

বনফুল

রচনাবলী ০৫

বনফুল রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সম্পাদনা :
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
সহযোগী :
শ্রীশুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ-রূপায়ণ :
শ্রীশৈলেন শীল
শ্রীসমরেশ বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

প্রকাশক :
মুরলীধর ঘটক
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

জঙ্গম

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়

বনফুল

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫২
দ্বিতীয় মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪
তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৫৮
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাড়ে ছয় টাকা

জঙ্গম

চতুর্থ অধ্যায়

১

সাহিত্যিক জীবন! ইহার নাম সাহিত্যিক জীবন? 'সংস্কারক' আপিসের দ্বিতলের ঘরটিতে বসিয়া প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে শঙ্কর মনে মনে নিজের সাহিত্যিক জীবনের হিসাব-নিকাশ করিয়া যাহা অনুভব করিল, তাহা গৌরবজনক নহে। সাহিত্যিক মানে কেরানী? সাধারণ কেরানীর মত সেও তো দশটা-পাঁচটা আপিস করিয়া পরের ফরমাশ অনুযায়ী কলম পিষিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। গোটা দুই বাজে উপন্যাস, চলনসই কয়েকটা গল্প এবং চানাচুর-মার্কা কয়েকটা কবিতা লেখা ছাড়া আর কি এমন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে সে! ভাল লেখা দূরে থাক্, ভাল বই পড়িবারই তো অবসর পায় নাই। চাকরি বজায় রাখিতেই সমস্ত শক্তি ও সময় চলিয়া যাইতেছে। 'সংস্কারক'-সম্পাদকের শুচিবায়ুগ্রস্ত মনের রুচি অনুযায়ী লেখা নির্বাচন করিতে এবং সেই দুর্বল রচনাগুলিকে যথাসম্ভব নির্ভুল করিয়া মাসের ঠিক পয়লা তারিখে প্রকাশ করিতেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, নিঃসন্তান সম্পাদক মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন ভাগিনেয় নিলয়কুমারকে সমীহ করিয়া চলিতে হয়, তাহার যে-কোন রচনাকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-মর্যাদা দিয়া ছাপিতে হয়, তাহার বন্ধুদের অন্তঃসারশূন্য সাহিত্যিক চালিয়াতি নীরবে সহ্য করিতে হয়। ইহাই তাহার বর্তমান চাকরি এবং ইহাই তাহার সাহিত্য-চর্চা। অথচ এই চাকরি বজায় রাখিবার জন্য কত কৌশল, কত প্রচেষ্টা! ডাক্তার মুখার্জির সুপারিশে প্রুফ-রীডার হইয়া মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে

সে 'সংস্কারক' আপিসে ঢুকিয়াছিল, তাহার পর এই দুই বৎসরের মধ্যে, নিজের দক্ষতাগুণেই হউক বা ডাক্তার মুখার্জির গোপন সুপারিশ বলেই হউক, তাহার পদোন্নতি ঘটিয়াছে। সে এখন প্রুফ-রীডার নয়, সহকারী সম্পাদক। দুই বৎসর পূর্বে হীরালাল মজুমদারের সহকারী হইবার কল্পনা তাহার পক্ষে কল্পনা-বিলাস হইত, কিন্তু এখন সেই সহকারী-পদ পাইয়া সে অস্বস্তি ভোগ করিতেছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছে, কিছু হইল না, কিছু হইল না, সময়টা বৃথা নষ্ট হইয়া গেল। মনে হইতেছে, অহরহ মনে হইতেছে, কিন্তু চাকরি ছাড়িবার উপায় নাই। কলিকাতা শহরে অর্থই একমাত্র বল। মাস শেষ হইলে অন্ততপক্ষে দেড় শত টাকা চাইই। চাকরি ছাড়া চলিবে না, বরং চাকরিটা যাহাতে আরও পাকা হয় সে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করিতেছে। আপিসে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে—চণ্ডীচরণ দস্তিদার, নিলয়কুমারের বন্ধু। অনেকে বলেন নিলয়কুমারের চর। মামার আপিসের সমস্ত হালচালের সম্পূর্ণ খবর রাখিবার জন্যই নাকি নিলয়বাবু চণ্ডীচরণবাবুকে আপিসে ঢুকাইয়াছেন। তিনি আপিসে আসিয়াই একটি দল পাকাইয়াছেন। দলটি শঙ্করকে শত্রু-পক্ষীয় বলিয়া মনে করে। মনে করে, শঙ্কর হীরালাল-বাবুর গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু নয়। শঙ্করের আশঙ্কা এই চণ্ডীচরণবাবুর চক্রান্তেই হয়তো তাহার একদিন চাকরি যাইবে। কারণ, কাগজে-কলমে হীরালালবাবু মালিক হইলেও আসল মালিক নিলয়কুমার। তাই নিলয়কুমারকে তুষ্ট করিবার জন্য শঙ্কর ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার জন্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতেছে, কিন্তু বাহিরে ব্যগ্র হইতেছে। আজই তো সমস্ত দিন ধরিয়া সে সদ্যবিবাহিত নিলয়কুমারের জন্য সস্তায় একটি বাড়ি ঠিক করিয়া আসিল। নিলয়কুমার নববিবাহিতা পত্নীকে লইয়া মাতুলের বাড়িতে থাকিতে চান না। এতদিন মাতুলের কাছেই ছিলেন; কিন্তু বিবাহ করিবামাত্র তাঁহার আত্মসম্মানবোধ সম্ভবত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; তিনি অন্য বাসায় উঠিয়া যাইতে চান, হীরালালবাবুও নাকি ইহাতে মত দিয়াছেন। চণ্ডীচরণবাবু ও নিলয়বাবু নিজেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ভদ্রপল্লীতে সস্তায় বাড়ি আবিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না, আজ শঙ্কর বাড়িটা খুঁজিয়া দিয়ে-

চণ্ডীচরণ দস্তিদারের উপর টেক্কা দিয়াছে। নিলয়কুমার এবং তৎপত্নী রেণুকা যদি সুপ্রসন্ন থাকেন, শঙ্করের চাকরি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। হীরালালবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, নিজে কিছু দেখিতে পারেন না। নিলয়কুমার অফিস-ডিরেক্টার হিসাবে মোটা মাসোহারা লইয়া আপিসের সর্বময় কর্তা। ইঁহাকে সন্তুষ্ট না করিলে চাকরি থাকিবে না।

নিলয়কুমার উপর-চালাক-গোছের লোক। হঠাৎ কথাবার্তা শুনিলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বোঝা যায়, ভিতরে কোন শাঁস নাই। শঙ্কর ইহা জানে, কিন্তু ভুলিয়াও কখনও তাহা প্রকাশ করে না, বরং আচার-ব্যবহারে এমন একটা সভ্রদ্ধ ভাব দেখায় যে, সে যেন নিলয়কুমারের বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। বাড়ি খুঁজিয়া দিয়া শঙ্কর তাঁহাকে আজ আরও খুশি করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, রেণুকা দেবীর একটি অতি-সাধারণ কবিতার এমন উচ্ছ্বসিত অনর্গল প্রশংসা করিয়াছে যে, নিজের আচরণে সে নিজেই বিস্ময়বোধ করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে চণ্ডীচরণ দস্তিদারের দলের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে এ কি করিতেছে? ইহাই কি সাহিত্য-চর্চা? সহসা তাহার মন আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সহসা মনে হইল, বিবাহ করিয়া এমনভাবে জড়াইয়া না পড়িলে হয়তো তাহার এ অধঃপতন ঘটিত না, অতিশয় যুক্তিহীনভাবে সহসা অমিয়ার উপর রাগ হইল, আবার তখনই মনে হইল—না না, সে বেচারীর দোষ কি? তাহাকে সে-ই তো নিজে যাচিয়া জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছে এবং বিবাহ করিয়া সম্ভবত তাহারই প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্বের একটা ঘটনা শঙ্করের সহসা মনে পড়িল। সমস্ত চিত্রটা মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর, হাওড়ার পুল খোলা, রাত্রেই গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতা ফিরিতে হইবে। সঙ্গীরা সবাই মাতাল, একজন রাস্তায় শুইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া একজন মাঝির ঘুম ভাঙাইল, বেশি পয়সার লোভে সে তাহাদের গঙ্গা পার করিয়া দিতে রাজীও হইল; কিন্তু গঙ্গায় এমন অবস্থা যে ডিঙি তীর পর্যন্ত আসিতে পারে না।

শঙ্কর সঙ্গীদের প্রত্যেককে কাঁধে করিয়া নৌকায় তুলিল। গঙ্গার জলে বিষ্ঠা ভাসিতেছে, চতুর্দিকে কর্দম ও আবর্জনা। সমস্ত অতিক্রম করিয়া শঙ্কর সঙ্গীদের লইয়া নৌকায় চড়িয়া বসিল ; হু-হু করিয়া একটা হাওয়া উঠিয়াছে, ও-পারে কলিকাতা শহরের আলো-আঁধারির রহস্য, রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছে, হুইস্কির নেশাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নৃত্যপরা তন্বীর যৌবন-মাদকতায় কল্পনা আবিষ্ট—মেয়েটার নামটা কি ছিল ? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর খানিকক্ষণ ভাবিল, কিন্তু মনে করিতে পারিল না।

"উড়িষ্যার বনে জঙ্গলে"র পর ইঞ্চি তিনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে, কোন কবিতা-টবিতা থাকে তো দিন।

প্রিণ্টার শীতলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শঙ্কর রেণুকা দেবীর কবিতাটা দিয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ। এ ধরনের কবিতা তো প্রতি মাসেই ছাপিতে হয়, রেণুকা দেবীরটা ছাপিতেই বা দোষ কি ? ছাপিলে তাহার লাভ বই ক্ষতি নাই। ছন্দ মিল সবই তো ঠিক আছে, ভাবটিও বেশ উদাস-করা উদাস-করা গোছের। মন্দ কি ? শীতলবাবু চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর নিজের আচরণে নিজেই অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

২

'ক্ষত্রিয়' অবশ্য এখনও জীবিত আছে।

কিন্তু কোনক্রমে। কোন আয় তো হয়ই না, মাঘের পত্রিকা চৈত্রে বাহির হয়, তাও ভাল লেখা জোটে না। 'ক্ষত্রিয়ে'র পুরাতন দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। হিরণদা ইরিগেশন বিভাগে বড় চাকরি করিতেছেন, জ্যোতির্ময়বাবু একটা ইংরেজী দৈনিক-পত্রিকার সাব-এডিটার, সুরেন্দ্র সোম শিক্ষকতা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে কর্মে অবসর লইয়া দেশে গিয়াছেন, সেখান হইতে মাঝে মাঝে দুই-একটা ভারী ওজনের "উদ্ভট-

গোছের প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ছবি রায় একাধিকবার প্রেমে পড়িয়া, অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া, ক্রমবর্ধমান পরিবার লইয়া একটা আশঙ্কাজনক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে; পরিচিত কেহ তাহাকে দেখিলেই সরিয়া পড়ে, কারণ দেখা হইলেই সে ধার চায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করে নাই, শুষ্ক রুক্ষ কেশভার ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি লইয়া সে শঙ্করের কাছে মাঝে মাঝে আসে এবং শেলী ব্রাউনিং কীটস্‌ আওড়াইয়া কাঁদিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া শঙ্করকে বিব্রত করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে রোমান্টিক ধরনের প্রবন্ধ বা কবিতাও লিখিয়া আনে 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার জন্য। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আরও দুইজন লেখক জুটিয়াছেন, একজন ডাক্তার মুখার্জি এবং আর একজন লোকনাথ ঘোষাল। ডাক্তার মুখার্জির এমন কলমের জোর আছে, তাহা শঙ্কর ইতিপূর্বে জানিত না। লোকনাথ ঘোষাল লোকটিও অদ্ভুতপ্রকৃতির। এমন একনিষ্ঠ সাহিত্যিক শঙ্কর আর দেখে নাই। সাহিত্যই তাঁহার জীবনের ধ্যান জ্ঞান, সাহিত্য ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না, আর কিছু জানিতে চান না। বেহারের এক পল্লীগ্রামে তিনি স্কুল-মাস্টারি করেন এবং মাস্টারি করিবার পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা সাহিত্য-সাধনায় ব্যয় করেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ঠুনকো শৌখিন ব্যাপার নয়, জীবনের মর্মমূলে সে সাধনা রস-পরিবেশন করে, আলো-বাতাসের মত তাহা তাঁহার নিকট সত্য ও প্রয়োজনীয়। 'সংস্কারক' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদকরূপে লোকনাথবাবুর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছে। আলাপ করিয়া শঙ্কর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার মুখার্জি এবং লোকনাথবাবুর লেখায় 'ক্ষত্রিয়' সত্যই সমৃদ্ধ। শঙ্করের আশা, তাহার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা সত্যই একদা আদর্শ সাহিত্য-পত্রিকায় পরিণত হইবে, তাই এত অসুবিধার মধ্যেও সে 'ক্ষত্রিয়'কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখনও সে আদর্শ বহু দূরে, এখনও কেবল নিন্দা এবং গালাগালি দিয়াই কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে হয়। গালাগালির বিষয়ও সেই এক, প্রতিভাহীন বামনদের স্পর্ধিত চন্দ্র-লোলুপতা। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার মুখার্জি দিল্লী হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, শঙ্কর তাহাই পড়িতেছিল। ডাক্তার মুখার্জি আজকাল দিল্লীতে, কারণ তাঁহার একমাত্র পুত্র দিল্লীতেই চাকরি করেন।

ডাক্তার মুখার্জি লিখিতেছেন—

শঙ্কর,

আধুনিক লেখকদের ওপর তুমি চটেছ। আমি তোমার চেয়ে বেশিদিন বাংলা দেশে বাস করেছি, আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখেছি, তাই চটবার কারণ পাচ্ছি না।

সেকালে রবিবাবুর নাম করলে ঢিল খেতে হ'ত ; আমাদের প্রাণ বাঁচানো দায় ছিল। রবিবাবুর ছন্দ নেই, মিল নেই, গাম্ভীর্য নেই, ভাষার মাধুর্য নেই —এই রকম কত দোষ যে দেখতে পেয়েছিল হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দমুগ্ধ সাহিত্যিকেরা, তা বলবার নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে রবিবাবুর ভাষাকে চেস্ট বাংলায় রূপান্তরিত করবার জন্যে নম্বর দেওয়া হ'ত।

এখন সেদিন গেছে। এখন রবিবাবু নাকচ হয়েছেন পিচের গন্ধ আর পেট্রোলের গন্ধ কবিতায় ঢোকান নি ব'লে।

সেকালে টিকি আর তিলকের মধ্যে ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম আর ইলেক্‌ট্রিসিটি, বিধবার অলঙ্কারের স্বর্ণে উত্তেজক তাড়িত এবং শূদ্রের চোখের দুষ্ট ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ বেরুত। এর জন্যে অনেকেরই ফিজিক্স পড়বার দরকার হয় নি, এমন কি যাঁরা ফিজিক্স চর্চা করতেন তাঁরাও ওই রকম বক্তৃতা দিতেন কেউ কেউ।

সেকালে গল্প বেরুত—ডাকাতরা বৃক্ষকোটরে প্রবেশ করলে, আর ডিটেক্‌টিভ মাইক্রস্‌কোপ লাগিয়ে তাদের ধ'রে ফেললে।

একালে ইলেক্‌ট্রিসিটির বদলে এসেছে ফ্রয়েডিজ্‌ম আর সাইকলজি। এখন মা চুমু খেলে বেবির মুখ লাল হয়ে ওঠে, মামা ভাগনীর রিপ্রেশন তাড়াবার জন্যে বক্তৃতা করে। সেকালে যাঁরা মামী-কাকীকে কাশী পাঠাতেন তাঁদের কাব্যের একমাত্র বিষয় ছিল সতীত্ব। একালে সতীত্ব নেই। যুবারা সেক্সের বিজ্ঞাপন পড়া (অনেক সময় আবার সেটা কন্টিনেন্টাল নভেল বা সিনেমার মারফৎ) আর রতিবিলাস খাওয়ার অবসরে রাস্তায় মেয়েদের হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের ঘুমন্ত মুঠোয় টাকা গুঁজে দিয়ে চ'লে আসছে। সেকালের প্রব্‌লেম ছিল ক-খ-জানা মেয়ের হাতে স্বামীর লাঞ্ছনা অথবা অহঙ্কার

প্রব্লেম হয়েছে লেবার-এর দুঃখ। যেখানে ভিক্ষা পেলেই পেট ভ'রে খেতে পাওয়া যায়; যেখানে অতি অধমেরও কাকা দাদা প্রভৃতি আশ্রয়স্থল আছে— সেখানকার লেবার প্রব্লেম কি মর্মান্তিক!

এক খামচা লঙ্কাবাটা বা একটা পেঁয়াজ দিয়ে যারা এক থালা ভাত খায়, তাদের পাড়ায় যেতে হয় ডিমের খোলা মাড়িয়ে! গিয়ে দেখতে হয়, দরমার দেওয়ালে খবরের কাগজের ওয়াল-পেপার আর বালিশের তলায়—দি ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড!

সেকাল আর একাল পাশাপাশি বসিয়ে দেখ, ইউক্লিডের ফোর্থ থিয়োরেমের মত মিলে যাবে।

এখনকার অধঃপতনে দুঃখ বা রাগ হতে গেলে প্রি-সাপোজ করতে হয় যে, এর আগে এক সময় এর চেয়ে ভাল কিছু ছিল।

সেকালে দেখেছিলুম, একজন মহাত্মা ভদ্র কুলবধূর নাম ক'রে কেচ্ছা করলেন আর চারিদিকে বাহবা বাহবা প'ড়ে গেল। শেষে তাঁর জেল হ'ল। কিন্তু যেদিন জেল থেকে বেরুলেন, কলেজের ছেলেরা মাথায় ক'রে তাঁকে নিয়ে এল। একালে দেখি সিবিল-ডিস্ওবিডিয়েন্স মুভ্মেণ্টে দলে দলে লোক জেলে গিয়ে, নিজেদের ডিফেণ্ড করছে না। জেলে গিয়ে কিন্তু মাসিমের তেল বা পানের চুন কম হ'লে আকাশ-ফাটা আর্তনাদ করছে, আর হর্লিক্স মিল্ক না পেলে হাঙ্গার-স্ট্রাইক করছে! সেকালের সাহিত্য বা পলিটিক্স যা ছিল, একালেও ঠিক তাই আছে,—বাইরের চেহারাটায় একটু অদল-বদল হয়েছে মাত্র। দাণ্ডী-মার্চ বা সণ্ট-রেডের সাব্লাইম বা রিডিকুলাস কারুর কল্পনা উদ্বুদ্ধ করল না। বিহার ভূমিকম্প কারুর কাব্যের খোরাক যোগাল না। এবার অতীতের দিকে চেয়ে দেখি—সিরাজ এবং ইংরেজ যখন বঙ্গদেশের বুকে সমুদ্রমন্থন করছিল, তখন বই বেরিয়েছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত। কি আর বলি! তোমরা সবাই ভাল? ইতি শুভার্থী

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়

ডাক্তার মুখার্জির পত্রখানা পড়িয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। তাঁহার ঠিক এই রূপ সে এতদিন দেখে নাই। আধুনিকনামা এই অপদার্থ

লোকগুলার সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টিভঙ্গীই যেন বদলাইয়া গেল। ইহারা যে এই পরাধীন দেশের সনাতন মনোবৃত্তিরই নব রূপ, তাহা এতদিন তাহার ধারণাতে আসে নাই। সহসা তাহার মনে হইল, সে কি নিজেও তাহাদেরই দলভুক্ত নয়, না হয় তাহার ধরনটা একটু ভিন্ন রকমের। সে 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকায় উহাদের রচনাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে ব্যঙ্গ কি সত্যই সাহিত্যিক ব্যঙ্গ? তাহাতে বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কি নাই? আধুনিক লেখকদের হঠাৎ-জনপ্রিয়তা কি তাহার চিত্তকে ঈর্ষাক্ষুব্ধ করিয়া তোলে নাই? এই ঈর্ষা এবং এই ঈর্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া মহত্ত্বের অভিনয় করা কি পরাধীন জাতির মজ্জাগত প্রবৃত্তি নয়? যে পরাধীনতার প্রকোপে এই আধুনিকেরা নকল-নবিস, সেই পরাধীনতার প্রকোপে সেও ঈর্ষাক্লিষ্ট নকল-সংস্কারক। কিন্তু না না··· সহসা শঙ্করের যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। নিজেকে এতটা হীন সে ভাবিতে পারিল না। ঈর্ষা? ঈর্ষার জন্যই সে এত সব করিয়াছে? আর একটা কথা তাহার মনে হইল। উহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে তো তাহার বাধে নাই! একই হোটেলে একই ধরনের আহার্য ও মদ্য সেবন করিয়া একই বারবনিতার বাড়িতে রাত্রি কাটাইতে তাহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই; এমন কি যাহাদের সঙ্গে এই [illegible] বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে তাহার উগ্রতাটা যেন অনেকটা [illegible] হইয়া আসিয়াছে। মানসিক শুচিতাই যদি তাহার ব্যঙ্গের কারণ হইত, তাহা হইলে সে ইহাদের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতে পারিত কি? কিন্তু না না, কোথায় যেন ভুল হইতেছে—সাহিত্যিক বিরোধের সহিত সামাজিক প্রীতি-অপ্রীতির কোনও সম্পর্ক নাই। তাহার নিকটতম বন্ধুর রচিত সাহিত্যও তাহার বিচারের মানদণ্ডে হীন হইতে পারে এবং তাহা লইয়া নিষ্ঠুরতম ব্যঙ্গ করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সে স্বস্তি পাইল এবং পুনরায় মনোযোগসহকারে প্রুফ দেখিতে আরম্ভ করিল। তাহার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকারই প্রুফ সে দেখিতেছিল। ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—নয়টা বাজিয়া গিয়াছে; একটু পরেই আপিসের জন্য উঠিতে হইবে। একজন

বেয়ারা প্রবেশ করিয়া একটা চিঠি দিয়া গেল। শৈলর চিঠি, শৈল ডাকিয়াছে।

৩

আপিসে ভন্টু আসিয়া হাজির।

এখনও প্রূফ লব্‌কাচ্ছিস? ওঠ্।

কেন, কি করতে হবে?

লব্‌স্টারিং।

সে আবার কি?

লব্‌স্টার মানে জানিস না? গলদা-চিংড়ি। ইটিং আপিসে ঢুকব আজ, এখন না কিনলে তো পাওয়াই যাবে না। ওঠ্।

এটা শেষ ক'রে দিই, থাম্, মেশিন না হ'লে ব'সে থাকবে। তা ছাড়া এখন আমার ঢের কাজ বাকি—বাজারে যাবার সময় নেই, ব'স্।

ভন্টু মুখ সুচালো করিয়া তাহার দিকে একবার তাকাইল এবং চেয়ার টানিয়া বসিল।

হঠাৎ গলদা-চিংড়ি খাবার শখ কেন?

বিয়ে ক'রে সিংকিং আপিস খুলছি।

অর্থাৎ?

দরাজে ব্যাপার।

কি রকম?

বিড্‌ডিকারের নাকে লব্‌স্টার-ফ্রাইং গন্ধ এন্‌টারিং আপিস খুলেছে।

শঙ্কর কোন মন্তব্য না করিয়া স্মিতমুখে প্রূফই দেখিতে লাগিল। ভন্টু বলিয়া চলিল, বুঝতে পারলি না তো? পারবার কথাও নয়, বুঝিয়ে বলি তা হ'লে শোন্। আমার মাইনে যদিও একটু বেড়েছে—কিন্তু চাল বাড়াই নি আমি, বিড্‌ডিকারকে সেই সাবেক চালে নৌকোর হালটিতে বসিয়ে রেখেছি। প্রাচীন কলাইয়ের ডাল, পোস্ত আর মৌরলামাছের বাটি

টক, গ্লাস একটা জাবদা-গোছের ভেজিটেব্‌লের তরকারি—এই মামুলি ফরমুলা চলছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন বিড্‌ডিকারের নাকে চিংড়িমাছ-ভাজা গন্ধ ঢুকল।

পাশের বাড়ি থেকে ?

না, দোতলা থেকে। বিড্‌ডিকার দোতলায় উঠে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলে, ঘরে খিল বন্ধ ক'রে ইন্দুমতী স্টোভে লবস্টার ফ্রাই করছে। তাও মাত্র দুটি—একটি বোধ হয় নিজের জন্যে, আর একটি আমার জন্যে।

শঙ্কর হাসিয়া ভন্টুর পানে চাহিয়া আবার প্রূফে মন দিল।

ভন্টু বলিল, বোঝ, ভাল ক'রে তলিয়ে বুঝে দেখ ব্যাপারটা।

এতে আর বোঝবার কি আছে ?

ঝিকে দিয়ে লুকিয়ে চিংড়িমাছ আনিয়ে গোপনে ইটিং আপিস খুলছে—বোঝবার কিছু নেই ?

যাঃ।

তুই দেখছি বিড্‌ডিকারেরও এক কাঠি ওপরে গেলি। বিড্‌ডিকারও প্রথমে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল।

শঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

বিড্‌ডিকারের যা স্বভাব, দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে। বলছে, ও বড়লোকের মেয়ে, যা-তা জিনিস কি রোজ রোজ মুখে রোচে বেচারীর, তোমারই কিপ্‌টেমির জন্যে এসব হচ্ছে, আজ বেশি ক'রে গলদা-চিংড়ি আনাও, সবাই মিলে খাওয়া যাক।

একটু থামিয়া ভন্টু পুনরায় বলিল, বোঝ।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল।

এখনও ধার শোধ ক'রে উঠতে পারি নি, দাদার আবার জ্বর হচ্ছে, ডাক্তাররা বলছে ফের চেঞ্জে পাঠাতে।

শঙ্কর আবার হাসল।

মুচকি মুচকি হাসছিস যে বড় ? মরিয়া হয়ে উঠেছি আজ, লবস্টারের চরম ক'রে ছাড়ব আমি। ওঠ্‌।

আমি এখন উঠতে পারব না, অনেক কাজ বাকি আছে আমার। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিল, চণ্ডীচরণ দস্তিদার শ্যেনচক্ষু মেলে চেয়ে আছে, কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

ভন্‌টু মুখ সূচালো করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, তা হ'লে রাত্রে যেও এবং ওইখানেই ইটিং আপিস খুলো। কটি লব্‌স্টার খাবে তুমি?

গোটা চারেক।

বলিস কি রে?

ভন্‌টু উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললাম, মৃন্ময়কেও ব'লে যাই। ক্যাণ্ডলকে নিয়ে কিন্তু মহা মুশকিলে পড়েছি ভাই; ও আপিসের কাজ একদম কিচ্ছু করে না, অন্যমনস্ক হয়ে ব'সে থাকে খালি। এমন থক্‌বকিয়ে গেল কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

কেন, কি করে?

কিচ্ছু করে না। কিছু বললেই ফ্যালফ্যাল ক'রে লুকিং আপিস খোলে খালি। ও কি রে, তুই আবার আংটি লদ্‌কালি কবে? দেখি দেখি, এ যে দামী জিনিস দেখছি।

আমার নয়, অপরের।

ফের মোল্লা জুটিয়েছিস নাকি?

না।

আমি চললাম। আর দেরি করলে পাওয়া যাবে না।

ভন্‌টু চলিয়া গেল।

আংটির কথা উঠিতে শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল, কুমার পলাশকান্তি আজ যাইতে বলিয়াছেন। তাঁহাকে একটি গল্প লিখিয়া দিতে হইবে। এই জমিদার-পুত্রটির সাহিত্য-বাই চাগিয়াছে। নিজের কোন প্রতিভা নাই, অপরের দ্বারা গল্প লিখাইয়া নিজের নামে প্রকাশ করেন এবং ভাল কাগজে ভাল লোক দিয়া ভাল সমালোচনা লিখাইয়া লইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বলা বাহুল্য, সবই টাকার জোরে। এই দামী হীরার আংটিটা তাঁহারই।

শঙ্কর শখ করিয়া আঙুলে পরিয়াছিল, তিনি আর খুলিয়া লন নাই। বলিয়াছিলেন, ব্যস্ত কি, বেশ মানাইয়াছে, থাক্ না, পরে লইলেই হইবে। 'সংস্কারক' 'পত্রিকার সহকারী সম্পাদককে, বিশেষত 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার উগ্র সমালোচককে, খুশি করিয়া রাখিতে তিনি ব্যগ্র। একটি গল্প লিখিয়া দিবার জন্য তিনি শঙ্করকে দুই শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। একটি উপন্যাস লিখিয়া দিতে পারিলে হাজার টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কুমার পলাশকান্তি লক্ষ্মীর দৌলতে সরস্বতীর দরবারেও আসর জমাইতে চাহেন। এককালে রেসের শখ ছিল, এখন সাহিত্যের শখ হইয়াছে।

ভন্টু চলিয়া যাইবার পর শঙ্কর আরও খানিকক্ষণ প্রুফ দেখিল, কিন্তু হঠাৎ একটা 'ফোন' আসাতে তাহাকে উঠিয়া পড়িতে হইল।

ফোনে চুন্‌চুন বলিল, আসবেন একবার? যদি আপনার অসুবিধে না হয়, আমি মনুমেণ্টের কাছে থাকব।

শঙ্করের মনে হইল, অবিলম্বে যাওয়া দরকার। ড্রয়ার টানিয়া আপিসেরই কয়েকটা টাকা সে পকেটে পুরিয়া লইল এবং অতিশয় উত্তেজনাভরে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল, আরও দুই স্থানে যাইতে হইবে।—প্রথম শৈলর বাসায়, দ্বিতীয় আসুমি-দার্জির পিতা নিবারণবাবুর কাছে। কুমার পলাশকান্তি যদিও আজ যাইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে আজ যাওয়া হইবে না, সময় নাই। চুন্‌চুন, শৈল এবং নিবারণবাবু সারিয়া ভন্টুর বাসায় পৌঁছিতে এমনিই অনেক রাত হইয়া যাইবে।

অমিয়ার মুখখানা মনে একবার উঁকি দিয়া গেল। পথে হঠাৎ পলাশকান্তিরই সহিত দেখা। তিনি তাঁহার মূল্যবান মোটরখানি নিঃশব্দে থামাইয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইলেন। কুমার পলাশকান্তি (বন্ধু ও পারিষদবর্গ তাঁহাকে আদর করিয়া 'কুমার' বলিয়া ডাকেন, সত্যই তিনি রাজপুত্র নহেন) এখনও যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা নারীসুলভ কমনীয়তা এবং সেই ধরনের দীপ্তি বিদ্যমান, যাহার মূল কারণ প্রতিভা নহে, আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং অভিজাত-সমাজ-সঙ্গ। প্রিয়দর্শন ব্যক্তি তিনি।

শঙ্করবাবু, আমার কাছেই যাচ্ছেন নাকি ?

না, জরুরি দরকারে আর এক জায়গায় যেতে হচ্ছে। আপনার কাছে কাল যাব।

আমার গল্পের কত দূর ?

অর্ধেকের ওপর হয়ে গেছে।

আচম্বিতে শঙ্করের মুখ দিয়া মিথ্যাই বাহির হইয়া পড়িল।

মুহূর্তকাল নীরবতার পর পলাশকান্তি বলিলেন, আজ কাগজ পড়েছেন ?

না।

অ'চনবাবুর দশ বছর জেল হয়ে গেল। আজ রায় বেরিয়েছে।

সংবাদটার জন্ত শঙ্কর প্রস্তুত ছিল না। সহসা তাহার মনে বহুদিন আগেকার একটা চিত্র ফুটিয়া উঠিল। অচিনবাবুর সহিত সে একবার ওই বৃদ্ধ ম্যানেজারটার নিকট গিয়াছিল টাকার চেষ্টায়। অচিনবাবু বলিয়াছিলেন যে, বুড়াকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে অনায়াসেই হাজার খানেক টাকা ধার পাওয়া যাইতে পারে, বেশি সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সুদ পর্যন্ত লাগিবে না। তিনি টাকা দিতে রাজী হইয়াছিলেন ; কিন্তু পরিবর্তে যে প্রস্তাবে শঙ্করকে রাজী ...ত বলিয়াছিলেন, তাহা শঙ্কর পারে নাই।

পলাশকান্তি বলিলেন, সমস্ত ডিটেল্‌স্ আজ কাগজে বেরিয়েছে, প'ড়ে দেখবেন ; উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। ওই ম্যানেজারটা সাংঘাতিক লোক ছিল মশাই। আর সবচেয়ে মজার খবর হচ্ছে এই যে, লোকটা অনেকদিন থেকে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু তার কামনা মরে নি।

শঙ্করের নিকট ইহা নূতন খবর নহে। তবু সে বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, তাই নাকি ?

এই যে কাগজে বেরিয়েছে, দেখুন না, সৌদামিনী আর তার মেয়ে সাক্ষী দিচ্ছে, কাগজটা আপনি রাখুন, আমার পড়া হয়ে গেছে।

শঙ্কর কাগজখানা লইয়া দেখিতে লাগিল। সমস্ত খবরই বাহির হইয়াছে। অচিনবাবু বৃদ্ধ ম্যানেজারকে যে চিঠিখানা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া খগেশ্বর অচিনবাবুর কন্যাকেই ভুলাইয়া আনিয়া ম্যানেজারের কবলে সমর্পণ

করিয়া দিয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া অচিনবাবু ম্যানেজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। পলাশকান্তি বলিলেন, 'আমার এ গাড়িখানা অচিনবাবুই কিনে দিয়েছিলেন, তখন কে জানত যে ভদ্রলোক এমন ধারা—

কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া শঙ্কর বলিল, ভদ্রলোকের ওয়ারিশ কেউ নেই?

না, অথচ টাকার কুমীর। একটা উইল নাকি ক'রে গেছেন, এখনও তা কোর্টের জিম্মায়।

ও।

এ রকম নরপিশাচ দেখা যায় না মশাই, কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। কাগজে একটা ফর্দ দিয়েছে দেখেছেন? সি. আই. ডি. বেচারাদেরও কম খাটতে হয় নি। লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

একটু থামিয়া পলাশকান্তি পুনরায় বলিলেন, এতে হয়তো উপন্যাসের খোরাকও পাবেন আপনি। এই নিয়ে একটা উপন্যাস লিখে দিন না আমাকে, দেবেন? বেশ সাইকলজিক্যাল-গোছের একটা—

আচ্ছা, প'ড়ে দেখব। এখন একটু তাড়া আছে, চলি।

আচ্ছা।

কাগজটা পকেটে পুরিয়া শঙ্কর পলাশকান্তির নিকট বিদায় লইল। অচিনবাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। মোটরের দালাল অচিনবাবু। কতটুকুই বা তাহার সঙ্গে পরিচয় ছিল? লোকটার জীবনে যে এত জটিলতা এবং তাহার পরিণতি যে শেষ পর্যন্ত জেলে, তাহাই বা কে জানিত! সহসা শঙ্করের মনে হইল, কাহার সহিতই বা তাহার এতদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর পরিচয় আছে? কাহার জীবনের সম্পূর্ণ রহস্য সে জানে? এমন কি, নিজের বিষয়েও তাহার জ্ঞান কতটুকু? এই প্রসঙ্গেই তাহার মনে পড়িল যে, যদিও তাহার মনের মধ্যে একটা নারীমাংসলোলুপ পশু বাস করে, কিন্তু কই, সেদিন ম্যানেজারের প্রস্তাবে সে তো সম্মত হইতে পারে নাই? পশুটার মাংসলোলুপতা হঠাৎ বিলুপ্ত

হইয়া গেল কি করিয়া? অচিনবাবুর সহিত প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। রিনির জন্মদিনে মিষ্টিদিদি আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। কোথায় রিনি! তাহার ডাক্তার স্বামীকে লইয়া সে হয়তো সুখেই আছে। শঙ্করের কথা হয়তো তাহার মনেই পড়ে না। কোথায় রিনি, কোথায় অচিনবাবু, কোথায় মিষ্টিদিদি! জীবনে একদিন যাহারা কত বড় ছিল, আজ তাহাদের কথা মনেও পড়ে না। বেলার মুখখানিও মনের মধ্যে ভাসিয়া আসিল—গ্রীবা বাঁকাইয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গীভরা হাসি হাসিতেছে। একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখে না!

৪

ট্রাম হইতে নামিয়াই শঙ্কর দেখিতে পাইল, চুনচুন মাঠে ঘাসের উপর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। শঙ্কর মিসেস স্যানিয়ালের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু চুনচুনকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যতদিন সে অব্যবস্থিত ছিল, ততদিনই সে চুনচুনের সহিত দেখা করে নাই। কিন্তু 'সংস্কার' আপিসে চাকরি হওয়া মাত্র সে মিসেস স্যানিয়ালের দৃষ্টি এড়াইয়া চুনচুনের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। কলিকাতা শহর এবং বর্তমান যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতার কল্যাণে তাহা অসম্ভব হয় নাই। চুনচুনের অবস্থা এখনও ঠিক পূর্ববৎ। এখনও সে ঠিক আগের মতই মিসেস স্যানিয়ালের নিষ্পাপ গৃহস্থালীতে মিসেস স্যানিয়ালের উপদেশাবলী, মিসেস স্যানিয়ালের পুত্রদ্বয়ের অনুকম্পা, মিসেস স্যানিয়ালের বৃদ্ধ দেবর পীতাম্বরবাবুর নিষ্পলক দৃষ্টি সহ্য করিয়া নীরবে বাস করিতেছে, এতটুকু বিদ্রোহ করে নাই। আজকাল শঙ্করের সহিত তাহার সম্পর্ক অনেকটা গুরু-শিষ্যার সম্পর্কের ন্যায়। শঙ্কর তাহাকে বই দেয়, সে তাহা পড়িয়া ফেরত দেয়। ফেরত দিবার সময় পঠিত পুস্তক লইয়া হয়তো মাঝে মাঝে আলোচনাও হয়। এই আলোচনার মধ্যে একজন গ্রন্থকার অদৃশ্যভাবে বর্তমান থাকিলেও সাধারণ নিয়ম অনুসারে অনুরাগের ইহা এতদিনে তাহাদের ব্যক্তিগত আশা-আশঙ্কা-আকুতিময়

আলাপে পরিণত হইতে পারিত, শঙ্করের সেদিকে প্রবণতাও যে কিছু কম তাহা নহে, কিন্তু চুনচুন মেয়েটি সত্যই অদ্ভুত। সে কোনদিন কোন আচরণ দ্বারা ইহার সম্ভাবনাকে পর্যন্ত প্রশ্রয় দেয় নাই। একটা সুন্দর শুভ্র ফুলে খানিকটা কালি ঢালিয়া দিবার চেষ্টা যেমন সুস্থ সহজ মানুষ করে না, তেমনই শঙ্করও চুনচুনের সহিত কোনদিন প্রেমালাপ করিবার চেষ্টা করে নাই। শঙ্করের মনে হয়, চুনচুনও তাহাদের সম্পর্কটাকে বোধ হয় এই একই মনোভাব লইয়া দেখে—যদিও কি যে তাহার মনোভাব তাহা শঙ্কর বুঝিতে পারে না। ইহার অস্বাভাবিকতা, ইহার রহস্যময়তা তাহাকে অনুসন্ধিৎসু করে, কিন্তু বাহিরে শঙ্কর শোভন সংযত ভাবটা বজায় না রাখিয়া পারে না। তাহার মনে হয়, এই দুর্ভেদ্য আবরণ একদিন স্বাভাবিক নিয়মে খসিয়া পড়িবেই ; কিন্তু কি করিয়া কখন কাহার জন্য যে পড়িবে, তাহা তাহার কল্পনাতীত। শঙ্কর যখনই চুনচুনের সহিত দেখা করিতে আসে, সঙ্গে করিয়া কিছু টাকা আনে। চুনচুনের ফোন আসিলেই তাহার মনে হয়, নিশ্চয়ই সে কোন বিপদে পড়িয়াছে, মিসেস স্যানিয়াল হয়তো তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, কিংবা হয়তো নিজেই সে উত্যক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রতি বারেই সে গিয়া হতাশ হয়। স্মিত নম্র হাসি হাসিয়া চুনচুন বই ফেরত দেয়, কিংবা হয়তো কোন দুর্বোধ্য অংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করে, কিংবা অমনই একটা কিছু। নাটকীয় কোন কিছু ঘটে না। অথচ শঙ্করের মনে হয়, ভিতরে ভিতরে মেয়েটি না জানি কোন্ রহস্যময় লোকের অধিবাসিনী, সঙ্গোপনে কি যেন ভাবিতেছে, কিন্তু এসবের কোন বাহ্যিক প্রমাণ শঙ্কর কোনদিন পায় নাই। কালো রঙ, ছিপছিপে গড়ন, স্বপ্নময় চোখ, এতদিন আলাপ, মেয়েটি শঙ্করকে কল্পনায় আকৃষ্ট করিতেছে, অথচ কাছে আসিলে ইহার সম্বন্ধে তাহার সমস্ত মোহ যেন ফুরাইয়া যায়।

কি খবর ?

খবর আছে একটা, আমি কলেজে ভর্তি হব, কোন্ কলেজ ভাল বলুন দিকি—বেথুন, না, ডায়োসেশন ?

শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

এতদিন পরে হঠাৎ কলেজে পড়ার শখ ?

শখ অনেকদিন থেকেই ছিল, খরচ জুটছিল না।

এখন জুটল কোথা থেকে ?

খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে—অন্তত শঙ্করের তাহাই মনে হইল—চুন্‌চুন বলিল, পীতাম্বরবাবু দেবেন।

পীতাম্বরবাবু ? হঠাৎ তাঁর এত দয়া ?

চুন্‌চুন এ কথার জবাব দিল না। ক্ষণকাল নীরবতার পর পুনরায় প্রশ্ন করিল, কোন্ কলেজটা ভাল, বলুন না ?

তা পীতাম্বরবাবুই ঠিক ক'রে দেবেন না ?

পীতাম্বরবাবু নিজে বিশেষ লেখাপড়া জানেন না, তিনি আমাকেই ঠিক করতে বলেছেন।

মিসেস স্যানিয়াল তো আছেন।

তিনি বেথুন কলেজের পক্ষপাতী। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, বেথুন কলেজে যদি আমার আপত্তি থাকে, তা হ'লে আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি বাধা দেবেন না।

ওঃ !

ক্ষণকাল নীরবতার পর চুন্‌চুন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কলেজটা ভাল ?

এখন ঠিক বলতে পারছি না, খোঁজ নিয়ে কাল বলব।

বেশ। চলুন, অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

এ কথাটুকু ফোনে বললেই পারতে।

আপনি অবসর দিলেন কই, আপনাকে আসতে ব'লে তখনই ভাবলাম—ফোনেই জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আপনি তখন কেটে দিয়েছেন।

উভয়েই নীরবে পাশাপাশি খানিকক্ষণ হাঁটিল। চুন্‌চুন একটু পরে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি কাজ ক্ষতি ক'রে এসেছেন বুঝি ? আমি—

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, অকৃত্রিম কুণ্ঠাভরে চুন্‌চুন যেন ...টির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

নীরবে খানিকক্ষণ পথ অতিবাহন করিবার পর শঙ্কর প্রশ্ন করিল, 'চোখের বালি' কেমন লাগছে ?

খুব ভাল লাগছে না।

লাগছে না ?

আমি বুঝতে পারছি না বোধ হয়।

সহসা শঙ্করের মনে হইল, হয়তো ইহার রসবোধ নাই এবং সেই জন্যই বোধ হয় ইহার জীবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটে না। হয়তো—

হর্ন দিতে দিতে একটা ট্যাক্সি আগাইয়া আসিল। শঙ্করের চিন্তাধারা ভিন্ন পথ ধরিল।

চল, তোমাকে ট্যাক্সি ক'রে পৌছে দিই।

চলুন।

ট্যাক্সিতে উভয়ে চড়িয়া বসিল।

৫

শঙ্কর যখন শৈলর বাসায় পৌছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ড্রয়িং-রুমে ঢুকিতেই মিস্টার এল. কে. বোসের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি নিখুত সাহেবী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন। শঙ্করকে দেখিয়া থামিলেন এবং ফেল্‌টের টুপিটি মাথা হইতে ঈষৎ আলগা করিয়া শঙ্করকে অভিবাদন-করত হাসিয়া বলিলেন, হঠাৎ পথ ভুলে নাকি ?

শঙ্কর একটু মৃদু হাসিল।

বহুদিন আপনার দেখা নেই, আগে যা-ও বা আসতেন, খ্যাতিলাভ করার পর থেকে তো একেবারে বর্জন করেছেন আমাদের। আজ হঠাৎ কি মনে ক'রে ?

শৈল ডেকে পাঠিয়েছে।

সো সিলি অব হার! আপনার মত 'বিজি' লোককে ডেকে পাঠানো!

শঙ্কর পুনরায় হাসিল, মিস্টার বোসও হাসিলেন। তাহার পর পকেট হইতে চামড়ার সিগার-কেস বাহির করিয়া শঙ্করের সামনে সেটি খুলিয়া ধরিলেন, আমরা আর বেশি দিন এখানে নেই, বদলির খবর এসেছে।

কোথা যাচ্ছেন?

এলাহাবাদ।

শঙ্কর একটি সিগার তুলিয়া লইল, মিস্টার বোস একটি চকচকে সিগারেট-লাইটার বাহির করিয়া সেটি ধরাইয়া দিলেন, নিজেও একটি ধরাইলেন। এক্স্‌কিউজ মি, আমাকে বেরুতে হচ্ছে; ক্লাবে ব্রিজ টুর্নামেণ্টে জয়েন করেছি, আজ আমার খেলার দিন, উইল্‌সনের সঙ্গে খেলতে হবে, সে সোজা লোক নয়, সুতরাং একটু—

অর্থপূর্ণ একটা মুচকি হাসি হাসিয়া মিস্টার বোস অসম্পূর্ণ বাক্যটাকে পূর্ণতা দান করিলেন। তাহার পর দাঁতে সিগারটা চাপিয়া বাম্‌ চক্ষুটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অন্তরঙ্গের মত আন্তরিক সহৃদয়তার সহিতই প্রশ্ন করিলেন, শুধু খ্যাতিই হচ্ছে, না, পকেটেও কিছু আসছে? হোয়াট ইজ হোয়াট ম্যাটার্স ইন দি লং রান, ইউ নো—

শঙ্কর কিছু না বলিয়া আর একটু হাসিল। মিস্টার বোস হাত-ঘড়ি দেখিলেন। তাহার পর ঘরের কোণে গিয়া ছড়ি রাখিবার র‍্যাক হইতে একটি ছড়ি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, হেঁটেই যাওয়া যাক। শঙ্করের পানে চাহিয়া হাসিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বিশেষ কোন ভঙ্গীভরে গেলেন না; কিন্তু তবু শঙ্করের মনে এই অনুভূতিটুকু জাগাইয়া দিয়া গেলেন যে, তিনি পদব্রজে ক্লাবে গমন করিয়া একটা অসাধ্য সাধনই বুঝি বা করিলেন। শঙ্করের কেন এরূপ মনে হইল, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো বলিতে পারিত না; কিন্তু তাহার মনে হইল।

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া নীচে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। নীচের দালানে কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব্‌ বিমর্ষভাবে জ্বলিতেছে, চতুর্দিকে কেমন যেন থমথমে ভাব। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল এবং বলিল, মাঈজী উপরে আছেন। উপরে উঠিতে উঠিতে তাহার

নিজেরই কেমন যেন একটু লজ্জা করিতে লাগিল। সত্যই অনেকদিন সে শৈলর কাছে আসে নাই। শৈলর কথা আজকাল তাহার মনেই পড়ে না।

শৈল দালানেই ছিল, পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল। কোন প্রশ্ন করিল না।

তুই এসব কি করছিস?

শৈল তবু উত্তর দিল না। কাঁচি দিয়া কি একটা কাটিতেছিল, নীরবে তাহাই কাটিতে লাগিল।

শৈল দালানে ছোটখাটো একটি দরজির দোকান খুলিয়া বসিয়াছিল যেন। কাঁচি, কল, ফিতা, ফ্রিল, ছিট, প্যাটার্ন—চতুর্দিকে ছড়ানো। শঙ্কর নিকটের চেয়ারটায় বসিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেল। সবই ছোট ছেলের জামা, একেবারে শিশুর গায়ের।

এত জামা করছিস কার জন্যে, তোর দাইয়ের কটা ছেলে-মেয়ে—

কেন, দাই ছাড়া আর কারও ছেলেমেয়ে হতে নেই?

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, যদিও পা-কল, তবু শৈল হাত দিয়া ঘুরাইয়া সেলাই করিতেছে। আরও লক্ষ্য করিল, শৈলর মুখে একটা পাণ্ডুর সুন্দর শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে। মাতৃত্বের পূর্বাভাস। শঙ্কর বুঝিল, কিন্তু কিছু বলিল না। শৈলও নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ আজ ডেকে পাঠিয়েছিস কেন?

শৈল কিছু বলিল না, সেলাই থামাইয়া উঠিয়া গেল। মিনিট কয়েক পরে ঘর হইতে একটা খাতা আনিয়া বলিল, এই নাও।

কি এ?

শঙ্কর খাতাখানা চিনিতে পারিয়াছিল, তবু প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তোমার কবিতার খাতাখানা, ফিরিয়ে দিলুম।

শঙ্কর খাতাখানা হাতে লইয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, কি যে বলিবে সহসা ভাবিয়া পাইল না। শৈল আবার কলে আসিয়া বসিল এবং নীরবে সেলাই করিতে লাগিল। শঙ্কর শৈলর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া

রহিল ; তাহার মনে হইল, শৈল যেন বড় বেশি ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, মুখখানা যেন শ্বেতপাথরের তৈরি, চুনির দুলটা আলোকবিদ্ধ একবিন্দু রক্তের মত কাঁপিতেছে।

এতদিন পরে খাতাখানা ফিরিয়ে দেবার মানে ?

ও খাতা রাখবার আর আমার অধিকার নেই।

শৈল কল ছাড়িয়া আবার উঠিল এবং ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। পর-মুহূর্তেই কপাটটা একটু খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল, আর আমার কিছু বলবার নেই শঙ্করদা, তুমি আর তোমার সময় নষ্ট ক'রে ব'সে থেকো না, তোমার অনেক কাজ। আমার শরীরটা ভাল নেই, একটু শুই আমি, বড় ক্লান্ত লাগছে।

আবার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। শৈল তাহার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। সেই শৈল। একবার তাহার মনে হইল, শৈলকে ডাকে ; কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, ডাকিয়া কি হইবে ? দুই-চারিটা মৌখিক মিষ্ট বচনে আর কতকাল তাহাকে ভুলাইবে সে ? এ ভণ্ডামির প্রয়োজনই বা কি ?

শঙ্কর উঠিয়া নামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কাগজ পোড়ার গন্ধ পাইয়া শৈল তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। দেখিল, কবিতার খাতাখানা সিগারের আগুনে পুড়িতেছে। অন্যমনস্ক শঙ্কর খাতাখানার উপর জ্বলন্ত সিগারটা নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

৬

মৃন্ময়ের বাসায় থাকিবার সময় আস্‌মি-দার্জির পিতা নিবারণবাবুর সহিত শঙ্করের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। ইহার ফলে নিবারণবাবু যেন বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ভন্টুর ব্যবহারে নিবারণবাবু মর্মাহত হইয়াছিলেন সন্দেহ

নাই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা আহত হইয়াছিলেন তিনি ভন্‌টুর অন্তর্ধানে। সেই হইতে ভন্‌টু আর নিবারণবাবুর বাসায় পদার্পণ করে নাই। ভন্‌টুর লজ্জা করিত।

প্রতিবেশী হিসাবে কিছুদিন বাস করিয়া শঙ্কর ভন্‌টুর স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে নিবারণবাবু শুধু আকৃষ্ট নয়, বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শঙ্কর মুকুজ্জেমশাইয়ের স্নেহভাজন, শঙ্কর নিজে চাকরি না লইয়া মৃন্ময়কে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে, শঙ্কর বিদ্বান একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, সর্বোপরি সে ইচ্ছা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে—এই সকল ধারণা থাকাতে নিবারণবাবু শঙ্করের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজকাল কোনরূপ বিপদে পড়িলে শঙ্করের কথাই তাঁহার সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাঁহার চিররুগ্ন স্ত্রীর কি সেবাটাই না শঙ্করবাবু করিয়াছিলেন! যদিও তাঁহার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত বাঁচেন নাই, কিন্তু লোকটির যে পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন তাহা কোনদিন ভুলিবার নয়।

শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিতেই নিবারণবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আসুন শঙ্করবাবু, আপনার অপেক্ষাতেই ব'সে আছি, দোকানে বেরুই নি এখনও।

গলির মধ্যে নিবারণবাবুর চায়ের দোকানটি এখনও ঠিক আছে, প্রত্যহ তিনি সেখানে গিয়া বসেন।

কেন, ব্যাপার কি?

আস্‌মির খোঁজ পাওয়া গেছে, মুকুজ্জেমশাই ধুবড়ি থেকে এই চিঠি লিখেছেন দেখুন।

শঙ্কর পত্রখানি লইয়া পড়িয়া দেখিল। অনেক অনুসন্ধানের পর মুকুজ্জে-মশাই ধুবড়িতে আস্‌মি এবং মাস্টারকে আবিষ্কার করিয়াছেন্। আই. বি. ডিপার্টমেন্টের একজন পরিচিত পদস্থ কর্মচারীর সহায়তায় এ কার্য সফল হইয়াছে। মুকুজ্জেমশাই কেবল তাহাদের আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের দুইজনের বিবাহও দিয়াছেন। লিখিয়াছেন—এ ক্ষেত্রে বিবাহ দেওয়াই সর্বাপেক্ষা সমীচীন; পাছে নিবারণবাবু কোনরূপ আপত্তি তোলেন,

তাই তাঁহাকে এ কথা জানানো হয় নাই। বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মাস্টারের একটি চাকরিও তিনি চা-বাগানে জুটাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার পরিচিত একটি ম্যানেজারের সহিত দেখা হইয়া যায়, তিনি অবিলম্বে মাস্টারকে তাঁহার অধীনে ভর্তি করিয়া লইয়াছেন, মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা। নিবারণবাবু যেন বিবাহ-ব্যাপারে ক্ষুব্ধ না হন, কপিলবাবু (অর্থাৎ মাস্টার) কুলীন না হইলেও তাঁহার স্বজাতি এবং মোটের উপর লোক মন্দ নয়। মানুষ দেবতা নয়, তাহার ক্রটি-বিচ্যুতি সহ্য করিতে হইবে বইকি।

শঙ্কর পত্রখানি পাঠ করিয়া নিবারণবাবুকে ফেরত দিল।

বুঝলেন, কদিন থেকে আমার ডান চোখের ওপর-পাতাটা ক্রমাগত নাচছিল।

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, ভালই তো হয়েছে।

ভাল! একে ভাল বলেন আপনি! ওই নচ্ছারটার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে, এ কথা ভাবতেও যে গা শিউরে ওঠে মশাই।

যাক, সে তো যা হবার হয়ে গেছে, এইবার তাদের আসতে লিখুন।

আসতে লিখব? আমি? নিবারণ শর্মা সে বান্দাই নয়। ওদের আর মুখদর্শন করব না আমি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, বুঝলেন, মুখদর্শন করব না। ওই কালসাপকে আবার নেমন্তন্ন!

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়। এখন আপনাকে যে জন্যে ডেকেছি, তাই বলুন। তাদের কোনও খবর পেলেন?

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিল।

না, এখনও তারা খবর দেয় নি, আমি খোঁজ করব কাল।

করবেন দয়া ক'রে একটু। মেয়েটার একটা গতি ক'রে আমি সোজা কাশী চ'লে যাই মশাই, আর পারি না।

যে পাত্রটি সেদিন দার্জিকে দেখিয়া গিয়াছিল—(শঙ্করই তাহাকে

যোগাড় করিয়া আনিয়াছিল) সে পাত্রটিকে পছন্দ করে নাই। শঙ্কর ইহা জানিত, কিন্তু রূঢ় সত্যটা সে বলিতে পারিল না।

আচ্ছা, আমি উঠি এখন, আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।

কাল খবরটা নেবেন ?

নেব।

মাঝে একদিন আর এক ছোকরা দেখে গেল, তার পছন্দ হয় নি।

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নিবারণবাবু বলিলেন, পছন্দ হ'লেও তার সঙ্গে আমি দিতুম না, ঠোঁটে ধবল, তিন কুলে কেউ নেই।

ও, তাই নাকি ?

আর বলেন কেন ? যত ব্যাটা কদর্য লোফার শ্বশুরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার চেষ্টায় আছে।

শঙ্কর একটু হাসিল।

আমি আজ যাই, তাড়া আছে।

আসুন, আপনার নানা কাজ, আমার কথাটা মনে রাখবেন।

আচ্ছা। শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তা হইতে শুনিতে পাইল, নিবারণবাবু বলিয়া উঠিলেন—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !

৭

ভন্টুর বাসায় যখন শঙ্কর গিয়া পৌছিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি। মাহিনা বাড়াতে ভন্টুর দৈন্যদশা অনেকটা ঘুচিয়াছিল। মুখে সে যা-ই বলুক, চাল সে বদলাইয়াছে। আগে বাড়িতে ঢুকিলেই ময়লা বিছানা, ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া মাদুর, দড়ির আলনায় স্তূপীকৃত মলিন জামাকাপড়, দালানের কোণে ভাঙা তক্তাপোশ প্রভৃতিতে যে দারিদ্র্য প্রকট হইয়া থাকিত, এখন তাহা আর নাই। বাড়িতে এখন বেশ একটা লক্ষ্মীশ্রী দেখা দিয়াছে।

সে বাড়িও এখন নাই,· ভন্টু বাড়ি বদলাইয়াছে, বেশ ভদ্রগোছের দ্বিতল একটি বাড়ি। দ্বিতলের ছোট দুইখানি ঘর লইয়া ভন্টু থাকে, একটি শুইবার বসিবার ঘর—অপরটি বাথ-রুম। বাথ-রুম না হইলে ইন্দুমতীর চলে না। একতলার শ্রেষ্ঠ ঘরখানি অবশ্যই বাকু লইয়াছেন। ঢুকিতেই প্রথমে বাকুর ঘর।

ঢুকিয়াই শঙ্কর বাকুর দরাজ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, উপদেবতা নন! তা হলে বাঁচা গেল। কিন্তু অবিশ্বাস ক'রো না, ওঁরা আছেন।

বউদিদির সহিতই কথা হইতেছিল। বউদিদি ঘরের মেঝেতে পান সাজিতে সাজিতে শ্বশুরের সহিত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতে দিতে গল্প করিতেছিলেন। ঘাড় নাড়িয়া যখন কুলাইতেছিল না, তখন উঠিয়া গিয়া শ্বশুরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেছিলেন। বধির বাকু তাহা না হইলে কিছুই শুনিতে পান না। শঙ্করকে দেখিয়া বউদিদি একমুখ হাসিয়া সম্বর্ধনা করিলেন।

এস, বড় রাত করলে কিন্তু। ঠাকুরপো বোধ হয় তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ। মৃন্ময় ঠাকুরপোও আসে নি এখনও।

ভূতের গল্প হচ্ছিল নাকি?

বউদিদি হাসিলেন।

নন্টুর অসুখ করেছিল কিনা, তার পথ্যের দিন ঠাকুরপোর আপিসের এক বন্ধু কিছু জ্যান্ত কইমাছ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাছগুলো দালানের কোণটায় ঢালা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা মাছ কখন যে লাফাতে লাফাতে গিয়ে ওই পুরনো বড় তোরঙ্গটার পেছনে গিয়ে ঢুকেছিল, তা আমরা কেউ টেরও পাই নি। ক্রমে সে মাছ ম'রে প'চে বাড়িময় দুর্গন্ধ, ঠাকুরপো চারিদিকে ফিনাইল ছেটাচ্ছে, কিছুতেই গন্ধ যায় না। বাবা বললেন—পাঠ এ বাড়ি বদলাও, নিশ্চয় কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে।* আজ ঘর ধোয়া হচ্ছিল, তোরঙ্গটা সরাতে গিয়ে সেই পচা মাছ বেরুল।

বউদিদি হাসিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, যত আজগুবি কাণ্ড আপনাদের, এ যুগে ভূত আছে নাকি?

বউদিদি উঠিয়া বাকুর কানে চুপিচুপি বলিলেন, শঙ্কর ঠাকুরপো ভূত-টুতে একদম বিশ্বাস করে না, বলছে—আপনাদের যত সব আজগুবি কাণ্ড।

বাকু তামাক খাইতেছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার গড়গড়ার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি নলটি মুখ হইতে নামাইয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তাহার পর নল দিয়াই সামনের মোড়াটা দেখাইয়া বলিলেন, ব'স। তোমরা, আজকালকার ছোকরারা, দুপাতা ইংরিজী প'ড়ে কিছুই তো মানতে চাও না। একটা গল্প বলি শোন।

বৃদ্ধ গড়গড়ায় একটা মধ্যম গোছের টান দিয়া শুরু করিলেন, শোন। তখন আমি ঝরিয়া কলিয়ারিতে কণ্ট্রাক্টারি করি। ঠিক দুকুরবেলা, বোশেখ মাস, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর চারিদিকে, কোল রেজিং হচ্ছে, আমি শোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখলুম, ভনুটুর গর্ভধারিণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে, পরনে টকটকে লালপেড়ে কাপড়, মাথায় চওড়া সিঁদুর। আমি অবাক হয়ে গেলুম, এখানে এল কি ক'রে, কথা কইতে যাব, মিলিয়ে গেল।

বাকু গড়গড়ায় টান দিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

খানিকক্ষণ পরে টেলিগ্রাম পেলুম, মারা গেছে। তোমার সায়ান্স কি বলে?

কোথায় ছিলেন তিনি?

দেশের বাড়িতে, দুশো মাইল দূরে।

শঙ্কর কি বলিবে, চুপ করিয়া রহিল। বউদিদি বহুবার-শ্রুত এই কাহিনীটি আর একবার শুনিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি হাসিতে হাসিতে পানের খিলিগুলিতে লবঙ্গ গাঁথিতে লাগিলেন। এই হাসি বাকু যদি দেখিতে পান, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি খিলিগুলি মুড়িয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তুমি ব'স, আমি ঠাকুরপোকে ডেকে দিই।

বাকু গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ তাম্রকুট চর্চা করিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিলেন।

বউমাটিকে নিয়ে এস একদিন, দেখি।

তাহার পর একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন, মিলিয়ে দেখেছিলে?

শঙ্কর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল।

ঠিক মিলে গেছে তো? জানি, মিলবেই।

শঙ্কর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। বাকুর বদ্ধ ধারণা—স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের মুখ এক ছাঁচের হইবেই। ভন্টুর বিবাহের পরও বাকু শঙ্করকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—লক্ষ্য ক'রে দেখ তুমি, ভন্টুর আর নতুন বউমার মুখের 'কাট্' হুবহু এক রকম, হতেই হবে যে! ভন্টুর গর্ভধারিণীর ফোটোগ্রাফ আছে, আমার মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ—নাক মুখ চোখ গড়ন সমস্ত একরকম। শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াছিল, কারণ প্রতিবাদ করা বৃথা। বাকু এ বিষয়ে এমন গোঁড়া যে, যদি কোন স্বামী-স্ত্রীর মুখ এক রকম না হয়, তাহা হইলে তাঁহার ধারণা—স্বামী-স্ত্রী নয়, কোনরূপ গোলমাল আছে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পও তিনি করেন। একবার ট্রেনে যাইতে যাইতে তিনি নাকি একটি বেখাপ্পা দম্পতি দেখিয়াছিলেন। স্বামীর মুখ গোলাকার, কিন্তু স্ত্রীর সোজা লম্বা। বাকুর ঘোরতর খটকা লাগে। দুই-চারি স্টেশন পরেই খটকা ভাঙিল; পুলিস আসিয়া হাজির হইল, ছোকরা আর-একজনের স্ত্রীকে লইয়া সরিতেছে।

মৃন্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল।

বউদিদি আসিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো তোমাদের ওপরেই যেতে বললে। তোমরা ওপরে ব'সগে, আমি গরম-টরম করি ততক্ষণ।

বাকু দরাজ গলায় আদেশ করিলেন, বউমা, এ কলকেটায় আর কিছু নেই, তুমি আর একটা কলকে ঠিক ক'রে দিয়ে যাও।

মৃন্ময় ও শঙ্কর উপরে উঠিয়া যাইতেছিল। শঙ্করের বগলে একটা পুলিন্দা ছিল, শঙ্কর তাহা যথাসম্ভব সঙ্গোপনেই রাখিয়াছিল, তবু তাহা বউদিদির দৃষ্টি এড়াইল না।

বগলে ওটা কি, শঙ্কর ঠাকুরপো ?

শাড়ি একখানা।

অমিয়ার জন্যে কিনলে বুঝি ?

শঙ্কর কেবল মুচকি হাসিয়াই উত্তর দিল।

মৃন্ময়ও হাসিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার হাসিটা কেমন যেন প্রাণবন্ত হইল না, বরং মুখখানা যেন আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। হাসিকে শাড়ি কিনিয়া দেওয়ার ঘটনাটা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল বোধ হয়। ঘটনাটা অনেক দিনের হইলেও সে ভোলে নাই।

শঙ্কর ও মৃন্ময় উপরে উঠিয়া গেল।

ভন্টু বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। ইন্দুমতী ঘরের এক কোণে বসিয়া উলের কি যেন একটা বুনিতেছিল। শঙ্কর ও মৃন্ময় প্রবেশ করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও আধুনিক কায়দা অনুযায়ী নমস্কার করিল।

আসুন।

ঘরে খানকয়েক মোড়া ছিল, শঙ্কর ও মৃন্ময় উপবেশন করিল। ভন্টু বিছানায় উপুড় হইয়াই রহিল এবং বলিল, শঙ্কর, তুই এসে আমার কোমরটার ওপর চ'ড়ে ব'স্ তো।

কেন, কি হ'ল কোমরে ?

জখম হয়েছে।

ইন্দুমতী মুখ টিপিয়া হাসিল এবং বলিল, আমি যাই নীচে, দেখিগে, দিদি কি করছেন !

ভন্টু উঠিয়া বসিল এবং বলিল, লব্‌স্টারমেধ যজ্ঞের হোতাকে আর খজলে লাভ কি, তিনি একাই একশো।

ইন্দুমতী বলিল, চা ক'রে আনব ?

শঙ্কর বলিল, এখন আর চা খেয়ে কি হবে ? আপনি বসুন।

ভন্টু মুখ স্থচালো করিয়া বলিল, ওঁকে অত সমীহ ক'রে লাভ কি ? উনি একটি চামাটু, লুকিয়ে চিংড়িমাছ ভাজা খেতে চান।

ইন্দুমতী বড় বড় চোখ দুইটি ভন্টুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, তুমি সবাইকে ওই কথা ব'লে বেড়াচ্ছ বুঝি ?

ভন্টু গলার ভিতর হইতে গোঁক-গোঁক শব্দ করিল।

মৃন্ময় ভন্টুর সান্নিধ্যে কখনও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, হয়তো সে এই নিমন্ত্রণেও আসিত না ; কিন্তু ভন্টুকে এড়াইয়া চলা এখন তাহার পক্ষে অশোভন, ভন্টু এখন তাহার উপরওয়ালা কেরানী। শঙ্করের পকেট হইতে কুমার পলাশকান্তির দেওয়া খবরের কাগজটা দেখা যাইতেছিল। মৃন্ময়ের তাহা চোখে পড়িতে সে যেন বাঁচিয়া গেল।

আজকের কাগজ নাকি ওটা ?

হ্যাঁ।

দিন তো, দেখাই হয় নি আজকের কাগজ।

কাগজখানা লইয়া সে এক ধারে সরিয়া বসিয়া পড়িতে শুরু করিয়া দিল।

শঙ্কর ইন্দুমতীকে বলিল, ভন্টুর কথা বিশ্বাস করি না আমরা। বসুন আপনি।

অনুযোগ-ভরা সুরে ইন্দুমতী বলিল, দেখুন তো কাণ্ড, শন্টু নন্টু ওরা দুজনে রোজই আমাকে বলত—কাকীমা, গলদাচিংড়ি ভাজা খাব, পয়সা দাও, দোকানে কেমন ভাজা হচ্ছে গরম গরম। আমি তাদের বললুম, দোকানের ভাজা খাবার দরকার কি ? গলদাচিংড়ি তোরা কিনে আন্, আমি স্টোভে লুকিয়ে ভেজে দেব তোদের দুপুরে।

লুকিয়ে কেন ?

ফন্তি-মিনুর যে আবার পেট ভাল নয়, দেখতে পেলে কাঁদবে।

ভন্টু মন্তব্য করিল, থিফ কোথাকার !

নিজেদের খাবার ইচ্ছে হয়েছে তাই বল, আমার নামে দোষ দেওয়া কেন শুধু শুধু ?

অভিমানভরে ঠোঁট ফুলাইয়া ইন্দুমতী বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর একটু হাসিল এবং বলিল, কেন বেচারীকে রাগালি শুধু শুধু ?

ভন্টু পুনরায় গোঁক-গোঁক করিয়া শব্দ করিল। বিছানার উপর একটা রেজিস্টার্ড খাম পড়িয়া ছিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি রে?

পানউলির পরামর্শে কানা করালীকে একটা রেজিস্টার্ড চিঠি লিখেছিলাম, চিঠিখানা ফিরে এসেছে।

সত্যি, কি করা যায় বল্ তো? আমি তো উইলের কথা মাকে কিছু বলি নি।

বলবার দরকার কি?

বাবার অত টাকা মাঠে মারা যাবে?

ব্যাঙ্ক মাঠ নয়।

কানা করালী যদি না ফেরে?

টাকাটা সুদে বাড়ুক না। তুই হাত দিলেই তো সব উপে যাবে, তোর হাত তো জাদুকরের হাত!

তবু একটা কিছু—

বছর কয়েক ঢোঁক গিলে ব'সে থাক্ এখন। পরে কোন উকিলের পরামর্শ নিলেই হবে।

সেই কাকটা আছে এখনও?

সেটা ডাইং আপিস খুলেছে। পানউলি আর একটা এনে পুষেছে, ওর ধারণা, করালী ফিরে এসে যদি কাক দেখতে না পায় খুন ক'রে ফেলবে ওকে।

বলিস কি?

লদ্‌লদে ব্যাপার! পানউলি শবরীফাই।

সহসা মৃন্ময় চীৎকার করিয়া উঠিল, এ কি?

মনে হইল, কেহ যেন তাহার মাথায় ডাণ্ডশ মারিয়াছে।

কি?

এই দেখুন, স্বর্ণলতার নাম রয়েছে।

ম্যানেজারের কবলে অচিনবাবুর সহায়তায় যে সব নারী কবলিত

হইয়াছিল, কাগজে পুলিস তাহাদের যে ফর্দটা বাহির করিয়াছে, শঙ্কর দেখিল, তাহাতে সত্যই স্বর্ণলতার নাম রহিয়াছে। মৃন্ময় বিবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি বিহ্বল, ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছে।

৮

গভীর অন্ধকার রাত্রি।

বিনিদ্র শঙ্কর একা বিছানায় শুইয়া আছে। অতিশয় দ্রুত ছন্দে আজ সন্ধ্যা হইতে যে যে ঘটনাগুলি তাহার মানসপটে রেখাপাত করিয়া গেল, তাহাদেরই কথা সে ভাবিতেছিল। অচিনবাবু, চুনচুন, নিবারণবাবু, শৈল, মৃন্ময়, ভন্টু, পলাশকান্তি, ম্যানেজার, কপিলবাবু, আস্মি, দার্জি—সকলেই একই জীবনের বিকাশ, অথচ প্রত্যেকেই কত বিভিন্ন! সে গত কয়েকদিন হইতে কাব্যরচনার উপযোগী বিষয় খুঁজিতেছিল, এই তো এত বিষয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তো নূতন বস্তুর পরিচয় মিলিতেছে, ইহাদের কয়েকটিকে একত্র করিয়া গাঁথিলেই তো কাব্য হয়; জীবনই তো কাব্য, প্রত্যেক জীবনের হাসি কান্না, হতাশা-বৈরাগ্য প্রকৃতির পীড়ন এবং সেই পীড়ন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস, ইহাই মানব-জীবন এবং ইহাই মানব-জীবনের কাব্য। সমস্ত অন্তর দিয়া জীবনের সত্যকে অনুভব করিতে হইবে, কল্পনার বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত করিয়া তাহাকে বাণীলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সার্থকভাবে ইহা করিতে পারিলেই তো কাব্য হইল। মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়াই আকাশের দিকে চাহিতে হইবে। সহসা কবি লোকনাথের কথাগুলি শঙ্করের স্মরণ হইল। তিনি এই সাহিত্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন, কল্পনার ভঙ্গীতে ও রসসৃষ্টির আদর্শে লেখকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই, আরও থাকা চাই বাস্তব সংসার ও সমাজের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। মানুষকে ভালবাসিতে হইবে, সৎ অসৎ উচ্চ নীচ সকলকেই অন্তরের মধ্যে স্থান দিয়া মানব-জীবনের বিচিত্র বিকাশ হিসাবে দেখিতে হইবে। তাহাদের মহত্ত্ব-ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে, তাহাদের জীবনচরিতের

অন্তরালে অজ্ঞাত সেই প্রাণশক্তির দুর্জ্ঞেয় পিপাসার সন্ধান করিতে হইবে, যে পিপাসা নানা জনকে নানা পথে লইয়া যাইতেছে। ছোট খাঁচায় বড় পাখির পাখা-ঝাপটানির যে রক্তারক্তি—মনুষ্য-জীবনের চিরন্তন ট্র্যাজেডি, প্রকৃতি-শাসিত মানুষের দুর্দশা, মূঢ় প্রবৃত্তি ও অকৃতের আকাঙ্ক্ষা, এই উভয়ের দ্বন্দ্বই কাব্যলোকের আলো-ছায়া।

…সহসা অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল এবং ঘুমের ঘোরে শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল। রঙিন শাড়িখানি পাইয়া আজ সে ভারি খুশি হইয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অমিয়াকে মনে করিয়া শঙ্কর শাড়িখানা কিনে নাই, শাড়িখানা দেখিয়াই অমিয়ার কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল। নানারূপ ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সে অমিয়ার দিকে মন দিতে পারে না। মনে হয়, তাহার প্রতি সে অবিচার করিতেছে, বাহিরের ঐশ্বর্য দিয়া তাই সে অমিয়াকে ভুলাইতে চায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয়, সত্যই কি অমিয়া ভোলে? ভোলে কি না তাহা শঙ্কর জানে না, কিন্তু ইহা সে জানে যে, অমিয়া কখনও বিচলিত হয় না, তাহার আচরণ সম্বন্ধে কখনও কোন প্রশ্ন করে না। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কখনও কোন সন্দেহ তাহার মনে জাগে না, স্বামীর সম্বন্ধে কোনরূপ হীন ধারণা পোষণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। নীরবে শান্তমুখে সে পত্নীর কর্তব্য করিয়া যায়। শঙ্কর নিজে কি তাহাকে ভালবাসে? বাসে বইকি। যুবতী পত্নীকে কোন্ যুবক-স্বামী ভাল না বাসে!

৯

শঙ্করের মা দেশে থাকেন। শঙ্করের অনুরোধ সত্ত্বেও শঙ্করের নিকট আসিয়া তিনি থাকিতে রাজী হন নাই। নানা অসুবিধা সহ্য করিয়াও তিনি পল্লীগ্রামে থাকিতে চান। স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া তাঁহার স্মৃতি ধ্যান করিবার জন্য নয়; তাঁহাকে দেখিয়া ঠিক তাহা মনে হয় না, বরং মনে হয় যে, বিধবা হইয়া তিনি যেন সুস্থতরই হইয়াছেন। অম্বিকাবাবুর প্রখর প্রবল

ব্যক্তিত্বের চাপে নিষ্পিষ্ট হইয়া তাঁহার মনের স্বাস্থ্য যেন বিকল হইয়াছিল, চাপমুক্ত হইয়া তিনি যেন সুস্থ বোধ করিতেছেন। তিনি পল্লীগ্রামে থাকেন পল্লীপ্রীতিব জন্যও নয়। অবশ্য নিরীহপ্রকৃতির মানুষ তিনি, নিজের পূজা আহ্নিক লইয়া অনাড়ম্বর নিরুপদ্রব পল্লীজীবন যাপন করা কষ্টকর নয় তাঁহার পক্ষে। কিন্তু এজন্যও তিনি পল্লীগ্রামে থাকেন না। একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া দেশে থাকার হেতু অন্য। তিনি দেশে থাকেন শঙ্করের জন্যই। দূর হইতেই তিনি পুত্রের মহিমাচ্ছটা নীরবে উপভোগ করেন, নিকটে আসিয়া তাহাতে ছায়াপাত করিতে তাঁহার বড় শঙ্কা হয়, নিকটে আসিলে তাঁহার দুর্ভাগ্যের ছায়া পাছে পুত্রকেও স্পর্শ করে। তাঁহার অন্য কোন প্রকার পাগলামি নাই, কিন্তু তাঁহার এই একটা বদ্ধ ধারণা যে, যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য। তাঁহার এক পুত্র গিয়াছে, স্বামী গিয়াছে, তাঁহার ধারণা, তাঁহার সংস্পর্শে ছিল বলিয়াই গিয়াছে। তাই ভয়ে ভয়ে তিনি শঙ্করের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আছেন।

কালীঘাটে একটা মানত ছিল, তাহাই শোধ করিতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া শঙ্করের কাছে কয়েকদিন ছিলেন। অমিয়া যদিও তাঁহার কাছে ইতিপূর্বে কিছুকাল ছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে তখন তেমন ভাল করিয়া দেখেন নাই। রঙিন-কাপড়-পরা নতমুখী বধূটি তখন তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত করে নাই। এই কয়দিনে অমিয়াকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মনে কেমন যেন একটা অনুকম্পামিশ্রিত কৌতূহল জাগিয়াছে। অমিয়া শঙ্করের বধূ বলিয়া নয়, অমিয়া শঙ্করের অনুপযুক্ত বলিয়া অমিয়াকে তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু কিছু বলেন নাই। যখন তাঁহার মত্ততা থাকে না, তখন তিনি অতিশয় নীরবপ্রকৃতির লোক, নিজেকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন এবং প্রায় অধিকাংশ সময় ঠাকুরঘরেই কাটান। অমিয়াকে তিনি লক্ষ্য করিলেন, একটা অনুকম্পামিশ্রিত স্নেহও জাগিল; ইচ্ছা হইল যে, তাহাকে বকিয়া বকিয়া সংশোধন করিয়া শঙ্করের উপযুক্ত করিয়া দেন; কিন্তু তাহা হইলে শঙ্করের কাছে থাকিতে হইবে, তাহা তো অসম্ভব। তিনি মানত শোধ করিয়া চলিয়া

গেলেন। ট্রেনে চড়িয়া শঙ্করকে শুধু মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, বউটাকে দেখিস একটু, সব সময়ে নিজেকে নিয়ে থাকলেই কি চলে ?

আচ্ছা।

ট্রেন চলিয়া গেল। হঠাৎ শঙ্করের মনে হইল, মা এ কথা বলিলেন কেন ? ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মায়ের কথাটা সে তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল। কোন নিগূঢ় অর্থ আছে নাকি ? পর-মুহূর্তেই হুইলারের স্টলের পুস্তকসম্ভার তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং সব ভুলিয়া সে সেই দিকেই আগাইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে কয়েকখানা বই কিনিয়া সে বাড়ি ফিরিল। ভাল বই দেখিলে সে লোভ সামলাইতে পারে না, ধার করিয়াও কিনিয়া ফেলে। জানে, সব বই সে পড়িতে পারিবে না, পড়িবার সময় নাই ; তবু কেনে।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে থামিয়া গেল, চোখে পড়িল, দোতলার জানালায় অমিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখের একটা পাশ, কবরীর খানিকটা অংশ, রঙিন শাড়ির বিস্রস্ত প্রান্তটুকু, আর কিছু নয়—অমিয়ার এ রূপ সে তো কখনও দেখে নাই ! মুগ্ধ হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

১০

অনেক দিন পরে শঙ্কর একা মাঠে গিয়া বসিয়া ছিল। বসিয়া বসিয়া সে নিজেরই অতীত জীবনটার পর্যালোচনা করিতেছিল। ভাবিতেছিল, যাহা তাহার কাম্য, তাহার সন্ধান মিলিয়াছে কি ? সারা জীবন সে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে ? বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। তখন ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সকলে তাহাকে ভাল ছেলে বলুক —এই কামনায় তাহার চিত্ত সতত উন্মুখ হইয়া থাকিত। বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া সে সাধ তাহার মিটিয়াছিল। আজও তাহার সহপাঠীরা এবং শিক্ষকেরা তাহার ভাল-ছেলেত্ব লইয়া সগর্বে আলোচনা করেন। পরীক্ষায় প্রথম হইবার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অন্তরে চিরস্থায়ী হইল না। ম্যাট্রিকুলেশন

পরীক্ষা দিবার পরই তাহার মনে দেশসেবা করিবার আগ্রহ জাগিল, মনে হইল, ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া, কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হইয়া, বন্যাদুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাশুশ্রূষা করিয়া, চরকা চালাইয়া, খদ্দর পরিধান করিয়া রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোই প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য। অনন্যকর্ম হইয়া কিছুকাল এ কর্তব্য সে পালনও করিয়াছিল ; কিন্তু যেই খবর বাহির হইল যে, সে ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পাইয়াছে, অমনই তাহার মত বদলাইয়া গেল, অমনই অবলীলাক্রমে সে কলেজে ভরতি হইয়া বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান পড়িতে লাগিল। শুধু পিতার আদেশেই নয়, তাহার নিজেরও মত বদলাইয়াছিল বইকি। চরকা ঘাড়ে করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কিন্তু সে বুঝিয়াছিল যে, কিছুই হইতেছে না, দেশের লোকের সত্যকার কোন উপকারই সে করিতে পারিতেছে না, কেবল হুজুকে মাতিয়া হৈ-হৈ করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। ক্রমশ সে বুঝিয়াছিল যে, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাধনাই প্রকৃত দেশসেবা, বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের উন্নতি না করিয়া চরকা চালাইতে গেলে দেশের প্রকৃত অগ্রগতি হইবে না। একটা নূতন আদর্শ চোখের সম্মুখে রাখিয়াই যেন সে আই. এস-সি. এবং বি. এস-সি. পাস করিয়া ফেলিল। তাহার এই ব্রহ্মচর্য এবং বিজ্ঞানসাধনার আদর্শ মফস্বলে অটুট ছিল, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তাহা ভাঙিয়া পড়িল। সুরমা, রিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, বেলা, শৈল, মুক্তোরা আসিয়া তাহার মনে যে আলোড়ন তুলিল, তাহাতে তাহার পূর্বজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধ-স্বপ্ন আদর্শ-কর্তব্যের সমস্ত মানদণ্ড উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিপর্যস্ত হইয়া গেল। মনে হইল, জীবনকে উপভোগ করাই মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য, চার্বাকদর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন। কিন্তু সে দর্শন অনুসরণ করিয়াই বা লাভ কি হইল, কত রামী বামী ক্ষেন্তি, কত বীণা আশা রাধা, কত মিষ্টিদিদি তেতোদিদি আসিল এবং গেল—সকলের নামও মনে নাই ; কিন্তু কি হইল ? জীবনকে উপভোগ করা হইল কি ? পীবর বক্ষ, চটুল চাহনি, লাস্য-হাস্য, ভাব-ভঙ্গী কিছুরই তো অভাব ছিল না ; তবু মনে এখনও অতৃপ্তি কেন ? কেন মনে হইতেছে, জীবনটা বৃথায় গেল ? জীবনকে সে তো কম উপভোগ করে নাই! কিন্তু এখন আর ওসব কিছুই ভাল

লাগিতেছে না। চুনচুন কল্পনাকে অধিকার করিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও আর তেমন মাদকতা নাই। চুনচুনের নিকট হইতে আহ্বান আসিলে সে উত্তেজিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহার কাছে গেলেই সে উত্তেজনা নির্বাপিত হইয়া যায়, মনে হয়, ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট আসিয়াছে।

যে বিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া সে একদিন চরকা-নীতিকে উপহাস করিয়াছিল, সে বিজ্ঞানও তাহাকে বেশি দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে নাই। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অনিবার্য প্রভাবকে অস্বীকার সে করে না, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া কোনরূপ প্রগতি যে অসম্ভব তাহা সে জানে, দেশের উন্নতি করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়াই যে করিতে হইবে, ইহাও সর্বতোভাবে সে স্বীকার করে, তবু সে বিজ্ঞানচর্চা ত্যাগ করিয়াছে। সুযোগ পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে। কেন? সহসা তাহার মনে হইল, আমাদের চিন্তার সহিত আমাদের কার্যের কি সত্যই কোন যোগ আছে? চিন্তা করিয়া যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহাই কি আমরা সব সময়ে করি? কোন সময়ে কি করি? তাহার মনে হইল, চিন্তা করা শিক্ষিত মনের বিলাস মাত্র, আমাদের কার্যের সহিত তাহার কচিৎ সম্পর্ক থাকে। আমরা যাহা করি, তাহা চিন্তাপ্রণোদিত হইয়া করি না, নিজের সুখের জন্য করি। সে সুখের পিপাসা অন্তরের যে অন্ধকার কন্দর হইতে উৎসারিত হয়, তাহার সন্ধান আজও আমরা পাই নাই। চিন্তা করিয়া সৎ-অসৎ ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিতের একটা আদর্শ আমরা খাড়া করি বটে, কিন্তু তদনুসারে আমরা চলি না, আমরা চলি নিজেদের আন্তরিক প্রেরণায়। সে প্রেরণার সহিত যদি কেতাদুরস্ত নীতির মিল থাকে ভালই, যদি না থাকে তাহা হইলেও আমরা নিরস্ত হই না, যাহা করিবার আমরা ঠিক করিয়া যাই, কোন অদৃশ্য অজ্ঞাত শক্তি তখন যেন আমাদের উপর ভর করিয়া আমাদের নীতিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

এই শক্তিই তাহাকে হয়তো বিজ্ঞানের পথ হইতে সাহিত্যের পথে আনিয়াছে, সুগম সুপরিচিত পথ হইতে টানিয়া দুর্গম অপরিচিত পথে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই শক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াও কিন্তু আর একটা যুক্তির মোহ হইতে শঙ্কর কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার

মনে হইতেছিল যে, দেশের মনে বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করা যদি সত্যই প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যস্থতাতেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্যই সে বিজ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত বাহন। বিজ্ঞানকে সম্যকরূপে গ্রহণ করিবার মত সুস্থ মনোবৃত্তিও দেশের সাহিত্যই গঠন করিবে। তাই সাহিত্যের পথকেই সে জীবনের পথরূপে বাছিয়া লইয়াছে, এই পথ ধরিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে।

হঠাৎ যেন আর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ছাত্রজীবনে স্কুলের হেডপণ্ডিত ধরণীধর ভট্টাচার্য তাহার মনে যে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, 'আনন্দমঠ' পাঠ করিয়া যে দেশকে সে জননী-জন্মভূমি বলিয়া জানিয়াছিল, সেই দেশাত্মবোধই তাহাকে জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে এতদিন পরিচালিত করিয়াছে, তাহার সকল কর্মে প্রেরণা যোগাইয়াছে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—রবীন্দ্রনাথের এ সঙ্কল্পকে সে-ই তো মূর্ত করিবে। সাহিত্যের পথই তাহার পথ, এই পথেই তাহাকে চলিতে হইবে। কিন্তু ইহার নাম কি সাহিত্য-পথে চলা? 'সংস্কারক' আপিসে চাকরি করা মানে কি সাহিত্য-চর্চা? শঙ্করের রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। 'নারীস্তোত্র' নামে সে যে কবিতাটা লিখিয়াছিল, মজুমদার মহাশয় তাহা 'সংস্কারক' পত্রিকায় ছাপিতে নিষেধ করিয়াছেন। সে নিজে সহকারী সম্পাদক, অনায়াসেই সে লেখাটা তাঁহাকে না দেখাইয়াও ছাপিতে পারিত। কিন্তু অদ্যাবধি সে কোন লেখা সম্পাদকের বিনা অনুমতিতে ছাপে নাই, সম্পাদক মহাশয়ও এ যাবৎ তাহার কোনও লেখায় আপত্তি প্রকাশ করেন নাই, আজ হঠাৎ 'নারীস্তোত্র' কবিতাটা তাঁহার খারাপ লাগিয়া গেল? অশ্লীল? কি এমন অশ্লীলতা আছে উহাতে? 'শৃঙ্গার' 'স্তন' 'স্বচ্ছবসনা' 'নীবিবন্ধ' প্রভৃতি কয়েকটা কথায় দাগ দিয়া তিনি আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কোন্ ভাল কবির কবিতাতে এসব কথা নাই? কালিদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, এমন কি রবীন্দ্রনাথও—। শঙ্করের হাসি পাইল—ওই বেরসিক শুচিবায়ুগ্রস্ত হীরালাল মজুমদারের নির্দেশ অনুসারে কাব্যরচনা করিতে হইবে নাকি? চণ্ডীচরণ দস্তিদারের কথা মনে পড়িল। ওই লোকটি হয়তো

হীরালালবাবুর হৃদয় হরণ করিতে পারিবে। কাব্যরসবিবর্জিত খাঁটি কর্মক্ষম ব্যক্তি। কম কথা বলেন। ঠিক সময়ে—কখনও কখনও ঠিক সময়ের পূর্বেও—আপিসে আসেন এবং রাত্রি দশটা পর্যন্ত মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যান। নিলয়কুমারের সহকারী হিসাবে বাহাল হইয়াছেন, 'সংস্কারক' পত্রিকার ব্যবসায়ের দিকটা দেখাই নাকি তাঁহার একমাত্র কার্য। শঙ্করের কিন্তু সন্দেহ হয়, নীরবে তাহার গতি-বিধি লক্ষ্য করাই তাঁহার প্রধান কার্য। সর্বদাই যেন একটা মুখোশ পরিয়া আছেন। একটি বাজে কথা বলেন না, রসিকতা করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করা যায় না। চণ্ডীচরণ অতীত জীবনে পড়াশুনার বিশেষ ধার ধারেন নাই, থার্ড ক্লাস পর্যন্ত নাকি পড়িয়াছিলেন এবং তাহার জোরেই নাকি তিনি কুড়ি বৎসর পূর্বে কোন সদাগরি অফিসের কেরানীগিরি যোগাড় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছয় মাস পূর্বে তাঁহার কেরানীজীবন শেষ হইয়াছে; কিন্তু সামর্থ্য এবং চাকুরিস্পৃহা এখনও শেষ হয় নাই বলিয়া পুনরায় তিনি কাজে লাগিয়াছেন। এই ইতিহাসটুকুই শঙ্কর জানিত, আজ সে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছে যে, চণ্ডীচরণ শুধু কেরানীমাত্র নহেন, তিনি একজন প্রত্নতাত্ত্বিকও। অর্থাৎ সাহিত্যের দরবারে তাঁহারও কিঞ্চিৎ দাবি আছে। তাঁহার প্রত্নতত্ত্বও আবার এমন বিষয়ে, যে সম্বন্ধে শঙ্করের কোনও জ্ঞান নাই। প্রাচীন মিশর তাঁহার বিষয়। সবজান্তা নিলয়কুমার নাকি ইজিপ্টোলজির একজন সমঝদার, তিনি চণ্ডীচরণকে খুব উৎসাহিত করিতেছেন। খবরটা শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনে একটা অস্বস্তি জাগিয়াছে, তাহার মনে হইতেছে, হয়তো এই দাবির জোরেই চণ্ডীচরণবাবু একদিন তাহাকে পদচ্যুত করাইয়া নিজেই 'সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদক হইয়া বসিবেন এবং ভিতরে ভিতরে হয়তো তাহারই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

অনেক রাত্রে শঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, মৃন্ময়ের স্ত্রী হাসি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। যাহা শুনিল, তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। মৃন্ময় আপিসের টাকা ভাঙিয়া ধরা পড়িয়াছে। সে নাকি এখন জেলে। অতিশয় শান্ত কণ্ঠে হাসি সংবাদটি দিল। বিস্ময়ে শঙ্করের বাক্যস্ফূর্তি হইল না, সে চুপ করিয়া হাসির মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃন্ময় চুরি করিয়া

জেলে গিয়াছে! এ যে অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু ইহার সম্ভাব্যতা লইয়া বিচার করিবার সময় নাই, শঙ্করের মনে হইল, অবিলম্বে কিছু একটা করা প্রয়োজন।

আপনি বসুন, আমি ভন্টুর কাছে যাই। দেখি, কতদূর কি করা যেতে পারে! হয়তো কোথাও কোন ভুল হয়েছে—

কোথাও যাবার দরকার নেই। ভন্টুবাবু অনেক চেষ্টা করেছেন, কিছু হবে না। কিছু ভুলও হয় নি, উনি নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছেন, টাকাও ফেরত দিতে রাজী নন। ওঁর জেল হবেই।

কত টাকা?

দশ হাজার।

দশ হাজার! এত টাকা কি ক'রে পেলে?

আপিসের সিন্দুকে ছিল, কেশিয়ারের টেবিল থেকে চাবিটা সরিয়ে টাকাটা নিয়েছেন।

টাকাটা কোথা?

হাসি চুপ করিয়া রহিল।

সহসা তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা টপটপ করিয়া গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বিনিদ্র শঙ্কর একা বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। ভাবিতেছিল, কি করিয়া এই নূতন সমস্যাটির সমাধান করিবে। মৃন্ময়ের যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, হাসিই সমস্যা। হাসির আপনজন কেহ নাই। মৃন্ময়ই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে পরিবারে তাহার বাল্যকাল কাটিয়াছে, সেখানে সে আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। সংবাদ পাইলে মুকুজ্জেমশাই অবশ্য আসিবেন, ইহা লইয়া মাতিয়া উঠিবেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা ব্যবস্থাও করিবেন; কিন্তু হাসির তাহা ইচ্ছা নয়। হাসি শঙ্করকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছে, মুকুজ্জেমশাইকে যেন খবর না দেওয়া হয়; তিনি তাহার যে উপকার করিয়াছেন সে ঋণই সে জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে

না, ঋণের বোঝা আর সে বাড়াইতে চাহে না। কিন্তু সে যে ঠিক কি করিতে চায় তাহাও এখন পর্যন্ত খুলিয়া বলে নাই।

তুমি এখনও ঘুমোও নি ?

অমিয়া শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল।

না। হাসিকে নিয়ে কি করা যায় তাই ভাবছি।

আমাদের কাছেই থাক্, কি আর করবে ?

আমাদের কাছেই থাকবে ?

আমাদের কাছেই এসেছে যখন, কোথায় আর যাবে, যেতে বলাটা কি ভাল দেখায় ?

তা বটে। তা হ'লে থাক্।

শঙ্কর পাশ ফিরিয়া শুইল। অমিয়া তাহার চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া চুল কুরিয়া দিতে লাগল।

ঘুমোও তুমি।

ঘুমুচ্ছি।

শঙ্করের কিন্তু ঘুম আসিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, অমিয়া না হইয়া যদি অপর কোন মেয়ে হইত, তাহা হইলে হাসির অভ্যাগমে সে শঙ্কিত হইয়া পড়িত। হাসি সুন্দরী এবং যুবতী। অমিয়ার মনে কিন্তু এতটুকু শঙ্কা নাই। শঙ্কর সম্বন্ধে সে এত নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় যে, শঙ্কর তাহার আচরণে অবাক হইয়া যায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয় যে, অমিয়া বোধ হয় অতিশয় নির্বোধ। আবার মনে হয়, কই, বুদ্ধিহীনতার আর কোন লক্ষণ তো সে দেখিতে পায় না; কেবল এই বিষয়েই—যে বিষয়ে নারীবুদ্ধি সর্বাপেক্ষা প্রখর—সে বিষয়েই সে নির্বোধ ?

১১

তখনও ভাল করিয়া সকাল হয় নাই। শঙ্কর নীচের ঘরটায় বসিয়া 'কাব্যে বাস্তবতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব'

কথাটা যে অর্থে লইয়া বাস্তববাদীদের বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দৃষ্টি দিয়া দেখিলে উপহাসযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু উপহসিত সমালোচকদের পক্ষ লইয়া নানা উদাহরণ দিয়া শঙ্কর ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল যে, সমালোচকগণ কাব্যে যে 'বস্তু'র সন্ধান করিয়াছেন, তাহা সাধারণ বস্তু নহে। সে বস্তুর সংজ্ঞা বিভিন্ন। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থই কাব্যবস্তু হইতে পারে না, যদি না সঙ্গে সঙ্গে তাহা রসিকজনের মর্মগ্রাহ্য হয়। যে সব সমালোচক কাব্যে বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা সেই বস্তুরই সন্ধান করিয়াছেন যাহা রসিকচিত্তগ্রাহী। কাব্যলোকের কুসুম এবং উদ্ভিদ-বিদ্যার কুসুমে আকাশ-পাতাল তফাত—ইহা যে নিয়মে সত্য, বিদেশাগত অবাস্তবতা অথবা অতিবাস্তবতা সেই একই নিয়মে এই সমালোচকগণ কর্তৃক অবাস্তবশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে যাহা 'অকাব্য', তাহাই কাব্যবিচারে অবাস্তব, কারণ কাব্যের বস্তু তাহাতে নাই।

শঙ্কর আছ নাকি ভাই ?

দ্বার ঠেলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে অপ্রত্যাশিতভাবে ভন্টুর মেজকাকা প্রবেশ করিলেন।

এ কি, আপনি কবে এলেন ?

কঠিন বন্ধন ভাই, বুঝলে, মায়ার বন্ধন বড় কঠিন বন্ধন।

বসুন।

উপবেশন করিয়া মুক্তানন্দ পুনরায় বলিলেন, রঙিন চশমাটা নাকে এমন এঁটে বসেছে যে, খোলা দুষ্কর।

কবে এলেন ?

এলাম মানে ! গেলুম কবে ?

শঙ্কর স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিল, মুক্তানন্দ এখন প্রতি কথারই দার্শনিক জবাব দিবেন।

তোমরা যেতে দিচ্ছ কই ভাই, বার বার যাচ্ছি, আর ফিরে আসছি।

কাল ভন্টুর সঙ্গে দেখা হ'ল, সে তো কিছু বললে না !

আমি বিনোদের বাসাতেই উঠেছি। মানে, ভন্টুর কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না।

মিটিমিটি চাহিয়া দাড়িতে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। তাহার পর যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, সেইজন্যেই তো তোমার ঠিকানা যোগাড় ক'রে এই ভোরে তোমার কাছে আসা। তুমি একটা উপায় বাতলে দাও ভাই।

কিসের উপায়?

ভন্টুর কাছে যাবার।

কেন, ভন্টুর কাছে যাবার বাধাটা কি?

ওই দেখ, তুমি বুদ্ধিমান লোক হয়ে বুঝতে পারছ না—বাধাটা কি? আমি সন্ন্যাসী মানুষ, গৃহীর বাড়িতে যেতে এমনিতেই তো কত বাধা, তার উপর ভন্টু নিজের ভাইপো, মোটা মাইনের চাকরি করে শুনেছি, বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে করেছে। গেলেই ভাববে, ওই রে, বাবাজী কোন মতলবে এসেছে নিশ্চয়। আজকাল সন্ন্যাসী দেখলেই লোকে ভাবে, ব্যাটার কোন মতলব আছে।

মুক্তানন্দ চক্ষু বুজিয়া দাড়িতে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সহসা চক্ষু খুলিয়া মুক্তানন্দ বলিলেন, আমি একটা উপায় ভেবে এসেছি, তুমি যদি রাজী হও।

বলুন।

তোমাকে কিন্তু একটি মিথ্যে কথা বলতে হবে। বলতে হবে যে, আমার সঙ্গে রাস্তায় তোমার হঠাৎ দেখা, তুমি যেন জোর ক'রে আমাকে ভন্টুর কাছে নিয়ে এসেছ।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, বেশ। বিকেলে আসবেন তা হ'লে, এখন ব্যস্ত আছি একটু।

ইহাতে মুক্তানন্দ যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। উঠিয়া বলিলেন, বিকেলে? আচ্ছা, তাই আসব। লেখক-হিসেবে তোমার নামডাক খুব শুনছি। আনন্দের কথা, তোমার নামডাক হবে না তো কার হবে? লিখছ নাকি কিছু এখন

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। মুক্তানন্দ একবার ঝুঁকিয়া তাহার খাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

লেখ, তোমাকে আর বিরক্ত করব না তা হ'লে।

তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, সবই মায়া, কিছুই কিছু নয়।—বলিয়া চলিয়া গেলেন। শঙ্করের মনে পড়িল, আজ বৈকালে হাসির জন্য একবার প্রফেসার গুপ্তের নিকটও যাইতে হইবে। প্রবন্ধটা এখনই শেষ করা প্রয়োজন। লিখিতে যাইবে, নিপু আসিয়া প্রবেশ করিল। হিরণদার আড্ডায় নিপুর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছিল। হিরণদার আড্ডার অধিকাংশ সভ্যের সহিত এখন আর দেখাই হয় না, কেবল নিপু আর ছবি টিকিয়া আছে। নিপুও সাহিত্য-রসিক। সে নাকি গোপনে সাহিত্য-রচনাও করে, কিন্তু কাহাকেও তাহা দেখায় না। সহসা সকলকে তাক লাগাইয়া প্রভাত-সূর্যের মত অনিবার্য দীপ্তিতে একদিন বঙ্গসাহিত্য-গগনকে উদ্ভাসিত করিয়া সে সমুদিত হইবে—ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা। এখন অন্ধকারে তাহার তপস্যা চলিতেছে। দরিদ্রের সন্তান। এখনও বিবাহ করে নাই। আত্মীয়স্বজন কেহই তাহাকে তাহার বিদ্যা অথবা সাহিত্য-সাধনার জন্য শ্রদ্ধা করে না। সে বেকার, অসামাজিক। একমাত্র শঙ্করই তাহাকে আমল দেয়, তাই সে শঙ্করের কাছে আসে। কিন্তু শঙ্করের কাছে আসিয়াও সে স্বস্তি পায় না। মনটা কেমন যেন বিষাইয়া উঠে।

কিছু লিখছ নাকি ?

শঙ্কর যাহা লিখিয়াছিল দেখাইল।

কিছু হয় নি। তুমি যা লিখেছ, তা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছেন—

ঠিক এমনি ক'রে কোথায় বলেছেন ?

নিপু কয়েকটা প্রবন্ধের নাম করিল। শঙ্কর তাহার একটাও পড়ে নাই। পড়িবে কখন ? চাকরি করিতেই সমস্ত সময় চলিয়া যায়।

ছেঁড়া জামার পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া নিপু বলিল, ধারটা শোধ করতে এসেছি। কেরানীগিরি জুটেছে একটা।

তাই নাকি, শুনি নি তো?

তথাপি ইহা সত্য।

নিপু হাসিল। তাহার হাসির মধ্যেও কেমন যেন একটা চাপা ঈর্ষা চকমক করিয়া উঠিল।

চলি এখন।

নিপু চলিয়া গেল।

শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর প্রবন্ধটা কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

১২

প্রফেসার গুপ্ত একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। পত্নী সুলেখা তাঁহার গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুধু লক্ষ্য নয়, গতি প্রতিরোধ করিতেও তিনি উদ্যত। পুত্রকন্যাকে লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন, স্বামীর প্রতি এমন করিয়া মনোযোগ দিবার অবসর, এমন কি প্রবৃত্তিও, তাঁহার এতদিন ছিল না। স্বামীকে অবশ্য তিনি চিনিতেন। বেলার সহিত তাঁহার সম্পর্কটা চোখের সম্মুখেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা রুচি এবং এম. এ. ডিগ্রী সত্ত্বেও এইজন্য তাঁহাকে নিতান্ত সেকেলে ধরনে অহিফেনও গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এতদিন তাঁহার মনের অন্য অবলম্বন ছিল—পুত্র-কন্যা। কন্যাটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পুত্রটি মারা গিয়াছে। আর সন্তান নাই, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিজেই তিনি অধিক সন্তানের জননীত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, অন্য কোন বন্ধনও নাই, স্বামীই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন।

তিনি নিজে যদিও স্বামীকে চিনিতেন, কিন্তু পাঁচজনের কাছে যাহা বলিয়া বেড়াইতেন তাহা ঠিক বিপরীত। পরিচিত মহলে আকারে ইঙ্গিতে তিনি এতদিন এই কথাই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে, স্বামী তাঁহার দেবচরিত্র ব্যক্তি, কাব্য লইয়া আত্মহারা হইয়া থাকেন এবং তাঁহার পত্নী-প্রীতি অনন্ত-

সাধারণ। তাঁহার ধারণা ছিল যে, লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করে ; কিন্তু সহসা সেদিন তিনি জানিতে পারিয়াছেন, কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করিবার ভান করে মাত্র। আসল কথাটা সকলেই জানে। এক নিমন্ত্রণ-বাড়িতে স্বকর্ণে সেদিন তিনি আড়াল হইতে শুনিয়াছেন—একটা ঘরে মিষ্টিদিদির সহিত তাঁহার স্বামীর নাম জড়াইয়া একদল মেয়ে হাসাহাসি করিতেছে। মিষ্টিদিদি নাকি তাঁহার স্বামীকে ফেলিয়া কোন এক মুসলমান যুবকের সহিত কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়াছেন। তাঁহার মেয়ের বয়সী মেয়েরা ইহা লইয়া হাসাহাসি করিতেছে। প্রফেসার গুপ্ত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার আলাদা বাসাটিতে চলিয়া যান, আজও যাইতেছিলেন, সুলেখা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কোথায় যাচ্ছ ?

প্রফেসার গুপ্ত একটু বিস্মিত হইলেন। এ রকম প্রশ্ন সুলেখা সাধারণত করেন না।

যেখানে রোজ যাই।

কোথায় ?

প্রফেসার গুপ্ত দাঁড়াইয়া পড়িলেন, রিম্‌লেস চশমাটা একবার ঠিক করিয়া লইলেন।

জবাবদিহি করতে হবে নাকি ?

হবে।

সুলেখার গলার স্বরটা একটু কাঁপিয়া গেল, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যাহা ফুটিয়া উঠিল, তাহা করুণ বা কোমল কিছু নহে, তাহা আগুন। একটু ইতস্তত করিয়া প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, হঠাৎ আজকে এসবের মানে ?

মানে, সন্ধ্যের পর তুমি আর কোথাও বেরুতে পারবে না, যদি কোথাও যাও আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

বিয়ের সময় এ রকম কোন শর্ত ছিল ব'লে তো মনে পড়ছে না।

ছিল বইকি, তুমি আমাকে সুখে রাখতে বাধ্য।

ও। আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে।

সুলেখার দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রফেসার গুপ্ত তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, দেখ, কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না, নিজে সুখী হতে হয়। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে জীবনে তুমি কখনও সুখী হতে পারবে না। আমি অবশ্য চেষ্টা করব।

আমাকে সুখীই যদি না করতে পারবে, তা হ'লে বিয়ে করেছিলে কেন?

ঠিক ওই একই প্রশ্ন আমিও তোমাকে করতে পারি, কিন্তু তা আমি করব না। আমার উত্তর—সমাজে থাকতে গেলে একটা বিয়ে করা প্রয়োজন, তাই করেছি। ভেবেছিলাম—। যাক সে কথা।

কি ভেবেছিলে?

এখনই বলতে হবে সেটা?

বলই না শুনি!

ভেবেছিলাম, তুমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছ, তখন তোমার সঙ্গে আমার মনের খানিকটা মিল হবে। এখন দেখছি, সেটা মহা ভুল। পরীক্ষা পাস করলেই মিল হয় না।

তুমিই কি মিল হবার মত লোক?

সেটা তো নিজের মুখে বলা শোভা পায় না। তোমার সঙ্গে মিল হচ্ছে না, এইটুকু শুধু বলতে পারি। যতদূর দেখছি, উচ্চশিক্ষা তোমার দেহকে রুগ্ন বিগতযৌবন এবং মনকে অহঙ্কারী করেছে, আর কিছুই করে নি। সাধারণ মেয়ের মতই তুমি বিলাসী, লোভী, স্বার্থপর। ডিগ্রীটা তোমার নতুন প্যাটার্নের আর্মলেট বা নেক্‌লেসের মত আর পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে দেবার আর একটা অলঙ্কার মাত্র, ওতে তোমার মনের কোনও উন্নতি হয় নি। তোমার কাছে যে কাল্‌চার আশা করেছিলাম, তা তোমার নেই।

আমার কাল্‌চার আছে কি নেই, সেই বিচার তোমাকে করতে হবে না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি—

প্রফেসার গুপ্ত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আমার সঙ্গে কেবল কাব্য আলোচনা করবে, এই আশা ক'রেই আমাকে বিয়ে করেছিলে নাকি? তা যদি ক'রে থাক, তা হ'লে হতাশ হবার

কারণ আছে। তোমার মত কাব্য-রোগ আমার নেই, তা স্বীকার করছি।

প্রফেসার গুপ্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, আমার যেসব পুরুষ বন্ধু আছে, তাদের কারও কাব্য-রোগ নেই ; কিন্তু তবু তাদের মনের সঙ্গে আমার মনের সুর ঠিক মেলে। দেখ, এসব কথা তর্ক ক'রে বোঝানো যায় না।

আসল কথাটা চাপা দিচ্ছ কেন ? আমি পুরুষ বন্ধুদের কথা বলছি না, মেয়ে বন্ধুদের কথা বলছি। যাদের সঙ্গ পাবার জন্যে তুমি কাঙালের মত ঘুরে বেড়াও, তারা কি আমার চেয়ে বেশি কাব্য-রসিকা ?

তা কেন হবে ?

তা হ'লে যাও কেন ?

সব কথা কি খোলাখুলি আলোচনা করা যায় ?

গোপন তো আর কিছুই নেই, সবাই তো সব কথা জেনে ফেলেছে। আমি জানতে চাই, আমাকে বার বার এমন অপমান কেন করবে তুমি ?

আমার তো মনে পড়ছে না, জ্ঞাতসারে কখনও তোমাকে অপমান করবার চেষ্টা করেছি। আমি বরং বরাবর বাঁচিয়েই চলেছি তোমাকে। তুমিই বরং আফিং-টাফিং খেয়ে আমাকে অপদস্থ করেছ।

আমি কি সাধে আফিং খেয়েছিলাম ? বাধ্য হয়ে খেয়েছিলাম।

আমিও যা করছি, বাধ্য হয়েই করছি।

বাধ্য হয়ে করছ ! তাই নাকি ? কি রকম ?

সুলেখার চোখের দৃষ্টি ব্যঙ্গশানিত হইয়া উঠিল।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, তবে শোন। আমার মনের একটা অবলম্বন চাই। তুমি তা হতে পার নি। তুমি—শুধু তুমি নয়, তোমাদের অনেকেই ঘরের বার হয়ে গেছ। কাব্যলোকের প্রিয়া কিংবা গৃহলোকের লক্ষ্মী কোনটাই তোমরা হতে পার নি। সেকালের মত তুমি 'পতি পরম গুরু' এই কথা বিশ্বাস ক'রে যদি আমার ঘরের লক্ষ্মী হতে পারতে, তা হ'লে হয়তো—

ঘরের লক্ষ্মী মানে ?

মানে, সেই মেয়ে, যে আমার সুখের জন্যে সর্বতোভাবে দেহ-মন-প্রাণ

উৎসর্গ করেছে, যে শুধু আমার শয্যাসঙ্গিনী নয়, আমার সর্বপ্রকার তৃপ্তিবিধায়িনী, যে আমার জন্যে নিজে হাতে রান্না করে, আমি কি কি ভালবাসি তার খোঁজ রেখে তদনুসারে চলে, আমি যাতে অসুখী হই কখনও এমন কাজ করে না, আমি অসুস্থ হ'লে যে দিবারাত্র আমার সেবা করে, আমার পিকদানি বা কমোড পরিষ্কার ক'রেও যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, আমার পুত্রকন্যার জননী হয়ে যে নিজেকে বিব্রতা মনে করে না—গর্বিত হয়, নিজের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েও যে আমাকে সুখী করবার জন্যে সতত উন্মুখ—

অর্থাৎ, যে তোমার দাসী—

শুধু দাসী নয়, সর্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে দাসী। এ রকম দাসীর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই, কোন পুরুষেরই নেই বোধ হয়। এরা দাসী নয়, এরাই লক্ষ্মী, এরাই রাণী। কিন্তু এখন তোমরা পুরুষের দাসত্ব করতে চাও না, সে ক্ষমতাই নেই তোমাদের, এখন তোমরা চাও স্বাধীনতা।

চাইই তো।

বেশ, স্বাধীন হও, আমাকেও স্বাধীন হতে দাও।

আমি যদি তোমার মত স্বাধীন হই, তা হ'লে কি ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যাবে?

ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যাবে কি না, এই ভেবে যারা কাজ করে, তারা স্বাধীনচিত্ত নয়, তারা সুবিধাবাদী। তোমাদের স্বাধীনতার মানে কি জান? তোমাদের স্বাধীনতার মানে, স্বামীর অর্থে শাড়ি গাড়ি গয়না কিনে ভদ্রতার মুখোশ প'রে সমাজের পাঁচজনের কাছে ফ্লারিশ ক'রে বেড়ানো। ঠাকুর রান্না করুক, চাকর বিছানা করুক, বেয়ারা ফরমাশ খাটুক, বয় হাতে হাতে সব জিনিস এগিয়ে দিক, দাই বোতল খাইয়ে ছেলে মানুষ করুক, স্বামী রাশি রাশি টাকা রোজকার ক'রে তোমার পদানত হয়ে থাকুক, তোমার সুবিধার জন্যে সবাই সব করুক, কেবল তুমি নিজে কুটোটি নাড়বে না। এই হ'ল তোমাদের আদর্শ স্বাধীনতা। মাঝে মাঝে রান্না সেলাই অবশ্য তোমরা যে

া কর তা নয়, কিন্তু তা শৌখিন রান্না সেলাই, তাতে গৃহস্থের কোন উপকার য়'না, তারও একমাত্র উদ্দেশ্য ফ্লারিশ করা; এত স্বার্থপর তোমরা যে, মা তেও রাজী হও না, পাছে ফিগার খারাপ হয়ে যায় এই ভয়ে।

আমাদের সবই খারাপ বুঝলাম, কিন্তু যাদের পিছনে পিছনে তুমি ঘুরে বড়াও, তারা কিসে আমাদের চেয়ে ভাল? তাদের কি আছে?

রূপ আছে, যৌবন আছে। পুরুষের কাছে এগুলোও কম লোভনীয় জিনিস নয়। তোমার তাও নেই। দেহের খোরাক মনের খোরাক কিছুই যাগাতে পার না, কি লোভে থাকব তোমার কাছে?

সুলেখা হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন।

মিষ্টিদিদির যৌবন আছে নাকি?

যৌবন না থাক্, এমন একটা মাদকতা আছে, যা তোমার নেই। আসল থা কি জান? আমরা মুগ্ধ হতে চাই। রূপ, যৌবন, প্রেম, প্রেমের অভিনয়, সবা, রান্না, আত্মত্যাগ—যা হোক একটা নিয়ে আমরা মেতে থাকতে চাই। মি আমাকে কি দিয়েছ? তোমার সঙ্গে আমার অতি স্থূল টাকাকড়ির স্পর্ক এবং সে সম্পর্ক আশা করি কড়ায় ক্রান্তিতে ঠিক আছে।

মিষ্টিদিদিও তো তোমাকে আর আমল দিচ্ছে না শুনছি। এক মুসলমান ছাড়ার সঙ্গে চ'লে গেছে—

এক মিষ্টিদিদি গেছে, আর এক মিষ্টিদিদি আসবে। পৃথিবীতে মিষ্টিদিদিদের ভাব ঘটবে না কখনও।

বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু এসেছেন।

শঙ্কর অনেকক্ষণ আসিয়াছিল, বাহিরে কেহ ছিল না বলিয়া এতক্ষণ ংবাদ পাঠাইতে পারে নাই। শয়নকক্ষের ঠিক পাশের ঘরেই বাহিরের র। শঙ্কর সব শুনিয়াছিল।

কি খবর?

প্রফেসর গুপ্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

শঙ্কর হাসির জন্য আসিয়াছিল। হাসি কোন বোর্ডিঙে থাকিয়া লেখাপড়া

করিতে চায়। বাড়িতে নিজের চেষ্টায় সে ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়িয়াছে, এখন স্কুলে ভরতি হইতে চায়। প্রফেসার গুপ্তের সাহায্যে তাহাকে একটি ভাল স্কুলে ভরতি করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেই শঙ্কর আসিয়াছে। প্রফেসার গুপ্ত এ কার্য যত সহজে ও সুষ্ঠুরূপে পারিবেন, অপরে তাহা পারিবে না। শিক্ষয়িত্রী-মহলে প্রফেসার গুপ্তের খাতির আছে, তাহা ছাড়া তিনি নিজেও শিক্ষা-বিভাগের লোক, কোন্ স্কুলটা ভাল তাহা হয়তো ঠিকমত বাছিয়া দিতে পারিবেন।

সব শুনিয়া প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ আছে কোন? আমি তো যতদূর দেখেছি, লেখাপড়া-জানা মেয়েরা ঠিক খাপ খাচ্ছে না সমাজের সঙ্গে।

লেখাপড়া-জানা ছেলেরাই কি খাপ খাচ্ছে? আপনি খাপ খেয়েছেন?

প্রফেসার গুপ্ত স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, পুরুষরা বেখাপ্পা হ'লে ততটা এসে যায় না। মেয়েরা বেখাপ্পা হ'লে বড় মুশকিল।

আমার তো ধারণা, মেয়েরা কিছুতেই বেখাপ্পা হয় না। ওদের প্রকৃতি জলের মত, যে পাত্রেই রাখুন ঠিক সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে।

করবে—যদি ওদের প্রকৃতিকে শিক্ষা দিয়ে বদলে না দাও। শিক্ষা পেলেই জল জ'মে বরফ হয়ে যায়।

একটু উত্তাপ পেলে কিন্তু গ'লে যায় আবার। জল কতক্ষণ বরফ হয়ে থাকবে, বলুন?

কিন্তু আমরা উত্তাপ দিই কি ক'রে, বল? আমাদের নিজেদেরই যে উত্তাপ প্রয়োজন, আমরা নিজেরাই যে বরফ হয়ে গেছি—বিলিতি রেফ্রিজারেটারে ঢুকে।

ওদেরও আপনারাই ঢুকিয়েছেন। একটা কথা ভেবে দেখছেন না কেন ওরা প্রাণপণে আমাদের মনের মত হবারই তো চেষ্টা করছে। যখন যা বলেছেন, তখনই তাই করেছে। ন বছরে গৌরীদান করতেন যখন, তখনও ওরা আপত্তি করে নি। চিতায় পুড়িয়ে মারতেন যখন, তখনও বেচারীরা

দলে দলে পুড়ে মরেছে। যখন পালকি ক'রে নিয়ে গেছেন পালকি ক'রে গেছে, যখন হাঁটিয়ে নিয়ে গেছেন হেঁটেই গেছে। ও বেচারীদের দোষ কি? আজ আপনারা চাইছেন, ওরা স্কুল-কলেজে পড়ুক, নাচগান শিখুক—ওরা প্রাণপণে তাই করছে। কাল যদি আপনাদের চাহিদা বদলায়, ওদেরও রূপ বদলাবে।

সব ঠিক। কিন্তু আমি সমাজ-সংস্কারক নই, আমি সামান্য মানুষ, যে কদিন বাঁচি একটু সুখে থাকতে চাই। **I am fed up with the present lot. I would like to have—**

প্রফেসার গুপ্ত কথাটা শেষ করিলেন না, একটু থামিয়া বলিলেন, মেয়েটির নাম কি বললে? হাসি? আচ্ছা, আজ আমি ফোনে কয়জনের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে রাখব, তুমি কাল এসো। তোমার সাহিত্যচর্চা কেমন চলছে? তোমার 'জীবন-পথে' বইখানা তত ভাল লাগে নি আমার কিন্তু। বড পানসে।

ভাল হবে কি ক'রে বলুন, চাকরি করতে করতে সাহিত্যচর্চা করা যায় না।

তার কোন মানে নেই; উনুনের ভেতর পুড়লেও আগুন আগুনই থাকে; ওসব লেম এক্স্‌কিউজ।

শঙ্কর মুচকি হাসিল বটে, কিন্তু মনে মনে সে খুব দমিয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল, 'জীবন-পথে' বইটা পড়িয়া প্রফেসার গুপ্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবেন।

তুমি বসবে, না, যাবে এখুনি?

আমাকে যেতে হবে।

চল তা হ'লে, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

সুলেখা পাশের ঘরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

১৩

আমাকে চিনতে পারেন ?

কই, মনে পড়ছে না—

চিবুকের ডান দিকে কালো তিলটা দেখেও মনে পড়ছে না ?

শঙ্করের সহসা মনে পড়িল। সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

আমার সম্বন্ধে অত কথা আপনি জানলেন কি ক'রে ?

কল্পনা করেছি।

সবটা কিন্তু অলীক কল্পনা ব'লে মনে হয় না।

অলীক কে বললে ? কল্পনাতেই সত্য ব'লে অনুভব করেছি ব'লেই লিখেছি।

আমার সম্বন্ধে ওই সব অনুভব করেছেন সত্যি সত্যি ?

করেছি ব'লেই তো লিখেছি।

আমার সব কথা জানেন ?

জানি বইকি।

ত্রিশ বছরের একটা মেয়ের মনে সংসার সম্বন্ধে অতখানি বৈরাগ্য এসেছিল হঠাৎ ? ডাক্তারকে পেলাম না ব'লেই ক্ষিদে চ'লে যাবে ? পোলাও পেলাম না ব'লে ভাত খাওয়াও বন্ধ ক'রে দেব ?

পোলাও না পেলে মনের যে ভাবটা হওয়া স্বাভাবিক, তাই আমি লিখেছি। ভাত খাওয়ার খবর দেওয়া আমার বিষয়ের বাইরে।

বুভুক্ষাই যখন আপনার বিষয়, তখন ও-খবরটা বাদ দিলে চলবে কেন ?

ওই নোংরা খবরটা দেবার দরকার কি ?

ইচ্ছে করলেই তো আপনারা নোংরাকেও সুন্দর ক'রে তুলতে পারেন। স্বামীকে ত্যাগ ক'রে চ'লে আসার খবরটাও কম নোংরা নয় কিছু।

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, জানেন ! ডাক্তারকে পাই নি ব'লে দুঃখ হয়েছিল অবশ্য আমার, কিন্তু তা ব'লে তার

কম্পাউণ্ডারটিকে ছাড়তে পারি নি আমি। পরের সংস্করণে যোগ ক'রে দেবেন খবরটা। আরও রিয়ালিস্টিক হবে।

শঙ্করের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল। আশেপাশে চাহিয়া দেখিল। সত্যই স্বপ্ন তাহা হইলে! অদ্ভুত স্বপ্ন! তাহার 'পান্থনিবাস' পুস্তকের নায়িকা যমুনা স্বপ্নে দেখা দিয়া গেল।

আশ্চর্য!

১৪

বিনিদ্র নয়নে হাসি একা শুইয়া ছিল।

কাঁদিতেছিল না, ভাবিতেছিল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা নয়, দুর্মতির কথা ভাবিতেছিল। স্বর্ণলতার চিঠিগুলি আবিষ্কার করিবার পর মৃন্ময়কে সে কত অপমানই না করিয়াছে! মৃন্ময় কিন্তু সে অপমান গায়ে মাখে নাই। অসংলগ্ন ভাষায় অসহায়ভাবে কেবল তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, ইহা তাহার যে কর্তব্য, তাহা হইতে সে যদি বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে হাসিই বা তাহার উপর নির্ভর করিবে কোন্ ভরসায়? মৃন্ময় এত কথা এমনভাবে গুছাইয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু বার বার এই কথাই বলিয়াছে। হাসি বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে চাহে নাই। ঈর্ষার কৃষ্ণধূমে তাহার আকাশ বাতাস তখন অস্বচ্ছ হইয়া ছিল।

আমাকে অনুমতি দাও তুমি।

মৃন্ময়ের কথাগুলি এখনও তাহার কানে বাজিতেছে।

আমাকে সত্যিই যদি ভালবেসে থাক, সত্যিই যদি শ্রদ্ধা করতে চাও, আমার মনুষ্যত্বকে খর্ব ক'রো না। এই ঘৃণিত পশুজীবন থেকে অব্যাহতি পেতে দাও আমাকে।

মৃন্ময়ের মুখখানা মনে পড়িল। প্রশস্ত উন্নত ললাট, রক্তাভ গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নাসা। ক্ষণিকের জন্য হাসি যেন এক মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময়ের কথাও মনে পড়িল। সেও আর ফিরিবে না। সহসা হাসি

উঠিয়া বসিল। আলুলায়িত কুন্তল দুই হাত দিয়া ঠিক করিতে করিতে আবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, তোমার সহধর্মিনী হইবার যোগ্যতা আমি লাভ করিবই। আমি যত ছোট ছিলাম, সত্যই তত ছোট আমি নই।

আলো জ্বালিয়া সে মৃন্ময়কে চিঠি লিখিতে বসিল। এ চিঠি মৃন্ময় কোনদিন পাইবে না জানিয়াও লিখিতে বসিল। আজ সে সমস্ত অন্তর দিয়া বুঝিয়াছিল, কেন মৃন্ময় স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিত!

১৫

হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি রমজানের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তুমি এটা ঠিক জান তো যে, সে বাড়িতে বড়সড় বিবাহযোগ্য আর কোন মেয়ে নেই?

না।

মেয়েটির নাম সেলিমা?

হ্যাঁ।

বাড়ির ঠিক পিছনেই পুকুর আছে?

ঠিক পিছনেই।

সামনে পাশাপাশি দুটো আমগাছ?

হ্যাঁ।

বাস্, আর কিছু দরকার নেই, ঠিক দেখে আসব আমি। তোমার যাবার দরকার নেই, আমি নিজেই চিনে বার করতে পারব। তোমার হবু শ্বশুরের নাম আলিজান—ঠিক মনে থাকবে আমার। তুমি যাও।

মুকুজ্জেমশাই আর একবার সহাস্য দৃষ্টি রমজানের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

পাশেই কাজিগ্রাম, সেখানে তোমার পিসীর কাছে চ'লে যাও তুমি।

আচ্ছা।

একটু অনিচ্ছাসহকারেই যেন রমজান রাজী হইল।

উভয়ে নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর গিয়া একটা গোলমাল শোনা গেল। দেখা গেল, একজন লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে লোকটা আসিয়া পড়িল।

পালান শিগগির, একটা পাগল একটা লাঠি নিয়ে সকলের মাথা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছে, দুজন খুন হয়ে গেছে। ওদিকে যাবেন না, পালান।

সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল, কোন প্রশ্ন করিবার অবসর দিল না।

মুকুজ্জেমশাই মুচকি হাসিয়া রমজানের দিকে চাহিলেন।

রমজান বলিল, চলুন, এই গলিটার ভেতর ঢুকে পড়ি।

আগে থাকতেই? এই লোকটাই পাগল কি না তার ঠিক কি? একটু এগিয়ে দেখাই যাক না!

মুকুজ্জেমশাই গলিতে ঢুকিলেন না, থামিলেনও না, যেমন চলিতেছিলেন চলিতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া রমজানকে অনুসরণ করিতে হইল। একটু পরে সত্যই কিন্তু পাগলকে দেখা গেল, মোটা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সগর্জনে ছুটিয়া আসিতেছে। দৈত্যের মত চেহারা, ভীষণদর্শন। রমজান তাড়াতাড়ি পাশের একটা দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িল; আশপাশের কপাট জানালা সব নিমেষের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল। মুকুজ্জেমশাই রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন, কোথাও পলাইবার চেষ্টা করিলেন না। পাগলটাও এক অদ্ভুত কাণ্ড করিল। সেও মুকুজ্জেমশাইয়ের সামনে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রক্তচক্ষু মেলিয়া ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ হেঁট হইয়া প্রণাম করিল এবং যেমন আসিয়াছিল তেমনই আবার লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

রমজান দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া বলিলেন, তোমার বউ বিপত্তারিণী হবে বোঝা যাচ্ছে। এতবড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল। লাঠিটা মাথায় বসিয়ে দিলেই হয়েছিল আর কি!

রমজান অবাক হইয়া গিয়াছিল।

ও-রকম করলে কেন বলুন তো?

তবে আর পাগল বলেছে কেন ?

আপনি দাওয়ায় উঠলেন না কেন ?

ফুরসৎ পেলাম কই, এসে পড়ল যে ! তা ছাড়া পালালেই যে সব নিস্তার পাওয়া যায়, তা ভেবো না। সিঙ্গাপুরে একবার একটা মাতাল । পিস্তল দিয়ে রাস্তায়—

গল্প করিতে করিতে উভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন।

আসুমিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর মুকুজ্জেমশাই কিছুদিন মনো খোঁজ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পান নাই। এখন রমজানের হবু-বধূকে দেখিতে চলিয়াছেন। রমজানকে তিনি বড় করেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়া রমজান এখন একটি ভাল চ পাইয়াছে। রমজানের বাপের সহিতই মুকুজ্জেমশাইয়ের বহুকাল । হৃদ্যতা, রমজানের পড়ার খরচও মুকুজ্জেমশাই কিছুকাল চালাইয়া এ কথা অবশ্য রমজান অথবা রমজানের বাবা জানে না, তাহারা জা মুকুজ্জেমশাইয়ের কোন ধনী বন্ধু মুকুজ্জেমশাইয়ের অনুরোধে এই সাহা করিয়াছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে মুকুজ্জেমশাই দুই দিন আগে রমজ বাড়ি গিয়াছিলেন। গিয়া শুনিলেন, আলিজানের কন্যা সেলিমার : রমজানের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে। গোঁড়া মুসলমান সমাজে মেয়ে-দেখানোর প্রথা নাই। ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া রমজানের গোঁ ঘুচিয়াছে, প্রথা কিন্তু বদলায় নাই। রমজানের মুখ দেখিয়াই মুকুজ্জে বুঝিলেন, রমজান মনে মনে ক্ষুব্ধ। রমজানের বাবাকে লুকাইয়া তাই উভ বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। মুকুজ্জেমশাই ঠিক করিয়াছেন, আলিজা বাড়ির পশ্চাতে যে পুষ্করিণী আছে, তাহারই ঝোপে-ঝাড়ে আত্মগোপন কি সেলিমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবেন। সমস্ত দিনের মধ্যে সে নিশ্চয়ই দু একবার ঘাটে আসিবে। রমজানেরও মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত যাইবার ই কিন্তু পাছে, জানাজানি হইয়া যায়—এই ভয়ে মুকুজ্জেমশাই তাহাকে স লইয়া যাইতে ইচ্ছুক নহেন। রমজান সুতরাং মুকুজ্জেমশাইকে শ্বশুর-বা

গ্রামের রাস্তাটা দেখাইয়া দিয়া কাজিগ্রামে পিসীর বাড়িতে চলিয়া যাইবে। আলিজানের বাড়ি রেল-স্টেশন হইতে দশ ক্রোশ। কাঁচা রাস্তা, হাঁটিয়া যাইতে হইবে, বৈশাখের দারুণ দ্বিপ্রহর। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু দমিবার লোক নহেন।

১৬

চুনচুন বেথুন কলেজে ভরতি হইয়াছে, হাসিও বেথুন স্কুলে ভরতি হইয়া গেল। চুনচুনের খরচ পীতাম্বরবাবু দিবেন, হাসি নিজের খরচ নিজেই চালাইবে। দুইটা ব্যাপারই শঙ্করকে বিস্মিত করিয়াছে। মনে মনে সে একটু আহতও হইয়াছে। যদিও তাহার নিজের আয় যৎসামান্য—চুনচুন কিংবা হাসির পড়ার ব্যয়ভার অংশত বহন করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, তথাপি তাহা যদি বাধ্য হইয়া তাহাকে করিতে হইত, তাহা হইলে সে যেন মনে মনে তৃপ্তি লাভ করিত। দুইটি জটিল ব্যাপারেরই এমন সহজ সমাধানে সে একটুও খুশি হয় নাই। কিন্তু এ অস্বস্তি যে কিসের জন্য, তাহাও সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। চুনচুন কিংবা হাসির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়া অবশেষে তাহাদের প্রেমাস্পদ হওয়ার বাসনা তাহার আর নাই, তাহার মনের সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। বস্তুত নারী বলিয়াই যে তাহাদের সম্বন্ধে তাহার চিত্ত সমুৎসুক এ কথা সত্য নহে, উহারা নারী না হইয়া পুরুষ হইলেও সে হয়তো এই অস্বস্তি ভোগ করিত। অবহিতচিত্তে আত্মবিশ্লেষণ করিলে সে বুঝিতে পারিত যে, বাহাদুরি দেখাইবার দুই-দুইটা সুযোগ এমন ভাবে হাতছাড়া হইয়া যাওয়াতেই সে অস্বস্তি ভোগ করিতেছে। কিন্তু এই মনস্তত্ত্ব লইয়া বেশিক্ষণ সময়ক্ষেপ করিবার মত সময় সে পাইল না, লোকনাথবাবু আসিয়া পড়িলেন।

কবি লোকনাথ ঘোষালের সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কি একটা ছুটিতে তিনি কয়েক দিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। গৃহিণীর নিকট কলিকাতা আসিবার কয়েকটি গুরুতর কারণ অবশ্য তিনি দেখাইয়া

আসিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিবার তাঁহার একমাত্র কারণ শঙ্কর। কন্যার জন্য পাত্র অথবা নিজের গণ্ডমালার জন্য চিকিৎসক অন্বেষণ করা তাঁহার অজুহাত মাত্র। সাহিত্যিক ছাড়া জগতে আপনার বলিতে তাঁহার কেহ নাই, থাকিলেও তাহাদের তিনি গ্রাহ্য করেন না। কন্যার পাত্র অথবা গণ্ডমালার চিকিৎসক জুটিবার হইলে ঠিক সময়ে আসিয়া জুটিয়া যাইবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস, এসবের জন্য ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। পৃথিবীতে মনুষ্যপদবাচ্য সভ্য ব্যক্তির যাহা লইয়া সত্যই ব্যস্ত হওয়া উচিত, তাহার নাম সাহিত্য। সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার প্রিয়, অসাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার শত্রু। লোকনাথ সুদর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো রঙ, খর্বাকৃতি, কদমছাঁট চুল, আরক্ত চক্ষু, চোঁখের কোণে পিচুটি। চোখে মুখে একটা দর্প প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও পরিস্ফুট।

কিছুদিন পূর্বে শঙ্কর কয়েকটি সনেট লিখিয়াছিল। বিভিন্ন মাসিকপত্রে সেগুলি প্রকাশিতও হইয়াছিল। লোকনাথবাবু তাহার প্রত্যেকটি পড়িয়াছিলেন। যে সব লেখকের সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও আশা পোষণ করেন, তাহাদের কোন লেখা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না। সনেট লইয়াই আলোচনা চলিতেছিল।

লোকনাথবাবু সাধারণত মৃদু হাসিয়া আস্তে আস্তে কথা বলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আপনার সনেটগুলি গীতিকবিতা হিসেবে উৎকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সনেট হয় নি।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, সনেট কি এক জাতীয় গীতিকবিতা নয়?

কিন্তু গীতিকবিতা মাত্রেই সনেট নয়।

লোকনাথবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার চোখে একটি দীপ্তি প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল। শঙ্কর বুঝিতে পারিল, তাঁহার মনে আবেগ আসিয়াছে। সে চুপ করিয়া রহিল।

না, গীতিকবিতা মাত্রেই সনেট নয়, দুধ মানে যেমন ক্ষীর নয়। বুঝুন ব্যাপারটা ভাল ক'রে, লিরিকের সমস্ত উপকরণই ওতে থাকবে, অথচ স্বাতন্ত্র্যও যথেষ্ট থাকা চাই।

শঙ্কর বলিল, তার মানে, সনেটে কোন রকম বাহুল্য থাকবে না, এই তো বলতে চান ?

যে কোন রস-রচনাতেই বাহুল্য বর্জনীয়, কেবল সনেটেরই বিশেষত্ব নয় তা। সনেটের ব্যাপারটা কি জানেন ?

লোকনাথবাবু খানিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, রসেটি বলেছেন—

A sonnet is a moment's monument
Memorial from the soul's Eternity
To one dead deathless hour—

এই হ'ল সনেটের পরিচয়। অন্যান্য লিরিক কবিতার মত সনেটে আবেগ থাকা চাই, গভীরতা থাকা চাই, গভীর রসবোধের পরিচয় থাকা চাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই একটা বিশিষ্ট বাঁধন, কেন্দ্রীভূত ঘনীভূত একটা জিনিস, যাতে বাঁধন সত্ত্বেও অথবা বাঁধনের জন্যেই একটা চমৎকার রসরূপ ফুটে ওঠে। সেইজন্যেই যে কোন লিরিক ভাবকেই সনেটের রূপ দেওয়া যায় না।

ও।

লোকনাথবাবু বলিলেন, সুতরাং বুঝতে পারছেন, আপনার ওগুলো সনেট হয় নি।

বুঝতে পারছি।

শঙ্কর কিন্তু বুঝিতে পারে নাই। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে লোকনাথবাবুকে কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, তাই কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না; করিলেই তাঁহার সহিত হৃদ্যতা আর থাকিবে না।

লোকনাথবাবু বলিয়া চলিলেন, অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত গভীর ভাবধারা একটা বিশিষ্ট শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়েও, অর্থাৎ ছন্দ-মিলের বিশিষ্ট বন্ধনে বন্দী হয়েও যখন রসোত্তীর্ণ হবে, তখনই তাকে সনেট বলব। আগেই বলেছি, তাই যদি হয়, তা হ'লেই বুঝতে পারছেন—যে কোন ভাব সনেটের উপযোগী নয়। অর্থাৎ, মিলবন্ধনের কৃত্রিমতা এবং ভাবোচ্ছ্বাসের অকৃত্রিমতা যেখানে স্বাভাবিক প্রবণতাবশত রসকেন্দ্রে ঘনীভূত হচ্ছে—

একই ভাবকে নানা ভাষায় নানা কথায় বারম্বার রূপান্তরিত করিয়া বক্তৃতা করা লোকনাথবাবুর স্বভাব। আজ কিন্তু বক্তৃতায় বাধা পড়িল, অপূর্বকৃষ্ণ পালিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ বা প্রসাধনে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্তু লক্ষ্য করিলে শঙ্কর দেখিতে পাইত, তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে পূর্বে ভীত লুব্ধ যে অনিশ্চয়তা ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া লোকটিকে সকলের নিকট খেলো করিয়া তুলিত, তাহা এখন আর নাই। তাঁহার হাবভাবে বেশ একটা সপ্রতিভতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ ভঙ্গীভরে নমস্কার করিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, আপনাকে ঠিক এ সময়ে বাড়িতে পাব ভাবি নি, যদিও এ সময় ঠিক অফিস-আওয়ার নয়, তবু, মানে—

লোকনাথ. উঠিয়া পড়িলেন। বক্তৃতায় বাধা পড়িলে তিনি আর বসেন না। বলিয়া গেলেন, সন্ধ্যাবেলা আবার তিনি আসবেন এবং যদি পান কয়েকটি বিখ্যাত সনেটও যোগাড় করিয়া আনিবেন।

আমি আরও আগেই আসতাম, কিন্তু মোড়ে প্রিয়বাবুর উকিল জগদীশ সেনের সঙ্গে দেখা হওয়াতেই—, অথচ—

ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না? বসুন।

বিখ্যাত শক্তিমান লোকের সম্মুখে বসিতে পাইলে অবিখ্যাত অশক্ত ব্যক্তি যেমন কাঁচুমাচু হইয়া পড়ে, অপূর্বকৃষ্ণও সেই নীতি অনুযায়ী অতিশয় সসঙ্কোচে শঙ্করের নির্দিষ্ট আসনটিতে উপবেশন করিলেন।

একটি অনুগ্রহ আমাকে করতে হবে।

বলুন।

আমার বিয়ে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনি যদি দয়া ক'রে, মানে, যদিও এটা আমার দুঃসাহস, তবু অনেক দিনের পরিচয়ের জোরে—

এর সঙ্গে প্রিয়বাবুর উকিল জগদীশ সেনের সম্পর্ক কি?

এর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, মানে, তাঁর সঙ্গে মোড়ে দেখা হওয়াতেই দেরি হয়ে গেল। অবশ্য আর এক দিক দিয়ে দেখলে বিয়ের চেয়ে সেটাও কম ইম্‌পর্‌ট্যাণ্ট নয়, কিন্তু—

কেন, হয়েছে কি ?

অপূর্বকৃষ্ণের চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

শোনেন নি ? প্রিয়নাথ মল্লিক এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন যে ! কাগজে বেরিয়েছে তো খবরটা।

আমি পড়ি নি। প্রিয়নাথ মল্লিক কে ?

বেলা মল্লিকের দাদাকে এর মধ্যেই ভুলে গেলেন ? মানে, আমি এক্‌স্‌পেক্ট করেছিলুম—যদিও অবশ্য আপনার—

কি হয়েছে তাঁর ?

অপূর্বকৃষ্ণ ক্ষণকাল থামিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন। বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, খবরটা শঙ্করকে বলা সমীচীন হইবে কি না। কিন্তু ব্যাপারটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে মনে পড়িয়া যাওয়াতে তাঁহার দ্বিধা বিদূরিত হইল।

কি হয়েছে প্রিয়বাবুর ?

তিনি এক অদ্ভুত রগ-চটা মেজাজের লোক, মানে, তা না হ'লে আপিসের মধ্যে অমন ক'রে প্রফুল্লবাবুকে—, তা ছাড়া ভদ্রলোকের দোষও এমন কিছু—

কি করেছেন প্রফুল্লবাবুকে ?

রুল-পেটা করেছেন।

কেন, হঠাৎ ?

হ্যাঁ, হঠাৎই। প্রফুল্লবাবুর দোষ ছিল না তত, তিনি এমনই ঠাট্টার ছলে, ঠিক ঠাট্টার ছলেও নয়—ভাল ভেবেই কথাটা বলেছিলেন, অথচ প্রিয়বাবু, মানে, বোধ হয়—

শঙ্কর অধীর হইয়া উঠিতেছিল, আশ্চর্য স্বভাব ভদ্রলোকের ! কিছুতেই কোন কথা সোজা করিয়া বলিতে পারেন না।

কি কথা বলেছিলেন ?

আমরা সকলেই জানতাম, অর্থাৎ আমার অন্তত তাই ধারণা ছিল যে, বেলা দেবীর ওই সব কাণ্ড-কারখানার ফলে প্রিয়বাবু আজকালকার লেখাপড়া-জানা মেয়েদেরই ওপর চটা। তাই প্রফুল্লবাবু তাঁকে খুশি করবেন

ভেবে—অবশ্য তিনি যে খুশি হবেনই এ কথা প্রফুল্লবাবুর ইম্যাজিন করাটা একটু, মানে, ফার্-ফেচেড বলতে পারেন, কিন্তু—

কি বলেছিলেন তিনি ?

তেমন কিছু নয়, এই একটু, মানে, ভাষাটা অবশ্য একটু ইয়ে গোছের, মানে অশ্লীলই বলতে হবে, কিন্তু প্রিয়বাবু ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে ওভারলুক করতে পারতেন।

এর জন্যে রুল-পেটা করলেন তিনি প্রফুল্লবাবুকে ?

সে এক ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড, ভদ্রলোক মাথা ফেটে অজ্ঞান, পুলিস-কেস—

কি বলিলেন তাঁর উকিল ?

খুব বেশি আশা দিলেন না—দেওয়া শক্ত, মানে—

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। প্রিয়নাথ মল্লিকের মুখখানা তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

আমার বিয়েতে যাবেন তো ? আপনি এ রকম নিমন্ত্রণ রোজই পান নিশ্চয়, তবু যদি দয়া ক'রে—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব।

সেইজন্যেই চিঠি না পাঠিয়ে পার্‌সোনালি এলাম, জানি, আপনি বিজি লোক, অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেও হয়তো—

যাব।

জায়গাটা চিৎপুরের গলি, এই চিঠিতেই ঠিকানা দেওয়া আছে।

সুদৃশ্য কার্ডে ছাপানো নিমন্ত্রণ-লিপিটি অপূর্বকৃষ্ণ বাহির করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া নাক মুখ কান মুছিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, লোকে বসতে পেলেই, মানে, প্রোভার্বটা জানা আছে নিশ্চয়ই আপনার—। এবং হাসিলেন।

লোকনাথবাবুর নিরঙ্কুশ সমালোচনার পর অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের তোষামোদ শঙ্করের বড় ভাল লাগিতেছিল। সে প্রসন্ন দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, আবার কি ?

কাঁচুমাচু মুখ করিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, শুধু আমার নয়, মীনুরও অনুরোধ—দয়া ক'রে একটি কবিতা যদি লিখে দেন। বেশি বড় নয়, একটি সনেট শুধু, সেদিন কি একটা কাগজে আপনার সনেট একখানা পড়লাম, ওয়াণ্ডারফুল—সিম্‌প্লি ওয়াণ্ডারফুল।

শঙ্করের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

দেবেন লিখে?

আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে।

অপূর্বকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সহসা তাহার মনে হইল, এ কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে তাহার! অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের প্রশংসার জন্য সে লালায়িত!

পিওন চিঠি দিয়া গেল। আর একটি বিবাহের নিমন্ত্রণ। পড়িয়া শঙ্কর বিস্ময় বোধ করিল—চুনচুনের সহিত পীতাম্বরবাবুর বিবাহ!

বিস্মিত হইল; কিন্তু ইহা লইয়া তাহার অন্তরে তেমন কোন আলোড়ন জাগিল না। তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া লোকনাথবাবুর কথাগুলিই কেবল ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—আপনার ওগুলো সনেট হয় নি।

১৭

শঙ্কর সবিস্ময়ে চণ্ডীচরণ দস্তিদারের বিদ্যাবত্তার কথা চিন্তা করিতে করিতে আপিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল। লোকটাকে এতদিন সে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ মাসে 'সংস্কারকে'র জন্য যে প্রবন্ধটি তিনি দিয়াছেন, যাহার প্রুফ সে এইমাত্র সংশোধন করিয়া ফিরিতেছে, তাহা পড়িবার পর লোকটির প্রতি শ্রদ্ধাবিষ্ট না হইয়া পারা যায় না। "প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দুটি কথা" প্রবন্ধের নাম; কিন্তু দুইটি নয়, অনেক জ্ঞাতব্য কথাই তিনি লিখিয়াছেন। আর যাহারই থাক্‌, শঙ্করের অন্তত এসব কিছুই জানা ছিল না। আবিসিনিয়ার পর্বতকন্দর হইতে নীল নদের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত, নিম্ন-মিশরের সহিত ব-অক্ষরের সাদৃশ্য, পেলুশিয়ান কেনোপিকের উদ্ভব,

প্রাচীন ইজ্‌রেলাইট্‌স্‌দের কাহিনী, জোসেফের ইতিবৃত্ত, ফারাওদের পূর্ববর্তী রাখাল রাজাগণের ইতিহাস, হিলিওপোলিস ফিনিক্স সম্বন্ধে তথ্য, আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরীর অতীত মহিমা—শঙ্কর সত্যই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে এসব কিছুই জানিত না, অথচ চণ্ডীচরণ দস্তিদার—

আমাকে চিনিতে পারেন দাদা ?

একটি রোগা লম্বাগোছের যুবক প্রণাম করিয়া শঙ্করের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। শুষ্ক শীর্ণ চেহারা দেখিলেই মনে হয়, তাহার শরীরের সমস্ত রস কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে, অস্থি এবং চর্ম ছাড়া দেহে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। শঙ্কর চিনিতে পারিল না।

আমি আপনার মামাতো-ভাই নিত্যানন্দ।

ও।

উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আপনার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রে পিসেমশাই আমাকেই এম. এ. পড়ার খরচ দিয়েছিলেন।

ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমাকে সেই কোন্ ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম, তাই চিনতে পারছি না। কোথায় আছ, এখন কি করছ ?

কিছুই করছি না।

কতদিন এম. এ. পাস করেছ ?

পাস করতে পারি নি। বার তিনেক চেষ্টা ক'রেও পারি নি। করলেও বা কি হ'ত, বলুন ?

হাসিল। এবড়ো-খেবড়ো পানের-ছোপ-ধরা বিশ্রী দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িতেই নিত্যানন্দের স্বরূপ যেন উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল।

কোথায় আছ এখানে ?

দেশ থেকে আজই এসেছি, একজন ফ্রেণ্ডের বাড়িতে উঠেছি।

আমার বাসায় এসো, ঠিকানাটা হচ্ছে—

ঠিকানা জানি। আপনার ঠিকানা কে না জানে, আপনি আজকাল বিখ্যাত লোক।

তারপর হাসিয়া বলিল, কাল যাব। এখন অন্য জায়গায় কাজ আছে একটু। বউদি এখানেই আছেন তো?

আছেন।

নিত্যানন্দ চলিয়া গেল।

শঙ্কর তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার আপন মামাতো-ভাই, অথচ কত অপরিচিত!

১৮

ভন্টু আপিস হইতে ফিরিতেছিল। আজ তাহার অনেক পূর্বেই ফেরা উচিত ছিল, কিন্তু কাজ সারিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। কাজ কি একটা যে, তাড়াতাড়ি শেষ হইবে? মৃন্ময়ের জেল হওয়ার পর হইতে কাজের চাপ আরও বাড়িয়াছে। সমস্ত খুঁটিনাটি নিজে দেখিয়া ক্যাশ মিলাইয়া সমস্ত টাকা জমা দিয়া তবে তাহাব ছুটি। ইন্দু কেমন আছে কে জানে? ইন্দুমতী আসন্নপ্রসবা, ক্রমাগত ভুগিতেছে। আজ সকালে বার দুই বমি করিয়া চোখ উলটাইয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিল যে, পট করিয়া চল্লিশটি টাকা খসিয়া গেল। তাহার বাপের বাড়িতে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাকেই ডাকিতে হইল, তিনি নাকি উহার নাড়ী এবং ধাত ভাল বুঝেন। তাঁহার ফী বত্রিশ টাকা এবং যে সকল ঔষধ পথ্য তিনি ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, তাহার দামও আট টাকা। মুখটি বুজিয়া দিতে হইল। তিনি বলিয়া গেলেন যে, প্রসবের পূর্বে প্রসূতির যেসব পরিচর্যা প্রয়োজন, তাহার কিছুই করা হইতেছে না। আসন্ন-প্রসবার যে পরিমাণ দুধ ফল খাওয়া উচিত, যতটা বিশ্রাম এবং ব্যায়াম করা দরকার, তাহার কিছুই হয় নাই। সত্যই হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারের নানাবিধ খরচ। দাদা আবার চেঞ্জে গিয়াছেন, তাঁহাকে খরচ পাঠাইতে হয়; দাদার ছেলেরা স্কুলে পড়িতেছে, তাহাদের সব খরচ দিতে হয়; বাবু অহিফেন এবং দুধের মাত্রা বাড়াইয়াছেন; বাবাজী আসিয়া জুটিয়াছেন, তাঁহার জন্য খাঁটি গব্যঘৃত কিনিতে হইতেছে। ইহার উপর

প্রসূতি-পরিচর্যার খরচ কি করিয়া জুটাইবে সে! তাহার মাহিনা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সংসার-খরচ তদপেক্ষা ঢের বেশি বাড়িয়াছে। ইন্দু এ বেলা কেমন আছে, কে জানে? একবার ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা করিয়া গেলে কেমন হয়? কিন্তু ইন্দুর এ বেলার খবরটা না জানিয়া যাওয়া বৃথা। হঠাৎ ভন্টুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, বাইকের ব্রেকটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সে নামিয়া পড়িল। এ কি কাণ্ড! এ তো সে স্বপ্নেও ভাবে নাই!

বল হরি হরিবোল—

করালীচরণ বক্‌সি মড়া বহিয়া লইয়া যাইতেছেন। করালীচরণ বক্‌সি! কাহার মড়া? করালীচরণ দ্রাবিড় হইতে ফিরিয়াছেন নাকি? কবে? ভন্টু কিছুই তো জানে না! সে গত ছয় মাস করালীচরণের কোন খোঁজই রাখে নাই। অবসরও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নাই। দুই বৎসর পূর্বে সে হয়তো আগাইয়া গিয়া কুশল প্রশ্ন করিত, এমন কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত গিয়া সমস্ত রাত কাটাইয়া আসিতেও হয়তো তাহার বাধিত না, আজ কিন্তু এসব করিবার কল্পনাও সে করিল না, পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল। বরং এই চিন্তাই মনে উদিত হইল, চাম্‌লদ আমাকে দেখিতে পায় নাই তো!

১৯

অনেক রাত্রে চিৎপুর রোড দিয়া শঙ্কর একা ফিরিতেছিল। এমন আনন্দময় উন্মাদনা তাহার জীবনে বহুকাল আসে নাই। তাহার দেহের প্রতি শিরায়-উপশিরায় যেন সুরা তরঙ্গিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল, লোকনাথ ঘোষালের বিচারই কি ঠিক? প্রফেসার গুপ্তের শুচিবায়ুগ্রস্ত সাহিত্য-রুচিই কি সাহিত্য-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড? তাহার মনের অস্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে সে হয়তো জ্ঞাতসারে সচেতন ছিল না, থাকিলে লোকনাথ ঘোষাল অথবা প্রফেসার গুপ্তের রসবোধে সন্দিহান হইতে সে হয়তো ইতস্তত করিত। কিন্তু অবিমিশ্র প্রশংসার মদিরায় তাহার সমস্ত চিত্ত বিহ্বল, লোকনাথ ঘোষাল

্রফেসার গুপ্ত সব তখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের বিবাহ-
াসরে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একজন ভক্ত পাঠিকার সহিত দেখা হইয়া
়াইবে, ইহা কে কল্পনা করিয়াছিল! কুমারী নীরা বসাক সত্যই তাঁহাকে
াবা'ক করিয়া দিয়াছে। সে তাহার সমস্ত লেখা শুধু যে পড়িয়াছে তাহা নয়,
ত্নসহকারে বারম্বার পড়িয়াছে। তাহার কবিতা তো বটেই, কিছু কিছু গল্পও
াহার কণ্ঠস্থ, অনায়াসে মুখস্থ বলিয়া গেল। 'জীবন-পথে' পুস্তকের নীহার
াহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, "উদ্বন্ধন" গল্পের নায়িকার দুঃখে সে অশ্রুপাত
রিয়াছে, "নাম-না-জানা" গল্পের সূক্ষ্ম রসে সে অভিভূত। তাহার রুচি তুচ্ছ
রিবার মত নয়। টল্স্টয়-গোর্কি-পড়া মেয়ে। তাহার রসবোধ নাই—এ
থা বলা চলে না। অতিশয় দক্ষতার সহিত সে 'পান্থ-নিবাসে'র যমুনা-চরিত্র
বিশ্লেষণ করিল, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় দেখাইল। শঙ্কর
ত্যই অবাক হইয়া গিয়াছে। কুমারী নীরা বসাকের মুখখানা বারম্বার
াহার মনে পড়িতে লাগিল। মেয়েটি দেখিতে কুৎসিত। সামনের দাঁতগুলি
ড বড়, গায়ের রঙ কালো, সামনের চুলগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু
ইটিতেও তেমন কিছু সৌন্দর্য নাই। কিন্তু সাহিত্য আলোচনা করিতে
বিতে সে যখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সমস্ত কদর্যতাকে অবলুপ্ত
রিয়া দিয়া তাহার চোখে মুখে যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা দেহাতীত
এবং সত্যই অনবদ্য। শঙ্করকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। শঙ্করের জীবনে অনেক
ারী আসিয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন মেয়ে শঙ্কর আর দেখে নাই। অধিকাংশ
ারীর দেহটাই সর্বপ্রথমে চিত্তকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু নীরা বসাক রূপের অভাব
ত্ত্বেও মনকে আকর্ষণ করে। সে যে নারী, এ কথাটাই মনে থাকে না। এ
কাথায় ছিল এতদিন? এই প্রসঙ্গে চুনচুনের কথাও শঙ্করের মনে পড়িল।
নচুনেরও সাহিত্যপ্রীতি আছে, কিন্তু তাহা এত বেশি নীরব যে, তাহার
স্তিত্ব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। চুনচুনেরও আজ বিবাহ হইয়া গেল।
ঙ্কর যায় নাই, তাহার প্রবৃত্তিই হয় নাই। চুনচুন যে স্বেচ্ছায় পীতাম্বরবাবুকে
বিবাহ করিতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। ওই লোভী লোমশ
ুড়টার মধ্যে সে কি এমন দেখিতে পাইল? যদি কোনদিন চুনচুনের সঙ্গে

নির্জনে দেখা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে, পীতাম্বরবাবুর মাধুর্যটা কোথায়? হয়তো কিছু আছে, যাহা শঙ্করের অনধিগম্য। সহসা শঙ্করের মনে হইল, চুনচুনের সহিত এতদিনের পরিচয়, অথচ তাহার সম্বন্ধে সে কত কম জানে! যতীন হাজরার শোচনীয় মৃত্যুর রাত্রিটা মনে পড়িল:– সেই গভীর রাত্রে গোপনে খিল খুলিয়া দেওয়া! সেদিনও চুনচুন যেমন রহস্যময়ী ছিল, আজও তেমনই রহস্যময়ী আছে। তাহার অন্তরলোকের দ্বার আজও শঙ্কর খুলিতে পারে নাই। হঠাৎ তাহার মনে হইল, খুলিবার প্রয়োজনটাই বা কি? সকলের অন্তরলোকের খবর যে তাহাকে রাখিতেই হইবে, এমনই বা কি কথা আছে? সিগারেট বাহির করিবার জন্য সে পকেটে হাত পুঁরিল। হাত পুরিতেই বিবাহের প্রীতি-উপহারখানা হাতে ঠেকিল। একটা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়াইয়া বহুবার-পঠিত সনেটটা সে আবার পড়িল। চমৎকার করিয়া ছাপাইয়াছে! অপূর্ববাবুর রুচিটা যে সুমার্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপূর্বকৃষ্ণের উপর শঙ্করের বরাবরই বিতৃষ্ণা, আজ এই উপলক্ষ্যে বিতৃষ্ণাটা যেন অনেক কমিয়া গেল। মনে হইল, তাহার উপর এতদিন সে অকারণে অবিচার করিয়াছে। তাহার উপর রুষ্ট হইয়া থাকিবার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণই তো নাই। কৃতবিদ্য মার্জিতরুচি ভদ্রলোক, অতিশয় নিরীহ, কাহারও সাতে-পাঁচে থাকিতে চান না, কাহারও উপকার ভিন্ন অপকার করেন না, সঙ্গীত-বিষয়ে সত্যই গুণী। নারীজাতি সম্বন্ধে অবশ্য কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। কিন্তু সে দুর্বলতা কাহার নাই? বউটিও বেশ হইয়াছে। চমৎকার মেয়েটি। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। মেয়েটি কিছুকাল পূর্বে অপূর্বকৃষ্ণেরই ছাত্রী ছিলেন। গরিব ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, অপূর্বকৃষ্ণের সহায়তাতেই নাকি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছেন, গান-বাজনাও শিখিয়াছেন। হয়তো উহারা সুখেই থাকিবে।

কিছুদূরে গিয়াই শঙ্কর কিন্তু অপূর্বকৃষ্ণের কথা ভুলিয়াই গেল। পকেট হইতে সনেটটা বাহির করিয়া আর একটা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়াইয়া আবার সেটা পড়িতে লাগিল। সকলেই কবিতাটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছে। ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ

বিডন স্ট্রীটে ঢুকিয়া পড়িল। বিডন স্ট্রীটের একটা গলিতেই লোকনাথবাবু থাকেন।

রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছিল, তবু লোকনাথবাবু জাগিয়াই ছিলেন। "বঙ্কিমচন্দ্র" সম্বন্ধে বিরাট একটা প্রবন্ধ লিখিবেন, বহুদিন হইতেই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। মফস্বলে সব বই পাওয়া যায় না বলিয়া লিখিতে পারেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া লাইব্রেরি হইতে পুরাতন মাসিক ও নানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রয়োজনীয় অংশগুলি টুকিয়া লইতেছিলেন। শঙ্করের ডাকে কপাট খুলিয়া দিলেন এবং এত রাত্রে শঙ্করকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

এত রাত্রে কি মনে ক'রে ?

একটা বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলাম, ভাবলাম, আপনি কি করছেন দেখে যাই।

আসুন আসুন। আমি বঙ্কিমকে নিয়ে পড়েছি। বঙ্কিম আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পুরোধা, অথচ তাঁর সম্বন্ধে ভাল ক'রে কোন আলোচনাই হয় নি এখনও। আমি ভাবছি, আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি ক'রে যাব। বঙ্কিমের ভাষার লিপিচাতুর্য প্রথমে দেখাতে চাই, বুঝলেন ? বঙ্কিমের ভাষাটা—

বঙ্কিম-আলোচনা শুরু হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে শঙ্কর বাড়ি ফিরিল। বঙ্কিম সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিল বটে, কিন্তু মন তাহার অপ্রসন্ন। লোকনাথবাবু সনেটটির প্রশংসা তো করেনই নাই, বরং ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কবিতা লইয়া এ রকম খেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অমিয়া মেঝেতে আঁচল পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। পাশে থালায় পরটা ঢাকা দেওয়া। শঙ্করের ডাকে অপ্রতিভমুখে সে উঠিয়া বসিল। শঙ্করও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যে আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ ছিল, এ কথা সে অমিয়াকে বলিতেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

যাই, পরটাগুলো গরম করি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছ কি ক'রে, যা মশা!

মশারির ভেতর আলো ঢোকে না। এখানে শুয়ে শুয়ে পড়ছিলাম।

তাহার পর মিটিমিটি চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, তোমারই বই পড়ছিলাম একখানা।

কোন্‌টা ?

'পান্থনিবাস'খানা।

কেমন লাগল ?

বেশ।

শঙ্কর কোটটা খুলিয়া চেয়ারে রাখিল।

আবার ওখানে রাখছ ? আলনা রয়েছে তা হ'লে কেন ?—অমিয় কোটটা তুলিয়া যথাস্থানে রাখিল। তাহার পর পাশের ঘর হইতে একটা কাপড় আনিয়া বলিল, কাপড়টাও ছেড়ে ফেল, সমস্তটা দিন ওই এক কাপড়ে রয়েছ।

কাপড় ছাড়া হইয়া গেলে অমিয়া বলিল, হাত পা মুখ ধোবে না বারান্দার কোণে জল গামছা সব ঠিক ক'রে রেখেছি।

শঙ্কর হাত মুখ ধুইয়া আসিল।

'পান্থনিবাস'খানা ভাল লাগল তা হ'লে তোমার ?

হ্যাঁ, বেশ তো। তবে—

আবার তবে কি ?

আমি সব বুঝতে পারি নি ভাল। আমার বিদ্যের দৌড় আর কতদূর !

কোন্‌খানটা বুঝতে পার নি ?

ওই যমুনাকে। ও-রকম মেয়ে আছে নাকি ? কি বিচ্ছিরি কাণ্ড, ও রকম করে নাকি কেউ ?

করে বইকি।

রাম রাম !

যমুনা মাতাল দুশ্চরিত্র স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নানা বিপদ-আপদের মধ্যে পড়িয়া অবশেষে নার্স হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে এবং কালক্রমে একজন ডাক্তারের প্রেমে পড়িয়া উপলব্ধি করিয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রেম

একমাত্র কাম্য ধন। কিন্তু উক্ত ডাক্তার যখন তাহার প্রণয়-ফাঁদে ধরা দিল না, তখন যমুনার মনে হইল—কিছুই কিছু নয়, পৃথিবীটা একটা পান্থনিবাস মাত্র। ইহাই 'পান্থনিবাসে'র গল্প। এ সম্বন্ধে শঙ্কর নীরা বসাকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছে, লোকনাথ ঘোষালের চুল-চেরা সমালোচনাও শুনিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, অমিয়াকেও এই গল্পের আর্ট সম্বন্ধে সচেতন করে। কিন্তু অমিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তোমার গাল-বালিশ করেছি আজ, দেখবে? এক দিকে টকটকে লাল শালু আর এক দিকে কালো সাটিন—এই দেখ। ভাল হয় নি? আমার ইচ্ছে ছিল, এ দিকটা নীল রঙের দিয়ে—

বেশ হয়েছে। পরটা গরম কর।

এই করি। ক্ষিধে পেয়েছে বুঝি? পাবে না, সেই কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছ! এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

লোকনাথবাবুর কাছে।

আবার সনেটের কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

২০

অপরাহ্ণ।

'সংস্কারক'-আপিসে শঙ্কর যথারীতি প্রূফ দেখিতেছিল। একটি নয়-দশ বৎসরের বালক সসঙ্কোচে প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু কোথায়?

আমি শঙ্কর। কেন?

বালক একটি চিঠি দিল। ছবির চিঠি। ক্ষুদ্র পত্র।—

ভাই শঙ্কর,

তিন দিন থেকে জ্বরে প'ড়ে আছি। শয্যাসঙ্গিনীও সঙ্গ নিয়েছেন্। ঝি পলাতকা। সুতরাং বুঝতেই পারছ। তোমাকে লিখছি, কারণ তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই লেখবার নেই। কেউ ঠিক বুঝবেও না। সময় নষ্ট ক'রে তোমাকে আসতে বলছি না, কিন্তু যখন হয় একবার এসো ভাই। এটি

আমার বড় ছেলে। যদি অসম্ভব না হয়, এর হাতে, এক টাকা না পার, গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিও অন্তত। কাল থেকে সকলের অনাহার চলছে।

পত্রপাঠান্তে শঙ্কর বালকের দিকে চাহিল। ফরসা রঙ, শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মলিন বেশবাস। পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া দেখিল, একটি মাত্র টাকাই আছে।— এই নাও। বাবাকে ব'লো, একটু পরেই যাচ্ছি আমি।

বালক চলিয়া গেল। প্রুফটা শেষ করিয়া শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। চণ্ডীচরণবাবুর নিকট গিয়া বলিল, গোটা দশেক টাকা আমার এখনই চাই।

চণ্ডীচরণ বিনাবাক্যব্যয়ে শঙ্করের নামে খরচ লিখিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল যে, সে আপিসের নিকট হইতে প্রায় দেড় শত টাকার উপর ধার করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি একটু বেরুচ্ছি, বুঝলেন? ছবির খুব অসুখ।

চণ্ডীচরণবাবু চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, 'হাঁ' 'না' কোনও জবাব দিলেন না শঙ্করের মনে হইল, চণ্ডীবাবুর কাছে সে বৃথা জবাবদিহি করিতে গেল কেন? নিজের উপরই এজন্য সে চটিয়া গেল এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং যেমন তাহার স্বভাব অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতে লাগিল। সহসা বেথুন কলেজের গেটের সম্মুখে চুন্‌চুনের সহিত দেখা। চুন্‌চুন ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শঙ্করকে দেখিয়া চুন্‌চুন মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল, একটি অতি ক্ষীণ মৃদু হাস্যরেখা অধরপ্রান্তে ফুটিল কি ফুটিল না বোঝাও গেল না! শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। না দাঁড়াইয়া উপায় ছিল না, কিন্তু কি বলিবে, সহসা সে ভাবিয়া পাইল না। চুন্‌চুনই কথা কহিল।

অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। আজই ভাবছিলাম, আপনাকে ফোন করব। সন্ধ্যের দিকে আপনার কবে অবসর আছে বলুন তো?

কেন?

উনি বলছিলেন, একদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে।

আমার অবসর নেই।

চুন্‌চুন ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ঘাড়

ফিরাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পাশাপাশি নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শঙ্করের মনে হইল, দৃশ্যটা শোভন হইতেছে না। বেশিক্ষণ অবশ্য এভাবে থাকিতে হইবে না, অদূরে চুন্‌চুনের ট্রাম দেখা যাইতেছে।

বলিল, আচ্ছা, চলি তবে আমি।

আপনি মিছিমিছি রাগ ক'রে আছেন।

কি ক'রে বুঝলে, রাগ ক'রে আছি?

চুন্‌চুন চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্করও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল, তোমার মত মেয়ে যখন পীতাম্বরবাবুর মত লোককে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে, তখন রাগ হয় না, আশ্চর্য লাগে, একটু দুঃখও হয়।

আমার মতন সাধারণ একজন মেয়েকে আপনি অত বড় ক'রে দেখছেন কেন, বুঝতে পারছি না।

পীতাম্বরবাবুর কি আছে যে, তাকে বিয়ে করলে তুমি?

টাকা।

শঙ্কর ভাল করিয়া চুন্‌চুনের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। না, ব্যঙ্গ নয়, উহাই তাহার মনের কথা। অবাক হইয়া গেল।

টাকা! টাকার জন্যে তুমি বিয়ে করেছ?

শঙ্করের মুক্তোকে মনে পড়িল।

চুন্‌চুন উত্তর দিল না, সম্মুখেই দেওয়ালটার পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। শঙ্করের, কি জানি কেন, হঠাৎ যতীন হাজরার মুখটাও মনে পড়িয়া গেল, তাহার শেষ কথাগুলিও।

যতীনবাবুকে নিশ্চয় তুমি টাকার জন্যে বিয়ে কর নি?

টাকার জন্যেই করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমায় ঠকিয়েছিলেন, তাঁর সত্যি কিছু ছিল না।

টাকার জন্যেই বিয়ে করেছিলে তাঁকে?

মনে করুন, করেছিলাম; তাতেই বা লজ্জা পাবার কি আছে? টাকা না হ'লে সংসার চলে না, আর আমাদের মত মেয়ের—যার না আছে রূপ, না

আছে গুণ—বিয়ে করা ছাড়া ভদ্রভাবে টাকা সংগ্রহের আর কি উপায় আছে, বলুন ?

তোমার সম্বন্ধে ঠিক এ ধারণা ছিল না আমার।

কি ধারণা ছিল ?

আমার ধারণা ছিল, একটা উচ্চ আদর্শের জন্য তুমি অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করতে পার।

আদর্শ বজায় রাখবার মত সঙ্গতি নেই আমার। শুধু আমার কেন, অনেকেরই নেই। এই দেখুন না, আপনার মত লোককেও টাকার জন্যে তুচ্ছ একটা চাকরি করতে হচ্ছে। ও-কাজ কি আপনার উপযুক্ত ? কিন্তু উপায় কি বলুন, সংসারে টাকাটা দরকার যে।

ট্রাম আসিয়া পড়িল।

আমি যাচ্ছি। আসবেন একদিন।

ট্রাম চলিয়া গেল।

২১

শঙ্কর কিছুদিন পূর্বে 'হাতুড়ি' নাম দিয়া একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল। আধুনিক কাব্য হিসাবে পুস্তকটি অনেকের প্রশংসা লাভও করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সম্পর্কে ডাক্তার মুখার্জির একটি পত্র আসিয়াছে, শঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহা পড়িতেছিল।

শঙ্কর,

বল্‌শেভিজ্‌ম্ নিয়ে কবিতা লিখে তুমিও আধুনিক হবার চেষ্টা করছ দেখে কষ্ট হ'ল। অনেকের কাছে বাহবা পেয়েছ নিশ্চয়। বাংলা দেশে সমঝদার জোটা একটা দুর্বিপাক। এই সমঝদারের গুঁতোয় সত্যেন্দ্র দত্ত 'বাঙালী পল্টন' আর শরৎ চাটুজ্জে বোধ হয় 'শেষপ্রশ্ন' লেখেন। রবীন্দ্রনাথও আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। তোমার লেখা যে সব জায়গায় খারাপ হয়েছে তা বলছি না, কিন্তু পপুলার এবং আধুনিক হবার 'আপ্রাণ' প্রয়াস রসিকের

নিকট হাস্যকর। নিন্দা শুনতে যদি ভালবাস, তবলা বাঁধা হবার আগে গান আরম্ভ ক'রে লম্বকর্ণ শ্রোতাদের তাক লাগাবার প্রবৃত্তি যদি কম থাকে তো তোমার উচিত আমার কাছে এসে খানিকক্ষণ হাতুড়ির ঠকঠক সহ্য করা। কারণ আমার বিশ্বাস, তোমার অন্য সমঝদারেরা একটু আধটু বেসুরে বিক্ষুব্ধ হন না এবং তুমিও সেই কুসংসর্গে প'ড়ে বেসুরে সুর-সাধনা আরম্ভ করেছ। কিন্তু এ আমি করছি কি ? না:—

চিঠিতে আর কাব্য সমালোচনা করব না। লিখতে লিখতে হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব হ'ল। শাস্ত্রের উপদেশ—এখন বনং ব্রজেৎ। বনে যেতে হয় নি, চারদিকে আপনা-আপনি বন গজিয়ে উঠল। কালো চুল সাদা হ'ল, সাদা দাঁত কালো হ'ল, স্বচ্ছ চোখের মণি ঝাপসা হয়ে এল ক্রমশ। যে পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসর কাটালুম, সে তার রূপ বদলে ফেললে। পুরনো যা ছিল তা আর হাতের কাছে নেই, নতুন যা এল তাকে চিনি না। সব বদলে গেল, বদলাল না শুধু 'সোহং দেবদত্ত'—এই জ্ঞান। তাই মাঝে মাঝে হঠাৎ বক্তৃতা ক'রে ফেলি। তারপর চমকে থেমে গিয়ে হাতড়ে দেখি, আশে-পাশে কেউ নেই। অতএব বক্তৃতা করব না। যদি কখনও দেখা হয়, আমার কথা বোঝাবার চেষ্টা করব। ইতি—

শুভার্থী

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়

২২

ছবির এবং ছবির স্ত্রীর টাইফয়েড হইয়াছে।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শঙ্কর একা জাগিয়া বসিয়া আছে। শঙ্কর ছাড়া ইহাদের দেখিবার কেহ নাই। শঙ্করই ডাক্তার ডাকিয়াছে, ঔষধপত্র আনিতেছে, বেশি বাড়াবাড়ি হইলে রাত্রি জাগিয়া সেবাও করিতেছে। সমস্ত খরচও তাহারই, ছবি কপর্দকহীন। ধার বাড়িতেছে। সেজন্য শঙ্কর ক্ষুব্ধ নয়, তাহার প্রধান ক্ষোভ—লিখিবার সময় পাইতেছে না। রাত্রিটুকুই

লিখিবার সময়। কিন্তু ছবিকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া যায় না। ছবির স্ত্রীও শয্যাগত। এ বাড়ির কেহই সুস্থ নয়। সাতটি সন্তান, কাহারও জ্বর, কাহারও সর্দি, কাহারও চোখ উঠিয়াছে, কাহারও সর্বাঙ্গে পাঁচড়া, একজনের হাঁপানি—অনাহারক্লিষ্ট রুক্ষ শীর্ণ সকলেই। দারিদ্র্যের ঠিক এই মূর্তি বড় করুণ। যাহারা সমাজে সোজাসুজি গরিব বলিয়া পরিচিত, তাহাদের দীনতা এমন মর্মান্তিক নয়। কারণ তাহা প্রত্যাশিত সরল দীনতা। ইহা শুধু দীনতা নয়, ইহা দীনতা এবং দীনতাকে অপটুভাবে ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়া অতিশয় করুণ। পচা জিনিসকে সুদৃশ্য আবরণ দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিলে যাহা হয়, ইহা তাহাই। তোশকের ছিটটি সুন্দর, সুরুচির পরিচয় দিতেছে, কিন্তু সেই সুরুচির মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া দ্বিতীয় তোশক প্রস্তুত করানো সম্ভবপর হয় নাই। এখন তাহা মলমূত্রে ভিজিয়া উঠিয়াছে ; বাড়িতে দ্বিতীয় তোশক নাই, মলিন অংশটুকু কাপড় চাপা দেওয়া আছে, মাছি ভনভন করিতেছে। এমনই সব জিনিসেই। যে কাপটি দিয়া ঔষধপত্র খাওয়ানো হইতেছে, তাহা এককালে সুদৃশ্য ছিল, কিন্তু এখন তাহা হাতলহীন, ফাটা, ফাটার ফাঁকে ময়লা জমিয়া আছে। স্ত্রীর হাতে চুড়ি ঝকমক করিতেছে, কিন্তু একটিও স্বর্ণের নহে, সমস্ত গিলটি-করা।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শঙ্কর একা বসিয়া ভাবিতেছিল। লেখকেরা কাগজ কলম লইয়াই যে সর্বদা লেখে তাহা নয়, তাহারা মনে মনেও লেখে, শঙ্করও একা বসিয়া মনে মনে লিখিতেছিল। নূতনতম এক কাব্য-নীহারিকা তাহার মনের আকাশে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছিল।

ছবি প্রলাপ বকিতে লাগিল—ব্রাউনিঙের কবিতা। অসুখে পড়িয়াও বেচারী কবিতা ভোলে নাই। সহসা শঙ্করের মনে হইল, এত সাহিত্যরস পান করিয়াও তাহার এই দুর্দশা কেন? সব দিক দিয়াই সে তো অমানুষ। মনে প্রশ্ন জাগিল, সাহিত্য দিয়া সত্যই কি কাহারও উপকার করা যায়? অন্ধকারে আলেয়ার পিছনে অথবা উষর মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া যাহারা পথ হারাইয়া ফেলে, সেও তাহাদেরই মত একটা মিথ্যা আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে না তো?

২৩

ইন্দু সামলাইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সারে নাই। ইন্দুর মুখেই ভন্টু শুনিল যে, এই সময়ে তাহার নাকি একটা কঠিন ফাঁড়াও আছে। ভন্টু আর স্থির থাকিতে পারিল না, করালীচরণের উদ্দেশ্যে বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। ঝামাপুকুরের গলিতে ঢুকিয়া সে দেখিতে পাইল, পানওয়ালীর দোকানটা খোলা নাই। খোলা থাকিলে সুবিধা হইত, তাহার নিকট হইতে করালীচরণের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। এতদিন পরে দেখা, বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলিলে চামূণ্ড হয়তো ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। যা 'লোক, কিছুই বলা যায় না। ভন্টুর সাংসারিক অবস্থা যখন মন্দ ছিল, তখন সে করালীচরণকে অতিশয় ভয় ও সমীহ করিয়া চলিত। এখনও অবশ্য তাহার মনের ঠিক সে ভাব নাই, তবুও করালীচরণের সম্মুখীন হইতে সে কেমন যেন ইতস্তত করিতেছিল। ইন্দুমতীর ফাঁড়ার খবরটা কর্ণগোচর না হইলে সে হয়তো আসিতই না।

সে ঢুকিতে ইতস্তত করিতেছিল, তাহার কারণ—সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। সে করালীচরণকে কথা দিয়াছিল যে, তাহার বাসার তত্ত্বাবধান করিবে; কিন্তু সে বহুকাল এদিকে আসে নাই। করালীচরণের কুড়িটা টাকাও তাহার কাছে আছে। আছে মানে—পাওনা আছে। সঙ্গে নাই।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া অবশেষে ভন্টু আগাইয়া গেল। দেখিল, দরজা বন্ধ। ঠেলিবামাত্রই কিন্তু খুলিয়া গেল।

কে ?

ভন্টু সবিস্ময়ে দেখিল, করালীচরণ টেবিলটাকে ঘরের এক কোণে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। বোতলের মুখে মোমবাতি জ্বলিতেছে, টেবিলের এক ধারে একগাদা বই স্তূপীকৃত করা আছে। করালীচরণ ঝুঁকিয়া কি যেন করিতেছিলেন, শব্দ পাইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছেন।

আমি ভন্টু।

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এক চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। চিবুকটা একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল।

ভন্টু? ভন্টু কে?

ভন্টু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাই নারায়ণ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, এগিয়ে আসুন না, মুখখানা দেখি একবার।

ভন্টু তাঁহার কথাগুলা ঠিক যেন বুঝিতে পারিতেছিল না।

তবু একটু আগাইয়া গেল।

ভন্টুর মুখের উপর এক চক্ষুর দৃষ্টি আরও ক্ষণকাল নিবদ্ধ রাখিয়া করালীচরণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শঙ্কা ও ক্রোধ যুগপৎ ঘনাইয়া উঠিল।

ও, আপনি। বসুন।

এইবার ভন্টু বুঝিতে পারিল, কেন সে করালীচরণের কথা বুঝিতে পারিতেছিল না। করালীচরণের দাঁত নাই, সমস্ত মুখটাই যেন তুবড়াইয়া গিয়াছে।

ভন্টু প্রশস্ত চৌকিটির এক ধারে উপবেশন করিল।

কিছু মনে করবেন না, নামটা আপনার মনে ছিল না। আপনি যদি শেক্‌স্‌পীয়ার, মিল্‌টন, ডার্‌বিন, ফ্যারাডে বা ওদের মত কেউ হতেন, তা হ'লে হয়তো থাকত।

একটু থামিয়া অস্ফুটকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, বাই নারায়ণ! বিড়বিড় করিয়া আরও খানিকটা কি বলিলেন, ভন্টু বুঝিতে পারিল না। সে মনে মনে স্বগতোক্তি করিল, চাম্‌লদ ভীম জালে ফেলবার অ্যারেঞ্জ্‌মেণ্ট করছে দেখছি।

প্রকাশ্যে বলিল, আমার নতুন বাসার ঠিকানা পানউলী জানত। আপনি যদি একটু খবর—

আমি যখন এলাম, তখন ঠিকানা বলবার মত অবস্থা ছিল না পানউলীর।

:স তখন বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছিল এই চৌকিতে প'ড়ে প'ড়ে। মুখে এক ফোঁটা জল দেবার লোক ছিল না কাছে।

করালীচরণ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ভন্টু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। করালী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আবার বলিয়া উঠিলেন, বেশ হয়েছে, বেশ্যা মাগীর কাছে আসবে কে ?

চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল। এক চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি পুনরায় তিনি ভন্টুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন। ভন্টুর মনে হইল, যেন তাহার কপালে কেহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিতেছে।

ভন্টু বিস্ময় প্রকাশের ভান করিয়া বলিল, পানউলীর কাছে' কেউ ছিল না ?

বিব্রত ভাবটা সামলাইয়া লইয়া কোনক্রমে প্রশ্নটা করিল।

মোস্তাক ছিল, কিন্তু মোস্তাক তখন একপাল কুকুরবাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত।

চৌকির অপর প্রান্তে পুঞ্জীভূত অন্ধকারটা হঠাৎ নড়িয়া উঠিল।

না না, তুমি ঘুমোও, তোমার কোনও দোষ দিচ্ছি না। তুমি ঠিকই করেছিলে। একটা মর-মর বুড়ী বেশ্যার মুখে দু ফোঁটা জল দেওয়ার চেয়ে কচি কচি কুকুরবাচ্চা ঘাঁটা ঢের বেশি আর্টিস্টিক। তুমি একজন আর্টিস্ট। ঘুমোও তুমি, উঠো না।

মোস্তাক গুটি মারিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, উঠিল না।

ভন্টু চুপ করিয়াই রহিল, এই পরিবর্তিত করালীচরণ বক্সিকে কোনও কথা বলিতে তাহার সাহসেই কুলাইতেছিল না। অথচ একদিন ইহার সহিত তাহার কত হৃদ্যতাই ছিল! অনেকদিন আগেকার একটা ছবি ভন্টুর মনে পড়িল। নৈহাটি স্টেশনে বসন্তরোগাক্রান্ত ভিড়-পরিবৃত অসহায় করালীচরণের ছবিটা। কত অসহায়! ভন্টুই দয়াপরবশ হইয়া সেদিন তাহাকে তুলিয়া আনিয়া হাসপাতালে দিয়া আসিয়াছিল। অথচ ইহারই সহিত এখন কথা কহিতে সাহসে কুলাইতেছে না। তাহার মনে হইতে লাগিল, চেহারা বদলাইয়া গেলে মানুষটাই বদলাইয়া যায় হয়তো। যাহার

গোঁফদাড়ি ছিল না, সে যদি বহুকাল পরে একমুখ গোঁফদাড়ি লইয়া হাজির হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত পূর্বেকার সহজ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে। করালীচরণের দন্তহীন তোবড়ানো মুখের পানে চাহিয়া ভন্টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

করালীচরণই কথা কহিলেন, আচ্ছা, ভন্টুবাবু, কল্পনা ব'লে কোনও বালাই আছে আপনার মধ্যে?

আজ্ঞে?

আপনি কল্পনা করতে পারেন?

একটু একটু পারি হয়তো।

পারেন? কল্পনা করতে পারেন, একটা কঙ্কালসার কদাকার বুড়ী বেশ্যা অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরছে, তার মৃত্যু-সময়ে মুখে এক ফোঁটা জল দেবার লোক কেউ কাছে নেই? কদাকার মুখ ভাল ক'রে দেখেছেন কখনও? গালের হাড় উঁচু, কপালের শিরা বার-করা, বড় বড় দাঁত, তাতে আবার মিশি লাগানো—

করালীচরণ হয়তো বর্ণনাটা আরও ফলাও করিয়া করিতেন, কিন্তু কুঁই-কুঁই করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইল। মোস্তাক তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং নিঃশব্দে ঘরের কোণে আলমারির পাশটায় গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোনদিকে না চাহিয়া ক্রন্দমান বাচ্চাগুলিকে বগলদাবা করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মা-টা আবার বোধ হয় পালিয়েছে। বাই নারায়ণ!

করালীচরণের চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল।

ভন্টু ভাবিতেছিল, কোনও ছুতায় এই ভীম জাল ছিন্ন করিয়া এইবার পলায়ন করা উচিত। কোষ্ঠিগণনা করাইবার আশা সে বহুপূর্বেই বিসর্জন দিয়াছিল। আর একদিন আসা যাইবে। আজ চামুণ্ড বিরক্তি-মাউণ্টেনের তুঙ্গে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছে।

হঠাৎ কর্কশকণ্ঠে করালীচরণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, দেখেছেন কখনও

াকার মুখ? শুধু কদাকার নয়, তৃষিত, মুমূর্ষু, যে তার কুৎসিত হাসি ও
র্য কটাক্ষ দিয়ে আজীবন লোক ভোলাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু
জনকেও ভোলাতে পারে নি, একটা লোকও তার আপন হয় নি, তার
্যকালে কেউ কাছে আসে নি—দেখেছেন এ রকম কখনও?

মানে, অবশ্য তাকে—

মিছে কথা বলবেন না, আমি জানি আপনি দেখেন নি, আমিও দেখি নি। খ থাকলেই দেখা যায় না, চোখের সামনে থাকলেও না।

পানউলীর কথা বলছেন তো?

ঠিক ধরেছেন। তা হ'লে শুধু আমার চোখে নয়, আপনার চোখেও কুচ্ছিৎ ছিল। বাই নারায়ণ, পৃথিবীতে কেউ ভাল চোখেও দেখত মাগীকে।

মরিচা-ধরা একটা টিনের কৌটা খুলিয়া করালীচরণ একটি আধপোড়া ড়ি বাহির করিলেন এবং সেটি মোমবাতির শিখায় ধরাইয়া লইয়া নীরবে নিতে লাগিলেন। তাহার পর সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ভালই ল, চ'লে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

ঠিক করি নি এখনও।

কবে যাবেন?

তাও ঠিক করি নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

করালীচরণই পুনরায় কথা কহিলেন, আজ হঠাৎ এলেন যে, কোনও কার ছিল নিশ্চয়?

একটি কুষ্ঠি দেখাতে এনেছিলাম।

গণনা করা আজকাল ছেড়ে দিয়েছি। ও-শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই। জ্যাতিষশাস্ত্রের ব্যর্থতা' নাম দিয়ে একখানা বই লিখছি, এই দেখুন।

একটা খাতা তুলিয়া দেখাইলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস নেই?

না।

করালীচরণের চক্ষুটা দপদপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আপনি দ্রাবিড় থেকে ফিরলেন কবে ?

করালীচরণ গুম হইয়া রহিলেন।

হাত দেখে জন্মতারিখ বার করতে পারে, এ রকম জ্যোতিষী কলকাতা বেশি নেই। আপনি যদি—

চুপ করুন।

অপ্রত্যাশিত ধমক খাইয়া ভন্টু থামিয়া গেল।

করালীচরণ বলিয়া উঠিলেন, কুষ্ঠি-ফুষ্ঠি দেখে কচু হয়। ওসব ছিঁড়ে কুচিকুচি ক'রে নর্দমায় ফেলে দিন গে যান। সব মিথ্যে, বাজে, রাবিশ—

করালীচরণ প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। টেবিলের বইগুলি দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতে দিতে রুদ্ধ আক্রোশে তর্জন করিতে লাগিলেন, মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যের স্তূপ সব, জঞ্জাল—

ভন্টু ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

কি করছেন আপনি, বকসি মশাই ?

বকবক করবেন না, বাড়ি যান।

ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে ?

একটি কথা শুধু জানতে চাই, যদি দয়া ক'রে বলেন।

না, বলব না।

তাহার পর কি মনে করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কি বলুন ?

জ্যোতিষশাস্ত্রে আপনার অবিশ্বাস হ'ল কেন ?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আবার কেন আছে নাকি ?

না, এতদিন যাতে আপনার অগাধ বিশ্বাস ছিল, যা আরও ভাল ক'রে শেখবার জন্যে আপনি দ্রাবিড় গেলেন, আজ হঠাৎ—

করালীচরণ বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন।

বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি।

করালীচরণের চোখ-মুখ এমন হইয়া উঠিল যে, ভন্‌টু আর ঘরের ভিতর থাকা সমীচীন মনে করিল না, সভয়ে বাহির হইয়া গেল। করালীচরণ দড়াম করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভন্‌টু বাহিরে আসিয়া দেখিল, মোস্তাক একটা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে একটা কালো কুকুরীকে জোর করিয়া চাপিয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছে, বাচ্চাগুলি মহানন্দে স্তন্যপান করিতেছে। ভন্‌টু ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার পর বাইকে চড়িয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। অপমানে তাহার কানের দুই পাশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। করালী যে তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারেন, ইহা তাহার ধারণাতীত ছিল।

কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া করালীচরণ দ্বারে কান লাগাইয়া রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাগ নয়, তাঁহার ভয় হইতেছিল। ভন্‌টু হয়তো যাইবে না, এখনই হয়তো ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নিগূঢ় রহস্যটি জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইবে। কিছুতেই তিনি হয়তো বাধা দিতে পারিবেন না। দ্রাবিড়ে গিয়া করকোষ্ঠী হইতে নিজের জন্ম-চরিত্র উদ্ধার করিয়া তিনি নিঃসংশয়রূপে জানিয়াছেন যে, তাঁহার মা বেশ্যা ছিলেন। এই নিদারুণ কথা পৃথিবীতে আর কেহ জানিবে না। না, আর দেরি করা নয়, এখনই কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। এখনই হয়তো ভন্‌টুবাবু একদল চেনা লোক লইয়া হাজির হইবে। ভন্‌টুকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহার নাম মোটেই তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহারই আগমন-আশঙ্কায় অতি ভয়ে ভয়ে দিনপাত করিতেছিলেন। বাড়িটা বিক্রয় করিবার জন্যই কলিকাতায় আসা। নিদারুণ অর্থাভাব ঘটিয়াছে। সে ব্যাপার তো আজ চুকিয়া গেল। আর দেরি করিয়া কি হইবে? করালীচরণ হাতের কাছে যাহা পাইলেন, একটা পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, মোস্তাকও চলিয়া গিয়াছে। তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন এবং প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন।

এই ট্যাক্সি!

ছুটন্ত ট্যাক্সিটা থামিতেই করালীচরণ তাহাতে চড়িয়া বলিলেন, হাওড়া, জল্‌দি।

হাওড়ায় পৌঁছিয়া দেখিলেন, একখানা ট্রেন ছাড়িতেছে। বিনা টিকিটেই তাহাতে তিনি চড়িয়া বসিলেন।

২৪

দিনকয়েক পরে ভন্টুর মনে পড়িয়া গেল, শঙ্করের বাবার উইলটা তো করালীচরণের কাছে আছে। শঙ্করকে খবর দিয়া উইলটা অবিলম্বে উদ্ধার করিয়া আনা প্রয়োজন। তাহার নিজের আর করালীচরণের বাসায় যাইতে সাহস হইতেছিল না, প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। লোকটার উপর সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকটা বিদ্বান হইতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অভদ্র। ভন্টু এখন আর সে ভন্টু নাই। আপিসে তাহার পদোন্নতি হইয়াছে, নিম্নতন অনেক কেরানী তাহাকে দুই বেলা ঝুঁকিয়া নমস্কার করে। যেখানে সেখানে যখন-তখন আগেকার মত অদ্ভুত বাক্যাবলী উচ্চারণ করিয়া সে আর ভাঁড়ামি করে না। তাহার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হাজার হোক সে একটা ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু, জুলফিদার-কন্যা ইন্দুমতীর স্বামী। করালীচরণের সেদিনকার অপমানটা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। উইলটা কিন্তু উদ্ধার করিতে হইবে যেমন করিয়া হোক। শঙ্করকে অন্তত খবরটা দেওয়া দরকার। ইন্দুর জন্য এক বাক্স ওভাল্‌টিন-বিস্কুটও কিনিয়া আনা দরকার। ভন্টু বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

শঙ্করের বাড়ির দরজায় নামিয়া ভন্টু খানিকক্ষণ বাইকের ঘণ্টা বাজাইল। শুধু ভন্টু নয়, অনেকেরই ধারণা, বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া বাইকের ঘণ্টা বা মোটরের হর্ন বাজাইলেই বাড়ির ভিতর হইতে লোকজন ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে; ডাকিবার প্রয়োজন নাই। অনেকে বাহির হইয়া আসেও। শঙ্কর আসিল না, কারণ শঙ্কর বাড়িতে ছিল না। ভন্টুকে অবশেষে বাইকটা দেওয়ালে ঠেসাইয়া বারান্দার উপর উঠিয়া কড়া নাড়িতে হইল। অগত্যা

দ্বিতল হইতে জানালা ফাঁক করিয়া দেখিল এবং নিত্যানন্দকে মৃদুকণ্ঠে বলিল, ভন্টুবাবু এসেছেন।

নিত্যানন্দ কয়েকদিন হইতে শঙ্করের বাসায় আসিয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর চাঁবর বাসা হইতে ফেরে নাই।

দাদা বাড়ি নেই।—নিত্যানন্দই গলা বাড়াইয়া বলিল।

কোথা গেছে, কখন ফিরবে?

ঠিক জানি না। যদি কিছু বলবার থাকে, ব'লে যান।

সে অপরকে বললে চলবে না, তাকেই বলতে হবে। আচ্ছা, আমি পরে আসব।

ভন্টু চলিয়া গেল।

নিত্যানন্দ অমিয়াকে বলিল, কি যে একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে দাদা সময় নষ্ট করছেন! ক্রমাগত লোক এসে ফিরে যাচ্ছে।

অমিয়া শুধু একটু হাসিল।

কিছু ভাল লাগছে না, একটু চা কর দিকি বউদি।

করি।

ওভালটিন্-বিস্কুট কিনিয়া ভন্টুর মনে হইল, ঝামাপুকুরটা একবার ঘুরিয়া গেলে হয়। ভিতরে না ঢুকিলেই হইল, বাহির হইতে চাম্‌লদের হালচালটা দেখিয়া যাইতে ক্ষতি কি? করালীচরণের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া কিন্তু ভন্টুকে বাইক হইতে নামিতে হইল—বাড়িতে তালা বন্ধ, সম্মুখে "টু লেট" ঝুলিতেছে। মোড়ের পানের দোকানটা খোলা আছে বটে, কিন্তু সেখানে পানউলী নাই—ছোকরা-গোছের আর একজন বসিয়া পান বেচিতেছে। তাহারই নিকট ভন্টু সংবাদ পাইল, দোকানটা পানউলীর নিজস্ব ছিল না, অপরের দোকানে সে চাকুরি করিত। কিছুদিন পূর্বে অসুখ হওয়াতে দোকানের মালিক তাহাকে ছাড়াইয়া দেয়। তখন পানউলী করালীচরণের বাসাতেই আশ্রয় লইয়াছিল। করালীচরণ যেদিন আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই দিনই তাহার মৃত্যু হয়। করালীচরণ-প্রসঙ্গে ছোকরাটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অমন লোক হয় না বাবু, বুঝলেন, কি ধুমধাম ক'রে ছাদ্দটা করলে পানউলীর! লোকজন কাঙাল গরিব কত যে খাওয়ালে! পানউলী ম'রে যাওয়াতে হাউহাউ ক'রে সে কি কান্না মশাই, যেন আপনার লোক মরেছে কেউ, নিজে কাঁধে ক'রে নিয়ে গেল,—লোক ছিল বটে।

তাহার নিকটই ভন্টু শুনিল, করালীচরণ বাড়ি বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না।

২৫

ছবির শ্বাস উঠিয়াছে। পাশের ঘরে তাহার স্ত্রী কাদম্বিনীও অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছে। ছবির শিয়রে শঙ্কর জাগিয়া বসিয়া আছে, কাদম্বিনীর কাছে আছেন তাহার বৃদ্ধ পিতা হরিনাথবাবু। ছেলেমেয়েদের অন্য একটি বাসায় সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবির শ্বশুর হরিনাথবাবু কলিকাতার বাহিরে থাকেন, ইহাদের অসুখের সংবাদ শুনিয়া সপরিবারে আসিয়া অন্য একটি বাসায় উঠিয়াছেন। ছবির ছেলেমেয়েরা সেই বাসায় গিয়াছে। হরিনাথবাবু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। আবক্ষ পাকা দাড়ি, কম কথা বলেন, উচিত কথা বলেন এবং যেটুকু বলেন বেশ গুছাইয়া বলেন। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস হয় না। হোমিওপ্যাথিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, সুতরাং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছে। শঙ্করের বার বার মনে হইতেছিল যে, বোধ হয় দারিদ্র্যের জন্যই হরিনাথবাবু অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিলেন—সে নিজে প্রয়োজন হইলে টাকা দিতে প্রস্তুতও ছিল, কিন্তু স্বল্পভাষ এবং মুখভাবে একটা নিষ্ঠার দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কর জোর করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। তাঁহার মতেই মত দিতে হইয়াছে। হরিনাথবাবুই ছবির আপন লোক, শঙ্কর ছবির কে? শঙ্কর এ কয়দিন বাড়ি যায় নাই, দিবারাত্রি কেবল ছবিকে লইয়াই আছে। তাহার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছে, এ বিপদে ছবিকে ফেলিয়া যাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। ছবির যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, শঙ্করের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল। তাহার শ্বশুর আসিয়াছে—এই অজুহাতে অজ্ঞা

এখন তাই তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না। বিনা বেতনে মন একজন সহৃদয় একনিষ্ঠ নার্স পাইয়া হরিনাথবাবুও অনেকটা নিশ্চিন্ত ইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম হরিনাথবাবুর সহিত ব্রাহ্ম নিলয়কুমারের ধর্মগত যাগাযোগ থাকাতে আপিসের ছুটিও সহজেই মিলিয়াছিল।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। মুমূর্ষু ছবির শিয়রে বসিয়া বসিয়া শঙ্কর ছবির কথাই গবিতেছিল। ভাবিতেছিল, ছবির সহিত তাহার পরিচয় কতটুকু? তাহার বজীবনের কতটুকু সে জানে, উত্তর-জীবনের কতটুকু বা জানিবে? ছবির াহিত্যপ্রীতি আছে, তাহারও আছে। পরিচয়ের সূত্র মাত্র এইটুকু। মনে াড়িল, ছবির সহিত তাহার দেখাও খুব যে ঘন ঘন হইত তাহা নহে,.কচিৎ কখনও হইত। মাঝে মাঝে আসিয়া টাকা ধার চাহিত, হয়তো বা কখনও কোন দিন মদ খাইয়া ঈষৎ মত্ত অবস্থায় আসিত, শেলী কীট্‌স ব্রাউনিং রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিতে করিতে উত্তেজনার আবেগে টেবিল চেয়ার উলটাইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া অস্থির করিয়া তুলিত, কখনও বা নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সংসারের নিত্য-উদীয়মান অভাবের তালিকা দেখাইয়া পরামর্শ চাহিত এবং পর-মুহূর্তেই আবার নিম্নকণ্ঠে জানাইত যে, রামবাগানে একটি মেয়ের গান শুনিয়া সে তাহার প্রেমে পড়িয়াছে—মাইরি বলছি, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল গানের জন্যে। তাহার মনের শিল্পবোধ ছিল, সৌন্দর্যের প্রতি পিপাসা ছিল এবং সেইজন্যই বোধ হয় তাহাকে এত ভাল লাগিত। শুধু তাই কি? সুখদুঃখনিষ্পিষ্ট মানুষটাকেও কি কম ভাল লাগিত! ছবির অতীত জীবনের যে ঘটনাগুলির খবর শঙ্কর জানিত, ছায়াছবির মত সেগুলি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। খামখেয়ালী দুশ্চরিত্র মাতালটার এইবার শ্বাস উঠিয়াছে। আর কিছুক্ষণ পরেই সব শেষ হইয়া যাইবে। লোকটা সাহিত্যিক ছিল! পরাধীন দেশের শৌখিন সাহিত্যিক! কবিতা আওড়াইত, মদ খাইত, প্রেমে পড়িত! আস্পর্ধা কম নয়।

সহসা শঙ্করের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এ কি অকালমৃত্যু! প্রতিভার এ কি শোচনীয় অপচয়! এই ছবি কি না হইতে পারিত!...শ্বাস উঠিয়াছে। কি কষ্ট, কি নিদারুণ কষ্ট! শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সমস্ত পেশীগুলি

প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, চতুর্দিকে বাতাসের অভাব নাই, কিন্তু তাহার ব্যায়ত, আনন, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, নীল ওষ্ঠাধর, ঘর্মাক্ত কলেবর, আর্ত ম্লানায়মান দৃষ্টি যেন সমস্বরে বলিতেছে—পাইলাম না, পাইলাম না, আকাশ-ভরা এত বাতাস, আমি কিন্তু এতটুকু পাইলাম না।

কপাট ঠেলিয়া পাশের ঘর হইতে হরিনাথবাবু আসিলেন, আসিয়া সন্তর্পণে কপাটটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

কি রকম বুঝছেন ?

যাহা বুঝিতেছিল, তাহা কি ব্যক্ত করা যায় ? শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হরিনাথবাবু ক্ষণকাল ছবির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে যখন তিনি প্রবেশ করিলেন, শঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার হাতে পিতলের তৈয়ারি প্রকাণ্ড ভারী 'ওঁ'।

ওটা কি হবে ?

ওটা ওর বুকের ওপর রেখে দেব। আমরা আর কি করতে পারি বলুন—সবই তাঁর ইচ্ছা।

একে বেচারার এই শ্বাসকষ্ট, তাহার উপর বুকে এই ভারী জিনিসটা চাপাইয়া দিতে হইবে! কিন্তু সে বাধা দিতে পারিল না, বরং তাড়াতাড়ি বুকের চাদরটা সরাইয়া দিল। হরিনাথবাবু বুকের উপর পিতলনির্মিত 'ওঁ'টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন এবং বাহির হইতে সন্তর্পণে কপাটটি ভেজাইয়া দিলেন।

২৬

নিপু আসিয়াছিল। কয়েক দিন পূর্বে আসিয়া সে শঙ্করকে স্বরচিত একখানি উপন্যাস দিয়া গিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গেই কথা হইতেছিল। নিপুই বক্তা।

নিপু বলিতেছিল, আমি চাই না যে, তুমি আমার লেখাটার প্রশংসা কর। প্রশংসা পেতে ইচ্ছে করলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাই আমি পেতে পারতাম।

গবু সেবার যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল, তখন সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল লেখাটা, অবশ্য আমার অজ্ঞাতসারে—

গবু কে ?

গবুকে চেন না ! ওরাই তো কামিং লাইট ! 'মজদুর-দর্পণ' ব'লে একখানা কাগজও করেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—রবিবাবু এর গোড়ার দিকটা শুনেছিলেন, ভালই বলেছিলেন শুনলাম। ইচ্ছে করলে তাঁর প্রশংসা পেতে পারতাম, কিন্তু ওসবে রুচি নেই আমার। তোমাকেও প্রশংসার জন্যে ই নি, আমি এটা তোমাকে দিয়েছি নূতন যুগের নূতন সাহিত্যের নমুনা হিসেবে। আমি উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছি, নূতন যুগের নূতন সাহিত্যের রূপ কি—মানে নবতম রূপ কি—হয়তো হঠাৎ বেখাপ্পা বেসুরো মনে হবে তোমার—আমি জিনিসটা দেখাতে পেরেছি কি না, তাও জানি না। ভাল ক'রে প'ড়ে তবে সমালোচনা ক'রো। মাঝখানটায় একটু হয়তো জটিল ব'লে মনে হবে—মার্ক্সিজ্‌ম সোজা জিনিস নয়। কত দূর পড়েছ ?

সবটা পড়ি নি এখনও।

শঙ্কর মিথ্যে কথা বলিয়া ফেলিল।

না না, তাড়াতাড়ি পড়বার দরকার নেই, আমি এত তাড়াতাড়ি ছাপাতামও না—বঙ্গদেশের সাহিত্য-সমাজে স্থান পাবার লোভ আমার মোটে নেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে স্থান হয়ে গেল দেখছি। বিশ্বেশ্বরবাবুকে পড়তে দিয়েছিলাম, তাঁর প্রেস আছে, তিনি একরকম জোর ক'রেই ছাপিয়ে ফেললেন। ছাপার ভুলও বিস্তর থেকে গেছে—এ দেশের যেমন পাঠকসমাজ, তেমনই ছাপাখানা—

ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া তিক্ত হাসি হাসিতে হাসিতে নিপুর কথা বলার একটা বিশেষ ধরন আছে। কথা শোনারও বৈশিষ্ট্য আছে তাহার। অপরে যখন কথা বলে, তখন সে মুখে একটা হাসি ফুটাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া থাকে, বক্তার দিকে নয়। শঙ্কর একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নিপুর চোখের দৃষ্টিতে খ্যাতিলোলুপতা এবং তাহা গোপন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস। গায়ে

আধ-ময়লা টুইলের শার্ট, পায়ে বার্নিশহীন গ্রীসিয়ান স্লিপার, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখময় ব্রণ ও মুখভাবে বুভুক্ষার চিহ্ন। বেরসিক অশিক্ষিত জনতার প্রতি অসীম অবজ্ঞার ভান, অথচ বই ছাপাইয়া তাহাদেরই দ্বারস্থ হইবার আকুল আগ্রহ। দ্বারস্থ হইয়াও নিজের স্পর্ধিত গর্বটাকে আস্ফালন করিবার হাস্যকর আড়ম্বর! সবই মানাইয়া যাইত, যদি প্রতিভা থাকিত। কিন্তু হায় হায়, সেই বস্তুটিরই একান্ত অভাব। তাই কেবল নানা কৌশলে, নানা ছুতায়, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বত্র হুল ফুটাইয়া কালি ছিটাইয়া, সকলকে ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া পরোক্ষে অপরোক্ষে নিজের নকল নূতনত্বের ঢাকটা পিটাইবার এই অদম্য অভিযান! কিন্তু ঢাকটাও ফাটা, বীভৎস বিকট আওয়াজ বাহির হইতেছে। সুর যে জমিতেছে না তাহা ইহারা জানে, তাই ইহাদের বুলি—আমরা বেসুরের সাধক, আমরা বিদ্রোহী, আমরা উল্টা কথা বলি, আমাদের এই নূতন ঢঙের অভিনব মর্যাদা, পুরাতনপন্থী তোমরা বুঝিবে না। কিন্তু ইহা যে ইহাদের আসর-জমানো মৌখিক বুলি-মাত্র, মনের কথা নয়, তাহার প্রমাণ ইহারা বই লিখিয়া সর্বাগ্রে সেটি পুরাতনপন্থীদেরই হাতে তুলিয়া দেয় এবং তাহাদের প্রশংসাবাক্য শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

এ শ্রেণীর অনেক লেখকের সম্পর্কে শঙ্করকে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সমঝদার হিরণদার বন্ধু নিপুদাও যে এই দলের, তাহা শঙ্কর জানিত না, কল্পনাও করে নাই। নিপুদার সাহিত্যিক বুদ্ধির প্রতি তাহার আস্থা ছিল। তাহার ধারণা ছিল, নিপুদা গোপনে গোপনে একটা বিরাট কিছুর সাধনা করিতেছেন। অন্ধকারে তাঁহার তপস্যা চলিতেছে বাংলা ভাষার ইতিহাস অথবা অভিধান অথবা ওই জাতীয় কিছু একটা সুসম্পন্ন করিয়া তিনি একদিন তাক লাগাইয়া দিবেন। নিপুদা যে শেষে এই কমিউনিস্টিক কসরৎ দেখাইবেন, তাহা শঙ্কর প্রত্যাশা করে নাই। কমিউনিজ্‌ম লইয়া প্রবন্ধ সহ্য হয়, কাল্পনিক কাব্যও হয়তো চলিতে পারে, কিন্তু রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থাকে ভারতবর্ষের, বিশেষত বঙ্গদেশের বাস্তব জীবন মনে করিয়া উপন্যাস অসহ্য। যেন কতকগুলি বল্‌শেভিক মতবা

মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে এবং অবশেষে মার্ক্স-লেনিনের জয়গান করিয়া ক্যাপিটালিজ্‌মকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে। নিপুদার উপন্যাসে মহারাজা মেথর সব সমান। মন্দির মসজিদ কিছু নাই, চতুর্দিকে কেবল জনগণ-পরিচালিত অসংখ্য ফ্যাক্টরি। সিনেমা এবং লাউড-স্পীকারে এন্‌তার শিক্ষা বিতরণ চলিতেছে। লাঙলের বদলে ট্র্যাক্‌টার, ধর্মের বদলে কর্ম, বিবাহের বদলে প্রেম এবং সন্তান। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিংশ শতাব্দীর রামহীন রামরাজত্ব শুরু হইয়া গিয়াছে! যে আদর্শ নিপুদা খাড়া করিয়াছেন, তাহা নিন্দনীয় নয়, কারণ সে আদর্শ মার্ক্স-লেনিনের প্রতিভায় প্রদীপ্ত। নিপুদার তাহাতে কোনও কৃতিত্ব নাই। নিপুদার যাহা নিজস্ব কৃতিত্ব—এই জগদ্দল উপন্যাসখানি—তাহা একেবারে রাবিশ। তাহার একটি চরিত্র জীবন্ত নয়, তাহাতে এতটুকু কবিত্ব নাই, জীবনদর্শন নাই, কল্পনার প্রসার নাই। আছে কেবল বল্‌শেভিজ্‌ম।

সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার, শঙ্করকে ইহার প্রশংসা করিতে হইবে। যে 'ক্ষত্রিয়' কাগজের আদর্শ ছিল অ-সাহিত্যকে তাড়না করা, সেই 'ক্ষত্রিয়' কাগজেরই পৃষ্ঠায় ইহার প্রশংসা করিতে হইবে। উপায় নাই। হিরণদার বন্ধু নিপুদা। তাহার সম্বন্ধে সত্য কথা বলা চলিবে না। বলিলেও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে হইবে। তিক্ত সত্যটাকে প্রশংসার মিষ্ট প্রলেপে ঢাকিয়া দিতে হইবে।

২৭

নীরা বসাক ও তাহার বান্ধবী কুন্তলা মুখোপাধ্যায় হাস্যপরিহাসসহকারে যে আলাপে ব্যাপৃত ছিল, তাহাকে ঠিক সাহিত্যালাপ বলা যায় না, যদিও আলাপের মূল বিষয় একজন উদীয়মান সাহিত্যিক—শঙ্করসেবক রায়।

নীরার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত, কুন্তলা গম্ভীর।

সেদিন সামান্য একটু প্রশংসা করবামাত্র লোকটা এমন গদগদ হয়ে পড়ল যে, মনে হ'ল, সার্টিফিকেট কেন, লোকটাকে দিয়ে ঘানি পর্যন্ত টানিয়ে

নেওয়া যায়। তার ওই ট্র্যাশ বইখানার এমন বাগিয়ে প্রশংসা করেছিলাম আমি য়ে, আমার নিজেরই তাক লেগে গিয়েছিল।

সার্টিফিকেট যোগাড় করেছিস ?

প্রথম দিনই কি সার্টিফিকেট চাওয়া যায় ? জমিটা তৈরি ক'রে রেখেছি, এইবার বীজ ছড়ালেই গাছ গজাবে।

নীরা বসাকের চোখ-মুখ পুনরায় হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কুন্তলা বলিল, আমার কিন্তু লোকটিকে অত বোকা ব'লে মনে হয় না। তা ছাড়া, এও আমার মনে হয় না যে, সত্যি সত্যি তুমি ওর লেখাকে ট্র্যাশ ব'লে মনে কর।

কি তোমার মনে হয় শুনে ?

আমার মনে হয়, শঙ্করবাবুর লেখা সত্যি সত্যি তোমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু যেহেতু আমার ভাল লাগে না এবং যেহেতু কুমার পলাশকান্তি আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতা প্রকাশ করছেন, সেই হেতু তুমি আমার মন রেখে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথাগুলো বলছ।

নীরা বসাকের সমস্ত মুখ ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল, আচ্ছা, কি তুই কুন্ত !

কুন্তলার গাম্ভীর্য এতটুকু বিচলিত হইল না। সে বাতায়ন-পথে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একফালি রোদ বাঁ গালে পড়িয়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে—টানা টানা চোখ দুইটি যেন আবেশবিহ্বল হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। এই অপরূপ সৌন্দর্যের পানে চাহিয়া চাহিয়া নীরা বসাকের সমস্ত অন্তঃকরণ সহসা যেন বিষাইয়া উঠিল। এ মেয়েটার সহিত কিছুতেই পারা গেল না। স্কুলে কলেজে এতদিন একসঙ্গে কাটিল, কিছুতেই কোনও বিষয়ে ইহাকে আঁটিয়া উঠা গেল না। কুন্তলা যদি অহঙ্কারী হইত, তাহা হইলে সেই ছুতায় ইহার সহিত মনোমালিন্য করা চলিত। কিন্তু সে মোটেই অহঙ্কারী নয়। রূপে গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, বংশগরিমায়—সর্ববিষয়ে সে অনেক বড়, অথচ তাহার নীচতা নাই, আত্মম্ভরিতা নাই, আস্ফালন নাই। আর নীরু

বসাক ? তাহার রূপ নাই, গুণ নাই অর্থও নাই। অর্থাভাবেই তাহার এম.এ. পড়াটা হইল না, অথচ কুন্তলা স্বচ্ছন্দে এম.এ. পড়িতেছে। কুন্তলার প্রেমের জন্য কুমার পলাশকান্তির মত লোক উন্মুখ, আর সে অনিল সান্ন্যালকেও ভুলাইতে পারিতেছে না। তাহার সমস্ত চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি চললাম। কুমার পলাশকান্তিকে তোমার কিছু বলবার দরকার নেই।

আমি বলেছি। কিন্তু আমার বলায় তোমার অনিলবাবুর চাকরি হবে না।

এই কথা শুনিবামাত্র নীরা বসাকের মনের মেঘ কাটিয়া যেন আলো ঝলমল করিয়া উঠিল। সে আবার বসিয়া পড়িল।

তুই বলেছিস। হবে না কি ক'রে বুঝলি ?

কুমার পলাশকান্তিকে আমি বিদেয় ক'রে দিয়েছি—ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে 'রিফিউজ়' করেছি।

নীরা যেন নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কুমার পলাশকান্তিকে কুন্তলা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, যে পলাশকান্তিকে গাঁথিবার জন্য শত শত সভ্য ছিপ সর্বদা সমুদ্যত, যাহার করুণাকণা লাভ করিবার জন্য, যাহার দামী মোটরে একবার চড়িবার জন্য অভিজাতবংশীয় যুবতী কন্যারা লালায়িত, তাহাকে কুন্তলা বিদায় করিয়া দিয়াছে !

সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, কেন, কি হ'ল হঠাৎ ?

হবে আবার কি ! তুই কি আশা করেছিলি, আমি ওকে বিয়ে করব ?

করেছিলুম বইকি।

করেছিলি ? আমার সম্বন্ধে তোর ধারণা যে এত হীন, তা জানা ছিল না।

কেন, বিয়ে করতে আপত্তিটা কি ?

আমি অভিজাত ব্রাহ্মণ-বংশের মেয়ে, হস্টেলে থেকে না হয় এম.এ. পড়ছি, পাঁচজনের সঙ্গে মিশছি, হেসে কথা কইছি—তা ব'লে যাকে-তাকে বিয়ে করব !

কুমার পলাশকান্তি যে-সে লোক নয়।

ও তো একটা বেনে। ওর স্পর্ধা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি। টাকা ছাড়া আর কি আছে ওর? সে টাকাও আবার স্বোপার্জিত নয়।

তুই কাকে বিয়ে করবি তা হ'লে?

আমার বাবা মা পছন্দ ক'রে যাঁর হাতে আমাকে সম্প্রদান করবেন, তাঁকে। তাঁরা অভিজাতবংশীয় ব্রাহ্মণকেই পছন্দ করবেন আশা করি।

ও বাবা, এত লেখাপড়া শিখেও তোর এখনও এত জাতবিচার আছে, তা তো জানতাম না!

জাত যখন আছে, তখন তা মানতেই হয়। সোনার পাত দিয়ে মোড়া থাকলেও বাবলাগাছকে আমগাছের মর্যাদা দিতে পারি না।

সেকালের কুলীনরা একশো দুশো বিয়ে করত শুনেছি, তোর বাবা যদি সে রকম কোন এক কুলীনকে পছন্দ করেন, বিয়ে করবি তুই?

নীরার দৃষ্টি সকৌতুকে নাচিতে লাগিল।

কুন্তলা গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল।

সে রকম কুলীন আজকাল দুষ্প্রাপ্য। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে, সে রকম কোন কুলীনের হাতে বাবা আমাকে সম্প্রদান করবেন ঠিক করেছেন, তা হ'লেও আমি আপত্তি করব না। বিবাহ সামাজিক ধর্ম, ওতে নিজের মত চালাতে যাওয়া অন্যায়।

ও-রকম স্বামীকে ভক্তি করতে পারবি?

ভক্তি করতে পারা না-পারা নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতার ওপর নির্ভর করে পাথরের নুড়ি, কদাকার বিগ্রহ—এসবকেও তো লোকে ভক্তি করতে পারছে

নীরা বুঝিল, তর্ক করা বৃথা। কুন্তলাকে সে তর্কে হারাইতে পারিবে না তাহাকে সে কোনদিন বুঝিতে পারে নাই, আজও পারিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কুন্তলা বলিল, এক স্বামীর এক স্ত্রী হওয়া আজকালকার রেওয়াজ, কিন্তু আমার মনে হয়, ওটা দারিদ্র্যের চিহ্ন। সত্যি সত্যি যদি কোন পুরুষ একাধিক স্ত্রীর ভরণ-পোষণ মনোরঞ্জন করতে পারে তা হ'লে মানতেই হবে, সে শুধু পুরুষ নয়, পুরুষ-প্রবর। সে শ্রদ্ধেয়, হে

নয়। একটিমাত্র স্ত্রী নিয়ে হ্যাতাজোবড়া হয়ে যারা প্রতি পদে হিমসিম খেতে থেতে নাকে কেঁদে মরে, তারা অসমর্থ অপুরুষের দল, ওই একটিমাত্র স্ত্রীকেও তারা সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারে না—তারা অক্ষম, কৃপার পাত্র।

আগেকার ওই কুলীনরা কি তা হ'লে—

আগেকার কুলীনেরা কি ছিলেন, তর্কের বিষয় তা নয়। যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করে, সে হেয়, না, শ্রদ্ধেয়—তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল।

মুসলমানদের হারেম তোর মতে তা হ'লে ভাল ?

সভ্যসমাজে আজকাল যা হচ্ছে, তার চেয়ে ঢের ভাল। আজকালকার সভ্যসমাজের মেয়েরা সেজে-গুজে রূপ-যৌবন দুলিয়ে হাটে বাজারে সস্তা পণ্যসামগ্রীর মত নিজেদের যাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। কাক, কোকিল, ময়না, শালিক সবাই একবার ক'রে ঠুকরে যাচ্ছে। বাদশার হারেমে, আর যাই থাক্, এ দুর্দশা নেই। সেখানে একশো থাক্, দুশো থাক্, প্রত্যেকেই বেগম, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, প্রত্যেকের কাছেই বাদশা আসেন—হয়তো বছরে একবার, কিন্তু সেই একবারের মহিমাই এত যথেষ্ট যে, তার স্বপ্নে বাকি বছরটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। একাধিক বারও তুমি বাদশাকে আকর্ষণ করতে পার, যদি তোমার নিজের গুণ থাকে। সত্যিকার গুণের কদর হারেমে বাদশার কাছেই হয়। বাদশা বুভুক্ষু দরিদ্র নয় যে, যা পাবে, নির্বিচারে হ্যাংলার মত গিলে ফেলবে। বাদশা সমঝদার, সূক্ষ্ম রসের রসিক, তার কাছে ফাঁকি চলে না, মেকি চলে না—

বাবা বাবা! থাম্। এত বাজে বকতেও পারিস!

নীরা হাসিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্যি চললি নাকি ?

হ্যাঁ।

অনিল সাণ্ডেলকে এত ভাল লেগেছে যে, বিয়ে না করলে আর চলছে না ? ও যে তোর চেয়ে ছোট।

বিয়ে করব কে বললে! কুমার পলাশকান্তি যদি ওঁকে প্রাইভেট

সেক্রেটারি ক'রে নেন, তা হ'লে—মানে, মিসেস স্যানিয়েল বড় কষ্টে পড়েছেন আজকাল—তা ছাড়াও—

বুঝেছি।

কুন্তলার গম্ভীর মুখে হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া নীরা বসাক ছেলেমানুষের মত কিল তুলিয়া বলিল, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি। তাহার পর কণ্ঠস্বরে যতটা আন্তরিকতা ফোটানো সম্ভব, তাহা ফুটাইয়া বলিল, পাগল নাকি, আমি বিয়ে করব ওই অনিলটাকে, কি যে ভাবিস তোরা আমাকে!

কুন্তলা কিছু বলিল না, শুধু একটু হাসিল।

বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথায়?

হচ্ছে।

আমি যাই তা হ'লে। শঙ্করবাবুর কাছে যেতে হবে একবার।

সত্যই যেন কুন্তলার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে, এমনই একটা মুখভাব করিয়া নীরা বাহির হইয়া গেল। সে নিজে জানে যে, অনিল সান্ন্যালের একটা চাকরি যদি সত্যই জুটিয়া যায়, তাহা হইলে অনিল তাহাকে বিবাহ করিবে। বেকার অবস্থায় মায়ের আদেশের বিরুদ্ধে যাইবার সাহস তাহার নাই। নীরাকে সে ভালবাসিয়াছে, নীরাকেই সে বিবাহ করিবে, কিন্তু তৎপূর্বে একটা চাকরি পাওয়া দরকার। কিন্তু আই.এ.-ফেল অনিলের কিছুতেই চাকরি জুটিতেছে না। কুমার পলাশকান্তি মাসিক এত শত টাকা বেতনে একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিবেন বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। নীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, এই চাকরিটা অনিলের যাহাতে হয়। শঙ্করের সার্টিফিকেট এবং কুন্তলার সুপারিশ কুমার পলাশকান্তির নিকট মূল্যবান, তাই বেচারা এত ছুটাছুটি করিতেছে। সে নিজেও বেকার। ইচ্ছা করিলে একটা শিক্ষয়িত্রীর চাকরি অবশ্য সে যোগাড় করিতে পারে, কিন্তু সেরূপ ইচ্ছাই তাহার হয় না। সে সংসারী হইতে চায়, নীড় বাঁধিতে চায়। চাকরি করিবার প্রবৃত্তিই তাহার নাই। ভগবান তাহার রূপ দেন নাই, যৌবনও বিগতপ্রায়। পাত্র খুঁজিয়া তাহার বিবাহ দিবে এমন কোন অভিভাবকও

াহার নাই। তাহাকে নিজেই খুঁজিয়া লইতে হইবে। সে অনেক ুঁজিয়াছে, অনেক ছলনা, অনেক অভিনয় করিয়াছে—কেহই তাহাকে দেখিয়া ্ধ হয় নাই, এক এই অনিল ছাড়া। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা—চাকরি না

কিছুতেই বিবাহ করিবে না। নীরা, যেমন করিয়া হোক, তাহার াকরি জুটাইয়া দিবে। অনিলকে সে কিছুতেই হাতছাড়া করিবে না। ববাহ হইয়া গেলে লোকে যদি নিন্দা করে করুক, কুন্তলা যদি টিটকারি দেয় দিক, সে গ্রাহ্য করিবে না। এখন কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা করে, কুন্তলার কাছেও লজ্জা করে। আহা, অনিলের চাকরিটা যদি হইয়া যায়! ীরার সমস্ত দেহমন যে পিপাসায় হাহাকার করিতেছে, কুন্তলা তাহার কতটুকু বোঝে!

নীরা দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিল।

২৮

সকাল হইতে শুরু হইয়াছে। বেলা বারোটা বাজিয়া গেল, আর কত াকি আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবারও উপায় নাই। করিলেই লোকনাথ ঘোষালের আত্মসম্মান আহত হইবে। আহতপুচ্ছ গোক্ষুরকে বরং সহ্য করা য়, কিন্তু আহত-সম্মান লোকনাথকে সহ্য করা কঠিন। তাহা ছাড়া ভালও াগিতেছে, তাই শঙ্কর নিবিষ্টচিত্তেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি শ্রবণ করিতেছে। সুদীর্ঘ হইলেও প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। অমিয়ার কথা স্মরণ করিয়া এবং নিজের নানাবিধ কাজের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তি বোধ করিলেও অবহিত মুগ্ধ চিত্তেই সে প্রবন্ধটি শুনিতেছে এবং ভাবিতেছে, এই পণ্ডিত সুরসিক ব্যক্তিটিকে কেহ চিনিল না কেন? 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় শঙ্কর ইঁহার মূল্যবান প্রবন্ধ আজকাল বাহির করিতেছে, কিন্তু পাঠকসমাজে তেমন কোন সাড়া পড়ে নাই তো! দুই-চারিজন বিদগ্ধ ব্যক্তি প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ পাঠকপাঠিকাই লোকনাথ ঘোষালের া দেখিলেই পাতা উলটাইয়া যায়। অথচ··· দ্বার ঠেলিয়া একজন যুবক

আসিয়া প্রবেশ করিল। যুবককে দেখিয়া শঙ্কর একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। লোকনাথবাবুর সম্মুখে ভদ্রলোক না আসিলেই যেন ভাল হইত। কিন্তু আর উপায় নাই। স্মিতমুখে আহ্বান করিতেই হইল। যুবক প্রশ্ন করিল, আপনি যাচ্ছেন তো তা হ'লে

আপনাদের সভা কবে?

আগামী মঙ্গলবার।

সেদিন আমার ছুটি নেই।

কবে যেতে পারবেন বলুন, সেই রকমই ব্যবস্থা করব আমরা।

রবিবারের আগে আমার অবসর নেই।

বেশ, তাই হবে। রবিবারেই একেবারে 'কার' নিয়ে আসব তা হ'লে সভা পাঁচটায় হবে, বারোটা নাগাদ আসব, এতদূর যেতেও তো হবে।

বেশ, তাই আসবেন।

নমস্কারান্তে যুবক চলিয়া গেল।

লোকনাথবাবু প্রশ্ন করিলেন, কিসের সভা?

কোন্নগরে একটা সাহিত্য-সভা হবে, তাতেই আমাকে সভাপতি করতে চান ওঁরা।

ও।

লোকনাথ ঘোষালের মুখে কিসের যেন একটা ছায়া সহসা ঘনাইয়া আসিল। অনেকক্ষণ তিনি কোনও কথাই বলিলেন না। তাহার পর হঠাৎ বলিলেন, আজ উঠি। এটুকু আর একদিন হবে, বেলা অনেক হয়েছে আজ।

উঠিয়া পড়িলেন এবং অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পক্ষে আর বসিয়া থাকা সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে কি যেন একটা মোচড় দিয়া উঠিতেছিল। জীবনে সাহিত্য ছাড়া তিনি আর কিছুই চাহেন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনে একমাত্র আকর্ষণ। ইহার জন্য সংসার সমাজ পাপ পুণ্য পরলোক আত্মা, এমন কি ভগবান তিনি তুচ্ছ করিয়াছেন, সাহিত্য ছাড়া আর কোন কিছুতেই তাঁহার নাই, আর কোন বিষয়ে তিনি আনন্দ পান না। এই সাহিত্যের মধ্যেই তিনি

জীবন-রহস্যের যে লীলাময় দেবতাকে, রসমূর্ত যে সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করিয়াছেন, আজীবন বাণীসাধনায় আত্মহারা হইয়া তাহারই মহিমা-কীর্তন তিনি করিতেছেন। কিন্তু কই, তাঁহার কথা তো কেহ শুনিল না!' কোন সাহিত্য-সভা হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল না তো! নাবালক শঙ্করের কথা সকলে শুনিতে চায়, অথচ তাঁহাকে সকলে এড়াইয়া চলে—অধিকাংশ লোক চেনেই না। এই ছোকরা তো তাঁহাকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করিল না! এই দেশে, এই সমাজে, আত্মীয়স্বজনপরিত্যক্ত হইয়া কাহার জন্য কিসের জন্য তিনি এই দুরূহ তপশ্চর্যা করিতেছেন? কেহই তো তাঁহার কথা শোনে না, জোর করিয়া শুনাইলেও শুনিতে চায় না। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে শঙ্করের অস্বস্তি তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন। শঙ্করও স্থিরভাবে তাঁহার লেখা শুনিতে অপারগ! তবে এসব কেন—কেন—কেন?

দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া লোকনাথ ঘোষাল কলিকাতার ফুটপাথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। হাতে বিরাট প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি—চোখে বিদ্যুদ্দীপ্তি।

লোকনাথবাবু আকস্মিক অন্তর্ধানে শঙ্কর একটু হাসিল। লোকনাথবাবুর ব্যথা যে কোথায়, তাহা তাহার অবিদিত নাই; কিন্তু সে ব্যথা দূর করা তাহার সাধ্যাতীত। কিছুক্ষণ শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। আগে অনেকবার মনে হইয়াছে, আবার মনে হইল, যে নিষ্ঠাসহকারে সাহিত্যসেবা করা উচিত, সে নিষ্ঠা তাহার নাই—সে আদর্শভ্রষ্ট হইতেছে। মনে হইল, লোকনাথ ঘোষালই নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক—সে পল্লবগ্রাহী সুবিধাবাদী ব্যবসাদার। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে পড়িল, অমিয়া তাহার অপেক্ষায় এখনও অভুক্ত বসিয়া আছে। উঠিতে যাইবে, এমন সময় আর এক বাধা—নীরা বসাক আসিয়া প্রবেশ করিল। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মাথার সামনের কেশবিরল অংশের অবিন্যস্ত চুলগুলা হাওয়ায় উড়িতেছে। মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, আসতে পারি?

আসুন।

মুখমণ্ডলে শ্রদ্ধার আভাস বিচ্ছুরিত করিতে করিতে চেয়ার টানিয়া নীরা বসিল।

এ সময় হঠাৎ ?

না এসে পারলাম না। এ মাসের 'সংস্কারে' "অভ্যুদয়" কবিতাটাব জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

বসুন।

কি চমৎকারই লিখেছেন! সত্যি, আপনিই আধুনিক যুগের যুগপ্রবর্তক কবি।

নীরা বসাকের চোখের দৃষ্টিতে ভক্তি শ্রদ্ধা যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। শঙ্কর অমিয়ার কথা ভুলিয়া গেল। কণ্ঠস্বরে একটু আবদারের আমেজ মাখাইয়া নীরা আবার বলিল, কি ক'রে আপনি এমন লেখেন বলুন না, অবাক লাগে, সত্যি!

শঙ্কর স্মিতমুখে বসিয়া রহিল—প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনটাই করা শোভন নয়।

নীরা 'অভ্যুদয়' কবিতার খানিকটা আবৃত্তি করিয়া সোচ্ছ্বাসে বলিল, এসব কি ক'রে লিখছেন আপনি! এ যে আগুন!

ওই ধরনের আর একটা কবিতা লিখেছি কাল।

একটু শুনতে পাই না?—সাগ্রহ মিনতি-ভরা কণ্ঠে নীরা অনুরোধ জানাইল।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ড্রয়ার টানিয়া শঙ্কর কবিতাটি বাহির করিল এবং পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। সুদীর্ঘ কবিতা। শেষ হইয়া যাইবার পর নীরার মুখ দিয়া খানিকক্ষণ কোন বাক্যস্ফূর্তি হইল না। ক্ষণকাল পরে মৃদুকণ্ঠে কেবল নিঃসৃত হইল—চমৎকার! খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আচ্ছা, এবার উঠি তা হ'লে, নমস্কার।

নমস্কার।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনেছি, কুমার পলাশকান্তির সঙ্গে আলাপ আছে আপনার।

আছে।

যদি দয়া ক'রে তা হ'লে একটা কাজ করেন, একটি দরিদ্র পরিবারের বড় উপকার হয়।

কি বলুন্?

আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া শঙ্কর বলিল, আমিও ওদের ভাল ক'রে চিনি। অনিল অখিলকে পড়াবার জন্যে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে আমি ছিলাম যে কিছুদিন।

নীরা সব জানিত, তবু বিস্ময়ের ভান করিল।

ওমা, তাই নাকি! তা হ'লে দিন একটা চিঠি।

আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু কুমার পলাশকান্তির একটি অনুরোধ আমি রাখি নি, তিনি যদি আমারটা না রাখেন?

ঠিক দুই দিন পূর্বে কুমার পলাশকান্তির তাগাদায় অস্থির হইয়া শঙ্কর অবশেষে তাহাকে জানাইয়া দিয়াছে যে, সে গল্প লিখিয়া দিতে পারিবে না, কুমার তাহাকে যেন ক্ষমা করেন, তাহার মোটেই সময় নাই। সে ব্যস্ততার দোহাই দিয়াছিল বটে, কিন্তু আসলে তাহার গল্প লিখিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না, বিবেকে বাধিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আংটিটাও ফেরত দেওয়াতে প্রত্যাখ্যানটা একটু রূঢ়ই হইয়াছে। এত কথা সে অবশ্য নীরাকে বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দিতে পারবেন না তা হ'লে?

সম্ভব হ'লে দিতাম।

নীরা বসাকের সমস্ত সপ্রতিভতা যেন দপ করিয়া নিবিয়া গেল। সে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

২৯

পরদিন একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি লইয়া শঙ্কর কুমার পলাশকান্তির বাড়িব উদ্দেশ্যে ছুটিতেছিল। তাহার কেবলই ভয় হইতেছিল, তিনি যদি বাড়িতে না থাকেন—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ সময় প্রায়ই তিনি বাহির হইয়া যান। নীরা বসাকের বিবর্ণ ম্লান মুখচ্ছবি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহার সমস্ত কাহিনী সে শুনিয়াছিল। কুন্তলার কাছে গোপন করিলেও শঙ্করের কাছে নীরা কিছুই গোপন করে নাই। কুন্তলা ঠিকই ধরিয়াছিল, নীরা সত্যই শঙ্করের ভক্ত। লেখা পড়িয়াই সে শঙ্করকে এত ভক্তি করিত যে, তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহার রচনার ভিতর দিয়া সে যে সহৃদয় ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার নিকট অকপটে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে সে দ্বিধা করে নাই।

শঙ্কর দ্রুতপদে পথ চলিতেছিল। হঠাৎ একটা কাপড়ের দোকানে চোখ পড়িতে সে একটু বিস্মিত হইয়া গেল। প্রফেসার গুপ্ত ও সুলেখা কাপড় কিনিতেছেন—একটি চমৎকার শাড়ির পাট খুলিয়া উভয়ে সেটি নিরীক্ষণ করিতেছেন। সুলেখার উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইতেছে না যে, স্বামীর সহিত তাঁহার কিছুমাত্র অসদ্ভাব আছে। অত অপমানের পরও সুলেখা ঠিক আগেকার মতই স্বামীর ঘর করিতেছেন, বিদ্রোহ করিয়া গৃহত্যাগ করেন নাই। হয়তো তাঁহারই আদরে আবদারে বিগলিত হইয়া প্রফেসার গুপ্ত তাঁহারই জন্য শাড়ি কিনিতে আসিয়াছেন। প্রফেসার গুপ্তের চরিত্র যে বিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহার নিজেরই একটি ছাত্রীর সহিত তাঁহার নাম জড়াইয়া প্রফেসার-মহলে যে কানাঘুষা চলিতেছে, তাহা শঙ্কর শুনিয়াছে। সুলেখাও হয়তো শুনিয়াছেন। সুলেখার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে আর একবার চাহিয়া শঙ্কর আগাইয়া গেল। একটু হাসিয়া মনে মনে বলিল, ইহাই জীবন।

অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া শঙ্কর জীবনের আর একটি ছবি দেখিতে পাইল না। আসুমি-দার্জির পিতা নিবারণবাবু শঙ্করকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পাশের

গলিতে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিলেন। তিনি বাজার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। কাঁকড়া, ভেটকিমাছ, মাটন প্রভৃতি নানারূপ সুখাদ্য তিনি কিনিয়াছেন। আসৃমি-সহ পলাতক মাস্টার ফিরিয়াছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নয়, নিবারণবাবুর আহ্বানে। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া শুধু চিঠি নয়, তিনি টেলিগ্রাম পর্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের কাছে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং শঙ্করকে দেখিয়া তাঁহাকে তাড়াতাড়ি অন্ধকার গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে হইল।

অনিলের চাকরি জুটাইয়া দিবার জন্য শঙ্কর উর্ধ্বশ্বাসে কুমার পলাশকান্তির বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিল।

৩০

আসৃমিকে লইয়া তবলাবাদক মাস্টার কপিলবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। নিবারণবাবুর অন্তরের কথা নিবারণবাবুই সম্যকরূপে জানেন, বাহিরে তাহার যতটুকু প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তাহা পরিচিতমহলে কিঞ্চিৎ বিস্ময়েরই উদ্রেক করিয়াছে। আসৃমি ও মাস্টারকে ঘিরিয়া নিবারণ-গৃহে প্রতিদিন একটা-না একটা ছোট বড় উৎসব লাগিয়াই আছে। নিবারণ যে ইহাদের বিরুদ্ধে পুলিসে নালিশ করিয়াছিলেন অথবা কখনও ইহাদের মুখ-দর্শন করিবেন না বলিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বর্তমান আচরণ দেখিয়া অনুমান করা কঠিন। দার্জির আচরণও ঠিক পূর্ববৎ আছে। দার্জি সর্বদা স্বল্পভাষিণী, সর্বদা কর্তব্যপরায়ণা। সে সহসা মিষ্ট কথায় গলিয়াও পড়ে না, রুষ্ট কথায় ফোঁস করিয়াও উঠে না। যাহা তাহার ভাগ্যে জোটে, তাহাই সে মানিয়া লয়। অদৃষ্টকে শান্ত মুখে মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে অনাড়ম্বর জীবনযাপন-কৌশল সে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। মনে হয়, তাহার যেন কোন অভাববোধই নাই। থাকিবে কি করিয়া? যে আনন্দের অভাব জীবনকে শুষ্ক করিয়া দেয়, সে আনন্দ তাহার প্রচুর পরিমাণে আছে। সে শিল্পী। সূচীশিল্পে সে তন্ময় হইয়া থাকে, বাবাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে।

আর কি চাই? তাহার বিশ্বাস, সে ছাড়া তাহার বাবাকে আর কেহ চেনে না, বোঝে না। আস্মি আসার পর হইতে সে সর্বদা সশঙ্কিত হইয়া আছে—কখন শঙ্করবাবু হঠাৎ আসিয়া পড়েন! শঙ্করবাবুর নিকট নিবারণবাবু আস্মি ও কপিলবাবুর সম্বন্ধে যেসব গর্জন করিয়াছিলেন, তাহা দার্জির অবিদিত নাই। তাই তাহার সর্বদা ভয় হয়, শঙ্করবাবু এখন যদি আসিয়া পড়েন, কি ভাবিবেন! বাহিরের কোন লোকের নিকট তাহার বাবা অপমানিত বা অপ্রস্তুত হইলে তাহার বড় কষ্ট হয়। এই একটি জিনিসই তাহার পক্ষে সত্য সত্যই কষ্টদায়ক। অথচ বাবা এমন সব কাণ্ড করিয়া বসেন! সেদিনও একটি লোককে তিনি তাহার বিবাহের জন্য কি খোশামোদই না করিতেছিলেন—সে পাশের ঘর হইতে স্বকর্ণে শুনিয়াছে। কি দরকার তাহার বিবাহ করিবার? সে বাবাকে বলিয়া দিয়াছে যে, তাহার জন্য আর পাত্র খুঁজিতে হইবে না। সে বিবাহ করিবে না। আস্মি বিবাহ করিয়াছে, সেও যদি বিবাহ করে, তাহার অসহায় বাবাকে দেখিবে কে? না, সে বিবাহ করিবে না।

সেলাইয়ের ফোঁড় তুলিতে তুলিতে সে ভাবিতেছিল, শঙ্করবাবুর নিকট কি করিয়া বাবার মান বাঁচানো যায়! সহসা তাহার মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে ঠিক করিয়া ফেলিল, শঙ্করবাবু যদি আসেনই, তাঁহাকে আগেই আড়ালে ডাকিয়া সে বলিয়া দিবে যে, বাবার নয়, তাহারই আগ্রহাতিশয্যে আস্মিরা আসিয়াছে। তাহারই অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বাবা তাহাদের আসিতে লিখিয়াছিলেন এবং তাহারই মুখ চাহিয়া তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ব্যাপারটার সমাধান করিয়া তাহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, হেঁট হইয়া সেলাইয়ের বাক্সের ভিতর উড্ডীয়মান শুকপক্ষীর পালকের উপযোগী সবুজ রঙের সুতা অন্বেষণে সে ব্যাপৃত হইল।

আস্মি, মাস্টার ও নিবারণবাবু আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়াছেন। দার্জি যায় নাই। সে কোথাও যায় না। নিস্তব্ধ দুপুরে একা বসিয়া সেলাই করিতেই তাহার ভাল লাগে।

৩১

করালীচরণের আকস্মিক অভ্যাগম ও অন্তর্ধানে ভন্টু শঙ্করের বাবার উইল সম্বন্ধে প্রথমে হঠাৎ যতটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পরে ততটা উদ্বিগ্ন সে আর রহিল না। প্রথম কারণ—শঙ্করের নাগাল সে পাইল না, শঙ্কর বাড়িতেই থাকিত না, মুমূর্ষু ছবিকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত। দ্বিতীয় কারণ—ইন্দুমতী, ইন্দুমতীর বাবা, বাবাজী ওরফে মুক্তানন্দ স্বামী এবং আপিসের কাজকর্ম তাহাকে এমন ব্যাপৃত করিয়া রাখিল যে, শঙ্করের কথা তাহার আর মনেই রহিল না। অন্তর এবং বহির্লোকের নানা ঘটনা-পরম্পরা এমন একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিল, যাহাকে উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করিতে হইলে বলিতে হয়—ঘূর্ণাবর্ত।

ইন্দুমতী বড়লোকের মেয়ে, চিরকাল সুখে মানুষ হইয়াছে, বাপের বাড়িতে সর্বদা তাহার সহিত ঝি-চাকর ঘুরিত। সম্প্রতি সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে, ঝি-চাকরের সংখ্যা দ্বিগুণিত হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু ভন্টু একটি চাকর ছাড়াইয়া দিয়াছে অর্থাৎ দিতে বাধ্য হইয়াছে। অসুস্থ বেতনহীন দাদার চেঞ্জের খরচ, শন্টু-নন্টুর পড়ার খরচ, বিশাল বাড়িভাড়া, এতগুলি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন, ঔষধপত্র, লোক-লৌকিকতা—এসব তো আছেই, তাহার উপর চাপিয়াছে বাবাজীর গব্যঘৃত আলোচাল এবং বাকুর দুধ ও ঔষধ। বাকু অসুস্থ, তাঁহার শোথ হইয়াছে, কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে। কবিরাজ মহাশয় অন্য পথ্য নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং ভন্টুকে চাকর ছাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। ইন্দুমতীকেই সদ্যপ্রসূত শিশুর কাঁথা কাপড় স্বহস্তে কাচিতে হইতেছে। ইন্দুমতী অবশ্য কাচিতে আপত্তি করে নাই, হাসিমুখেই সেসব করিতেছে ; কিন্তু ওই হাসির অন্তরালেই কি যেন একটা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হইতেছে, যাহাতে বাবাজী ক্রুদ্ধ, বউদিদি ভীত এবং ভন্টু উতলা হইয়া পড়িয়াছে। বউদিদির অসংখ্য কাজ। তিনি উঠেন ভোর পাঁচটায়, শুইতে যান রাত্রি এগারোটায় কিংবা তাহারও পরে—ইহার মধ্যেও সুময় করিয়া ইন্দুমতীর কাঁথা কাপড় কাচিয়া দিতে তিনি রাজী আছেন ; কিন্তু ইন্দু

কিছুতেই তাহা করিতে দিবে না, নিজেই কাচিবে। তাহার গোঁ দেখিয়া বউদিদি হাসেন, একটু ভয়ও পান—বড়লোকের মেয়ে মনে মনে না জানি কি ভাবিতেছে !

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাবাজী একদিন আপিস-গমনোন্মুখ ভনুটুকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন, তোর কি চোখ নেই ? দেখতে পাস না? মেয়েটা খেটে খেটে ম'ল যে !

ভনুটু একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, কি আর এমন খাটছে ও! বউদি ওর চেয়ে ঢের বেশি খাটেন।

একটা মহিষের পক্ষে যা সহজ, বুলবুলির পক্ষে তা সহজ নয়। তুমি বিবাহ করেছ একটি বুলবুলিকে, তাকে দিয়ে ঘানি টানালে চলবে কেন বাপু?

ভনুটু চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটিল।

বাবাজী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তবু খুব করছে। খুব—

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, একটি কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার—জীবাত্মাকে কষ্ট দিলে ভগবচ্চরণে অপরাধী হতে হয়। ও না হয় গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগে কর্মফলবশত তোমার স্ত্রী হয়েছে, তাই ব'লেই যে তাকে নির্যাতন করতে হবে, এ একটা কোন যুক্তি নয়।

গত কয়েক দিন হইতে ভনুটুর মনেও ঠিক এই কথাগুলি জাগিতেছিল, হঠাৎ বাবাজীর মুখে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়া বাবাজীর প্রতি সহসা তাহার যেন একটু শ্রদ্ধাই হইল।

বলিল, কি করব, আপনিই ব'লে দিন।

আমি কি বলব বল, আমি সন্ন্যাসী মানুষ। আমার কাছে তুমিও যা, তোমার দাদা বিষ্ণুও তাই। উভয়েরই মঙ্গল আমি কামনা করি, কিন্তু তাই ব'লে যা ন্যায্য ব'লে বুঝেছি, মনে-প্রাণে যেটা সত্য ব'লে অনুভব করছি, তা যদি না বলি, তা হ'লে বিবেকের কাছে অপরাধী হতে হবে আমাকে। তাই বলছি, বউমাকে কষ্ট দিও না।

আমি কি ইচ্ছে ক'রে কষ্ট দিচ্ছি ?

তোমার এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে উনি কষ্ট না পান।

কি করব, বলুন ?

তোমার দাদাকে চিঠি লেখ, কাজে এসে জয়েন করুক। সে সমুদ্রের ধারে ব'সে ব'সে সিনারি দেখবে আর তুমি তার সংসার ঘাড়ে নিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অবিচার করবে, এটা তো ন্যায্য কথা নয়।

ভন্টু চুপ করিয়া রহিল।

বাবাজী তাহার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, পাঁকে যে পড়বে, তা আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার। আমি কতকাল ধ'রে আশা করেছিলাম যে, তোমাকে সঙ্গী ক'রে নিয়ে কোন তীর্থস্থানে বাকি জীবনটা নাম-জপ ক'রে কাটিয়ে দেব। ও ছাড়া আর কি করবার আছে, বল ? সংসারে এসে তাঁর মহিমাই যদি না কীর্তন করতে পারলাম, শূয়োরের মত পাঁকে নাক ডুবড়েই যদি মানব-জীবনটা কাটিয়ে দিতে হ'ল, তা হ'লে আর হ'ল কি ? কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই, তুমি ফট ক'রে বিয়ে ক'রে বসলে, এইবার মজাটা বোঝ।

ভন্টু সহসা সচেতন হইল—বাবাজী যে পথে এইবার তাঁহার চিন্তাধারাকে চালিত করিয়াছেন, সে পথ অন্তহীন। তাহার আপিসের বেলা হইয়া যাইতেছে। সে বাইকে সওয়ার হইয়া পড়িল। তাহার আজ অনেক কাজ। আপিসের অনেকগুলি ফাইল ক্লিয়ার করিতে হইবে, খোকার জন্য সোয়েটার কিনিতে হইবে, বাকুর জন্য কবিরাজের বাড়ি যাইতে হইবে, একজন স্বর্ণকারের নিকট ইন্দুর জন্য একটি হাল-ফ্যাশানের হার গড়াইতে দিয়াছে, তাহাকে একবার গিয়া চুমরাইতে হইবে, কারণ তাহাকে এখন নগদ টাকা সে দিতে পারিবে না। হার হইলে আবার এক ফ্যাসাদ আছে, বউদিদি ও বাকুর নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইবে যে, হারটা তাহার শ্বশুর দিয়াছেন। হঠাৎ ভন্টুর মনে হইল, এত সব চাতুরীর কি প্রয়োজন, সে তো কোন অন্যায় কার্য করিতেছে না! বাবাজীর কথাগুলি তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

হাসি অপেক্ষা করিতেছে।

পড়াশোনায় সে ক্লাসের মেয়েদের ও শিক্ষয়িত্রীদের তাক লাগাইয়া দিয়াছে। তাহাদের ধারণাই ছিল না যে, একজন গৃহস্থ-ঘরের বউ হঠাৎ স্কুলে ভরতি হইয়া অতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে। গৃহস্থালীর নানা কাজকর্মের অবসরে নিশ্চয়ই সে পড়াশোনার চর্চা রাখিয়াছিল, তাহা না হইলে হঠাৎ এতটা উৎকর্ষ লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাহার যে হাতের লেখা সে একদিন প্রবাসী মৃন্ময়কে চিঠি লিখিবার জন্য চিন্ময়ের সহায়তায় শুরু করিয়াছিল, যে হাতের লেখার জন্য মৃন্ময়ের চাকরি গিয়াছিল, যে হাতের লেখায় সে আজও মৃন্ময়কে প্রত্যহ পত্র লেখে, সর্বাপেক্ষা সেই হাতের লেখাই সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। সত্যই মুক্তার মত লেখা। পড়াশোনায় কোনও বিষয়ে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। অথচ ব্যবহারে সে অতিশয় অনাড়ম্বর ও সপ্রতিভ। অহঙ্কারী নয়, গম্ভীর নয়, স্বামী চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে বলিয়া বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ সর্বাঙ্গে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। অতিশয় সহজভাবে সে সকলের সঙ্গে মেশে, হাসে, কথা কয়। কাহারও সহিত তাহার শত্রুতা নাই, সকলেই তাহাকে ভালবাসে। অনেকেই বিস্মিত হয়। যাহার স্বামী জেলে, সে কি করিয়া এমন সহজভাবে থাকে, যেন কিছুই হয় নাই! হাসি নিজেই মাঝে মাঝে নিজেকে চিনিতে পারে না, নিজের এই বিবর্তন দেখিয়া নিজেই সে বিস্মিত হইয়া যায়। বাল্যকালে সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া যখন দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে মানুষ হইতেছিল, তখন সে সঙ্কোচে মরিয়া থাকিত, মুকুজ্জেমশাইয়ের চেষ্টায় যখন মৃন্ময়ের সহিত তাহার বিবাহ হইল সে যেন বাঁচিয়া উঠিল—রাজপুত্রের স্পর্শে যেন ঘুমন্ত রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল—ভীরু নয়ন তুলিয়া সে দেখিল, সম্মুখে দেবতা দাঁড়াইয়া আছে, যে দেবতা তাহারই, আর কাহারও নয়। তারপর দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে আপন মহিমায় বিকশিত হইয়া আপন অধিকারে প্রমত্ত হইয়া

ভীরু রাজকন্যা যখন রাজেন্দ্রাণী হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সমস্ত স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সহসা আবির্ভূত হইল নেপথ্যবাসিনী মৃত স্বর্ণলতার প্রেতাত্মা ও তাহার বিস্ময়কর ইতিহাস—আকস্মিক বজ্রপাতের নিদারুণ প্রহারে তাহার সুখ-প্রাসাদ নিমেষে যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে অবলুণ্ঠিত হইল, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। যাহাকে ঘিরিয়া তাহার হৃদয়ের শতদল বিকশিত হইয়াছিল, তাহাকেই ক্ষোভে দুঃখে লাঞ্ছিত করিল, ক্রোধে ঈর্ষায় সমস্ত অন্তর পুড়িয়া গেল, মনে হইল, এই বুঝি শেষ, সমস্ত মহিমার উপর অন্ধকারের যবনিকা নামিল। কিন্তু অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার নূতন জ্যোতি দেখা দিয়াছে। সহসা সে মৃন্ময়কে—চিন্ময়ের অগ্রজ মৃন্ময়কে, নূতন রূপে নূতন মহিমায় আবিষ্কার করিয়াছে।

সমস্ত অন্তর দিয়া সে অপেক্ষা করিতেছিল। অপেক্ষা করিতেছিল, কবে তাহার পরম গৌরব ও চরম সর্বনাশের সংবাদ বহন করিয়া তাহার জীবনের সেই স্মরণীয় দিবসটি আসিবে, যেদিন সে বুঝিতে পারিবে যে জীবনের প্রদীপটি জ্বলিল কি না!

দ্বার-পথে শব্দ হইল।

হাসি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, সুচারু প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে একখানা কাগজ।

কি সুচারু?

সুচারু কোন কথা বলিতে পারিল না। অথচ সে খবরটা দিতেই আসিয়াছিল, কিন্তু হাসিকে দেখিয়া তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

ওটা কি আজকের কাগজ?

হ্যাঁ।

দেখি।

কাগজ দেখিয়া সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরার রক্তধারা যেন হিমানী-স্রোতে রূপান্তরিত হইল। প্রথম পাতাতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল। মৃন্ময়ের তপস্যা সফল হইয়াছে, এতদিনে ধর্ষিতা স্বর্ণলতার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিল, মৃন্ময় জেলে নৃশংসভাবে

অচিনবাবুকে হত্যা করিয়াছে। হাসির মুখ ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ জ্বলিল।

৩৩

সংবাদটা শুনিয়া শঙ্কর বিহ্বল হইয়া পড়িল। মৃন্ময়ের মধ্যে যে এ সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা কে জানিত! আমরা মানুষকে কতটুকু চিনি!

পুরাতন পুস্তকের দোকানে বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মৃন্ময়ের মুখখানাই বারম্বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। গত কয়েক দিন নীরা বসাক ও অনিল তাহার সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। অনিল সান্যালের উপর সে প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু নীরার সংস্পর্শে আসিয়া সে অপ্রসন্নতা কাটিয়া গিয়াছিল। To know all is to forgive all. সমস্ত শুনিবার পর আর রাগ করিয়া থাকা চলে না। কি করিলে ইহারা সুখী হইবে, এই চিন্তাই তাহার মনকে অধিকার করিয়া তাহাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল। সহসা ইহাদের অবলুপ্ত করিয়া মৃন্ময় ও হাসি আসিয়া দাঁড়াইল। নীরা বসাক ও অনিলের সহিত তাহার যে সম্পর্ক, মৃন্ময় ও হাসির সহিতও তাহাই। এখন কিন্তু মনে হইতে লাগিল, উহারা তাহার বেশি আপন। উহাদের সহিত বেশি আত্মীয়তা অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত অজ্ঞাতসারে গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

...হঠাৎ, এক কোণে একগাদা পুরাতন মাসিকপত্র নজরে পড়িল—নাম 'বান্ধব'। কৌতূহল হইল। উবু হইয়া বসিয়া সে উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিতে লাগিল। সহসা দেখিতে পাইল, একটি প্রবন্ধের নাম 'প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দুটি কথা'—সহসা কে যেন তাহাকে চাবুক মারিল।

চণ্ডীচরণ দস্তিদার চোর! ইহারই ঐতিহাসিক জ্ঞানের গভীরতা লইয়া সে সভায় সভায় গর্ব করিয়া বেড়াইতেছে! তাহার সমস্ত উৎসাহ যেন নিবিয়া গেল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন শিথিল শক্তিহীন হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ

সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাড়ি ফিরিয়া অমিয়ার নিকট শুনিল, তাহার মামাতো-ভাই নিত্যানন্দ টাকা লইয়া বাজার করিবার জন্য বাহির হইয়াছিল, মদ খাইয়া ফিরিয়াছে, পাশের ঘরে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর এমন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল যে, চুপ করিয়া চাহিয়াই রহিল। তাহার পর হঠাৎ যেন তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। সক্রোধে পাশের ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। উলঙ্গ নিত্যানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। শঙ্করের মনে পড়িল, সেও তো কিছুদিন আগে মদ খাইত। কিছু বলিল না, সন্তর্পণে কপাটটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

•

•

•

গভীর রাত্রি।

শঙ্কর লেখনী-হস্তে একা জাগিয়া আছে, পাশের ঘরে অমিয়া ঘুমাইতেছে। চতুর্দিকের নিবিড় নীরবতা তাহাকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, সে একটি কথাও লিখিতে পারিতেছে না, লেখনী-হস্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মনে হইতেছে, গভীর রাত্রির নিবিড় নীরবতার মধ্যে এমন একটা কিছু প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, যাহা নীরব বলিয়াই উপেক্ষণীয় নহে; মনে হইতেছে, অদৃশ্য অসংখ্য চক্ষু যেন নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, নামহীন নির্দেশহীন অগণ্য অনুভূতিপুঞ্জ আশেপাশে উর্ধ্বে নিম্নে চতুর্দিকে যেন স্পন্দিত হইতেছে, ধরণীর ধূলিকণা ও মহাকাশের নীহারিকাপুঞ্জ শ্রুতি-অগম্য যে বিরাট ছন্দে ছন্দিত, অন্ধকারে তাহার কিছু আভাস যেন পাওয়া যাইতেছে, অন্ধকার-অবলুপ্ত সৃষ্টি অদৃশ্য অন্তরলোকে নব রূপে মূর্তি-পরিগ্রহ করিতেছে, নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর আত্মা স্বপ্নের পাখায় ভর করিয়া জ্যোতির্ময় আকাশলোকে যাত্রা করিয়াছে, অস্ফুট হাসি-কান্নার অসংখ্য অমূর্ত তরঙ্গ নিঃশব্দে চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—নির্বাক শঙ্কর নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে।

পাশের ঘরে চুড়ির শব্দ হইল। সহসা সমস্ত মায়ালোক যেন মিলাইয়া গেল। সে মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিল। মনে হইল, অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল; তাহার দীর্ঘনিশ্বাস-পতনের শব্দও যেন শোনা গেল। খোলা জানালা দিয়া

একটা দমকা বাতাস ঢুকিল, টেবিল হইতে একটা কাগজ উড়িয়া গেল। শঙ্কর তুলিয়া দেখিল, বাড়ি-ভাড়ার বিল। দুই মাসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছে।

শঙ্কর লেখনী লইয়া আবার লিখিবার উদ্যোগ করিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, কি লেখা যায়? অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল—কিছুই লেখা গেল না। কি লিখিবে? গতানুগতিক নিয়ম বজায় রাখিয়া কতকগুলা চটুল কথার জাল বুনিয়া যাইবে? এতদিন তো ইহাই করিয়াছে, সাহিত্য-সেবার ছুতায় মনিহারী দোকান সাজাইয়া লোক ভুলাইয়াছে। জীবনের কোন্ নিগূঢ় রহস্য তাহার কবিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে? সাহিত্যের ভিতর দিয়া জীবনের কি আদর্শ সে দেশের লোকের সম্মুখে ধরিতে চায়? সে আদর্শের পথে সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? সে আদর্শের জন্য সে কতটা স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে? সে তো এতকাল কেবল লোকের মনোরঞ্জন করিয়া, সাহিত্যের নামে অনুষ্ঠিত যত সব বাজে সভার সভাপতিত্ব করিয়া, হাততালি মালা এবং প্রশংসা কুড়াইয়া অতি সস্তা মেকি জিনিসের বেসাতি করিয়াছে মাত্র।

মৃন্ময়ের কথা মনে পড়িল। আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া সে অবলীলাক্রমে ফাঁসি-কাঠে উঠিয়াছে। তাহার টাকা চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল জেলে গিয়া অচিনবাবুর নাগাল পাওয়া। আদর্শের জন্য মৃন্ময় স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিল। সে পারিবে কি?

৩৪

অনিল ও নীরা বসাক, মৃন্ময় ও হাসিকে লইয়া শঙ্করের কয়েক দিন বেশ কাটিয়া গেল, অর্থাৎ এ কয়দিন উহাদের লইয়া শঙ্কর নিজেকে বেশ ভুলিয়া রহিল। ইহার পূর্বে ভুলিয়াছিল ছবিকে লইয়া। সহসা সে আবিষ্কার করিল, কোন কিছু লইয়া নিজেকে ভুলিয়া থাকিবার উপলক্ষ্য পাইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়, তা সে উপলক্ষ্য যতই না কেন তুচ্ছ হউক। বস্তুত, কিছুদিন হইতে এই উপলক্ষ্যই সে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে লোকনাথবাবুর

সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শ্রবণ করে, নিপুদার সহিত সোৎসাহে কমিউনিজ্‌ম-বিষয়ক আলোচনায় যোগ দেয়, যেখানে-সেখানে সভাপতিত্ব করিতে ছুটিয়া যায় কেবল অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার জন্য। যে প্রশ্নটা কিছুদিন হইতে বারম্বার তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, যে প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় তাহার সমস্ত অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, যে প্রশ্নের সদুত্তর সে কিছুতেই নিজেকে দিতে পারিতেছে না—সেই দুরূহ প্রশ্নটাকে এড়াইবার জন্যই সে বাহিরের একটা-কিছু লইয়া মাতিয়া থাকিতে চায়। লোকনাথবাবুর প্রবন্ধ মনোহারী, নিপুদার সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিয়া আনন্দ আছে, নীরা বসাকের প্রশংসা মাদকতাময়, সাহিত্য-সভার হাততালি শিরা-উপশিরায় উন্মাদনা সঞ্চার করে—সবই ঠিক; কিন্তু কেবল ওই সব কারণেই সে যে উহাদের লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহা ঠিক নয়। সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিতে চায়, নিজের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া বাহিরের ভিড়ে আত্মগোপন করিতে চায়, নিজের মনের অনিবার্য প্রশ্নটাকে বাহিরের কোলাহলে নীরব করিয়া দিতে চায়। তাহার একা থাকিতে ভয় করে।

অনিলের চাকরি হইয়া গিয়াছে। তিনি আইন অনুসারে নীরা বসাকের সহিত তাহার বিবাহও হইয়া গেল। উপস্থিত হাতে উত্তেজক কোন কাজ নাই। এ মাসে 'সংস্কারক' পত্রিকার কাজও যাহা ছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। আপিস হইতে শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নটি সহসা শতমূর্তি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার নাম কি সাহিত্য-সাধনা? আর যদি সত্যই সে সাধনা করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলেই বা কাহার কতটুকু উপকার করিতে পারে? বড় জোর তাহা কতকগুলি প্রকৃষ্টমনা ব্যক্তির মানসিক বিলাসের উপকরণ যোগাইবে। কিন্তু তোমার যে উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা করা! দেশের উন্নতিকল্পেই একদা তুমি চরকা ঘাড়ে করিয়াছিলে, চরকা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান পড়িতে গিয়াছিলে, বিজ্ঞান ছাড়িয়া এখন সাহিত্য-সেবা করিতেছ! ইহাই কি সেই সাহিত্য-সেবার নমুনা? তোমার ও-সাহিত্য কয়টা খাজনা-পীড়িত কৃষকের দুঃখমোচন করিবে, কয়জন নিরন্নকে আহার যোগাইবে, কয়জন রোগীর ঔষধ-পথ্যের

সংস্থান করিবে, কয়জন অশিক্ষিত ব্যক্তির সুশিক্ষার সহায়ক হইবে, দুঃখীকে সুখী করিবে? তুমি বলিতেছ, আধিভৌতিক নয়, আধ্যাত্মিক দুঃখ-মোচনই উহার উদ্দেশ্য। তাই যদি হয়, বলিতে পার, তোমার ও সাহিত্য দেশের কয়জনের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? ইহা কয়জনের আত্মগোচর হইতে পারে? যে দেশের শত-করা পাঁচজনের শুধু অক্ষর-পরিচয় মাত্র আছে, সে দেশের কয়জন সাহিত্য-রস পান করিতে সক্ষম? যাহারা সক্ষম, তাহারাও কি তোমার ও-সাহিত্যের ভাষা বোঝে? ও-সাহিত্যের ভাববিলাসের সহিত কি তাহাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে? দেশসেবার অজুহাতে তুমি যাহা করিতেছ, তাহা আত্মরতি মাত্র। তুমি এবং তোমার মত ভাববিলাসী কয়েকজন পরস্পর আত্মপ্রশংসা করিবার অছিলায় মিথ্যা মায়ালোক সৃজন করিয়াছ, তাহার সহিত দেশের জন-সাধারণের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। তোমরা যাহাদের ছোটলোক বল, তাহারা তাড়ির আড্ডায় বসিয়া যাহা করে, তোমরাও তোমাদের সাহিত্য-সভায় বসিয়া তদপেক্ষা মহত্তর কিছু কর না। তাহাদেরও উদ্দেশ্য চিত্ত-বিনোদন, তোমাদেরও উদ্দেশ্য তাই! চিত্তবিনোদন করিতে বসিয়া তাহারাও গালাগালি মারামারি চীৎকার করে, ভিন্ন ভাষায় তোমরাও তাহাই কর। ইহার সহিত দেশের অথবা দশের কোন সম্পর্ক নাই—ইহা নিতান্তই তোমাদের গোষ্ঠীগত ব্যাপার। যাহারা তোমাদের গোষ্ঠীর লোক—সাহিত্য-সম্পৃক্ত হওয়াতে তাহারাই বা কি এমন মহত্তর ব্যক্তি হইয়াছে? তাহাদের জীবনের কতটা আধ্যাত্মিক সুখসাধন করিয়াছ? কতটা দুঃখমোচন সম্ভব হইয়াছে? তোমাদের দলের সকলেই তো দুঃখী। শুধু তাই নয়, সাধারণ সামাজিক মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে অধিকাংশই পাপিষ্ঠ নরাধম। ছবি, প্রফেসার গুপ্ত, লোকনাথ ঘোষাল, নিলয়কুমার, নীরা বসাক, নিপুদা, চণ্ডীচরণ দস্তিদার, হীরালাল মজুমদার, সে নিজে, অর্থাৎ সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট যাহারা—তাহারা একজনও কি মনুষ্য-হিসাবে শ্রদ্ধেয়? তবে? যে কয়জনকে সে জীবনে সত্য-সত্যই শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছে, তাহাদের কাহারও তো সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সহসা তাহার স্কুলের হেডপণ্ডিত

ধরণীধর ভট্টাচার্যকে মনে পড়িল। তিনি, মুকুজ্জেমশাই, বেলা মল্লিক, ভন্টুর বউদি, মৃন্ময়, হাসি, তাহার নিজের বাবা—ইঁহারা কেহই সাহিত্যের স্রষ্টা বা সমঝদার হিসাবে উল্লেখযোগ্য নহেন।

বহুদিন পূর্বে গ্রামে গ্রামে চরকা ও খদ্দর প্রচার করিতে করিতে তাহার যেমন মনে হইয়াছিল যে, সে ভুল পথে চলিতেছে। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়িতে পড়িতে সে যেমন উপলব্ধি করিয়াছিল যে, বিজ্ঞানের পথ তাহার পথ নহে—সাহিত্যের পথে চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়, সাহিত্যের পথেই সে দেশের প্রকৃত উপকার করিতে পারিবে, আজও তেমনই আবার অনিবার্যভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল, দেশের দুঃখ ঘুচাইব—ইহাই যদি তাহার জীবনের আদর্শ হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের পথও ভুল পথ। অন্যান্য নানারূপ বিলাসের মত ইহাও একরূপ বিলাস।

আরে! কে, শঙ্কর নাকি?

চলন্ত ট্রাম হইতে যে ব্যক্তিটি লাফাইয়া নামিল, তাহাকে সে এ সময়ে এখানে মোটেই প্রত্যাশা করে নাই।

উৎপল বম্বে হইতে কবে আসিল!

৫৫

শঙ্করের উচ্ছ্বাসহীন প্রশংসা নিপুকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। নিপু বুঝিয়াছিল, ওই কয় ছত্র মামুলি সমালোচনার মূল্য কি এবং অর্থ কি! মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও সে মনে মনে জ্বলিতেছিল। সে জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল, যখন দৈনিক কাগজগুলি শঙ্করের গুণগান করিয়া সাড়ম্বরে তাহার অভিভাষণটি বাহির করিল। অভিভাষণে যাহা ছিল, তাহা সুরুচিসঙ্গত সাহিত্যিক আলোচনা। শাশ্বত সাহিত্যের লক্ষণগুলির বিচার এবং বাংলা সাহিত্যে তাহাদের প্রকাশ লইয়া আনন্দ অথবা অভাব লইয়া দুঃখ। নিরপেক্ষ যে কোন সাহিত্যিকের নিকট অভিভাষণটি নিঃসন্দেহে উপাদেয়; কিন্তু নিপুর মনে হইল, উহা তৃতীয় শ্রেণীর চর্বিতচর্বণ। উহাতে নূতন কথা কি আছে?

মানবের ইতিহাসে যে নবযুগ সূচিত হইতেছে, রুশ দেশের জার-প্রপীড়িত জনসাধারণ সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য বিদ্রোহ করিয়া পুরাতন বিধিবিধান উলটাইয়া দিয়া যে বৈজ্ঞানিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, শঙ্করের অভিভাষণে তাহার কিছুমাত্র আভাস নাই। সুতরাং উহা বাজে। শাশ্বত সাহিত্যের সনাতন বুলি অনেকবার অনেক লোকের নিকট শোনা গিয়াছে, উহা শুনিবার আর প্রবৃত্তি নাই। মানবের অগ্রগতির, মানবের আধুনিকতম প্রতিভার নব জয়যাত্রার বাণী যদি শুনাইতে পার, তবেই তাহা শ্রাব্য। রুশ দেশের সহিত আমাদের দেশের মিল আছে। রুশ দেশ কৃষিপ্রধান, আমাদের দেশও কৃষিপ্রধান। তাহারাও একদিন ঠিক আমাদেরই মত দুর্দশাপন্ন ছিল। আমাদেরই মত নিরক্ষর, আমাদেরই মত রোগে অনাহারে জীর্ণ, ঋণভারে করভারে প্রপীড়িত। আমাদেরই মত তাহারা ধীরে ধীরে লয় পাইতেছিল, যে সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাহারা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, আমাদেরও সেই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্যে সেই মন্ত্রের ধ্বনি যে কবির বীণায় ঝঙ্কৃত হইবে, সে-ই নবযুগের কবি।

ঠোঁট বাঁকাইয়া নিপু যাহাদের নিকট বক্তৃতা করিতেছিল, তাহারা সকলেই তরুণ-বয়স্ক, সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রীধারী এবং রুশসাহিত্যে সুপণ্ডিত। প্রায় সকলেই বেকার, সকলেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সকলেরই নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা এত অত্যুচ্চ যে, সে উচ্চতার নিকট হিমালয়ও হীন হইয়া যায়, সকলেই স্বদেশহিতৈষী এবং সকলেরই ধারণা, যাহা করিলে স্বদেশের হিত হয় তাহা কেবল তাহাদেরই জানা আছে, অপরের নয়। দেশের নিকট যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত, স্বদেশের মুক্তির জন্য যাঁহারা জীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছেন, স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন—ইহাদের মতে, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিহীন। নূতন যুগের নূতন প্রেরণার খবর রাখেন না। এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়ির জয়গান করিয়া বেড়ান। তাঁহারা অধিকাংশই ক্যাপিটালিস্ট অথবা পেটি-বুর্জোয়া। তাঁহারা যাহা করিতেছেন অথবা বলিতেছেন, তাহা ক্যাপিটালিজ্‌ম-গন্ধী, তাহাতে সমগ্র দেশের উপকার হইবে না, তাহা মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল, শ্রমিকদের অথবা কৃষকদের নয়।

তাই ইহারা নূতন করিয়া দেশকে গঠন করিতে চায়। সাহিত্য যেহেতু লোকশিক্ষার প্রধান বাহন এবং সংবাদপত্র যেহেতু জনমত গঠন করে, সেই হেতু ইহাদের সকলেই প্রায় সাহিত্য অথবা সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে ব্যগ্র। ইহাদের নিজেদেরও সাহিত্য-পত্রিকা আছে, যদিও তাহার প্রচার খুব কম, কারণ লোকে যে রসের লোভে সাহিত্য-পত্রিকা কেনে, ইহাদের পত্রিকা সে রসে বঞ্চিত। ইহাদের পত্রিকা 'থিওরি' প্রচার করে, কিন্তু তাহা সাহিত্য হইয়া উঠে না। নিপুর যুগান্তকারী উপন্যাসটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা নিপুকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছে। যে নিপুকে আত্মীয়স্বজন কেহই কোন দিন আমল দেয় নাই, হিরণদার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সম্পর্কে আসিয়াও যে কিছুতেই নিজেকে পাদপ্রদীপের সম্মুখীন করিতে পারে নাই (কোথাকার অজ্ঞাতকুলশীল শঙ্কর আসিয়া যেখানে আসর জমাইয়া বসিল), সেই নিপু নিজেকে সহসা একটা দলের শীর্ষভাগে দেখিয়া মনে মনে ভারি একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে এমন একটা ভাব প্রকাশ করিতেছিল, যাহা তাহার প্রকৃত মনোভাবের বিপরীত। ভাবটা এই যে, আঃ, তোমরা আমাকে এ কি বিপদে ফেলিলে! আমি তো এসব চাই না, আমি চাই নির্জনে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া মন্ত্রের সাধনা করিতে। আমি সামান্য কেরানী বটে, কিন্তু আমি তপস্বী!

শঙ্কর সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছিল। একজন বলিল, লোকনাথবাবুর মত একটা জ্ঞানী লোক শঙ্করবাবুর পিছনে আছেন ব'লেই ওঁর সাহিত্য-সমাজে যা কিছু প্রতিপত্তি। আর একজন বলিল, কাল কিন্তু লোকনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি দেখলাম, শঙ্করের উপর একটু চটেছেন, বেশ একটু অপ্রসন্ন মনে হ'ল।

তাই নাকি?

সংবাদটাকে নিপু উপেক্ষা করিতে পারিল না।

তা হ'লে চল না, লোকনাথবাবুকে দিয়েই শঙ্করের অভিভাষণের একটা স্কেদিং সমালোচনা লেখানো যাক। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্—

একজন ভক্ত বলিল, লোকনাথবাবু কি আপনার মত লিখতে পারবেন?

আমি নিজের নাম দিয়ে ওটা আর লিখতে চাই না।

সদলবলে সকলে লোকনাথবাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইল। লোকনাথবাবু বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, নিপুকে দেখিয়া সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, শঙ্করবাবুর অভিভাষণটা পড়েছেন? চমৎকার হয়েছে। আমি যাচ্ছি তাকে অভিনন্দন জানাতে, এতটা আমি আশা করি নি।

নিপুকে হতাশ হইতে হইল। সদলবলে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যাবেন আপনি?

না। আমার অন্য কাজ আছে একটু এখন।

আমি চললাম তবে।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। শঙ্করের অভিভাষণ পড়িয়া সাহিত্য-প্রেমিক লোকনাথ ঘোষালের মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছিল।

নিপু সেই ছোকরাটির দিকে চাহিয়া বলিল, ওঁরা সবাই পেটি-বুর্জোয়া। আমাদের সঙ্গে ওঁদের সুর মিলতেই পারে না।

ঠিক হইল, অভিভাষণের স্কেদিং সমালোচনা নিপুই লিখিবে, কিন্তু বেনামীতে। স্কেদিং সমালোচনাটা লিখিতে বসিয়া নিপু কিন্তু প্রথমটা একটু বিপদে পড়িল। শঙ্করের অভিভাষণটা পুনরায় আগাগোড়া পড়িয়া তাহার মনে হইল, কিসের বিরুদ্ধে সে সমালোচনা করিবে! শঙ্কর যাহা লিখিয়াছে, তাহা এতই যুক্তিযুক্ত, তাহার ভাষা এতই জোরালো এবং ভঙ্গী এমনই চিত্তাকর্ষক যে, তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে ভদ্র অন্তঃকরণ স্বভাবতই একটু সঙ্কুচিত হয়। হাজার হোক, সে একদিন 'ক্ষত্রিয়'-দলের একজন সমঝদার সভ্য ছিল তো, সাহিত্যস্রষ্টা না হইলেও অন্তরের অন্তস্তলে সে সুসাহিত্যের রসগ্রাহী, মুখে তাহা স্বীকার করুক আর না করুক।

অনেকক্ষণ সে কলম হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। প্রবন্ধ ত্যাগ করিয়া তাহার চিন্তা অতীতে ফিরিয়া গেল। হিরণদাকে মনে পড়িল। বড়লোকের খামখেয়ালী ছেলে হিরণদা, পিতার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া নানারূপ খেয়াল চরিতার্থ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, এবং তাহারা (সে নিজেও তাহাদের মধ্যে একজন) ওই উচ্ছৃঙ্খল

বড়লোকের ছেলেটার তোষামোদ করিবার জন্য বিদূষক-বেশে তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়াছিল। সমঝদার হিসাবে ততটা নয়, যতটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায়। হিরণদা দিলদরিয়া লোক ছিলেন। কখনও কাহাকেও এক টুকরা রুটি ছুঁড়িয়া দিয়া, কখনও কাহারও পিঠ চাপড়াইয়া, এমন কি কখনও কাহারও মদের খরচ যোগাইয়াও তিনি তাহাদের অনেককে মাঝে মাঝে অনুগৃহীত করিতেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন শঙ্করকে। কারণ, শঙ্করই সর্বাপেক্ষা বেশি পদলেহী ছিল। লেখা-ব্যাপারে যতটা না হোক, লেহন-ব্যাপারে সে সত্যই একজন বড় আর্টিস্ট। বেশি কথা না বলিয়াও সর্বাপেক্ষা বেশি খোশামোদ করিতে পারে, তাহার গালাগালির মধ্যেও খোশামোদ প্রচ্ছন্ন থাকে। শাঁসালো ব্যক্তির খোশামোদ করাই তাহার পেশা। ইদানীং শঙ্কর যেসব পুস্তক অথবা প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিল, তাহা নিপুর মনে পড়িতে লাগিল। প্রত্যেকটি সমালোচনায় খোশামোদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, এমন কি যাহাদের পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিয়াছে, তাহাদেরও এক অদ্ভুত উপায়ে খোশামোদই করিয়াছে, তাহাদের অন্তরঙ্গ হিতৈষী সাজিয়া কটুভাষণের অন্তরালেই তাহাদের তুষ্টিবিধান করিতে চাহিয়াছে। নিপুর বইটার যে এই ছদ্ম-প্রশংসা করিয়াছে, ইহা তাহার ওই হীন মনোবৃত্তিরই পরিচয়। ভালই যদি না লাগিয়াছিল, সোজা ভাষায় গালাগালি দিলেই পারিত, তাহাতে বরং ন্যায়নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত। কিন্তু এ কি!

সহসা নিপুর মনে হইল, ইহাই পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি, ইহারা ক্ষমতাবানের খোশামোদ করিয়া অক্ষমের উপর তাহার প্রতিশোধ লয়। খোশামোদ করিতে পারে না বলিয়া নিপুর এই দুর্দশা।

সহসা তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল।

সে লিখিতে শুরু করিল।

৩৬

উৎপল ও সুরমার সহিত অনেক দিন পরে দেখা হইয়া শঙ্কর যেন তাহার পূর্বজীবনের স্বাদ খানিকটা ফিরিয়া পাইল, যে পূর্বজীবনে সুরমার সান্নিধ্যে তাহার মনে প্রথম রঙ ধরিয়াছিল, রিনিকে ঘিরিয়া প্রথম প্রণয়ের উদ্বোধন হইয়াছিল, মিষ্টিদিদির মাদকতায় প্রথম পদস্খলন ঘটিয়াছিল, কলিকাতা শহরের প্রথম স্পর্শে যে জীবন মাধুর্য-আবিলতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সেই পূর্বজীবনের অনুভূতি তাহার মনে আজ আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল স্মিতমুখী সুরমাকে দেখিয়া। আজ যেন শঙ্কর নূতন করিয়া আবার উপলব্ধি করিল, বিংশ শতাব্দীর যে প্রকাশ আমরা নারী-প্রগতিতে কামনা করি, যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখিয়া আমরা আমাদের মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাই, তাহা যেন শোভনভাবে সার্থক হইয়াছে সুরমা-চরিত্রে। সুরমা সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনীর কন্যা, ধনীর বধূ। কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোনরূপ উগ্রতা নাই, তাহা অতিশয় বিনম্র ও সুমধুর। কথায় বার্তায়, আকারে ইঙ্গিতে সে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হয় না যে, অধুনা-প্রকাশিত বিদেশী পুস্তক সে সর্বদাই পড়িয়া থাকে অথবা তাহাদের চারখানা মোটরকার আছে। অথচ অতি-বিনয়ের অভিনয়ও তাহার নাই। তাহার এই সহজ সপ্রতিভ সুমার্জিত রূপ শঙ্করকে বিস্মিত করিয়াছে, তাহাতে কোনরূপ আড়ষ্টতাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, সংযম আছে। সে পরপুরুষের সঙ্গে মেশে, আলাপ করে, হাসি-ঠাট্টাতেও যোগ দেয়; কিন্তু তাহার চরিত্রে কোথায় কি যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা কিছুতেই শোভনতার সীমারেখা অতিক্রম করে না। শঙ্করের কবিতা উপন্যাস গল্প লইয়া সে অনেক আলোচনা করিল। নীরা বসাকের মত সোচ্ছ্বাসে নয়, নিপুদার মত অবজ্ঞাভরেও নয়, যাহা বলিল, সবিনয় শ্রদ্ধাসহকারেই বলিল। তাহাতে বাচালতা নাই, নিজের বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা নাই, কিন্তু আন্তরিকতা আছে। সব লেখার প্রশংসা করিল না, কিন্তু যেগুলির অপ্রশংসা করিল, তাহা অন্তরকে ব্যথিত করে না; কারণ তাহা ঠিক নিন্দা নয়, তাহা যেন 'আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই' অথবা 'আমার রুচি একটু আলাদা রকমের' জাতীয় মন্তব্য।

উৎপলের বয়স কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু মন বদলায় নাই। সে এখনও ঠিক তেমনই দুষ্টবুদ্ধি, তেমনই খামখেয়ালী আছে। আগের মতই এখনও সে নূতন কিছু করিবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ। দুই বৎসর কাগজ চালাইয়া শঙ্করের মত সেও নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে, সাহিত্য-ব্যবসা ভদ্রলোকের কর্ম নহে। এ দেশে ভদ্রভাবে সাহিত্য-ব্যবসা করিতে গেলে দেশটাকে সর্বাগ্রে প্রস্তুত করিতে হইবে। জমি প্রস্তুত না করিয়া বীজ বপন করা মূর্খতারই নামান্তর।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি ক'রে জমি প্রস্তুত করবে তুমি?

শিক্ষা দিয়ে।

কোথায়, কাকে শিক্ষা দেবে?

ও, তুই বুঝি শুনিস নি, আমি আমাদের গ্রামের জমিদারিটা কিনে ফেলেছি? সেখানেই ভাবছি—

কিনে ফেলেছিস? রাজবল্লভবাবুরা কোথা গেলেন?

কলকাতা চ'লে এসেছেন বোধ হয়। আজকাল অধিকাংশ জমিদারই তো কলকাতায় চ'লে আসছেন। পাড়াগাঁ আর ভাল লাগছে না তাঁদের।

কি ক'রে কিনলি তুই?

কেনারামবাবুর মারফৎ।

শঙ্কর এবং উৎপল এক গ্রামেরই ছেলে। উৎপল গ্রামের জমিদার হইয়াছে! সংবাদটা শুনিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

উৎপল সোৎসাহে বলিতে লাগিল, রাজবল্লভবাবুর জমিদারি শুধু আমাদের গ্রামখানি নিয়েই নয়, পাশাপাশি দশখানা গ্রাম আছে। আমি ভাবছি, সমস্তটা নিয়ে একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট করব। শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি—সব রকমের যাতে উন্নতি হয়, তার চেষ্টা করার ইচ্ছে আছে।

অনেক টাকার দরকার তাতে।

অনেক টাকা আমার আছে। শ্বশুর মশাই যে টাকা আমায় দিয়েছিলেন, তার খানিকটা অবশ্য আমি জার্নালিজ্‌ম করতে গিয়ে নষ্ট করেছি—খুব বেশি অবশ্য নয়, হাজার দশেক; কিন্তু বাকিটা শ্বশুর মশাইয়ের পরামর্শমত ব্যবসাতে খাটিয়ে অনেক লাভ হয়েছে। টাকার জন্যে আটকাবে না, তা

ছাড়া আমি হয়তো প্রথমে একখানা গ্রাম নিয়ে আরম্ভ করব, কেনারামবাবুকে আমার প্ল্যান লিখেও পাঠিয়েছি।

তিনি—

শঙ্কর একটু হাসিল।

তিনি ছাড়া গ্রামে আর তো কোন বুদ্ধিমান লোকই দেখতে পাই না। তাঁকে দিয়ে যে চলবে না, তা বুঝতে পারছি, ভাল লোকের চেষ্টাতেও আছি; দেখি যদি—

সহসা উৎপল থামিয়া গেল। খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, তুই যাবি? তোকে বলতে ভয় করে। তোর আত্মসম্মান যে রকম প্রখর, হয়তো হঠাৎ চ'টে উঠবি। চল্ না, দুজনে মিলে নিজেদের গ্রামটার উন্নতি করা যাক। তোর কথার সুরে মনে হচ্ছে, আমার মতন তোরও ভুল ভেঙেছে। সাহিত্য-টাহিত্য ক'রে কিছু হবে না এখন এ দেশের। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই।

তুই কি তোর অধীনে চাকরি নিয়ে যেতে বলছিস আমাকে?

তা ঠিক বলছি না, আমি তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি ইচ্ছে করলে স্বাধীনভাবেও থাকতে পার। জ্যাঠামশাই যা রেখে গেছেন, তাতে তোমার স্বচ্ছন্দে চ'লে যাওয়া উচিত।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। বাবার উইলের কথা সে উৎপলকে বলিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল করালীচরণকে। করালীচরণের আগমন ও নির্গমন বার্তা সে জানিত না। ভন্টুর সহিত তাহার দেখাই হয় নাই। এই সূত্রে তাহার মনে পড়িল, ভন্টুর বউদিদি কাল আপিসে শন্টুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি একবার তাহার সাক্ষাৎ চান। কাল নানা গোলমালে যাওয়া হয় নাই। সময় করিয়া একবার যাইতেই হইবে। শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল।

উঠছিস? আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখিস একটু।

আচ্ছা।

৩৭

উপন্যাসে যাহা লিখিলে সমালোচকরা নাসা কুঞ্চিত করিয়া মনে করেন য, আর্ট ক্ষুণ্ণ হইল, লেখক যেন নিজের সুবিধার জন্য জোর করিয়া ঘটনাটা ়ই স্থানে ঘটাইয়া দিলেন; জীবনে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক সময় ত্য সত্যই তাহা ঘটে। শঙ্করের জীবনে ইতিপূর্বে এ রকম একাধিকবার টিয়াছে, আবার ঘটিল।

শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া তাহার বাবার উইলের কথাই ভাবিতে ভাবিতে থ চলিতেছিল। হঠাৎ নজরে পড়িল, ফুটপাথের এক ধারে মোস্তাক সিয়া আছে। তাহার বগলে একগাদা কাগজ, এক কানে জবাফুল, অন্য নে বিড়ি, নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া শাঁক-আলু ভক্ষণ করিতেছে। মোস্তাককে দখিয়া শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল—হয়তো করালীচরণের খবর এ বলিতে পারে। স্তুত জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই।

মোস্তাক, কি হচ্ছে এখানে?

মোস্তাক শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট করিল। বগল হইতে কাগজের গাদা ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল।

আহা, তোমার সব প'ড়ে গেল যে! দাঁড়াও, তুলে দিচ্ছি।

তুলিয়া দিতে গিয়া কিন্তু যাহা তাহার হাতে পড়িল, তাহা যে এখানে ভাবে পাওয়া যাইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। তাহার বাবার ইল এবং করালীচরণকে লেখা তাঁহার সেই চিঠিখানা।

এ তুমি কোথা থেকে পেলে?

মোস্তাক তাহার কর্তব্য সমাপন করিয়া পুনরায় শাঁক-আলুতে মন য়াছিল। কোনও জবাব দিল না।

বক্সি মশাই কি ফিরেছেন?

এই কথায় মোস্তাক হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি নাড়িয়া দিল।

আমি এই কাগজ দুখানা নিয়ে যাই, কেমন?

মোস্তাক আপত্তি করিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শঙ্কর ভন্টুর

বাড়ি যাইতেছিল, হঠাৎ মোড় ঘুরিয়া সে ঝামাপুকুরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে হইল, করালীচরণের খোঁজটা লইয়া যাওয়াই ভাল।

গলিটা ধোঁয়ায় ধূলায় আচ্ছন্ন। পানের দোকানের সামনে একজন কাবুলীওয়ালা একজন পাওনাদারকে লাঞ্ছিত করিতেছে, কয়েকজন লোক একটু দূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে ঋণগ্রস্ত লোকটার দুর্দশা দেখিতেছে। কাবুলীওয়ালার টকটকে লাল মখমলের জরি-বসানো ওয়েস্টকোটটা স্বল্পালোকেই চকচক করিতেছে। তাহার অন্তরের লোলুপতা নিষ্ঠুরতা যেন উহাতেই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে শঙ্কর দেখিতে পাইল, করালীচরণের বাসার সম্মুখে আলো জ্বলিতেছে, কে যেন দাঁড়াইয়াও আছে। কাছে গিয়া দেখিল, করালীচরণ নয়—একটি বারবনিতা, সাজসজ্জা করিয়া খরিদ্দারের প্রতীক্ষা করিতেছে। শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—মুখটা যেন চেনা-চেনা বলিয়া মনে হইতেছে। হাঁ, চেনাই তো! এ যে উষা—মুক্তোর প্রতিবেশিনী উষা। কেরানীবাগান হইতে উঠিয়া আসিয়া এইখানে ঘর-ভাড়া করিয়াছে নাকি? করালীচরণ কোথায় গেল?

আসুন বাবু, অনেকদিন পরে যে, পথ ভুলে নাকি?

উষাও শঙ্করকে চিনিতে পারিয়াছিল, একমুখ হাসিয়া সম্বর্ধনা করিল শঙ্কর কিন্তু আর দাঁড়াইল না, দাঁড়াইতে পারিল না। সেই উষার হাসি আজ এত বীভৎস!

শঙ্কর প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

৩৮

বউদিদি ঘরে খিল দিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতেছিলেন। অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছিলেন—তুমি আর দেরি ক'রো না, তাড়াতাড়ি চ'লে এসে কাজে জয়েন কর। সংসারে খরচ দিন দিন বাড়ছে। ঠাকুরপো এত খরচ একা আর চালাতে পারছে না। কাল তার শ্বশুর এসেছিলেন, তিনি ঠাকুরপোকে নাকি বলেছেন যে, তিনি না হয় মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য

করবেন, যতদিন না তুমি চেঞ্জ থেকে ফিরে আস। ঠাকুরপো একটু দোনোমোনো করছিল, আমি কিন্তু তাতে মত দিলাম না। কুটুমের কাছ থেকে এ ভাবে টাকা নেওয়াটা কি ভাল দেখায়! কিন্তু এটাও ঠিক যে, ঠাকুরপো বেচারা একা আর পেরে উঠছে না। তুমি আর ওখানে থেকো না, চ'লে এস। এখানেই নিয়ম ক'রে থাকলে শরীর সেরে যাবে। নন্টুরও কদিন থেকে রোজ জ্বর আসছে সন্ধ্যেবেলা, কুইনিন খেয়ে গেল না, ডাক্তারবাবু বলেছেন, ওরও নাকি বুকের দোষ জন্মাচ্ছে। ভগবান কপালে কি যে লিখেছেন, জানি না।

বউদি!

বউদিদি তাড়াতাড়ি কলম নামাইয়া খাতার তলায় চিঠিটা চাপা দিলেন, গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া লইলেন, তাহার পর খিল খুলিয়া বাহিরে আসিলেন।

শঙ্কর ঠাকুরপো নাকি? এস, এত রাত্রে যে?

নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল। ভন্টু ঘুমিয়েছে নাকি?

সে শ্বশুর-বাড়ি গেছে ইন্দুকে নিয়ে, জামাই-ষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে।

ও। আমাকে ডেকেছিলেন কেন বলুন তো?

ব'স, বলছি, দালানেই এস।

বাকুর ঘরের বন্ধ দ্বারের দিকে তাকাইয়া শঙ্কর বলিল, বাকুও আজ বড্ড শিগগির শুয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

ওঁর শরীরটা খুব খারাপ। শোথটা কিছুতেই কমছে না।

অন্য সময় হইলে হয়তো শঙ্কর বাকুর অসুখের বিষয়ে দুই-চারিটি প্রশ্ন করিত। এখন কিন্তু তাহার মনের অবস্থা এরূপ যে, এ সম্বন্ধে সে কিছুই বলিল না। মোক্তাকের নিকট হইতে বাবার উইলের যে নকলটা সে পাইয়াছিল, তাহা সে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। বাবার আসল উইলটা দেশে দেরাজের মধ্যে আছে। উইলের কোন সাক্ষী নাই, উইল রেজেস্টারি করা নাই। সেটাকেও অবলুপ্ত করিয়া দিলে উইলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতেই পারিবে না। কিন্তু শঙ্করের মনে

হইতেছিল, কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলেই কি উইল নষ্ট হইয়া যায়? আইনত যাহাই হউক, ধর্মত বাবার বিষয় সে কি লইতে পারে? বাবা তো তাহাকে কিছুই দিয়া যান নাই। সে যদি কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে অমিয়াই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে, সে নয়—ইহাই তাহার বাবার অন্তিম ইচ্ছা।

ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

শঙ্করকে একটি মোড়া আগাইয়া দিয়া বউদিদি নিজে একখানি আসন টানিয়া বসিলেন। শঙ্কর হঠাৎ যেন বউদিদি ও পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হইল। মোড়াতে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, বাবাজী কোথায়?

তিনি আজ চ'লে গেছেন।

চ'লে গেছেন? কোথা গেলেন?

তা জানি না। ঠাকুরপোর সঙ্গে আজ সকালে বাইরের ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ কি যে কথা হ'ল, তাও জানি না। ঠাকুরপো আপিস চ'লে যাবার পর উনিও নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরের ঘরের টেবিলে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন দেখলাম।

কি লেখা আছে তাতে?

মুচকি হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, মাত্র একটি লাইন—আমার আর ভাল লাগছে না, চললাম।

বউদিদি চুপ করিয়া গেলেন। একটা বিষাদের ম্লান ছায়ায় তাঁহার হাসি যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

আমাকে ডেকেছিলেন কেন?

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বউদিদি বলিলেন, ঠাকুরপোকে একটা কথা বুঝিয়ে বলতে পারবে তুমি? তুমিই যদি পার, আমি তো ব'লে ব'লে হার মেনেছি।

কি কথা?

ইন্দুকে নিয়ে ও আলাদা বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকুক। এমন ক'রে আমাদের সব্বাইকে নিয়ে ও আর পেরে উঠছে না। ওর মুখের পানে

চাইলে কষ্ট হয় আমার। আজকাল জলখাবার খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের সব্বাইকে জড়িয়ে কষ্ট পাবার কি দরকার ওর ? উনি এসে কাজে জয়েন করুন, তা হ'লেই আমাদের এক রকম ক'রে চ'লে যাবে। 'আমার কথায় ও মোটে কান দেয় না।

শঙ্কর ইহাও প্রত্যাশা করে নাই। ভন্টুকে ও বউদিদিকে পৃথক পৃথক কল্পনা করিতে সে অভ্যস্ত নহে। বউদিদি এ কি বলিতেছেন !

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কেন, কি, হ'ল কি ?

বউদিদি সবিস্তার সব বলিতে লাগিলেন। ইন্দু অথবা ভন্টু কাহারও দোষ দিলেন না, কিন্তু অবস্থা যাহা সত্যই দাঁড়াইয়াছে, তাহাই বলিতে লাগিলেন। শঙ্কর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

৩৯

শঙ্কব যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঢুকিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল, লেটার-বক্সের ভিতর একখানা মাসিক-পত্রিকা রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখিল 'মজদুর-দর্পণ'। উলটাইতেই চোখে পড়িল, তাহার সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে কে কি লিখিল ? নিরতিশয় ক্লান্তি সত্ত্বেও সে নীচের ঘরে বসিয়া সাগ্রহে প্রবন্ধটি পড়িতে শুরু করিয়া দিল, নিজের সম্বন্ধে এত বড় দীর্ঘ প্রবন্ধে কে কি লিখিয়াছে, তাহা অবিলম্বে জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। পড়িতে পড়িতে কিন্তু তাহার সমস্ত মন ক্ষোভে গ্লানিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য নাম দেওয়া থাকিলেও নিপুদার লেখা চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই ঈর্ষা-তিক্ত যুক্তি, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের ছলে সকলকে হীন করিয়া দিবার এই প্রয়াস, সহজ ভাবকে দুর্বোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিবার এই বক্র ভঙ্গী—নিপুদা ছাড়া আর কাহারও হইতে পারে না। সে যেন মানসপটে নিপুদার মুখখানা দেখিতে পাইল। গালের হাড় উঁচু, চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা, গালে কপালে মেচেতার দাগ, ঠোঁট বাঁকাইয়া কথা

বলিবার ভঙ্গী। গ্রন্থকীট লোকটা জীবনে কোথাও কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে 'মজদুর'দের উদ্ধার করিবার ছুতায় যেখানে-সেখানে নিজেকে জাহির করিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া শঙ্কর ঘাড় ফিরাইল। অমিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

তুমি এত রাত ক'রে ফিরলে ?

কেন, কি হয়েছে ?

নিতাই ঠাকুরপো—

অমিয়া আর বলিতে পারিল না, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে মেঝের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট শঙ্করের কোলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কি করেছে নিতাই ?

অনেক জেরার পর শঙ্কর জানিতে পারিল, চাকরটা সন্ধ্যার সময় ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে, অমিয়া বাড়িতে একা ছিল। নিতাই কোথা হইতে মদ খাইয়া আসিয়া হঠাৎ তাহাকে পিছন দিক হইতে জাপটাইয়া ধরে। অনেক ধস্তাধস্তির পর নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে পাশের ঘরে খিল দিয়া বসিয়া ছিল। নিতাই টেবিলের ড্রয়ার হইতে চাবির রিং লইয়া আলমারি খুলিয়া তাহার গহনার বাক্সটা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

শঙ্কর হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। সাহিত্যের স্বপ্ন তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে, কলিকাতায় আর সে থাকিতে পারিবে না।

৪০

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে উৎপলের সহিত দেখা করিল। বলিল যে, সে তাহার সহিত গ্রামেই ফিরিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টাতে সে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু একটি শর্তে।

শর্তটা কি ?

আমি তোমার অধীনে চাকরি করব।

বেশ, আমার কোনও আপত্তি নেই তাতে। একজন ভাল লোক তো আমি খুঁজছিই।

কিন্তু আসল শর্তটা হচ্ছে, কথাটা গোপন রাখতে হবে। তুমি এবং আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি এ কথা জানবে না।

তা হ'লেই তো মুশকিলে ফেললে দেখছি। তৃতীয় একটি ব্যক্তির নিকট আমি ইতিপূর্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তার কাছে কোন কিছুই গোপন রাখব না।

উৎপল মুচকি হাসিল।

সুরমা। ওর কাছে আমি সব বলি, এমন কি নিজের দুষ্কৃতি পর্যন্ত। তবে ও একটি লোহার সিন্দুকবিশেষ, একবার যা প্রবেশ করবে, তা আর সহজে বেরুবে না। যদি ইচ্ছে কর, ওকেও তুমি বিশ্বাস করতে পার।

শঙ্কর ক্ষণকাল ভাবিল। তাহার পর বলিল, বেশ। এইবার আমি উঠি তা হ'লে, ওই ঠিক রইল।

মাইনে কত নেবে, তা বললে না ?

সে তুমি ঠিক কর। যা দেবে, তাতেই আমি রাজী। তবে আর একটা কথা আছে, সেটাও ব'লে রাখা ভাল। মাইনে আমি কম নিতেও রাজী আছি, কিন্তু আমার কাজে তুমি যখন-তখন বাধা দিতে পারবে না। তা হ'লে কিন্তু বনবে না ভাই।

উৎপল হাসিয়া বলিল, বাধা দিতে হ'লে যে উদ্যম প্রয়োজন, তা যদি আমার থাকত, তা হ'লে আমি অন্য লোক খুঁজতাম না, নিজেই সব করতাম। সুতরাং সে বিষয়েও তুমি নির্ভয় থাকতে পার।

৪১

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ছাড়িতেছিল।

জিনিসপত্রসহ অমিয়াকে একটা গাড়িতে চড়াইয়া দিয়া শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ছিল। গতকল্য উৎপল সপরিবারে চলিয়া গিয়াছে, আজ সে যাইতেছে। সকলের সঙ্গেই তাহার প্রায় দেখা হইয়াছে, কেবল ভন্টুর সঙ্গে হয় নাই। বউদিদি ভন্টুকে যাহা বলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও অমুক্ত রহিয়াছে। কাল ভন্টুকে তাহার আপিসে ফোন করিয়া জানাইয়াছে যে, সে বোধ হয় চিরদিনের মত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে; বাড়িতে গিয়া তাহার সহিত দেখা হয় নাই, বউদিদিকেও সে বলিয়া আসে নাই যে, হঠাৎ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া সে গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছে, কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হইল, বলিতে পারিল না। অথচ ইহাই বলিতে সে গিয়াছিল। ভন্টু যদি স্টেশনে আসিয়া তাহার সহিত দেখা না করে, তাহা হইলে হয়তো আর দেখাই হইবে না। আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে তাহার সঙ্গে। শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ভন্টুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।···সিগারেট পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল, কিন্তু ভন্টু আসিল না। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে চুন্‌চুন আসিয়া হাজির হইল। চুন্‌চুনের সহিতও সে দেখা করিয়া আসে নাই। শঙ্কর প্রত্যাশা করিতে লাগিল যে, চুন্‌চুনই আসিয়া প্রথমে কথা কহিবে, কিন্তু চুন্‌চুন সেসব কিছুই করিল না। অন্য দিকে চাহিতে চাহিতে, যেন সে শঙ্করকে দেখিতেই পায় নাই এমনই ভাবে, প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গেল। শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর ডাকিল। মনে হইল, চুন্‌চুন যেন ডাকটাও শুনিতে পাইল না। সামনের প্ল্যাটফর্মে আর একটা প্রায়-খালি প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়াইয়া ছিল—বোধ হয় কোন লোকাল ট্রেন—তাহারই একটা কামরায় গিয়া চুন্‌চুন উঠিয়া পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, হয়তো কোথাও যাইবে, আমাকে দেখিতে পাইল না। আগাইয়া গিয়া আলাপ করিবে কি না, ভাবিতেছে, এমন সময় ভন্টুর ভাইপো শন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভন্টু কোথায় ?

কাকা এখানে আসবেন ব'লেই বেরিয়েছিলেন বাইক ক'রে। রাস্তায় হঠাৎ একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি প'ড়ে গেছেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে খবরটা দিতে।

খুব বেশি লেগেছে নাকি ?

পায়ের হাড় ভেঙে গেছে।

ও।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যাবার সময় তার সঙ্গে আর দেখাটা হ'ল না দেখছি। আচ্ছা, তুমি যাও। আমি গিয়েই চিঠি লিখব, কেমন থাকে খবরটা দিও আমাকে।

আচ্ছা।

প্রণাম করিয়া শন্টু চলিয়া গেল। শঙ্কর হাতঘড়িটা একবার দেখিল, ট্রেন ছাড়িতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। অমিয়াকে বলিল, তুমি ব'স, আমি আসছি। শঙ্কর দ্রুতপদে চলিয়া গেল। স্টেশনে সকলের ব্যবহারের জন্য যে ফোন আছে, তাহারই সহায়তায় মেডিকেল কলেজ ইমার্জেন্সি রুমের একটি ডাক্তারের সহিত সে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

ভন্টু নামে আমার একজন বন্ধু এখুনি বাইক থেকে প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙে আপনাদের ওখানে গেছে। তাঁকে যদি দয়া ক'রে একটু ব'লে দেন যে, শঙ্করবাবু ফোন করেছিলেন। নিতান্ত দরকারে আমাকে আজ চ'লে যেতে হচ্ছে, জিনিসপত্র সব ট্রেনে তুলে দিয়েছি, তা না হ'লে আমি এখনি তাকে দেখতে যেতাম। ব'লে দিন যে, আমি হাওড়া স্টেশন থেকে ফোন করছি। আজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি যদি ব'লে দেন, বড় ভাল হয়। মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে ? ও, আচ্ছা, উঠলে বলবেন। আচ্ছা, থ্যাঙ্ক্‌স্‌।

ফোনটা করিয়া শঙ্কর যেন খানিকটা তৃপ্তি লাভ করিল। কিছু করিতে না পারিয়া সে যেন অস্বস্তি ভোগ করিতেছিল। ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিতেই শঙ্কর একরূপ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই দেখে চুনচুন দাঁড়াইয়া

আছে। শঙ্কর কিছু বলিবার পূর্বেই সে হেঁট হইয়া শঙ্করকে প্রণাম করিল। ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছে, আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না, শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর তোমার? ভাল আছ তো?

চুনচুন স্মিতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না, ট্রেন চলিয়া গেল।

৪২

গ্রামে যখন শঙ্কর পৌঁছিল, তখন প্রভাত হইতেছে। সে পূর্বে কোনও খবর দেয় নাই। সব জিনিসপত্র লইয়া এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িল কেন, তাহা শঙ্করের মা বুঝিতে পারিলেন না; সবিস্ময়ে শুষ্কমুখে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

তুই হঠাৎ এসে পড়লি যে?

শহর আর ভাল লাগছে না, তোমার কাছেই থাকব এবার ঠিক করেছি।

আমার কাছে থাকবি?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা তিনি আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আমি রাক্ষসী, তোর ভাইকে খেয়েছি, বাপকে খেয়েছি, তোকেও খেয়ে ফেলব—পালা, পালা, পালা আমার কাছ থেকে।

সেই দিন রাত্রেই তিনি সম্পূর্ণরূপে আবার পাগল হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, এখানে ঠিক সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়, রাঁচি পাঠানো উচিত।

পঞ্চম অধ্যায়

চার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

প্রভাত হইতেছে, বাতায়নের ফাঁকে ফাঁকে আলো দেখা যাইতেছে। শঙ্করের ঘুম এখনও ভাঙে নাই, কিন্তু দুই বৎসরের শিশু-কন্যাটির ঘুম ভাঙিয়াছে এবং সে বুকের উপর চড়িয়া চোখের ভিতর ছোট ছোট আঙুল ঢুকাইয়া ডাকিতেছে, বাবা, ওত, ও বাবা, ওত।

শঙ্কর হাসিয়া চোখ খুলিল। অমিয়া আগেই উঠিয়া রান্নাঘরে আঁচ দিতে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিল। মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, মেয়ের বেলায় হাসা হচ্ছে, আর আমি ওঠাতে গেলে ধমক খেয়ে মরি।

শঙ্কর আর একটু হাসিয়া চোখ বুঝিয়া আবার পাশ ফিরিল।

পাশ ফিরে শুচ্ছ যে, তোমার আজ ছবিগঞ্জে যাবার কথা নয়?

মনে আছে।

কন্যা ডাকিল, বাবা, ওত।

শঙ্কর উঠিয়া বসিল। সত্যই তাহার অনেক কাজ, শুইয়া থাকিলে চলিবে না। ছবিগঞ্জে আজ একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা। তা ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে। বাহিরের ঘরে হয়তো ইতিমধ্যেই জনসমাগম হইয়াছে। কন্যা গলা জড়াইয়া গালে গাল রাখিয়া শুইল। অমিয়া চা করিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

ছাড়, এবার আমাকে উঠতে হবে।

না।

ভারি আদুরে দুষ্টু হয়েছ তুমি।

তুমি দুত্তু।

আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিল। শঙ্করের মনে হইল, এমনভাবে তাহাকে আর কেহ বোধ হয় কখনও বাঁধে নাই। জীবনে অনেকের বাহুপাশে সে বাঁধা পড়িয়াছে, কিন্তু এ নিগড়ের নিকট সেসব অতি অকিঞ্চিৎকর। তাহারই নিজের অন্তরের নিগূঢ় কামনা, যাহা বারম্বার বহু নরনারীকে বাঁধিতে চাহিয়াছিল কিন্তু পারে নাই, তাহাই যেন তাহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল, বাহিরের ঘরে কেনারামবাবু কয়েকজন লোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন।

চল, যাচ্ছি। একে নাও।

না, দাব না।

যাও, লক্ষীটি।

না—না—না।

জোর করিয়া চাকরের কোলে তাহাকে দিয়া শঙ্কর উঠিয়া পড়িল।

বাহিরের ঘরে কেনারাম চক্রবর্তীর সঙ্গে আসিয়াছিল ফরিদ এবং কাক্ষু। উভয়েরই উদ্দেশ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করা। কেনারাম চক্রবর্তী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি, সুপারিশ করিতে আসিয়াছেন। উৎপলের এবং কয়েকজন বর্ধিষ্ণু প্রজার টাকায় গ্রামে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। গভর্মেণ্টও কিছু টাকা তাহাতে দিয়াছেন—ঋণস্বরূপই দিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য—মহাজনদের হাত হইতে গরিব প্রজাদের রক্ষা করা। গরিব প্রজারা মহাজনদের নিকট হইতে অতিশয় চড়া সুদে টাকা কর্জ করিয়া সর্বস্বান্ত হয়। এই ব্যাঙ্ক কম সুদে টাকা ধার দেয় এবং ফসল উঠিলে কিস্তিতে কিস্তিতে তাহা শোধ করিয়া লয়। কেনারাম চক্রবর্তীর কর্তব্য—অনুসন্ধান করিয়া দেখা, যাহাতে ব্যাঙ্কের টাকা মারা না পড়ে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, ঋণপ্রার্থীর বিষয়সম্পত্তি এমন আছে কি না, যাহা হইতে টাকা উদ্ধার হইতে পারে এবং লোকটা বিশ্বাসযোগ্য কি না, টাকা লইয়া সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না! কেনারামবাবু ভূতপূর্ব জমিদার রাজবল্লভের নায়েব, এ অঞ্চলে সমস্ত প্রজার প্রকৃত অবস্থা তাঁহার জানিবার কথা, সুতরাং তাঁহাকেই

সেক্রেটারি করা হইয়াছে। শঙ্কর অবশ্য সর্বময় কর্তা। তাহার অনুমতি ছাড়া কিছুই হইবে না, ইহা কেনারামবাবুর সম্মতিক্রমেই উৎপল নির্ধারিত করিয়াছে।

কেনারাম চক্রবর্তী যদিও সারাজীবন নায়েবি করিয়া কাটাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে নায়েব বলিয়া মনে হয় না, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া মনে হয়। হাব-ভাবে পোশাক-পরিচ্ছদে কথায়-বার্তায় তাঁহার যে মার্জিত রূপটি বিচ্ছুরিত হয়, তাহা সম্ভ্রম-উদ্রেককারী। তাঁহার ঢিলা-হাতা এণ্ডির পাঞ্জাবি, ধবধবে সাদা বাঁধানো দাঁত, ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে বুদ্ধিদীপ্ত গাম্ভীর্য, অতি-আধুনিক বুকনি-সমন্বিত আলাপ—সমস্ত মিলিয়া এমন একটা সুষ্ঠু প্রকাশ যে, ভিতরের আসল মানুষটিকে চিনিতে দেরি লাগে, অনেক সময় চেনাই যায় না। কেনারামবাবু শঙ্করের পিতৃবন্ধু, সুতরাং শঙ্কর তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। উৎপলও দূর হইতে তাঁহাকে যতটা তুচ্ছ করিয়াছিল, নিকটে আসিয়া দেখিল, তিনি ততটা উপেক্ষণীয় নহেন ; এমন কি এ বিশ্বাসও তাহার হইল যে, তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার এই পল্লী-উন্নয়ন-চেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং একটা বড় বিভাগের শীর্ষদেশে তাঁহাকে স্থাপন করিতে সে ইতস্তত করিল না। কেনারামবাবু এ ব্যাপারে প্রথমে কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম লইতে স্বীকৃতই হন নাই। তাঁহার ভাবটা ছিল, তোমরা ছেলে-ছোকরার দল, দেশের কাজ করিতে চাহিতেছে, এ তো বেশ ভাল কথা, তোমরা নিজেদের নিয়মে নিজেদের বুদ্ধি অনুসারেই চল না—আমাদের মত বুড়াকে আবার ওসবের মধ্যে টানিতে চাও কেন? উৎপলের অনুরোধেই তিনি যেন অবশেষে খানিকটা অনিচ্ছাসহকারে এবং খানিকটা আবদারের খাতিরে শঙ্করের অধীনে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি হইতে রাজী হইয়াছেন।

শঙ্কর বাহিরে আসিতেই কেনারামবাবু বলিলেন, দুটো গরিব প্রজাকে টাকা ধার দিতে হবে, তারা এসেছে, তোমার যা জিজ্ঞেস করবার করতে পার।

আমি আর কি জিজ্ঞেস করব? আপনি যখন এনেছেন—

কেনারাম স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তোমার এটা কর্তব্য ব'লেই বলছি।

আমি কি আর আপনার চেয়ে ভাল বুঝি? কত টাকা চায়?

প্রত্যেকেই চায় হাজার খানেক ক'রে। দেবে কি না ভেবে দেখ। ফরিদের দশ বিঘে জমি আছে, কারুর আছে আট বিঘে। এ ছাড়া বাস্তুভিটেও আছে অবশ্য দুজনের।

বেশ তো, আপনি যদি ভাল বোঝেন—

ভালমন্দ বোঝবার ভার তোমার, তুমিই ফাইনাল অথরিটি—

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। কেনারামবাবুও চুপ করিয়া রহিলেন, কেবল তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে কৌতুকপূর্ণ একটা নীরব হাস্য যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। চতুর দাবা-খেলোয়াড় চাল আগাইয়া দিয়া যেমনভাবে বিপক্ষের মুখের দিকে চায় অনেকটা তেমনিভাবে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর বলিল, বেশ তো, দেওয়া যাক। গরিব প্রজাদের উপকারের জন্যেই তো ব্যাঙ্ক।

কথাটা লুফিয়া লইয়া কেনারাম বলিলেন, উপকার কথাটাই যদি ব্যবহার করছ, তা হ'লে বেশি কড়াক্কড়ি করাটা অনুচিত। করলে তোমাদের সঙ্গে নেকিরামের অথবা রাজীববাবুর কোনও তফাত থাকে না।

তা তো বটেই। প্রজাদের উপকার করাই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে টাকাটা যাতে মারা না যায়, সেটা যথাসম্ভব দেখতে হবে।

সে তো একশো বার। তবে 'যথাসম্ভব' কথাটা মনে রেখো। নেকিরাম-রাজীববাবুর টাকাও মারা যায়, এমন কি কাবুলীওয়ালারাও সব সময়ে টাকা আদায় করতে পারে না, তাই ওদের সুদ অত চড়া—

আপনি যদি ভাল মনে করেন, ওদের টাকা দিন না, আমার আপত্তি নেই।

বেশ।

পকেট হইতে কেনারামবাবু একটি ছাপানো অনুমতি-পত্র বাহির করিলেন।

সই ক'রে দাও তা হ'লে।

শঙ্কর সহি করিয়া দিল। কেনারামবাবু উঠিয়া পড়িলেন, শঙ্করও, উঠিয়া তাঁহার সহিত বারান্দা পর্যন্ত আসিল। বারান্দায় ফরিদ ও কাঙ্গু জোড়হস্তে বসিয়া ছিল। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। উভয়ের মধ্যে কিন্তু কোনও তফাত নাই। উভয়েরই অনাহারক্লিষ্ট মূর্তি, পরিধানে শতছিন্ন মলিন বসন, উভয়েরই দৃষ্টি ম্লান ভীত-চকিত, উভয়েই ঋণে জর্জরিত, রোগে জীর্ণ, নানা অভাবে নিষ্পিষ্ট দরিদ্র চাষী।

২

আহারাদির পর শঙ্কর ছবিগঞ্জের দিকে গরুর গাড়ি চাপিয়া রওনা হইল। সেখানে মুকুন্দরাম পোদ্দারের বৈঠকখানায় নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। মুকুন্দরাম একজন ধনী মহাজন, ছবিগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নূতন জমিদার উৎপলের এই সকল জনহিতকর কার্যের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন, শঙ্করের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল। ছবিগঞ্জে কিছুদিন পূর্বে যে নূতন পাঠশালাটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ঘরটিও তিনি দিয়াছেন। হয়তো অদূরভবিষ্যতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় করিবার সহায়তাও তিনি করিবেন।

কলিকাতা পরিত্যাগের পর দেখিতে দেখিতে চার বৎসর কাটিয়া গেল। যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা অনেকটা সফল হইয়াছে বইকি। দশটি পাঠশালা, একটি বালিকা-বিদ্যালয়, গোটা দুই দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র চাষীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রতি গ্রামে গ্রামে নূতন ইঁদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছে, পুরাতন কূপগুলির সংস্কার-সাধন করা হইতেছে। ইহা ছাড়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সহজ প্রতিষেধ্য সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ প্রভৃতির জন্যও চেষ্টার ত্রুটি নাই।

এই শেষোক্ত কার্য দুইটির ভার সে নিপুদাকে দিয়াছে। মাস ছয়েক

পূর্বে নিপুদা নিজের নিতান্ত দুরবস্থার সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়া শঙ্করকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল যে, আত্মীয়স্বজন কাহারও সহিত তাহার বনিতেছে না। কাকা-কাকীর অনুগ্রহপ্রদত্ত অন্ন এবং সদিচ্ছা-প্রণোদিত উপদেশ আর সে হজম করিতে পারিতেছে না। যে কেরানীগিরি সে কিছুকাল পূর্বে যোগাড় করিয়াছিল, তাহাতে সে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। টিকিয়া থাকিতে পারিলে হয়তো জীবনের শেষে মাসিক পঁচাত্তর টাকার গ্রেডে উন্নীত হইতে পারিত; কিন্তু তাহার জন্য প্রত্যহ যে পরিমাণ হীনতা স্বীকার করিতে হইত, তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে চাকুরি গিয়াছে। প্রাইভেট টিউশনি করিয়া কিছুদিন চলিয়াছিল, একটি ভাল ছাত্রও জুটিয়াছিল। ছাত্রের অভিভাবকেরাও ভদ্রলোক ছিলেন অর্থাৎ সামান্য কারণে প্রাইভেট টিউটারকে কড়া কথা শুনাইয়া কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। বেতনও ভাল দিতেন। কিন্তু সে চাকরি বেশিদিন রহিল না, কারণ ছাত্রটি এক বারেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিয়া ফেলিল। আরও দুই-এক স্থানে টিউশনি জুটিয়াছিল, কিন্তু অভিভাবকদের অভদ্রতা অথবা অতিশয় কম বেতন অথবা ছাত্রের ধৈর্যচ্যুতিকর নির্বুদ্ধিতা—একটা না একটা কারণের জন্য তাহাকে সেসব ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। শূন্য বখরাদার হইয়া অর্থাৎ নিজের পরিশ্রম এবং বুদ্ধি ক্যাপিটাল স্বরূপ দান করিয়া সে একজন বন্ধুর সহিত ব্যবসায়ে যুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে ব্যবসায়টি ফেল করিয়াছে। এই সব বর্ণনা করিয়া অবশেষে সে লিখিয়াছিল যে, দুর্ভাগ্যক্রমে এমন দেশে এমন সময়ে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, কিছুতেই ভদ্রভাবে এক মুঠা অন্ন জুটিতেছে না, অথচ সে কাজ করিতে প্রস্তুত, তাহার বুদ্ধির অভাব নাই, বিদ্যাও যৎকিঞ্চিৎ আছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার এমন দুর্দশা নিশ্চয়ই হইত না। সাহিত্য-পথেও সে চেষ্টা কম করে নাই। ইংরেজী বাংলা কয়েকটা প্রবন্ধ লিখিয়া সে নামজাদা সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছে। কিন্তু কোথাও সেগুলি ছাপা হয় নাই। সর্বত্রই

কটা না একটা দল নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসিয়া াছে, কিছুতেই বাহিরের লোককে সেখানে ঢুকিতে দিবে না। যদিই বা কষ্টে কোথাও প্রবেশাধিকার মেলে, প্রবন্ধের ন্যায্য পারিশ্রমিক মিলিবে। 'মজদুর-দর্পণ' কাগজের এমন আয় নাই যে, বেশি মূল্য দিয়া তাহার প্রবন্ধ কিনিতে পারে। কাকা-কাকীর সংস্রব সে ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং এখন হয় অনাহারে, না হয় আত্মহত্যা করিয়া তাহাকে মরিতে হইবে। ঙ্কর নাকি তাহার এক উদার বন্ধুর অর্থে পল্লী-উন্নয়ন করিতেছে, সে যদি তাহাকে কোন একটি—ইত্যাদি।

শঙ্করের সহিত নিপুদা যদিও ভাল ব্যবহার করে নাই, তবু শঙ্কর তাহাকে আহ্বান করিয়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও স্যানিটেশনের কাজে লাগাইয়া দিয়াছে। নিজেও সে একদিন অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল, এ অবস্থার দুঃখটা যে কত গভীর ও শোচনীয়, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। যে হিরণদার অনুগ্রহে উদ্ধারলাভ করিয়াছিল, সেই হিরণদারই বন্ধু নিপুদা। চক্ষুলজ্জাবশতই ঙ্কর প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। উৎপলও আপত্তি করে নাই। ানও বিষয়ে সে আপত্তি করে না। সে টাকা দিয়াই নিশ্চিন্ত, শঙ্করকেই সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ মালিক করিয়া দিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে সে কেবল হিসাব-নিকাশ লইবে, কার্য কতদূর অগ্রসর হইল! ইতিমধ্যে শঙ্কর যা ভাল ঝে করুক, সে কোন কথা বলিবে না।

বালিকা-বিদ্যালয়টির জন্য শঙ্কর কলিকাতা হইতে হাসিকে আনাইয়াছে। াধারণত সেই সব শিক্ষিতা মহিলারা বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী-পদে বাহাল হন, যাঁহারা কুরূপের জন্য অথবা অর্থাভাবে সমাজে স্বামী সংগ্রহ করিতে পারেন না। হতাশ প্রণয়িনীও মাঝে মাঝে আসিয়া জোটেন। শঙ্করের ধারণা—শিক্ষয়িত্রী হিসাবে ইঁহারা অযোগ্য। শিক্ষয়িত্রী হইতে হইলে মনের যে সমতা ও প্রসন্নতা থাকা উচিত, তাহা ইঁহাদের না থাকিবারই কথা। ইঁহারা বঞ্চিত ক্ষুধিত, ইঁহাদের সমস্ত মনপ্রাণ পড়িয়া থাকে সেই সব ভাগৈশ্বর্যের দিকে—যাহা তাঁহারা পান নাই, অথচ যাহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের রাগ্যও জন্মে নাই। মাতৃত্বই নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি। তাহা লাভ না

করিলে চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। তাই হাসিকে সে আনিয়াছে হাসির শুধু যে বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা আছে তাহাই নয়, স্বামী-চ বৃহৎ আদর্শের সংস্পর্শে আসাতে সে অভিজ্ঞতা মহত্ত্বপূর্ণ। তাহার নারী অবলম্বনস্বরূপ একটি পুত্রও আছে। হাসি প্রথমে আসিতে চায় নাই অনেক অনুরোধ করিয়া তাহাকে সে আনিয়াছে এবং বালিকা-বিদ্যাল সম্পূর্ণ ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

গরুর গাড়ি চলিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে চাষের জমি। দূরে দূ চাষারা টোকা মাথায় দিয়া লাঙল চষিতেছে। কত দরিদ্র অথচ কত মহ উহারা! উহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া শঙ্কর মনে-প্রাণে ইহাই বুঝিয়া যে, মানব-চরিত্রে যেসব গুণকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, তাহা উহাদে চরিত্রেই প্রচুর পরিমাণে আছে। তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের 'চরি বলিয়া এমন কোন কিছু নাই, যাহাকে শ্রদ্ধা করা যায়; যাহা আছে, তাহ স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল একটা হীন-ধরনের চতুরতা মাত্র। এই শিক্ষি ভদ্রলোকেরা সত্যই বড় দুর্দশাপন্ন। ইহারা ভাল করিয়া ভোগও করি পারে না, ত্যাগও করিতে পারে না। ইহারা আর পাঁচজনকে দেখাইব ভোগের একটা অভিনয় করে মাত্র, এবং সেই লেফাপা বজায় রাখিবার জ আজীবন প্রাণপণ করে। সত্যকার ত্যাগের নাম শুনিলে ইহারা ভয় পায় তবে ত্যাগের অভিনয় করিয়াও অনেক সময় লেফাপা বজায় রাখিতে হ সে রকম ত্যাগ ইহারা করে মাঝে মাঝে। কিন্তু মুখোশ কিছুদিন পরে খসিয়া যায়, এবং তখন ইহাদের কদর্য স্বরূপ দেখিয়া সকলে আতঙ্কি হইয়া উঠে।

সহসা তাহার মনে হইল, এই সব লইয়া একটা উপন্যাস লিখিলে কেম হয়? ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদারে'র মত উপন্যাস সে কি লিখিতে পা না? না, সময় নাই, তাহার অনেক কাজ। অনেক কাজ সত্ত্বেও কি তাহার মন সাহিত্যবিমুখ হয় নাই। সাহিত্যকে সে ত্যাগ করিতে পা নাই। যাহা তাহার অন্তরের বস্তু, তাহাকে ত্যাগ করিবে কি করিয়া সময় পাইলেই, এমন কি সময় নষ্ট করিয়া এখনও সে সাহিত্যচর্চা করে

ট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এখনও সে মাঝে মাঝে লেখে বইকি, সাময়িক ত্রিকাদিতে সেসব প্রকাশিতও হয়। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সঙ্গে অবশ্য এখন াহার পূর্বের সে সম্বন্ধ নাই। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা সে লোকনাথবাবুকে দান রিয়া দিয়াছে—লোকনাথ স্বেচ্ছায় যাচিয়া স্বয়ং সে ভার লইয়াছেন। সে ত্রিকার কাজ এখন—লোকনাথবাবুরই সাহিত্যিক মতামত লিপিবদ্ধ করা। র কোন লেখকের নিকট তিনি লেখা ভিক্ষা করেন না, বিজ্ঞাপন-গণের মুখ চাহিয়া আত্মমর্যাদা নষ্ট করেন না, কোন বড়লোকের খাতিরে জের সাহিত্যবুদ্ধিকে এক চুলও বিচলিত করেন না। তাঁহার সারস্বত-ধনার ত্রিসীমানায় তিনি লক্ষ্মী অথবা লক্ষ্মীর বাহনদের সামান্য ছায়াপাতও হ্য করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং 'ক্ষত্রিয়' কাগজের চাহিদা নাই। বিক্রয়ের ন্য সজ্জিত হইয়া স্টলে স্টলে তাহা খরিদ্দারের আশায় মাসে মাসে পথ াহিয়াও থাকে না। তাহা মাঝে মাঝে বাহির হয়—ঠিক মাসে মাসে নয়, বং সাহিত্য-রসিকদের নিকট বিনামূল্যে বিতরিত হয়। লোকনাথ ঘাষালের অর্থসামর্থ্য কতটা তাহা শঙ্কর ঠিক জানে না; শুধু জানে যে, তিনি ুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকরা সাধারণত দরিদ্র, লোকনাথবাবু কি করিয়া য নিজ ব্যয়ে 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইয়া বিতরণ করেন, তাহা ভাবিয়া শঙ্কর বিস্মিত তাঁহাকে চিঠিতে এ সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের কানও উত্তর দেন নাই। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকায় শঙ্কর এখনও মাঝে মাঝে লেখে, কিন্তু সে লেখা লোকনাথ ঘোষালের অনুমোদন লাভ করিলে তবে প্রকাশিত । বাজে লেখা লোকনাথ ঘোষাল ছাপেন না, শঙ্করের অনেক লেখা নি ফেরত দিয়াছেন। লোকনাথ ঘোষালকে শঙ্কর একটি বিদ্যালয়ের ভার য়া তাহার পল্লী-উন্নয়ন-কার্যে সাহায্য করিবার জন্যও আমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি নিজের যে মাইনর স্কুলে তদিন কাটাইয়াছেন, প্রথম যৌবনে চেষ্টা-চরিত্র করিয়া যাহা তিনি নিজেই কদিন স্থাপন করিয়াছিলেন, সে স্কুল ছাড়িয়া কোথাও তিনি যাইবেন না।

'সংস্কারক' পত্রিকাতেও শঙ্কর মাঝে মাঝে লেখে। এ পত্রিকাটিও স্তান্তরিত এবং রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখানে আজকাল হীরালাল

৬০

মজুমদার অথবা নিলয়কুমার নাই, কুমার পলাশকান্তিই বর্তমান স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ অনিল এবং নীরাই বর্তমান 'সংস্কারক' পত্রিকার কর্ণধার। কুমার পলাশকান্তির উপন্যাস, অনিল সান্যালের বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মনৈতিক সামাজিক প্রবন্ধ এবং নীরার গল্প-কবিতাই এখন 'সংস্কারকে'র অধিকাংশ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতেছে। নিলয়কুমারের কবিপত্নী রেণুকা দেবীও 'সংস্কারক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। তিনি প্রায়ই প্রেমের কবিতা লেখেন এবং তাহা 'সংস্কারকে'র প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়। নীরার অনুরোধে শঙ্করও মাঝে মাঝে লেখে।

হীরালাল মজুমদারের 'সংস্কারক' কি করিয়া কুমার পলাশকান্তির হইয়া গেল, সে ইতিহাস বড় করুণ। একদা ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যভাষণের জন্য নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য, সততা ও সাহিত্যিক নিষ্ঠার জন্য 'সংস্কারক' পত্রিকার যে সুনাম ছিল, সেই সুনামের সুবিধা লইয়া ভাগিনেয় নিলয়কুমার বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিতে করিতে পত্রিকাখানিকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাহার গৌরবময় অগ্রগতি আর সম্ভব ছিল না। ভাল পত্রিকায় ভাল লেখকমাত্রেই লিখিতে চায়। আরও প্রলোভন ছিল 'সংস্কারকে'র বিজ্ঞাপনে লেখা থাকিত—ভাল লেখা সমুচিত মূল্য দিয়া গ্রহণ করা হয়, এবং রচনানির্বাচনে সাহিত্যিক মানদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও প্রকার মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় না। এই উচ্চাদর্শে উৎসাহিত হইয়া অনেক ভাল লেখক তাঁহাদের রচনা 'সংস্কারক' পত্রিকায় প্রেরণ করিতেন। ক্রমশ কিন্তু এই কথাটাই সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বিজ্ঞাপনে যাহাই লেখা থাক, লেখার মূল্য সহজে কেহ পাইবেন না এবং লেখার মূল্য লইয়া বেশি কড়াকড়ি করিলে সে লেখা ছাপা হইবে না। ইহাও বুঝিতে কষ্ট হইল যে, 'সাহিত্যিক মানদণ্ড'ও বিজ্ঞাপনের বুলি-মাত্র, চালিয়াত নিলয়কুমারের স্বকীয় মানদণ্ডই আসল মাপকাঠি এবং সে মাপকাঠির স্থূল কথা—অর্থ, মানে সেই অর্থ যাহা দিয়া মোটর কেনা যায় অথবা ঋণ শোধ হয়। পত্রিকার কর্মচারীগণও সময়ে বেতন পাইতেন না। শুধু লেখক এবং কর্মচারীগণই নয়, একটা পত্রিকার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্যান্য যেসব ব্যক্তি জড়িত

থাকেন, তাঁহারাও 'সংস্কারকে'র সুনামে আস্থা স্থাপন করিয়া শেষ পর্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন। কাগজওয়ালা, টাইপ-সরবরাহকারী, কালির দোকানদার, ব্লক-প্রস্তুতকারক কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, 'সংস্কারক' পত্রিকার টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহাদের আদালত পর্যন্ত ছুটিতে হইবে। হীরালাল মজুমদার সত্যই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে গেলে তিনি সত্য কথাই বলেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কিছুই দেখতে শুনতে পারি না, আপনারা নিলয়ের কাছে যান, সে-ই সব ব্যবস্থা করবে। নিলয়ের কাছে যাইতে তাঁহাদের আপত্তি নাই, গিয়াছিলেনও। কিন্তু সাহেবী-প্রকৃতির নিলয়কুমারের দেখা পাওয়াই শক্ত, তিনি প্রায় সর্বদাই 'নট অ্যাট হোম'। অনেক হাঁটাহাঁটির পর দৈবাৎ তাঁহার দর্শন মিলিলে টাকার পরিবর্তে তিনি তারিখ দিতেন এবং প্রায়ই সে তারিখের মর্যাদা রক্ষা করিতেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলে আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কুমার পলাশকান্তি উদ্ধার না করিলে হয়তো 'সংস্কারক' পত্রিকা অবলুপ্ত হইয়া যাইত। কুমার পলাশকান্তির এবম্বিধ হিতৈষণা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়; যদিও দুষ্টলোকে রটাইয়াছে যে, সাহিত্য-প্রীতিবশত ততটা নহে, যতটা নিলয়কুমারের পত্নী রেণুকার জন্যই তিনি নাকি এই জনহিতকর কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। রেণুকার ন্যায় জনৈকা বিদুষী কবি অর্থাভাবে কষ্ট পাইবেন, তাহা পলাশকান্তির ন্যায় মহাপ্রাণ নাকি সহ্য করিতে অক্ষম। পাওনাদারদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রচুর অর্থ দিয়া 'সংস্কারক' পত্রিকার সমস্ত স্বত্ব কিনিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, হীরালাল মজুমদার এবং নিলয়কুমারকে মাসে মাসে মাসোহারাও দিয়া থাকেন। রেণুকা দেবীর মধ্যে তিনি অসাধারণ কবি-প্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহাকে নাকি 'পুশ' করিতেছেন।

দেখিয়ে হুজুর।

গাড়োয়ান মুশাই হঠাৎ কথা কহিয়া উঠিল। গাড়িটাও হঠাৎ একটু একপেশে হইয়া পড়িল।

কি?

বয়েলকো বদমাশি।

শঙ্কর উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বাঁ ধারের কালো গরুটা জোয়াল খুলিয়া ফেলিয়া রাস্তার পাশ হইতে দূর্বা ছিঁড়িয়া খাইতে শুরু করিয়াছে। ডান ধারের সাদা গরুটা বোকার মত দাঁড়াইয়া আছে।

কহাথা না ?

তাই তো।

গরু জোড়া সম্প্রতি কেনা হইয়াছে। মুশাই গাড়োয়ান কয়েক দিন হইতে শঙ্করকে বলিতেছে যে, ইহাদের জোড় ঠিক মিলে নাই। কালো গরুটা বেশি চালাক এবং বেশি পেটুক, সাদাটা কিঞ্চিৎ নির্বোধ এবং স্বল্পাহারী। মুশাইয়ের অভিপ্রায় এবং উপদেশ—কালো গরুটাকে বিক্রয় করিয়া তাহার স্থানে মুশাইয়েরই বাদামী রঙের গরুটাকে নিযুক্ত করা। কারণ মুশাইয়ের মতে তাহার এই বাদামী গরুটির স্বভাবও উক্ত সাদা গরুটিরই অনুরূপ—বেশি চালাকি নাই এবং খুব কম খায়। বাবু যদি অনুমতি করেন, মুশাই বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। উহার জোড়াটা মরিয়া গিয়াছে, একটা গরু লইয়া সে আর কি করিবে, তাহা ছাড়া তাহার ক্ষেত এখন চষিবেই বা কে, ছেলেটা তো কলে চাকরি লইয়া চলিয়া গেল, গরুটা বেচিয়াই ফেলিতে হইবে। হাটে লইয়া গেলে ভাল দামেই সে বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু বাবু যদি কেনেন, তাহা হইলে সে—.ইত্যাদি।

বেচ দিজিয়ে শালেকো।

কালো গরুটাকে জোয়ালে বাঁধিতে বাঁধিতে মুশাই পুনরায় স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিল।

এখন তাড়াতাড়ি নে, ছবিগঞ্জে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে দেখ্‌ছি। অনেক কাজ সেখানে আমার।

হো গিয়া।

গরুটাকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া মুশাই তড়াক করিয়া স্বস্থানে উঠিয়া বসিল এবং দ্রুতবেগে গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। শঙ্কর মুশাইয়ের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দিয়া তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, ফ্যাক্টরিতে তাহার পুত্র বিষুণের চাকরি

করিয়া দিয়াছে; তবু তাহার অভাব মেটে না। তাহার এই গোচরিত্র-বিশ্লেষণের মূলে যে অর্থাভাব, তাহা শঙ্করের বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, কেন, এত অভাব কেন ইহাদের? আর কি করিলে ইহাদের দুঃখ দূর হয়?

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা হীরাপুর গ্রামে ঢুকিল।

হীরাপুরে নিমাই ঘটক থাকে। হীরাপুরের নব-প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলের হেড-পণ্ডিত সে। গ্রামেরই ছেলে, আই. এ. ফেল করিয়া বসিয়া ছিল, শঙ্কর তাহাকে স্কুলের হেড-পণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। হেড-পণ্ডিতি করিবার যোগ্যতা ছেলেটির নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ঠিক ওই জন্যই যে শঙ্কর তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে তাহা নয়, আসল কারণ—শঙ্কর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আকর্ষণের প্রধান কারণ রূপ। রূপ জিনিসটার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, স্ত্রী-পুরুষ ফল-পুষ্প জন্তু-জানোয়ার আকাশ-সমুদ্র যেখানেই তাহার আবির্ভাব ঘটুক না, তাহা মানুষকে মুগ্ধ করে। রূপ দেখিয়াই শঙ্কর প্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার পর আরও মুগ্ধ হইয়াছে তাহার সাহিত্য-প্রীতি এবং সাহিত্য-বিষয়ে চিন্তার অভিনবত্ব দেখিয়া। শঙ্কর আজকাল যাহা কিছু লেখে, তাহা সর্বাগ্রে নিমাই ঘটকের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং তাহার অভিমত গ্রাহ্য করে। নিমাই ঘটক সাহিত্য-স্রষ্টা নয় বটে, কিন্তু উঁচুদরের রসিক সমঝদার—অন্তত শঙ্করের তাহাই বিশ্বাস।

হীরাপুর গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্করের মনে পড়িল, তাহার "জাতীয় সাহিত্য" নামক প্রবন্ধটা ঘটকের কাছে অনেকদিন পড়িয়া আছে। প্রবন্ধটি লিখিবার অব্যবহিত পরেই ঘটকের সহিত দেখা হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি পড়িবে বলিয়া লইয়া গিয়াছিল, এখনও ফেরত দেয় নাই। যদিও ছবিগঞ্জে তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন, তবু সে হীরাপুরে নামিয়া পড়িল। প্রবন্ধটি নিমাই ঘটকের কেমন লাগিয়াছে, তাহা জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল, না। সে সাহিত্য-পথ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সাহিত্য তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। মনের প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে যে ভাবনা তাহার অন্তরতম সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, তাহা সাহিত্য-ভাবনা। ওই

ভাবনাই সে সর্বদা করিতেছে, উহা ছাড়া অন্য কোনও ভাবনায় তাহার সুখ নাই। ইহার জন্য তাহার কর্তব্যকর্মে ত্রুটি ঘটিতেছে ইহা সে বোঝে, সেবার যে কাঁটাপোখর গ্রামের স্কুলটা গবর্মেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইল না, তাহার কারণ, সে সময়মত স্কুল-ইন্স্পেক্টরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তোয়াজ করিতে পারে নাই। দেখা না করিতে পারার কারণ, সে তখন প্রকাণ্ড একটা কবিতা লইয়া এমন তন্ময় হইয়া ছিল যে, ইন্স্পেক্টরের কথা তাহার মনেই ছিল না। অনুরূপ ঘটনা আরও কতবার ঘটিয়াছে। আজও ছবিগঞ্জে যাইবার পথে সে হীরাপুরে নামিয়া পড়িল।

নিমাই ঘটক বাড়িতেই ছিল।

স্মিতহাস্যে নিমাই তাহাকে সম্বর্ধনা করিল। নিমাইয়ের দোহারা চেহারা, বর্ণ যে খুব টকটকে ফরসা তাহা নয়, কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে, চোখ-মুখের গড়নে, মৃদু হাস্যে এমন একটা রূপ আছে, যাহা সচরাচর দেখা যায় না। নিমাইয়ের একমাত্র পার্থিব বন্ধন ছিলেন মা, তিনি বছর খানেক পূর্বে মারা গিয়াছেন। এখন নিমাই একা। নিজেই রাঁধিয়া খায়, ঘরের একটি গাই আছে, সেটির পরিচর্যা করে, নিজের কাজকর্ম নিজেই করিয়া লয়। তাহার খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরটি বেশ পরিষ্কার করিয়া নিকানো, তকতকে ঝকঝকে। কোঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়া নিমাই বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া ছিল, শঙ্করের গাড়ি থামিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আসুন, স্কুল আজ বন্ধ।

স্কুল দেখতে আসি নি, তোমার কাছে এসেছি।

নিমাই তাড়াতাড়ি একটি কম্বলের আসন বিছাইয়া দিল। শঙ্কর উপবেশন করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। নিমাইয়ের মত নিমাইয়ের ঘরটিরও বেশ একটি নিরাভরণ সৌন্দর্য আছে। চমকপ্রদ নয়, কিন্তু দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। একটি অতি সাধারণ চৌকি এবং বই রাখিবার শেল্ফ ছাড়া ঘরে অন্য কোন প্রকার আসবাবই নাই, তাহার সামান্য কাপড় জামা দড়ির আলনাতে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। শেল্ফগুলি কেরোসিন কাঠের, প্রত্যেকটিতে বই ঠাসা, প্রত্যেকটি বই মলাট দেওয়া।

ছবিগঞ্জে মুকুন্দ পোদ্দারের বাড়ি যাচ্ছি। ভাবলাম, অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, একবার নেবে যাই। একটু স্বার্থও যে নেই তা নয়, আমার সেই প্রবন্ধটা—

হ্যাঁ, আমার পড়া হয়ে গেছে।

উঠিয়া একটি খাতার ভিতর হইতে একটি লম্বা খাম বাহির করিল এবং খামের ভিতর হইতে প্রবন্ধটি বাহির করিয়া শঙ্করকে দিল। বেশ যত্নসহকারেই প্রবন্ধটি রাখিয়াছিল, বোঝা গেল।

কোন বক্তব্য আছে এ সম্বন্ধে ?

আমার বেশ ভালই লেগেছে। তবে—

স্মিতমুখে নিমাই চুপ করিয়া গেল।

তবে কি ?

কেবল একটু, মানে—

অত ইতস্তত করবার দরকার কি, ব'লেই ফেল না।

সাহিত্যের পূর্বে কোনরকম বিশেষণ বসাতে আমার যেন কেমন একটু গে। এমন কি জাতীয়, স্বদেশী—এই সব বিশেষণও।

প্রত্যেক জাতির সাহিত্যে যখন এক-একটি ক'রে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তখন অস্বীকার করি কি ক'রে, বল ?

আমার অবশ্য বেশি বিদ্যে নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রত্যেক সাহিত্যেরই াসল বৈশিষ্ট্য—তা চিরন্তন মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সহৃদয় ালোচনা, কোন বিশেষ দেশের মানুষের নয়।

তা ঠিকই। ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু প্রত্যেক দেশের মানুষের সুখ-ঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা মূলত এক হ'লেও বাইরে সে সবের প্রকাশ দেশে দেশে কটু ভিন্ন নয় ? এই যেমন ধর, আমাদের দেশের একজন নারী আর াশ্চাত্য দেশের একজন নারী। উভয়েই নারী বটে ; কিন্তু একজনের কালো প, মাথায় খোঁপা, পায়ে আলতা, পরনে শাড়ি, নাকে নাকছাবি, মুখে পান, াখের কালো তারায় সভয় সলজ্জ দৃষ্টি ; আর একজনের ধপধপে সাদা রঙ, থার চুল ছাঁটা, পায়ে জুতো, পরনে স্কার্ট, নাকে পাউডারের গুঁড়ো, ঠোঁটে

লিপ্‌স্টিক, চোখের নীল তারায় নির্ভয় কৌতূহল-দৃষ্টি। দুজনেরই মন বিশ্লেষণ করলে উভয় ক্ষেত্রেই হয়তো চিরন্তনী নারীকে দেখা যাবে; কিন্তু দুজনের বাইরের রূপ আলাদা। সাহিত্যেরও তেমনই একটি বাইরের রূপ আছে। তা ছাড়া, যে মানুষ সাহিত্যের প্রধান উপাদান, সেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ সব দেশে সমান নয়, ভাল-লাগা মন্দ-লাগার রূপ নানা দেশে নানা রকম, তাই—

আপনি বাংলার জাতীয় সাহিত্যের এমন কি রূপ দেখতে পেয়েছেন, যা অন্য দেশের সাহিত্যে নেই? আপনি মধুর রসের কথা বলেছেন, তা কি অন্য সাহিত্যে বিরল?

মধুর রস আমাদের সাহিত্যের বিশেষ রস। ওইটেই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমরা বীর রস চাই না, অদ্ভুত রস চাই না, বীভৎস রস চাই না—যদি মধুর রসও তার সঙ্গে সঙ্গে না থাকে। ওই মধুর রসটাই আমরা ভালবাসি। বৈষ্ণব-সাহিত্যে, বৈষ্ণব-ধর্মে যে মাধুর্য একদিন আপামরভদ্র সকলের মনে-প্রাণে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাই এখনও আমাদের সাহিত্যের মূল সুর। শুধু রাধা-কৃষ্ণ নয়, যশোদা-গোপাল, সুবল-কানাই, বৃন্দা-চন্দ্রাবলী, এমন কি জটিলা-কুটিলা-আয়ানঘোষও আমাদের প্রিয়—মানবপ্রেমের নানা রস-রূপের সাধনাতেই আমরা তন্ময়। ও ছাড়া আমরা আর কিছুতে আনন্দ পাই না। কালীর মতন ভীষণাও আমাদের আদরে আবদারে বিগলিতা, মহাদেবের মতন সন্ন্যাসীকেও আমরা জামাই সাজিয়েছি, দুর্গার যে রূপে আমরা মুগ্ধ তা তাঁর মহিষমর্দিনী রূপ নয়, তা তাঁর কন্যা-রূপ। দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে। মধুর-রস-সমুদ্রেই সোনার তরী ভাসিয়েছিলেন ব'লে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি, রাবণকে রিয়ালিস্টিক রাক্ষস-রূপ দিলে মাইকেলের কাব্য এতটা আদর পেত কি না সন্দেহ। রাবণ শুধু যে মানুষ তা নয়, সে রীতিমত বাঙালী—

নিমাই হাসিয়া বলিল, কিন্তু এত সব উদাহরণ আপনি আপনার প্রবন্ধে দেন নি—

উদাহরণ না দিলেও যা বলেছি, তাতে—। আচ্ছা, উদাহরণ দিয়ে দেব—বড় হয়ে যাবে ব'লে দিই নি।

সহসা এই রস-আলোচনার মাঝে একটা বেসুর বাজিল। মলিন-বসন-পরিহিত জীর্ণ-শীর্ণ একটা লোক আসিয়া শঙ্করকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

এ আবার কে?

নিমাই ঘটক চিনিত—গ্রামেরই একজন কৃষক। উহাদের পল্লীতে শঙ্করের ব্যবস্থাতেই কিছুদিন পূর্বে একটি ইঁদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছিল, কিন্তু ইঁদারাটি ইহারই মধ্যে অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে, পুনরায় সংস্কার করা প্রয়োজন।

কতদিন আগে ইঁদারা হয়েছিল?

মাস ছয়েক আগে।

পাকা ইঁদারা?

হ্যাঁ।

ছ মাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল কি ক'রে? হয়েছে কি?

বাঁধানো পাড় ধ'সে ধ'সে প'ড়ে যাচ্ছে।

এ রকম হবার মানে?

মানে যে কি, তাহা নিমাই ঘটক জানিত, কিন্তু সে কিছু বলিল না। সে নির্বিবাদী লোক, কাহারও নামে লাগানো তাহার স্বভাব নয়। সে চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র চাষাও সভয়ে করজোড়ে চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করব। মাটির পাড় দিয়েই বাঁধিয়ে দেওয়া যাবে আপাতত। তোমরাও কিছু চাঁদা তুলতে পার যদি, ভাল হয়। আমরা তো একবার ক'রে দিয়েছি, মেরামতটা অন্তত তোমাদের নিজেদের করা উচিত। আরও কয়েক জায়গা থেকে ইঁদারা ভাঙার খবর এসেছে, আমরা কত আর করি, বল?

চাষা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে বাঙালী না হইলেও বাংলা বোঝে। পুরুষানুক্রমে হাতজোড় করিয়া থাকাই তাহাদের অভ্যাস। বহু কটূক্তি, বহু উপহাস, বহু প্রহার, বহু অত্যাচার সত্ত্বেও তাহারা হাতজোড় করিয়া থাকে। উহা করা ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় তাহাদের নাই।

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, যাও তুমি, আমি ব্যবস্থা করব।

খুব ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। শঙ্কর পকেট হইতে ডায়েরি বাহির করিয়া ইঁদারার কথাটা লিখিয়া লইল।

ইহার পর রস-সাহিত্যের আলোচনা আর জমিল না।

শঙ্কর উঠিবার উপক্রম করিল।

আমাকে এক গ্লাস জল দাও দিকি, খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।

নিমাই উঠিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে ছোট একখানি চকচকে কাঁসার রেকাবিতে চারটি গুড়ের বাতাসা ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিল।

এ আবার কেন?

ঈষৎ হাসিয়া নিমাই বলিল, কুন্তলাদিদি বলেছেন, শুধু জল কাউকে দিতে নেই।

কুন্তলাদিদিটি কে?

আমাদের হরিদার স্ত্রী। কুন্তলাদিদির কথা শোনেন নি?

খুব শুনেছি। তাঁর শিষ্য হয়েছ নাকি?

স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল, শিষ্য না হয়ে উপায় নেই। বড় ভাল লাগে তাঁকে, সত্যিই ভক্তি হয়।

কেন, কি দেখলে তাঁর মধ্যে?

তিনি সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর এম.এ., অথচ তাঁর জীবন এত সরল অনাড়ম্বর যে এমন আর আমি দেখি নি, কল্পনাও করি নি।

উৎপলের স্ত্রী সুরমাও খুব সরল অনাড়ম্বর, সেও লেখাপড়া কিছু কম জানে না।

তিনি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, তাঁর কথা ছেড়ে দিন।

কেন, বড়লোক ব'লে অপরাধটা কি হ'ল?

অপরাধ নয়। বড়লোকের পক্ষে অহমিকাটা ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু দারিদ্র্যের অহমিকা ত্যাগ করা সত্যিই বড় শক্ত, কারণ ওইটুকু অবলম্বন ক'রেই দরিদ্রেরা মাথা উঁচু ক'রে থাকে। আমার মনে হয়, কুন্তলাদির সেটুকুও বোধ হয় নেই। অথচ তাঁর যা গুণ, তাতে অহঙ্কারী হ'লে বেমানান হ'ত না।

কি গুণ? এম.এ. ডিগ্রীটা?

তা তো আছেই। কিন্তু ডিগ্রী সত্ত্বেও তিনি সংসারের সব কাজ হাসিমুখে করেন—রাঁধেন, বাসন মাজেন, বড়ি দেন, চরকা কাটেন, পিসীমার সেবা করেন, আবার ওর মধ্যে একটু লেখাপড়াও করেন।

তা যদি হয়, তা হ'লে তো—

সত্যিই অদ্ভুত। আলাপ নেই আপনার সঙ্গে?

আলাপ করতে সাহস করি নি।

নিমাই আবার খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, চলুন একদিন আমার সঙ্গে। তাঁর পরদা নেই, আর হরিদাকে তো চেনেনই!

আচ্ছা, পরে দেখা যাবে, এখন চলি।

শঙ্কর আর দেরি করিল না, ছবিগঞ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

ছবিগঞ্জের মুকুন্দ পোদ্দার একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন। বেশ বিস্তৃত তেজারতি কারবার আছে। দরিদ্র বিপন্ন চাষীদের চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়াই তাঁহার ব্যবসায়। উৎপল ও শঙ্করের এই সব জনহিতকর প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার সহানুভূতি না থাকিবারই কথা, কিন্তু বাহির হইতে মনে হয়, তিনি যেন এসব ব্যাপারে অত্যুৎসাহী।

কিন্তু তাঁহার প্রকৃত মনোভাবটি—সম্ভবত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই—তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী। মুখে তিনি অতি-বিনয়ী। শঙ্করের সহিত দেখা হইবামাত্র গদগদ স্বাগত-সম্ভাষণের আতিশয্যে তাহাকে অস্থির করিয়া তোলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যাহা ব্যক্ত করে, তাহা মোটেই সম্মানজ্ঞাপক নহে। সে দৃষ্টিকে ভাষায় অনুবাদ করিলে অনেকটা এইরূপ দাঁড়ায়—থাম্ ব্যাটা, তোকে দেখাচ্ছি! দেশ উদ্ধার করতে এসেছেন, ইস্, ভারি আমার লায়েক!

যদি ইহাই মুকুন্দ পোদ্দারের মনের কথা হয়, তাহা হইলে বাহিরের

আচরণের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কোথায় এ কথা যাঁহারা ভাবিবেন, তাঁহারা মুকুন্দ পোদ্দার জাতীয় লোকদের সম্যকরূপে চেনেন না। চিনিলে ইহা তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিত না যে, ইঁহাদের মনের কথার সহিত বাহিরের আচরণের প্রায়ই গরমিল থাকে। শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য সৎ অসৎ কোনপ্রকার কার্য করিতেই ইঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। এ ক্ষেত্রে মুকুন্দ পোদ্দারের মনোভাব অনেকটা এই রকম—ও, তোমরা মহত্ত্ব আস্ফালন করিয়া আমাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিবে ভাবিয়াছ—দেখা যাক, কে কাহাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে পারে—টাকা আমারও কিছু কম নাই—টাকা দিয়া স্কুল পাঠশালা আমিও করিয়া দিতে পারি এবং করিয়া দিবও। তোমরাই যে উদারতার অভিনয় করিয়া সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করিবে—আর আমি পিছনে পড়িয়া থাকিব, তাহা কিছুতেই হইতে দিব না। দেখাই যাক না তোমাদের দৌড়টা কতদুর !

মুকুন্দ পোদ্দার নাতিস্থূল পুষ্টকান্তি ব্যক্তি। বেশ কুচকুচে কালো রঙ, মাথায় এককালে ঢেউ-খেলানো অ্যাল্‌বার্ট টেড়ি ছিল, এখন টাক পড়িয়াছে। গলায় সোনার হার, বাহুমূলে সোনার তাবিজ, অনামিকায় নীলা-বসানো সোনার আংটি, এমন কি সামনের কয়েকটি দাঁতেও সোনা-লাগানো।

শঙ্কর যখন ছবিগঞ্জে পৌঁছিল, তখন প্রায় অপরাহ্ণ। মুকুন্দ তাকিয়া ঠেস দিয়া নিত্যসঙ্গী কাঠের হাতবাক্সটির নিকট বসিয়া ছিলেন। শঙ্করকে দেখিবামাত্র সোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধনা করিলেন।

আসুন দেবতা, আসুন আসুন, সকাল থেকে আপনার কথাই ভাবছি ব'সে ব'সে। ওরে, গোবরাকে খবর দে—বল্, বাবু এসেছেন, চা-টা আনুক।

আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

এমন আর কি দেরি হয়েছে দেবতা ! আপনারা পাচ কাজের মানুষ, আমাদের মত নিষ্কর্মা তো নন—হে হে হে হে—পাচ জায়গায় ঘুরতে গেলেই দেরি একটু আধটু হয়েই থাকে।

মুকুন্দর চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, মুখে বিনীত হাস্য।

আপনাদের পাঠশালা কেমন চলছে, বলুন ?

চলছে। ভালই চলছে—বলতে হবে, গতকাল গুটি দশেক ছাত্তর জুটেছিল, না হে ভজহরি ?

পাশের ঘর হইতে ভজহরি উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জুটেছিল।

মাত্র দশজন ?

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

এতেই অবাক হচ্ছেন' দেবতা! আমার বিবেচনায় ওই দশজনই যথেষ্ট আপাতক্—ওই শেষ পর্যন্ত টেকে কি না দেখুন।

এখানে এত কম ছেলে হবার কারণ কি, অন্য অন্য গ্রামে তো এত কম হয় নি ?

এটা যে চাষার গ্রাম দেবতা, এ বেটা ছাতুখোর চাষারা লেখাপড়ার মর্ম কি বুঝবে বলুন ? বলে কি জানেন, বলে যে, ছেলেকে যদি পাঠশালায় পাঠাই, তা হ'লে আমাদের গরু চরাবে কে ?—এই যাদের মতিগতি, তাদের আর কতদুর কি হবে বলুন ?

মুকুন্দ পোদ্দারের মুখে হাসি এবং চোখে অগ্নির আভা ফুটিয়া উঠিল।

তবু চেষ্টা করতে হবে বইকি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই—চেষ্টা করব বইকি—চেষ্টা তো করছিই। নাইট-স্কুল খোলবার ঘর সব সাফ-সুতরো করিয়ে রেঁখেছি। মাস্টারের জন্যে একটা মোড়া, ছাত্তরদের জন্যে মাদুর শতরঞ্জি—সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। কথা দিয়েছি যখন, তখন সে কথার নড়চড় করব না। আসুন না, দেখবেন।

এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কথাবার্তায় বাধা পড়িয়া গেল। পিছনের বারান্দায় কে যেন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভজহরি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিল শোনা গেল, আরে মোলো, রোতা কাহে ?

কাঁদছে নাকি মাগী ? এ তো আচ্ছা এক ফৈজৎ হ'ল দেখছি !

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া মুকুন্দ বলিলেন, গরিব চাষাদের উদ্ধার করবার জন্যে আপনারা ব্যাঙ্ক খুললেন, কিন্তু এ ব্যাটারা আমাদের পাছ ছাড়বে না। আমাদের সুদ বেশি, সোনা রূপো বন্ধকি না রেখে আমরা ধার দিই না, তবু আমাদের ছাড়বে না। ওদের যত বুঝিয়ে বলি—তুম

লোগকা উদ্ধারকা বাস্তে উৎপলবাবু ব্যাংক খুলা হ্যা, হুঁয়াই যাও ; কিছুতে যাবে না।

মুকুন্দ পোদ্দারের চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুনের হলকা ছুটিতে লাগিল।

যায় না কেন ?

যাবে কি ক'রে ? আপনারা তো জমিজরাৎ না থাকলে টাকা দেবেন না। এ মাগীর না আছে জমি, না আছে জরাৎ। জন খেটে খায়।

স্বামী নেই ?

স্বামীটিকে পূর্বেই খেয়েছেন। সে দিকে সৌভাগ্যবতী। একটি কাঠ-ব্যাটা ছিল, তিনি বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে সরেছেন শহরে।

কাঠ-ব্যাটা কি ?

সৎছেলে। এতদিন এ দেশে আছেন, কাঠ-ব্যাটা কাকে বলে জানেন না, অথচ আপনারা এ দেশ উদ্ধার করতে চান !

শঙ্কর একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মনের কথা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়াতে মুকুন্দও ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি পাকা লোক, তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিলেন, আপনারা তো সেদিন এসেছেন, আপনাদের আর কি দোষ দোব ! আমি সারা জীবনটাই এ অঞ্চলে কাটালাম, 'থাবুনি' কাকে বলে আমিই জানতাম না, সেদিন শিখলাম ভজহরির কাছে—ছট পরবের সময় ওরা ময়দা আর চালের গুঁড়ি দিয়ে যে 'ঠেকুয়া' তৈরি করে, তাকে বলে 'থাবুনি'। জানতেন ?

শঙ্করকে স্বীকার করিতে হইল যে, সে জানিত না। ভজহরি আবার পাশের ঘরে ক্রন্দমানা রমণীটিকে সান্ত্বনা দিল, রোও মৎ, রোকে কি হোগা। জেবর জোগাড় কর, তব রুপিয়া মিলে গা।

জেবর কথাটা শঙ্কর জানিত, জেবর মানে—গহনা। জিজ্ঞাসা করিল, কিসের জন্যে ও টাকা চায় ?

একটা ন্যাংনেঙে ছেলে আছে, তার বিয়ে দেবে, সেইজন্যে হাঁসুলি বাঁধা দিয়ে টাকা নেবার জন্যে দমাদ্দমি করছে। এদের উদ্ধার করা কি সহজ আপনি ভেবেছেন ? হারামজাদীরা বিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয় কেন

তাও তো বুঝি না! বিয়ে দিলেই তো ছেলে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ওর কাঠ-ব্যাটা বেশ ছিল এতদিন, আমারই এখানে খাটত-খুটত। যেই গওনা ক'রে বউটি নিয়ে এসেছে—বাস্, অমনই উধাও। গওনা মানে বোঝেন তো? দ্বিরাগমন। হাঁসুলিটা ওজন ক'রে দেখেছ ভজহরি?

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল, বিশ ভরি সাড়ে ন আনা।

গোটা দশেক টাকার বেশি দেওয়া যায় না। মাসে টাকা পিছু দু আনা ক'রে সুদ দিতে হবে।

ভজহরি বলিল, সুদ দিতে ও রাজী আছে, কিন্তু কুড়িটা টাকা চায়।

চাইলেই কি দেওয়া যায়? আমার পোষানো চাই তো!

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুকুন্দ বলিলেন, টাকায় তিন আনা ক'রে সুদ দিতে রাজী আছে?

আছে।

তা হ'লে দাও। কিন্তু তিন মাস যদি সুদ না দেয়, তা হ'লে হাঁসুলি আর ফেরত পাবে না। বাকি টাকাটা খেটে শোধ করতে হবে। রাজী যদি হয় দাও—ছাড়বে না যখন, উপায় কি?

বুঝা?

ভজহরি তাহার নিজস্ব হিন্দীতে মেয়েটিকে মুকুন্দর প্রস্তাব বুঝাইতে শুরু করিল।

মুকুন্দ বলিল, চলুন, আমরা ততক্ষণ ঘরটা দেখে আসি। একটা লণ্ঠন দরকার হবে, সেটা এখনও যোগাড় হয়ে ওঠে নি। আপাতক তেলের ডিব্‌রিই জ্বলুক একটা—অ্যাঁ, কি বলেন আপনি?

লণ্ঠন আমি কালই পাঠিয়ে দেব।

মহত্ত্ব-দ্বন্দ্বে পরাজিত হইবার লোক মুকুন্দ নন।

পাঠিয়ে দেবার দরকার নেই। এতই যখন করতে পেরেছি, একটা লণ্ঠনও দিতে পারব। ও ভজহরি, লণ্ঠন একটা চাই, বুঝলে?

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল, যে আজ্ঞে।

উভয়ে উঠিয়া নৈশ-বিদ্যালয়ের ঘরটি দেখিতে গেলেন।

৪

কয়েক দিন পরে শঙ্কর মুরারিপুর নামে আর এক গ্রাম হইতে ফিরিতেছিল। সেখানে শঙ্করের স্থাপিত ডিস্পেন্সারির নূতন ডাক্তারবাবুটির সহিত স্থানীয় কয়েকজন বেহারীর মনোমালিন্য হইয়াছিল। বেহারীদের ইচ্ছা ছিল, একজন বেহারীই নিযুক্ত করা। বাঙালী ডাক্তারবাবুটির সহিত নানা ছুতায় তাই তাহারা কলহ করিতেছে। ডাক্তারবাবুটিও কলহপ্রবণ এবং বেহারীদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত, সুতরাং কিছুতেই নিজেকে তাহাদের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। মুরারিপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা সমবেতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়াছে। শঙ্কর তাহারই তদন্ত করিতে গিয়াছিল। সাময়িকভাবে মিটমাট হইয়া গেল বটে। আসল সমস্যার সমাধান হইল না।

রাত্রি হইয়াছে। শুক্লা অষ্টমীর চন্দ্র পশ্চিমদিগন্তে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার কাছে দুই-একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রও জ্বলিতেছে। চক্রবালরেখা-সংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণী পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মত দেখাইতেছে, মেঠো সুরে কোথায় যেন একটা বাঁশের বাঁশি বাজিতেছে! মুশাই নীরবে গাড়ি হাঁকাইতেছে। শঙ্কর ভাবিতেছে।

ভাবিতেছে, এই বেহারে তাহার এবং উৎপলের বাবা বহুকাল পূর্বে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। বেহারই তাহাদের জন্মভূমি এবং তাহারাও নানা দেশ ঘুরিয়া অবশেষে বেহারে আসিয়াই পুনরায় নিজেদের জীবন আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের কি বাংলা দেশে ফিরিয়া যাওয়া উচিত ছিল? অনেক হিতৈষী তাহাকে এবং উৎপলকে উপদেশ দিয়াছিলেন, দেশের উপকার করিতে হইলে বাংলা দেশের উপকার কর গিয়া। এ দেশে জনহিতকর কিছু করা ভস্মে ঘি ঢালার মতই নিরর্থক। বেহারের প্রতি শহরে শহরে, প্রতি গ্রামে গ্রামে খোঁজ করিয়া দেখ, যেখানেই বাঙালী গিয়াছে, সেখানেই তাহার কিছু না কিছু জনহিতকর কার্য করিয়াছে। কিন্তু বেহারীরা কি তজ্জন্য বাঙালীদের প্রতি কৃতজ্ঞ? মোটেই না। "বাঙালী-বেহারী ফীলিং" নামক

বিষটি ক্রমশ উগ্রতর হইয়া বরং প্রবাসী-বাঙালীদের জীবন দিন দিন দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে। ভবিষ্যতে আরও তুলিবে। সুতরাং এখানে নূতন করিয়া জীবন পত্তন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শঙ্কর কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-বেহারী, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য প্রভৃতি নানা বিভাগে জাতিকে বিভক্ত করিয়া খণ্ড-কলহ করিলে আমাদের কোন দিনই মঙ্গল নাই। যাহা অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে-প্রাণে বুঝিয়াছি, তাহাকে কেন প্রশ্রয় দিব? বেহারে বাঙালী-বেহারী 'ফীলিং' আছে বলিয়াই প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কর্তব্য সেই ফীলিং-সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করা। তলপি-তলপা গুটাইয়া প্রস্থান করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না, কাপুরুষতা প্রকাশ করা হইবে মাত্র। প্রতিশোধ বাসনায় যদি বঙ্গদেশ হইতে বেহারী বিদূরিত করিবার আন্দোলন করা যায়, তাহাতে এই 'ফীলিং' বৃদ্ধিই পাইবে, কমিবে না। ভাবিয়া দেখা উচিত, কি করিয়া এই ফীলিং' দূর করা যায়। ইহার উত্তর, ভালবাসিয়া। তুমি যদি সত্যই ইহাদের ভালবাসিতে পার, তাহা হইলে এ 'ফীলিং' আর থাকিবে না। উপকার করিলেই লোক কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবে—ইহা নীতিশাস্ত্রের উপদেশ বটে, কিন্তু মানুষ সব সময় নীতিশাস্ত্র মানিয়া চলে না; সে মানিয়া চলে নিজের হৃদয়কে। সেই হৃদয় যদি জয় করিতে পার, তাহা হইলেই এ সমস্যার সমাধান হইবে। হৃদয় জয় করিবার মন্ত্র ধর্মনীতি নহে, রাজনীতি নহে—ভালবাসা। এই 'ফীলিং' প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বিবেচ্য। এই ফীলিং কাহাদের মধ্যে? চাকুরিপ্রার্থী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাহারাই এই বিষ চতুর্দিকে ছড়াইতেছে। আমরা—বাঙালীরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, আমরা কেহ চাকুরি করিব না, তাহা হইলে বোধ হয় আপাতত অবিলম্বে এ সমস্যার মূল ছিন্ন হয়। চাকুরি জীবিকা-অর্জনের একটা উপায় বটে, কিন্তু একমাত্র উপায় নয়,—প্রশস্ত উপায় তো নয়ই। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, সিন্ধী, কচ্ছী, গুজরাটী, ইহারা তো নানা প্রদেশে গিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছে, বেহারী-মাড়োয়ারী অথবা বেহারী-কচ্ছী 'ফীলিং' তো কোথাও হয় নাই।

চাকর হইবার জন্য যে সব তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালী-বেহারী রাজদরবারে ভিড় করে, এই ফীলিং তাহাদের মধ্যে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, চাকুরি না করিলে বাঙালীর ছেলে করিবে কি? চাকরি ছাড়া আর কোন্ কর্ম করিবার তাহারা উপযুক্ত? তাহা ছাড়া, অন্যায়ভাবে (এমন কি কংগ্রেস-মিনিস্ট্রির সময় বিশেষ করিয়া) তাহারা চাকুরির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইবে কেন? চাকুরির স্বপক্ষে তাঁহাদের আরও যুক্তি আছে। তাঁহারা মনে করেন, চাকুরি না থাকিলে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকিবে না এবং তাহা না থাকিলে যে কালচারের গর্বে আমরা স্ফীত তাহার চাকচিক্যও ক্রমশ নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে। এমন কি তাঁহারা এ আশঙ্কাও করেন যে, আমাদের সাহিত্য, আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, সংস্কার সমস্তই নাকি বিনষ্ট হইবে, যদি আমাদের চাকুরি না থাকে।

বাঙালী-সন্তান চাকুরি ছাড়া অন্য কোন প্রকার কাজ করিতে অপারক, এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা হয় এবং সম্ভবত সে কথা সত্যও নহে। জীবিকা-অর্জনের ভিন্ন পন্থায় এখনও তাহারা চলিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সে সব পথে চলিবার জন্য যে ধরনের চরিত্র প্রয়োজন, বর্তমানে হয়তো তাহাদের সে চরিত্র নাই। কিন্তু সেজন্য হতাশ হইলে চলিবে না। কেরানীগিরি করিবার মত চরিত্রও যে বাঙালীর ছিল না, ইতিহাসেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। সাধনার দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট কেরানী হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। সাধনা করিলে আবার তাহারাই উৎকৃষ্ট বণিক অথবা চাষী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি! বণিক অথবা চাষীর কাজ যে ঘৃণ্য নয়, বরং দাসত্ব অপেক্ষা অধিক গৌরবজনক, এই সুস্থ মনোবৃত্তি শুধু ছেলেদের নয়, ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যেও গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যস্ত হইলে চলিবে না, হয়তো দুই এক পুরুষকেই এজন্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু ইহাই একমাত্র সদুপায়। বাঙালীর ছেলে চাকুরি ছাড়া আর কিছু করিতে পারিবে না, অতএব চাকুরি-লাভ করিবার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা সহ্য কর, সকলের সঙ্গে কলহ কর, নানাপ্রকার জাল-জুয়াচুরির আশ্রয় লও—এ মনোভাব মোটেই প্রশংসনীয় নয়। বাঙালীর

ছেলে অন্যায়ভাবে চাকুরির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে? সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পার, কিন্তু চাকুরি ছাড়া গ্রাসাচ্ছাদন জুটাইবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে আমরা অক্ষম—এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জিত হও। বরং অন্য ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের সামর্থ্য যদি তোমার থাকে, তাহা হইলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের আন্দোলন সফল হইবার আশা আছে। হীনমনোবৃত্তি চাকরের কোন আন্দোলনকেই কেহ কখনও গ্রাহ্য করে না। যাঁহারা এই অন্যায়কে মূলধন করিয়া আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করিতেছেন, তাঁহারা শক্তিকেই খাতির করেন, অন্য কিছুকে নয়। সুতরাং স্বদেশবাসীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া শক্তি সংগ্রহে মন দাও। হয়তো স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের পথেও ভবিষ্যতে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, সে বিঘ্নও শক্তির সহায়তাতেই উৎপাটন করিতে হইবে। কিন্তু সে সব দূরভবিষ্যতের কথা। এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের নিমিত্ত নিজেদের প্রস্তুত করা। পারতপক্ষে চাকুরি আমরা করিব না—এই প্রতিজ্ঞা করিলে মনে স্বতই শক্তি আসিবে। এই সুস্থ সবল মনোভাবই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। যাঁহারা মনে করেন যে, চাকুরি না থাকিলে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকিবে না তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আজকাল সমাজে অর্থেরই প্রতিপত্তি, চাকুরেদের নয়। যে কাল্‌চার লোপ হইবার ভয়ে তাঁহারা অস্থির, সেই সোফা-সেটি-মোটর-রেডিও-সমন্বিত পোশাক-পরিচ্ছদ-সর্বস্ব ঝুটা কাল্‌চার আমাদের কাল্‌চার নয়। ওই বিদেশী বস্তু সত্যই যদি লোপ পায়, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই। ওই বাহ্যিক কাল্‌চার আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়াই আমরা আমাদের আন্তরিক কাল্‌চার হারাইতে বসিয়াছি। আতিথেয়তা, দয়া, উদারতা, আন্তরিকতা, বিনয়, শিক্ষা, সাধনা, গুণের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিকতা প্রভৃতি যে সব মহৎ গুণাবলী আমাদের ভারতীয় কাল্‌চারের অঙ্গ, তাহা কি এই চাকুরিপ্রার্থী অথবা চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের আছে? স্বার্থ ছাড়া আর কি বোঝেন তাঁহারা? তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা দুষ্ট বলিয়া সকলেই স্বার্থপর; যাঁহারা চাকুরি করেন, তাঁহাদের

স্বার্থপরতা অধীনতা-দুষ্ট বলিয়া আরও ভয়ঙ্কর। আমাদের চাকুরি না থাকিলে আমাদের সাহিত্য পর্যন্ত নষ্ট হইবে, এমন আশঙ্কাও অনেকে করেন। সাহিত্য প্রতিভাবান গুণীদের সৃষ্টি। প্রতিভাবান ব্যক্তি কখন্ সমাজের কোন্ স্তরে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যই অনেক সময় বহু প্রতিভাবানের প্রতিভাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিভাকে লালন করা অবশ্য সমাজের কর্তব্য। কিন্তু চাকুরিজীবীরা কি আমাদের দেশের প্রতিভাবানদের সত্যই লালন করেন?

কয়জন চাকুরিয়া বই কিনিয়া পড়েন? কয়জনের সামর্থ্য আছে? কয়জনের বুদ্ধি আছে? বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কয়জন স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন? বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্কট ছিলেন অথবা রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়া বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, এই গর্বে তির্যকপথে আপন অহঙ্কারের রসদ সংগ্রহ করা ছাড়া চাকুরিয়া বাঙালী বাংলা সাহিত্যের সহিত আর কি ভাবে যে সম্পৃক্ত, তাহা শঙ্করের বুদ্ধির অগম্য।

বেহারের উপর রাগ করিয়া যাহারা বাংলা দেশে ফিরিয়া যাইতে চান, তাঁহাদের কি ধারণা যে, বাংলা দেশে চাকুরি অফুরন্ত? সেখানেও তো হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। সেখানেও তো চাকুরির জন্য লাঠালাঠি ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং অবশেষে অপমান। না, চাকুরির মোহ পরিত্যাগ না করিলে বাঙালীর মঙ্গল নাই। ভারতবর্ষের যে প্রদেশেই সে থাকুক, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মানুষের মত যদি থাকিতে পারে, তবে আর কোন সমস্যাই আপাতত থাকিবে না। এতদিন সে যেখানে গিয়াছে, চাকুরিয়া-বেশে গিয়াছে, শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে হাকিমি চালে হুকুম চালাইয়াছে, লোকে তাহাদের ভয় করিয়াছে, কিন্তু ভালবাসে নাই; তাহারা যে উপকার করিয়াছে, সে উপকারকেও কেহ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে নাই। ভালবাসা না থাকিলে কিছুই হৃদয়গ্রাহ্য হয় না।

শঙ্করের নটবর ডাক্তারের কথা মনে পড়িল। লোকটা পাস-করা ডাক্তারও নয়। চরিত্রে অনেক দোষ আছে। মদ খায়, চরিত্র খারাপ। চরিত্রহীনতার জন্য বহুবার বহুস্থানে লাঞ্ছিত হইয়াছে। কিন্তু সকলে তাহাকে ভালবাসে।

গ্রামের ভদ্র সকলেই তাহার প্রিয়, কেহ তাহার পর নয়। এই ভালবাসার যে কতখানি, তাহা সেবার নির্বাচনদ্বন্দ্বে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া হ। প্রতিপত্তিশালী 'ফীলিং'-ওয়ালা অনেক বেহারী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, াহারা চেষ্টাও কম করে নাই, কিন্তু নটবর ডাক্তারের সহিত কেহ পারিল নটবর ডাক্তার দাঁড়াইয়াছেন—এ কথা প্রচারিত হইবামাত্র সকলে াকেই ভোট দিতে উদ্যত হইল। কয়েকজন বেহারী-বন্ধুকে সন্তুষ্ট রিবার জন্য শঙ্করকে অবশেষে গিয়া অনেক তোষামোদ করিয়া নটবরকে ই দ্বন্দ্ব হইতে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছে। উইথ্‌ড্র না করিলে সে-ই বাচিত হইত। কই, বেহারী-বাঙালী 'ফীলিং' তো নটবরকে স্পর্শ করিতে রে নাই!

সহসা মুশাই কথা কহিল।

বিশঠো রূপিয়াকা বড়া জরুরৎ পড়লো ছে—

কি জরুরৎ?

মুশাই চুপ করিয়া রহিল।

কিসের জরুরৎ রে?

মুশাই এবারও কোন উত্তর দিল না, জিহ্বা ও তালু সহযোগে টকটক শব্দ তে করিতে গরু হাঁকাইতে লাগিল।

শঙ্কর বুঝিল, প্রকৃত কারণটা বলিতে মুশাই রাজী নয়, বিশ্বাসযোগ্য একটা থাও সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাই চুপ করিয়া আছে।

শঙ্করও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল, তোকে নিয়ে তো মুশকিল দেখছি, রোজ রোজ টাকা পাব কোথায়?

মুশাই নিরুত্তর। সে জানে, বাবু টাকা দিবেই; এবং শঙ্করও জানে টাকা যখন চাহিয়াছে তখন না দিয়া উপায় নাই, দিতেই হইবে। না লেই কামাই করিতে শুরু করিবে। হঠাৎ এমন আত্মগোপন করিবে যে, ছুতেই ধরা-ছোঁয়া যাইবে না। একবার তো অনেক কষ্টে তাহাকে ধরিয়া নতে হইয়াছিল। গ্রামের প্রান্তে যে অশ্বত্থ-গাছটাকে সকলে উপদেবতার শ্রয়স্থল ভাবিয়া ভয় করে, সেই গাছটারই মগডালে মুশাই উঠিয়া বসিয়াছিল,

সেইখানেই নাকি দিবারাত্রি বসিয়া থাকিত, কেবল রাত্রে যখন তাহার বউ যমুনিয়া তাহার জন্য খাবার লইয়া যাইত, তখনই সে একবার খাইবার জন্য নামিত। যমুনিয়াকে খোশামোদ করিয়াই শঙ্কর তাহার নাগাল পাইয়াছিল। মুশাইয়ের সহিত সম্পর্ক এরূপ যে, তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। মুশাই না থাকিলে তাহার কাজকর্ম সব অচল, সে-ই তাহার দক্ষিণহস্ত। নিরক্ষর হইলে কি হয়, এমন তাহার বুদ্ধি এবং শঙ্করের পছন্দ অপছন্দ সে এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছে যে, শিক্ষিত কোন ভদ্রলোকের পক্ষেও তাহার স্থান পূরণ করা অসম্ভব। সে একাধারে গাড়োয়ান, খানসামা, পাচক, ম্যানেজার এবং হিতৈষী। তা ছাড়া শঙ্করকে সে ছেলেবেলায় খেলাইয়াছিল, অর্থাৎ তাহার রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্য ছিল, কোলে করিয়া বেড়াইত। তখন তাহার বয়স বোধ হয় বছর দশেক ছিল এবং শঙ্কর ছিল বছর খানেকের। এখন উভয়ের বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু সম্পর্ক বদলায় নাই। এখনও সে যেন শঙ্করের রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্য, এবং শঙ্কর যেন দুরন্ত দামাল শিশু।

গাড়ি আসিয়া বাড়ির নিকট থামিল।

অমিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, খুকী ঘুমাইয়াছে।

ভাগ্যে আজ তোমার আসতে দেরি হ'ল, আমি এইমাত্র রান্নাঘর থেকে আসছি।

এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিলে! কেন?

খুকীকে ঘুম পাড়াতে দিয়ে তরকারিটা পুড়ে গিয়েছিল। বড্ড বায়নাদার হয়েছে বাপু, কিছুতে কি ঘুমুতে চায়! চাপড়ে চাপড়ে হাত ব্যথা হয়ে যায় তবু ঘুমুবে না। চাপড়ানো বন্ধ করলেই বলবে—চাপলাও।

অমিয়া হাসিল, শঙ্করও হাসিল।

এই তাহার ঘর। এখানে বাঙালী-বেহারী সমস্যা নাই, দেশোদ্ধারের দুশ্চিন্তা নাই। এখানে আছে কেবল অমিয়া এবং তাহার কন্যা। কোন উগ্রতা নাই, কোন উন্মাদনা নাই, কোন অভিনবত্ব নাই। ইহাই তাহ

নির্ভরযোগ্য আশ্রয়-নীড়, বাহিরের সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা করে, সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়া পরিচর্যা করে, সকলপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করে। খিল লাগাইয়া দিলেই সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেল, বাহিরের পৃথিবী তাহার কলরব-কোলাহল লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, ভিতরে রহিল সহজ সরল অনাড়ম্বর শান্তি। সহসা তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল, মা রাঁচিতে কেমন আছেন কে জানে?

ঝুম্‌ঝর আসিয়া বসিয়া ছিল।

ভাঙা গলায় মাঝে মাঝে হাঁকিতেছিল, এ খোখিদিদি—

অমিয়া পূজার ঘরে ছিল, জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, ঝুমঝর, আজ যে মানুষের ভাষায় কথা কইছ বড়?

ঝাপসা কণ্ঠে ঝুম্‌ঝর উত্তর দিল, গল্‌লা বঝি গেলছে মাইজী।

অর্থাৎ গলা ধরিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে সে তাহার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী কুকুর, বিড়াল, মহিষ, মুরগি, না হয় অন্য কোন প্রকার জানোয়ারের ডাক ডাকিয়া তাহার আগমনবার্তা ঘোষণা করিত। আজ তাহার গলা ধরিয়া গিয়াছে বলিয়া কিছুই করিতে পারিতেছে না। মুখ দেখিয়া মনে হইল, এ জন্য যেন সে লজ্জিত।

ঝুম্‌ঝর ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে। বেঁটে লোকটি, ছোট মুখখানি। পাতলা একজোড়া গোঁফ তৈলাভাবে রুক্ষ। থুতনির কাছে কাঁচাপাকা ছাগলদাড়ি, তাহাও তৈলাভাবে শ্রীহীন। গালের লোলচর্মে বলিরেখা। ছোট ছোট চক্ষু দুইটি কোটরগত এবং পীতাভ। একটি পা কাটা। নিজেই এখান ওখান হইতে কাঠের টুকরা, চামড়ার বেল্‌ট প্রভৃতি যোগাড় করিয়া লইয়া একটি কাঠের পা বানাইয়া লইয়াছে। তাহারই উপর ভর দিয়া একটি লাঠির সাহায্যে সে চলা-ফেরা করে। মাথায় একটি টিনের বাটি—সম্ভবত কোকোজেমের খালি টিন, টুপির মত করিয়া পরিয়াছে। তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলে, সে সংক্ষেপে নিজের জীবনের যে পরিচয় দেয়, তাহা এই—

দক্ষিণে তাহার বাড়ি। সেইখানেই এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে সে চাষবাসের কাজ করিত। লাঙল চষিত, 'কামৌনি' 'দৌনি' সব করিত। তাহার বিবাহও হইয়াছিল। তিনটি পুত্র আছে। একটি বেশ সাবালক আর দুইটি ছোট ছোট। প্রভুর জন্য কাষ্ঠসংগ্রহার্থে সে একদিন একটা বড গাছে উঠে। সেখান হইতে পা ফসকাইয়া পড়িয়া গিয়া তাহার পা-টি ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাহার প্রভু অবশ্য তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছিলেন, নিজের গরুর গাড়ি করিয়া তাহাকে সরকারী হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুও চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট খারাপ, পা কিছুতেই বাঁচিল না। হাঁটুর উপর হইতে কাটিয়া না দিলে ডাক্তারবাবু বলিলেন, তাহার প্রাণও নাকি বাঁচিত না। পা-টি সুতরাং কাটিয়া ফেলিতে হইল। কাটা পা লইয়া চাষের কাজ চলে না, সুতরাং ন্যায্যভাবেই প্রভু তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। খঞ্জ বেকার স্বামীর সহিত থাকা নিরর্থক বুঝিয়া স্ত্রীও আর একটি সমর্থ লোকের সহিত 'চুমানা' করিল। তাহার এই আচরণকেও ঝুমুর অন্যায় বলিয়া মনে করে না। প্রভুর নিকট ঋণ করিয়া সে জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বিবাহ দিয়াছিল, পুত্র খাটিয়া সেই ঋণ শোধ করিতেছে। নাবালক ছেলে দুইটি তাহার সঙ্গেই আছে। স্ত্রী তাহাদের নাকি বড মারধোর করে, তাই তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারাও ভিক্ষা করে, তাহাদেরও সে জানোয়ারের ডাক ডাকিতে শিখাইতেছে। ভাগ্যে ছেলেবেলায় একজন ওস্তাদের কাছে এই বিদ্যাটা শিখিয়াছিল, তাই বাবু-ভেইয়াদের মনোরঞ্জন করিয়া কোনরূপে দিনগুজরান করিতেছে। অমনি ভিক্ষা চাহিলে রোজ রোজ লোকে দিবে কেন? অন্ন সংস্থানের এই উপায়টিও সম্প্রতি কিন্তু বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিয়া গলা বসিয়া গিয়াছে।

ঝুমুর অমিয়ার একজন পোষ্য। প্রায়ই আসে। অমিয়ার আর একজন পোষ্যও আছে—সুরদাস। সে জন্মান্ধ। ভজন গায়। দাইটিও কিছুদিন হইতে চারিটি ছেলে-মেয়ে লইয়া অমিয়ার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মাসখানেক হইতে ক্রমাগত আমাশয়ে ভুগিতেছে, ভুগিয়া ভুগিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে, কাজ করিতে পারে না। অমিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারে নাই। তাড়াইয়া দিলে চারিটি শিশুসহ রোগে অন্নাভাবে হয়তো রাস্তায় মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। স্বামীটা পাগল, কোথায় কখন থাকে ঠিক নাই। মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হয়, খিড়কির দরজায় দাঁড়াইয়া স্ত্রীর উপর তম্বী করে। ভাবার্থ—খবরদার, যেন সে কোনক্রমে বেচাল না হয়, সতীত্বই আসল ধর্ম, ইজ্জৎ যেন ষোল আনা বজায় থাকে—ইত্যাদি। ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া চুমাও খায়। আবার কোথায় উধাও হইয়া যায়। এককালে শঙ্করের বাবার গাড়ি ঘোড়া ছিল, এখন সে সব কিছু নাই, আস্তাবলটা খালি পড়িয়া আছে। তাহাতেই দাইটা সন্তান-সন্ততি লইয়া থাকে।

এতগুলি পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া অমিয়া এতটুকু বিরক্ত নয়। শঙ্কর সাহিত্য লইয়া যখন মাতিয়া ছিল, তখন অমিয়া যথাসাধ্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে সেই সাহিত্যেরই রসগ্রহণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহার মনে হইত, সাহিত্যরসিক না হইতে পারিলে শঙ্করের মন পাওয়া যাইবে না। কিছু রস যে সে না পাইত তাহা নয়, কিন্তু তাহা তাহার প্রাণ-মনকে তেমন নাড়া দিত না। অনেকটা যেন কর্তব্যবোধেই সে শঙ্করের এবং সাময়িক লেখক-লেখিকাদের রচনার সহিত পরিচয় লাভ করিবার চেষ্টা করিত। এখন সে সব দিন গিয়াছে। শঙ্কর মাতিয়াছে পল্লী-উন্নয়ন লইয়া। গরিব-দুঃখীদের কিসে ভাল হয়, ইহাই এখন তাহার ধ্যান-জ্ঞান। অমিয়াও তাই যথাসাধ্য গরিব-দুঃখীদের দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করে। তাহার আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু, ততটুকুই করে। স্বামীকে সুখী করাই তাহার উদ্দেশ্য। সাহিত্যচর্চা অপেক্ষা এসব করিয়া ঢের বেশি আনন্দও পায়। আনন্দের আর একটা গোপন কারণও আছে। কলিকাতায় শঙ্কর যেমন ছিল, এখানে আসিয়া আর তেমনটি নাই। তাহার স্বভাব অনেক বদলাইয়াছে। মুখে অবশ্য সে শঙ্করকে কখনও কিছু বলে না। কলিকাতায় যখন সে মদ খাইয়া অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরিত, তখনও যেমন সে নীরব ছিল এখনও তেমনই নীরব আছে। কিন্তু সে সব বোঝে। শঙ্কর তাহাকে যতটা নির্বোধ মনে করে, ঠিক

ততটা নির্বোধ সে নয়। উৎপলবাবুর স্ত্রী সুরমার মত হয়তো সে বিদুষী নয়, কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে তাহার মন কখনও ভুল করে না। শঙ্কর যখন কুপথে যায়, তখন সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ না পাইলেও তাহার অন্তর্যামী মন যেমন আসল সত্যটি বুঝিতে পারে, কুপথ হইতে সুপথে যখন ফিরিয়া আসে তখনও তেমনই পারে। কিছুই তাহার মনের অগোচরে থাকে না। কলিকাতায় শঙ্কর যখন বিপথগামী হইয়াছিল, তখন তাহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল বইকি, কিন্তু খুব বেশি বিচলিত সে হয় নাই; তাহার কারণ শঙ্করের মহত্ত্বের প্রতি তাহার গভীর আস্থা ছিল। সে জানিত, সোনাতে কখনও কলঙ্ক লাগিবে না। সাময়িকভাবে একটু ছাই বা ধুলা যদি লাগেও, তাহা যথাকালে আপনি উড়িয়া যাইবে। উহা লইয়া বেশি হৈ-চৈ করিলে সুবর্ণ-অধিকারীর সুবর্ণ-চরিত্রে জ্ঞানের অভাবই সূচিত করে। এখন আবার স্বর্ণের স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। যে সব দীন-দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ দিয়া তাহার স্বামীর স্বাভাবিক মহত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সব দীন-দরিদ্রের সেও সেবা করিতে উৎসুক। তাহার এই মনোভাব যদিও কলিকাতায় সাহিত্যচর্চা করিবার মত শুষ্ক কর্তব্যবোধ-মাত্রই নয়, কিন্তু তাহা শঙ্করের প্রেরণার মত আবেগপূর্ণও নয়। অমিয়ার প্রধান লক্ষ্য—শঙ্কর, অন্য কিছু নয়।

খোখিদিদি—এ খোখিদিদি—আব—

দাত্তি।

খোখিদিদি উঠানে বাঘা কুকুরটার ঘাড়ে চড়িয়া তাহার কান মোচড়াইতেছিল। বলিষ্ঠ বাঘা অস্ফুট কুঁ-কুঁ শব্দ করিতে করিতে তাহার এই স্নেহের অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। ঝুম্‌ঝুমরের প্রতি খোখিদিদির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে সে নিস্তার পাইয়া বাঁচিল। দাত্তি।—বলিয়া খোখিদিদি প্রবীণ গিন্নীর মত ঝুম্‌ঝুমরের দিকে আগাইয়া গেল। কিছুদূর গিয়া তাহার হুঁশ হইল যে, রিক্তহস্তে যাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না। তখন সে ফিরিয়া মাকে ডাকিল।

মা, ঝম্‌ঝু—তাল দাও।

যাচ্ছি।

অমিয়া পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। একটু তাড়াতাড়িই সিল, তাহার ভয়—পাছে খুকী ঝুম্‌মরকে ছুঁইয়া ফেলে। মেয়ের তো র সঙ্গে ভাব, এখনই হয়তো উহার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

বাঘাকে ছুঁয়েছ ?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া খুকী বলিল, না।

'হাঁ'কে খুকী 'না' বলে।

তবে দাঁড়াও গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিই মাথায়।

অমিয়া পুনরায় পূজার ঘরে ঢুকিল এবং গঙ্গাজল আনিয়া মেয়ের মাথায় ছিটাইয়া দিল।

গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা।

খুকী মাথা পাতিয়া গঙ্গাজল লইয়া বলিল, গগ্‌গা গগ্‌গা—এবং হাসিল।

সর্দিতে নাক বন্ধ, 'গঙ্গা' উচ্চারণ হয় না।

আলো দাও।

জলের ছিটা চোখে মুখে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চমৎকার লাগে।

না, আর দিতে হবে না।

তাহার পর ঝুম্‌মরের দিকে ফিরিয়া অমিয়া বলিল, তুই আর চাল নিয়ে কি করবি ? দুপুরে বরং ছেলে দুটোকে নিয়ে এখানেই খাস।

ঝুম্‌মর সেলাম করিল। তাহার পর সসঙ্কোচে হাসিয়া ধরা-গলায় পুনরায় আবেদন জানাইল, এক টুকরা পাঁওরোটি মিলতিয়ে মাইজী, রাতিসে ভুখলো ছি—

গ্রামের দুইটি বেকার বাঙালী যুবককে উৎসাহিত করিয়া শঙ্কর এখানে একটি বেকারি স্থাপন করাইয়াছে। শঙ্কর সেখান হইতে রোজ পাঁউরুটি লয়। ঝুম্‌মর শঙ্করেরই উচ্ছিষ্ট পাঁউরুটি মাঝে মাঝে দুই-এক টুকরা খাইয়া দেখিয়াছে। চমৎকার খাইতে। একটু চা দিয়া ভিজাইয়া লইলে তো আরও চমৎকার, চিবাইতে হয় না, ভিজিবামাত্র নরম তুলতুল করে।

গরিব মানুষের আবার পাঁউরুটি খাওয়ার শখ কেন রোজ রোজ ? মুড়ি খাও না চারটি।

ঝুম্‌মর একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

খুকী বলিল, পাত্তুটি কাবে? পাত্তুটি? দিত্‌তি।

খুকী ভাণ্ডারঘরের দিকে অগ্রসর হইল। মীট-সেফে কোথায় পাঁউরুটি থাকে, তাহা তাহার অজানা নাই।

বাবা বাবা, মেয়ের কত্তাত্তির জ্বালায় গেলাম!

মেয়ের পিছু পিছু অমিয়াও ভাণ্ডারঘরে ঢুকিল এবং ঝুম্‌মরের জন্য এক টুকরা রুটি তাহার হাতে দিল।

আল্‌গোছে দিও, ছুঁয়ো না যেন।

আত্‌তা।

শঙ্কর এতক্ষণ বাহিরের ঘরে নানাবিধ লোকপরিবৃত হইয়া নানারূপ সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত ছিল। একটু ফাঁক পাইয়া সে ভিতরে আসিল একটু চায়ের আশায়। পূজা সারিয়া অমিয়া এই সময় একটু চা পান করে, শঙ্করও প্রায়ই এ সুযোগ ছাড়ে না। আসিবামাত্র খুকু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—

মানে—কোলে কর। কোলে তুলিয়া লইতে হইল।

তোমার চা খাওয়া হয়ে গেল নাকি?

না। এস না।

হাম্‌রো এক জরা দিও মাইজী।

মুখপোড়ার পাঁউরুটি চাই, চা-ও চাই! সুখ আর ধরছে না!

হাসিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া অমিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

গল্‌লা বঝি গেলছে মাইজী।

হাসপাতাল থেকে ওষুধ নাওগে যাও না। তোমাদের জন্যে তো হাসপাতাল করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঝুম্‌মর বলিল যে, হাসপাতালে সে গিয়াছিল, তাহার গলায় কি একটা ঔষধ তাহারা লাগাইয়াও দিয়াছিল, কিন্তু কোন উপকারই হয় নাই, বরং আরও বেশি বসিয়া গিয়াছে।

অমিয়া শঙ্করকে বলিল, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারবাবুটি তেমন সুবিধের নয়। হয় কিছু জানে না, নয়, গরিবদের ভাল ক'রে দেখে না। আমাদের দাইটার আমাশা তো মাসখানেক থেকে কিছুতেই সারছে না, অথচ রোজ ওষুধ খাচ্ছে।

কি করি বল, শিক্ষিত লোক দেখেই তো রাখা হয়েছে। এখুনি বেরুব একবার, তখন খোঁজ করব।

ঝুম্মরকে বলিল, চা পিকে হামারা সাথ তুম চলো, দাবাকা ইন্‌তিজাম কর দেঙ্গে।

শঙ্কর হিন্দী ভাল জানে না। হিন্দী, ভাঙা উর্দু, মোচড়ানো বাংলা প্রভৃতি মিশাইয়া একটা খিচুড়ি ভাষায় যা-হোক করিয়া কাজ চালাইয়া লয়।

'ইন্‌তিজাম' শব্দটা ঝুম্মর ভাল বুঝিল না, কিন্তু শঙ্করের কথার সারমর্ম বুঝিতে তাহার বিঘ্ন হইল না। সে বসিয়া রহিল।

ঝুম্মরকে সঙ্গে লইয়া শঙ্কর হাসপাতালে গিয়া দেখিল, সেখানে অনেক রোগী ভিড় করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু ডাক্তারবাবু নাই। তিনি উৎপলকে দেখিতে গিয়াছেন। উৎপলের নাকি পরশু হইতে শরীর খারাপ। শঙ্করও তিন-চারদিন উৎপলের খবর পায় নাই, উৎপলের বাড়িতে যায় নাই। সে ঝুম্মরকে হাসপাতালে বসাইয়া উৎপলের বাড়ি চলিয়া গেল।

৬

নিজের বাড়ির সম্মুখের প্রশস্ত গোলাপ-বাগানে দাঁড়াইয়া উৎপল কয়েকটি সদ্য-ক্রীত মূল্যবান গোলাপ-চারার বিষয়ে মালীকে উপদেশ দিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

তোমার কথাই ভাবছিলাম। এত লোকের এত উপকার ক'রে বেড়াচ্ছ, আমার একটু কর না!

হয়েছে কি তোর?

সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ওই দেখ, ও-ধারের স্নো-কুইনটার কি দশা, এ দিকে এভারেস্টও যায়-যায়, ডিউক অব ওয়েলিংটন পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে পড়েছে।

শঙ্করকে ভ্রূকুঞ্চিত করিতে দেখিয়া উৎপল বলিল, অমন ভ্রূকুটি করবার দরকার নেই, খুব সাংঘাতিক কিছু নয়—উই ভার্স্যাস we। তামাকের জল দিয়ে দিয়ে পরিশ্রান্ত হয়েছি, তোমার যদি কিছু জানা থাকে বল।

সহসা থামিয়া বলিল, অনেকক্ষণ সিগারেট খাও নি মনে হচ্ছে।

পকেট হইতে সোনার সিগারেট-কেস বাহির করিয়া উৎপল সেটি শঙ্করের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। একটি সিগারেট তুলিয়া লইয়া শঙ্কর বলিল, তোমাকে তখনি বলেছিলাম, ওই প্রমথ ডাক্তারকে রেখো না, লোকটা বড় বেশি কথা বলে আর একের নম্বর ফাঁকিবাজ।

কেন, কি করেছে?

এখনই হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বহু রোগী ব'সে আছে, অথচ তার পাত্তা নেই। হাসপাতালে ব'লে এসেছে যে, তোমার নাকি অসুখ, তুমি ডেকে পাঠিয়েছ। তোমার যে কিছু হয় নি, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

উৎপল অপ্রতিভ হইল।

I stand rebuked, আমিই ডেকে পাঠিয়েছি—ভদ্রলোক এখানেই আছেন।

কি হয়েছে তোর?—শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

চলতি ভাষায় সর্দি, ডাক্তারি ভাষায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

এতেই এত ভয়?

ভয় অসুখকে নয়, সুরমাকে। আয়, ভেতরে আয়।

ভিতরের সুবিস্তৃত দালানে প্রমথ ডাক্তার ও বীরু খানসামা ছিল। প্রমথ ডাক্তার বীরু খানসামার অন্তরে সম্ভ্রম উদ্রেক করিবার মানসেই সম্ভবত তাহাকে সবিস্তারে বুঝাইতেছিলেন, ব্রংকাইটিস-কেট্‌ল কি ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, ফুটবাথ দিতে হইলে জলের উত্তাপ ঠিক কতটা হওয়া প্রয়োজন, অ্যাস্‌পিরিন নামক ঔষধের ডোজ কি, দোষ কি কি, অ্যাস্‌পিরিন না দিয়া তিনি ভেরামন কেন ব্যবহার করিতেছেন, উৎপলের চিকিৎসার জন্য

কি কি 'প্রিকশান' তিনি লইবেন, এমন সময় উৎপল ও শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। বীরু পাশের দরজা দিয়া স্নুট করিয়া সরিয়া পড়িল, প্রমথ ডাক্তার সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এটা কি ?

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

ওটা হচ্ছে সার্ ব্রংকাইটিস-কেট্‌ল। বেশি কাশি হ'লে কিংবা লাংসে কোন অ্যান্‌টিসেপ্‌টিক দিতে হ'লে আমরা এটা ব্যবহার করি।

বুক-খোলা জামা গায়ে মালকোঁচা-মারা প্রমথ ডাক্তার বেশ সপ্রতিভ ব্যক্তি।

উৎপল প্রমথ ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনি হাসপাতাল ফেলে চ'লে এসেছেন, শঙ্করের কাছে আমাকে বকুনি খেতে হ'ল।

হাসপাতালে আপনি গিয়েছিলেন নাকি সার্, কোনও দরকার ছিল ?

একটা রোগী নিয়ে গিয়েছিলাম।

ও, চলুন, যাচ্ছি। কি রোগী ?

ঝুম্‌ঝরকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওর কাশি কিছুতেই সারছে না, গলাটা ভেঙেই আছে, ও-ই বেচারার উপজীবিকা—

ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন।

ঝুম্‌ঝর ? কই চিনতে পারছি না।

ওই যে কাঠের পা প'রে বেড়ায়, সব রকম জানোয়ারের ডাক ডাকে—

বুঝেছি, বুঝেছি। ওর গলায় তো রোজ থ্রোট-পেণ্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সার্, মেণ্ডেল্‌স পিগ্‌মেণ্ট দিচ্ছি—

কমছে না কিন্তু।

গলার ভেতরটা একবার 'এক্স্‌প্লোর' করা দরকার। করিই বা কি ক'রে ? আমাদের ল্যারিংগোস্কোপ যে নেই।

উৎপল এতক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া সবিস্ময়ে ব্রংকাইটিস-কেট্‌লটাকেই নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এটা কি আমার জন্যেই এনেছেন ?

হ্যাঁ, সার্।

হাসপাতাল থেকে ?

হ্যাঁ. সার্। রাত্রে যদি কোন ফীট অব কাফ-টাফ হয়, দরকার লাগতে পারে।

উৎপলকে নীরব দেখিয়া এবং তাহার নীরবতার কারণ অনুমান করিয়া লইয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলবে—ব্র্যাণ্ড নিউ আছে।

আছে নাকি ? আচ্ছা। আপনি আপনার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন ডিরেক্‌শন সব লিখে রেখে যান।

সার্‌টেন্‌লি।

ডাক্তারবাবু পটাৎ করিয়া বুক-পকেট হইতে ফাউণ্টেন-পেন বাহির করিয়া লিখিতে বসিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল, ল্যারিংগোস্কোপ আনা যদি দরকার মনে করেন, আনিয়ে নিন না। বলেন তো আজই অর্ডার প্লেস ক'রে দি।

প্রমথ ডাক্তার লিখিতে লিখিতে উত্তর দিলেন, দিন।

আয়, ওপরে আয়।

উৎপল সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

যাচ্ছি।

প্রমথ ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া শঙ্কর বলিল, ঝুম্‌ঝুমরটাকে হাসপাতালে বসিয়ে রেখে এসেছি। আপনি তা হ'লে গিয়ে তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন।

সার্‌টেন্‌লি। একটা গার্গারিস্‌মা দিয়ে দেখি আজ। পরে না হয় লিংটাস দেব যদি না কমে।

উৎপল উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, শঙ্করও অনুগমন করিল। ডাক্তারবাবু প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন ও ডিরেক্‌শন লিখিতে লাগিলেন।

সুরমা স্পিরিট-স্টোভে দুধ গরম করিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইতেই উৎপল সুরমার দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার জন্যে শঙ্করের কাছে বকুনি খেতে হ'ল।

সুরমা কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে শঙ্করের দিকে চাহিল ও স্পিরিট-স্টোভ হইতে দুধটা নামাইয়া নিপুণভাবে একটি সুদৃশ্য পেয়ালায় ঢালিল, এক ফোঁটা বাহিরে পড়িল না, এবং নীরবে বাহির হইয়া গেল।

মৃদু হাসিয়া উৎপল বলিল, দশটা বাজল।

তা হবে বোধ হয়।

বোধ হয় নয়, নিশ্চয়। দুধ গরম ক'রে কাপে ঢালা হয়ে গেছে যখন—

পাশের ঘরের একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল।

ওই শোন। এখন সমস্যা ওইটি গলাধঃকরণ করতে হবে। কি মুশকিল!

ক্ষিধে না থাকলে জোর ক'রে খাওয়াবে নাকি?

ওই তো মজা, জোর করে না কখনও। ঠিক সময়ে দুধটি গরম ক'রে পাশে রেখে যাবে, হয়তো একবার বলবে—খাও। যদি না খাও, কিছু বলবে না, মুখও যে ভার ক'রে থাকবে তা নয়; কিন্তু কেমন যেন সর্বদা মনে হতে থাকবে, নেপথ্যে ও চটেছে। সে এক ভারি অস্বস্তি, তার চেয়ে খাওয়াই ভাল।

এ সময়ে রোজ দুধ খাস নাকি?

তোমার ওই ডাক্তার এসে ব্যবস্থা করেছে। ডাক্তারের বাক্য সুরমার কাছে বেদবাক্য।

সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্র উৎপল থামিয়া গেল এবং নিতান্ত ভালমানুষের মত মুখ-চোখ করিয়া বলিল, শঙ্করকে বলছিলাম—সুরমা হয়তো তোমাকে কফি না খাইয়ে ছাড়বে না।

কফির কথা বলতেই গিয়াছিলাম।

শঙ্কর বলিল, আমাকে কিন্তু এখনই উঠতে হবে। বেশি দেরি করতে পারব না।

উৎপল গম্ভীর মুখে সুরমার দিকে চাহিয়া ছদ্ম আদেশের ভঙ্গীতে বলিল, না, দেরি করিয়ে দিও না, দেশের কাজে বাধা দেওয়া অন্যায়। একেই তো তুমি সকালবেলা ডাক্তারকে ডেকে গরিবদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছ।

আমরা গরিব নই ব'লে বিনা চিকিৎসায় মারা যাব নাকি?

এই বলিয়া সুরমা কোণ হইতে একটি চৌকো ফ্রেম বাহির করিল এবং স্মিতমুখে শঙ্করের দিকে একবার চাহিয়া অর্ধ-সমাপ্ত কার্পেটের আসনটিতে মন দিল'।

কেন, আপনারা তো চরণবাবুকে ডাকতেন! তিনি ডাক্তারও ভাল, লোকও ভাল, কারও চাকরি করেন না, তিনিই তো বেশ ছিলেন, তাঁকে ছাড়লেন কেন?

তাঁকেই ডাকতে পাঠিয়েছিলাম, তিনি এলেন কই? তাঁকে পাওয়া শক্ত। পরশু বললেন, দুটোর সময় যাব; কাল তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে বীরুকে পাঠালাম সাইকেল ক'রে। তিনি বললেন, আমার এখনও কয়েকটা গরিব রোগী দেখতে বাকি আছে, তাদের দেখে তবে যাব। আমরা যেন 'বড়লোক হয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

সুরমা কার্পেটের আসন বুনিতে শুরু করিয়া দিল। উৎপল দুধের কাপটা তুলিয়া এক চুমুক পান করিয়া নীরবে আবার তাহা নামাইয়া রাখিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়া গেল। আসনের ফুলগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, বাঃ, আসন তো বেশ চমৎকার হচ্ছে আপনার!

উৎপল বলিল, তা হচ্ছে। কিন্তু ওতে তোমার বা আমার কোন লাভ নেই।

কেন?

আমরা পাব না। প্রত্যেক মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতের বসবার জন্যে একটি ক'রে দান করবেন উনি ঠিক করেছেন।

বেশ ভালই তো।

ও! কুন্তলা দেবীর সঙ্গে তোমারও আলাপ হয়েছে নাকি?

না। তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

তিনিই এই সদিচ্ছাটি ওঁর অন্তরে—তোমরা সাহিত্যিকেরা যাকে বল উদ্বুদ্ধ, তাই করেছেন। তোমারও সহানুভূতি দেখে মনে হচ্ছে যে, হয়তো তোমার সঙ্গেও—

না, আলাপ হয় নি; কিন্তু আলাপ করতে হবে। ওঁর সম্বন্ধে যা শুনি,

তাতে মনে হয় চেষ্টা করলে ওঁকে হয়তো আমাদের কাজে লাগাতে পারা যায়।

সুরমা আপনার মনে বুনিতেছিল। এই কথায় বলিল, আপনাদের এই ধরনের পল্লীসংস্কার ওর পছন্দসই নয়।

তাই নাকি? বলছিলেন কিছু?

একদিন কথা হয়েছিল, তাতেই আভাসে বুঝলাম।

'আভাস' কথাটা শুনিয়া উৎপল ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া সুবোধ বালকের ন্যায় দুধের কাপটি তুলিয়া আর এক চুমুক পান করিল।

আভাসে বুঝেছেন মানে?

এ নিয়ে তর্ক করলে হয়তো ওর মনের ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যেত, কিন্তু তা আর আমি করি নি। কি হবে বাজে তর্ক ক'রে ওর সঙ্গে?

বিশেষত হেরে যাবার সম্ভাবনাটাই যখন বেশি।

উৎপল ফোড়ন কাটিল।

ইহাতে সুরমা চটিল না, মুচকি হাসিয়া বলিল, তাও ঠিক। ভয় করে ওর সঙ্গে তর্ক করতে।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, খুব মুখরা নাকি?

না। খুব কম কথা বলে। দারুণ সংস্কৃত জানে ব'লে ভয় হয়।

উৎপল দুধের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখিল এবং বলিল, সুরমার কাছে ওঁর সঠিক চিত্রটি পাবে না।

কেন?—শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

দুজনে বন্ধুত্ব হয়েছে।

সুরমা হাসিল, শঙ্করও হাসিল।

উৎপল বলিল, পাশের ঘর থেকে সেদিন আমি যতদূর আন্দাজ করেছিলাম, তাতে ওঁর সম্বন্ধে একটি উপমাই আমার মনে হয়েছিল, সুরমা যদি রাগ না করে বলতে পারি।

সুরমা সহাস্য দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল। কোন প্রকার মন্তব্য করিল না।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, কি উপমা, শুনিই না ?

কামান। কামানও বেশি কথা বলে না, কিন্তু যখন বলে, তখন একেবারে কন্‌ভিন্‌সিং।

কফির সরঞ্জাম লইয়া ভৃত্য প্রবেশ করিল এবং ছোট একটি টেবিলে সেগুলি রাখিয়া টেবিলটি আগাইয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

আর কিছু খাবেন ?

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

না।

সহসা শঙ্করের অনাহারক্লিষ্ট ঝুমঝুমরের কথা মনে পড়িল। সে হয়তো তাহার অপেক্ষায় এখনও হাসপাতালে বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবু এবার তাহাকে ঠিকমত ঔষধ দিয়াছেন কি না কে জানে!

প্রমথ ডাক্তার বেশ করিৎকর্মা ব্যক্তি। বছর তিনেকের মধ্যে উৎপলদেব এই প্রাইভেট ডাক্তারখানাটিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি নিজের বেশ একটি 'ফিল্ড' 'ক্রিয়েট' করিয়া লইয়াছেন। যে সম্প্রদায় ডাক্তারের মধ্যে কেবল চিকিৎসকই নয়, ধূর্ত ফন্দীবাজ বন্ধু কামনা করেন (যিনি আইনজ্ঞ অথচ নিরঙ্কুশ), সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রমথ ডাক্তার বেশ পশার জমাইতে পারিয়াছেন। মিথ্যা সার্টিফিকেট লিখিয়া, দারোগাকে তোয়াজ করিয়া, জেলার গবর্মেণ্ট অফিসারদের সহিত ভাব-সাব রাখিয়া, উৎপল এবং শঙ্করের তোষামোদ করিয়া তিনি নিজের আসনটি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইন্‌জেকশন-বিশারদ বলিয়া এ অঞ্চলে তাঁহার একটা বিশেষ খ্যাতি হইয়াছে। 'জকৃসন' দিয়া তিনি বহু দুঃসাধ্য ব্যাধি নাকি সারাইয়াছেন।

গুলাব সিং আসিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি শহর হইতে ইন্‌জেক্‌শনের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়া ফিরিয়াছেন। গোঁফ চুমরাইতে চুমরাইতে সালঙ্কারে নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন।

হড়বড়মে থে হুজুর, ভুখভি লগা থা, হালওয়াইকো কহা—জলদি করো ভাই। উ ভুজতে চলা, ম্যঁয় খাতে চলে। কুছ দেরমে খেয়াল পড়া ই তো পলুতি কাম কর রহেঁ হেঁ, ই শালা তো কাচ্চা পুড়ি খিলা রহা হ্যা। খেয়াল হানেকা সাথহি খানা বন্দ কর দিয়া—মগর তবভি ভোগনা পড়া ডাক্টারবাবু।

ক্যা হুয়া ?

কাচ্চা আঁটা পেটমে লসক্ গিয়া।

লসক্ গিয়া ?

লসক্ গিয়া। দো রোজ দস্ত নহি উত্রা, বাই তক ভি গায়েব—ঠসম্-ঠাস্। এক ডাক্টরকো বোলায়েঁ। উ আ কর এক সুই দিহিন, এক পুরিয়া দিহিন, পাঁচ রুপিয়া ফিস লিহিন। নেহি উৎরা। দুসরা এক ডাক্টর বোলায়েঁ ইস ডাক্টরনে দো সুই দিহিন, এক শিশি দাবাই দিহিন, ফিস লিহিন আট রুপিয়া। কুছ নেহি হুয়া। পেট বেশি ফুলা দিহিস্। ম্যঁয় আর দবি নেহি কিয়া, তড়াক শহর চলে গ্যয়ে। ডাক্টার চৌধুরীকো বোলায়েঁ। ডাক্টার চৌধুরী আচ্ছাহ তরেসে দেখিন্, পেটমে যন্তর বৈঠাইন, বাঁমে ফিতা লপ্টাকে প্রিসার দেখিন্, পেসাব জামিন কিহিন্,—পাঁচ রুপিয়া ফিস দেনে পড়া পেসাব জামিন-কা বাস্তে। দেখ শুন কর ডাক্টর চৌধুরী কহিন্, দেখো ভাই, ইসকা দো তরেকা জক্সন্ হ্যা মেরা পাস, এক বড়া, এক ছোটা। বড়া জক্সন্ দেনেসে চার ঘণ্টাকা অন্দর পাখানা উতর যায়ে গা, ছোটামে দো রোজ লাগে গা। বড় জক্সন্‌কা কিমৎ ষোল রুপেয়া, ছোটকা পাঁচ রুপেয়া, অব তুমহারা ক্যা খাঁইস কহো ? ম্যঁয় কহা, বড় জক্সন্‌ই দিজিয়ে হুজুর, জান যা রহা হ্যায়। ইয়া বড়া এক জক্সন্ চুতড়্মে ঘোঁৎ দিহিন, আউর মিশ্রিকে লায়েক এক দাবা ছ চাম্মচ লেকে গরম পানিমে ঘোরকে পিলা দিহিন। জহরকা লায়েক তিতা। মগর হ্যাঁ—

উদ্ভাসিত মুখে গুলাব সিং চুপ করিলেন।

হো গিয়া ?

একদম সাফ—দোহি ঘণ্টে মে।

ইহা শুনিয়া প্রমথ ডাক্তার চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করত মাথা নাড়িয়া

ভাঙা হিন্দীতে অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার ঠিক ঔষধটি নির্বাচন করিয়া যদি জক্‌সন্ দেন ফল তো হইবেই।

বেশক্।

গুলাব সিং গোঁফ চুমরাইয়া অতঃপর তাঁহার আগমনের কারণটি ব্যক্ত করিলেন।

আজ হুজুর, মেরা ঘর পর তশরিপ লাইয়ে।

কাহে?

মেরা জানানাকো এক জক্‌সন্ দেনা পড়ে গা।

ক্যা হুয়া উনকো?

উ যব চলতি ফিরতি হ্যায়, তব তো ঠিক হ্যায়, কোই তক্‌লিফ নহি। মগর যবহিউ বাচ্চেকো গোদমে লে কর বৈঠি, যব তক সিধা রহি, তব তক তো ঠিক রহি, মগর যবহি দুধ পিলানো কো লিয়ে সাম্‌নেহ ঝুকি, কচ—

গুলাব সিং কোমরে হাত দিয়া দেখাইয়া দিলেন কচ করিয়া ব্যথাটা কোথায় লাগে।

এক ঘণ্টা বাদ আওয়েঙ্গে।

একঠো কড়া জক্‌শন্ দেনে পড়ে গা।

আচ্ছা।

বাত তব পাক্কা?

পাক্কা।

পাকা কথা কহিয়া গুলাব সিংহের মনে হইল, দর্শনীটা অগ্রিম দিয়া দিলে ব্যাপারটা আরও পাকা হইয়া যাইবে। ন্যায্য খরচ করিতে তিনি কোন কালেই পশ্চাৎপদ নহেন। ট্যাঁক হইতে ডাক্তারবাবুর দক্ষিণাটি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং জোড়হস্তে কহিলেন, উঠা লিয়া যায় হুজুর।

ডাক্তারবাবু টাকা চারিটি লইয়া নমস্কার করিলেন। গুলাব সিংহও প্রতি-নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারবাবু একাই থাকেন, পরিবার দেশে। কিছুক্ষণ পূর্বেই কল সারিয়া ফিরিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত ছিলেন। ভাবিলেন, এক চটকা ঘুমাইয়া

লইয়া তাহার পর গুলাব সিংহের স্ত্রীকে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়া আসিবেন। ইন্‌জেক্‌শন একটা দিতেই হইবে, না দিলে গুলাব সিংহের তৃপ্তি হইবে না। ঘুমাইতে যাইবেন, এমন সময় শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

ডাক্তারবাবু, বিরজু ম'রে গেল না কি?

বিরজু কে? কি হয়েছে?

আপনি কিছু জানেন না? বিরজু কাঠ কাটছিল, হঠাৎ কুড়ুলটা ফসকে তার পায়ে লাগে। রক্ত কিছুতে বন্ধ হচ্ছিল না দেখে তাকে আমি আপনার কাছে পাঠালাম যে।

কতক্ষণ আগে?

তা প্রায় ঘণ্টা দুই হবে।

আমি ছিলাম না। কলে বাইরে গিয়েছিলাম।

লোকটা বিনা চিকিৎসাতেই ম'ল তা হ'লে?

না, আমাদের কম্পাউণ্ডার খুব এক্‌স্‌পার্ট লোক, যা করবার করেছে ঠিক, চলুন দেখি, কি ব্যাপার!

হাসপাতালে গিয়া দেখা গেল, বিরজুর মৃতদেহের পাশে বসিয়া তাহার যুবতী স্ত্রী বুক-ফাটা হাহাকার করিতেছে। এক্‌স্‌পার্ট কম্পাউণ্ডারবাবু তাঁহার যথাসাধ্য করিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিরজু মারা গিয়াছে। কম্পাউণ্ডারবাবুর যথাসাধ্য যে কতদূর তাহা ডাক্তারবাবুর অবিদিত ছিল না অবশ্য, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন, সবই তো করা হয়েছে দেখছি, সিরাম একটা দিলে ভাল হ'ত অবশ্য, কিন্তু তা তো আমাদের হাসপাতালে নেই।

শঙ্কর এসব কিছুই শুনিতেছিল না। ওই শোকার্ত বিধবাটার গগনবিদারী ক্রন্দনে সে যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, আহা, অমন জোয়ান লোকটা অপঘাতে মারা গেল! ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিতেছিলেন, কিছুই শঙ্করের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। হঠাৎ তাহার কানে গেল, আমাদের একটা বড় সিরিন্‌জ্‌ পর্যন্ত নেই সার্,

গ্লুকোজ-টুকোজ দিতে এমন অসুবিধে হয়,—টেন সি. সি. সিরিন্‌জ্‌ দিয়ে, মানে, বার বার খুলে খুলে দিলে—

শঙ্কর বলিল, কি কি জিনিস আপনাদের দরকার তা তো আপনারাই ঠিক ক'রে দেন, আমরা টাকা দিয়েই খালাস। যা যা দরকার, তা তো আপনাকেই আনতে দিতে হবে।

সার্‌টেন্‌লি। দিয়েছিলামও, কিন্তু সিবিল সার্জন ঘচাঘচ কেটে দিলে সব, এমন কি অ্যাক্রিক্লেবিন পর্যন্ত কেটে দিয়েছে সার্‌।

টাকা আমরা দিচ্ছি, সিবিল সার্জন কেটে দেবার কে?

প্রমথ ডাক্তার হাত উলটাইয়া এমন একটা সহাস্য মুখভাব করিলেন, যাহার অর্থ—ওই তো! আর বলেন কেন! ও লোকগুলার সব জায়গাতেই ফফরদালালি করা স্বভাব।

আমি ভাবছি—

কথাটা বলিয়াই শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থামিয়া গেল।

কি ভাবছেন?

ভাবছি, ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস বন্ধ করতে না পারলে, হাসপাতালের কাজ ভাল হওয়া সম্ভব নয়।

সার্‌টেন্‌লি। কিন্তু তা হ'লে মাইনেও বেশি দিতে হবে, পঁচাত্তর টাকায় কুলোবে না।

কত টাকা হ'লে কুলোয়?

অন্তত শ পাঁচেক।

শ পাঁচেক!

মৃদু হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, তার কমে কি ক'রে হয়, বলুন?

অত আমাদের বাজেটে কুলোনো শক্ত।

স্যার্‌টেন্‌লি। বাজেট নিয়েই তো যত গোলমাল। সিবিল সার্জন যে ঘচাঘচ কেটে দেন, তাঁরও ওজুহাত ওই বাজেট। আপনারা ওষুধ-পত্তরের জন্যে যত টাকা দেন—

আচ্ছা, চললাম।

হঠাৎ শঙ্কর হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর কম্পাউণ্ডারের দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, এ সব কবি-টবি নিয়ে চলাই দুষ্কর বাবা।

কম্পাউণ্ডার একটু হাসিল।

ডাক্তারবাবু ডাক্তারখানায় আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিলেন না, গুলাব সিংহের স্ত্রীকে ইন্‌জেক্‌শন দিতে যাইতে হইবে। ক্যাল্‌সিয়াম বা ভিটামিন বা ওই জাতীয় কিছু একটা দিতেই হইবে। লোকটা ডবল ফী দিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাসায় আসিয়া দেখেন, তাঁহারই অপেক্ষায় একটি লোক এক হাঁড়ি দই, কিছু ভাল চিঁড়া এবং কয়েক ছড়া চমৎকার রম্ভা লইয়া বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া লোকটি উঠিয়া ঝুঁকিয়া নমস্কার করিল এবং দেহাতি হিন্দীভাষায় যাহা নিবেদন করিল, তাহার সারমর্ম এই—গুলাব সিংহের পত্নী ডাক্তারবাবুকে নমস্কার জানাইয়া এই ভেটগুলি উপহার পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ডবল ফী-ও পাঠাইয়াছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া ইন্‌জেক্‌শন দিবার জন্য না আসেন, কারণ তিনি কিছুতেই ইন্‌জেক্‌শন লইবেন না। স্বামী কিন্তু না-ছোড়, তাই তিনি লুকাইয়া ডাক্তারবাবুকে এই অনুরোধটি জানাইতেছেন, ডাক্তারবাবু যেন টাল-বেটাল করিয়া কোনরকমে ব্যাপারটা গোলমাল করিয়া দেন।

ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে ভেটসহ ফীসটি হস্তগত করিয়া বাম গুম্ফপ্রান্তে মৃদু মৃদু তা দিতে দিতে সমস্ত ব্যাপারটি প্রণিধান করিলেন। তাহার পর বলিলেন, মাইজীকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিও, ইন্‌জেক্‌শন আমি দিব না। কিন্তু গুলাব সিংকে ফাঁকি দিবার জন্য ইন্‌জেক্‌শন দিবার একটা অভিনয় করিতে হইবে। তাঁহার গায়ে ছুঁচ ফুটাইব না, কিন্তু মাইজীকে এমন একটা ভাব করিতে হইবে যেন ফুটাইলাম। এইরূপ না করিলে গুলাব সিং হয়তো অন্য ডাক্তার ডাকিবে এবং সে ডাক্তার হয়তো মাইজীর এ অনুরোধ না-ও রক্ষা করিতে পারেন

এই বার্তা লইয়া লোকটি প্রসন্ন মনে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবুও অনুগমন করিলেন।

৮

বাড়ি ফিরিয়া শঙ্কর দেখিল, স্যুট-পরিহিত একটি তরুণকান্তি যুবক তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। পদশব্দ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শঙ্করকে দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল, মুখভাবে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। শঙ্করও কম অবাক হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কোন বাক্যবিনিময় হইবার পূর্বেই যুবকটি পকেট হইতে কার্ড বাহির করিয়া শঙ্করের হাতে দিল এবং বলিল, আমি এই কোম্পানিকে রেপ্রেজেণ্ট করছি। আপনার হাতে অনেকগুলো ডাক্তারখানা. আমাদের যদি অর্ডার দেন, ভারি উপকৃত হব। হাসপাতালের জন্যে আমাদের স্পেশাল রেট আছে, এই দেখুন—

হেঁট হইয়া চামড়ার ব্যাগ হইতে কাগজপত্র বাহির করিতে লাগিল। শঙ্কর সবিস্ময়ে চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল, তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। নিজের চক্ষুকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এ চেহারা তো ভুল হইবার নয়! যুবকটি খুব অপ্রতিভভাবে নিজের কাগজপত্র দেখাইতেছিল বটে, কিন্তু একবারও সে শঙ্করের চোখের দিকে চাহে নাই। নিজের কাগজপত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কথাবার্তা চালাইতেছিল। ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল, প্রয়োজনীয় আলাপ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে পারিলে সে যেন বাঁচে। শঙ্কর একটিও কথা বলে নাই, কেবল সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

বক্তব্য শেষ করিয়া যুবকটি একগোছা কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গেও একটু দেখা ক'রে যেতে। অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন আমাদের কথা। আচ্ছা, আমি এখন চলি।

কোথায় যাবেন?

স্টেশনে।

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর অবশেষে বলিল, কিছু যদি মনে না করেন, একটা প্রশ্ন আপনাকে করব।

কি, বলুন?

বেলা মল্লিক ব'লে কি আপনার কোন যমজ ভগ্নী ছিলেন?

ভ্রূভঙ্গীসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া যুবক বলিল, না। আচ্ছা, আমি এখন চলি।

বারান্দার নীচেই বাইক ছিল। দ্রুতপদে নামিয়া যুবক তাহাতে চাপিয়া বসিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বিস্মিত শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও বেলা মল্লিককে চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। বেলা মল্লিক? বেলা অবশেষে তাহার নারীত্বকেই অবলুপ্ত করিয়া দিল! প্রাক্-জীবনের এক ঝাঁক স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বেশিক্ষণ কিন্তু সেসব লইয়া বসিয়া থাকিতে সে পারিল না।

বাবা, তল, তা তান্‌দা হভ তে।

খুকী আসিয়া হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। তাহার পর আসিল স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী এবং বলিল, দশ পাউণ্ড কুইনিন অবিলম্বে দরকার। সেদিন তো অত কুইনিন দিল, আবার কুইদিন চাই! শঙ্করের সন্দেহ হইল, কুইনিন বোধ হয় চুরি হইতেছে। কিন্তু ভদ্রসন্তানকে সে কথা বলা যায় না। তাহা ছাড়া অমিয়ার সহিত উহার স্ত্রীর বন্ধুত্ব হইয়াছে। শঙ্কর কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল, কাল আসবেন।

৯

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে।

নিজের ঘরে ঝকঝকে পিতলের পিলসুজে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া নিবিষ্টমনে চরকা কাটিতে কাটিতে হাসি পুত্রটিকে কবিতা মুখস্থ করাইতেছিল।

হাসির পরিধানে শুভ্র খদ্দরের থান, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই, চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রখর জ্যোতি। সে যেন ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছে। জ্বালা যে কেন, তাহা সে নিজেও জানে না। যাহা উচিত, যাহা বিবেক-সম্মত, সমস্তই সে করিতেছে, তবু সমস্ত অন্তর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া গেল।

ছেলেটি ঠিক বাপের মত হইয়াছে। মৃন্ময়ই যেন শিশুরূপে আবার তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। তেমনই ধপধপে রঙ, তেমনই লাল চুল, তেমনই চোখ-মুখ সব। হাসি তাহার নাম রাখিয়াছে, তুমি।

কই, বলছ না, বল আবার।—

"পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারই লাগি তাড়াতাড়ি।"

দুই-একবার ভুল করিয়া 'তুমি' অবশেষে ঠিক করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিল। চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাসি বলিয়া চলিল—

"সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজী দিল তুলে
বন্দার এক ছেলে।
কহিল, ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।"

এই ভাবে রোজ চলে। হাসি সকালে রাঁধে, নিজে পড়ে, ছেলেকে পড়ায়, মৃন্ময়ের একটা ছবি সম্মুখে রাখিয়া ফুল-চন্দন দিয়া পূজাও করে। দুপুরে স্কুল। বৈকালে ছেলের সঙ্গে থাকে। তাহার সহিত খেলাও করে। বাহিরে কোথাও যায় না, কাহারও সহিত মেশে না। এমন কি শঙ্করও যে তাহার নিকট বার বার আসে, ইহাও সে পছন্দ করে না। ইহাই তাহার বর্তমান জীবন। নিঃসঙ্গ এবং কর্তব্যময়।

১০

ব্যাঙ্কে আজ ধার লইবার দিন। অসম্ভব ভিড় হইয়াছে। কেবল সহি করিতে করিতেই শঙ্কর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কাহার ধার পাওয়া উচিত, কাহার উচিত নয়, কাহার ধার শোধ করিবার সংস্থান আছে, কাহার নাই, এসব বিচার করিতে গেলে শুধু যে বিলম্ব হইয়া যায় তাহা নয়, কেনারাম চক্রবর্তীকেও অসন্তুষ্ট করিতে হয়। তিনি যাহাকে যাহাকে সুপারিশ করিয়াছেন, শঙ্কর তাহারই দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেছে। কেনারামবাবু অবশ্য প্রত্যেক দরখাস্তেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন যে, শঙ্কর নিজে ভাল করিয়া খোঁজ-খবর করিয়া যদি ধার দেওয়া নিরাপদ মনে করে, তবেই যেন ধার দেয়। কিন্তু তাহা শঙ্করের পক্ষে করা অসম্ভব। সে নির্বিচারে সহি করিয়া চলিয়াছে। মাথা-পিছু টাকা অবশ্য বেশি নয়, কেহ দশ, কেহ বিশ, কেহ পচিশ, কিন্তু মাথা অনেকগুলি, প্রায় দুই শত। ইহাদের প্রত্যেকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর লওয়া শঙ্করের সাধ্যাতীত।

কাল ছট পরব। প্রত্যেকেরই টাকার দরকার এবং টাকার দরকার পড়িলে ধার করা ছাড়া অন্য কোন সদুপায় ইহাদের জানা নাই। উৎপলও বলিয়াছে, পর্বের সময় কাহাকেও যেন নিরাশ করা না হয়। আদেশের ভঙ্গীতে বলে নাই, অনুরোধ করিয়াছে।

সকলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। পথে হঠাৎ নেকিরাম মাড়োয়ারীর সহিত দেখা হইল।

রাম রাম, সোংকোরবাবু, রাম রাম। হাঁ, খুব কিয়া আপ দোনো, সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে।

হিন্দী-বাংলা মিশ্রিত অদ্ভুত ভাষায় নেকিরাম দন্ত বিকশিত করিয়া সোল্লাসে উৎপলের এবং শঙ্করের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

গরিব লোক সব কাঁহাসে রূপিয়া লানবে! হামি লোগ তো সব চোষ লিয়া। আপনেরা খুব করলেন। সামনে ছট পরব, কাঁহাসে রূপিয়া মিলবে বেচারাদের! খুব কিয়া, যশ হো গিয়া, সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে, বা বা বা বা বা!

খানিকক্ষণ এই জাতীয় বক্তৃতার পর 'রাম রাম' কহিয়া নেকিরাম পাশের গলিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। শঙ্কর মনে মনে বেশ একটু পুলকিত হইল। নেকিরাম কাপড়ের দোকান ছাড়া মহাজনী কারবারও করে। এই ছুট পরবের মরশুমে গরিব চাষীদের বেশ চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া বেশ কিছু বাণিজ্য করিত, এবার বেচারার সে গুড়ে বালি পড়িল। সত্যই ইহারা গরিবদের রক্ত শোষণ করে। নিজের মুখেই আবার বলা হইতেছে, হামি লোগ সব চোষ লিয়া! ইহারা না গেলে দেশের উন্নতি নাই। নিপু ঠিকই বলে। এই ক্যাপিটালিস্টরাই দেশের শত্রু, ইহাদের সর্বগ্রাসী লোভ দেশের সর্বস্বই গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। অথচ ইহাদের বাদ দিয়া চলিবারও উপায় নাই। অর্থবানদের অর্থেই দেশের যত কিছু সৎকার্য হয়। ধনীদের বদান্যতাতেই গরিবদের উপকারের আশা। ক্যাপিটালিস্ট উৎপল যদি টাকা না দিত, তাহা হইলে তো এসব কিছুই হইত না। কমিউনিস্টদের মতে, এই উৎপলই কিন্তু উচ্ছেদযোগ্য। অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অমিয়া তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিতেছিল। কমিউনিস্টদের মতে ভক্তিপরায়ণা অমিয়াও উপহাসাস্পদ।

প্রণতা অমিয়ার পাশে খুকীও হেঁট হইয়া বলিতেছে, নমো—নমো।

নিকার-বোকার পরানো থাকাতে ভাল করিয়া হেঁট হইতে পারিতেছে না, কিন্তু বেচারার চেষ্টার ত্রুটি নাই। কুঁথাইয়া কুঁথাইয়া যথাসম্ভব পিঠ বাঁকাইয়া চোখ-মুখ লাল করিয়া মাথাটা নত করিয়াছে।

শঙ্করের পদধ্বনি শুনিয়া তাহার প্রণাম করা ঘুচিয়া গেল। ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, তে? মানে, কে?

তাহার পর শঙ্করকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহার হাঁটু দুইটি জাপটাইয়া ধরিয়া উদ্ভাসিত মুখে বলিল, ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাদে।

শঙ্কর বলিল, কিচ্ছু হ'ল না।

কিত্তু ওলো না?

না।

খুকী পুনরায় চেষ্টা করিল। চোখ বড় বড় করিয়া দুইবার আবৃত্তি করিল, ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাদে, ভম্ ভম্ ভম্ বাদে।

শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমু খাইয়া বলিল, কিচ্ছু হচ্ছে না।

আজ সকালে নিমাই আসিয়াছিল এবং সে খুকীকে ভারতচন্দ্রের ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে লেখা দুই লাইন কবিতা শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।

খুকী কেবল শিখিয়াছে—'ভম্ ভম্ ভম্ বাদে' এবং তাহাই সমস্ত দিন যখন তখন আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। কোলে উঠিয়াই খুকী শঙ্করের বুক-পকেটে হাত চালাইয়া সিগারেট-কেস ও ফাউণ্টেন-পেনটি হস্তগত করিয়া ফেলিল এবং সতৃষ্ণ নয়নে হাতঘড়িটার পানে চাহিল। বাবার এই জিনিসগুলির উপর তাহার টান সবচেয়ে বেশি। চকচকে সেলুলয়েডের পুতুল অথবা দম-দেওয়া মোটরের উপর তাহার তাদৃশ মমতা নাই; প্রথম প্রথম যে মোহ ছিল, এখন আর তাহাও নাই। মোটরের চাবিও খারাপ হইয়া গিয়াছে, পুতুলটাও খুব সুস্থ নয়। বাঘা কুকুরটা চিবাইয়া তাহার একটা পা শেষ করিয়া দিয়াছে এবং দুইটা জিনিসই বারান্দার কোণে অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। খুকুর টান বাবার এই জিনিসগুলির প্রতি। সিগারেট হোল্ডারটা তো দখলই করিয়া লইয়াছিল, এখন অবশ্য সেটা হারাইয়া গিয়াছে, তাহার কথা মনেও নাই।

দাও, ওগুলো দাও।

খুকী মাথা নাড়িয়া আপত্তি করিল।

দাও তো, লক্ষ্মী। ও বাবা, তোমার কি সুন্দর কোট হয়েছে, দেখি দেখি!

কোটের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেই কোট সম্বন্ধে তাহার সত্য মতামত সে অকপটে ব্যক্ত করিয়া ফেলিল।

কোত কুলে দাও।

অমিয়ার জেদাজেদিতেই ওগুলা পরিতে হয়। কোট-পাজামা পরিয়া থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা করে না।

বাবা, কুলে দাও।

আরো সুনু, ইধার আবো ?

উঠানের অন্ধকার কোণ হইতে কে কথা কহিয়া উঠিল। খুকী সঙ্গে সঙ্গে কোল হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার প্রিয় পরিচিত কণ্ঠস্বর।

যমুনিয়া নাকি ?

অমিয়া ভাঁড়ারঘরে ধুনা দিতেছিল, বাহির হইয়া বলিল, আবার কে, কাল ছট, টাকা দাও।

মুশাই গাড়োয়ানের বউ যমুনিয়া।

এখুনি তো মুশাই কুড়ি টাকা ধার নিয়ে গেল !

ওক্‌রসে একো পয়সা কি হাগরো মিলতে। পঁদ্‌রে রূপিয়া লেতেই নেকি মাড়বারিয়া আর পাঁচ রূপিয়া লেতেই ওহি মুসহরনি ছৌড়ি।

কি রকম ?—ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

যমুনিয়া সবিস্তারে যাহা বর্ণনা করিল, তাহাতে শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। নেকি মাড়োয়ারী, রাজীব দত্ত এবং মুকুন্দ—এ অঞ্চলের এই তিনজন মহাজন নাকি তাহাদের সমস্ত খাতকদের ডাকাইয়া শাসাইয়াছেন যে, আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি সকলে তাহাদের ঋণ সুদ সমেত পরিশোধ না করে, তাহা হইলে প্রত্যেকের নামে নালিশ করা হইবে এবং বন্ধকী জিনিস কাহাকেও আর ফেরত দেওয়া হইবে না। সত্যই নালিশ করিলে আদালতের বিচারে কি হইবে তাহা যদিও ঠিক জানা নাই ; কিন্তু নালিশের নামেই গরিব লোকেরা ভয় পায়। তাহারা ভাল করিয়াই জানে যে, যাহার প্রচুর অর্থ আছে, আদালতে শেষ পর্যন্ত তাহারই জয় হয়। তাহারা আজ সকলে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়াছে, উহাদেরই ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত। সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ করিলে ছটের জন্য আবার তাহারা নূতন ঋণ পাইবে এ আশ্বাসও মহাজনরা অবশ্য দিয়াছে। কিন্তু যমুনিয়া অত চড়া সুদে আর টাকা ধার করিতে পারিবে না, কারণ বন্ধক দিবার মত তাহার আর কিছুই নাই। তাহার যাহা কিছু ছিল, সব উহাদের গর্ভেই গিয়াছে। যমুনিয়া মলিন বস্ত্রাঞ্চল চোখে দিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুশাই আজকাল তাহাকে দেখে না, আজকাল রাত্রে বাড়ি পর্যন্ত যায় না, ওই

মুসহরনি ছুঁড়ীটার কাছে পড়িয়া থাকে, ছুঁড়ী তাহার স্বামীকে 'গুণ' করিয়াছে। ও মানুষ নয়, ডাইনী। তাহার পর সহসা চক্ষু হইতে বস্ত্রাঞ্চল নামাইয়া শঙ্করের দিকে সে আগাইয়া গেল এবং একটু ঝুঁকিয়া মুখ বাড়াইয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোঁহি তো রূপিয়া দে দে করিকে ওক্‌র এইসন্ হালত্ করলি।

ছট করবি তুই কার জন্যে?

ওক্‌রে বাস্তে।

ওই স্বামীর মঙ্গলার্থেই সে উপবাস করিয়া ছটপূজা করিবে।

ক টাকা চাই?

দশঠো।

শঙ্কর বিনাবাক্যব্যয়ে দশটা টাকা বাহির করিয়া দিল।

অমিয়া কিছু বলিল না, মুচকি হাসিল। তাহার সমস্ত অন্তর যেন আনন্দে গর্বে ভরিয়া উঠিল। পূর্বে শঙ্করের যথেচ্ছ খরচ দেখিয়া তাহার কষ্ট হইত, এখন আর হয় না। এই লোকটির মনের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া চলিতে পারিলেই আনন্দ পাওয়া যায়, ইহা সে বুঝিয়াছে।

যমুনিয়া চলিয়া গেল না। টাকাটা খুঁটে বাঁধিয়া খুকীকে কোলে লইয়া হিন্দী ছড়া বলিতে বলিতে ঘুম পাড়াইতে লাগিল,·চান্দ মামু চান্দ মামু, আরে আবো বারে আবো, নদীয়া কিনারে আবো, সোনাকা কটোরামে দুধু ভাতু লেনে আবো।

শঙ্কর বাহিরের আরাম-কেদারাটায় অন্ধকারে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহাদের ব্যাঙ্কের এতগুলা টাকা ওই রক্তশোষক মহাজনদের সিন্দুকে গিয়া ঢুকিল! গরিব প্রজারা এক পয়সা পাইল না!

সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে। খুব কিয়া আপলোগ।—নেকি মাড়োয়ারীর বিকশিতদন্ত মুখচ্ছবিটা তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল।

১১

অন্ধকার রাত্রি, চতুর্দিক নির্জন। নিপু আপন ঘরে বসিয়া একমনে ডায়েরি লিখিতেছিল—

একটা কালো কুক্কুরী আমার অস্থি-মাংস চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছে। স্নায়ু-শিরা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর-মন আর্তনাদ করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই নিস্তার নাই, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না, কিছুতেই সে আমাকে শান্তি দিবে না। অর্থ, সামর্থ্য, ভয়-প্রদর্শন, যুক্তি—সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। কিছুতেই তাহার মন পাইতেছি না। কুক্কুরী, ঘৃণিতা কুক্কুরী, কালো, কুৎসিত, কদর্য, কিন্তু তবু, ওঃ—না, নিজেকে সম্বরণ করিতে হইবে, এ জ্বালাময় অপমান আর সহ্য করিতে পারি না, আর সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু কেন? কেন আত্মসম্বরণ করিবার প্রবৃত্তি জাগিতেছে? এ দুর্বলতার অর্থ কি? অর্থ সেই সনাতন সংস্কার, মনের সেই অন্ধ গোঁড়ামি, যাহা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া নিষেধকে মানে, যাহা প্রত্যক্ষ যুক্তিকে বিদলিত করিয়া অযৌক্তিক মানস-বিলাসে আত্মহারা হয়, যাহা কাল্পনিক পরলোকের আশ্বাসে অতি বাস্তব ইহলোককে তুচ্ছ করে। না, এ দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সকলকে বায়োলজির মূল তত্ত্ব শিখাইতে হইবে, যে বায়োলজি জীবধর্মের স্থূল রূপটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, যাহা জীবকে জীব হিসাবেই গণ্য করে—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিকতার কুয়াশা সৃষ্টি করিয়া যাহা জীবনের বৃহৎ সত্য আবৃত করিয়া ফেলে না। আগে জীবন, তাহার পর জীবনদর্শন। বল্‌শেভিক রাশিয়া সহজ সুস্থ যৌন-মিলনের সমস্ত কৃত্রিম বাধা দূর করিয়া দিয়াছে। সে দেশে ভালবাসা ছাড়া আর কোনও নিগড় নাই। ও-মেয়েটা কি আমাকে ভালবাসে না? হয়তো বাসে, কিন্তু বাসিলেও প্রকাশ্যত তাহা স্বীকার করিতে পারে না, সমাজের নিষ্ঠুর আইন আছে। সে পারিলেও আমি পারি না, আমার একটা ঝুটা আত্মসম্মানের বুর্জোয়া মুখোশ আছে, আমি কিছুতেই প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে পারি না যে, আমি একটা নীচজাতীয়া অস্পৃশ্যার

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। বলশেভিক রাশিয়ায় হয়তো এই অবৈজ্ঞানিক চক্ষুলজ্জা থাকিত না, হয়তো ওই মেয়েটাও ওই নাক-বসা সর্বাঙ্গে-ঘা লোকটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হইত না, হয়তো—

চিন্তা-স্রোতে সহসা বাধা পড়িল। অদূরে হাড়ী-টোলায় একটা কলরব উঠিল। মনে হইল, যেন মারামারি বাধিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি কলম রাখিয়া ডায়েরি বন্ধ করিয়া ফেলিল। উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ শুনিল, তাহার পর আলোটি কমাইয়া বালিশের তলা হইতে টর্চটি লইয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল। অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, অস্পৃশ্যদের উন্নতি-সাধন তাহার কাজ, অস্পৃশ্যদের মধ্যেই তাই সে বাসা বাঁধিয়াছে। একেবারে ঠিক মধ্যে নয়, কাছাকাছি। হাড়ী-পাড়ার একটু দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাহার পরিচ্ছন্ন ছোট বাসাটি। উৎপলই বাসাটি করাইয়া দিয়াছে। অস্পৃশ্য বালক-বালিকাদের পাঠশালাটি এই বাসারই প্রশস্ত বারান্দায় রোজ বসে। নিপুই তাহাদের পড়ায় ইহাদের কাছে সে 'গুরুজী' বলিয়া পরিচিত। টর্চ ফেলিতে ফেলিতে অন্ধকারে নিপু আগাইয়া গেল। অকুস্থলে পৌছিয়া তাহাকে কিন্তু গতিবেগ সম্বরণ করিতে হইল। আর অগ্রসর নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। এ কি কাণ্ড! সুরা-উন্মত্ত একদল হাড়ী অশ্রাব্য ভাষায় চীৎকার করিতেছে। ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া মুশকিল। ভিড়ের ভিতর হইতে একটা আর্তনাদও উঠিতেছে—ভিতরে কে যেন কাহাকে প্রহার করিতেছে। নিকটেই ধূমাঙ্কিত একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা না জ্বলিলেও ক্ষতি ছিল না। একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিপু ইতস্তত করিতে লাগিল—কি করা যায়! কিছু একটা অবিলম্বেই করা উচিত, আর্তনাদটা ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কি যে ঠিক হইতেছে তাহা অনুমান করা কঠিন—সকলেই অসংলগ্ন ভাষায় চীৎকার করিতেছে, কিছুই বোঝা যায় না, কেহই থামিবেও না। উহাদের ভিতর গিয়া হাতাহাতি করিতে পারিলে তবে হয়তো উহাদের থামানো যায়; কিন্তু তাহা করা নিপুর পক্ষে অসম্ভব। সে দূর হইতেই দুই-একবার টর্চ ফেলিয়া 'এই এই, কিয়া হুয়া' জাতীয় দুই-একটা উক্তি করিল, কিন্তু কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ভিড়ের ভিতরে

আর্তনাদটা প্রবলতর হইয়া উঠিল। কেহ কাহাকেও খুন করিয়া ফেলিতে না তো! অসম্ভব নয়। নিপুর স্মরণ হইল, জারের যুগে রাশিয়ান শ্রমিক ভড্‌কা পান করিয়া আপনজনকে হত্যা করিয়া ফেলিতেছে, এ কাহিনী বহুবার বহু পুস্তকে পাঠ করিয়াছে। আর একটু আগাইয়া গিয়া আর একবার টর্চ ফেলিল! এবার সে দেখিতে পাইল এবং যাহা দেখি তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মোটা কালো একটা হাড়ি একটা রোগা ছোঁড়ার বুকের উপর বসিয়া তাহার চুলের ঝুঁটি করিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চড়াইতেছে এবং ক্রুদ্ধ কর্কশকণ্ঠে বলিতে এইসে, এইসে. এইসে—। ছোঁড়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, বাপ বাপ রে, বাপ রে—

মোটা হাড়িনী শুধু মোটা নয়, মোটা এবং কালো। তাহার রুক্ষ চু আলুলায়িত, কাপড় ছিন্নভিন্ন, মুখে অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষা। আর একবার ফেলিয়া নিপু ইহাকে চিনিতে পারিল। এই মাগীই তো (মাগী কথা তাহার মনে হইল) চুপড়ি, কুলো, মোড়া বুনিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় ক বেড়ায়। দিনের আলোকে নিপু ইহাকে অনেকবার দেখিয়াছে। তখন ইহার বেশ শান্তশিষ্ট সলজ্জ মূর্তি, মুখের আধখানা ঘোমটা দিয়া ঢাকা থা ভদ্রলোক দেখিলে একটু তেরছাভাবে দাঁড়াইয়া ফিসফিস করিয়া কথা বলে সেই ব্যক্তির এখন এই মূর্তি এবং প্রতাপ! ছোঁড়াটা নিদারুণ চীৎক করিতেছে। নিপু আর একবার ক্ষীণভাবে চেষ্টা করিল, আরে, এই, কি করতা হ্যায় তুমলোগ? ছোড়ো, ছোড়ো, উঠো।

মহিষমর্দিনী তাহার কথায় দৃক্‌পাত পর্যন্ত করিল না। কিন্তু বার ব টর্চের আলো ফেলাতে ভিড়ের অন্য দুই-একজন যে বিচলিত হইয়াছে, তাহ প্রমাণ মিলিল। একটা রোগা লম্বা-গোছের হাড়ী আগাইয়া আসি আদেশের ভঙ্গীতে বলিল, কোওন হ্যায় রে?

নিপু আমতা আমতা করিয়া বলিল, আরে, শুনো—শুনো—

ভা-গো শালা।

একটা বুড়া আগাইয়া আসিল। তাহারও পা টলিতেছিল, কিন্তু,

একেবারে সম্বিৎ হারায় নাই। নিপুকে সে চিনিতে পারিল। আরে শালা চুপ র, গুরুজী আইলো ছে। সেলাম গুরুজী।

তৃতীয় আর এক ব্যক্তি ইহার প্রত্যুত্তরে খুব একটা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিয়া বলিল, গোলি মারো গুরুজীকো।

চতুর্থ একজন জড়িতকণ্ঠে মন্তব্য করিল, গুরুজী ফুলশরিয়াকা পিছোমে পড়লো ছে—

ইহাতে পঞ্চম একজন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মোটা কালো হাড়িনীটা ছোঁড়াটাকে সমানে মারিয়া চলিয়াছে। কাহারও সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন অতিশয় স্বাভাবিক এবং সঙ্গত একটা ব্যাপার ঘটিতেছে, বিচলিত হইবার কিছু নাই। কেবল সেই বুড়াটা একবার মাত্র বলিল, হে গে, আব ছোড়ি দে, ঢের ভেলো।

নিপু নির্বাক হইয়া ভাবিতেছিল, এখন কি করা যায়! বাইক করিয়া অবিলম্বে থানায় গিয়া খবর দেওয়া উচিত, না, শঙ্করের কাছে যাওয়া উচিত! এমন ভাবে চলিলে তো—

অপ্রত্যাশিতভাবে কিন্তু সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। নটবর ডাক্তার সহসা অশ্বপৃষ্ঠে ঘটনাস্থলে আসিয়া হাজির হইয়া গেলেন এবং ঘোড়ার লাগাম টানিয়া প্রশ্ন করিলেন, এত্‌না হাল্লা কাহে রে?

মন্ত্রবলে সমস্ত যেন ঠিক হইয়া গেল। যে যেখানে ছিল, সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নটবর ডাক্তারকে সেলাম করিল। মোটা হাড়িনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিজের প্রায়-উলঙ্গ কলেবরকে লুকাইবার জন্য কুঁড়ে-ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। ছোঁড়াটা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছোঁড়া অপর কেহ নয়, উহারই তৃতীয় পক্ষের স্বামী, ন্যায়সঙ্গতভাবেই মার খাইতেছিল। ডাক্তারবাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়াটাকে বেড়ার খুঁটায় বাঁধিলেন এবং সহাস্যমুখে উহাদের মধ্যে গিয়া হাজির হইলেন।

তাড়ি, তাড়ি, খালি তাড়ি! শালা লোগ তাড়ি পিতে পিতেই জাহান্নমমে যাগা। দেখে কেইসে তাড়ি, লে আও। ইতিমধ্যে একজন ঘরের ভিতর হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া আনিয়াছিল। নটবর ডাক্তার তাহার

উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। সসম্ভ্রমে একজন মাটির খুরিতে ভরিয়া তাড়ি আগাইয়া দিল, ডাক্তারবাবু একবার শুঁকিয়া দেখিলেন, তাহার পর এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন।

ছি ছি ছি ছি, যেত্তা রদ্দি মাল পিতে হো শালে লোগ। যাও, পাঁচ বোতল আচ্ছা মাল লে আও।

পকেট হইতে পাঁচটা টাকা ঝনাৎ করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া একজন বলিল, কালালি কি আভি খুললো হোতৈ ?

যা করকে বোলো—ডাক্‌টারবাবু মাংতে হেঁ।

একজন টিপ্পনী কাটিল, ওকর বাপ দেতেই।

যাহার বাড়িতে ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন, সে ব্যক্তি ঔষধের বাক্স মাথায় লইয়া পিছু পিছু আসিতেছিল, সে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাকে নটবর ডাক্তার আদেশ করিলেন, তুম আগু বঢ়ো, হম আতে হেঁ।

লোকটি তাড়ির আড্ডায় ডাক্তারবাবুকে সমাসীন দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে সাহস করিল না। এমনিতে ডাক্তারবাবু কোন না কোন সময়ে গিয়া ঠিক পৌঁছিবেন, কিন্তু প্রতিবাদ করিলে বাঁকিয়া বসিতে পারেন এবং একবার বাঁকিয়া বসিলে নটবর ডাক্তারকে সিধা করা শক্ত। কিছু না বলিয়া সে ব্যক্তি নীরবে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ নিপুকে লক্ষ্য করেন নাই। নিপুর সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল না, মুখ চিনিতেন, কিন্তু স্বল্পালোকে তাহাও চিনিতে পারিলেন না।

কোন্ হ্যায় ?

আমি।

নিপু আগাইয়া আসিল।

ও, মাস্টার মশাই! কি বিপদ! আসুন আসুন। আর একঠো মো লে আও। আসুন। চলবে নাকি এক-আধ পাত্তর ?

আজ্ঞে না, আমি ওসব 'টাচ' করি না।

টাচ করেন না? ও! আপনিই না untouchability দূর করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছেন? বসতে তো দোষ নেই, বসুন না।

আর একটা মোড়া আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু নিপু বসিল না। হাড়ীদের তাড়ির আড্ডায় বসিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নটবরের উপর তাহার রাগও হইল। কোথায় ইহাদের সুরাপান হইতে নিবৃত্ত করিবে, না, আরও পাঁচ বোতল আনিতে দিল! শঙ্করকে বলিয়া ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে।

বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

আমার একটু কাজ আছে, চললাম—এখন আর বসব না।

বাসায় আসিয়া বাইক করিয়া সে শঙ্করের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। শঙ্কর কিন্তু তখন দ্বিতলে বসিয়া কবিতার ছন্দ মিলাইতেছিল। চাকরের মুখে নিপুদার আগমনবার্তা শুনিয়া পুলকিত হইল না।

বল গিয়ে, বাবু শুয়ে পড়েছেন, এখন দেখা হবে না।

নিপু চাকরের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দ্বিতলের আলোকিত বাতায়নটার দিকে একবার চাহিয়া আবার বাইকে সওয়ার হইল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এত রাত্রে ছয় মাইল রাস্তা বাইক করিয়া আসিলাম, শঙ্কর তাহার সহিত দেখা পর্যন্ত করিল না! এ কিছু নয়, টাকার গরম। ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তির লক্ষণ। উৎপল আসিলে তাহাকে শঙ্কর এমনভাবে ফিরাইয়া দিতে পারিত কি?

নির্জন মাঠের ভিতর দিয়া নিপু বাইক করিয়া চলিয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিতেছে, কি একটা অজানা ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত। নিপুর মনে কিন্তু এতটুকু আনন্দ নাই। মাতাল হাড়ীগুলা পর্যন্ত তাহাকে উপহাস করিল, অথচ তাহাদের মঙ্গলের জন্য সে কি না করিতেছে! নটবর ডাক্তারটারও স্পর্ধা কম নয়, তাহাকে ওই স্থানে বসিয়া তাড়ি খাইতে অনুরোধ করিতেছিল! ছোটলোকগুলাকে মদ ঘুষ দিয়া তাহাদের দলপতি সাজিয়াছে! স্কাউণ্ড্রেল! আবার তাহার মনে হইল, ক্যাপিটালিজ্‌ম—

ক্যাপিটালিজ্‌মের এই আর এক রূপ, ইহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি নাই।

১২

ছট পরব লাগিয়াছে।

দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ রঙিন কাপড় পরিয়া নদীতীরে চলিয়াছে। হলুদ এবং গোলাপী রঙের প্রাধান্যই বেশি। গরিব লোকেরা সাধারণ কাপড়ই রঙাইয়া লইয়াছে। যাহাদের অবস্থা একটু ভাল, তাহাদের কেহ কেহ রেশম পরিয়াছে। বেশির ভাগই স্ত্রীলোক, শাড়ি এবং ওড়নারই আধিক্য। যাহার যেটুকু জুটিয়াছে, তাহাতেই সে বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন হইয়া বাহির হইয়াছে। সকলেরই মুখে একটা শান্ত সৌম্য নিষ্ঠার ভাব। যাহারা 'ছট' করে, তাহারা সকলেই উপবাসী থাকে, প্রিয়জনের কল্যাণ-কামনায় ভগবানের নিকট মানত করিয়া আন্তরিক নিষ্ঠাভরেই সেই মানত শোধ করিতে যায়।

ছট পরবের নিয়ম অনেক। কালীপূজার পর হইতে ছয় দিন নিয়ম করিয়া থাকিতে হয়। কালীঠাকুরের ভাসানের পর পুরাতন হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়া নূতন হাঁড়িতে পাক করিয়া প্রথম তিন দিন খুব শুদ্ধাচারে নিরামিষ আহারাদি করা নিয়ম, কোন দিন কদ্দু ভাত, কোন দিন মটর-ডাল ভাত। চতুর্থ দিনে 'খর্ণা', অর্থাৎ সেই দিনই আসল পূজার আরম্ভ। উঠানেই পূজা হয়। কাঁচা মাটির সরায় ও হাঁড়িতে পূজার উপকরণ সজ্জিত করাই বিধি, পোড়া মাটির বাসন চলে না। কাঁচা মাটির বাসনগুলিকে সিন্দূর দিয়া অলঙ্কৃত করিয়া তাহাতে ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি প্রভৃতি রাখা থাকে। একটি বাসনে কাঁচা দুধে পাঁচ রকম ফলের রস দিয়া পঞ্চামৃত তৈয়ারি হয়, আর একটি পাত্রে দুধে আলোচাল সিদ্ধ করিয়া পূর্ব হইতেই 'আরোয়াইন' প্রস্তুত করা থাকে। যে ছট করিবে, সে পূজা করিয়া একনিশ্বাসে যতটা পারে ততটা দুধ পান করিয়া লয়। দুগ্ধ পান করিবার সময় যদি কেহ 'টোকে' অর্থাৎ নাম ধরিয়া ডাকিয়া দেয়, কিংবা যদি কোন রকম শব্দ হইয়া বা

গোলমাল হইয়া বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর খাওয়া হয় না। ছটের প্রথম দিন হইতেই 'সুপে' অর্থাৎ কুলাতে নানারূপ ফল সাজাইতে হয়, যাহার যেমন সামর্থ্য সে সেইরূপ করে। বড়লোকেরা দেয় আঙুর আপেল কিসমিস—গরিবেরা দেয় পেয়ারা খেজুর আতা নারিকেল। ইহা ছাড়া সকলকেই দিতে হয় 'খাবুনি'—আটা এবং ঘি দিয়া প্রস্তুত পিষ্টকজাতীয় একরূপ খাবার। চতুর্থ দিন সকালে একনিশ্বাসে দুগ্ধ-পান, রাত্রে 'আরোয়াইন'। পঞ্চম দিন উপবাস। ডালায় 'সুপ' সাজাইয়া সেটি মাথায় লইয়া একবার সকালে, একবার বিকালে নদীতীরে যাইতে হয়, আকাশের দিকে হাত তুলিয়া সূর্যপূজা করিতে হয়। পঞ্চম দিন অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসের পর ষষ্ঠ দিনে নদীতীরে গিয়া সূর্যপূজা করিয়া তবে উপবাস ভঙ্গ করিতে হয়। ছট পরবে এ দেশের জনসাধারণের গভীর বিশ্বাস—সকলেই জানে, নিষ্ঠাভরে করিলে নিশ্চয়ই দেবতা মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। উপবাস ছাড়াও কেহ কেহ আবার কঠোরতর মানত করে। নিজের বাড়ি হইতে নদীর তীর পর্যন্ত হয়তো সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে যায়, এই কৃচ্ছ্রসাধনই তাহার মানত। কেহ হয়তো ভিক্ষা করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে, এই দীনতাস্বীকারই তাহার মানতের অঙ্গ। একবার মানত করিয়া ফেলিলে তাহা শোধ করিতেই হয়, মানত করিয়া যদি কেহ অসুস্থতাবশত তাহা পালন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার হইয়া অপর কাহাকেও তাহা করিয়া দিতে হয়। করিয়া দিবার লোকাভাবও হয় না। ছট বড় জাগ্রত দেবতা, কোনও অনিয়ম সহ্য করেন না। দাইয়ের স্বামীটা যে পাগল হইয়া গিয়াছে, মুশাইয়ের মামার সর্বাঙ্গে যে ধবল হইয়াছে, সকলের বিশ্বাস ছটপূজায় অনিয়ম করাই নাকি সেসবের আসল কারণ। একজন নাকি উপবাসের সময় লুকাইয়া খাইয়াছিল, আর একজনের নাকি 'সুপে' পা ঠেকিয়া গিয়াছিল, সেই পদস্পৃষ্ট 'সুপ' লইয়াই সে নাকি দেবতার পূজা চড়াইয়াছিল, তাই এই শাস্তি।

ডালা মাথায় লইয়া দলে দলে নরনারী চলিয়াছে। যে একটু অবস্থাপন্ন, সে সঙ্গে বাজনাও লইয়াছে। বাজনা অবশ্য বিশেষ কিছু নয়—একটা ঢোল,

একটা কাঁসি এবং একটা সানাই। কিন্তু উহাতেই উৎসব জমিয়া উঠিয়াছে।

শঙ্কর বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়া এই জনস্রোত দেখিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, আমরা এতদিন ইহাদের ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি, ইহাদের পূজা-পার্বণকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিয়াছি। কিন্তু এই যে দলে দলে নরনারী উপবাস করিয়া প্রিয়জনের কল্যাণ-কামনায় দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইতে চলিয়াছে, তাহা কি সত্যই উপহাস করিবার মত জিনিস? নব-বৎসরে ছাপানো-হরফে ডাকযোগে 'শুভকামনা' জানানো অপেক্ষা কি ইহা বেশি হাস্যকর? ইহাদের মত আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাস কি আমাদের আছে? আছে বইকি। আমরা ইংরেজী অক্ষরে লেখা অথবা বিদেশী-মুখ-নিঃসৃত যে কোন অসম্ভব তথ্য নির্বিচারে বিশ্বাস করি। নাসা কুঞ্চিত করি কেবল দেশী জিনিসের বেলায়। কেরোর 'বুক অব নাম্বাস' আমরা অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত পড়ি, আমাদের যত অবিশ্বাস দেশী গণক-ঠাকুরকে। ফ্রী-ম্যাশনের আংটি পরিতে আমাদের আপত্তি নাই, মাদুলি পরিতেই যত আপত্তি। উপবীতগুচ্ছ গলায় ঝুলাইয়া রাখা অযৌক্তিক মনে করি, টাই ঝুলাইবার বেলায় কিন্তু যুক্তির কথা মনে পড়ে না, বারম্বার মনে হয়, নট্‌টা ঠিকমত হইয়াছে কি না, রঙটা ঠিক ম্যাচ করিয়াছে কি না! রাশিয়ার সাম্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্র লইয়া আমরা উন্মত্ত, কিন্তু হিন্দু সভ্যতায় যে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের নীতি আছে, তাহা প্রণিধান করিবার মত ধৈর্য আমাদের নাই। উদ্দীপ্ত হইলেই শঙ্করের চা পান করিবার বাসনা হয়। চেয়ারে শুইয়াই হাঁকিল, অমিয়া!

অমিয়া একটু দিবানিদ্রা উপভোগ করিবে বলিয়া শুইয়া ছিল, সবে বেচারীর তন্দ্রাটি আসিয়াছিল, উঠিয়া আসিতে হইল।

কি?

একটু চা কর না।

অমিয়া চলিয়া গেল।

সহসা শঙ্করের চোখে পড়িল, ডালা মাথায় করিয়া যমুনিয়া যাইতেছে।

াহার পিছু পিছু ভাল মানুষের মত মুশাইও চলিয়াছে। যমুনিয়ার মাতৃমূর্তি। ই যেন দুষ্ট অবাধ্য ছেলে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া ভালমানুষ সাজিয়া কর্তব্য করিতেছে। মুশাই একবার আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিয়া হাসিল। শঙ্করের সমস্ত মন মাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে মুগ্ধনেত্রে বসিয়া ছট পরবের শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

অমিয়া চা করিয়া আনিল।

এইবার খাতা-কলম চাই নাকি?

চাই।

অমিয়া গনগন করিয়া বলিল, খালি ফরমাশের ওপর ফরমাশ! ভাবলুম, একটু ঘুমুব—

খুকী ঘুমিয়েছে?

তাকে যতুয়া ছটের মেলা দেখাতে নিয়ে গেছে।

অমিয়া খাতা ও ফাউণ্টেন-পেন দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শঙ্কর আবার ডাকিল।

সিগারেট দেশলাই।

বাবা বাবা!

শঙ্কর যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, অমিয়াকে ফরমাশে ফরমাশে অস্থির করিয়া তোলে। অনেক সভ্য স্বামী স্ত্রীর সহিত লৌকিকতা করেন, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহাদের নানারূপ 'কন্‌সিডারেশন' আছে। শঙ্করের সে সব কিছুই নাই। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত সে যেমন লৌকিকতা করে না, স্ত্রীর সহিতও করে না; অমিয়াকে সে সত্যই অর্ধাঙ্গিনী মনে করে। অমিয়াকে ঘিরিয়া কোন রকম রোমান্স তাহার মনে জাগে নাই, অমিয়ার সহিত কোন রকম ভণ্ডামি করাও সে প্রয়োজন মনে করে না, এমন কি অমিয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সে সর্বক্ষণ সজাগভাবে সচেতন নয়, কিন্তু অমিয়া না হইলে তাহার জীবনযাত্রা অচল। অতিশয় অপ্রত্যক্ষভাবে নিশ্বাসবায়ুর মত অমিয়া সঙ্গোপনে তাহার জীবনের সহিত কখন যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানে না।

সিগারেট দেশলাই দিয়া অমিয়া বলিল, এবার যাই ?

যাও।

চা শেষ করিয়া শঙ্কর সিগারেট ধরাইল এবং প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করিল। পল্লী-উন্নয়নের আবর্তে পড়িয়াও তাহার অন্তরবাসী কবি বিপর্যস্ত হয় নাই, সে সদা জাগ্রত, সদা উৎকর্ণ, কেবল দেখিতেছে, শুনিতেছে এবং মনে সুর লাগিলেই গান গাহিয়া উঠিতেছে। কোন অজুহাতেই তাহাকে থামানো যায় না। শঙ্কর তন্ময় হইয়া লিখিতে লাগিল, যদিও তাহার এখন স্যানিটেশন-বিভাগ পরিদর্শন করিতে যাওয়া উচিত ছিল।

১৩

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মেঠো পথ বাহিয়া শঙ্কর একা ফিরিতেছিল। গ্রামের বাহিরে কৃষকদের চাষের নিমিত্ত গত বৎসর যে ইঁদারাটি প্রস্তুত করানো হইয়াছিল, সেটি ধসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই পরিদর্শন করিতে শঙ্কর গিয়াছিল। পরিদর্শন করিয়া চিত্ত আনন্দিত হয় নাই, অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা আনন্দজনক নহে। জীবন চক্রবর্তী পুরা টাকা লইয়া কাজে ফাঁকি দিয়াছে। সে-ই এ অঞ্চলের সমস্ত ইঁদারার কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিল। যে পরিমাণ চুন সুরকি প্রভৃতি দিলে পাকা ইঁদারা সত্যই পাকা হয়, সে পরিমাণ চুন সুরকি দেওয়া হয় নাই, ইহাই সকলে বলিল। এ অঞ্চলের সব ইঁদারাই ভাঙিয়া পড়িতেছে। জীবন গ্রামেরই ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী, তাহার ন্যায্য মজুরি তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তবু সে অন্যায়ভাবে চুরি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। উৎপল বলিয়াছিল, কোন সাহেব কোম্পানিকে কণ্ট্রাক্ট দিতে, কিন্তু শঙ্করের কোন কথার উপর সে কথা কহিবে না প্রতিশ্রুত ছিল, তাই শঙ্কর যখন তাহাতে সায় দিল না, সে চুপ করিয়া গেল। শঙ্কর ভাবিয়াছিল, কি হইবে বিদেশী লোক ডাকিয়া, এই সামান্য কাজ কি আর দেশের লোকেরা করিতে পারিবে না ? বিশেষত কেনারাম

চক্রবর্তীর পুত্র জীবন যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সোৎসাহে ইঁদারাগুলির ভার লইল, তখন শঙ্করের আর কোন সংশয় রহিল না। এখনও কোন সংশয় নাই, কেবল তাহার মনের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। নিতান্ত আপনজন যদি নিঃসংশয়ে চোর প্রতিপন্ন হয়, তখন যেমন জ্বালা করে, তেমনই জ্বালা করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এমন কেন হয়? কোন সাহেবের আপিসে চাকরি করিতে পাইলে এই জীবন উপরওয়ালার চাবুকের ভয়ে অতিশয় দক্ষতার সহিত কাজ করিত, চুরি করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু চাবুকভয়শূন্য জীবন কিছুতেই স্বাধীনভাবে স্বকর্তব্য সুষ্ঠুভাবে করিবে না। তাহার শিক্ষা দীক্ষা ভদ্রতা কোন কিছুরই উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার উপায় নাই, করিলেই ঠকিতে হইবে। চাবুক না মারিলে কাজ করিবে না, দেশের কাজের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তো করিবেই না, মজুরি পাইলেও করিবে না। অথচ বাহিরে কি অপরূপ ছদ্মবেশ! বি. এ. পাস করিয়াছে, দেশের সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে, বর্তমান যুদ্ধের প্রগতি ও পরিণাম বিষয়ে বিজ্ঞের মতন বচন বিস্তার করে, লেনিন-স্টালিন-গান্ধী সকলের চরিত্র নখদর্পণে, দেশের বেকার-সমস্যা লইয়া ক্ষোভের অন্ত নাই, অথচ নিজে চোর। এই ছোকরাই সেদিন সামান্য লাউ-চুরির অপরাধে নিজেদের চাকরটাকে পুলিসে দিয়াছে। হঠাৎ শঙ্করের নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়া মনে হইল। দেশের শিক্ষিত যুবকরাই তো দেশের আশা-ভরসা, তাহাদের উপর যদি আস্থা স্থাপন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে উপায় কি! শঙ্কর বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাপারটাকে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কেন এমন হয়? ইহারা শিক্ষিত, ইহাদের সমস্ত শিক্ষা এমনভাবে নিষ্ফল হইয়া গেল কেন? যে শিক্ষার চাকচিক্য ইহাদের রসনার তুণ্ডাগ্রে ক্ষণে ক্ষণে ঝলমল করিয়া উঠে, তাহার সামান্যতম দীপ্তিও ইহাদের চরিত্রে প্রতিভাত হয় না কেন? গলদটা কোথায়?

বাবু!

মৃদু নারীকণ্ঠের ডাক শুনিয়া শঙ্কর সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল।

• কে?

ফুলশরিয়া।

নামটা শুনিয়া শঙ্কর মনে মনে বিব্রত হইয়া পড়িল।

এই অস্পৃশ্য মেয়েটার সহিত নিপুদার নাম যুক্ত করিয়া যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা শঙ্করের অবিদিত ছিল না। এ বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে নিপুদাকে কিছু বলিতেও পারে নাই। উচিত হইলেও ইহা লইয়া নীতিগর্ভ বক্তৃতা দিবার অধিকার আর যাহারই থাক্, তাহার যে নাই, ইহা সে সসঙ্কোচে অনুভব করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের হিতার্থে এ বিষয়ে নীরব থাকা উচিত নয় তাহা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু কি করিয়া যে কথাটা পাড়িবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এখন সহসা নির্জন গ্রামপ্রান্তে সেই মেয়েটার সহিতই মুখামুখি হওয়াতে সে ভয় পাইয়া গেল। নিপুদার নামে নালিশ করিতে আসিয়াছে নাকি! তাহা হইলে তো অতিশয় অস্বস্তিকর 'পরিস্থিতি'।

কি চাই?

ফুলশরিয়া কিছু বলিল না, নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্করের মনে হইল, কাঁদিতেছে।

কি চাই?—শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল।

ফুলশরিয়া মৃদুকণ্ঠে যাহা বলিল, তাহাতে শঙ্কর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নিপুদার সম্বন্ধে কিছু নয়, স্বামীর অসুখের কথা বলিতে আসিয়াছে। তাহার স্বামী নাকি বহুদিন হইতে অসুস্থ, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তিন মাস ধরিয়া 'দাবাই পানি' করিয়াছেন, কিছুই হয় নাই। সেদিন নটুটুবাবু আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে চরণবাবুকেও একবার ডাকিয়া দেখানো উচিত, কারণ একা তিনি এ রোগ সামলাইতে পারিবেন না। নটুটুবাবু গরিবের 'মাই বাপ', তাঁহাকে বিনা ফীসে ডাকা যায়, কিন্তু চরণবাবুকে ডাকিতে তাহাদের সঙ্কোচ হইতেছে। এ গ্রামে আসিলে সাধারণত তিনি আট টাকা ফীস নেন, কিন্তু আট টাকা দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত, বাবু যদি একটা চিঠি লিখিয়া দেন, তাহা হইলে হয়তো তিনি কমে আসিতে রাজী হইতে পারেন। রূপার চুড়ি বন্ধক দিয়া সে গোটা চারেক টাকা কোনক্রমে যোগাড় করিয়াছে।

সহসা ফুলশরিয়া বসিয়া পড়িল এবং শঙ্করের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল,

দয়া করো বাবু।

হয়েছে কি তোর স্বামীর ?

ঘা।

ঘা ?

ফুলশরিয়া যে নিপুদার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া তাহাকে বিপন্ন করে নাই, ইহাতেই শঙ্কর মেয়েটার প্রতি মনে মনে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল।

চল্, দেখে আসি কি হয়েছে !

ফুলশরিয়ার সঙ্গে যাইতে যাইতে একটা কথা সহসা শঙ্করের মনে পড়িল। ফুলশরিয়ার আবার স্বামী কি ? সে তো পতিতা। পতিতারও একটা লোক-দেখানো স্বামী থাকা অসম্ভব নয়—মনকে এই বলিয়া সে প্রবোধ দিল। কিছুক্ষণ হাঁটিয়া একটি মাটির ছোট কুঁড়েঘরে উপস্থিত হইয়া সে যাহা দেখিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। ঘরের কোণে খাটিয়ায় হরিয়া শুইয়া আছে। হরিয়া জাতিতে কুর্মী, সামাজিকভাবে সে ফুলশরিয়ার স্বামী হইতে পারে

হরিয়া এককালে তাহাদের ভৃত্য ছিল। শুধু তাহাদের নয়, অনেকের বাড়িতেই সে চাকরি করিয়াছে, কিন্তু কোথাও টিকিয়া থাকে নাই। কোথাও টিকিয়া থাকা তাহার স্বভাব নয়। কিছুদিন আসামে পলাইয়া গিয়া চা-বাগানে কুলিগিরি করিয়াছিল, একটা পাটের কলেও নাকি কিছুদিন মজুর খাটিয়াছে। এই পর্যন্ত ইতিহাস শঙ্কর জানিত, তাহার পর কিছুদিন তাহার কোন পাত্তাই ছিল না। কবে সে ফিরিয়াছে এবং কিরূপে সে ফুলশরিয়ার স্বামী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা শঙ্কর জানিতে পারে নাই। হঠাৎ এতদিন পরে তাহাকে ফুলশরিয়ার ঘরে রোগশয্যায় শয়ান দেখিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। সর্বাঙ্গে বড় বড় ঘা, নাকটা বসিয়া গিয়াছে, বীভৎস চেহারা ! দেখিয়া মনে হয়, কুষ্ঠ হইয়াছে।

হরিয়া উত্থানশক্তি-রহিত। শুইয়া শুইয়াই হাত তুলিয়া প্রাক্তন মনিব শঙ্করকে সেলাম করিল। সে-ই ফুলশরিয়াকে শঙ্করের কাছে পাঠাইয়াছিল।

তোর স্বামী ?

ফুলশরিয়া নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর ইতিপূর্বে মেয়েটাকে ভাল করিয়া দেখে নাই।

কেরোসিনের স্বল্পালোকে আজ প্রথম ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। রূপসী নয়, রঙ কালো। বয়সও খুব কম নয়, ত্রিশের উপর হইবে। স্বাস্থ্য কিন্তু নিটোল এবং অটুট। চোখের দৃষ্টিতে, পুষ্ট অধরে, গর্বিত গ্রীবাভঙ্গিমা আকর্ষণী শক্তি আছে।

শঙ্কর পুনরায় হরিয়াকে প্রশ্ন করিল, তুই একে বিয়ে করেছিস নাকি ?

ফুলশরিয়া ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

খোনা স্বরে হিন্দীভাষায় হরিয়া বলিল, না বাবু, ওকে আমি 'সাধি' কর নাই। কিন্তু ও-ই আমার সব। আমার স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভাইরা আমাকে দেখে না, আত্মীয়-স্বজন সকলেই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। ও-ই কেবল আমাকে ছাড়ে নাই। আমি পাজি, বদমাশ, লুচ্চা—ও সব জানে, তবু আমাকে ছাড়ে না। আমি রোজ উহাকে কত বলি, তুই কেন এ মুর্দার কাছে পড়িয়া আছিস, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি মরিয়া পচিয়া শেষ হইয়া যাই, তুইও আমার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করিস কেন ? রাস্তায় ফেলিয়া দিতে না পারিস, হাসপাতালে দিয়া আয়। ও কিন্তু কিছুতে আমার কথা শোনে না বাবু, নিজের জেবর শাড়ি বেচিয়া ডাক্তার ডাকিতেছে রোজ নিজের হাতে আমার এই পচা ঘা সাফ করে—

হরিয়ার চোখের কোণ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ফুলশরিয়া হঠাৎ ধমকাইয়া উঠিল, চুপ চুপ, ঢের ভেলো—

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল এবং দেখিতেছিল। দেখিতেছিল বিছানার চাদর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ব্যাণ্ডেজের ন্যাকড়াগুলি ধপধপ করিতেছে এই কুঁড়েঘরেও হরিয়া রাজার হালে রহিয়াছে।

হরিয়া আবার শুরু করিতেছিল, বাবু—

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমি যতদূর পারি ব্যবস্থা করব। চরণবাবুকে খবর দেব কালই। এখন চললাম। ভাল হয়ে যাবি, ভয় কি ?

হরিয়া দুর্বল কম্পিত হস্ত তুলিয়া পুনরায় সেলাম করিল।

শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে ফুলশরিয়াও বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, একে হাসপাতালে দিতে এত আপত্তি কেন?

ওহাঁ অচ্ছা দবাই নেই দেইছে।

শঙ্করের কৌতূহল হইল। সর্বাঙ্গে-ঘা অসমর্থ দরিদ্র হরিয়াকে এমন ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার নিগূঢ় মনস্তত্ত্বটা কি? প্রেম? তাহার মন পরীক্ষা করিবার জন্য শঙ্কর বলিল, ও যখন তোর স্বামী নয়, তখন শুধু শুধু ওর জন্যে খরচ ক'রে মরছিস কেন? হাসপাতালেই দে।

ফুলশরিয়া মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। তাহার পর নিজস্ব হিন্দীতে বলিল, ও যদি সুস্থ হইত, উহাকে অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারিতাম। এখন কিন্তু পারি না। আমিই উহাকে ওই রোগ দিয়াছি। রোগের জন্যই ওর এই দশা, আমি সময়মত 'জক্‌সন্‌' লইয়া ভাল হইয়া গিয়াছি, ও প্রথমে রোগটাকে গ্রাহ্যই করে নাই, নানারকম দেশী জড়িবুটি করিয়াছিল, এখন একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। এই রোগের জন্যই ওর আত্মীয়-স্বজন উহাকে ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু আমি কি করিয়া ত্যাগ করি? আমার জন্যই যে ওর রোগ।

তাহার পর আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল, উপরে মালিক আছেন, তিনি সব দেখিতেছেন, আমি বেইমানি করিতে পারিব না, আমি জান দিয়া উহাকে ভাল করিয়া তুলিব।

আচ্ছা, কাল চরণ ডাক্তারকে খবর পাঠাব তা হ'লে।

শঙ্কর চলিয়া গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিপু আসিয়া হাজির হইল।

হরিয়া আজ কেইসা হ্যায়?

আচ্ছা।

ফুলশরিয়ার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে আড়চোখে

একবার চাহিয়া নিপু বলিল, উস্‌কা দবাইকা বাস্তে দাইকা মারফৎ রুপিয়া ভেজা থা, মিলা ?

কোন উত্তর না দিয়া ফুলশরিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং দুইখানি দশ টাকার নোট আনিয়া নিপুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, যাইয়ে।

ইস্‌কা মানে ?

ঝপাৎ করিয়া ঝাঁপটা ফেলিয়া দিয়া ফুলশরিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

নিপু বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নীচের পড়িবার ঘরে একটি সুদৃশ্য আলো জ্বালিয়া উৎপল তন্ময় হইয়া ইংরেজী ভাষায় লিখিত চীন দেশের রূপকথা পড়িতেছিল।

শঙ্কর হনহন করিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

শিক্ষা মানে কি বলতে পার ? আসল শিক্ষা কাকে বল তুমি ? এ কি করছি আমরা ?

তার মানে ?

বিস্মিত উৎপল সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

আনুপূর্বিক সমস্ত বর্ণনা করিয়া শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল, এখন বল, কে শিক্ষিত ? জীবন চক্রবর্তী, নিপুদা, না, ফুলশরিয়া ?

উৎপলের চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু কোন জবাব দিল না, কেবল গম্ভীরভাবে বাম-গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল। কিছুদিন হইতে সে গোঁফ রাখিতে শুরু করিয়াছে।

উত্তর দিচ্ছ না যে ?

মনের মত উত্তর যদি শুনতে চাও, ওপরে চল, কুন্তলা দেবী এসেছেন।

এমন সময় তিনি হঠাৎ ?

হরিহরদা এই পাড়ায় এসেছেন কোন একটা কাজে, তাঁরই সঙ্গে এসেছেন।

আমার সঙ্গে আলাপ নেই যে !

তার জন্যে আটকাবে না, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, চল। চীনে-পরীদের

গল্প গিলে গিলে মুখটাও মেরে গেছে আমার সন্ধ্যে থেকে। মুখটা একটু বদলানো যাক, চল। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তিনি বেশ ঝাঁজালো গোছের একটা উত্তর দেবেন।

তোমার উত্তরটা কি শুনি?

আমি উত্তর দিতে পারব না। তবে যদি আপত্তি না থাকে, পরামর্শ দিতে পারি।

কি পরামর্শ?

একজন এক্‌স্‌পার্ট ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ভাঙা ইঁদারাগুলো পরীক্ষা করাও, তিনি যদি বলেন যে, জীবন সত্যিই জোচ্চুরি করেছে, তা হ'লে তার নামে কেস ঠুকে দাও। আর তোমার ওই নিপুদা, যদি সত্যিই অপরিহার্য রকম কাজের লোক হন, তা হ'লে তাঁকে অপদস্থ করা ঠিক হবে না। তাঁকে বরং কিছু টাকা আর ছুটি দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও, একটু ঝরঝরে হয়ে ফিরে আসুন ভদ্রলোক। হাসছ যে? এ রকম ক'রে পারে নাকি মানুষ!

হাসছি বটে, কিন্তু আমি কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ছি।

হতাশ হবার কি আছে? পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,—ধাবিত হওয়াই আমাদের কাজ, থামলে চলবে না। চল, ওপরে চল।

কুন্তলা দেবীর সহিত সহজেই আলাপ হইয়া গেল।

উৎপল পরিচয় করাইয়া দিতেই শঙ্কর বলিল, অনেক দিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে। কিন্তু সুযোগ হয় নি এতদিন।

কুন্তলা বসিয়া পান সাজিতেছিল, এই কথায় হাসিমুখে শঙ্করের দিকে একবার চোখ তুলিয়া পানই সাজিতে লাগিল, কোন কথা কহিল না। উৎপল পরিচয় করাইয়া দিয়া গম্ভীরভাবে কোণের ক্যাম্প-চেয়ারটায় গিয়া বসিল এবং একটি সিগারেট ধরাইল। কি ভাবে আলাপ চালানো যায়, শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রতই বোধ করিতেছিল, এমন সময় সুরমা পাশের ঘর হইতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আপনি এসে গেছেন দেখছি ঠিক সময়ে, এক্ষুনি আপনার বিষয়েই কথা হচ্ছিল কুন্তলার সঙ্গে। ও আপনার "কুসংস্কার" লেখাটি প'ড়ে চটেছে।

কুন্তলা আর একবার হাসিভরা দৃষ্টি তুলিয়া শঙ্করের দিকে চাহিল, তাহার পর সুরমাকে বলিল, প্রথম পরিচয়ের মুখেই একটা ঝগড়ার সূত্রপাত করিয়ে দিয়ে ভাল করলে না তুমি। উনি লেখক মানুষ, লেখার নিন্দে করলে ওঁর সমস্ত মন সজারুর মত কণ্টকিত হয়ে উঠবে।

শঙ্করবাবু সে রকম পরমুখাপেক্ষী লেখক নন। তুমি সত্যিই যখন চটেছ, তখন বলতে বাধা কি ?

চটি নি। শঙ্করবাবুর মত প্রতিভাবান লেখককেও গড্ডলিকাপ্রবাহে ভাসতে দেখে দুঃখ হচ্ছিল। কুসংস্কার সম্বন্ধে ওসব কথা ক্রিশ্চান আর ব্রাহ্ম মিশনরিদের মুখে অনেকবার শুনেছি আমরা। ওঁর কাছ থেকে নতুন কথা শুনব আশা করেছিলাম।

উৎপলের চক্ষু দুইটি আরও কৌতুকদীপ্ত হইয়া উঠিল। সিগারেটে সন্তর্পণে টান দিতে দিতে সে পা দোলাইতে লাগিল।

হঠাৎ এমন কথা কুন্তলার মুখে শুনিবে, শঙ্কর আশা করে নাই। "কুসংস্কার" প্রবন্ধটা সে অনেক দিন পূর্বে লিখিয়াছিল, যদিও সেটা সম্প্রতি 'সংস্কারক' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। 'কুসংস্কার' সম্বন্ধে তাহার নিজের মত বদলাইয়াছে। ছুট পরবের পর যে প্রবন্ধটি সে লিখিয়াছে, তাহাতে তাহার পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচয় আছে। কিন্তু এই নতমুখী বধূটির মুখে এ কথা শুনিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই এ বিষয়ে মেয়েটি কতদূর চিন্তা করিয়াছে, তাহা জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না ; ঠিক করিল, তর্ক করিবে।

সুরমা বলিল, কিন্তু ওঁর ভাষা আর উপমাগুলো যে চমৎকার, সেটা তোমাকে মানতেই হবে।

মানছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলছি যে, ভাষা আর উপমা চমৎকার ব'লেই ও প্রবন্ধ আরও ভয়ঙ্কর। যে পড়বে, সে-ই মুগ্ধ চিত্তে ওর প্রতি কথাটি বিশ্বাস করবে।

করলেই বা ক্ষতি কি ?

গম্ভীরভাবে শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

আপনারা তা হ'লে তর্ক করুন, আমি টঁ্যাপারির জেলিটা চড়িয়ে এসেছি, দেখি, যদি কুন্তলা থাকতে থাকতেই নামাতে পারি। সঙ্গেই দিয়ে দেব তা হ'লে। শঙ্করবাবু নেবেন নাকি একটু ?

না। টঁ্যাপারির গন্ধ পছন্দ নয় আমার।

অমিয়া কিন্তু ভালবাসে, তাকেই পাঠিয়ে দেব।

সুরমা চলিয়া গেল! কুন্তলা নীরবে পানগুলি লবঙ্গ দিয়া মুড়িতে লাগিল। শঙ্করই পুনরায় কথা কহিল, আমার প্রবন্ধে আপত্তি আপনার কোন্‌খানটায় ?

সবটাতেই। আপনি যা বলেছেন তা সত্যি নয়, কুসংস্কার আমাদের পঙ্গু করে নি। আপনি মুখস্থ বুলি আউড়েছেন মাত্র।

আমি যেসব কুসংস্কারের উল্লেখ করেছি, আপনি সেগুলো সমর্থন করেন, এই কি আমাকে বুঝতে হবে ?

এতক্ষণ কুন্তলা ধীরকণ্ঠে কথা কহিতেছিল, শঙ্করের এই কথায় যেন আহত ফণিনীর মত তর্জন করিয়া উঠিল।

দেখুন, আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত বর্বর, বিদেশী অনাত্মীয়দের মুখে এসব কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এখন তলিয়ে বোঝবার সময় এসেছে যে, কথাগুলো সত্যি কি না!

আপনার মতে তা হ'লে ওগুলো কুসংস্কার নয় ?

কোন্‌টা কু, কোন্‌টা সু, তা জানি না। এইটুকু শুধু জানি যে, যাদের আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব'লে ঘৃণা করতে শিখেছি, মানুষ হিসেবে তারা আজকালকার সংস্কারমুক্ত স্বার্থপর নাস্তিকগুলোর চেয়ে ঢের বড়। ওরাই দেশের মেরুদণ্ড।

শঙ্করের ফুলশরিয়ার কথা মনে পড়িল। বলিল, তা বলতে পারেন। কিন্তু আমি যদি বলি, কুসংস্কারবর্জিত হ'লে ওরা আরও বড় হবে!

যা নমুনা দেখা যাচ্ছে, তার থেকে তা তো মনে হয় না। পাশ্চাত্য

শিক্ষার কল্যাণে আমরা অনেকেই অনেক রকম কুসংস্কার ত্যাগ করতে শিখেছি, কিন্তু সত্যিই বড় হয়েছি কি ?

হই নি স্বীকার করছি। কিন্তু তার অন্য কারণও থাকতে পারে। কতকগুলো যুক্তিহীন কুসংস্কার আঁকড়ে থাকলেই কি আমাদের মহত্ত্ব বাড়বে ?

হ্যাঁ, বাড়বে। সমাজ-জীবনের একটা স্তরে ওর প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। এ যুদ্ধের বাজারে প্রশ্নটা বেখাপ্পা শোনাবে না, মিলিটারি ট্রেনিং আপনি ভাল মনে করেন, না, খারাপ মনে করেন ?

নিশ্চয়ই ভাল মনে করি।

কেন ? কতকগুলো লোক ক্যাপ্টেনের হুকুম পাওয়ামাত্র কোন একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে দমাদ্দম গুলি ছুড়ছে, 'মার্চ' কথাটা উচ্চারিত হতে না হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, কখনও এগুচ্ছে কখনও পেছুচ্ছে, একটা বিশেষ ধরনের পোশাক প'রে বিশেষ রকম কায়দায় হাত পা ছুঁড়ে ড্রিল করছে, এগুলো কুসংস্কার নয় ? যাকে নিরীহ ব'লে জানে, তাকে নির্বিচারে হত্যা করার মধ্যে কি যুক্তি আছে ? প্রত্যেক সৈনিক যদি ওপরওলার প্রত্যেক আদেশটি নিজের যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায়, তা হ'লে কি রকম হয় সেটা ?

মিলিটারি ট্রেনিং মিলিটারি ডিসিপ্লিন শেখায়, ওতে চরিত্র দৃঢ় হয়, এইটেই ওর সপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি।

ওপরওলা অফিসারকে দেখামাত্র খটাং ক'রে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে স্যালিউট করা তা হ'লে আপনি কুসংস্কার মনে করেন না ? আপনার যত আপত্তি দিশী কুসংস্কারের বেলায় ? আমি যদি বলি, ওগুলোর উদ্দেশ্যও চরিত্র দৃঢ় করা ? একাদশীর দিন উপবাস করা, একটা বিশেষ বারে বেগুন না খাওয়া, পূজো-পার্বণে নিষ্ঠা-নিয়ম অনুসারে চলা, এসবের প্রত্যেকটির মধ্যেই এমন একটি সংযত আত্মসম্বরণের ভাব আছে, যা মেনে চলতে পারলে চরিত্র সত্যিই উন্নত হয় ?

তাই যদি হয়, তা হ'লে সেটা স্পষ্ট ক'রে বলা নেই কেন ?

মিলিটারি স্ট্র্যাটিজিও সব সময়ে স্পষ্ট ক'রে বলা হয় না। মিলিটারি আইন হচ্ছে—You are not to reason why—

কিন্তু কুসংস্কারের সঙ্গে যে কতকগুলো জিনিস স্পষ্টভাবেই জড়ানো আছে দেখা যাচ্ছে, যথা—ভগবান, পরলোক, পাপপুণ্য—

না জড়ালে লোকে মানত না, কোর্ট মার্শালের ভয় না থাকলে সাধারণ সৈনিক যেমন মিলিটারি আইন মানে না। ওগুলো আমাদের অদৃশ্য কোর্ট মার্শাল। সাধারণ মানুষকে সৎপথে রাখবার আর কোন উপায় নেই।

আমি কুসংস্কার না মেনেও সৎপথে থাকতে পারি।

আপনি অসাধারণ মানুষ। আমি সাধারণ লোকের কথা বলছি। সাধারণ লোক যদি অসাধারণত্বের ভাণ করে তা হ'লে যা কাণ্ড হয়, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন আজকাল। অঙ্কশাস্ত্রে যার কিছুমাত্র অধিকার নেই, সেই অর্বাচীনটা নামতা মুখস্থ করা জ্যামিতি পড়াকে কুসংস্কার ব'লে উড়িয়ে দিয়ে উচ্চস্তরের গণিতশাস্ত্রের বুলি কপচাচ্ছে সস্তা ছাপাখানার দৌলতে, আর আপনারা তাই দেখে বাহবা করছেন।

আমি অন্তত করছি না। আমাদের কুসংস্কারগুলো যুক্তিসহ কি না, তাই ওই প্রবন্ধটায় বিচার করবার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র। ওটা আমার অনেকদিন আগের লেখা। এখন আমারও মত অনেকটা বদলেছে, কিন্তু তবু আমি নির্বিচারে অন্ধ কুসংস্কার মানবার পক্ষপাতী হই নি এখনও।

ভাল ক'রে ভেবে দেখলে হবেন।

দেখি।

সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিতেই উৎপল বলিয়া উঠিল, শঙ্কর হেরে গেছে তোমার বন্ধুর কাছে, প্রায় স্বীকার ক'রে ফেলেছে যে, কুসংস্কারগুলোর একটা সার্থকতা আছে।

কুন্তলা হাসিল। সুরমা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আমি কিন্তু তোমার মতে মত দিয়ে পাঁজি দেখে চলতে পারব না। আমার যেদিন খুশি আমি অলাবু ভক্ষণ করব।

তা ক'রো। জেলি কতদূর?

ঠাণ্ডা করতে দিয়েছি।

উৎপল বলিল, শঙ্করের পরাজয় উপলক্ষ্যে একটু চা খেলে কেমন হয়?

এত রাত্রে আবার চা কেন?—সুরমা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল।

উৎপল ক্যাম্প-চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

কই, চল এবার, রাত হয়ে গেল।

কুন্তলার স্বামী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন।

মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া কুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সভা ভঙ্গ হইল।

১৪

পাড়ায় 'রাম-লীলা' হইতেছে। খুকীকে লইয়া অমিয়া শুনিতে গিয়াছে। শঙ্কর নিজে যদিও এই 'রাম-লীলা'র একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু শরীর তেমন ভাল নাই বলিয়া যায় নাই, বারান্দায় আরাম-কেদারায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। তাহার অভাবে 'রাম-লীলা' উৎসবের এতটুকু অঙ্গহানি যে হইবে না, তাহা সে জানে। ক্রমশই এই কথাটা সে উপলব্ধি করিতেছে যে, যাহাদের আমরা 'মাস' অর্থাৎ জনসাধারণ বলি, তাহাদের সহিত অন্তরের যোগ রক্ষা করা কত কঠিন! আমাদের অন্তরে উহাদের স্থান নাই, উহাদের অন্তরেও আমাদের স্থান নাই। আমরা উহাদের অনুগ্রহ করি, উহারা আমাদের সেলাম করে। সম্পর্ক শুধু এইটুকু। উহাদের উৎসব আমাদের অনুপস্থিতিতে অঙ্গহীন হয় না, আমাদের উৎসব উহাদের যোগদানের অপেক্ষা রাখে না। আমরা ভিন্ন জাতের লোক, আমরা পর। আমরা যে উহাদের হিতার্থে এত করি, তাহা কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, আন্তরিক আবেগবশত নহে।

সহসা কুন্তলার কথা শঙ্করের মনে পড়িল। সেদিন যদিও তাহার সহিত মতের কিছুমাত্র অমিল হয় নাই, তবু কেমন যেন খটকা লাগিয়াছিল। কেমন অদ্ভুত যেন মেয়েটি! ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়া উলটা কথা বলিবার ঝোঁকটা যেন বড় বেশি রকম উগ্র। কথাবার্তা যেন

তীক্ষ্ণ তীরের মত। তীরন্দাজের লক্ষ্যভেদ-শক্তি দেখিয়া চিত্ত কিন্তু আনন্দিত হয় না, তীরের ফলাটা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া মর্মস্থল বিদ্ধ করে। উহার যুক্তি মানিলেও উহার কথাবার্তার ধরন, উহার দলিতা-ফণিনী মূর্তি দেখিয়া উহাকে আপন লোক বলিয়া মানিতে মন ইতস্তত করে। কুন্তলার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গোল আছে, ইংরেজী ভাষায় যাহাকে 'কম্‌প্লেক্স' বলে। বেলা মল্লিকের কথাও মনে পড়িল। মেয়েটা পুরুষ-বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিলাতে কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে কে জানে! নারীবেশে সমাজে থাকিতে পারিল না? কেন পারিল না? পাছে পুরুষের সংস্পর্শে আত্মসম্মান আহত হয়? পুরুষের বাহুপাশে কিছুতেই ধরা দিব না, এ অসম্ভব প্রতিজ্ঞার দুর্গে অস্বাভাবিক একটা আত্মসম্মানকে বাঁচাইয়া রাখার অর্থ কি? কোন একজন পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেই তো হইত! এত অহঙ্কার কিসের? মনোমত পুরুষ জুটিল না! মনোমত আহার না জুটিলে কি অনাহারে থাক, মনোমত শয্যা না জুটিলে কি অনিদ্রায় কাটাও, বিবাহের বেলাতেই বা এত বিচার কেন? শঙ্করের মনে হইল, আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে সকলেই একটা অস্বাভাবিক আদর্শের পিছনে ছুটিতেছে। কুন্তলা পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিরোধী। কিন্তু তাহার বিরোধিতাটাই কেমন যেন প্রতিক্রিয়াক্লিষ্ট হিংস্র মূর্তি ধরিয়াছে। ইহার অন্তরালে ক্ষোভের একটা গ্লানি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যেন। একজন মাতালের কথা মনে পড়িল। সে হুইস্কি পান করিয়া যতক্ষণ নেশা থাকিত, ততক্ষণ কুৎসিত ভাষায় হুইস্কিকেই গালাগালি দিত। উদরস্থ বিলাতী সুরাকে সম্বোধন করিয়া বলিত, ওরে শালা হুইস্কি, তুই কি ভেবেছিস, তুই মস্ত বড় একটা কিছু? তুই তো ছেলেমানুষ রে ব্যাটা! সোমরসের নাম শুনেছিস? মাধ্বী, গৌড়ী পৈষ্টীর কথা জানিস? এদের কাছে তুই তো একটা অপোগণ্ড নাবালক রে! কুন্তলারও বোধ হয় সেই দশা। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সে সর্বান্তঃকরণে সেই শিক্ষারই বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই জাতীয়তা-বোধ আমরা কোথা হইতে পাইলাম? সহসা শঙ্করের মনে হইল, এই জাতীয়তা-বোধ জিনিসটা যে ভাবে আমরা চর্চা করিতে শিখিয়াছি, তাহা সত্যই কি ভাল? এই

জিনিসটাকে কেন্দ্র করিয়াই তো আধুনিক মানবের নীচতা হীনতা হিংস্রতা সহস্র বীভৎস রূপে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। একটা বড় নামের আড়ালে ইহা কি স্বার্থপরতারই জঘন্যতম রূপ নয়? ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তাহার ব্রাহ্মণত্বে। সে ব্রাহ্মণত্ব এখন অবলুপ্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারই আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই কি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? বর্বরসুলভ এই হানাহানির আদর্শে ভারতীয় প্রতিভা কি স্বচ্ছন্দে স্ফূর্তি পাইবে? ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কি, শঙ্কর চিন্তা করিতে লাগিল। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—ইহাই কি ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের শেষ কথা? কিছুই কিছু নয়, সবই মায়া, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত এই সংসার ত্যাগ কর, এষণা-মুক্ত হও—ইহাই যদি ভারতীয় ঋষির নির্দেশ হয়, জাতীয় পতাকা আস্ফালন করিয়া তাহা হইলে এসব পণ্ডশ্রম কেন? পল্লী-সংস্কারেরই বা প্রয়োজন কি? যাহা মন্দ তাহা কালক্রমে আপনিই ভাল হইবে, সত্য-শিব-সুন্দর যথাস্থানে যথাসময়ে নিজেকে প্রস্ফুটিত করিবেন, অলীক অবিদ্যা মিথ্যা মরীচিকাবৎ আপনি বিলুপ্ত হইবে। আমি ছটফট করিয়া মরিতেছি কেন? আমি কে? কি ক্ষমতা আছে আমার? পরক্ষণেই শঙ্করের মনে হইল, সংসারটা যে মায়া-মরীচিকা ইহা আমাদের জীবনের মূল-মন্ত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মন্ত্রে বিহ্বল হইয়া হিন্দু-সভ্যতা জড়ত্বকে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই। সত্য সত্যই যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা সংসারের নশ্বরত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই তপস্বী মহাপুরুষ হিন্দুসমাজের শিরোমণি, কিন্তু সকলেই শিরোমণি হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, সকলের সে অধিকারও নাই। সমাজের অধিকাংশ লোকই সাধারণ লোক। তাহারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও ব্রাহ্মণেরাই করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণ-সমন্বিত হিন্দুসমাজে গুণানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য সুনির্দিষ্ট আছে। দ্রোণাচার্য ও পরশুরামের কথাও শঙ্করের মনে পড়িল। উঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপস্যাও করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনের সময় অস্ত্রচালনা করিয়া শত্রু হনন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। শঙ্কর যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভারতীয় আদর্শ

তাহা হইলে নিছক মায়াসর্বস্ব নির্বেদ নয়! উহাতে বলিষ্ঠ পুরুষকারেরও স্থান আছে। উহাতে স্থান নাই কেবল মূঢ় আসক্তির, যে আসক্তি মানুষের হিতাহিত-জ্ঞান অবলুপ্ত করে। সংসারকে মায়াময় জানিয়াও নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত চিত্তে সমাজের হিতার্থে প্রত্যেককে স্বকর্তব্য করিতে হইবে, ইহাই আমাদের জাতীয়তা। বর্তমান যুগের স্বার্থপঙ্কিল পরস্বলোলুপ ন্যাশনালিজ্‌ম আমাদের ন্যাশনালিজ্‌ম নহে। আমাদের সঙ্কীর্ণতা নাই, কারণ আমরা জানি, সংসার মায়াময়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রত্যেকেই জানে, সংসার মায়াময়; অথচ প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, স্বকর্তব্য সাধন না করিলে এই মায়াপাশ ছিন্ন করা যাইবে না। নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, গত্যন্তর নাই। ইহাই আমাদের সনাতন আদর্শ, ইহাই আমাদের কর্তব্য; অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ও বিশ্বাস করিবে, সংসার অনিত্য, তবু সে যুদ্ধ করিবে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মান রক্ষার জন্য, আদর্শ ও কর্তব্যের জন্য, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নহে।

স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতামুক্ত নিরাসক্তচিত্ত নিষ্কাম কর্তব্যপরায়ণ সমাজ এ যুগে স্থাপন করা কি সম্ভব? কেন সম্ভব নয়? শিক্ষা দ্বারা সবই সম্ভব। শিক্ষাই গোড়ার কথা। সমস্ত দেশের চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা,—রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। অন্ধকারে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল। ভারতের সনাতন আদর্শকে নূতন করিয়া প্রাণের মধ্যে পাইয়া তাহার সমস্ত সত্তা যেন চরিতার্থ হইয়া গেল। শান্ত শুভ্র উদাত্ত বিরাট একটা অনুভূতি তাহার দেহমনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, এমন সময় বাইসিক্লের ঘণ্টার শব্দে সচকিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল।

কে?

কুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর আসিল, আমি নিমাই।

ও, নিমাই, এস। এত রাত্রে হঠাৎ কি মনে ক'রে?

কোন খবর না দিয়ে মোটরে ক'রে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর এসেছেন একটু আগে।

কাল আমাদের স্কুল দেখবেন। আপনাদের অ্যালুমিনিয়মের ডেকচিটা একবার চাই।

কেন, কি হবে ?

মুরগী রাঁধতে হবে তাঁর জন্যে।

একটু ইতস্তত করিয়া নিম্নকণ্ঠে নিমাই বলিল, মদও চাইছেন। এত রাত্রে মদ কি পাওয়া যাবে ?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল। শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া প্রথমেই মুরগী ও মদের ফরমাশ করিয়াছেন! দেশের শিক্ষার আদর্শ-নিয়ন্ত্রণের ভার ইঁহার উপর। আদর্শ চুলায় যাক, লোকটার চক্ষুলজ্জাও কি নাই! টুর করিবার জন্য উচ্চহারে ভাতা পান, অথচ গরিব শিক্ষকের বাড়িতে আসিয়া চড়াও হইয়াছেন!

কোথায় উঠেছেন ?

হেডমাস্টারবাবুর বাসায়।

শঙ্করের ইচ্ছা হইল, এখনই গিয়া লোকটাকে কড়া কড়া দুই-চারি কথা শুনাইয়া দেয়। কিন্তু এ আবেগ তাহাকে সম্বরণ করিতে হইল। এই লোকটাকেই তোয়াজ করা হয় নাই বলিয়া কাঁটাপোখর স্কুলটা গভর্মেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এবারও যদি ইহাকে তোয়াজ না করা হয়, হীরাপুর স্কুলটার হয়তো সর্বনাশ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া নিমাই ঘটকের মুখ চাহিয়াই তাঁহাকে খুশি করা প্রয়োজন। সে আই.এ.ফেল অথচ হেডপণ্ডিতি করিতেছে। শঙ্করই তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে। হেডপণ্ডিতি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে, কিন্তু ব্যাপারটা আইনসঙ্গত নয়। ইন্‌স্পেক্টর রুষ্ট হইলে কলমের এক খোঁচায় তাহার চাকরি চলিয়া যাইতে পারে।

এ তো এক আচ্ছা মুশকিল দেখছি!

এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছে ছিল না। আমি প্রথমে কেনারামবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও আজ মাংস রান্না হচ্ছে হৃদয়বল্লভবাবু এসেছেন কিনা কলকাতা থেকে।

যদিও অন্ধকারে শঙ্কর নিমাই ঘটকের মুখ দেখিতে পাইতেছিল না, তবু তাহার কণ্ঠস্বরে মনে হইতেছিল, নিজের চাকরির জন্য সকলকে বিরক্ত করিতে হইতেছে বলিয়া বেচারা যেন সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছে। ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া রাত-দুপুরে মদ মাংস দাবি করিয়াছে, ইহা যেন তাহারই অপরাধ। ভারতীয় আদর্শে প্রত্যেক নরনারীর মন শিক্ষাসমৃদ্ধ করিতে পারিলে দেশের যে জাগরণ হইবে, এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে শঙ্কর তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিল। সহসা সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। আদর্শের তুঙ্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া নিমাইকে আশ্বাস দিতে হইল, তার জন্যে কি হয়েছে, তুমি যাও, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

নিমাই তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

তুমি যাও, মুশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।

নিমাই চলিয়া গেল।

মুশাই!

মুশাই পাশেই কোথাও ছিল, ছায়ামূর্তির মত আসিয়া দাঁড়াইল।

দুটো মুরগী রেঁধে হীরাপুরে এখুনি দিয়ে আসতে হবে। আর এক বোতল মদ। যোগাড় করতে পারবি?

হাঁ হুজুর।

শঙ্কর টাকা বাহির করিয়া দিল।

হীরাপুরে হেডমাস্টারবাবুর বাসায় দিয়ে আসতে হবে।

মুশাই চলিয়া গেল। শঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া ঈজি-চেয়ারে পড়িয়া রহিল।

১৫

অলক্ষ্যে আর একটা মেঘও ঘনাইতেছিল।

কেনারাম চক্রবর্তী, ভূতপূর্ব জমিদার রাজবল্লভের একমাত্র পুত্র হৃদয়বল্লভ এবং বিখ্যাত মহাজন রাজীব দত্ত কেনারাম চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া নিম্নকণ্ঠে আলাপ করিতেছিলেন।

জমিদারি বিক্রয় হইয়া যাইবার পর হৃদয়বল্লভ কলিকাতা হইতে এই প্রথম আসিয়া গ্রামে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহাও গোপনে, গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁহার আগমনবার্তা জানে না। রাত্রিবাস মাত্র করিয়া কাল পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। প্রাক্তন নায়েব বন্ধুপ্রতিম কেনারাম চক্রবর্তীর বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছেন। এতদিন কেনারাম চক্রবর্তী এবং কেনারাম চক্রবর্তীর মারফৎ রাজীব দত্তের সহিত পত্রযোগে তাঁহার যেসব নিগূঢ় মন্ত্রণা চলিতেছিল, সাক্ষাতে সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করিবার জন্যই তিনি আসিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে রাজবল্লভ মারা গিয়াছেন। কলিকাতায় নানা ঘাটের নানা জল আস্বাদন করিয়া, শেয়ার-মার্কেটে লোকসান দিয়া এবং চিকিৎসা-ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত হইয়া হৃদয়বল্লভ অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, কলিকাতায় থাকা তাঁহার পোষাইবে না। তাঁহাকে গ্রামেই পুনরায় ফিরিতে হইবে। কিন্তু যে গ্রামে এতদিন তিনি জমিদার ছিলেন, সে গ্রামে প্রজারূপে—বিশেষ করিয়া সেদিনকার ছোঁড়া উৎপল এবং শঙ্করের আধিপত্যে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। গ্রামে ফিরিতে হইলে জমিদাররূপেই ফিরিতে হইবে। কিন্তু তাহাও প্রায় অসম্ভব। কি করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহারই জল্পনা-কল্পনা পত্রযোগে এতকাল চলিতেছিল; কিন্তু এমন ঢিমা চালে চলিতেছিল যে, হৃদয়বল্লভ আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; অবিলম্বে ইহার একটা 'ফয়সালা' করিয়া ফেলিবার জন্য সশরীরে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যেই কেনারাম, রাজীব দত্ত এবং প্রমথ ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রমথ ডাক্তার এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই।

রাজীব দত্তই প্রধান ভরসা। হৃদয়বল্লভ নিজে প্রায় কপর্দকহীন। কেনারামের প্ররোচনায় রাজীব দত্ত সম্পূর্ণ জমিদারিটি মর্গেজ রাখিয়া শত-করা পাঁচ টাকা সুদে আড়াই লক্ষ টাকা কর্জ দিতে রাজী হইয়াছেন। তিনজনেই পাকা লোক, তিনজনেরই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। হৃদয়বল্লভ অপুত্রক এবং বিপত্নীক। পত্নী পুত্র উভয়েই কিছুকাল পূর্বে যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছেন।

তিনি নিজেও যক্ষ্মাগ্রস্ত, আর বেশিদিন বাঁচিবার আশা নাই। যে কয়দিন বাঁচিবেন, পরের টাকায় জমিদারিটি ক্রয় করিয়া ভোগ করিতে চান। যদি ঋণশোধ করিতে না পারেন, জমিদারি না হয় রাজীবলোচনের হস্তগত হইবে, তাহাতে তাঁহার কি আসে-যায়, উত্তরাধিকারী তো কেহ নাই। নিজের জীবনটা ভদ্রভাবে কাটিলেই যথেষ্ট।

কেনারামের উদ্দেশ্য—কমিশন। চার বৎসর পূর্বে রাজবল্লভ যখন দেনার দায়ে জমিদারিটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন রাজবল্লভ এবং উৎপল উভয়েরই হিতৈষী সাজিয়া তিনি উভয় পক্ষের নিকট হইতে একুনে প্রায় হাজার দশেক টাকা উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এসব বিষয়ে সত্যই তিনি ক্ষমতাবান পুরুষ। হিতৈষী সাজিতে অদ্বিতীয়। হিতাকাঙ্ক্ষায় কখনও কড়া কথা বলিয়া কখনও স্পষ্টভাষণ করিয়া কখনও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া কখনও সান্ত্বনা দিয়া তিনি এমন একটা অভিনয় করিতে পারেন যে, তাঁহার ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি মনোভাব সব সময়ে সকলে বুঝিতেও পারে না। বুঝিলেও রাগ করিতে পারে না, রাগ করিলেও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার উপায় থাকে না, এমন পরিচ্ছন্ন তাঁহার কার্যবিধি। কোন কিছুতেই কখনও নিজেকে এমন ভাবে জড়াইয়া ফেলেন না, যাহাতে আইনত তাঁহাকে দোষী প্রতিপন্ন করা যায়। জমিদারি পুনঃক্রয়ের বাসনাটি আভাসে ইঙ্গিতে তিনিই একদা হৃদয়বল্লভের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ভাষাটি ছিল এইরূপ—তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয় জমিদারিটা তুমি যদি আবার ফিরে পাও, ফিরে পাওয়া শক্ত অবশ্য, কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো—। এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি থামিয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে স্ফুলিঙ্গটি যখন হৃদয়বল্লভের অন্তরে শিখারূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যখন হৃদয়বল্লভ জমিদারি ফিরিয়া পাইবার জন্য কেনারামকে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন, তখন অনেকটা যেন বিপন্ন হইয়াই প্রাক্তন সম্বন্ধের খাতিরে তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু চেষ্টাটা এমন মন্দগতিতে করিতে লাগিলেন যে, হৃদয়বল্লভ অবশেষে স্পষ্ট করিয়া লেখা সমীচীন মনে করিলেন, তুমি চেষ্টা করিয়া জমিদারিটি যদি উৎপলের কবল হইতে নির্বিঘ্নে পুনরুদ্ধার করিতে পার,

তোমার ন্যায্য পারিশ্রমিক তোমাকে আমি দিব। জমিদারির মূল্য এবং তোমার পারিশ্রমিক, এই সমস্ত টাকাটাই তুমি রাজীব দত্তের নিকট হইতে কর্জ কর—। কেনারাম উত্তরে লিখিলেন, পারিশ্রমিকের জন্য কিছু আসিয়া যায় না, পরিশ্রম করিলে অবশ্য কিছু পারিশ্রমিক লইতেই হয়, তবে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। তোমার ক্ষেত্রে টাকাটাই বড় নয়। দেখি, কত দূর কি করিতে পারি।

বলা বাহুল্য, কেনারাম আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সত্য সত্যই চেষ্টা করিয়া খানিকটা সফলকামও হইয়াছিলেন। আর কিছু না হউক, রাজীবলোচন তো রাজী হইয়াছেন।

কুসীদজীবী রাজীবলোচনের উদ্দেশ্য কুসীদ। কুসীদের লোভেই তিনি এই রাত্রে অসুস্থ শরীর লইয়াও কেনারামের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন এবং ইঁহাদের আগড়ম-বাগড়ম আলোচনা শুনিতেছেন। রাজীবলোচন প্রিয়দর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো, বেঁটে, শীর্ণকায় লোক তিনি। যখন চলেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া থাকেন, যখন বসেন উবু হইয়া বসেন। তাঁহার চোয়াল সর্বদাই নড়ে, মনে হয়, সুপারি-জাতীয় কি যেন একটা চিবাইতেছেন। মুখে এক-আধ টুকরা সুপারি লবঙ্গ বা হরীতকী কখনও হয়তো বা থাকে, কিন্তু তাহার জন্য অত ঘন ঘন মুখ নাড়ার প্রয়োজন হয় না। ওটা তাঁহার মুদ্রাদোষ। মাথার সামনের দিকে সামান্য টাক, সামান্য একটু কাঁচা-পাকা গোঁফ, মুখভাবে বিশেষ কিছুই অসামান্যতা নাই। মুখের মধ্যে চক্ষু দুইটিই, ছোট ছোট হইলেও, বেশ জীবন্ত। কিন্তু প্রায় তাহা অর্ধমুদ্রিত থাকে, কচিৎ কখনও কাহারও দিকে যদি চোখ খুলিয়া তাকান, সে চোখের মর্মভেদী দৃষ্টি তাহার মনে ভীতি সঞ্চার করে। পারতপক্ষে কেহ সে দৃষ্টির সম্মুখবর্তী হইতে চায় না, এমন কি তাঁহার একমাত্র পুত্রও নয়। সুদের লোভেই তিনি কেনারামের প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন। বিশ্বাসযোগ্য ব্যাঙ্কে আজকাল সুদের হার অতিশয় কম। টাকাগুলা কেবল পচিতেছে। কেনারামটাকে কিছু উপুড়হস্ত করিলে কিছু টাকার যদি সদ্গতি হয়, মন্দ কি? টাকা অবশ্য ও-ছোকরা শোধ করিতে পারিবে না, জমিদারিটাই শেষ পর্যন্ত লইতে হইবে, তাহাই বা মন্দ কি?

আড়াই লক্ষ টাকার পরিবর্তে বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি লাভ করা এ বাজারে নিন্দনীয় নয়। আজকাল ওই আড়াই লক্ষ টাকার সুদ বছরে চার হাজারও হয় না। জমিদারিতে অবশ্য হাজা শুকা আছে, নানা হাঙ্গামা, কিন্তু কির্‌ঙ্গাটে মা-লক্ষ্মী কবেই বা কাহার গৃহে আসিয়াছেন? তাহা ছাড়া আর একটা কথা, উৎপল এবং এবং শঙ্কর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তাহারা তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তাঁহার খাতক-সংখ্যা আগে যেমন ছিল এখনও যদিও প্রায় সেইরূপই আছে, কিন্তু উহাদের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা যেরূপ বাড়িতেছে, (জনসাধারণ দূরের কথা, তাঁহার নিজেরই শ্রদ্ধা বাড়িতেছে!) ভবিষ্যতে হয়তো তাঁহার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এই উপলক্ষ্যে ওই দুইজনকেও যদি গ্রাম হইতে উৎখাত করা যায়, মন্দ কি? শত্রুকে অঙ্কুরে বিনাশ করাই তো ভাল। কিন্তু এই বিনাশ করা ব্যাপারে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ খটকা আছে। অসঙ্কোচে কাহাকেও বিনাশ করিতে চিরকালই তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন, বিশেষত সে ব্যক্তি যদি নিরীহ হয়। দীর্ঘনিশ্বাসকে তাঁহার বড় ভয়। কুসীদজীবী হইলেও তিনি ধর্মভীরু ব্যক্তি, পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক আশীর্বাদ-অভিশাপ প্রভৃতিতে আস্থাবান। বিনা দোষে শঙ্কর এবং উৎপলকে বিপন্ন করাটা কি ঠিক হইবে? বহু অনুসন্ধান করিয়াও তো তিনি উৎপল অথবা শঙ্করের চরিত্রে এমন কোন দোষ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, যাহার অজুহাতে তাহাদের উচ্ছেদসাধন সমর্থন করা যায়। অম্বিকা রায়ের ব্যাটা শঙ্করকে তো ভালবাসিতেই ইচ্ছা করে। নিজের অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র গদাধরের সহিত তুলনা করিয়া এ কল্পনাও তিনি মাঝে মাঝে করিয়াছেন, শঙ্কর আমারই ছেলে হইলে মন্দ কি হইত? কেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলে, কোনরূপ নষ্টামি নাই, লোকের বিপদে-আপদে বুক দিয়া করে, কথায়-বার্তায় কেমন বিনয়ী, অথচ লোক-চতুর, সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত কেমন গড়গড় করিয়া আলাপ করিল! অথচ গদাধরটা কি যেন! ঠিক যেন একটা কানা কুলি-বেগুন, বেঁটে কুরকুট্টে, পেঁচার মতন স্বভাব, ভদ্রসমাজে মুখ দেখায় না, বদমাইসের ধাড়ি, যত আড্ডা ছোটলোকের সঙ্গে, এই বয়সেই গাঁজা ধরিয়াছে

নাকি, তুরীটোলার ছুঁড়িগুলা তো তাহার পয়সায় বড়লোক বনিয়া গেল শাড়ি-চুড়ির কি বাহার হারামজাদীদের!

সহসা রাজীবলোচনের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল।

কেনারাম মুল সমস্যাটা লইয়া আলোচনা করিতেছেন।

আমাদের যতই না কেন গরজ থাক্, উৎপল শুধু শুধু জমিদারি বিক্রি করতে রাজী হবে কেন? তার তো কোন অভাব নেই।

রাজীব দত্তের চোয়াল নড়িয়া উঠিল।

হৃদয়বল্লভ বলিলেন, তা নেই স্বীকার করছি। কিন্তু ওদের অতিষ্ঠ ক'রে তোল। তা হ'লেই পালাবে।

কেনারাম বাহিরে সভ্য-ভব্য মিতভাষী মার্জিতরুচি ব্যক্তি, চট করিয়া এমন কিছু বলেন না যাহার জন্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে দায়ী করা যাইতে পারে। অতিষ্ঠ করিবার আয়োজন তিনি করিয়াছেন, হৃদয়বল্লভের আগ্রহাতিশয্য ছাড়া ব্যক্তিগত একটা কারণও সম্প্রতি ঘটিয়াছে। উৎপলের পরামর্শ-অনুযায়ী শঙ্কর তাঁহার পুত্র জীবনকে সত্যই উকিলের চিঠি দিয়াছে। কিন্তু এত কথা হৃদয়বল্লভকে বলার প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে শুধু বলিলেন, দেখি!

না না, উঠে প'ড়ে লাগ ভাই, 'দেখি দেখি' তুমি অনেকদিন থেকে করছ। তুমি চুপ ক'রে থাকবার লোক নও, নিশ্চয় কোন আয়োজন করেছ একা চুপিচুপি, বলই না ভেঙে, শুনি।

শীর্ণকান্তি হৃদয়বল্লভের সমস্ত প্রাণশক্তি তাহার ড্যাবডেবে চক্ষু দুইটিতে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। সর্বগ্রাসী দৃষ্টি সে চক্ষুর।

আয়োজন? না, তেমন কিছু করি নি এখনও। তবে মণি বাঁড়ুজ্জে লক্ষ্মীবাগের ব্যাপারটা যদি বেশি দূর গড়ায়, তা হ'লে হয়তো কিছু হতে পারবে। হয়তো—

হয়তো কথাটার উপর জোর দিয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

হৃদয়বল্লভ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বল না ভাই, মণি বাঁড়ুজ্জে কে?

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর কেনারাম অবশেষে ব্যাপারটা খুলিয়া বলাই মনস্থ করিলেন।

আমাদের হরিহর বাঁড়ুজ্জের খুড়তুতো ভাই মণি লক্ষ্মীবাগে প্রায় হাজার বিঘে জমি নিয়ে মহা ধুমধাম ক'রে চাষ করেছে। আশপাশের কয়েকজন বেহারীদের, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত বেহারীদের, চোখ টাটাচ্ছে তাই দেখে। জনকয়েক বেহারী জমিদার গুলাব সিং তাহার মধ্যে প্রধান, জনকয়েক বেহারী উকিলও সেই নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। শঙ্করের দক্ষিণ হস্ত নিপুবাবুও ইন্ধন যোগাচ্ছেন তাতে। মণি যেসব চাষীর কাছ থেকে টাকা দিয়ে জমি কিনে নিয়েছিল, নিপুবাবু সেই সব চাষীদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ব'লে যে, মণি ক্যাপিটালিস্ট, ঠকিয়ে তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিয়েছে, যে চাষ করে জমি তারই, সমবায়-কৃষি-সমিতি ক'রেই রুশদেশে নাকি চাষীরা সুখে আছে, মণির ন্যায়ত কোন অধিকার নেই একা অতখানি জমি ভোগ করবার। মোট কথা, এই নিয়ে একটা হাঙ্গামা বাধবার সম্ভাবনা।

কেনারাম চুপ করিলেন।

তার সঙ্গে উৎপল আর শঙ্করের সম্বন্ধ কি?

হাঙ্গামা যদি বাধে আর ওরা যদি যোগ দেয় তাতে, দেওয়াই সম্ভব, ওরা আদর্শবাদী লোক, মণির পক্ষ নিশ্চয়ই নেবে, তা'হ'লে ও-অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু বেহারীদের সঙ্গে আর চাষীদেব সঙ্গে শত্রুতা হবে ওদের, আর তা হ'লেই—মানে—

মৃদু হাসিয়া কেনারাম পুনরায় চুপ করিলেন।

মানে?

মানে—একখানা টিকে একবার একটু ধরলে বাকিগুলোও ধ'রে উঠতে দেরি লাগবে না।

উপমাটা রাজীব দত্তের ভালই লাগিল।

তিনি একবার চোয়াল নাড়িলেন।

কিন্তু ফুঁ দেওয়া চাই, ফুঁটা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে—

হৃদয়বল্লভ বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না। প্রমথ ডাক্তার আসিয়া

প্রবেশ করিলেন। গুলাব সিংহের উপর প্রমথ ডাক্তারের অসীম প্রভাব আছে বলিয়া কেনারাম প্রমথ ডাক্তারকে দলে টানিয়াছেন। প্রমথ ডাক্তার আসিয়াছেন শঙ্করের উপর মনে মনে রাগ আছে বলিয়া। বিশেষত সেদিনকার প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস বন্ধ করিয়া দিবার কথাটা তাঁহার মোটেই ভাল লাগে নাই। লোকটা যেন হাতে মাথা কাটিয়া বেড়াইতেছে। উৎপলবাবু ভালমানুষ লোক, কিছু বলেন না, যা-তা করিয়া বেড়াইতেছে একেবারে। ভদ্রলোককে একটু কড়কাইয়া দেওয়া উচিত বই কি। সাবৃটেন্‌লি।

প্রমথ ডাক্তারের অভ্যাগমে পরামর্শ-সভা আরও জঁাকিয়া উঠিল।

১৬

শঙ্করের দিনগুলি কাটিতেছিল।

পল্লীজীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ-খচিত দিনগুলি। পৃথিবীর ইতিহাসে এই অতি তুচ্ছ দিনগুলির হয়তো কোন চিহ্ন থাকে না, পল্লীজীবনের দৈনন্দিন ইতিহাসে কিন্তু ইহাদের মূল্য কম নয়। ডান্‌কার্কে কে পরাজিত হইল, কোন্ পক্ষ যুদ্ধনৈপুণ্যের কি পরিচয় দিল, চীনবাসীদের প্রতি বল্‌শেভিক রুশিয়ার আসল মনোভাব কি, জার্মানির নূতনতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা ববরতার কোন্ কাহিনী কাগজে বিজ্ঞাপিত হইতেছে, কোন্ পক্ষের কোন্ সেনানায়কের যুদ্ধকৌশল কিরূপ, বিমানবহর কে কত বেগে বাড়াইয়া চলিয়াছে—এসব খবর শিক্ষিত শহরবাসীকে যতটা চঞ্চল করিয়া তোলে, অশিক্ষিত পল্লীবাসীকে ততটা তোলে না। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের অত্যাশ্চর্য কাহিনী তাহারা শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মুখে অত্যাশ্চর্য কাহিনীর মতই শোনে, যেন রূপকথা শুনিতেছে। ঘর্ঘর শব্দ করিয়া আকাশ-পথে যখন বিমান-পোত উড়িয়া যায়, বিস্ফারিত নয়নে দলবদ্ধ হইয়া তাহারা সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে—যুদ্ধের সঙ্গে ওইটুকুই তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। মহাযুদ্ধের খবর তাহাদিগকে বিস্মিত করে, কিন্তু তাহাদের জীবনের সুখ-দুঃখ-আশা-

আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, অন্তত তখনও পর্যন্ত করে নাই। যুদ্ধের খবর তাহাদের নিকট খবরই নয়।

তাহাদের নিকট আসল খবর—নিমাই পণ্ডিতের গাই একটি চমৎকার বকনা প্রসব করিয়াছে। কুচকুচে কালো রঙ, কপালের মাঝখানে চন্দনের ফোঁটার মত সাদা একটি টিপ। চমৎকার দেখিতে। হকরু গোয়ালা গাইটি সস্তায় কিনিয়া দিয়াছিল বলিয়া একটা ব্যক্তিগত গর্ব অনুভব করিতেছে। বানারসি গাড়োয়ান, নৈমুদ্দিন দরজী, ইস্কুলের চাকর পরমেশ্বরা—সকলেই ইহাতে উল্লসিত, সকলেই নিমাইকে নানারূপ পরামর্শ অযাচিতভাবেই দিয়া যাইতেছে। এই সময় গাইকে কোন্ কোন্ জিনিস খাওয়ানো উচিত তাহা লইয়া রামু ও বিষুণের কলহই হইয়া গেল। রামু সরিষার খোলের পক্ষপাতী, বিষুণের মতে তিসির খোলই সর্বশ্রেষ্ঠ। খড় ভুষি কোথায় সস্তায় পাওয়া যাইবে সে পরামর্শ অনেকেই দিয়া গেল, খ'ড়ো চালাটা আগামী বর্ষায় চলিবে কি না তাহা লইয়াও অনেকে মাথা ঘামাইল। মুকুন্দ পোদ্দার কি একটা কাজে হীরাপুরে আসিয়াছিলেন, বকনাটি দেখিয়া তাঁহার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। তিনি যাচিয়া নিমাইয়ের সহিত দেখা করিয়া বলিয়া গেলেন যে, নিমাই ভবিষ্যতে কখনও যদি বকনাটি বিক্রয় করে তিনিই কিনিবেন, এমন কি এখনই তিনি ইহার জন্য নগদ পাঁচ টাকা বায়না দিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, নিমাই সম্মত হইল না।

কয়লার সদ্যোজাত শিশুটা নাকি শৃগালের কবলে গিয়াছে। কয়লার বউ তাহাকে আঙিনায় শোয়াইয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর রান্না করিতেছিল। দিন-দুপুরে এই কাণ্ড। খুকীর জন্য অমিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ মাঝে একদিন শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। আমের মুকুল যদিও এখনও তেমন হয় নাই, তবুও যা হইয়াছিল নষ্ট হইল। ইউরোপীয় যুদ্ধের শোচনীয় পরিবেশ অপেক্ষা এই পরিবেশ সকলকে বেশি আকুল করিয়া তুলিল। অতীতে কে কত ভীষণ শিলাবৃষ্টি দেখিয়াছে, তাহা লইয়া পাল্লা দিয়া গল্পও চলিল দুই-চারিজন বৃদ্ধের মধ্যে।

আর একটা বিস্ময়কর ঘটনায় সব চাপা পড়িয়া গেল। গ্রামপ্রান্তে

শিবমন্দিরের পাশে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক-দম্পতি বাস করিত। বেচারারা সত্যই অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এ অঞ্চলের বৃদ্ধতম লোকও নাকি তাহাদের ওই একই রকম দেখিতেছে। যম যেন তাহাদের ভুলিয়া আছে। কত ঝঞ্ঝাবাত মহামারী দুর্ভিক্ষে কত শক্ত সমর্থ লোক অকালে মরিল, কিন্তু উহাদের মৃত্যু নাই। কুব্জপৃষ্ঠে ন্যুব্জদেহে লাঠি ধরিয়া ধরিয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং চিরকাল হয়তো বেড়াইত, যদি না রাজীব দত্ত দয়া করিতেন। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ঠেকিলেও কুসীদজীবী রাজীব দত্তই দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বেচারাদের আর ভিক্ষা করিতে হইত না। বেশ ছিল। অকস্মাৎ একদিন রাত্রে ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ষণ্ডা ষণ্ডা দুইজন কালো লোক তাহাদের কুঁড়েঘরে ঢুকিয়া বুড়া অন্ধ ভিখারীটাকে কাঁধে তুলিয়া লইল এবং নিমেষমধ্যে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল। বুড়ীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশীরা সমবেত হইল। লণ্ঠন লইয়া, মশাল জ্বালিয়া, অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না। কিন্তু জীবন্ত বা মৃত বুড়ার কোন সন্ধানই মিলিল না। থানায় খবর দেওয়া হইল, কোন ফল ফলিল না। সম্ভব অসম্ভব নানারূপ গবেষণার পর যে ধারণা ক্রমশ অধিকাংশ লোকের মনে বদ্ধমূল হইল তাহা এই যে, যমরাজকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। বুড়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল, কিছুতেই মরিবে না। যমরাজ তাহা শুনিবেন কেন? দূত পাঠাইয়া জীবন্তই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয়েকদিন পরে বুড়ীও মরিয়া গেল।

রহিমের ভেড়া মটরা সকলকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। কসল খাইয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কিছু বলিতে গেলেই ছুটিয়া আসিয়া ঢুঁ মারিয়া ফেলিয়া দেয়। এ অঞ্চলের ছেলেরা তো ওটাকে যমের মত ভয় করে। সবাঙ্গে কোঁকড়ানো কালো লোম, প্রকাণ্ড পাকানো শিঙ দুইটা বিশাল 'ৎ'এর মত বলিষ্ঠ গর্দানার উপর যেন ওত পাতিয়া বসিয়া আছে। মটরার জ্বালায় সকলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু মটরার প্রতি সকলের স্নেহেরও অন্ত নাই হইবে না? সেবার রসুলগঞ্জে যখন ভেড়ার লড়াই হয়, তখন এই মুটরা

সমাগত সমস্ত ভেড়াকে পরাস্ত করিয়া গ্রামের মুখরক্ষা করিয়াছিল। সেই হইতে মটরা গ্রামবাসী সকলেরই আদরের পাত্র। ইহার বাড়ি ফ্যান খাইয়া, উহার বাড়ি ভুষি খাইয়া, কাহারও বাগান ভাঙিয়া, কাহারও ফসল চরিয়া মটরা দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি শুরু করিয়াছে। ভাগিয়ার ছেলে নন্‌কুকে এমন মারিয়াছে যে, সে হাতের হাড় ভাঙিয়া হাসপাতালে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। ভাগিয়া শঙ্করের নিকট আসিয়া মটরার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইল।

শঙ্কর বলিল, আমি কি করব তার? রহিমকেই বল গিয়ে।

আপ থোড়া বোল দিজিয়ে হুজুর।

আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয়।

রহিম আসিয়া বলিল যে, মটরার জ্বালায় নিজেই সে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছে।—কত দড়ি আর কিনি হুজুর, রোজ রোজ দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। নারিকেলের শক্ত মোটা দড়িও এক ঝটকায় পট করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। আমি আর উহাকে লইয়া পারি না, নাচার হইয়া পড়িয়াছি; আপনারা বরং ওটাকে কাটিয়া খাইয়া ফেলুন, আপদ চুকিয়া যাক।

এই কথায় ভাগিয়াই জিব কাটিয়া বলিয়া উঠিল, আরে, ছি ছি ছি, ই কেসন বাত!

শঙ্কর বলিল, একটা মোটা লোহার শেকল কিনে গলায় বক্‌লস দিয়ে বেঁধে রাখ্‌ ব্যাটাকে।

ইহার উত্তরে রহিম যাহা ব্যক্ত করিল, তাহাও সঙ্গত। এই যুদ্ধের সময় বক্‌লস এবং লোহার শিকলের যা দাম, তাহা জুটাইবার সঙ্গতি তাহার নাই। অবশেষে শঙ্করকে বলিতে হইল যে, দামটা সে-ই দিবে।

ভাগিয়া রহিম উভয়েই খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

নেকি মাড়োয়ারী শীঘ্রই নাকি একটি মাখন-তোলা কল বসাইবে।

নটবর এবং চরণ ডাক্তারের চিকিৎসায় হরিয়া ক্রমশ সারিয়া উঠিতেছে।

নিপু মাঝে একদিন হীরাপুর হাটে দাঁড়াইয়া ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে

বল্‌শেভিজ্‌ম সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিয়া নাকি হাঙ্গামা হইয়াছে।

কর্পূরা গোয়ালার মেয়ে শুকৃরি মাঝে একদিন হৈ-চৈ বাধাইয়া বসিল। এ দেশের সব মেয়েরই যেমন হয়, তাহারও অতি বাল্যকালেই, দুই বৎসর বয়সেই, বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত সে বাপের বাড়িতেই ছিল। মাসখানেক পূর্বে তাহার 'গওনা' (দ্বিরাগমন) হইয়াছে। 'গওনা' উপলক্ষ্যে গরিব কর্পূরা বেচারা এই দুর্দিনেও যথাসাধ্য সমারোহ করিয়া মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ি পাঠাইয়াছিল। দশ ক্রোশ দূরে ঝপ্‌টি গ্রামে তাহার শ্বশুর-বাড়ি। মেয়েটা হঠাৎ সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। রাতারাতি হাঁটিয়া চলিয়া আসিয়াছে। শ্বশুর-বাড়ির লোকেরাও দুই-একদিন পরে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া উপস্থিত। পলাতকা বধূকে যেমন করিয়া হোক তাহারা লইয়া যাইবেই।

শুকৃরি আসিয়া অমিয়ার শরণাপন্ন হইল। বলিল, তাহার স্বামীর শ্বেতি (ধবল) হইয়াছে, কিছুতেই ও-স্বামীর ঘর সে করিবে না। ঝপ্‌টি গ্রামের কাছেই শঙ্করদের স্থাপিত একটি ডিস্‌পেন্সারি আছে। তাহার স্বামীর যাহাতে সুচিকিৎসা হয়, সে ব্যবস্থা শঙ্কর করিয়া দিবে আশ্বাস দিল। প্রেম ডাক্তার বলিলেন, ধবল আর কুষ্ঠ এক জিনিস নয়, সংক্রামকও নয়, সুচিকিৎসায় সারিয়া যাইতে পারে। তবু শুকৃরি যাইতে চায় না। অবশেষে শঙ্করকে গ্রামের-দোহাই দিতে হইল। সে যদি না যায়, গ্রামেরই একটা বদনাম হইয়া যাইবে যে! এ গ্রামের মেয়েকে কেহ বিবাহই করিতে চাহিবে না হয়তো। তা ছাড়া এমন ভাবে পলাইয়া আসিলে লোকে অন্যরকম বদনামও দিতে পারে। শুকৃরির মত ভাল মেয়ের নামে এ রকম কুৎসা রটা কি ঠিক ?

পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নতমুখী শুকৃরি বলিল, এখন গেলে আমাকে উহারা মারিবে। বাহিরের বারান্দায় শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা বসিয়া ছিল, তাহারা প্রতিশ্রুতি দিল যে, বধূর উপর কোন রকম অত্যাচার করা হইবে না। তখন শুকৃরি আর এক বাহানা তুলিল। স

ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পায়ে ভয়ানক ব্যথা হইয়াছে, সে আবার অতটা পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না। কর্পূরা গোয়ালা নিকটে বসিয়া সব শুনিতেছিল, তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। মহিষের শিঙের মত উচ্চাগ্র বাঁকা গোঁফ চুমরাইয়া সে সগর্জনে বৈবাহিককে সম্বোধন করিয়া বলিল, ঝোঁটি পকড়িকে ঘিশিয়াকে লে যা। বৈবাহিকটি বলিষ্ঠ-গঠন ব্যক্তি, শালপ্রাংশু মহাভুজ যাহাকে বলে। পুত্রবধূর চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার মত শারীরিক ক্ষমতা তাহার আছে। লোকটি কিন্তু ধীরপ্রকৃতির। কর্পূরার কথায় তাহার মুখ প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পুত্রবধূর আপত্তির যৌক্তিকতাও সে বোধ হয় উপলব্ধি করিল। বটুয়া হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া সেটির প্রতি সে একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল, তাহার পর ইতস্তত করিয়া বলিল, আট আনামে বয়েল গাড়ি কি ডোলি হোতেই?

অসম্ভব। আজকালকার দিনে মাত্র আট আনায় কোন গরুর গাড়ি বা ডুলি দশ ক্রোশ পথ যাইতে রাজী হইবে না। অন্তত চার টাকা লাগিবে। কর্পূরা 'গওনা'তে সম্প্রতি ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, আবার এই চার টাকাও তাহাকে দিতে হইবে নাকি? তাহার ভয়ানক রাগ হইল। আর একবার গোঁফে চাড়া দিয়া সে বোধ হয় পুনরায় ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাবটাই করিতেছিল, কিন্তু শঙ্কর বাধা দিল।

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমার গাড়িটাই পৌঁছে দিয়ে আসুক ওকে, মুশাইকে ব'লে দিচ্ছি।

মুশাই মনে মনে খুব চটিল, ছুঁড়ীটার দেমাক তো কম নয়! কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল। শঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার সাধ্যাতীত। শুক্রির আর আপত্তি করিবার উপায় রহিল না, বরং তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

শঙ্করের 'শিশা'-লাগানো 'টপ্ পর'-দেওয়া গাড়িতে চড়িবার সুযোগ পাইয়া সত্যই সে উল্লসিত হইয়া উঠিল। অমিয়া তাহাকে একটি রঙিন শাড়ি কিনিয়া দিল। সে কিন্তু আরও বেশি খুশি হইল অমিয়ার অর্ধেক খালি তরল আলতার শিশিটা পাইয়া, হাতে যেন স্বর্গ পাইল। আর কোন আপত্তি করিল না, শ্বশুর-বাড়ি চলিয়া গেল।

পল্লীজীবনের এই সব অতি তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়া শঙ্করের দিনগুলি কাটিতেছিল। ঠিক নিরুদ্বিগ্ন না হইলেও, শান্তিপূর্ণ।

১৭

কুন্তলা গৃহকর্মে নিমগ্ন ছিল।

উঠানে বসিয়া নিজের হাতেই গরুর জাব কাটিতেছিল। বাংলা দেশ হইতে জাব কাটিবার একটা বঁটি সে আনাইয়া লইয়াছে। এ দেশের 'গড়াসা' তাহার পছন্দ নয়। বর্তমানে তাহার দৈনন্দিন জীবন সে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে যে, ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহার কোন অবসর নাই। ইচ্ছা করিয়াই কোন অবসর সে রাখে নাই। ভোর পাঁচটায় সে উঠে। উঠিয়াই প্রথমে ঘর বারান্দা উঠান স্বহস্তে ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করে, প্রতি ঘরের চৌকাঠে জল ছিটায়, গোবর দিয়া রান্নাঘরটা নিকাইয়া ফেলে। তাহার পর গোয়াল পরিষ্কার করিয়া, গরুকে খাইতে দিয়া, বাসনগুলি মাজে। এতদিন একটা বুড়ী ঝি ছিল, কিন্তু সে এখন নিতান্তই বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে, চোখে দেখিতে পর্যন্ত পায় না। ইচ্ছা করিয়াই কুন্তলা নূতন কোন ঝি রাখে নাই। সে নিজেই সব করিবে। বাসন মাজা হইয়া গেলে সে স্নান করে। স্নানান্তে পূজার ঘরে ঢোকে। পূজা সারিয়া রান্না শুরু করে। বেলা বারোটার পূর্বে হরিহরের খাইবার অবসর হয় না। স্নান, আহ্নিক, পৌরোহিত্য, সামান্য বৈষয়িক কাজ-কর্ম প্রভৃতি দৈনিক কর্তব্যগুলি করিতে বারোটাই বাজিয়া যায়। সুতরাং রান্না খাওয়া শেষ করিতে কুন্তলার প্রায় একটা বাজে। ইহার পর ঘণ্টাখানেক সে বিশ্রাম করে। বিশ্রামের পর খানিকক্ষণ পড়াশোনা, খানিকক্ষণ চরকা। পাঁচটার সময় গরুর জাব কাটে। গরু চরিয়া ফিরিয়া আসিলে স্বহস্তে তাহার জাব পর্যন্ত সে মাখিয়া দেয়। ঝাণ্ডু নামক যে বালকটি গরু চরায়, সে অবশ্য খানিকটা সাহায্য করে, না করিলেও কিছু ক্ষতি হইত না। কুন্তলা কিছুতেই দমিত না। গরুর সেবা করিয়া আবার ঠাকুর-ঘর, আবার রান্নার আয়োজন। বৈকালের দিকে রান্নাটাকে

সে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে। সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই সব শেষ করিয়া ফেলে। আটটার পর বাহিরের বারান্দায় পাড়ার অনেকে সমবেত হন, হরিহর ভাগবত পাঠ করেন। কুন্তলাও কিছুদিন হইতে রোজ সেখানে বসিতেছে। পিসীমা যতদিন ছিলেন, ততদিন অবশ্য এসব কিছু ছিল না। তখন হরিহর পাড়ার মুন্‌শীজীর সহিত দাবা খেলিতেন। কুন্তলা পিসীমার খুঁটিনাটি কাজ করিয়া দিত এবং পিসীমার সঙ্গেই গল্প-গুজব করিত। পিসীমার গল্পের প্রধান বিষয় ছিল হরিহরের পিতা ত্রিপুরেশ্বর এবং হরিহর। হরিহরের বাল্য-জীবনের কথা, ত্রিপুরেশ্বরের জীবনের অলৌকিক নানা কাহিনী পিসীমা সবিস্তারে বলিয়া যাইতেন, বার বার বলিয়াও যেন শেষ করিতে পারিতেন না, শেষ করিয়াও যেন তৃপ্তি হইত না। কুন্তলা ময়দা মাখিতে মাখিতে বা ক্ষীরের ছাঁচ তুলিতে তুলিতে স্মিতমুখে সেসব গল্প শুনিত। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত বটে, কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করিত যাহাতে অন্যমনস্ক না হয়। পিসীমা সম্প্রতি কাশীবাস করিয়াছেন। তাঁহার এক বোনপো কাশীতে বাড়ি করিয়া তাঁহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছে। সেখানেই পিসীমা এখন কিছুকাল থাকিবেন। যে হরিহরকে বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ করিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটু কষ্ট হইয়াছিল বইকি। কিন্তু সমস্ত হিন্দু নারীর মনে যে ভাব শেষ পর্যন্ত প্রবল হয়, তাহা তাঁহার মনেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মায়া তো একদিন কাটাইতেই হইবে, পরকালের কাজটাও তো করা দরকার, কতদিন আর সংসারের ঝঞ্ঝাটে জড়াইয়া থাকিবেন তিনি? বাবা বিশ্বেশ্বরে এমন একটা সুযোগ যখন ঘটাইয়া দিয়াছেন, তখন তাহা ত্যাগ করা কি উচিত? তবু তাঁহার মনে কিছু খুঁতখুঁতানি ছিল, বউমা একা সংসার চালাইতে পারিবে কি, হাজার এম.এ. পাস করুক, ছেলেমানুষ তো, সংসারের কতটুকু বোঝে! কুন্তলা চুপ করিয়া থাকিত। কাশী যাওয়ার সপক্ষে কিছু বলিলে পাছে পিসীমা ভাবেন, বউ তাঁহাকে কাশীতে বিদায় করিয়া দিয়া নিজেই সংসারের কর্ত্রী হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল দোটানার মধ্যে থাকিয়া পিসীমা নিজেই অবশেষে মনস্থির করিয়া

ফেলিয়াছিলেন। হিন্দু বিধবার পক্ষে কাশীবাসের প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন। পিসীমা কাশী চলিয়া গেলে সন্ধ্যার পর কুন্তলার বড় একা একা বোধ হইত। পাড়া-বেড়ানো স্বভাব তাহার নয়। পড়িতেও ইচ্ছা করে না একা একা। তাই সে হরিহরকে বলিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাগবতপাঠের আয়োজন করিয়াছে। এ প্রস্তাবে মুন্শীজীও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করাতে হরিহর রাজী হইয়াছেন। রাত্রি দশটা পর্যন্ত ভাগবতপাঠ হয়। তাহার পর আহারাদি করিয়া কুন্তলা শুইয়া পড়ে। এই তাহার বর্তমান দৈনন্দিন জীবন। একেবারে নিশ্ছিদ্র। ইচ্ছা করিয়াই সে কোন ছিদ্র রাখে নাই। ছিদ্র থাকিলেই নানা ভাবনা আসিয়া জোটে। অসংখ্য আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা মনের নিম্নস্তর হইতে উঠিয়া আসিয়া অদ্ভুত দিবাস্বপ্ন রচনা করে; চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। যে জীবনকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে, সে জীবনের মহিমায় যেন সন্দেহের ছায়াপাত হয়। না, কোনরূপ অশান্তিজনক স্বপ্ন-বিলাসের সুযোগ নিজেকে সে কিছুতেই দিবে না। যে জীবন সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই হিন্দু নারীর আদর্শ জীবন। সর্বতোভাবে সে আদর্শের উপযুক্ত তাহাকে হইতে হইবে, কায়মনোবাক্যে সে আদর্শ-জীবনের মহত্ত্বকে স্বীকার করিতে হইবে, কোনরূপ অনুশোচনার অবসর সে দিবে না, কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিবে। আচরণ দ্বারা তো নহেই, মনে মনেও সে স্বীকার করিবে না যে, ভুল করিয়াছে। ভুল সে করে নাই। ইহাই ভারতবর্ষীয় নারীর আদর্শ। এই আদর্শের উপযুক্ত হইতে হইবে, কষ্ট হয় হোক। যে কোন মহৎ সাধনা করিতে হইলেই কষ্ট করিতে হয়।

তবু মাঝে মাঝে সুধাংশুকে মনে পড়ে। কলেজ-জীবনে সুধাংশুকে সত্যই তাহার ভাল লাগিয়াছিল। যেমন তাহার সৌম্য মূর্তি, তেমনই আচরণ, তেমনই বিদ্যাবত্তা। দূর হইতেই সে তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল, উপযাচিকা হইয়া অন্য মেয়েদের মত ছলে ছুতায় তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহার সহিত একটা কথা পর্যন্ত বলে নাই। তাহার সহপাঠিনীদের মর্যাদাবোধের অভাব চিরকাল তাহাকে পীড়া দিয়াছে। কাপড়, গহনা, সিনেমা, পুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি অতি তুচ্ছ ব্যাপারই যেন তাহাদের নিকট

বড়। আত্মসম্মানের যেন কোন মূল্য নাই। অতি তুচ্ছ মূল্যেই নিজেকে বিকাইয়া দিতে সকলে প্রস্তুত। পাশ্চাত্য শিক্ষাটাই আমাদের কেমন যেন আত্মগৌরবশূন্য করিয়া তুলিয়াছে—এই কথাই কলেজে পড়িবার সময় বার বার তাহার মনে হইত। আমাদের যেন কিছু নাই! আমাদের ধর্ম পৌত্তলিকতাময়, আমাদের সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আমাদের সমস্ত সামাজিক নীতি সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণদের কারসাজি মাত্র! বিদেশী ধর্মকে, বিদেশী সমাজকে, বিদেশী নীতিকে, বিদেশী বুলিকে নকল করিতে না পারিলে আমাদের যেন আর মুক্তি নাই! নোবেল প্রাইজ না পাইলে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করিব না, বিলাত-ফেরত না হইলে কৌলীন্য-মর্যাদা দিব না, বিলাতী নজির না থাকিলে দেশী কোন কিছু বিশ্বাস করিব না—এই হেয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সে চিরকাল উদ্যত-প্রহরণ। এইজন্যই সে সুধাংশুর নামোল্লেখ পর্যন্ত কাহারও কাছে করে নাই। সুধাংশু জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাদের পালটি ঘরও, চেষ্টা করিলে অনায়াসেই তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারিত। কিন্তু 'চেষ্টা' করিয়া বিবাহ করা ব্যাপারটায় একটা বিদেশী গন্ধ আছে বলিয়া সে চেষ্টাই সে করে নাই। সত্য বটে, এই ভারতবর্ষে পূর্বে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল। সীতা, সাবিত্রী, উষা, দময়ন্তী—সকলে পছন্দ করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আচরণে এমন শিকারী-মনোবৃত্তি ছিল না। আজকাল মেয়েরা যাহা করে, তাহা ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরার মত মর্যাদাহীন ব্যাপার। ধৃত মৎস্যটি যদি রুই কাতলা না হয়, তাহা হইলে সেটিকে ছাড়িয়া দিয়া অভিজাত মৎস্যের উদ্দেশ্যে আবার নূতন টোপ ফেলা হয়। বর্তমান যুগের অর্থশাসিত বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রেমের সে মহিমা আর নাই। কেবলমাত্র প্রেমের জন্যই আজকাল কেহ প্রেমাস্পদকে বিবাহ করিতে রাজী হয় না, যদি না তাহার সহিত একটি সুরঞ্জিত 'ফিউচার' জড়িত থাকে। সুধাংশুর সহিতও একটি সুরঞ্জিত 'ফিউচার' জড়িত ছিল। বিশেষ করিয়া এইজন্যই কুন্তলা তাহাকে এড়াইয়া চলিত, পাছে কেহ মনে করে যে, ধনীসন্তান সুধাংশুকে সে রূপের টোপ ফেলিয়া গাঁথিবার চেষ্টা করিতেছে। সুধাংশু যদি দরিদ্র হইত, যদি সে বিলাতী ডিগ্রী অর্জন করিয়া

বড় চাকুরি করিবার স্বপ্ন না দেখিত, যদি সে ব্রাহ্মণোচিত নিরাসক্তিতে দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের কর্তব্যকেই জীবনে প্রাধান্য দিত, তাহা হইলে কুন্তলা হয়তো তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত। ব্রাহ্মণ-কন্যা সে, পছন্দ করিয়া যদি বিবাহ করিতে হয় সত্যকার ব্রাহ্মণকেই সে পছন্দ করিবে। কিন্তু সে রকম ব্রাহ্মণ একজনও তো তাহার চোখে পড়িল না। সকলেই অর্থগৃধ্নু। কেহ কেহ ব্রাহ্মণত্বের মুখোশ পরিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে কেহই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। প্রেমের অঞ্জলি, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কাহার চরণে দিবে সে? ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়া টাকার লোভে একটা বৈশ্যকে ভুলাইতে যাইবে? ইহা করা অপেক্ষা বর্তমান যুগের সম্প্রদান-প্রথায় আত্মসমর্পণ করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ঢের বেশি আত্মসম্মানজনক। সম্প্রদান-প্রথার অন্তর্নিহিত ভাব সত্যই মহত্ত্বপূর্ণ। যে কন্যা সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নের সঙ্গে উপমিত, সেই কন্যাকে লালনপালন করিয়া স-দক্ষিণা সৎপাত্রে দান করার মধ্যে যে আভিজাত্য আছে, তাহা কি তুচ্ছ করিবার মত? বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় (যে আবহাওয়ায় অর্থই পরমার্থ) পণপ্রথা-দুষ্ট হইয়া সে উদারতা চর্চা করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তবু তাহা যে মহত্ত্বপূর্ণ, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? এখনও আমাদের দেশের ভদ্রসমাজ এত কষ্টে পড়িয়াও এই উদার প্রথাকেই অবলম্বন করিয়া আছে, কন্যা-বিক্রয়ের হীনতা স্বীকার করে নাই। তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজেই কন্যারা আজকাল নিতান্ত দেহের তাগিদে এবং বিলাস-লালসায় মত্ত হইয়া বৈশ্যের কামবহ্নিতে নিজেদের ইন্ধন দিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে পাশ্চাত্য সমাজের নকল করিয়া। কুন্তলা এ হীনতা স্বীকার করে নাই। পিতার হস্তেই বিবাহের সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল।...তবু সুধাংশুর মুখখানা মাঝে মাঝে তাহার মনে পড়ে। পড়ুক, সুধাংশু তাহার কেহ নয়। হরিহরের সহিত তাহার তুলনা পর্যন্ত সে করিবে না। হরিহর তাহার স্বামী, আরাধ্য দেবতা, শুধু ইহকালের নয়, পরকালেরও সম্বল।

কুন্তলার সহিত হরিহরের বিবাহের ইতিহাসটিও ঈষৎ অদ্ভুত। কুন্তলার

উগ্র আত্মমর্যাদাবোধের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। হরিহরের পিতা স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এ অঞ্চলে 'ঠাকুর-বাবা' নামে প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি, তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। হীরাপুরের জগদ্ধাত্রী-মন্দিরের পুরোহিত অপুত্রক অবস্থায় মারা যাইবার পর প্রাক্তন জমিদার রাজবল্লভ রায় স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বর্ধমান জিলার এক গ্রাম হইতে সন্ধান করিয়া লইয়া আসেন এবং হীরাপুরের জগদ্ধাত্রী-মন্দিরে পুরোহিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ঠাকুর-বাবা একমাত্র মাতৃহীন পুত্র হরিহর ও বিধবা ভগ্নীটিকে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং জমিদার-প্রদত্ত নিষ্কর জমিজমার সাহায্যে হীরাপুরে বসবাস করিয়াছিলেন।

ঠাকুর-বাবার বিষয়ে অনেক অলৌকিক গল্প এ দেশে প্রচলিত আছে। তিনি নাকি ভূতপ্রেতের সহিত কথাবার্তা কহিতেন, শীতকালে পাকা আম-কাঁঠাল আনাইয়া দিতে পারিতেন। অনেক পরী নাকি তাঁহার বাধ্য ছিল। অনেকে স্বচক্ষেই নাকি দেখিয়াছে, স্বচ্ছ-বসনা জ্যোৎস্না-বরনা পরী মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে। লোহাকে সোনা করার ক্ষমতাও নাকি তাঁহাব ছিল। কিন্তু এ বিদ্যা একটিবার ছাড়া কখনও তিনি কাজে লাগান নাই। তিনি সত্যই সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বর্ণ এবং লৌহ তাঁহার নিকট তুল্যমূল্য ছিল। একবার কেবল একটি দরিদ্র বৃদ্ধার লোহার খন্তিটিকে তিনি সোনার করিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধা অর্থাভাবে তাহার একমাত্র পুত্রের চিকিৎসা করাইতে পারিতেছিল না এবং ঠাকুর-বাবাকে আসিয়া ধরিয়াছিল তাহাকে নিরাময় করিয়া দিবার জন্য। ঠাকুর-বাবা বলিয়াছিলেন, নিয়তি কাহারও বাধ্য নয়, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা ঘটিবেই, তুমি কর্তব্য কর, পুত্রের চিকিৎসা করাও, তাহার পর জগজ্জননীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। বৃদ্ধা অর্থাভাবের কথা জানাইলে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোর যদি কোন লোহার বাসন থাকে, পরিষ্কার করিয়া মায়ের পায়ের তলায় রাখিয়া যা, মায়ের যদি দয়া হয় লোহাকে সোনা করিয়া দিবেন। বুড়ীর প্রকাণ্ড একটা লোহার কড়া ছিল, সেইটা পরিষ্কার করিয়া দিলেই হইত, কিন্তু বোকা বুড়ী তাহা না করিয়া খন্তিটা দিয়া আসিয়াছিল। বুড়ী বোধ হয় ঠাকুর-বাবার

কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই। পরদিন কিন্তু বুড়ীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না, মায়ের পদস্পর্শে লোহা সত্যই সোনা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর-বাবা বুড়ীকে এ কথা প্রকাশ করিতে মানা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুড়ী কি এত বড় একটা সংবাদ চাপিয়া রাখিতে পারে! বেশি লোককে সে অবশ্য বলে নাই। কেবল নিজের ভোজাইকে, পিতিয়াকে এবং তেতরিকে বলিয়াছিল। তাহার এই অবাধ্যতার ফলও অবশ্য ফলিয়াছিল, ছেলেটি বাঁচে নাই। এই সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে ঠাকুর-বাবার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর-বাবা কাহাকেও আর আমল দেন নাই। সকলেই চলিয়া গিয়াছিল, যায় নাই কেবল ঝক্সু। বলিষ্ঠ দুর্দান্ত ঝক্সু জাতিতে লোহার। স্বচক্ষে সে সুবর্ণময় খন্তিটি দেখিয়াছিল। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও যখন ঠাকুর-বাবার নিকট হইতে সে সোনা করিবার মন্ত্রটি আদায় করিতে পারিল না, তখন কি যে তাহার মনে হইল, ঠাকুর-বাবার আশ্রয় সে আর ত্যাগ করিল না। আজীবন তাঁহার আশ্রয়েই থাকিয়া গেল। দুর্দান্ত মাতাল দুর্দান্ত কর্মীতে পরিণত হইল। ঝক্সু তাহার মোটা বুদ্ধি দিয়া এইটুকুই বোধ হয় বুঝিয়াছিল যে, ফাঁকি দিয়া অর্থোপার্জন করা পাপ। তাহা না হইলে ঠাকুর-বাবা নিজেই ঐশ্বর্যবান হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা হন নাই। তিনি নিজের কয় বিঘা জমি হইতে উৎপন্ন শস্য এবং শিষ্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সামান্য দক্ষিণা লইয়াই তো সন্তুষ্টচিত্তে মায়ের সেবা করিতেছেন।

এই ঠাকুর-বাবার পুত্র হরিহর স্থানীয় স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়িয়াছিলেন। কাজ-চলা-গোছ ইংরেজী বিদ্যা লাভ করিয়া পিতার নির্দেশে তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যয়নে মনোযোগ করিতে হইয়াছিল। খাঁটি স্বদেশী ছাঁচে ঠাকুর-বাবা পুত্রটিকে মানুষ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, টানা চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে শুচিতা যেন মূর্ত হইয়া আছে। নগ্ন গাত্রে এক গোছা শুভ্র উপবীত, মস্তকে গোক্ষুর পরিমাণ শিখা বিদেশাগত আধুনিকতার বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহের মত বিরাজ করিতেছে। অথচ লোকটি রবীন্দ্রনাথের গোরার মত উগ্র নয়, কথায় কথায় বক্তৃতা দিবার আবেগ তাঁহার জাগে না। অতিশয় স্বল্পভাষী মৃদুপ্রকৃতির লোক। নিজেকে

লোকচক্ষু হইতে যথাসম্ভব অবলুপ্ত করিয়া রাখাই যেন তাঁহার সাধনা। অধিকাংশ সময়ই মন্দিরে থাকেন, পূজা এবং পড়াশোনা করা ছাড়া অন্য কোন কাজ নাই। শিষ্যবাড়ির আহ্বানে অথবা কোথাও কথকতা করিবার জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হইলে নিতান্ত অনিচ্ছা ও সঙ্কোচ সহকারে কাঁধে চাদরটি ফেলিয়া কচিৎ কখনও তিনি বাহির হন। ফসল উঠিবার সময়ও মাঝে মাঝে তাঁহাকে বাহির হইতে হইত, কিন্তু কুন্তলা আসিবার পর হইতে বৈষয়িক সমস্ত ব্যাপারের ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এই নিরীহ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সহিত এম.এ.-পাস কুন্তলার বিবাহ সম্ভবপর হইয়াছিল ত্রিপুরেশ্বরের সহিত কুন্তলার পিতার আলাপ ছিল বলিয়া। শুধু আলাপ নয়, কুন্তলার পিতা ইংরেজী-শিক্ষিত অধ্যাপক হইলেও ত্রিপুরেশ্বরের একজন ভক্ত ছিলেন। কুন্তলার মাও ত্রিপুরেশ্বরকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেন। ত্রিপুরেশ্বরই নাকি একবার বালিকা কুন্তলাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি খুব সুলক্ষণা, আমার হরুর সঙ্গে এর বিয়ে দাও তো বড় খুশি হই। কুন্তলার পিতা মাতা উভয়েই তখন এ প্রস্তাবে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, কুন্তলাও কথাটা শুনিয়া মনে মনে একটা স্বপ্ন-রচনা করিয়াছিল। কিন্তু কথাটা তখন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পরে ত্রিপুরেশ্বর পত্রযোগে আবার এ প্রস্তাব করেন। কুন্তলার পিতা পত্রের উত্তরে লেখেন, কুন্তলা হরিহর উভয়েই এখন পড়িতেছে, উঁহাদের পড়াশোনা শেষ হইলে শুভকর্ম সমাধা করা যাইবে। বিবাহ ঠিক করাই রহিল। কিন্তু কুন্তলা এমন ভালভাবে পড়াশোনা এবং পাস করিতে লাগিল যে, তাহার বাবা পড়া বন্ধ করিতে পারিলেন না। কুন্তলা যখন আই. এ. পড়িতেছে, তখন তাহাকে একদিন বলিলেন, হরিহরের সঙ্গে কিন্তু তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করা আছে, বিয়ে করবি তো? কুন্তলার মন তখনও পাশ্চাত্য-শিক্ষার মোহে মুগ্ধ। সবাই যেমন বলে তেমনই বলিল, পড়াশোনা শেষ ক'রে তারপর বিয়ের কথা। ইতিমধ্যে ত্রিপুরেশ্বর মারা গেলেন। হরিহরকে ত্রিপুরেশ্বর বিবাহের কোন কথাই বলিয়া যান নাই, বিবাহ সম্বন্ধে হরিহরেরও বিশেষ তেমন কোন আগ্রহ ছিল না, পিসীমাই মাঝে মাঝে কেবল ব্যগ্র হইতেন। এদিকে কুন্তলা যখন এম. এ পাস করিয়া ফেলিল, তখন

তাহাকে একটা গ্রাম্য পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করিতে কুন্তলার বাবা একটু যেন ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কুন্তলার মায়েরও কেমন যেন অনিচ্ছা দেখা যাইতে লাগিল। কুন্তলার আত্মমর্যাদাবোধ তখন উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, ওঁদের সঙ্গে যখন কথা হয়ে আছে, সে কথার নড়চড় করা অভদ্রতা হবে। ওঁদের একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত, ওঁরা যদি আপত্তি করেন, আমাদের তা হ'লে আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না।

কুন্তলার মা বলিলেন, ছেলেটি তো মোটে ম্যাট্রিক-পাস শুনছি। ওর সঙ্গে তোর মানাবে কেন?

কুন্তলা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, বাবা এম.এ.পি.এইচ-ডি, আর তুমি তো একেবারে নিরক্ষর, তোমাদের কি মানায় নি? আমি এম.এ. পাস করেছি ব'লে কি তোমাকে মা ব'লে সম্মান করব না? পাস করাতে কি এসে-যায়।

কুন্তলার বাবা বলিলেন, ইংরেজী তেমন না জানলেও ছেলেটি সংস্কৃতে বেশ পণ্ডিত। ঘরে খেতে-পরতেও আছে। একশো বিঘের ওপর ভাল জমি, দেশেও খেনো জমি আছে। সেদিকে কিছু খারাপ নয়, অত বড় বংশ, ছেলেটিও বেশ সুস্থ সচ্চরিত্র। আমি কেবল তোর কথা ভেবেই একটু দোনোমোনো করছিলাম।

আমার কোনও আপত্তি নেই।

পত্র পাইয়া হরিহর অবাক হইয়া গেলেন। তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। মেয়ে এম.এ.-পাস শুনিয়া পিসীমা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ও মা, তা হ'লে সে তো মেয়ে নয়, মেমসাহেব! চশমা গাউন প'রে রুজ পাউডার মেখে বাহার দিয়ে জুতো খটখটিয়ে বেড়াবে খালি। একবার কলকাতায় দেখেছিলাম এক এম.এ.-পাস মেয়েকে, বাবা রে বাবা, সে কি ছিরি তার! হাতে ব্যাগ, পায়ে জুতো, চোখে চশমা, ঘাগরা ক'রে কাপড় পরা! মুখখানি কিন্তু শুকনো আমসির মত, তার ওপর আবার রুজ পাউডার!

ভীত হরিহর অসহায়ভাবে বলিলেন, বাবা কিন্তু এরই সঙ্গে কথা দিয়ে গেছেন যে!

কথা দিয়ে গেছেন ? কি ক'রে জানাল তুই ?

বাবার চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

এ যুক্তি অকাট্য। উভয়েই চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে পিসীমা অবশেষে বলিলেন, এক কাজ কর্ না হয় তুই, গুরুঠাকুরকে চিঠি লেখ্। তিনি জ্যোতিষীও বটেন, তোর কুষ্ঠিবিচার ক'রে সৎপরামর্শ দেবেন। এ তো এক মহা মুশকিলে পড়া গেল বাপু!

হরিহর তাহাই করিলেন। কয়েকদিন পরে কুলগুরু শিবকিঙ্কর শর্মার উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, তোমার পিতা যদি যথার্থই বাগ্‌দান করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে সত্যই অধর্ম হইবে জানিও। তোমার কোষ্ঠী-বিচার করিয়া তোমার বধূর যে বর্ণনা উদ্ধার করিলাম, তাহা জানাইতেছি। বাগ্‌দত্তা কন্যাটির সহিত যদি মিলিয়া যায়, তুমি নির্ভয়ে বিবাহ করিতে পার। বুঝিও, ইনিই তোমার বিধি-নির্দিষ্টা সহধর্মিণী। কন্যাটি গৌরবর্ণা, নাতি-দীর্ঘাঙ্গী, বিদুষী ও অচপলা হইবে। চরিত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রখরতা থাকিতে পারে, কিন্তু স্থিরপ্রজ্ঞাশালিনী ও চারিত্রিক শক্তিসম্পন্না হওয়াতে তাহা দুঃখের হেতু না হইয়া আনন্দেরই কারণ হইবে। কন্যার নামের আদ্যক্ষর 'ক' হওয়া উচিত। কন্যার পিতা সম্ভবত অধ্যাপক। তোমার একটা অপমৃত্যু-যোগ আছে দেখিতেছি, কন্যার কোষ্ঠীতে ইহার কোনও কাটান আছে কি না জানি না। যাই হোক, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়, অদৃষ্টও দুরতিক্রম্য। আমার মতে পিতৃ-আদেশ পালন করাই তোমার কর্তব্য।

বর্ণনার সহিত অনেকটা যখন মিলিয়া গেল, তখন হরিহর এবং হরিহরের পিসীমা বুঝিলেন, গত্যন্তর নাই, ভবিতব্যকে মানিতেই হইবে।

বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ করিয়া হরিহর যেদিন গ্রামে আসেন, সেদিন হরিহরের পিসীমা কম্পিতবক্ষে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পালকির ভিতর হইতে শেমিজ-কামিজ-জুতা-পরা কি অদ্ভুত জীবই না জানি বাহির হইবে, হয়তো প্রণাম না করিয়া শেকহ্যাণ্ড করিতে যাইবে, হয়তো বাড়িতে পা দিতে না দিতেই হরিহরের

হাত ধরিয়া বলিবে, চল, ফাঁকা মাঠে হাওয়া খাইয়া আসি, বিকালে বেড়ানো আমার অভ্যাস। কিন্তু পালকির ভিতর হইতে যখন চেলী-পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী নতমুখী সিঁথি-মউর-শোভিতা অলক্তকচরণা কুন্তলা সসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল, তখন আনন্দে বিস্ময়ে তিনি কাঁদিয়াই ফেলিলেন। যতদিন সংসারে ছিলেন, তাঁহার সে বিস্ময় এবং আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কুন্তলার প্রশংসায় তিনি শতমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বউ শুধু এম.এ.-পাসই নয়, শাক চচ্চড়ি সুক্তো হইতে আরম্ভ করিয়া সব রকম রান্না করিতে জানে, বড়ি দিতে পারে, চমৎকার আলপনা দেয়, চরকা কাটে, এমন কি ইতুপূজা পর্যন্ত জানে। হরিহরের মনেও যে ভয়টুকু হইয়াছিল, তাহা অল্প পরিচয়েই কাটিয়া গেল। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণ-গৃহিণী হইবার যোগ্যতা কুন্তলার আছে। ইহা লইয়া বেশি উচ্ছ্বসিত অবশ্য তিনি হন নাই, বিবাহরূপ কর্তব্যকর্ম সমাপন করিয়া নিজের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় সহজভাবেই চলিতেছিলেন। ইহাই কুন্তলার বিবাহের ইতিহাস।

কুন্তলা জাব কাটিতেছিল।

ঝকৃস্থর পুত্র রামলাল একটি খাতা ও বই লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল বেশ কায়দা-দুরস্ত করিয়া ছাঁটা। গায়ের হাফশার্ট এবং হাফশার্টের হাতা হইতে আধুনিক রীতিতে ছোট একটা ত্রিভুজাকৃতি অংশ বাদ দেওয়া। পায়ে বক্‌লস-শোভিত জুতা। সে যে ঝকৃস্থর পুত্র, তাহা না জানিলে বোঝা শক্ত। এবারে সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। বহুমাঈজীর নিকট পড়া বলিয়া লইতে আসিয়াছে। রোজ আসে। সে বারান্দায় উঠিয়া বসিল এবং গতকল্য কুন্তলা যে যে অংশগুলি অনুবাদ করিতে দিয়াছিল, তাহা পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বিরক্তিতে কুন্তলার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। অজস্র ভুল। রামলালকে লইয়া আর পারা গেল না। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষণেরও যে লিঙ্গ আছে, এই সামান্য

কথাটা কিছুতেই ইহার মাথায় ঢুকিবে না। তাব কাটিতে কাটিতেই কুন্তলা সংশোধন করিতে লাগিল।

১৮

মাঘ মাসের শীত। সকাল হইতে একটা প্রখর পশ্চিমে হাওয়া উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল, রৌদ্রকিরণে চতুর্দিক ঝলমল করিতেছে, তবু কনকনে শীত, হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছে। আঙুলের ডগাগুলি বরফ-শীতল। গায়ে গেঞ্জি, সার্জের পাঞ্জাবি, মোটা সোয়েটার, তবু শীত করিতেছে। শঙ্কর উঠিয়া ওভারকোটটা গায়ে দিল।

ছিত করচে ?

খুকী মন্তব্য করিল। খুকীর শীত নাই। একটা সাধারণ জুট ফ্ল্যানেলের ফ্রক তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরের কোণে একটি টুলের উপর বসিয়া এবং আর একটি উচ্চতর টুলের উপর খাতা রাখিয়া একটি পেন্সিল সহযোগে সে হিজিবিজি কাটিতেছিল। লিখিবার সময় শঙ্কর যেমনভাবে বসে ঠিক তেমনিভাবে একটু ঝুঁকিয়া টুলের উপর বাম কনুইয়ের ভর দিয়া বসিয়াছে। যদিও আজকাল কাগজ পেন্সিল দুর্মূল্য, তবু তাহাকে একটা ছোট পেন্সিল এবং পুরাতন খাতা দিতে হইয়াছে। সে চিঠি লেখে। বাবা যাহা যাহা করে, সব তাহার করা চাই। এমন কি, পোড়া সিগারেটের টুকরা কুড়াইয়া সে বাবার মত 'ছিগ্‌লেট'ও খায়।

বড্ড শীত করছে।

তা কাবে ?

খাব।

মাকে ব'লে আতি।

পাকা গৃহিণীর মত মুখ করিয়া খুকী রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

শঙ্কর খবরের কাগজটি মুড়িয়া রাখিয়া দিল। এতক্ষণ সে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। জাপান ও জার্মানির যুদ্ধোদ্যম আশঙ্কাজনক। ভারতবর্ষের

যুদ্ধে যোগদান করা উচিত কি না, ইহা লইয়া নেতাদের মধ্যে বিতণ্ডা চলিতেছে। উচিত কি? শঙ্কর ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ক্ষণপরেই মনে হইল, আদার ব্যাপারী শুধু শুধু জাহাজের ভাবনা ভাবিয়া মরিতেছি কেন। যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানও যেমন তাহার অসম্পূর্ণ, সম্পর্কও তেমনি অসংলগ্ন। বহু সহস্র মাইল দূরে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে, এ দেশের উলুখড়দেরও আপাতত চিন্তিত হইবার কোন হেতু নাই। যুদ্ধ এ দেশে উপস্থিত হইলে যথাকর্তব্য চিন্তা করা যাইবে। যুদ্ধ সম্পর্কে কোন প্রেরণা তাহার মনে জাগিল না।

কট কট কট কট কট···

'তাসা' বাজিতেছে। মহরম আসিয়া পড়িল নাকি? এইবার দলে দলে মুসলমান প্রজারা আসিয়া ধারের জন্য দ্বারে ধরনা দিবে। যে উদ্দেশ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। স্থির হইয়াছিল যে, চাষের জন্যই চাষীদের ধার দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহারা ভাল বীজ, ভাল সার, ভাল গরু কিনিয়া ভালভাবে চাষ করিতে পারে। ভাল ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে। কাযকালে কিন্তু দেখা গেল যে, প্রত্যেকটি চাষা ধার চায়—হয় বিবাহের জন্য, না হয় মহাজনদের ধার শোধ করিবার জন্য, কিংবা কোন পর্ব উপলক্ষ্যে। ভাল ফসল উৎপন্ন করিবার দিকে তাহাদের তত উৎসাহ নাই। তাহারা জানে যে, যত ভাল ফসলই তাহারা উৎপন্ন করুক না কেন, সে ফসল তাহাদের ভোগে কখনও লাগিবে না। তাহা মহাজনে গ্রাস করিবে। যে ঋণজালে তাহারা জড়িত, প্রত্যেক বছর ফসল দিয়াই সে ঋণের খানিকটা পরিশোধ করিতে হয়, অনেক সময় মহাজন মাঠ হইতেই ফসল কাটাইয়া লইয়া যায় এবং নিজের খুশিমত একটা মূল্য ধার্য করিয়া দেয়। তাহারা জানে যে, ফসল যত ভাল হোক, ঋণ কখনও পরিশোধ হইবে না। মহাজন ফসলের দাম যাহা দিবে তাহাই তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, কারণ ওই মহাজনরাই বিপদে-আপদে টাকা ধার দেয়, মহাজনদের ধারে

তে পাতিয়া জীবন-ধারণ করিতে হয়, মহাজনরাই মালিক। বহু যুগ ধরিয়া কার্যত ওই মহাজনদেরই ক্রীতদাস তাহারা। মহাজনদের ঘরে দশ মণের জায়গায় বিশ মণ ফসল পৌছাইয়া দিলে যদি সত্যই তাহারা ঋণমুক্ত হইতে পারিত, সে চেষ্টা তাহারা নিশ্চয়ই করিত। কিন্তু অধিকাংশ চাষারই জমি সামান্য, কিন্তু ঋণ প্রচুর। সুদের চক্রবৃদ্ধিতে সে ঋণ পর্বতপ্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। সে পর্বত ধূলিসাৎ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দেশের আইন তাহাদের অনুকূল নয়, চাষের উন্নতি করিয়া ঋণ-শোধ করিবার আশাও তাহারা করে না। ভাল সার, ভাল গরু, ভাল বীজ লইয়া কি করিবে তাহারা? ঋণমুক্ত হইবে? অসম্ভব। বংশপরম্পরা ধরিয়া এই সত্য তাহারা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে যে, ঋণ আছে এবং থাকিবে। তাই বলিয়া কি বিবাহ করিতে হইবে না? হোলি, ছট, দশমীতে দুদিন নূতন কাপড় পরিতে হইবে না? কোন সামাজিক অপরাধে হুক্কাপানি বন্ধ হইলে গোতিয়াদের আহারে তুষ্ট করিয়া জাতে উঠিতে হইবে না? ইহাই তো তাহাদের জীবন। চাষের উন্নতির জন্য নয়, এই জীবনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্যই তাহাদের টাকার দরকার। এই জীবনের দুঃখ-দুর্দশা হইতে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইবার নিমিত্তই তাহারা তাড়ি মদ গাঁজা আফিং খায়। এসব বাদ দিয়া তাহারা বাঁচিবে কিসের আশায়! তাই তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত নৈতিক বক্তৃতা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্মে প্রবেশ করে না। তোমাদের মত তাহারাও জীবনকে ভোগ করিতে চায়। শঙ্কর ইহা বোঝে, তাই আর আপত্তি করিতে পারে না। লিখিত আইন অমান্য করিয়াও ধার দিয়া ফেলে। মহরমের বাজনা শুনিয়া তাই সে মনে মনে বিব্রত হইয়া পড়িল। চাষের মিথ্যা অজুহাতে আবার একদল লোককে একগাদা টাকা দিতে হইবে। অথচ না দিয়াও উপায় নাই। এ এক মহাসমস্যা। এবার কিন্তু সে টাকা দিবে না ঠিক করিয়াছে। সেবার অত টাকা মহাজনদের সিন্দুকে ঢুকিয়াছিল। এবার সে টাকা দিবে না, জিনিস কিনিয়া দিবে। নিপুদা আর নিমাই ঘটক যদি সাহায্য করে, অনায়াসেই উহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনিয়া দেওয়া যায়। মেয়েদের জিনিস

হাসি কিনিতে পারে। হাসিও এক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। হাসির তত্ত্বাবধানে ও কার্যকুশলতায় মেয়ে-স্কুলটার বেশ উন্নতি হইতেছিল। কিন্তু জন-কয়েক শিক্ষিত বেহারী-ভদ্রলোক একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। হাসি 'হিন্দী-নোইং' নয়। কাজ-চলা-গোছ হিন্দী সে অবশ্য শিখিয়াছে, কিন্তু হিন্দী পরীক্ষা পাস না করিলে গভর্মেণ্টের চক্ষে 'হিন্দী-নোইং' হওয়া যায় না। পরীক্ষা পাস করিতে হইবে। হাসি পরীক্ষা দিতে রাজী নয়। যাঁহারা 'হিন্দী-নোইং' শিক্ষয়িত্রীর জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারা যে হিন্দী ভাষার প্রতি অথবা বেহারী সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিবশত করিতেছেন, তাহা নয়। তাঁহাদের সর্ববিষয়ে বাঙালীদের অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া এ ধারণা হয় না যে, স্বকীয় বেহারী বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহারা খুব বেশি অবহিত। এই শিক্ষিত বেহারীগণ বাঙালীদেরই মত চাকরিলোলুপ, বাঙালী পোশাক পরেন, ছেলেমেয়েদের বাঙালী নাম রাখেন, বাঙালী আহার পছন্দ করেন, বাঙালীদের সাহিত্য হইতে চুরি করেন; কিন্তু বাঙালীদের দেখিতে পারেন না। ইংরেজ সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীদের মনোভাব ছিল, বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সম্পর্কে ইঁহাদের ঠিক সেই মনোভাব। হাসি যে স্কুলের উন্নতির জন্য এত পরিশ্রম করিতেছে, তাহা ইঁহাদের নিকট অবান্তর ব্যাপার, আসল কথা—হাসি 'বাঙালিনী,' তাহাই তাহার চরম অপরাধ। কোন একটা ছুতা করিয়া তাহাকে তাই তাড়াইতে হইবে। মেষশাবককে বধ করিবার জন্য নেকড়ে বাঘের ছুতার অভাব কোন কালে হয় না। শিক্ষা-বিভাগের আইনও তাঁহাদের সপক্ষে আছে।

যাহারা ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত তাহাদেরই এই মনোভাব। অশিক্ষিত জনসাধারণ হাসিকে ভালবাসে, ভক্তি করে। শঙ্কর বারম্বার এই সত্যটি নানারূপে উপলব্ধি করিতেছে, যত গলদ যত কলহ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই। শিক্ষা-বিভাগের আইনের কবলে নিমাই বেচারাও কবলিত। এই সব কারণে তাহার স্কুলগুলি গভর্মেন্ট-সম্পর্করহিত করিবার ইচ্ছা শঙ্করের কিছুদিন পূর্বে হইয়াছিল। গভর্মেণ্ট যে টাকা সাহায্য করেন তা যৎসামান্য, সে সাহায্য না লইয়াও শঙ্কর স্কুলগুলি চালাইতে পারে। কিন্তু

অন্য মুশকিল আছে। ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের কলমের খোঁচায় কাঁটাপোখর স্কুলটি যখন গভর্মেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল, তখন স্কুলটা উঠিয়াই গেল। অর্থাভাবে নয়, ছাত্র জুটিল না। যে স্কুল হইতে পাস করিয়া গভর্মেণ্টের 'নোক্‌রি' মিলিবে না, সে স্কুলে কেহ পড়িতে চায় না। কেহই 'শিক্ষা' চায় না, সকলেরই উদ্দেশ্য 'নোক্‌রি'। গভর্মেণ্ট-অনমুমোদিত 'জাতীয়' স্কুলে ছাত্র জুটিবে না। এ মনোভাব যদিও প্রশংসনীয় নয়, তবু শঙ্কর ভাবিয়া দেখিয়াছে, 'নোক্‌রি'র লোভে তবু খানিকটা শিক্ষা তো হয়, তাহাই মন্দের ভাল। নিমাই আইনত নিজেকে 'কোয়ালিফাই' করিতেছে। মুরগী-মদ-পরিতুষ্ট ইন্‌স্পেক্টর দয়া করিয়া তাহাকে 'টাইম' দিয়াছেন। হাসিকেও রাজী করাইতে হইবে। হাসি দিন দিন কেমন যেন গম্ভীর হইয়া পড়িতেছে। মুখে হাসি নাই, প্রসন্নতা নাই,—চোখে কেমন যেন একটা দৃষ্টি। কোথাও যায় না, কাহারও সহিত মেশে না। নিজের ছেলেকেও কাহারও সহিত মিশিতে দেয় না। নিখুঁত নিষ্ঠার সহিত কর্তব্যটুকু করিয়া নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। অমিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিল, আলাপ জমে নাই। খুব কম কথা বলে, মনে হয়, সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক সেইটুকুরই উত্তর দিয়া চুপ করিয়া যায়। ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়া করিয়া আলাপ জমানো যায় না। অমিয়ার আর হাসির কাছে যাইবার উৎসাহ নাই। সুরমা কিন্তু মাঝে মাঝে যায়। কারণ সুরমার জীবনের একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী আছে, তদনুসারে সে নিয়মিতভাবে সামাজিক কর্তব্যগুলি করিয়া যায়। কবে কাহার বাড়ি যাইতে হইবে, কাহার বাড়িতে কবে কোন্ খাবারটি পাঠাইতে হইবে, কোন্ মেয়েটিকে কবে কোন্ গানটি শিখাইতে হইবে, কবে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে—এ সমস্তই সুরমা বাঁধা-নিয়ম অনুসারে করে। ঠিক নিয়মিতভাবে আসন বুনিয়া চলিয়াছে। অথচ উৎপলের সম্বন্ধেও সে উদাসীন নয়, উৎপলের জন্য অন্তত একটি খাবার তাহার নিজের হাতে করা চাই, উৎপলের অনেক চিঠির জবাব সে-ই লেখে। পড়াশোনাও করে। পাড়ার কয়েকজন বাঙালী ও বেহারী মেয়েকে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলাতেও উৎসাহিত করিয়াছে। কুন্তলার সহিত

তর্ক করিবারও অবসর পায়। তুমুল তর্ক করিয়া বন্ধুত্বও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। অদ্ভুত রকম ছন্দোময় তাহার জীবন। অদ্ভুত রকম মাত্রাজ্ঞান আছে। অমিয়ার সহিত যখন কথা কয়, মনে হয়, শিক্ষায় দীক্ষায় সে অমিয়ারই সমান। ঠিক সমান স্বচ্ছন্দতার সহিত সে সেদিন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মেমসাহেবের সহিতও আলাপ করিল। কোথাও কখনও বেসুরা হয় না। সুরমার কর্মতৎপরতায় শঙ্কর মুগ্ধ। বহুকাল পূর্বে এই সুরমাকে ঘিরিয়া তাহার মনে যে মোহ জাগিয়াছিল, সে মোহ এখন কিন্তু আর নাই। নিজের স্ত্রীরূপে অমিয়ার স্থানে সুরমাকে সে কল্পনাই করিতে পারে না। সুরমা কারুকার্যমণ্ডিত পালঙ্ক, অমিয়া হয়তো অতি সাধারণ তক্তাপোশ। কিন্তু সুনিদ্রার জন্য শঙ্করের পালঙ্কের আর প্রয়োজন নাই, তক্তাপোশই যথেষ্ট। বস্তুত পালঙ্কে হয়তো মোটেই নিদ্রা আসিবে না, এ আশঙ্কাও আছে। না, সুরমাকে ঘিরিয়া সে মোহ তাহার আর নাই। তবু সুরমা-চরিত্রে সে মুগ্ধ।

বাবুজী!

দ্বারপ্রান্তে রহিম দেখা দিল। তাহার সহিত পুরণও আসিয়াছে। মহরমে কি কি জিনিস লাগে, তাহারই আলোচনা করিবার জন্য শঙ্কর রহিমকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। শঙ্কর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিতেই রহিম এবং পুরণ উভয়েই সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুরণের কি খবর?

পুরণ কোন উত্তর না দিয়া সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর তখন রহিমকে বলিল, মহরমে তোদের কি কি হয়, বল্ তো? এবার আর টাকা পাবি না কেউ, জিনিস কিনে দেব ভাবছি। মহরমে কি কি করবি বল্?

রহিম নিজের ভাষায় মহরম-পর্ব বর্ণনা করিতে লাগিল।

আমরা যেমন পূজা-পার্বণে একজন পুরোহিত নিযুক্ত করি, উহারাও তেমনই একজন 'মোজাবর' নিযুক্ত করে। 'মোজাবর'কেই সব করিতে হয়। আমাদের দুর্গাপূজায় যেমন ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী আছে, মহরমেও তেমনই আছে। 'ছট্‌মী'র দিন দুইটি কর্তব্য। প্রথম—'কেলা কাট্টি'।

কালে কলার গাছ কাটিতে হয়। তাহার পর পাড়ার লোক দল বাঁধিয়া গিয়া 'ইমামবাড়া'তে সমবেত হইয়া সেই কলাগাছ পুঁতিয়া আসে। বৈকালে দ্বিতীয় কর্তব্যটি করা হয়। দ্বিতীয় কর্তব্য—নদী হইতে মাটি আনা। পরিষ্কার মাটির গামলায় সে মাটি রাখিয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া তাহা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। এই হইল 'ছট্‌মী'র কাজ। সপ্তমীর দিন 'সুনসান', অর্থাৎ বিশেষ কিছু করিবার থাকে না। 'অঠ্‌মী'র দিন কিন্তু অনেক কাজ। সেদিন ইমামবাড়াতে শরবত এবং তিল-চৌরি লইয়া যাইতে হয়। 'তিল-চৌরি' চাল চিনি এবং তিল দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টান্ন, প্রত্যেকে বাড়ীই তৈয়ারি করে। শরবত এবং তিল-চৌরি ইমামবাড়াতে লইয়া যাইবার পর 'মোজাবর' নেমাজ পড়েন। সেই নেমাজ-পূত শরবত তিল-চৌরি ঘরে আনিয়া রাখা হয়। তাহার পর 'মলিদা' বানাইয়া কিছু বুঁদিয়া এবং লাল পাতা উহার উপর দিয়া মূরতজ আলির পাঞ্জার নিকট লইয়া গিয়া ভোগ দেওয়া হয়। ভোগ দিবার পর সেগুলি ঘরে আনিয়া সকলে মিলিয়া খায়। সেই 'অঠ্‌মী'তেই রাত দুইটার সময় 'তাসা' বাজিয়া উঠে। মাটির কড়ার উপর চামড়া দিয়া এই বাদ্যটি প্রস্তুত, কোমরের কাছে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাঠি দিয়া বাজাইতে হয়। 'তাসা' বাজিলেই সকলে নিজেদের নিশান-তাজিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাজিয়ানিশানসমন্বিত এক-একটা দলকে 'আখাড়া' বলে। আপন আপন আখাড়া লইয়া তাসা বাজাইতে বাজাইতে লাঠি খেলিতে খেলিতে সকলে মূরতজ আলির বাজারে যায়। সেখানে নিশান নামাইয়া ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে। তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসে। 'নউমী'র দিন দিনে কিছু হয় না, রাত্রে একটু ভালো আহারের ব্যবস্থা থাকে সেদিন; পোলাও হয়। রাত্রি নয়টা দশটা নাগাদ পোলাও লইয়া মোজাবর-সহ সকলে ইমামবাড়াতে যায়। সেখানে 'ফতেহা' হয়। মোজাবর 'দোয়া' মানে, অর্থাৎ সকলের জন্য ভগবানের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বাড়িতে সেই পোলাও আহার করে। ইহার সঙ্গে মাংসও থাকে। রাত্রি দুইটার সময় আবার 'তাসা' বাজিয়া উঠে। আবার সকলে 'আখাড়া' লইয়া বাহির হয়, পূর্বদিনের মত

মুরতজ আলির বাজারে যায়, সেখানে নিশান-তাজিয়া নামাইয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে, ভোর হইতে না হইতে আবার বাড়ি ফিরিয়া আসে। 'দশমী'র সকালবেলাটা স্নানাদি করিয়া গত রাত্রির শ্রম অপনোদন করিতেই কাটিয়া যায়। অপরাহ্ণে বেলা দুইটা নাগাদ আবার আখাড়া বাহির হয়। সেদিন চতুর্দিক হইতে 'আখাড়া' আসিয়া রাস্তার চৌমাথায় জমিতে থাকে। সেখান হইতে সকলে 'কারবালা'য় যায়। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী যাহার আখড়া আগে যাইবার আগে যায়, যাহার পিছনে যাইবার কথা সে পিছনে থাকে। আগে-পিছে যাওয়া লইয়া অনেক সময় দাঙ্গাও বাধে। কারবালায় পৌঁছিয়া 'দফ্না' দিতে হয়। নিশানে নিশানে কাগজের যে ফুল থাকে, সেই ফুলগুলিকে ছোট ছোট পরিষ্কার কাপড়ের টুকরায় বাঁধিয়া কবর দেওয়া হয়, কবরের ভিতর 'কফন' থাকে। এই কাগজের ফুল কবর দেওয়াই দফনা দেওয়া। দফ্না দিবার পর নিশানগুলির সম্মুখে 'শির্নি' দিয়া সকলে আপন আপন বাড়ি ফিরিয়া যায়। এই উপলক্ষ্যে কারবালার কাছে মেলা বসে, অনেকে সেখানে জিনিসপত্র কেনে। দশমীর পর চার দিন কাটিয়া গেলে 'ফুল-পান' হয়। সকলে পানের সহিত এক টুকরা ফুল চিবাইয়া খায়। ইহা হাসান-হোসেনের মৃত্যুদিবস পালন। চল্লিশ দিন পরে 'চলিশ মা' হয়। আবার 'আখাড়া' লইয়া মুরতজের কাছে সকলে যায়। ইহাকে 'চেহেলুম'ও বলে অনেকে।

বর্ণনা শেষ করিয়া রহিম বলিল যে, সে এবার মানত করিয়াছে নিশান চড়াইবে।

তোরাও হিন্দুদের মত মানত করিস নাকি?

শঙ্করের অজ্ঞতা দেখিয়া রহিম হাসিল। তাহারা মানত করে বইকি। কেহ নিশান চড়ায়, কেহ হাত বাঁধে, কেহ দুল পরে। অনেক হিন্দুও মহরমে মানত করে, এই পুরণই তো এবার হাত বাঁধিয়াছে।

তাই নাকি?

পুরণ সসংকোচে একটু হাসিল।

ইতিপূর্বে শঙ্করের অনেকবার মনে হইয়াছে, এখন আবার মনে হইল,

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা লইয়া জিন্না-সাভারকরের যে দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক গজকচ্ছপ যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে, সে দ্বন্দ্ব ইহাদের মধ্যে নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে মংলার বউটা একটা সদ্যোজাত শিশু রাখিয়া মারা গিয়াছে। প্রায় একই সময়ে আলিজানেরও ছেলে হইয়াছিল। আলিজানের বউ মংলার ছেলেকে স্তন্যদান করিয়া মানুষ করিতেছে। যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা খবরের কাগজের পাতায়, শিক্ষিত-সমাজের বক্তৃতা-মঞ্চে, রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সে বিষ উদ্গীরণ করে, সে সমস্যা ইহাদের মধ্যে নাই। সে সমস্যা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের, ইহাদের নয়। ইহাদের একটি সমস্যাই আছে, তাহা দারিদ্র্য। সেই নিদারুণ সমস্যার প্রবল চাপে ইহারা সকলেই এক জাত হইয়া গিয়াছে। সকলেই বিপন্ন। বাহিরের ধর্ম যাহাই হউক, অন্তরে সকলে এক। ইহারা মহরমই করুক আর 'ছট'ই করুক, সকলেই দেবতার কাছে মানত করে, একই ভাষায় একই প্রার্থনা জানায়—ভগবান, আমাদের বাঁচাও।

রহিম পুরণ উভয়েই টাকা ধার চাহিল। চাহিলে এ লোকটি যে 'না' বলিতে পারে না—এ খবর ইহারা জানিয়াছে, তাই ইহারই কাছে বার বার ছুটিয়া আসে। কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে এমনভাবে কত টাকা সে দিতে পারে? জিনিস কিনিয়া দিলেই বা কি সুবিধা হইবে? জিনিস কিনিতেও টাকা লাগিবে, অথচ ইহারা সুখী হইবে না। নিজেদের উৎসবে নিজেরা জিনিস কিনিলে যে আনন্দ হয়, পরের দেওয়া জিনিসে ঠিক সে আনন্দ হয় না। সে আনন্দে ইহাদের বঞ্চিত করার কি অধিকার আছে তাহার?

টাকা নিয়ে যে মহাজনদের ধার শোধ করবে, তা হবে না।

নেই বাবু নেই, কিরিয়া খিলা লিজিয়ে।

উভয়েই সমস্বরে শপথ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ইহাদের শপথও যে সব সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা শঙ্কর বলিতে যাইতেছিল; হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, এই নিদারুণ শীতে উভয়েই অতি জীর্ণ সুতির চাদর জড়াইয়া আছে, পরিধানেও অতি মলিন ছিন্ন বসন, হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে নাই। অথচ সে কোটের উপর ওভারকোট চড়াইয়াছে!

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আর সে তুলিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, কাল আসিস, দেব।

উভয়ে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

আবার শঙ্করের মনে প্রশ্ন জাগিল, ব্যাঙ্কের টাকা এমনভাবে খরচ করা কি ঠিক হইতেছে? সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, ব্যাঙ্কের যদি কিছু ক্ষতি হয়, আমিই না হয় তাহা নিজের টাকা হইতে পূরণ করিয়া দিব। নিজের টাকা! নিজের কত টাকা আছে তাহার! উৎপল তাহাকে যে বেতন দেয়, তাহার সমস্তই তো খরচ হইয়া যায়। পৈতৃক কিছু টাকা অবশ্য রাজীবলোচনের কাছে জমা আছে, (অম্বিকাবাবুর রাজীবলোচনের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল) কিন্তু সে টাকার পরিমাণ কত শঙ্করের জানা নাই। পিতা যে উইল করিয়া তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, এই অভিমানে সে এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধানই করে নাই এতদিন। রাজীবলোচনের কাছে যত টাকাই থাক, তাহা ধর্মত অমিয়ার। উইল সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু টাকা খরচ করিবার অধিকার তাহার নাই।

তোমার আদুরে মেয়েকে নিয়ে আর পারি না বাপু, সমস্ত দেশলাই-কাঠিগুলো বাক্স থেকে বার ক'রে মেঝেময় ছড়িয়েছে।

অমিয়া খুকীকে দুম করিয়া বসাইয়া চলিয়া গেল।

খুকী কাঁদিল না। তাহার সমস্ত মুখে যেন আহত আত্মসম্মান মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিস্ফারিত চক্ষুর কোণে অশ্রুর আভাস, ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে।

মা দুষ্টু, এস তুমি আমার কাছে।

মুহূর্তে সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হইল, হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল. শঙ্করের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, বাবা বালো।

অমিয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল।

চায়ের কথা ঠিক বলেছে গিয়ে তা হ'লে!

তক্ষুনি। উনুন জোড়া ছিল ব'লে দেরি হয়ে গেল।

খুকী শঙ্করের বুকের উপর চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

যা আদুরে করছ মেয়েটিকে, বুঝবে মজা। দুধ খাবি চল্।

আমি ভুড কাব না। বাবার তন্দে তা কাব।

শঙ্কর হাসিয়া উঠিল।

দেখেছ আস্পর্দ্ধা! চল্।

অমিয়া জোর করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

না না না।

আচ্ছা, একটু চা দিচ্ছি, দুধ খাও গিয়ে। লক্ষ্মী তো—

ডিসে একটু চা ঢালিয়া দিতে হইল। খুকী অমিয়ার কোল হইতে ঝুঁকিয়া তাহা পান করিতেছে, এমন সময় বাড়ির উঠানে কোঁকর-কোঁ শব্দে মুরগী ডাকিয়া উঠিল।

ঝম্মু!

হ্যাঁ, ঝম্রু এসেছে, চল্।

খুকী আর যাইতে আপত্তি করিল না।

চা-পান শেষ করিয়া শঙ্কর আবার ঈজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িল। নানা চিন্তার আলো-ছায়ায় তাহার মনটা বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। কাছে দূরে সবত্র মহরমের বাজনা বাজিতেছে। কিন্তু এই বাজনার অন্তরালে অপরিশোধ্য ঋণের যে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই কাহিনীটাই শঙ্করের অন্তরে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এত করিয়াও কিছু হইতেছে না। ইহারা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। সকলেরই অর্থাভাব। কাহারও সচ্ছলতা নাই। এমন কি, তাহার নিজেরও। টাকা টাকা টাকা—সকলেরই ওই এক চিন্তা।

১৯

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পাইয়া শঙ্করকে কলিকাতা চলিয়া যাইতে হইল। যে অ্যাড্ভোকেট জীবন চক্রবর্তীকে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাইয়া চিঠি দিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতাবাসী। তিনিই শঙ্করকে অবিলম্বে কলিকাতা যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। কলিকাতার লোককে দিয়া কাজ

করানোর নানারূপ অসুবিধা আছে। তথাপি দুইটি কারণে এই ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। প্রথমত, ইনি উৎপলের বন্ধু। দ্বিতীয়ত, ও অঞ্চলের কোন ভাল উকিল কেনারাম চক্রবর্তীর পুত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে রাজী নহেন। মনে মনে কেনারাম চক্রবর্তীর উপরে সকলেই চটা, কিন্তু খোলাখুলিভাবে তাহা প্রকাশ করিতে সকলেই অনিচ্ছুক। লোকটাকে সবাই ভয় করে। জীবন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা করার ইচ্ছা শঙ্করের তেমন ছিল না, কিন্তু উৎপল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন কথাটা তুলিয়াছে এবং সমস্ত টাকা যখন উৎপলেরই, তখন না করিবার আর সঙ্গত উপায় রহিল না। মকদ্দমা করিতে অস্বীকার করিলে উৎপল হয়তো আপত্তি করিত না, কিন্তু ওই 'হয়তো' জিনিসটা বড়ই অনিশ্চিত, বিশেষত টাকাকড়ির ব্যাপারে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করাই নিরাপদ। উৎপল যদিও তাহাকেই সর্বময় কর্তা করিয়া রাখিয়াছে, তবু সে যেন স্বাধীন নয়, একটা অদৃশ্য পরাধীনতার বন্ধন তাহাকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কিছুতেই সে যেন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। নেপথ্যবাসী উৎপল নীরবে থাকিয়াও যেন তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। কেন এমন হয়? ট্রেনে বসিয়া শঙ্কর এই কথাটাই ভাবিতেছিল। মনটা ভাল ছিল না। অনেকদিন পরে অমিয়াকে, বিশেষত খুকীকে, ছাড়িয়া আসিয়া সে কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। আসিবার সময় মেয়েটা বড় কাঁদিয়াছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দায়ে পড়িয়া তাহাকে যাইতে হইতেছে। কি দরকার ছিল এই কলহ করিবার? সে কেন সোজাসুজি উৎপলের প্রস্তাবে আপত্তি করিল না? কেন তাহার এই দীনতা?

ট্রেন চলিতেছে। দুই ধারে চাষের জমি। কৃষিপ্রধান দেশ। জমিই এ দেশের সব। চাষের উন্নতি হইলেই এ দেশের উন্নতি। চাষের উন্নতির জন্যই ইঁদারা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই ইঁদারাকে কেন্দ্র করিয়াই মকদ্দমা বাধিয়াছে। সহসা শঙ্করের একটা কথা মনে হইল, ইঁদারা করাইয়া লাভ কি? মকদ্দমায় জিতিয়া জীবন চক্রবর্তীর নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করিয়া পুনরায় পঁচিশটি ইঁদারা করাইয়া দেওয়া যদি সম্ভবও হয়, তাহা হইলেই কি চাষীদের দুঃখমোচন হইবে? যে অঞ্চলে জলকষ্ট নাই, সে

অঞ্চলের চাষীরাই কি সুখী? তাহা তো নয়। সকলেই দুঃখী, সকলেই ঋণগ্রস্ত, সকলেরই টাকার অভাব। টাকা রোজগার করিবার জন্যই প্রত্যহ দলে দলে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া ফ্যাক্টরিতে, কলিয়ারিতে, চা-বাগানে চলিয়া যাইতেছে। সকলেরই টাকার দরকার। টাকা না থাকিলে জমিদারের খাজনা দেওয়া যায় না, মহাজনের ধার শোধ হয় না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা যায় না, এমন কি বিবাহ পর্যন্ত করা যায় না। প্রতি পদক্ষেপে নগদ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু টাকা তাহারা কিছুতেই পায় না। যে টাকার লোভে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে ছুটিয়া যায়, সে টাকা তাহারা শহরেও সংগ্রহ করিতে পারে না। শহরে বাড়িভাড়া আছে, কাবুলিওয়ালা আছে, ঘুষ আছে, মদের দোকান আছে। শহরের টাকা শহরেই রাখিয়া আসিতে হয়। শহরে বাস করিয়া তাহারা কেবল শহুরে হয়। বিলাসিতার নেশায় কুসংসর্গে জর্জরিত হইয়া পশুর মতই অবশেষে মরিয়া যায়। কয়েকটা ইঁদারা করাইয়া দিলেই কি ইহাদের দুঃখ ঘুচিবে? এক সময় ছিল, যখন তাহারা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়েই প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিস পাইত। দেশের রাজা খাজনা হিসাবে উৎপন্ন শস্যেরই অংশ লইতেন, টাকা চাহিতেন না। শস্যের বদলেই তাঁতি কাপড় দিত, নাপিত ক্ষৌরকার্য করিত, ধোপা কাপড় কাচিত, কুম্ভকার বাসন প্রস্তুত করিত, পুরোহিত পূজা করিতেন, অধ্যাপক টোল চালাইতেন। আজকাল কিন্তু সকলেই টাকা চায়। চাষীরা টাকা পাইবে কোথায়? তাহারা টাকা উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে শস্য। যে শস্য না হইলে পৃথিবীর কাহারও চলে না, সেই শস্য যাহারা রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া উৎপান্ন করে, তাহারাই আজ টাকার ফেরে পড়িয়া নিরন্ন বিবস্ত্র, আর আমরা তাহাদের আসল দুঃখটা না বুঝিয়া কেবল কতকগুলা বাঁধা বুলি কপচাইয়া মরিতেছি। আমরা তাহাদের নিকট টাকার দাবি করি বলিয়াই তাহারা তাহাদের কষ্টার্জিত শস্য লইয়া রক্ত-শোষক মহাজনদের দ্বারস্থ হয় এবং যে কোন মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করে। সারা বছরের খাইবার সংস্থানও অনেকের থাকে না, বীজের শস্যও অনেককে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। এই যেখানে

চাষের পরিণাম, সেখানে চাষের জন্ত জল সরবরাহ করিলে কতটুকু সুবিধা হইবে, যদি উৎপন্ন শস্তের পরিবর্তে তাহারা জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি না পায়? এ চাষ করিয়া লাভ কি তাহাদের? যত শস্তই হোক না, তাহা বিক্রয় করিয়া টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে, এবং তাহার দর ঠিক করিবে মহাজন, যে মহাজন পূর্বে টাকা ধার দিয়া সুদের সুদ করিয়া বসিয়া আছে। মহাজনরাও নিরুপায়। কারণ তাহারাও মহত্তর জনের নির্দেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য।

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল। চাষীদের নয়, খুকীকে নয়, অমিয়াকে নয়,—শৈলকে। সেই ফলসাগাছটার তলায় শৈল যেন দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। কোঁচড়ে মিত্তিরদের বাড়ির পেয়ারা। কোঁচড় হইতে একটা ডাঁশা পেয়ারা বাহির করিয়া শঙ্করকে দেখাইয়া ভুরু নাচাইয়া ঘাড় নাড়িল, তাহার পর তাহাতে কামড় দিল। সমস্ত মুখখানাতে দুষ্টামি মাখানো। হঠাৎ সে কাঁদিয়া উঠিল, শঙ্করদা, শিগগির এস, এটা পেয়ারা নয়, ওল, মুখ কুটকুট করছে আমার, শিগগির এস তুমি, এস না—। ছুটিয়া যাইতে গিয়া শঙ্কর হোঁচট খাইল। ঘুম ভাঙিয়া গেল। হঠাৎ এতদিন পরে শৈল আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিল কেন? শৈলর কথা তো সে বহুদিন ভাবে নাই। শঙ্কর উঠিয়া বসিল। শৈলর মুখখানাই চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। সত্যই পরলোক বলিয়া কিছু আছে নাকি? প্রায় চার বৎসর হইল, শৈল মারা গিয়াছে। যে সন্তানের জন্য তাহার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই সন্তান প্রসব করিতে গিয়াই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সন্তানটিও বাঁচে নাই। মিস্টার এল. কে. বোস আবার বিবাহ করিয়াছেন। অন্যমনস্ক হইয়া শঙ্কর শৈলর কথাই ভাবিতে লাগিল। ঠিক করিল, কলিকাতায় গিয়া তাহার নামে তর্পণ করিবে। হয়তো তাহার তৃষিত আত্মা এখনও কোথাও একবিন্দু জলের জন্য আশা করিয়া আছে। হয়তো—

ট্রেন একটা বড় স্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করিল। 'চা-গ্রম' 'গোশ্‌ত-রোটি' 'চাই কমলালেবু', যাত্রীদের কলরব, কুলীর চীৎকার, ট্রলির ঘড়ঘড়ানি,

হুড়মুড় করিয়া একটা প্রচণ্ড কোলাহল মনের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। শৈল কোথায় হারাইয়া গেল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

চার বৎসর পরে এই তাহার কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ। সেই যে গিয়াছিল, আর আসে নাই। কলিকাতার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে 'বিফল' দেওয়াল, রাস্তায় রাস্তায় পার্কে পার্কে ট্রেঞ্চ। রাত্রে ব্লাক-আউট। মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিতেছে। মাথার ওপর এরোপ্লেন ঘুরিতেছে। চায়ের দোকানে, বৈঠকখানায়, ট্রামে বাসে সর্বত্রই যুদ্ধের আলোচনা।—জাপান ক্রমশ আগাইয়া আসিতেছে, জওহরলাল কোন্ বক্তৃতায় কি বলিয়াছেন, মহাত্মাজীর স্বল্প দুই-চারিটি উক্তি হইতে কি আভাসিত হইতেছে, সে সবের সহিত বর্তমান যুদ্ধ-'পরিস্থিতি'র কি সম্পর্ক, এই সব লইয়াই কথা আলোচনা তর্ক। দীর্ঘ চার বৎসর পল্লীগ্রামে বাস করিয়া সে সত্যই যেন গেঁয়ো হইয়া গিয়াছে। বর্তমান জগতের রাজনৈতিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিবার প্রয়োজনই সে অনুভব করে নাই, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আগ্রহই নাই তাহার। একটা মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে বটে, তাহার আঁচ গৌণভাবে আমাদের গায়েও লাগিতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা ইতিপূর্বে এমন প্রত্যক্ষভাবে তাহার অন্তরকে বিচলিত করে নাই। সত্যই একটা কিছু হইবে নাকি? সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিল। আর এক মুশকিল, পুরাতন পরিচিত দলের কাহারও সহিত দেখা হইল না। সকলেই হয় অনুপস্থিত, না হয় অসুস্থ। কাহারও সহিত যে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিবে, তাহার উপায় নাই। নীরা, অনিল, পলাশকান্তি, রেণুকা, নিলয়কুমারের দল পলাশকান্তির সহিত আসাম-পরিভ্রমণে গিয়াছেন। প্রফেসর গুপ্ত পক্ষাঘাতে শয্যাগত, কাহারও সহিত দেখা করেন না। ভন্টু সে ঠিকানায় নাই। চুনচুনও ঠিকানা বদলাইয়াছে! খুঁজিলে হয়তো চুনচুনকে বাহির করা যায়, কিন্তু কি দরকার? চুনচুনের যে ছবিটি মনে আঁকা আছে, তাহাই তো চমৎকার। তাহার রূপ-পরিবর্তন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হইয়াছে, হয়তো সে সন্তান-সম্ভবা,

কিংবা হয়তো— না, দরকার নাই। বর্তমানের চুন্‌চুন আপন কক্ষ-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে যাইবার চলিয়া যাক। যে চুন্‌চুন একদা তাহার হৃদয়-হরণ করিয়াছিল, তাহার ছবিটাই অমর হইয়া থাক্‌ শুধু। চুন্‌চুন সম্বন্ধে মনের গহনে যে দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, এতদিন পরে সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া শঙ্কর নিজের কাছেই যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল: না, চুন্‌চুনের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা সে আর করিবে না।

সেকালে আর কে কে তাহার পরিচিত ছিল, ভাবিতে গিয়া অনেকের মুখ একে একে মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। রিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, মুক্তো, মুক্তোর সগোত্রবর্গ, ভন্টু, ভন্টুদের পরিবার, অরিজিনাল, প্রোটোটাইপ, নিবারণবাবু, আস্‌মি, দার্জি, অপূর্বকৃষ্ণ, বেলা মল্লিক, প্রফেসার গুপ্ত, মুকুজ্জেমশাই, মৃন্ময়, মিসেস স্যানিয়াল, হিরণদার দল, 'সংস্কার' পত্রিকার পূর্বতন কর্মচারীবৃন্দ, করালীচরণ, লোকনাথ ঘোষাল, ছোট বড় আরও কত লোক মনের পরদায় যেন মিছিল করিয়া আসিল এবং মিলাইয়া গেল। কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেহ অস্পষ্ট। ছায়া-ছবির মিছিল। কাহারও সম্বন্ধে কিন্তু মনের সে আগ্রহ আর নাই। এমন কি তাহার নিজের শ্বশুর-বাড়ির সম্বন্ধেও তাহার আগ্রহ অতিশয় কম। বিবাহের পর হইতে সে শ্বশুর-বাড়ি যায় নাই বলিলেও চলে। শিরীষবাবু মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন, মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইয়া অমিয়াকে লইয়া যান। পূজার সময়, জামাইষষ্ঠীতে কখনও কিছু টাকা, কখনও কিছু কাপড়-জামা পাঠান। ইহার অধিক কোনও সম্পর্ক নাই। শ্বশুর-বাড়ি দূরের কথা, নিজের মায়ের সহিতই বা তাহার নিবিড় সম্পর্ক কতটুকু? মা পাগলা-গারদে আছেন, মাসে মাসে তাঁহার জন্য সে টাকা পাঠাইয়া দেয়। মাঝে একবার রাঁচি গিয়াছিল, কর্তব্যবোধেই গিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মায়ের পাগলামি আরও যেন বাড়িয়া গেল। ডাক্তাররা দেখা করিতে মানা করিলেন। প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়া তাই সে নিশ্চিন্ত আছে। প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক থাকিলে সে কি ডাক্তারদের মানা শুনিত? সে কি মাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত? না, সত্য কথা বলিতে হইলে

বলিতে হয়, মায়ের সহিতও তাহার প্রাণের গভীর সম্পর্ক নাই। যাহা আছে, তাহা কর্তব্যের সম্পর্ক মাত্র। প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা বড় কঠিন। মনে যে সুর বাজে, সেই সুরের যাহারা সমঝদার তাহাদেরই সহিত কেবল অন্তরঙ্গতা হয়, বাকি সকলে পর। মনে চিরকাল এক সুর বাজে না। আপনজনও চিরকাল এক থাকে না। নূতন সুরের নূতন সমঝদার আসিয়া জোটে, সে-ই তখন অন্তরতম হয়। পুরাতন আপনজনেরা স্মৃতির ফলকে কখনও বা সামান্য চিহ্ন রাখিয়া, কখনও বা না রাখিয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যায়।

ট্রামের এক কোণে বসিয়া শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। ট্রামটা প্রায় খালি, সামনের দিকে আর একজন মাত্র যাত্রী বসিয়া আছেন। শঙ্কর একটা হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে সে কতক্ষণই বা থাকিতে পায়! সমস্ত দিনই ট্রামে-বাসে কাটিতেছে। মফস্বলের লোক অনেক দিন পরে কলিকাতায় আসিয়াছে, বহু লোকের বহু ফরমাশ আছে। কোনটা চাঁদনিতে পাওয়া যায়, কোনটা বড়বাজারে, কোনটা শ্যামবাজারে, কোনটা মিউনিসিপাল মার্কেটে। চরকির মত ঘুরিতে হইতেছে। অ্যাড্‌ভোকেট মহাশয়ের সহিতও পরামর্শটা সমাধা হয় নাই। সম্মুখে উপবিষ্ট যাত্রীটি শঙ্করের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিল।

আরে কে, শঙ্কর নাকি! অ্যাঁ, ছ্যা-ছ্যা, চিনতেই পারি নি! ভাবছিলুম, কে না কে—অ্যাঁ!

শঙ্করও এতক্ষণ চিনিতে পারে নাই। ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিল। ভন্টুর মেজকাকা, ওরফে বাবাজী, ওরফে মুক্তানন্দ। সেকালের গোঁফদাড়ি কিছুই নাই, সমস্ত কামাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই সহসা চেনা আরও কঠিন।

অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। তারপর, ভাল তো সব?

বাবাজী নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

চ'লে যাচ্ছে এক রকম।

ভন্টুর কাছে শুনেছিলাম, তুমি দেশে ফিরে গেছ। তা ভালই করেছ

এক রকম। কলকাতা ভদ্রলোকের বাস করবার অযোগ্য হয়ে পড়ছে ক্রমে। জাপান যদি অ্যাটাক করে, সকলকেই পালাতে হবে।

ভন্টুর খবর কি?

ভন্টুর চিঠিপত্র পাও না?

গোড়ায় গোড়ায় পেয়েছিলাম ছু-একখানা। তারপর আর পাই নি।

তাহার ঠিকানাটা কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, এমন সময় বাবাজী সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, আপিঙ খেলেই মানুষ জন্তু হয়ে যায়, ইন্‌জেক্‌শন নিলে কি আর রক্ষে আছে তার!

কে ইন্‌জেক্‌শন নেয়?

তোমার ভন্টু গো।

আপিঙের ইন্‌জেক্‌শন? মানে, মর্ফিয়া?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকম কি একটা যেন নাম তার।

মর্ফিয়া নেয়! কেন?

কেন আবার, নেশা। পায়ের হাড় ভেঙে মেডিকেল কলেজে যখন প'ড়ে ছিল, তখন সেখানকার ডাক্তাররা ওই ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দিয়ে ওর সর্বনাশটি ক'রে দিয়েছেন। এখন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-বেলা ও-বেলা ইন্‌জেক্‌শন না হ'লে চলে না; নিজেই পট পট ছুঁচ ফুটিয়ে নেয়।

অত মর্ফিয়া পায় কোথা?

পায় কোথা! শোন কথা একবার! পায় ডাক্তারদের মারফৎ। আজকালকার লক্ষ্মীছাড়া ডাক্তারগুলো পয়সা পেলে না করতে পারে হেন কাজ তো নেই। ফী পেলেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে দিচ্ছে।

বাবাজী হাত উলটাইয়া মুখভঙ্গী করিলেন।

ঘেন্না ধ'রে গেছে, বুঝলে, সমস্ত সংসারের ওপর ঘেন্না ধ'রে গেছে।

ভন্টুর ঠিকানাটা কি?

সে তো এখানে নেই। তার আপিস দিল্লীতে উঠে গেছে। সে এখন দিল্লীতে।

বউদিরা? বউদিরাও সেখানে নাকি?

ওরা তো বহুকাল হ'ল ভিন্ন হয়ে গেছে, এ খবর জান না বুঝি তুমি ?

না।

শঙ্কর আর কিছু বলিতে পারিল না।

বাবাজী কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া পকেট হাতড়াইয়া একটা পকেট-বুক বাহির করিলেন। সেটা একবার খুলিয়া কি দেখিয়া আবার সেটা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

ওদের খবর কতদিন জান না ?

ভন্টুর বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম, তারপর আর জানি না।

দাদা বেঁচে থাকতে কিছু হয় নি, তারপরই এই কাণ্ড।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বাবাজী পুনরায় বলিলেন, ভন্টুর বউ বড়লোকের মেয়ে, কাঁহাতক সে আর আঁস্তাকুড়ে হাঁটু গেড়ে বাসন মাজতে পারে, বল ?

বাবাজীর চোখে যেন একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলিয়া গেল। শঙ্কর যেন বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিল। যে ভন্টুকে সে চিনিত, সে যে স্ত্রীর পরিশ্রম-লাঘবের জন্য বউদিদির সহিত মনোমালিন্য করিয়া পৃথক হইয়া যাইতে পারে, এ কল্পনাও কোনদিন সে করে নাই।

বউকে বাসন-মাজা থেকে রেহাই দেবার জন্যে অবশ্য ভন্টু আলাদা হয় নি। আলাদা হ'ল একটা তুচ্ছ কারণে, আর তোমার ওই বউদির জেদে। ভয়ঙ্কর লোক তোমার ওই বউদিটি। আমি পট ক'রে মাঝ থেকে খামকা জড়িয়ে পড়লাম।

এমনভাবে শঙ্করের দিকে চাহিলেন, যেন শঙ্করই এজন্য অপরাধী। তাহার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ট্রাম আসিয়া মেডিকেল কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

আসল কারণটা তা হ'লে কি ?

আসল কারণ হ'ল—ভন্টুর ছেলেটা। ছেলেটা হয়ে উঠেছিল ভয়ানক আদুরে। কারণও ছিল। ভন্টু গ্রাহ্য করত না যদিও, কিন্তু ভন্টুর স্ত্রীর মনে একটা ক্ষোভ হ'তই যে, তার ছেলের ঠিক যত্ন হচ্ছে না। দুধ পেত না, খাবার পেত না, খেলনা পেত না, ভাল পোশাক পেত না; দিতে হ'লে সব ছেলেকেই

দিতে হয়, পয়সায় কুলোত না ভন্টুর। এ সমস্তর অভাব ভন্টুর স্ত্রী পূরণ করত আদর দিয়ে দিয়ে। ভন্টুর বউদি ছেলেটাকে সমীহ করত। ভয়ানক আদুরে ক'রে তুলেছিল ছেলেটাকে। যা হাতের কাছে পেত ভাঙত, বই পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলত, কেউ কিছু বলত না। হাতে কাঁচি পেলে তো রক্ষেই নেই, যা পাবে কেটে ফেলবে। ভন্টুর বই-খাতা কাগজ-পত্তর, এমন কি ভন্টুর একটা দামী স্যুট পর্যন্ত কাঁচি চালিয়ে দিলে একদিন সাবড়ে। দুপুরে সবাই ঘুমুত, ভন্টু আপিসে, বড় ছেলে দুটো স্কুলে, কর্তা সেই অবসরে সব জিনিস নষ্ট করতেন ব'সে ব'সে। রাগলে ভন্টুর চেহারা কি রকম হয়, তা নিশ্চয় তোমার অজানা নেই। আপিস থেকে ফিরে এসে রোজ সে অনর্থ করত। অথচ আসল অপরাধীর নাম বলতে কারও সাহস হ'ত না, ভন্টুর স্ত্রীর তো হ'তই না, তোমার বউদিরও হ'ত না. ছেলেগুলোও ভয়ে চুপ ক'রে থাকত। কারণ নাম বললেই ভন্টু নির্দয় ঠেঙাবে।

বাবাজী চুপ করিলেন।

তারপর ?

ভন্টু কিন্তু ঠেঙানো বন্ধ করলে না। সে ভুল ক'রে মনে করত যে, ভা ভাইপোরাই বোধ হয় এসব করছে। তারা যত বলত—আমরা করি নি, ত তার রাগ চ'ড়ে যেত, মনে হ'ত, ওরা মিছে কথা বলছে। তার নিজের ওইটুকু ছেলে যে কাঁচি চালাতে পারে, এ সন্দেহও তার মনে হ'ত না। ত এ ভুল ভাঙিয়েও কেউ দিত না, এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্য। ভাইপো তিনটে রোজ মার খেয়ে মরত, তবু সত্যি কথাটা বলত না। না, ভুল করছি, একদিন একজন বোধ হয় বলেছিল ; কিন্তু সে আরও বেশি মার খেয়ে ম'ল, ভন্টু বিশ্বাসই করলে না তার কথা। ভন্টুর মার যে কি মার, তা তো জানই মারতে মারতে বেত কেটে ছ্যাতরা ছ্যাতরা হয়ে যেত। শেষকালে তোমার বউদি একদিন এক কাণ্ড ক'রে বসল। একটা খোলার বাড়ি দেখে সেইখানে একদিন উঠে গেল দুপুরে, ভন্টু তখন আপিসে।

বাবাজী পুনরায় নীরব হইলেন।

তারপর ?

তারপর আর কি! সেই থেকেই ভিন্ন। ভন্টু অনেক সাধ্যসাধনা করলে, কিন্তু বউদি আর কিছুতেই ফিরল না। কেন আলাদা হয়ে গেল, তাও ঘুণাক্ষরে বললে না, মানে—সত্যি কথাটা বললে না; শুধু বললে—তোমার দাদার বেশি ঝামেলা সহ্য হয় না, তাই স'রে এসেছি।

ভন্টুর দাদা ফিরে এসেছিলেন বুঝি ?

হ্যাঁ, অনেক দিন। সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে বেশ মুটিয়ে ফিরেছে। চাকরি করছে আবার।

তারপর ?

তারপর আর কি! কিছুদিন পরেই ভন্টু দিল্লীতে বদলি হয়ে গেল। ওরাও কলকাতার খরচ চালাতে না পেরে নৈহাটিতে গিয়ে বাসা বাঁধল। সেখানেই এখন আছে। আমি মাঝ থেকে কেবল বিপদে প'ড়ে গেছি।

আপনার কি হ'ল ?

জড়িয়ে পড়েছি। ঠাকুরের আদেশ অমান্য তো করতে পারি না!

ঠাকুরের আদেশ মানে ? মুকুজ্জেমশাইয়ের ?

বাবাজী বিস্মিত হইলেন।

ঠাকুরকে তুমি চিনলে কি ক'রে ?

আমার শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল যে, সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও আলাপ। চমৎকার লোক! ও-রকম পরোপকারী লোক আমি আর দেখি নি।

ওই! ওই পরোপকারের ঠেলাতে আমিও অথৈ জলে পড়েছি।

কি রকম ?

গুজরাটে গিয়েছিলাম প্রভাসতীর্থ করতে। মন বসল না। ফিরে এলাম। এসে শুনলাম, ওরা সব নৈহাটিতে। কর্তব্যের খাতিরেই গেলাম একদিন দেখা করতে। সেখানে গিয়ে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড! ফন্‌তির হয়েছে টাইফয়েড, আর ঠাকুর সেখানে রয়েছেন। আমি তো থবাক্। শুনলাম, বিষ্ণুচরণের সঙ্গে ওঁর পুরীতে আলাপ হয়েছিল নাকি।

দেখলামও, খুবই স্নেহ করেন বিষ্ণুচরণকে। ফন্তির চিকিৎসা উনিই চালাচ্ছেন। বড় ডাক্তার আসছে, বরফ লেবু আঙুর সমস্ত ওঁরই খরচে। এত টাকা যে উনি কোথা থেকে পান, ভগবানই জানেন। আমি প্রণাম করতেই বললেন—আরে, তুমি কোথা থেকে এখানে! আমি যে বিষ্ণুচরণের কাকা, এ খবর ঠাকুর জানতেন না। শুনে খুব খুশি হ'লেন, বললেন—বাঃ, বেশ ভালই হ'ল, এখন কি করছ তুমি? বললাম—প্রভাসতীর্থটা সেরে এলাম। বললেন—তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আর কি হবে, তুমি এদের কাছেই থাক। আমি তো শুনে অবাক! এদের কাছে থাকব! কিন্তু ঠাকুরের মুখের ওপর কিছু বলতে ভরসা করলাম না। রাত জেগে ফন্তির সেবায় লেগে পড়তে হ'ল। কি করি, ঠাকুর নিজে রাত জাগছেন, আমি কি ক'রে ঘুমোই? একদিন ঠাকুরকে আড়ালে পেয়ে বললাম—ঠাকুর, নামজপ ক'রে মন ভরছে না, আমাকে একটা মন্তর দিন আপনি। ঠাকুর হেসে ফেললেন, বললেন—পাগল নাকি! আমি কি মন্তর দেব তোমাকে! আমি জোর ক'রে চেপে ধরতে বললেন—আচ্ছা, আমি যা বলব, তা সত্যি সত্যি করবে? আমি বললাম—নিশ্চয়। ঠাকুর কি বললেন শুনবে?

বাবাজীর চক্ষু দুইটি যেন অক্ষিকোটর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

কি বললেন?

তুমি বিষ্ণুচরণদের সেবার ভার নাও। এরা বড় দুঃস্থ হয়ে পড়েছে। এদের সেবা করলে তোমার পুণ্য হবে। কর্মযোগও মুক্তিলাভের একটা শ্রেষ্ঠ পন্থা। তুমি কায়মনোবাক্যে এদের সেবা কর দিকি, আনন্দ পাবে মুক্তিও পাবে। কোনও মন্ত্রের দরকার নেই। বিশ বাঁও জলে প'ড়ে গেলুম বুঝলে? বললাম—আপনি যা বলছেন, তা করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখন এদের এই দুরবস্থা, বিষ্ণুচরণের আয় যৎসামান্য, এর ওপর আমার নিজের ভার ওদের কাঁধে চাপালে ওরা সেটা ঠিক সেবার স্পিরিটে নেবে কি? আমার নিজের যা বিষয়-আশয় ছিল, তা তো সব ফুটকড়াই হয়ে গেছে ভন্টুকে দিতে চেয়েছিলাম, সে নেয় নি, বন্ধুর গর্ভেই গেল শেষকালে সব

ঠাকুর বললেন—না, গলগ্রহ হতে বলছি না। ওদের সাহায্য করতে বলছি। তোমাকে রোজগার করতে হবে। যা রোজগার করবে, সব এনে বউমার হাতে দেবে। চাও তো এক্ষুনি তোমার একটা চাকরির যোগাড় ক'রে দিতে পারি! আমার চেনা একজন রেশমের কারবারী বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আমার আর কিছু বলবার উপায় রইল না। কিছুদিন পরে সত্যিই ঠাকুর চাকরিটি জুটিয়ে দিলেন এবং তার কিছুদিন পরে ফন্তি যেই একটু সেরে উঠল, অমনি অন্তর্ধান করলেন, তাঁর যা চিরকাল স্বভাব।

তারপর?

তারপর আর কি! সেই চাকরি করছি। নৈহাটি থেকে রোজ ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করি। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝ একবার।

বাবাজীর চোখের দৃষ্টিতে পুনরায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

শঙ্কর বুঝিল, বাবাজী সেবাটা কায়মনোবাক্যে হয়তো করিতেছেন, কিন্তু সে বিষয়ে নির্বিকার নন।

ভন্টু কিছু সাহায্য করে না?

আগে আগে করত কিছু কিছু। এখন আর পারে না। পারবে কি ক'রে? একে দিল্লীর ভীষণ খরচ, তার ওপর ওই ইন্‌জেক্‌শন কিনতে হচ্ছে অগ্নিমূল্যে।

ইন্‌জেক্‌শন রোজ নেয়?

রোজ, দু বেলা। রেশমের ক্যান্‌ভাসিং করতে মাঝে আমি একবার দিল্লী গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, তার বউ বেশ ছিমছাম ক'রে, মানে—নিজের মনের মত ক'রে সংসারটি গুছিয়ে নিয়েছে। ছেলের ট্রাইসাইকেল, বাইরের ঘরে সোফা, রেডিও কিনেছে একটা।

আর ভন্টু?

ভন্টু উর্ধ্বশ্বাসে চাকরি করছে। সন্ধ্যের পর আপিস থেকে ফিরে ইন্‌জেক্‌শন নেয়, আর ছাতে ব'সে ব'সে হেঁড়ে গলায় গান গায়। আর মাঝে মাঝে হা-হা ক'রে হাসে—মর্মান্তিক সে হাসি, বুঝলে?

কি গান গায়?

নিজে তৈরি করেছে গান হে। টুকে এনেছি আমি, দেখবে? বাবাজী পকেট হইতে পকেট-বুকটি বাহির করিলেন এবং একটি পাতা খুলিয়া শঙ্করকে দিলেন।

শঙ্কর পড়িল—

লদ্‌কালদ্‌কি করতে করতে হিল্লী-দিল্লী হলাম পার।
নৈহাটিতে রান্নাঘরে বেগুন ভাজছে বিড্‌ডিকার
খজবুজ, খজবুজ, খজবুজ—
ফাটকা-খেলায় আটকে গেয়ে পড়লাম বিষম আড্ডায়
চুনোপুঁটি স্মোকিং হুক্কা তিমি-মাছের আড্ডায়

দাও, এবার আমাকে নাবতে হবে। এই, রোক্‌কে।

ট্রাম থামিল। পকেট-বুক লইয়া বাবাজী নামিয়া গেলেন। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণ সে যেন তন্ময় হইয়া একটা উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। ট্রামে অনেক যাত্রী উঠিয়াছে, সে লক্ষ্যই করে নাই। তাহার যেখানে নামিবার কথা, সে স্থান বহুক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে। অ্যাড্‌ভোকেট ভদ্রলোক আবার বাহির হইয়া না যান! সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্যা এখন ভন্টু নয়, তাহার সমস্যা এখন উকিল এবং ইঁদারা। অনেক জিনিসও কিনিতে বাকি আছে। সহসা মনে পড়িল, কুমোরটুলিতেও একবার যাইতে হইবে।

চলন্ত ট্রাম হইতে সে লাফাইয়া পড়িল।

২০

দিবা দ্বিপ্রহর।

খোলা মাঠে হু-হু করিয়া একটা হাওয়া বহিতেছে। কাছে দূরে গরু চরিতেছে। মাঠের প্রান্তে যে কুলগাছটা আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া কয়েকটা রাখাল-বালক ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িয়া চলিয়াছে। আরও দূরে চাষের জমি।

কোথাও সরিষা, কোথাও গম, কোথাও যব, কোথাও মটর, কোথাও ছোলা—হলুদ সবুজ-নীলের মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে যেন। যমুনিয়ার কিন্তু এ সব দিকে লক্ষ্য নাই, সে আপন মনে কাঠ ও গোবর কুড়াইতেছে। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ইহাই তাহার কাজ। মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সে শুকনা ডালপালা ও গোবর সংগ্রহ করে। প্রকৃতির এই ঐশ্বর্যের মাঝখানে তাহাকে কিন্তু মোটেই মানায় নাই, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মাঝে খানিকটা সচল আবর্জনা যেন। মাথায় রুক্ষ তৈলহীন চুল, পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, রোগে খাদ্যাভাবে শীর্ণ শ্রীহীন বিগত-যৌবন দেহ। বলিষ্ঠ মুশাইকে ভুলাইবার মত তাহার কিছুই নাই। অথচ কতই বা তাহার বয়স! ত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু ইহারই মধ্যে বুড়ী হইয়া গিয়াছে। মুশাইকে ভুলাইবার মত কিছু না থাকিলেও মুশাইকে ভুলাইবার আগ্রহ তাহার কম নয়। বস্তুত উহাই তাহার জীবনের একমাত্র আগ্রহ। তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া, তাহার জন্য পূজা করিয়া, তাহার পছন্দমত রান্না করিয়া, রাত্রে কোমরে তেল মালিশ করিয়া, সকালে চা প্রস্তুত করিয়া, তাহার কাপড়-জামা-পাগড়ি ক্ষার দিয়া পরিষ্কার করিয়া নানা উপায়ে সে মুশাইকে আগলাইয়া রাখিয়াছে। মুশাই যদি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার গতি কি হইবে! কাহাকে লইয়া থাকিবে সে! নিজের পেটের ছেলে জোয়ান বউ লইয়া শহরে চলিয়া গেল, তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল না পর্যন্ত। কলে 'নোক্‌রি' করিতেছে। যমুনিয়া অমন নোক্‌রির মুখে প্রত্যহ হাজারবার ঝাড়ু মারে। নোক্‌রি নয়, আসল কথা 'জরু'। জোয়ান জরু লইয়া মজা করিয়া আলাদা থাকিতে চায়। তাহার কথা একবার ভাবিল না পর্যন্ত, জরু লইয়া উন্মত্ত হইয়া চলিয়া গেল। কমবয়সী ছুঁড়ী দেখিলে পুরুষগুলার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায় যেন। 'পুতহু'র যৌবনের কথা ভাবিতে গিয়া সহসা তাহার নিজের যৌবনের কথা মনে পড়িল। তাহাকেও কি কম নাকাল হইতে হইয়াছিল! জমিদারের গোমস্তা কুঞ্জবাবু, পীরু গাড়োয়ান, জমিরুদ্দিন সিপাহী, কত লোকই-যে তাহার পিছনে লাগিয়াছিল! থানার নাক-কাটা চৌকিদারটা তো তাহাকে ধরিয়া একদিন জঙ্গলের মধ্যে টানিয়াই লইয়া গিয়াছিল। বিগত যৌবনের

বিস্মৃতপ্রায় নানা কাহিনী মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিল। কয়দিনই বা ছিল সে যৌবন! চকিতে আসিল এবং চলিয়া গেল। মুশাইয়ের সহিত কবে কোন্ বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ভাল করিয়া মনেও পড়ে না। মনে পড়ে, যখন সে যৌবনে প্রথম পদার্পণ করিল, সেই দিনগুলি। মুশাই তখন তাহাকে লইয়া বিভোর হইয়া থাকিত, পাগল হইয়া গিয়াছিল যেন। কাহারও দিকে তাকাইলে ক্ষেপিয়া যাইত, কোন বেচালের খবর কানে গেলে মারিয়া ধুনিয়া দিত। গুণ্ডাটা চিরকালই একরকম, কথায় কথায় কেবল মারপিট। কিছুদিন পরে বিষুণের জন্ম হইল, দেখিতে দেখিতে তাহার যৌবন চলিয়া গেল। শুধু যৌবন কেন, কত দিনই কাটিল তাহার পর। মুশাই তাড়ি ধরিল, মদ ধরিল, কত ছুঁড়ীর পিছনে ঘুরিল, এক সাহেবের কাছে কিছুদিন নোকরি করিল, তাহা ছাড়িয়া আবার কিছুদিন মজুরি খাটিল। এক দারোগাবাবুর বিবদৃষ্টিতে পড়িয়া দুই মাস জেল পর্যন্ত খাটিয়া আসিল। এখন শঙ্করবাবুর কাছে বাহাল হইয়াছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। শঙ্করবাবুর কাছেই ও জব্দ থাকে। তবু মুসহরণীটাকে লইয়া সেদিন পর্যন্ত কি কাণ্ড! পাপটা বিদায় হইয়াছে, বাঁচা গিয়াছে। মুশাই তাহার, আর কাহারও নয়। আর কাহাকেও কাছে ঘেঁষিতে দিবে না সে। মুশাইয়ের জন্যই যমুনিয়া জ্বালানি সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। শীতকাল। ঘর একটু গরম না করিলে মুশাই ঘুমাইতে পারে না। এইগুলি দিয়া ঘরে 'বোরশি', উঠানে 'ঘুর' জ্বালাইতে হইবে। ঘুরের পাশে বসিয়া মুশাই গল্প করিতে ভালবাসে। বার বার বিড়ি খাওয়াও আছে, কত 'শালা'ই কিনিবে সে!

নির্জন মাঠে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে জীর্ণবসনা শীর্ণকান্তি যমুনিয়া শুকনা ডালপালা কুড়াইয়া ফিরিতে লাগিল।

২১

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

সমস্ত গ্রাম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণপক্ষ। চতুর্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার

অবিশ্রান্ত ঝিল্লী-ধ্বনি। হুঁম্হুঁ। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের অন্ধকার ভেদ করিয়া শব্দ হইল, দূরের আর এক বৃক্ষ হইতে প্রত্যুত্তর আসিল, হুঁম্হুঁ, হুঁম্হুঁ, হুঁম্হুঁ। নির্জন নিশীথে নিশাচর পক্ষীমিথুন গম্ভীর কণ্ঠে আলাপ করিতেছে। শীতের বাতাস প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছের শাখাপ্রশাখা দুলাইয়া, বাঁশবনে শিহরণ জাগাইয়া, মাঠের শুষ্ক পাতা উড়াইয়া একটানা বহিয়া চলিয়াছে। ঝিল্লীধ্বনির সহিত হিল্লোলিত বৃক্ষপল্লবের মর্মরধ্বনি মিশিয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত মধ্যরাত্রির স্তব্ধতার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অপরূপ ছন্দে রনিয়া রনিয়া উঠিতেছে। সহসা পাশের ঝোপে একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ তীব্র একটিমাত্র ডাক। তাহার পর সব চুপচাপ। অন্ধকারের নিবিড়তা ঘনতর হইয়া উঠিল, সমস্ত শব্দ মুহূর্তের জন্য যেন থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর একটা তীক্ষ্ণ শব্দে অন্ধকার বিদীর্ণ হইল, কে যেন শিস দিতেছে। ঝোপটি নড়িয়া উঠিল, ঝোপের ভিতর হইতে গুঁড়ি মারিয়া বাহির হইয়া আসিল—শৃগাল নয়, মানুষ। কারু। যে দিকে শিস বাজিয়াছিল, সেই দিকে সে দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। শ্যাওড়াগাছের অন্ধকারে কম্বল গায়ে দিয়া ফরিদ দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনে নিঃশব্দ গতিতে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। চুরি করিতে চলিয়াছে।

মানুষের সাড়া পাইয়া নিশাচর পক্ষীদম্পতি উড়িয়া গেল।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি আবার নিবিড় হইয়া উঠিল।

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং—

মহিষের গলার ঘণ্টা বাজিতেছে। মাঠের পথ ধরিয়া গুলাব সিংহের শতাধিক মহিষ ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। চলিয়াছে লক্ষ্মীবাগের উদ্দেশে। মণি বাঁড়ুজ্জের জমিতে এবার নাকি চমৎকার ফসল হইয়াছে, আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত চরাইয়া দিতে হইবে, ইহাই গুলাব সিংহের হুকুম। চারিজন বলিষ্ঠ পশ্চিমা গোয়ালা প্রকাণ্ড লাঠি কাঁধে করিয়া মহিষ-বাহিনীর পিছনে পিছনে চলিয়াছে।

হুঁম্হুঁ, হুঁম্হুঁ—

দূর আম্রকাননে নিশাচর পক্ষীদম্পতি পুনরায় আলাপ শুরু করিল।

২২

নিকল্, নিকল্, নিকল্ হম্‌রা ঘর্‌সে।

ফুলশরিয়ার চোখে আগুন, ঠোঁট কাঁপিতেছে। পদাহত কুকুরের মত হরিয়া বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলশরিয়া তাহার কাপড়ের পুঁটুলি এবং বিছানাটাও বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর লণ্ঠনের আলোটা আর একটু উসকাইয়া দিয়া বঁটিটা টানিয়া পেঁয়াজ কুটিতে বসিল।—একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে যেন! ঘা কবে সারিয়া গিয়াছে, অথচ নড়িবার নাম নাই! এক পয়সা রোজগার করিবে না জোয়ান মরদ বসিয়া বসিয়া আমার অন্ন ধ্বংস করিবে রোজ রোজ! আমি কত যোগাই! ঘায়ের চিকিৎসা করিতে গিয়া তো যা কিছু সঞ্চিত ছিল সব গিয়াছে, কিছু 'জেবর' পর্যন্ত বন্ধক পড়িয়াছে! ও কি আর সে টাকা শোধ দিবে? 'মুরদা' আবার 'আশনাই' করিতে চায়, একবার 'আশনাই' করিতে গিয়া তো মরিতে বসিয়াছিল, লজ্জাও করে না 'বেহুদ্দা'টার! আমার কাছে আর কোন 'মরদ' আসিতে দিবে না, কাল তো রাজীববাবুর ব্যাটাকে অপমানই করিয়া বসিল। ইস্, 'সাধি' করা 'জরু' বানাইয়া তুলিতে চায় আমাকে! 'সাধি' করা 'জরু' তো ঘরে আছে একজন, সেইখানেই যা না, এখানে মরিতে পড়িয়া আসিছ কেন? এক কড়ার সামর্থ্য নাই, 'আশনাই' জমাইতে চায়!—এই জাতীয় স্বগতোক্তি করিতে করিতে ফুলশরিয়া পেঁয়াজ কুটিতে লাগিল। পেঁয়াজের তরকারিটা বানাইয়া এক বোতল 'শরাব' আনিতে হইবে। আজও গদাইবাবুর আসিবার কথা আছে। রাজীবলোচনের পুত্র গদাইবাবুর মুখটা মনে পড়িতে তাহার হাসি পাইল। কি বেহায়া আত্মসম্মানহীন এ লোকটা! কাল হরিয়ার নিকট অপমানিত হইয়াও আজ আবার আসিবে, খবর পাঠাইয়াছে। আজ আসিবার অন্য একটা কারণ আছে অবশ্য। ফরিদ কাক্স নিশ্চয়ই খবর দিয়াছে যে, গহনাগুলি ফুলশরিয়ার জিম্মায় তাহারা রাখিয়া গিয়াছে। সেইগুলি হস্তগত করিবার জন্যই গদাইবাবু আজ বিশেষ করিয়া আসিতেছেন। উৎপলবাবুর ঘরে সিঁধ দিয়া উহারা আর কি কি পাইল, কে জানে! মাইজীর দামী শাড়িগুলা নিশ্চয়

নেকি মাড়োয়ারীর ঘরে গিয়াছে। জেবরগুলা রাজীববাবুর ঘরে গিয়া ঢুকিবে। চোরাই গহনা আত্মসাৎ করিবার জন্য রাজীববাবু একজন স্যাকরাকেই নিজের বৈঠকখানার বাহিরের ঘরটাতে আশ্রয় দিয়াছেন, লোককে অবশ্য বলেন—ভাড়া দিয়াছেন। চোরাই গহনা গালানোই ওই স্যাকরাটার একমাত্র কাজ। ভাড়া না আর কিছু! ফুলশরিয়ার অজানা কিছুই নাই। 'চোট্টা' সব। শুধু 'চোট্টা' নয়, ভীতুও। চোরের হাত হইতে সোজাসুজি গহনা লইবারও হিম্মৎ নাই হুজুরদের, পাছে ধরা পড়েন। ফুলশরিয়া গহনাগুলি কয়েকদিন লুকাইয়া রাখিবে, তাহার পর চুপিচুপি গদাইবাবু আসিয়া একদিন লইয়া যাইবেন। বিশেষ করিয়া এইজন্যই আরও হরিয়াকে তাড়াইয়া দিতে হইল। সেদিন শেষরাত্রে গহনার পুঁটুলি লইয়া কাল্লু আসিয়া যখন ডাক দিল, তখন কি মুশকিলেই না সে পড়িয়াছিল! পুঁটুলিটা সারারাত বাড়ির পিছনে ছাইগাদায় লুকাইয়া রাখিতে হইল। হরিয়াকে এসব কথা বলা যায় না। বিশ্বাস করিবার মত লোক সে নয়। কাল্লুকেও ফিরাইয়া দিতে পারে না। নিজের স্বার্থের জন্যই পারে না। এসব ব্যাপারে তাহার বেশ মোটা রকম পাওনা আছে। দুই দফা পাওনা—একবার কাল্লুরা দিবে, আর একবার গদাইবাবু। নানা রকম 'দুখ ধান্দা' করিয়া তাহাকে রোজগার করিতে হইবে তো! না করিলে তাহার চলিবে কেমন করিয়া! সহসা ফরিদ এবং কাল্লুর জন্য তাহার দুঃখ হইল। চুরির সমস্ত ঝুঁকিটা তাহাদের। ধরা পড়িলে তাহাদেরই জেল হইবে। অথচ কয়টা টাকাই বা বেচারারা পাইবে! রাজীবলোচন এবং নেকিরাম দয়া করিয়া যাহা দিবে, তাহাই। কাল্লুর ভীত চকিত মুখখানা তাহার মনে পড়িল। সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, কাল্লু এবং ফরিদের নিকট হইতে সে এবার আর কমিশন লইবে না।

চনাচুর গরম পেয়ারে ম্যয় লায়া হুঁজি চনাচুর গরম—চানাচুরওয়ালা রামু আসিতেছে। রোজই প্রায় আসে। ফুলশরিয়া ঘাড়টা একটু উঁচু করিয়া দেখিল, তাকে বিড়ির বাণ্ডিলটা আছে কি না! এদিকে আসিলে রামুর ফুলশরিয়ার আঙিনায় একবার ঢোকা চাই। পুরাতন আলাপ। ফুলশরিয়ার প্রথম প্রণয় রামুর সহিতই। প্রণয়ের নেশা অনন্ত রামুর বহুদিন

পূর্বে ছুটিয়া গিয়াছে। এখন তাহার ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে এবং মারমুখী খাণ্ডার বউ। তবু রামু এখনও আসে। আসে, একটু বসে, বিড়ি খায়, দুই-একটা অশ্লীল রসিকতা করে, তাহার পর চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে দুই-এক দোনা চানাচুর উপহার দেয়, দাম দিতে গেলে লয় না। বলে—হুঁ তোরা শুদ ছে। বলে আর অপ্রতিভ হাসি হাসে একটা।

চানাচুরের ব্যবসা করিবার জন্য ফুলশরিয়াই তাহাকে কুড়িটা টাকা দিয়াছিল কিছুকাল পূর্বে। সে ভাল করিয়াই জানে যে, রামু ও-টাকা কখনও শোধ দিবে না। রামু কিন্তু রোজই বলে যে, পরের মাসেই সে সব শোধ করিয়া দিবে। বহু 'পরের মাস' আসিল এবং চলিয়া গেল, টাকা আজও শোধ হয় নাই। ফুলশরিয়া মনে মনে হাসে। যদিও সে জানে যে, ও-টাকা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, তবু সে মুখ ফুটিয়া কখনও বলে না যে, টাকাটা তোমায় দান করিলাম। রামু বড় আত্মসম্মানী লোক, তাহার দান সে লইবে না। তা ছাড়া সে মুখ ফুটিয়া বলিতেই বা যাইবে কেন, লোকটাকে হাতে রাখাই তো ভাল। ফুলশরিয়া পেঁয়াজ কুটিতে কুটিতে রামুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রামু চলিয়া গেলে গদাইবাবু আসিবেন, তাহার পর জমাদার সাহেব। হঠাৎ ফুলশরিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। জমাদার সাহেবের কি ভীষণ গালপাট্টা, বাহিরে কি তর্জন-গর্জন, হঠাৎ মনে হয়, দুর্ধর্ষ সিংহ একটা যেন, অথচ—। ফুলশরিয়া আবার হাসিল।

২৩

নিপুদা ডায়েরি লিখিতেছিল—

"যাহাদের গৃহের কোন বন্ধন নাই, যাহারা ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি স্বীকার করে না, সতীত্বের যূপকাষ্ঠে স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক প্রজনন-প্রবৃত্তিকে যাহারা বলিদান দিবার পক্ষপাতী নয়, কর্ম ছাড়া যাহাদের অন্য কোন ধর্ম নাই, এমন কি ভগবানকে পর্যন্ত যাহারা মানে না, আমি সেই দলের। আমি নির্ভীক। কোন কিছুর খাতিরে আমি সত্যপথ-ভ্রষ্ট হইব

না। শঙ্কর আমাকে চাকরি করিয়া দিয়াছে, এই অজুহাতে শঙ্করকে বাঁচাইবার জন্য অথবা উৎপলকে পুষ্ট করিবার জন্য আমি আমার জীবনের নীতি বিসর্জন দিব না, দিতে পারিব না। আমি বিদ্রোহী। বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোই আমার কাজ। প্রতি শ্রমিকের, প্রতি কৃষকের প্রাণে প্রাণে যে ভাব জাগাইতে হইবে, তাহা যদি শঙ্কর-উৎপলের স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। কৃতজ্ঞতা! কিসের কৃতজ্ঞতা! আমার কাজের পরিবর্তে উহারা আমাকে বেতন দেয়। অমনই দেয় না। যাহা দেয়, তাহাও যথেষ্ট নয়। আমার মত একজন কর্মী রুশ দেশে ইহার অপেক্ষা ঢের বেশি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। আমিই বা থাকিব না কেন? অতিশয় স্থূল দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার সঙ্গতি পর্যন্ত আমার নাই। প্রায়ই ধার করিতে হয়। ভজহরি হয়তো আজই তাগাদা করিতে আসিবে। কেন আমি ধার করিব? শঙ্কর-উৎপল 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট' সিগারেট খাইবে, আমিই বা কেন বিড়ি ফুঁকিয়া মরিব? শঙ্কর-উৎপল শাল-দোশালা উড়াইবে, আমিই বা দারুণ শীতে একটা সস্তা র‍্যাপার জড়াইয়া কাঁপিয়া মরিব কেন? আমি কি মানুষ নই? আমি কি উহাদের অপেক্ষা কম বিদ্বান, কম বুদ্ধিমান? আমার ক্ষুধা কি উহাদের ক্ষুধা অপেক্ষা কম প্রবল? সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি বিলাসিতার অনুকূল না হয়, সকলে মিলিয়া সমানভাবে দুঃখ ভোগ করিব, সকলে মিলিয়া ব্ল্যাক্-ব্রেড আহার করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু একজন পোলাও খাইবে, আর একজন পান্তা-ভাত—এ অবিচার সহ্য করা শক্ত। এ অসাম্য দূর করিতেই হইবে। আমারই যখন এই অবস্থা, তখন দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকদের অবস্থা যে কি তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। দারিদ্র্যের চাপে তাহাদের সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছে, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া অনুভব করিতেও পারে না। প্রতি শ্রমিককে, প্রতি কৃষককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, যাহারা তোমাদের পেশীর শক্তি অন্যায়ভাবে অপহরণ করিয়া ক্রমাগত নিজেদের শক্তি বাড়াইয়া চলিয়াছে, যাহাদের লোভের অন্ত নাই, তোমাদের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া জোঁকের মত স্ফীতকায় হইতে যাহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না,

তাহাদের ওই গগনস্পর্শী প্রাসাদটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ কর। ওই পুঁজিতন্ত্রী ধনীরাই তোমাদের শত্রু। তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য জোর করিয়া কাড়িয়া লও।..."

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। ভজহরি আসিল বোধ হয়। ঘাড় ফিরাইয়া নিপু দেখিল, ভজহরি নয়, ঢুলকি। একটু বিব্রত বোধ করিল। মেয়েটাকে আজই টাকা দিবার কথা। ঢুলকি কিছু না বলিয়া দ্বারপ্রান্তে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই স্তব্ধতা অস্বস্তিকর। নিপু যতটুকু দেখিয়াছে, তাহাতে অদ্যাবধি কোন উচ্ছলতা সে ঢুলকির মধ্যে লক্ষ্য করে নাই। নির্ঝরের চাপল্য কিংবা অগ্নির প্রদাহ, মান অভিমান, সোহাগ আবদার— অর্থাৎ ইহার অন্তরের কোন পরিচয় আজ পর্যন্ত নিপু পায় নাই। ঢুলকি শুধুই যেন দেহ, কেবল মাংস খানিকটা, আর কিছু নয়। কিন্তু অপরূপ সে দেহের গঠন। ক্ষীণকটি কুচভরনমিতাঙ্গী নিবিড়নিতম্বিনী ঢুলকি যেন জীবন্ত অজন্তা-চিত্র। কোন শিল্পীর কল্পনা যেন মূর্ত হইয়াছে। কিন্তু এ মূর্তির মধ্যে প্রাণ নাই, থাকিলেও নিপু তাহার কোন স্পর্শ পায় নাই। নিপুর কাছে ঢুলকি পাথরের মতই স্থির কঠিন নীরব। নিপু বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিল। ঢুলকি লাল ফুটকি দেওয়া হলুদ রঙের একটা শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। অবগুণ্ঠন নাই। চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা নাই, লজ্জা নাই, আগ্রহ নাই, প্রেম নাই, এমন কি দীপ্তিও নাই। স্থির অপলক দৃষ্টি যেন অনুচ্ছ্বসিত নীরব ভাষায় বলিতেছে, আমার পাওনাটা দিয়া দাও, আমি চলিয়া যাই।

ঢুলকি জাতে মুসহর ; এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে মধু বিক্রয় করিতে আসে। মাথায় মধুর হাঁড়ি লইয়া 'মধু-উ-উ-উ, মধু লিবে গো' বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়ায়। সঙ্গে একজন পুরুষও থাকে। ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা ভীষণদর্শন লোকটা, তাহারও শরীর যেন পাথরে কোঁদা, কোমরে সর্বদা একটা ছোরা গোঁজা, চক্ষুর দৃষ্টি সামান্য উত্তেজনাতেই হিংস্র হইয়া উঠে। স্বামী বলিতে সভ্য-সমাজে যে সম্পর্ক বুঝায়, এ ব্যক্তির সহিত ঢুলকির ঠিক সে সম্পর্ক আছে কি না, তাহা জানা কঠিন ; কিন্তু সে যে ঢুলকির মালিক, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। ঢুলকি তাহার পদানত। এই আত্মসমর্পণের

লে কি আছে, ছোরা, না, প্রেম, না, সামাজিক বন্ধন, তাহাও কেহ জানে না। এইটুকু শুধু সকলে জানে যে, সে ঢুলকির মালিক। ঢুলকির এই সব -অভিযান সে-ই নিয়ন্ত্রিত করে, উপার্জনের সমস্ত টাকা সে-ই লয়। কিছুকাল আগে মুশাই এই ঢুলকির কবলে পড়িয়াছিল। অর্থাভাবেই হোক যমুনিয়ার ছটপরবের জোরেই হোক, মুশাই এখন ঢুলকিকে ছাড়িয়াছে। ঢুলকি এখন নিপুর। ফুলশরিয়া কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিপু কিছুদিন ক্রোধে ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়ও তাহার কম হয় নাই, যখন সে আবিষ্কার করিল যে, ওই ঘেয়ো লোকটা তাহার স্বামী নয়। সামান্য পণ্যরমণী হইয়াও ওই লোকটাকে সে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে! কেন? যে বস্তুতান্ত্রিক মানদণ্ড দিয়া সে জীবনের সমস্ত রহস্য নিরূপণ করিতে অভ্যস্ত, তাহা দিয়া সে ফুলশরিয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে পারিল না। কাব্যের দুই বুলি আওড়াইয়া অবশেষে সে মনকে স্তোক দিল, প্রেমের বিচিত্র নিয়ম বোধ হয়। ইহা লইয়া বেশিদিন সে মাথাও ঘামাইল না, ঢুলকিকে পাইয়া ফুলশরিয়াকে ভুলিয়া গেল। সে বায়োলজিকালি বাঁচিতে চায়,—ঢুলকি ফুলশরিয়া যে কেহ একটা জুটিলেই হইল। এখন কিন্তু ঢুলকিকে দেখিয়া সে একটু বিব্রত বোধ করিল। হাতে মাত্র পাঁচটি টাকা আছে। পাঁচ টাকাই ইহাকে দিয়া দিলে হাত যে একেবারে খালি হইয়া যাইবে! কিন্তু ঢুলকির অপলক নীরব দৃষ্টিকে উপেক্ষা করা শক্ত। একটু ইতস্তত করিয়া নিপু অবশেষে পাঁচ টাকার নোটটা বাহির করিল এবং সেটা টেবিলে রাখিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল, বৈঠো।

ঢুলকি বসিল না।

পাঁচ টাকার নোটটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, পাঁচ টাকায় হোবে না বাবু, পঁচাশ টাকা লাগবে।

মুসহরদের নিজেদের ভাষা একরূপ অদ্ভুত হিন্দী। কিন্তু বাঙালী বাবুদের সহিত ইহারা বাঁকা বাংলায় কথা বলে।

নিপু আকাশ হইতে পড়িল। বলে কি! পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে! কাহে?

ঢুলকি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরেই যাহা ঘটল, তাহা অপ্রত্যাশিত। নিপু চমকাইয়া উঠিল। হঠাৎ পিছনের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল ঢুলকির মালিক এবং খাঁউখাঁউ করিয়া নিজস্ব ভাষায় যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম এই :—আপনিই তো, হুজুর, সেদিন হাটে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, মজুরদের বেতন দশ গুণ হওয়া উচিত, বাবু-ভেইয়ারা তাহাদের ঠকাইয়া তাহাদের ন্যায্য মজুরি চুরি করিয়া নিজেরা বাবুয়ানি করে। কথাটা আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। আশা করিয়াছিলাম যে আপনি অন্তত মজুরদের প্রতি সুবিচার করিবেন। আপনিও আর সকলের মত কম মজুরি দিতে চাহিতেছেন, এ তো বড় তাজ্জবকি বাত !

শাণিত দন্ত বিকশিত করিয়া লোকটা হাসিল। নিপু যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। লোকটার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতেও পারিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। এই মূর্খটাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে যে সকলে যদি সমাজতন্ত্রী না হয়, সে একা কি করিয়া হইবে, অর্থনৈতিক আইন অনুসারে তাহা যে কিছুতে হওয়া যায় না। তাহার মনে হইল, অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি সহজ ভাষায় ইহাদের মধ্যে প্রচার করা উচিত, তাহা না হইলে বক্তৃতার সহিত আচরণের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। আমি নিজেও যে ক অসহায়, তাহা ইহাদিগকে বুঝাইতে না পারিলে—

চল্।

নিপু চকিতে চোখ ফিরাইয়া দেখিল, লোকটা ঢুলকির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, চোখ দুইটা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। কয়টা টাকার জন্য মেয়েটা নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে নাকি ?

আরে, ঠহরো ঠহরো, যাও মৎ।

উভয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যদিও এতদিন ধরিয়া সে সাম্যবাদের মন্ত্র জপ করিয়াছে, কার্যকালে কিন্তু তাহার সুপ্ত বুর্জোয়া মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, টাকা দিয়া এই ছোটলোকগুলাকে কিনিয়া রাখিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। তাহাকে অপমান করিয়া চলিয়া যাইবে ! আশ্চ

তো কম নয়! ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়াড়ির যে রকম অযৌক্তিক রোখ চাপিয়া যায়, বৈজ্ঞানিক নিপুরও ঠিক তাহাই হইল। সে অশুদ্ধ হিন্দীতে বলিয়া বসিল যে, সে পঞ্চাশ টাকাই দিবে, আজ হাতে অত টাকা নাই, ঢুলকি কাল আসিয়া যেন টাকা লইয়া যায়।

বহুৎ খুব।

দুইজনেই অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

নিপু খোলা দ্বারটার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। আরও অবাক হইয়া যাইত, যদি দেখিতে পাইত, অন্ধকারে কেমন দুইজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত গলা-ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। দেহের শুচিতা ইহাদের কাছে তত বড় নয়, মনের শুচিতা যতটা। প্রাণ-ধারণ করিবার জন্য যেমন মধু-বিক্রয় করিতে হয়, তেমনই দরকার পড়িলে দেহ-বিক্রয়ও করিতে হয়। নারী-মাংসলোলুপ কুত্তার অভাব নাই পৃথিবীতে। তাহাদের লোভের খোরাক যোগাইয়া অর্থ-উপার্জন করিতে হয় বইকি মাঝে মাঝে। অর্থটা যে অতিশয় প্রয়োজনীয় জিনিস, না থাকিলে চলে না এবং মধু-বিক্রয় করিয়া সব সময়ে তাহা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহও করা যায় না। উপরি রোজকার করিতে দোষ কি? ইহাদের নীতি কমিউনিস্টিক নয়, একেবারে মহাভারতীয়। মন যদি একনিষ্ঠ থাকে, দেহ লইয়া ইহারা মাথা ঘামায় না। সমুদ্রাভিমুখিনী স্রোতস্বতীর বুকে সাময়িক খড়-কুটা-জঞ্জালের মত এসব নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার, আসে এবং ভাসিয়া যায়।···কেকার ধ্বনির ন্যায় একটা তীক্ষ্ণ শব্দ অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিল। নিপুর মনে হইল, আকাশে বোধ হয় হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। এ অঞ্চলের খালে-বিলে এ সময় হাঁস আসে। এ কিন্তু হাঁস নয়, ঢুলকি। স্বামীর কি একটা রসিকতায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়াছে। নিপু বুঝিতে পারিল না, কারণ নিপুর কাছে ঢুলকি কখনও হাসে নাই।···উন্মুক্ত দ্বারপথে চাহিয়া নিপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরের মধ্যে অতৃপ্ত লালসা, দারিদ্র্যজনিত ক্ষোভ, আদর্শনিষ্ঠা, আদর্শচ্যুতি, আহত আত্ম-অভিমান, ব্যর্থ আক্রোশ, সমস্ত যেন একটা তিক্ত বীভৎস রসের ফেনিল আবর্তে টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা করিতে

লাগিল, যে সমাজবিধান তাহাকে এমন ক্ষুধিত অসমর্থ অসহায় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিতে, ভীম যেমন করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান করিয়াছিল।

দেবতা, বাড়ি আছেন নাকি?

তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া নিপু যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। মুকুন্দ পোদ্দারের কণ্ঠস্বর।

এবার ভজহরিকে না পাঠাইয়া স্বয়ং আসিবার মানে? ভজহরিই তো প্রতি মাসে সুদ লইয়া যায়। দ্বারপ্রান্তে মুকুন্দ পোদ্দার আবির্ভূত হইলেন।

এই যে, দেবতা আছেন দেখছি!

চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া পোদ্দার মহাশয় পা ঠুকিয়া ঠুকিয়া চটিজুতা হইতে ধূলি অপসারণ করিলেন, তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া তৈলপক্ক বেঁটে বাঁশের লাঠিটি কোণে সন্তর্পণে রাখিয়া চৌকিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং নিপুর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। দন্তলগ্ন স্বর্ণখণ্ডগুলি বাতির আলোকে চকমক করিয়া উঠিল।

আপনি নিজেই এলেন যে আজ?

কেন, দেবদর্শনে দোষ কি আছে?

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, ভজহরির শরীরটা খারাপ। বুড়ো লোক সে, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই কাবু হয়ে পড়ে। ঠাণ্ডার দিনে আমি কিন্তু হাঁটলেই ভাল থাকি, তাই ভাবলুম, বেড়িয়েই আসি একটু।

ক্ষণকাল থামিয়া মুকুন্দ পুনরায় বলিলেন, আঃ, সেদিন হাটের বক্তৃতাটি আপনার চমৎকার হয়েছিল, অমন হক কথা বহুকাল শোনা যায় নি।

তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে অগ্নির আভা ফুটিয়া উঠিল, মুখে হাসি।

নিপু হাসিয়া বলিল, আপনারও ভাল লেগেছিল? আমার বক্তৃতা শুনে ওরা যদি জাগে, তা হ'লে তো আপনাদেরই বিপদ সবচেয়ে বেশি।

তা হ'লেও হক কথা হক কথাই। তা ছাড়া আমরা আর কদিন? আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন দেবতা?—এই।

মুকুন্দ পোদ্দার ললাটের মধ্যস্থলে তর্জনী স্থাপন করিয়া হাসিলেন।

এটি যতক্ষণ আমার সপক্ষে আছে, ততক্ষণ, দেবতা, কোন বক্তৃতাকেই আমি কেয়ার করি না। এমন কি আপনার প্যাম্‌ফেলেট না কি বললেন সেদিন, তাও ছাপিয়ে দিতে আমি রাজী আছি।

রাজী আছেন ?

আপত্তি কি ?

নিপু যেন অকূলে কূল পাইল। কলিকাতায় যে কমিউনিস্টিক দলের সহিত সে এখন নামেমাত্র সংশ্লিষ্ট আছে এবং যে দলের হরেন তালুকদার তাহার চাকরি-করা লইয়া খুব একটা ব্যঙ্গাত্মক পত্র লিখিয়াছে, হাজার কয়েক গরম প্যামফ্লেট ছাপাইয়া যদি সেই দলে চড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার শুধু যে মুখরক্ষা হইবে তাহাই নয়, নীরব কর্মী হিসাবে হয়তো দলের মধ্যে একটা জয়জয়কারও পড়িয়া যাইতে পারে। ইহা নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত জিনিস নয়। এমন কি প্যাম্‌ফ্লেটের ভাষায় সে যে আগুন ছুটাইবে, তাহা যদি পুলিস-বিভাগের রোষ উৎপাদন করিয়া তাহাকে কারাবরণ করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে তো কথাই নাই, তাহার প্রতিপত্তির অন্ত থাকিবে না। উত্তেজনাপূর্ণ কোন একটা কিছু করিতে না পারিলে তৃপ্তি নাই। এই অখ্যাত পল্লীগ্রামে একটা ক্যাপিটালিস্ট জমিদারের অধীনে হাড়ি-ডোমদের মধ্যে বাস করিয়া সহস্র বিরুদ্ধতার মধ্যে কাজ করা কি সম্ভব ? কেহ তাহার একটা কথা বোঝে না। ইহাদের মধ্যে কোন উত্তেজনা নাই, কোন উৎসাহ নাই, কেহ একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পর্যন্ত করে না। উত্তেজনার সন্ধানেই সেদিন সে হাটে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিল, উত্তেজনার সন্ধানেই লক্ষীবাগে মণির বিরুদ্ধে চাষীদের ক্ষেপাইতেছে। কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি নাই। সমস্ত দেশকে মাতাইবে—ইহাই তাহার স্বপ্ন। এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকিলে তাহার স্বপ্ন সফল হইবে কি ? মুকুন্দ পোদ্দারের কথায় তাহার অন্তরের সুপ্ত বহ্নি যেন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুখে কিন্তু বিশেষ আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না, সে বিষয়ে সে খুব চালাক, অত্যন্ত নিরীহভাবেই বলিল, বেশ তো, দিন না। তা হ'লে তো একটা ভাল কাজ হয়।

ভাল কাজ করতে কোন কালে পেছ-পা নই আমি। শঙ্করবাবু ইস্কুল

করতে চাইলেন, দিলাম ক'রে। এখন সে ইস্কুলে ছাত্তোর জুটছে না, তা তো আর আমার দোষ নয়।

ছাত্র জুটছে না নাকি ?

জুটবে কি ক'রে ? যা এক মাস্টার পাঠিয়েছেন শঙ্করবাবু—লোকটার নাক সর্বদা কুঁচকেই আছে, এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই—নিত্যি একটা না একটা বায়নাক্কা লেগেই আছে। তা ছাড়া বলে কি, শুনবেন ? বলে—ছোটলোকের ছেলেদের গায়ে বড্ড গন্ধ, কাছে বসা যায় না। ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেন্সওলা রুমাল নাকের কাছে ধ'রে পড়ান। এ রকম হুর্তচ্ছেদ্দা করলে ছাত্তোর ওর কাছে ঘেঁষবে কেন— অ্যাঁ, কি বলেন আপনি ? ছোটলোক হ'লেও ওরা মানুষ তো! এখন প্রতিটি ছাত্তোরকে যদি সাবান মাখাতে পারি, তা হ'লে হয়তো ওঁর মনঃপূত হয়, কিন্তু অত পয়সা আমার নেই মশাই, অমন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েও কাজ নেই, আর লেখাপড়া শিখে হবে তো কচু, ইস্কুল করার চেয়ে এ দেশে অন্নছত্র খোলা ভাল। ছোটখাটো একটা খুলেওছি, গুটি দশেক লোককে খেতে দিই, তার বেশি আর পারি না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মুকুন্দ পোদ্দার পুনরায় বলিলেন, ইস্কুল-ফিস্কুল চলবে না।

স্কুল সম্বন্ধে নিপুর নিকট হইতে কোন মন্তব্য না শুনিয়া পোদ্দার মহাশয় ও-বিষয়ে আর আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলেন না। কি জানি, শঙ্করকে গিয়া যদি লাগায়! উৎপলের দক্ষিণহস্ত শঙ্করকে চটাইবার সাহস তাঁহার নাই। স্কুল সম্বন্ধে এতক্ষণ তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্য খানিকটা সত্য। কিন্তু স্কুল না চলিবার আসল কারণ শিক্ষকের ফিনফিনে পাঞ্জাবি অথবা তাঁহার সদ্গন্ধ-প্রিয়তা নয়। আসল কারণ তিনি নিজেই। ভজহরির মারফৎ তিনিই পাকে-প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন, ছাত্র যাহাতে না জোটে। ভজহরি গ্রামের চাষীদের গোপনে "টিপিয়া" দিয়াছে যে, স্কুলে যেন তাহারা ছেলে না পাঠায়, পাঠাইলে পোদ্দারজী চটিয়া যাইবেন। ছাত্র না জুটিবার ইহাই যথেষ্ট কারণ এবং আসল কারণ।

প্যাম্‌প্লেট লিখি তা হ'লে ?

লিখুন। পাঁচজনের যদি উপকার হয়, দেব না হয় ছাপিয়ে। কিন্তু কটি শর্তে।

কি, বলুন ?

একটি নয়, দুটি শর্ত আছে। প্রথম—আমার নাম কারুর কাছে প্রকাশ রতে পারবেন না। দ্বিতীয় শর্তটি একটু ইয়ে-গোছের—বুঝিয়ে বলি হ'লে, শুনুন। আচ্ছা, ছোটলোকদের মধ্যে আন্দোলন চালাতে পারবেন পনি ?—মানে, স্ট্রাইক, ধর্মঘট এই সব ?

তা চেষ্টা করলে পারি বোধ হয়।

বহুৎ আচ্ছা। একটি কাজ করতে হবে আপনাকে। শুনেছেন বোধ য়, হৃদয়বল্লভ উৎপলের কাছ থেকে জমিদারিটা ফিরে কিনে নেবার চেষ্টা রছে, রাজীব দিচ্ছে টাকা। এর মানেটা বুঝছেন ?

নিপু কিছুই শোনে নাই। মনে মনে আশ্চর্য হইল। বাহিরে কিন্তু নে ভাব করিল, যেন সে সব জানে।

বুঝছেন কিছু ?

না।

এর মানে, ওই চশমখোর কঞ্জুস রাজীবই শেষ পর্যন্ত জমিদার হবে। আর া হ'লে দুর্গতির অন্ত থাকবে না ভদ্দরলোকদের। উৎপল জমিদারি বিক্রি রুক, হৃদয়বল্লভ তা কিনুক—এ ওয়াজিব ব্যাপার, আমার কোনও আপত্তি নই ; কিন্তু রাজীবকে মাথা গলাতে দোব না আমি তার মধ্যে। হৃদয়বল্লভ দি চায়, আমিই টাকা দিতে পারি।

বিহ্বল নিপু বলিল, আমাকে কি করতে হবে ?

কিছু নয়, হৃদয়বল্লভকে এই কথাটি শুধু জানিয়ে দিতে হবে যে, রাজীবের টাকা নিয়ে আপনি যদি জমিদারি কেনেন, তা হ'লে আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন না। আমরা ধর্মঘট করব, প্রজারা যাতে খাজনা না দেয় তার চেষ্টা করব, গান্ধীর দলকে ডেকে আনিয়ে ছারখার ক'রে দেব সব। জমিদারি

আপনি কিনুন, কিন্তু রাজীবের টাকা দিয়ে নয়। আমি টাকা দিতে রাজী আছি, নিতে হ'লে আমার টাকাই নিক।

মানে, আপনি নিজেই জমিদার হতে চান ?

মুকুন্দ পোদ্দার হাসিলেন। তাঁহার দাঁতের সোনা আবার চকচক করিয়া উঠিল।

আমি জমিদার হ'লে দেখবেন, কি করি। নিজের মুখে আগে থাকতে বলতে চাই না কিছু, দেখবেন। প্রজার ভাল কি ক'রে করতে হয়, তা দেখিয়ে দোব আমি।

নিপু সহসা অনুভব করিল, এই ধনী মহাজনটিকে খুশি রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহার অনেক সুবিধা হইতে পারে। আজ শঙ্কর যেমন উৎপলের সহায়তায় প্রতাপান্বিত হইয়াছে, সেও একদিন জমিদার মুকুন্দ পোদ্দারের সহায়তায় বহু লোকের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। নিজের আদর্শ প্রচার করিবার সুবিধাই তাহাতে। তাহার এতদিনকার মহাজন-বিদ্বেষ সহসা যেন কুয়াসার মত মিলাইয়া গেল। এই পুঁজিবাদী লোকটার স্বার্থরক্ষা করিতে তাহার আর দ্বিধা হইল না। বলিল, আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখব।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই কিন্তু মুকুন্দ পোদ্দারের আসল কথাটি মনে পড়িয়া গেল।

আজ কিছু দেবেন নাকি ?

হাতে এ মাসে একদম কিচ্ছু নেই। আরও গোটাপঞ্চাশেক টাকার জরুরি দরকার। কি যে করব ভাবছি! দেবেন আপনি ?

দিতে পারি অবশ্য, যদি—

একটু ইতস্তত করিয়া মুকুন্দ বলিলেন, আচ্ছা থাক্, আপনার সঙ্গে আর ব্যবসাদারি নাই করলাম, বন্ধকি দিতে হবে না আপনাকে, এমনিই দেব। কাল সকালে গিয়ে নিয়ে আসবেন। আপনার সোনার হাতঘড়িটাও ফেরত দিয়ে দোব। আপনার সঙ্গে বন্ধকী কারবার আর নাই করলাম—অ্যাঁ, কি বলেন ?

সহাস্যদৃষ্টিতে মুকুন্দ নিপুর দিকে চাহিলেন।

নিপু শুধু একটু মুচকি হাসিল।

রাত হ'ল, এবার ওঠা যাক।

ঘরের কোণ হইতে লাঠিটি লইয়া মুকুন্দ চৌকাঠের উপর সেটি অভ্যাসমত বার দুই ঠুকিলেন।

শীতকালের একটি সুখ কি জানেন, সাপ-খোপের ভয় থাকে না। ওই জিনিসটিকে বড় ডরাই দেবতা।

নিপু আবার মুচকি হাসিল।

মুকুন্দ পোদ্দার চলিয়া গেলেন। মুকুন্দ পোদ্দার চলিয়া গেলে নিপু আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, মনে হইল, সে যেন নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। এতদিন যে বিত্ত সে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ যেন তাহা ডাকাতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। না না না, সে মুকুন্দ রাজীব শঙ্কর উৎপল—কাহাকেও সাহায্য করিবে না, শত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একক সে সগর্বে বিদ্রোহ-পতাকা তুলিয়া যুদ্ধ করিবে, ক্যাপিটালিজ্‌মের সহিত কোন শর্তেই রফা করা চলিবে না। মুকুন্দ পোদ্দারকে এখনই সে কথাটা বলিয়া দেওয়া ভাল। সে উঠিয়া বাহিরে গেল।

পোদ্দার মশাই!

কোন উত্তর আসিল না। পোদ্দার মশাই অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলেন। একটা পেচক কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

২৬

গ্রামের ছোট স্টেশনটিতে শঙ্কর ট্রেন হইতে যখন নামিল, তখন তাহার মনে হইল, একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে যেন তাহার পরিচিত বিছানায় আবার জাগিয়া উঠিল। এতদিন একটা কদর্য ঘূর্ণাবর্তে সে যেন হাবুডুবু খাইতেছিল। দেঁতো হাসি, ছেঁদো কথা, অনান্তরিক আলাপ, সবজান্তা উন্নাসিকতা, স্বার্থসর্বস্ব মনোভাব, যুদ্ধের হিড়িক, তা ছাড়া দোকান—দোকান—দোকান। এই অল্প কয়েক দিনে কলিকাতার আবহাওয়া তাহার মনে যে গ্লানি জমাইয়া

তুলিয়াছিল, কুৎসিত-দর্শন স্টেশন-মাস্টারের আকর্ণবিস্তৃত আন্তরিক হাসির স্পর্শে তাহার অনেকখানি যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল।

আমার জিনিস এনেছেন?—হাসিয়া মাস্টার মহাশয় আগাইয়া আসিলেন।

এনেছি।

ঝুড়ির ভিতর হইতে রবিন্‌সনের বার্লির কৌটাটি শঙ্কর বাহির করিয়া দিল।

বিস্তর জিনিস এনেছেন দেখছি। আরে, বা বা বা—চমৎকার, কুমরটুলির নিশ্চয়?

হ্যাঁ। সমস্ত রাস্তা আগলে আগলে আসছি। পাছে কেউ ধাক্কা মেরে দেয়।

সরস্বতী-প্রতিমাটিকে শঙ্কর সস্নেহে একধারে সরাইয়া রাখিল। ছোট প্রতিমাটি, কিন্তু নিখুঁত একেবারে।

আপনার আনা চারেক ফিরেছে। এই নিন।

ঘাড় ফিরাইয়া শঙ্কর দেখিল, মাস্টার মহাশয় নিজ প্রকোষ্ঠে অন্তর্ধান করিয়াছেন। ক্ষণপরেই তিনি থার্মোফ্লাস্ক হইতে কাপে চা ঢালিতে ঢালিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

একটু ইষ্টিম ক'রে নিন, যা শীত।

কোথা পেলেন এই ভোরে?

আমার জন্যে এসেছিল বাড়ি থেকে। আমি আবার আনিয়ে নিচ্ছি।

না না, সেটা ঠিক হয় না।

খুব ঠিক হয়। আমি আনিয়ে নিচ্ছি এখুনি। আপনি যা জিনিস এনেছেন, গিন্নী দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবে এখন আপনাকে।

বাড়িতে কারও অসুখ নাকি?

তিন-তিনটে মেয়ে পেটের অসুখে ভুগছে মশাই। গাঁদালপাতার ঝোল আর খেতে পারে না বেচারীরা। নটবর বার্লি খাওয়াতে বলেছে, কিন্তু এ অঞ্চলে ও-বস্তু পাবার জো নেই। ভাগ্যে আপনি কলকাতা গেলেন—ও ইয়েস, আপনার সব জিনিস নেবেছে তো, ও ইয়েস, অল রাইট, অল রাইট।

মাস্টার মহাশয়ের সমর্থন পাইয়া গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাইয়া সবুজ পতাকা আন্দোলিত করিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

চা খুব খারাপ, তবু শঙ্করের অন্তর যেন পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। চা পান করিয়া শঙ্কর পেয়ালাটি নামাইয়া রাখিল। ইতিপূর্বে অনেকবার তাহার মনে হইয়াছে—এখন আবার মনে হইল, এই কেরানীরাই প্রকৃত ভদ্রলোক। ইহারা হয়তো 'এডুকেটেড' নয়, কিন্তু ইহারাই ভদ্রলোক। ছাপোষা বেচারীরা তথাকথিত কাল্‌চারের ধার ধারে না, কিন্তু স্বল্প আয় সত্ত্বেও ইহারাই সামাজিক সমস্ত দায়িত্ব বহন করে। থলি হাতে বাজারে যায়, ঋণগ্রস্ত হইয়া ছেলে পড়ায়, মেয়ের বিবাহ দেয়, অসমর্থ আত্মীয়কে প্রতিপালন করে, লোক-লৌকিকতা বজায় রাখে, চাঁদা করিয়া দুর্গাপূজা কালীপূজা করে, রাত জাগিয়া যাত্রা-থিয়েটার শোনে। অথচ কোন অহমিকা নাই, সবদাই যেন সঙ্কুচিত হইয়া আছে। স্বাতন্ত্র্যবাদী ড্রইংরুম-বিহারী আলোকপ্রাপ্ত সমাজে যে আন্তরিকতার অভাব, ইহাদের মধ্যে বাঙালী জাতির সেই সহৃদয় আন্তরিকতা এখনও জীবন্ত হইয়া আছে, ওষ্ঠ-চটক অন্তঃসারশূন্য আপ্যায়নমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই।

আপনার চার আনা ফিরেছে, এই নিন।

সস্তায় পেয়েছেন তা হ'লে। ওরে বজ্‌রঙ্গি, পেয়ালাটা তুলে রাখ্‌ বাবা, পা লেগে ভেঙে গেলেই গেল। আচ্ছা, আমি এবার চলি, ঘানি কামাই দেবার জো নেই তো।

হাসিয়া মাস্টার মহাশয় নিজ অফিসে প্রবেশ করিলেন।

মুশাই গরুর গাড়ি আনিয়াছিল। কুলির সাহায্যে সে জিনিসপত্র গরুর গাড়িতে তুলিতে লাগিল। কাপড়-চোপড়, বই খাতা, এক ঝুড়ি কমলালেবু, এক ঝুড়ি নারকুলে কুল, বাসনপত্র, গোটা দুই কোদাল, বাংলা দেশের কুলো, ধুচুনি, এক বাক্স গ্রামোফোন রেকর্ড, তা ছাড়া সুটকেস, বিছানা—গাড়িতে বসিবার স্থান আর রহিল না। শঙ্কর ঠিক করিল, হাঁটিয়াই যাইবে। সরস্বতী-প্রতিমাটা লইয়া যাওয়াই সমস্যা। স্কুলের ছেলেদের ফরমাশ, অনেক কষ্টে বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া এতদূর আনিয়াছে। ছোট প্রতিমা, একটা কুলি মাথায়

করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না? পারা তো উচিত। মুশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, চেটিয়া সেনি আইলোছে, ওহি লোগ লে যাইতে—

ওরা এসেছে? কই, কোথায়?

মুশাইয়ের অঙ্গুলিনির্দেশে শঙ্কর দেখিল, স্টেশন হইতে একটু দূরে যে প্রকাণ্ড বটগাছটা আছে, তাহার নীচে একদল ছাত্র সত্যই বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে এখনও দেখিতে পায় নাই বোধ হয়। এই ভোরে এতটা পথ তাহারা হাঁটিয়া আসিয়াছে! তাহার নিজের ছাত্রজীবন মনে পড়িল। সরস্বতীপূজাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রজীবনে কি উৎসাহই না হইত! সরস্বতী-পূজার আগের দিন রাত্রে চোখে ঘুমই আসিত না। দুবেজীকে মনে পড়িল। তিনি স্বহস্তে প্রতিমা নির্মাণ করিতেন। খড় দেওয়া হইতে শুরু করিয়া রং দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ দুবেজীর বাড়িতে ধরনা দিয়া বসিয়া থাকিত সে। দুবেজীর চেহারাটা স্পষ্ট মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ হইয়া একটু কুঁজো হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুখে একটি দাঁত ছিল না, কপালের মাঝখানে একটি চন্দনের ফোঁটা পরিতেন। বড় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাণ দিয়া ঠাকুরটি গড়িতেন, প্রাণ দিয়া পূজাও করিতেন। ছাত্রজীবনের সেই অতীত দিনগুলি শঙ্করের মনে সজীব হইয়া উঠিল। দেবদারুপাতা আর রঙিন কাগজের শিকল দিয়া স্কুল সাজানো, নিষ্ঠাভরে কুল না খাওয়া, পূজার দিন ভোরে উঠিয়া যবের শিষ সংগ্রহের জন্য মাঠে যাওয়া, অঞ্জলি না দেওয়া পর্যন্ত উপবাস করিয়া থাকা···। ছাত্রদল আসিয়া শঙ্করকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের চোখে মুখে কি প্রদীপ্ত উৎসাহ! তাহারা আশাই করিতে পারে নাই যে, শঙ্করবাবু সত্য সত্যই তাহাদের জন্য প্রতিমা লইয়া আসিবেন। যদির উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল। কুলির দরকার কি? প্রতিমা তাহারাই বহিয়া লইয়া যাইবে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন বালক সোৎসাহে আগাইয়া আসিল। মুশাই গরুর গাড়ি লইয়া আগাইয়া চলিয়া গেল। ছাত্রদের সহিত শঙ্কর পথ হাঁটিতে লাগিল।

প্রভাত হইতেছে। দুই পাশে চাষের জমি। সরিষা কাটা হইতেছে। গম এবং যবের শিষ ধরিয়াছে। চতুর্দিকেই স্নিগ্ধ শ্যামলশ্রী। ফুলে পাতায়

শিশিরবিন্দু টলমল করিতেছে। কোথায় যেন একটা শ্যামা পাখি শিস দিতেছে। বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে। একটা ক্ষেতের মাঝখানে বসিয়া কয়েকটা কাক কলরব তুলিয়াছে। কোথাও যেন কোন অভাব নাই, নীচতা নাই, কলহ নাই, সমস্তই যেন প্রাচুর্যে, দাক্ষিণ্যে, সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। শঙ্করের মনে হইল, এই তো আমার দেশমাতৃকা, অন্নপূর্ণা, সদাহাস্যময়ী জননী। মুগ্ধনেত্রে শঙ্কর সম্মুখের দিকে চাহিল। ছাত্রের দল সরস্বতী-প্রতিমাকে মাথায় করিয়া লইয়া চলিয়াছে, যে সরস্বতী কুন্দেন্দুতুষারধবলা', পুস্তক-শ্রী, বীণাপাণি, সংশয়-অন্ধকার-বিনাশিনী, জ্যোতির্ময়ী বাণী। তাহার মনে হইল, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট রূপটি আজ যেন এই প্রভাত-আলোকে অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল মাঠের বুক চিরিয়া সরু একটি পায়ে-চলার পথ, সেই পথ দিয়া বিদ্যার্থীর দল বাণীমূর্তিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়াছে, কত রাজ্যের কত উত্থান-পতন হইল, ভারতবর্ষের এই মূর্তিটি কিন্তু এখনও শাশ্বত হইয়া আছে।

২৫

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাণ্ড হল-ঘরে প্রকাণ্ড টেবিলে প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ বিস্তৃত করিয়া উৎপল তন্ময়চিত্তে কি যেন দেখিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল।

ও কি ?

তাহার স্বরটা যেন রুক্ষ। উৎপল চকিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় ম্যাপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল এবং বলিল, আধুনিক কুরুক্ষেত্র।

ম্যাপ দেখে খবরের কাগজ পড়ছ! যুদ্ধ নিয়ে খুব উন্মত্ত হয়ে উঠেছ তা হ'লে ?

খুব। মানব-সভ্যতার এতবড় একটা উৎক্ষেপে তোমরা যে কি ক'রে অবিচলিত আছ, আমি বুঝতে পারছি না।

আমরা তো উদ্ভিদ মাত্র। মানব-সভ্যতার হর্ষ-বিষাদের সঙ্গে আমাদের

সম্পর্ক কি ? যাদের তুমি মানব বলছ, তাদের সঙ্গে আমাদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। তুমি হয়তো মানব, কিন্তু আমি নই।

উৎপল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর টেবিল হইতে সিগারেট-কেসটা তুলিয়া স্মিতমুখে খুলিয়া ধরিল।

অনেকক্ষণ সিগারেট খাও নি মনে হচ্ছে।

সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উৎপল বলিল, হঠাৎ এ তুষ্কী ভাব ?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

ব্যাপার কি ? ব'স্, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

শঙ্কর একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। সিগারেট-প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার নয়, যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহাই বলিয়া ফেলিল।

নিজে জামিন হয়ে ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম।

কাদের !

ফরিদ কাক্ক পূরণ আর হরিয়াকে ?

কে তারা ?

তোমার প্রজা। দারোগা সাহেব তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে মারধোর করছিলেন, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই।

ওঁ।

উৎপল সন্তর্পণে সিগারেটে একটি টান দিল এবং ব্যাপারটা এইবার হৃদয়ঙ্গম করিল। এতক্ষণ সে সত্যই কিছু বুঝিতে পারে নাই। সিগারেটের মৃদু-গোছের আর একটা টান দিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্কর আর কোন কথা বলিল না, তাহার রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল। উৎপল ম্যাপটার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা বলিল, ওরা যে নির্দোষ, তা আশা করি তুমি ঠিক জান।

না, জানি না।

অথচ ওদের জন্তে জামিন হ'লে ?

ওরা দোষী কি নির্দোষ তা জানি না বটে, কিন্তু আসল কথাটা জানি।

কি সেটা ?

ওরা নিরুপায়।

বাই জোভ !

ওরা চুরি করে কেন, জান ?

উৎপলের চক্ষু দুইটি কৌতুকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

জানি এবং এর পর তোমার কি বক্তৃতা যে আসন্ন, তাও জানি।

সব জেনেও ওদের বিরুদ্ধে থানা-পুলিস করতে ইচ্ছে হ'ল তোমার ?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়মের খাতিরে অনেক জিনিস করতে হয়। বিশেষ ক'রে ওদের বিরুদ্ধেই আমি কিছু করি নি, চুরি হ'লে থানায় খবর দেওয়া উচিত ব'লেই দিয়েছিলাম।

থানায় খবর দিলেই চোর ঠিক ধরা পড়বে, এটা তুমি বিশ্বাস কর ?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠছে না। চুরি হ'লেই থানায় খবর দেওয়াই প্রতিকারের একমাত্র উপায়। সভ্য-সমাজে এ ছাড়া দ্বিতীয় আর কি উপায় আছে, বল ?

সভ্য-সমাজের কথা জানি না, নিজেদের সমাজের কথা জানি।

সেটা কি খুলেই বল না ?

ওই তো বললাম, আমরা নিরুপায়।

উৎপল স্মিতমুখে ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কি করতে বল তা হ'লে তুমি ? চুরি হ'লে সহ্য করব ?

তোমার নিজের ভাই চুরি করলে থানায় খবর দিতে ? ধর, যদি তোমার একটা চোর ভাই থাকত।

তা হয়তো দিতাম না। কিন্তু পৃথিবীশুদ্ধ সকলকে নিজের সহোদর ব'লে স্বীকার করতে হবে ? কার্যকালে তা পারি না, কাব্য করবার সময় পারি অবশ্য।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

পুনরায় ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উৎপল বলিল, হঠাৎ হ'ল কি তোর, ছাড়িয়ে এনেছিস, বেশ করেছিস, আমার ওপর তম্বি কেন? আমি কি আপত্তি করছি?

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা চালাতে দেব না তোমাকে আমি।

হঠাৎ তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। সে আর বসিল না, উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া উৎপল অস্ফুটকণ্ঠে পুনরায় বলিল, বাই জোভ!

শঙ্কর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্তরের যুক্তিহীন ক্ষোভকে অকস্মাৎ ভাষায় প্রকাশ করিয়া সে যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। এলোমেলো নানা কথা মনে হইতেছিল। কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না—কি করা উচিত, কোথায় পথ, অসংখ্য অসহায় পল্লীবাসীদের কি করিলে উপকার হইবে? মনে হইতেছিল, সে কিছুই জানে না, অথচ পল্লী-সংস্কার করিতে নামিয়াছে। নিজের অক্ষমতায় সে মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। উৎপলের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর-মুহূর্ত হইতেই একটা নিদারুণ সঙ্কোচে সে যেন মরিয়া যাইতেছিল। এমন কি বাড়ি ফিরিয়া যাইতেও তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল। একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল, ভাবপ্রবণতার আধিক্যবশত সে হয়তো অমিয়ার প্রতি অবিচার করিতেছে। এই তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র করিয়া হয়তো ঝড় উঠিবে এবং সে ঝড়ে অমিয়ার ক্ষুদ্র নীড়খানি হয়তো ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। নিজের প্রতি তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। হঠাৎ কখন যে কি করিয়া বসিবে, অতর্কিতে কি হইয়া যাইবে, তাহা নিজেও সে জানে না। অন্তরের অন্তস্তল হইতে মাঝে মাঝে কিসের যেন একটা ঘূর্ণন জাগে, সুবিন্যস্ত চিন্তাধারাকে অবিন্যস্ত করিয়া দেয়, সাজানো বাগান ছারখার হইয়া যায়। হঠাৎ খুকীর মুখটা মনে পড়িল—কচি দুষ্টু মুখটা। না না, উৎপলের সহিত ঝগড়া করা চলিবে না। কিন্তু

উৎপল কেন তাহার মনের কথা বুঝিবে না? কেন সে এমন নির্বিকারভাবে দূরে হইতে মজা দেখিবে কেবল? সভ্য-সমাজের আইন মানিয়া চলাটাই কি জীবনের একমাত্র নীতি? কিন্তু উৎপলই বা করিবে কি? আইন মানিয়া চলা ছাড়া যে উপায় নাই। চুরি হইলে থানায় খবর দেওয়াই উচিত।···পরক্ষণেই ফরিদ-কারু-হরিয়ার মুখগুলি মনের উপর একে একে ভাসিয়া উঠিল, তাহাদের পিঠের বেতের দাগগুলিও। নিরীহ নিরুপায় বেচারারা, সুরমার শাড়ি গহনা উহারা যদি লইয়াই থাকে, নিতান্ত পেটের দায়েই···সহসা মনে হইল, সুরমা হয়তো উৎপলের নিকট সব শুনিয়াছে, হয়তো তাহার কথা লইয়া দুইজনে এতক্ষণ হাসাহাসি করিতেছে।···হঠাৎ তাহার রাগ হইল, আবার পরক্ষণে লজ্জা হইল।···

শঙ্কর নাকি?

কে?

শঙ্কর হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল।

আমি নিপু।

ও, নিপুদা। বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?

না। আমি মুকুন্দ পোদ্দারের বাড়ি থেকে ফিরছি। তোমার সঙ্গেও একটু দরকার ছিল, একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।

কি, বলুন? চলুন, বাড়ির দিকেই ফেরা যাক।

চল।

নিপুদার সান্নিধ্যে শঙ্কর যেন আত্মস্থ হইল। যে দ্বন্দ্ব এতক্ষণ তাঁহার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। উৎপলের জমিদারির সর্বেসর্বা ম্যানেজার জনৈক কর্মচারীর প্রয়োজনীয় আলাপ শুনিবার জন্য সহসা অতিশয় স্বাভাবিকভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুই যেন হয় নাই।

কি বলবেন, বলুন?

মুকুন্দ পোদ্দারকে যে কথা বলবার জন্যে গিয়েছিলাম, তোমাকেও সেই কথাই বলতে চাই। আমি তোমাদের শত্রু।

শত্রু !

শঙ্কর বিস্মিত হইল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মন অজ্ঞাতসারেই যেন শত্রুর বিরুদ্ধে বর্মাবৃত হইয়া গেল। কমিউনিস্ট নিপুদা।

আপনি আমাদের শত্রু! বলেন কি ?

হ্যাঁ, শত্রু। আমি কমিউনিস্ট, তোমরা ক্যাপিটালিস্ট, তোমাদের উচ্ছেদ করাই আমার ধর্ম। তোমাদের সঙ্গে আপোস ক'রে চলতে পারব না আমি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আমার ধারণা ছিল, আমরা সবাই এক দলের।

ভুল ধারণা ছিল। আমি অন্য জাতের লোক।

অন্য জাত মানে ? অ-ভারতীয় ?

না, কমিউনিস্ট।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, একটা নামের লেবেল লাগিয়ে দিলেই যে জাত বদলে যায়, তা তো জানতুম না। যে লেবেলই লাগান নিপুদা, একটা কথা ভুলে যাবেন না, আমরা সকলেই নিরুপায় পরাধীন ভারতবাসী, এখন এই আমাদের একমাত্র পরিচয় জগতের কাছে।

ভুলব কেন ? মুহূর্তের জন্যেও ভুলি না সে কথা। ভুলি না ব'লেই তো ক্যাপিটালিজ্‌ম এই পরাধীনতার কারণ, যে ক্যাপিটালিজ্‌মের তোমরা পৃষ্ঠপোষক, সেই ক্যাপিটালিজ্‌মকে ধ্বংস করতে চাই আমরা। আমরা চাই সাম্য।

কে না চায় ? পৃথিবীতে যুগে যুগে সভ্য মানুষের ওই তো আদর্শ, ওই তো স্বপ্ন।

স্বপ্ন কিন্তু এখন আর স্বপ্নমাত্র নেই, রাশিয়ায় তা সফল হয়েছে। আমরা যদি তাদের পন্থা অনুসরণ করি—

রাশিয়ায় কি সর্বজনীন সাম্য হয়েছে ব'লে আপনার বিশ্বাস ? আমার মনে হয়, সেখানে চাকাটা ঘুরে গেছে শুধু। সেখানেও হিংস্র বর্বর অসহায় দুর্বলকে পেষণ করছে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রমিকরা নির্যাতন করছে

ক্ষমতাচ্যুত ধনিকদের। একে আপনি সাম্য বলেন? সাদা চামড়া যেমন অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে কালো চামড়াকে, সোভিয়েটও তেমনই অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে 'কুলাক'দের।

কালা আদমি আর 'কুলাক' এক জাতীয় নয়। উপমাটা ঠিক হ'ল না তোমার।

বিশেষ তফাত কি? কালো হয়ে জন্মানোটা যদি অপরাধ ব'লে না ধরেন, ধনী হয়ে জন্মানোটাই বা অপরাধ ব'লে ধরবেন কেন?

ধনী হয়ে কেউ জন্মায় না, গরিবের রক্ত শোষণ ক'রে তবে লোকে ধনী হয়।

সত্যি সত্যি গরিবের রক্ত শোষণ যারা করে নি, ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করেছে—এই মাত্র যাদের অপরাধ, তাদেরও আপনারা নিস্তার দেন নি।

রক্তবীজের বংশ নির্মূল করাই উচিত।

ওটা আপনাদের রাগের ভাষা। একটু তলিয়ে দেখেন যদি, কালা আদমি আর ধনীদের উপমাটা নেহাত খেলো মনে হবে না। একটা বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যেমন কালো হয়, তেমনই একটা বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবেশে বুদ্ধিমানও ধনী হয়। গরিব হয় বোকারা। বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারেই এসব হয়, এর জন্যে ন্যায়ত কাউকে অপরাধী করা যায় না। শক্তি অথবা বুদ্ধি থাকা পাপ নয়।

ডাকাতকেও তা হ'লে অপরাধী করা যায় না তোমার মতে, তার শক্তি বুদ্ধি দুইই আছে।

শক্তি আর বুদ্ধির যুদ্ধে সে যদি জয়ী হয়, বিজ্ঞানের চোখে নিশ্চয়ই সে অপরাধী নয়, বৈজ্ঞানিক তাকেই বাহবা দেবে, বিজয়ী সোভিয়েটকে এখন আপনারা যেমন দিচ্ছেন।

অসহায় দুর্বলরা তাদের প্রাপ্য ফিরে পেয়েছে ব'লে দিচ্ছি, অন্য কোন হেতু নেই। আমরা অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে—

অসহায় উদ্ভিদ গরু ছাগল মুরগী মাছ—এদের দিক দিয়ে ভেবে দেখলে সমস্ত মানব-জাতিটাকেই তা হ'লে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়।

তোমার মত ক্যাপিটালিস্ট-সুলভ কল্পনাশক্তি আমার নেই। আমি মানুষ, মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই ভাবি। গরু-ছাগলের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত বাজে কবিত্ব আমার নেই। মানুষের মধ্যে যারা বঞ্চিত দুর্গত সর্বহারা, যাদের ঠকিয়ে ঠকিয়ে তোমরা বড়লোক হয়েছ, আমি তাদের দলে, তুমি যতই না কবিত্ব কর।

কবিত্ব নয়, বায়োলজি। বায়োলজিস্টের চোখে জীবজগতে দুটি মাত্র দল আছে—বিজিত এবং বিজেতা। উদ্ভিদ গরু ছাগল মুরগী মাছ এবং আপনার ওই বঞ্চিত দুর্গত সর্বহারারা বায়োলজিস্টের বিচারে একশ্রেণীভুক্ত, জীবন-যুদ্ধে সক্ষম লোকের কাছে ওরা হেরে গেছে কিংবা যাচ্ছে।

যারা মানুষকে মুরগী-মাছের সামিল ক'রে দেখে, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। আমরা বঞ্চিতদের দলে, ওরাও যাতে পৃথিবীতে মানুষের মত বাঁচতে পারে, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করব আমি।

আমরাও তো সেই চেষ্টাই করছি। সেইজন্যেই তো আপনাকেও ডেকে এনেছি, আপনি আমাদের শত্রু ভাবছেন কেন ?

নিপুদা চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ পথ চলিয়া শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, হঠাৎ আপনার আজ এ কথা মনে হচ্ছে কেন ?

হঠাৎ হয় নি, বরাবর এই আমার মত। এতদিন সে কথা বলবার সাহস ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, দু নৌকোয় পা দিয়ে আমি চলতে পারব না।

সত্যিই কি নৌকো দুটো ? আমরা সবাই কি এক নৌকোতেই ভাসছি না ?

না। কবিত্ব ক'রে আসল সত্যটা কিছুতেই ঢাকা দিতে পারবে না। তোমাদের সঙ্গে আমার অনেক তফাত। তোমরা সুখী। অন্তত দেহের স্বাভাবিক ক্ষুধা মেটাবার সঙ্গতি তোমাদের আছে, আমার নেই। কোনক্রমে কদন্ন খেয়ে, ভয়ে ভয়ে কুৎসিত নারীসঙ্গ ক'রে, দেঁতো হাসি হেসে আমাকে যে দুর্বহ জীবন যাপন করতে হয়, তার সঙ্গে তোমাদের জীবনের কিছুমাত্র মিল নেই। তোমাদের অধীনে থেকে তোমাদের অনুগ্রহ-প্রদত্ত যৎসামান্য বেতন নিয়ে হাড়ি-পাড়ার কদর্যতার মধ্যে বাস ক'রে এ কথা

কিছুতেই আমি মানতে পারব না যে, আমরা এক নৌকোতে ভাসছি। আমাদের জাত আলাদা,—আমরা বঞ্চিত, তোমরা বঞ্চক। মিথ্যা অভিনয় করতে পারব না আমি।

শঙ্করের কানের দুই পাশ সহসা গরম হইয়া উঠিল। তবু আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল সে এবং ক্ষণকাল পরে সংযতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি করবেন তা হ'লে ?

আজই কলকাতা চ'লে যাব। মিথ্যার মুখোশ প'রে তোমাদের অধীনে কাজ করা পোষাল না আমার।

বেশ।

আচ্ছা, চলি তা হ'লে।

নিপুদা হঠাৎ বিপরীত দিকে ঘুরিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিস্মিত শঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। উদীয়মান ক্রোধ কোথায় বিলীন হইয়া গেল, নিপুদার কাতর অন্তরটা, সহসা যেন অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল সে। শুধু নিপুদার নয়, দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকদের করুণ মর্মকথা নূতন করিয়া তাহার চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সত্যই বঞ্চিত বেচারারা। লেখাপড়া শিখিবার সময় আদর্শ-জীবনের যে স্বপ্ন তাহারা দেখে, লেখাপড়া শেষ করিয়া কিছুতেই তাহারা বাস্তব জীবনে সে স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতে পারে না। মরীচিকার মত কেবলই তাহা দূর হইতে প্রলুব্ধ করে, কিছুতেই নাগালের মধ্যে ধরা দেয় না। আদর্শ জীবন দূরে থাক্, স্বাভাবিক জীবন যাপন করিবারই সুযোগ মেলে না, অতিশয় স্থূল আধিভৌতিক ক্ষুধা মিটাইবারও সঙ্গতি নাই। ঘরের পরের—সকলের অবজ্ঞা উপহাস শুনিয়া চাকরির চেষ্টায় আপিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, মুক্তির চেষ্টায় অবশেষে হয় স্বদেশী, না হয় সাহিত্যিক হয়। শঙ্কর আবার পথ চলিতে শুরু করিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ফরিদ কাক হরিয়া পূরণই কেবল নয়, নিপুদা, এমন কি, সে নিজেও একদলভুক্ত, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত লাঞ্ছিত অপমানিত। নিপুদাদের দুঃখটা আরও বেশি মর্মান্তিক। কল্পনায় তাহারা যে মহত্তর জীবনের স্বাদ পাইয়াছে, বাস্তবে কিছুতেই তাহাকে মূর্ত করিয়া

তুলিতে পারিতেছে না। পিপাসা জাগিয়াছে, কিন্তু পানীয় নাই, আছে শুধু স্বপ্ন। আলো কি তাহা জানে, মিলিয়াছে কিন্তু আলেয়া। ফরিদ-কারু-হরিয়াদের অভাব আছে, কিন্তু স্বপ্ন নাই। তাই তাহারা অভাবের মধ্যেও সুখী। স্বপ্নই পাগল করিয়া তোলে। পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, এই কথাগুলাই বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে শঙ্কর পথ চলিতে লাগিল। বার বার তাহার মনে হইতে লাগিল, সুমহৎ হিন্দুসভ্যতার ঐতিহাসিক আস্ফালনে মাতিয়া যত বাগাড়ম্বরই আমরা করি না কেন, এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না যে, আমরা হারিয়া গিয়াছি। বিজয়ী প্রতিপক্ষের নিষ্ঠুর প্রহারে আমরা মরণোন্মুখ, কেবলমাত্র হিন্দুসভ্যতার জয়গান করিয়া গীতাউপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত আওড়াইয়া কিছুতেই সে মৃত্যুকে রোধ করা যাইবে না। সহসা তাহার মনে হইল, সনাতন আর্যসভ্যতা সত্যই যদি এত মহৎ ছিল, তবে তাহা সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না কেন? বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব কেন সম্ভবপর হইল? মুসলমানই বা আসিল কেন? তাহা ছাড়া আর্যসভ্যতার যাহা লইয়া আমরা গর্ব করি, তাহার সহিত আমাদের অন্তরের নিবিড় যোগ কতটুকু? যাঁহারা রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-উপনিষদ্ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং আমরা কি একজাতের লোক? রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত চরিত্র কি আমাদের চরিত্র? কিছুমাত্র কি মিল আছে? মিল আছে বরং ইউরোপের। যে আর্যরা এখন ইউরোপে রাজত্ব করিতেছে, সেই আযদেরই একটা অংশ ভারতবর্ষে একদা আসিয়াছিল, তাহাদেরই কীর্তিকলাপ, তাহাদেরই সভ্যতা বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, ইউরোপের ইতিহাসে কাব্যে বিজ্ঞানে যেমন লিপিবদ্ধ আছে ইউরোপীয় আর্যসভ্যতার কাহিনী। আমরা কি আর্য? মোটেই নয়। ওসব লইয়া আমরা বৃথা গর্ব করিয়া মরি। আমরা পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, শোষিত, পদদলিত—এইটুকুই ঐতিহাসিক সত্য, এই সত্যটা যদি কাঁটার মত মর্মে বিঁধিয়া থাকে, তবেই হয়তো উদ্ধারের উপায় আছে। সহসা তাহার মনে হইল, মর্মে কি বিঁধিয়া নাই? প্রতি পদে প্রতি কশাঘাতের সহিত কি মনে পড়িতেছে না, আমরা অক্ষম অশক্ত

অপটু নির্বীর্য স্বপ্নবিলাসীর দল? কিন্তু কই, উদ্ধারের উপায় তো দেখা যাইতেছে না? আমাদের অপটুতা লইয়া আমরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিতেছি, আমাদের দুঃখ-দৈন্য লইয়া কবিত্ব করিতেছি, রাজনীতির নামে হয় খোশামোদ, না হয় দলাদলি করিতেছি, উদ্ধারের উপায় সন্ধান করিতেছি কই? আমাদের শক্তি বাড়িতেছে কই? তাহা ছাড়া আমরা মানে কাহারা? এই গ্রামের লোক? বেহারীরা? বাঙালীরা? ভারতবাসীরা, না, এশিয়াবাসীরা? না, পৃথিবীর যেখানে যত দুর্গত দুর্ভাগা আছে সকলে?...হাঁটিতে হাঁটিতে সহসা সে স্থির করিয়া ফেলিল, নিপুদাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। নিপুদার বাসায় গিয়া যখন সে হাজির হইল, তখন নিপুদা তোরঙ্গ গোছানো শেষ করিয়া বিছানা বাঁধিতেছেন। বাহিরে একটা গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে।

নিপুদা, আপনার যাওয়া হবে না।

নিপুদা শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না। যদিও সে যাইবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, তবু শঙ্করের কথায় মনে মনে যেন একটু তৃপ্তি অনুভব করিল। মুখে বাঁকা হাসিটি ফুটিয়া উঠিল।

আমি থাকতে পারব না ভাই, মাপ কর। যে কাজের ভার তুমি আমাকে দিয়েছ, আমি তার উপযুক্ত নই। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে মতেরও মিল নেই আমার।

আমার মত যে ঠিক কি, আমিই তা জানি না। অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি কেবল। আপনি চ'লে যাবেন না নিপুদা।

শঙ্করের কণ্ঠস্বরে এমন একটা মিনতি ফুটিয়া উঠিল যে, নিপুদা অবাক হইয়া গেল। অন্ধকারে অসহায় পথভ্রান্ত পথিক যেন সাহায্য চাহিতেছে!

তোমার মতের ঠিক নেই, অথচ তুমি দেশের কাজে নেবেছ? তোমার একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়?

দেশের ভাল হোক—সর্বান্তঃকরণে এই আমি চাই, এর বেশি আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

ভাল মানে কি ? মাড়োয়ারীরা বেশি বড়লোক হোক ?

সে সব আলোচনা পরে হবে, আপনি এখন বিছানা খুলুন।

পরস্পর উভয়ের দিকে নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর নিপুদা বলিল, আচ্ছা, তুমি এত ক'রে বলছ যখন, আজকে অন্তত যাওয়াটা স্থগিত রাখলুম, পরে কি করব বলতে পারি না।

শঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ্মীবাগের মণি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। মণি স্বাস্থ্যবান যুবক। শুধু দেহ নয়, মনও তাহার বলিষ্ঠ। কলেজে পড়াশোনা শেষ করিয়া চাষ করিতেছে, চাকরি পাইয়াও চাকরি করে নাই। খুব ভাল শিকারী, কলেজে নাম-করা স্পোর্টস্ম্যান ছিল।

কি হে, কি খবর ?

গুলাব সিং রোজ মোষ পাঠিয়ে আমার গমের ক্ষেতে চরিয়ে দিচ্ছিল. আমি দু দিন লোক পাঠিয়ে ভদ্রভাবে তাকে মানা করেছিলাম, তবু কাল আবার তার মোষ এসেছিল—

এই পর্যন্ত বলিয়া মণি চুপ করিল।

তারপর ?

আমি গোটা দুই মোষ গুলি ক'রে মেরেছি কাল।

মেরেছ !

না মেরে উপায় কি, ভদ্রভাবে বললে যখন শুনবে না ? আমার এক শো বিঘে গম কি ভাবে নষ্ট করেছে, আপনি যদি দেখেন গিয়ে—

তাহার চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

আমাকে কি করতে হবে ?

গুলাব সিং দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে শুনে উৎপলবাবুর কাছে এসেছিলাম. তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, তুমি থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি ক'রে দাও আপাতত।—বলিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল, এই থানা লইয়াই কিছুক্ষণ আগে উৎপলের সহিত তাহার ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা

ছাড়া কি-ই বা করিবার আছে এখন? ওই ঘুষখোর দারোগাটার কাছেই প্রতিকারের জন্ম ছুটিতে হইবে।

মণি উঠিয়া দাঁড়াইল।

আপনি বলছেন যখন, যাচ্ছি আমি থানায়, কিন্তু ওতে কিছু হবে না। আমি এসেছিলাম গোটা কয়েক লাঠিয়াল সিপাহী চাইতে, বেশি নয়, গোটা দশেক সিপাহী যদি আমাকে দেন, মেরে পস্তা উড়িয়ে দিতে পারি আমি ব্যাটাদের।

আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আগে আইনত চেষ্টা ক'রে দেখা যাক।

মণি উঠিয়া গটগট করিয়া চলিয়া গেল। শঙ্করের ব্যবস্থাটা তাহার মনঃপূত হইল না।

রহিম আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

হুজুর, দশঠো রূপিয়াকা বডা—

শঙ্করের আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত তাহাকে শান্তি দিবে না ইহারা!

হিঁয়া কি রূপিয়াকা গাছ হ্যায়? ভাগো হিঁয়াসে।

কণ্ঠস্বর অতটা উচ্চ করিতে সে চাহে নাই, কিন্তু উচ্চ হইয়া পড়িল।

রহিম সভয়ে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। তাহার ভীত চকিত দৃষ্টি শঙ্করকে কশাঘাত করিল যেন।

শুনো।

রহিম ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ক্যা করেগা রূপিয়া লেকে?

তিন দিনসে বালবাচ্চা সব ভুখা হ্যায় হুজুর। কুছ নেই খায়া। মোদীকা দোকানমে দশ রূপিয়া বাকি হ্যায়, ই রূপিয়া নেহি দেনেসে আর উধার নেহি মিলেগা।

সসঙ্কোচে সে থামিয়া গেল। আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া চকিতে শঙ্করের মুখের দিকে একবার চাহিল। নিরুপায় শঙ্কর পকেট হইতে ব্যাগটা

বাহির করিল। দেখিল, পাঁচটা টাকা আছে। ঘরে ঢুকিয়া ড্রয়ার হইতে আরও পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া আনিল। টাকা লইয়া রহিম সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর বাড়ির ভিতর গেল না। বারান্দার ক্যাম্প-চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। মনে হইল, সে যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না. পা দুইটা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। অমিয়াকে ডাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা দিয়া কোন স্বর বাহির হইল না। পাথরের মত কি একটা যেন কণ্ঠরোধ করিয়া আছে। আর একদিন ঠিক এমনই হইয়াছিল, যেদিন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ আসে।···একা অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সহসা তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

২৬

শঙ্করের সহিত তর্ক করিবার পর হইতে কুন্তলা মনে মনে কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নিজের কাছেই যেন সে ছোট হইয়া গিয়াছে। কলেজের ডিবেটিং-ক্লাবে সে তর্ক করিত, সেই অভ্যাসবশেই সেদিন সে নিজেকে সংযত করিতে পারে নাই। ভুলিয়াই গিয়াছিল, কলেজের ডিবেটিং-ক্লাবে যাহা শোভন, শ্বশুর-বাড়িতে তাহা শোভন নহে। তা ছাড়া তর্ক করিয়া লাভ কি? তর্ক করিয়া কখনও কাহারও স্বভাব বা মত পরিবর্তন করা যায় না। মুখে স্বীকার করিলেও মনে মনে যে যাহা তাহাই থাকিয়া যায়। তর্ক করিয়া সময় নষ্ট হয়, নিজের মর্যাদাও নষ্ট হয়। কুন্তলা তর্ক করা ছাড়িয়া দিয়াছে। সুরমার সঙ্গেও আর সে তর্ক করে না। সে অনুভব করিয়াছে, সুরমা তর্ক করে সত্য-উদ্‌ঘাটনের জন্য নয়, তাহার গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য। সুরমা অবশ্য কোন অভদ্রতা করে না, কোন অপ্রিয় কথা বলে না। তাহার সভ্য শিক্ষিত আচরণে এমন কিছুই প্রকাশ পায় না, যাহা লইয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে রাগ করা চলে। কুন্তলার গোঁড়ামিতে সুরমা বিস্ময় প্রকাশ করে, প্রতিবাদ করিলেও এমন সুষ্ঠু সহাস্য ভঙ্গীতে করে যে,

তাহাতে সোজাসুজি অসন্তুষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে, হাসির টুকরায়, বিস্মিত ব্যাজস্তুতিতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গই তাহা বুঝিতে কুন্তলার বিলম্ব হয় না। অনেক সময় সুরমা কুন্তলার কথায় সায়ও দেয়, কিন্তু তাহা যেন বয়স্ক ব্যক্তির শিশুর অসঙ্গত কথায় সায় দেওয়ার মত। কুন্তলা তাই আর তর্ক করে না। যাহা তাহার অন্তরের বস্তু, যাহাকে সে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যাহার প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধাও সে সহ্য করিতে পারে না, তাহা লইয়া এই মূঢ়দের সহিত সে আর বচসায় প্রবৃত্ত হইবে না। টেনিস-বল লইয়া লোফালুফি করা যায়, অন্তরের বেদনা লইয়া যায় না। আজকাল সুরমার সঙ্গ তাই সে এড়াইয়া চলিতেছে। তাহার ভয় হয়, হয়তো কথায় কথায় এমন কিছু বলিয়া ফেলিবে, যাহা তাহার আদর্শের পক্ষে গ্লানিকর। ইহাদের চক্ষে নিজের আদর্শকে সে কিছুতেই কোন কারণেই খাটো করিবে না। যে স্বার্থসর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোশ পরিয়া ইহারা নাচিয়া বেড়াইতেছে, সে সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিতে যাওয়াটাও গ্লানিকর। ক্ষুদ্রকে ব্যঙ্গ করিতে গেলে নিজেকেও ক্ষুদ্রের পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে হয়। একবার তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার যে অগ্রগতির প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ, সেই অগ্রগতির স্বরূপটা বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে। ও-দেশের মনীষা নানা রকম আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে সন্দেহ নাই, চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু আরও চমৎকৃত হইতে হয় সে যন্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া। ওই সব অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য যন্ত্র লইয়া সকলে চুরি ডাকাতি রাহাজানি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহা না করিলে অগ্রগতি হইবে কি করিয়া! কিন্তু প্রবন্ধ রচনা করিবার বাসনাও সে ত্যাগ করিয়াছে। সে কিছুই করিবে না, কাহারও কথায় থাকিবে না, কাহারও সহিত মিশিবে না। অনাড়ম্বরে নিজের আদর্শকে অনুসরণ করিবে কেবল, আস্ফালন করিবার প্রয়োজন কি? সে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্রভাবে থাকিবে। হরিহর পর্যন্ত কুন্তলার পরিবর্তিত আচরণে বিস্মিত। তাহার স্বামীভক্তি যেন বাড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যহ স্বামীর পাদোদক পান করে। হরিহর প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপত্তি টেকে নাই। সেদিন দ্বিপ্রহরে কুন্তলা

নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া নিপুণভাবে ছুরি দিয়া দাঁত খুঁটিবার খড়্‌কে প্রস্তুত করিতেছিল। দুই বেলা আহারের পর হরিহরের খড়্‌কে না হইলে চলে না। এতদিন ন্যাংড়াই খড়্‌কে প্রস্তুত করিত, কোনটা বেশি সরু, কোনটা বেশি মোটা হইত। হরিহরের খুব যে একটা অসুবিধা হইত তাহা নয়, কোনদিন এ বিষয়ে কিছু বলেও নাই সে, তবু স্বামীর এতটুকু অসুবিধাই বা কুন্তলা হইতে দিবে কেন?

হরিহর আসিয়া প্রবেশ করিল।

তোমাকে নেবার জন্যে উৎপলের বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে।

আমি আর এখন যাব না।

ওগুলো তো ন্যাংড়াও করতে পারে, তুমি ঘুরে এস না।

কুন্তলা কোন কথা বলিল না, কেবল, যেমন তাহার স্বভাব, হাসিভরা চোখ তুলিয়া স্বামীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র।

২৭

উৎপলের আজ জন্মতিথি। সমস্ত দিন শঙ্কর বাড়ি ছিল না। তাহাকে যাইতে হইয়াছিল লক্ষ্মীবাগে, মণির ব্যাপার তদন্তের জন্য। তাই দুপুরবেলা সে আসিতে পারে নাই। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সুরমার চিঠি লইয়া একজন চাকর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। চিঠিতে তেমন বিশেষ কিছু ছিল না। সাধারণ কাগজে সংক্ষিপ্ত নিমন্ত্রণলিপি।—

শঙ্করবাবু,

আজ আপনার বন্ধুর জন্মদিন। দুপুরে তো আপনাকে পাওয়াই গেল না। অমিয়া একা মেয়ে নিয়ে এসেছিল। আপনি সন্ধ্যায় এখানে নিশ্চয়ই আসবেন। রাত্রে আমাদের এখানেই খেয়ে যাবেন। আসবেন কিন্তু নিশ্চয়। আপনার জন্য অপেক্ষা করব আমরা। ইতি

সুরমা

সেদিনের পর হইতে শঙ্কর আর উৎপলের কাছে যায় নাই। উৎপলের আজ যে জন্মদিন, সে কথাও তাহার মনে ছিল না। চিঠিটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া এ সঙ্কল্পও সে একবার করিল যে, যাইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, না গেলে ব্যাপারটা আরও দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিবে। তা ছাড়া না যাইবার কোন সঙ্গত কারণ তো নাই। একা একা বাড়িতে বসিয়া কি করিবে এখন? অমিয়া বাড়ি নাই। দাইটা বলিল, খুকীকে লইয়া স্যানিটেশন-বিভাগের চৌধুরীদের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছে সে। চৌধুরীর স্ত্রীর সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, প্রায়ই সেখানে যায়। সুরমা কুন্তলা অথবা হাসির সহিত তাহার তেমন ভাব নাই, যত ভাব চৌধুরীর স্ত্রীর সহিত। শঙ্কর বাড়ির ভিতরে জামা বদলাইবার জন্য একবার ঢুকিল। ঘরে তালা বন্ধ, সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে। সমস্ত বাড়িটাই যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। ছোট্ট দুইটি প্রাণী, কিন্তু সমস্ত বাড়িটাকে যেন পূর্ণ করিয়া রাখে। মুশাই বাহিরের ঘরে স্টোভ জ্বালিয়া চা করিয়া দিল। চা পান করিয়া শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল, যাইবে। মনটা তবু একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। সেদিনের ওই হাস্যজনক কাণ্ডের পর সহজভাবে উহাদের সম্মুখে সে যাইবে কি করিয়া! সেদিন তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে যাহা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা যুক্তির আলোকে আজ তাহার নিকটও হাস্যজনক বলিয়া মনে হইতেছে।

সূর্যালোকস্পর্শে কুয়াসা যেমন বিলুপ্ত হয়, সুরমার হাসির স্পর্শে শঙ্করের মনের সমস্ত গ্লানি তেমনই নিমেষে মুছিয়া গেল যেন। অতিশয় তুচ্ছ কারণে সহসা-উদ্দীপ্ত উত্তেজনায় উৎপলের সহিত তাহার যে মনোমালিন্য ঘটিয়া গেল বলিয়া শঙ্করের ধারণা হইয়াছিল এবং যে ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মন অস্বস্তিতে আশঙ্কায় বিতৃষ্ণায় ক্ষোভে সম্ভব-অসম্ভব নানা কাল্পনিক বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছিল, নিঃশেষে অবলুপ্ত হইয়া গেল স্মিতমুখী সুরমার সানন্দ অভ্যর্থনায়।

আসুন।

একটি কথা মাত্রই সুরমা বলিল। কিন্তু তাহার আলোকিত দৃষ্টি, হাস্যোজ্জ্বল অধর, অভ্যর্থনার প্রসন্ন ভঙ্গিমায় যাহা প্রকাশ পাইল, তাহাতে

তাহার মনের গ্লানিই শুধু মুছিয়া গেল না, মনে রঙও ধরিয়া গেল। যে বীণার তার বহুকাল অনাহত ছিল, তাহা সহসা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল যেন শঙ্কর স্পন্দিত বক্ষে বিস্মিত মুগ্ধ নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া রহিল। বহুকাল পূর্বে যে সুরমা তাহাকে স্বপ্নলোকের পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই সুরমাই সহসা যেন আজ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ডাক দিল, আসুন।

সেই সুরমা! দীর্ঘ দিনের ব্যবধান চকিতে অতিক্রম করিয়া পরিবর্তনের বাধাপুঞ্জ নিমেষে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া সহসা তাহার এ কি অপ্রত্যাশিত অপূর্ব আবির্ভাব! শঙ্করের বয়স সহসা যেন কমিয়া গেল। সেকালের সুরমা স্বপ্নবিহ্বল শঙ্কর পুনর্জীবন লাভ করিয়া সেকালের মোহে, সেকালের বিস্ময়ে সেকালের আকুলতায় আত্মহারা হইয়া ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রবলে যেন রূপকথার দেশে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্যই।

লোকগুলোর কাণ্ড দেখেছ!

উৎপলের কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ চুরমার হইয়া গেল সব। উৎপলকে সে দেখিতে পায় নাই, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই এতক্ষণ সচেতন ছিল না সে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, প্রশস্ত হলটার কোণে একটা সোফায় ঠেস দিয়া উৎপল বসিয়া আছে। গায়ে কারুকার্যমণ্ডিত দামী একখানা শাল, হাতে লাল রঙের ছোট একখানা বই, চোখে মুখে চাপা হাসি। শিয়রের দিকে টেবিলের উপর সুদৃশ্য একটা বাতিও জ্বলিতেছে।

আপনারা গল্প করুন, আমি আসছি।

সুরমা চলিয়া গেল।

কি কাণ্ডর কথা বলছ?

শঙ্কর আগাইয়া গিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

এই ম্লেচ্ছ ব্যাটাদের—

লাল বইখানা তুলিয়া দেখাইল সে। পেঙ্গুইন সিরিজের বই, 'সায়েন্স ইন ওয়ার'। শঙ্কর একটু মুচকি হাসিল।

কি কাণ্ড! কোথায় আধ্যাত্মিক চিন্তা করবে, তা না কাঠ থেকে চিনি করছে, বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে নাইট্রেট তৈরি ক'রে ও

দিয়ে বোমা বানাচ্ছে! সিন্‌থেটিক রবারই বানিয়ে ফেললে। সিন্‌থেটিক সিল্ক।

উৎপল সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং টেবিল হইতে সিগারেট-কেসটা তুলিয়া বলিল, যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা ব্যাটাদের। এই নাও।

সিগারেট-কেসটা আগাইয়া দিল। পরক্ষণেই সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার।

ও, আই অ্যাম সরি, মনেই ছিল না।

নিজে সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে সেটি ধরাইল, তাহার পর চোখের দৃষ্টিতে হাসি বিকিরণ করিয়া বলিল, কতদিন এ কৃচ্ছ্রসাধন চলবে তোমার?

যতদিন চালাতে পারি।

উৎপল ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া আবার নামাইয়া লইল, কোন কথা বলিল না। শঙ্করও চুপ করিয়া রহিল। অস্বস্তিকর নীরবতা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না, সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিল।

কুন্তলা এ বেলাও এল না।

ও।—উৎপল সন্তর্পণে সিগারেটে একটা টান দিল।

আর একটা কথা শুনেছ? শঙ্কর সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে।

ভালই তো।

উৎপল শঙ্করের দিকে ফিরিয়া চোখে মুখে ছদ্ম-উদ্বেগ ফুটাইয়া প্রশ্ন করিল, মাছ মাংস খাচ্ছিস তো?

শঙ্করের কানের দুই পাশ সহসা গরম হইয়া উঠিল। সুরমার সম্মুখে উৎপলের এ ব্যঙ্গ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তবু আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল সে। কোন উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল শুধু।

চা খাবেন?—সুরমা প্রশ্ন করিল।

না, এইমাত্র খেয়ে আসছি।

উৎপলের চোখের দৃষ্টি পুনরায় কৌতুক-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টির

অর্থ—ও, চা-টা ছাড় নি তা হ'লে ? ভাল। শঙ্করও সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, মনে মনে আরও একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

সুরমার দিকে চাহিয়া উৎপল বলিল, অকূল সমুদ্রে প'ড়ে ও একটা ভেলা খুঁজছে, উদ্ধার কর ওকে।

শঙ্করবাবু সমর্থ লোক, সমুদ্রে যদি প'ড়েই থাকেন, সাঁতরে পার হয়ে যাবার শক্তি আছে ওঁর। ভেলার দরকার হবে না।

আহা, তবু একটা ছুঁড়ে দিতে ক্ষতি কি! বিশেষ কিছু করতে হবে না, একটা গান কর শুধু। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হবে। তোমার চেয়ে ওকে আমি বেশি চিনি।

স্বাভাবিক হইবার চেষ্টা করিয়া শঙ্করও হাসিয়া বলিল, গান শুনতে আপত্তি নেই। করুন না একটা গান, অনেক দিন গান শুনি নি আপনার।

উৎপল ফরমাশ করিল, কাল রবিবাবুর যে গানটা শিখলে সেইটে ধর। উৎরেছে গানটা।

সুরমার চোখে মুখে স্নিগ্ধ সলজ্জ হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। পরে সরাইয়া সে পাশের ঘরে গেল এবং অর্গ্যানের ডালাটা তুলিয়া বসিল। একটু বাজাইয়া ধরিল।—

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনা
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে
যেন পড়ে মনে, ভুলো না।
ভুলো না ভুলো না ভুলো না···

অন্ধকার রাত্রে শঙ্কর হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। সুরমার কণ্ঠস্বর, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তাহার অন্তরের গভীরতম স্তরে যে ছন্দ-স্পন্দন তুলিয়াছিল, তাহারই আবেশে আত্মহারা হইয়া সে পথ চলিতেছিল। একের পর এক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানই আজ সুরমা গাহিয়াছে সকলগুলিরই নিগূঢ় আবেদন এক। হে প্রিয়, হে দয়িত, কোথা তুমি, কত আয়োজন করিয়া যুগ-যুগান্ত যে তোমার জন্যই বসিয়া আছি। জানি

নির্জন ঘরে আঁধার রাতে একদিন তুমি আসিবে, সকল কাঁটা ধন্য করিয়া গোলাপ হইয়া একদিন তুমি ফুটিবে, তোমার পায়ের শব্দ, তোমার গন্ধ পাইতেছি, তোমার জন্যই যে আকাশ ভরিয়া নক্ষত্রের দীপালী তাহা জানি, বনে বনে কুসুম-কিশলয়ের উৎসব তোমারই প্রতীক্ষা করিয়া আছে, শুক্লা একাদশীর মধ্যরাত্রে নিদ্রাহারা শশী তোমার পথ চাহিয়াই স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া বাহিতেছে, কিন্তু হে প্রিয়, আভাসে-ইঙ্গিতে স্বপ্ন-কল্পনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আর কতকাল লুকাইয়া থাকিবে তুমি? আগ্রহে অধীর হইয়া আর কতকাল অপেক্ষা করিব? মূর্ত হও, হে জীবনবল্লভ, দেখা দাও, ধরা দাও। তোমাকে পাইয়াও যে পাই না। একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, সেইটুকু লইয়া আর কতদিন ফাল্গুনী-স্বপ্ন রচনা করিব? কোথায় তুমি, কবে আসিবে? হয়তো নিশীথ-রাতের বাদলধারার সুরে আমার একলা ঘরে চুপে চুপে তুমি আস, কিন্তু তখন চোখে আমার ঘুম, চারিদিকে অন্ধকার, তোমাকে কাছে পাইয়াও পাই না। যখন জাগিয়া উঠি তখন দেখি, তুমি নাই, দখিন হাওয়াকে পাগল করিয়া আঁধার ভরিয়া তোমার গন্ধ কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তুমি চলিয়া গিয়াছ। আকুল চিত্তে কল্পনা করি, তোমার মালার পরশ আমার বুকে লাগিয়াছিল কি···

রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুর, সুরমার আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। সুরমা বিশেষ করিয়া এই গানগুলিই গাহিল কেন? তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই গাহিল কি? সুরমার অন্তরের অন্তস্তলে এমন কোন কথা কি লুকানো আছে যাহা সহজ ভাষায় সে বলিতে পারে না...যাহা সহজ ভাষায় বলা যায় না, যাহার রূপ-রস-নিবিড়তা একমাত্র গানের সুরেই প্রকাশ করিতে পারে? আশ্চর্য কি! হয়তো আছে। কিন্তু···। কিন্তু'-ভাব কিন্তু বেশিক্ষণ রহিল না। ঈষৎ জাগ্রত বিবেককে সম্মোহিত করিয়া তাহার মন চিরন্তন পুরুষোচিত সেই স্বপ্ন সৃজন করিতে লাগিল, যে স্বপ্নে সামাজিক নীতির ভেজাল নাই, সংস্কারকের সংযম যাহাকে কুণ্ঠিত করিতে পারে না, অবিমিশ্র আবেগে যাহা চিরকাল সুস্থ পুরুষের মর্মমূলে বিষ উৎসারিত করিয়া আসিয়াছে, আদিম উদ্দাম প্রেরণায় স্বকীয়া-পরকীয়ার

কৃত্রিম গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা নরনারীর আপাত-সামাজিক বন্ধনকে যুগে যুগে শিথিল করিতেছে, চিরকাল করিবে। বহুকাল পরে অকস্মাৎ শঙ্করের চিত্ত সুরমাকে ঘিরিয়া স্বপ্নমধুর হইয়া উঠিল। শুধু মধুর নয়, মদিরও। সবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করিল, তাহার অন্তরতম সত্তা দেশের দুঃখে এতটুকু ম্রিয়মাণ নয়। বাহিরে সে একটা অভিনয় করিয়া চলিয়াছে শুধু। তাহার সংস্কারকের কর্তব্যবোধ মাত্র, অন্তরতম সত্তার সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। যে নিগূঢ় বেদনা আজ বহুকাল পরে সত্যই তাহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারিয়াছে তাহা পল্লীবাসীর দুঃখজনিত বেদনা নয়, তাহা বিরহ-বেদনা। সুরমার গান শুনিয়া তাহার অন্তর বেতসপত্রের ন্যায় আজ যে আকুলতায় কম্পিত হইতেছে, সুরমার মনের কথাটি জানিবার জন্য অবুঝের মত যে আগ্রহে সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, সে আকুলতা সে আগ্রহ কি তাহার দেশসেবায় ফুটিয়াছে কখনও? দেশকে ঘিরিয়া এমন তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি জাগিয়াছে? সুরমার সান্নিধ্যে আজ তাহার অন্তর যেমন সম্পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইল, এমন কি দেশের কাজে কোনদিন হইয়াছে? সত্যটা আবিষ্কার করিয়া মনে মনে সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং পর-মুহূর্তে তাহার রাগ হইল। সে শুধু নিজের উপর নয়, দেশের শিক্ষা-দীক্ষার উপর, এমন কি রবীন্দ্রনাথের উপরও।

তাহার মনে হইল, তাহার চিত্তকে এমন উন্মনা স্বপ্নবিলাসী করিয়া তুলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথই। কবিই দেশের চিত্ত-গঠন করেন। এ কি করিয়াছেন তিনি! পেলব মধুর ভাষায়, মর্মস্পর্শী ছন্দে সুরে মানব-মনের প্রেম-বিহ্বলতাকে না-পাওয়ার আকুলতাকে, সুদূরের পিপাসাকে রূপে রসে রঙে এমন মনোহারিণী করিয়া গিয়াছেন যে, দেশের সমস্ত যুবক-যুবতী ভাবাকুললোচনে কল্পনার কুঞ্জকুটিরে আজ কেবল স্বপ্ন দেখিতেছে। বলিষ্ঠতা কোথাও নাই, কেবল স্বপ্ন। অর্জুন একজনও নাই, ঘরে ঘরে কেবল রাধা। একটা তূর্যধ্বনি শোনা যায় না, চারিদিকে কেবল বাঁশের বাঁশি বাজিতেছে। সত্য বটে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-সঙ্গীত লিখিয়াছেন, 'নৈবেদ্য' রচনা করিয়াছেন, নানা প্রবন্ধে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন, "মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষা দিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সে সব রচনা দেশের মনে প্রেরণা দিতে পারিল কই? দেশ যত আবেগভরে "মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি—সখি জাগো" গাহিল, ঠিক তত আবেগভরে কি "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" গাহিতে পারিল? হুজুকে মাতিয়া দুই-চারিদিন হয়তো গাহিয়াছিল, কিন্তু সে গান তাহাদের মর্মে প্রবেশ করে নাই, তাহাদের মর্মে প্রবেশ করিয়াছে "কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া নামে"। কেন? শঙ্করের সন্দেহ হইল, হয়তো রবীন্দ্রনাথই ঠিক তেমন প্রাণ ঢালিয়া ওই দেশাত্মবোধক রচনাগুলি লেখেন নাই, ওগুলি সুললিত সুন্দর রচনা, কিন্তু ওগুলিতে ঠিক যেন তাঁহার প্রাণের সুর বাজে নাই, তাই দেশের কর্ণে প্রবেশ করিলেও দেশের মর্মে উহারা প্রবেশ করিতে পারিল না। তিনি অচিন পথের উন্মনা পথিক ছিলেন, বাউল সুফি মরমিয়া। দেশকে নয়, প্রিয়কে সুন্দরকেই তিনি আহ্বান করিয়াছেন, ধ্যান করিয়াছেন। পচা পানাপুকুরের পঙ্কোদ্ধারের কথা তিনি মাঝে মাঝে চিন্তা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে 'সোনার তরী ভাসাতেই' তিনি বেশি ব্যস্ত ছিলেন। কালিদাসের ভাববিলাস অথবা বৈষ্ণব কবিদের কান্ত কোমলতা ভারতে যে স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে স্বাস্থ্যকর ছিল,—পরাধীন নিরন্ন ভারতের পক্ষে তাহা যে মারাত্মক, সে খেয়াল থাকিলেও তাহার প্রতিবিধান করিবার উপায় তাঁহার হাতে ছিল না; কারণ নিজের সংস্কারকে, নিজের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না—কোন কবিই পারেন না। কোকিলের গান যদি কোন কারণে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হয়, কোকিল কি নিজের সুর বা স্বর পরিবর্তন করিতে পারে?···

সমস্ত দোষটা রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে চাপাইয়া নিপুণভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া শঙ্কর যেন নিজের কাছেই জবাবদিহি করিল। পতনের কারণ নির্ণয় করিয়া পতনের গ্লানি হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস পাইল,—একটুও অনুতপ্ত হইল না। সুরমার হাসি, গান, মার্জিত আলাপ, তন্বী দেহশ্রী, শাড়ির রঙ, অলকের কম্পন, অপাঙ্গের মাধুর্য ঘিরিয়া যে কল্পলোকে তাহার মুগ্ধ মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল, সে কল্পলোকে কল্পনাই

সম্রাজ্ঞী, যুক্তির স্থান সেখানে নাই। পুলকিত চিত্তে শঙ্কর আবিষ্কার করিল, তাহার যৌবন এখনও সজীব আছে, যে ভয়ে সে কলিকাতায় চুন্‌চুনের সহিত দেখা করে নাই, তাহা তাহার লুব্ধ বাসনারই ভীত রূপ। তাহার কবি-মানসে সে মানসী-লিপ্সা চিরকাল চিরন্তনী প্রিয়ার স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে, তাহা মরে নাই—প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আজ সহসা সুরমাকে ঘিরিয়া তাহা আকুল হইয়া উঠিয়াছে। মুগ্ধ মদির হৃদয়ে সে পথ চলিতে লাগিল। শীতের আকাশে শীর্ণ চাঁদ উঠিয়াছে; দূর রাস্তায় ক্যাঁচক্যাঁচ করিয়া গরুর গাড়ি চলিয়াছে, সমস্ত পল্লী ধূম ও কুয়াসায় আচ্ছন্ন, শিউলিফুলের এক ঝলক গন্ধ যেন কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল। "আজি মম অন্তর-মাঝে কোন্ পথিকের পদধ্বনি বাজে"—মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতেছে সুরমার গানের সুর। একটা নিদারুণ চীৎকারে সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। সে দাঁড়াইয়া পড়িল। মনের সুরটা কাটিয়া গেল। বিরক্তিতে মনটা ভরিয়া উঠিল। কে এমন বেসুরা চীৎকার করিতেছে? চাহিয়া দেখিল, পাশেই মুশাইয়ের বাড়ি, চীৎকারটা সেখান হইতেই আসিতেছে। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া ডাকিল। হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিল যমুনিয়া। তাহার রুক্ষ চুল, ছিন্ন বসন অসম্বৃত। এমন সময় এখানে শঙ্করকে দেখিতে পাইবে, সে প্রত্যাশা করে নাই। শঙ্করকে দেখিয়া তাহার দুঃখ যেন আরও উথলাইয়া উঠিল। কাপড় সামলাইবার কথা পর্যন্ত তাহার মনে রহিল না, অসম্বৃত বসনেই সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মুশাই তাহাকে মারিতেছে, এইমাত্র কোথা হইতে সে 'পিইয়া' আসিয়াছে। ম্লান জ্যোৎস্নার স্বল্পালোকেও শঙ্কর দেখিতে পাইল, যমুনিয়ার পাঁজর গোনা যায়, জীর্ণ বুকে হাড়গুলা উঁচু হইয়া রহিয়াছে, স্তনযুগল শুষ্ক বিশীর্ণ—যেন রুগ্ন পুরুষমানুষের বুক। নিজের ভাষায় যমুনিয়া বকিয়া চলিয়াছিল। অত দাম দিয়া মুশাইকে সেদিন একটা ''মোটিয়া' কিনিয়া দিল, কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে—কোনও ছুঁড়ীকে দিয়া আসিয়াছে কি না, তাহারই বা ঠিক কি! ইহার জন্য সে কিন্তু কোন অনুযোগ করে নাই, সে 'কিরিয়া খাইতে' (শপথ করিতে) প্রস্তুত আছে, বরং নিজের গায়ের চাদরখানা তাহাকে দিতে গিয়াছিল, তখন অবশ্য

বলিয়াছিল, নে, এটাও নে, আমার যথাসর্বস্ব গ্রাস কর্ তুই। এই কথাতেই তাহাকে মারিতে শুরু করিয়া দিল, চুলের ঝুঁটি ধরিয়া মুক্কা, থাপ্পর, লাত (কিল, চড়, লাথি)।···শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। উঠানের মাঝখানে 'ঘুর' জ্বলিতেছে, তাহার পাশে মুশাই দাঁড়াইয়া আছে, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, আরক্ত চক্ষু।

যমুনিয়াকে কেন মেরেছিস ?

মুশাই সাধারণত নীরবপ্রকৃতির। কিন্তু মদের ঝোঁকে বলিয়া বসিল, হমারা খুশি।

খুশি ?

ঠাস করিয়া তাহার গালে শঙ্কর প্রচণ্ড একটা চড় বসাইয়া দিল। মুশাই পড়িয়া গেল।

ওঠ্, ওঠ্ শিগগির, খুন ক'রে ফেলব তোকে আজ।

মুশাই ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল এবং নতমস্তকে বসিয়াই রহিল। উঠানের এক কোণে শুষ্ক মুখে যমুনিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল, আব ছোড়ি দে হুজুর, পিলোছে (এবার ছেড়ে দে বাবা, মদ খেয়ে ও-রকম করছে)।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, যমুনিয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, শুধু ভয়ে নয়, শীতেও। গায়ে কাপড় নাই, নিজের একমাত্র গায়ের কাপড়খানি মাতাল চরিত্র-হীন স্বামীকে দিয়াছে। শঙ্কর নিজের গায়ের র‍্যাপারটা খুলিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। চেঁচামেচিতে যে দুই-চারিজন পাড়ার লোক বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে ফুলশরিয়া একজন। শঙ্কর কাহারও দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিল। ফুলশরিয়া অবাক হইয়া গেল।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, অমিয়াও তাহার অপেক্ষায় জাগিয়া আছে। খুকীকে ঘাড়ের উপর শোয়াইয়া পায়চারি করিতেছে। আসন্নপ্রসবা সে, নিশ্চয়ই কষ্ট হইতেছে।

এখনও ঘুমোও নি ?

খুকীর পেটব্যথা করছে, কিছুতে ঘুমুচ্ছে না। পারুলের বাড়িতে পানফল-টল খেলে কতকগুলো যা-তা—

শঙ্করের সাড়া পাইয়া খুকী মাথা তুলিল এবং ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, পেত ব্যাতা কত্‌তে।

এস আমার কাছে।

সমস্ত দিন একটিবারও আজ সে বাবাকে পায় নাই, একমুখ হাসিয়া ঝাঁপাইয়া কোলে আসিল।

সুরমার মোহ স্বপ্নের মত ভাঙিয়া গেল।

সে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে নামিল, না, মর্ত্য হইতে স্বর্গে উঠিল, বুঝিতে পারিল না।

পরদিন সকালে যখন উঠিল, তখন দেখিল, মনের আকাশ নির্মেঘ। কম্প দিয়া যে জ্বরটা সহসা আসিয়াছিল, তাহা সহসাই ছাড়িয়া গিয়াছে। মুশাই আসিয়া প্রবেশ করিল এবং অন্য দিনের মত টেবিল ঝাড়িতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই।

২৮

'তুমি' অঘোরে ঘুমাইতেছে। বিনিদ্র-নয়নে হাসি একা জাগিয়া আছে। ভাবিতেছে। রোজই ভাবে। ভাবে, কোথায় সে ভাসিয়া চলিয়াছে, কি তাহার জীবনের পরিণাম? বিহার-পল্লীর একটা তুচ্ছ স্কুলের নগণ্য শিক্ষয়িত্রীরূপেই কি তাহার জীবনের অবসান হইবে? শঙ্করবাবুর আগ্রহাতিশয্যে সে আসিয়াছে, দেখিতে দেখিতে এতদিন কাটিয়াও গেল, ফল কি হইল? কিছুই না। শিক্ষার যে আদর্শ লইয়া সে আসিয়াছিল, সে আদর্শে মনের মত করিয়া একটা মেয়েকেও সে লেখাপড়া শিখাইতে পারিল না, শিখাইবার উপায় নাই। একপাল মেয়ে সাজিয়া গুজিয়া স্কুলে আসে যেন তাহারই মাথা কিনিবার জন্য। পড়াশোনায় কাহারও মন নাই। মেয়েদের অভিভাবকরাও এ বিষয়ে খুব সচেতন নন। দুই দিন পরে তো বিবাহ হইয়া যাইবে, লেখাপড়া কত আর শিখিবে! শঙ্করবাবুর খাতিরে, অনেকটা চক্ষুলজ্জাবশত, যেন তাঁহারা মেয়েদের স্কুলে পাঠান। খানিকটা ফ্যাশানের

ধাতিরেও বটে। আজকাল সভ্য-সমাজে টর্চ, হাতকাটা কামিজ, বাটারফ্লাই গোঁফের মত মেয়েদের 'লিখাপঢ়ি' শেখানোটাও একটা ফ্যাশান হইয়াছে। 'বংগালী' বাবুরা তাঁহাদের 'লেড়কি'দের লেখাপড়া শিখাইতেছেন, তাঁহাদের লেড়কিরাও শিখুক যতটা পারে—ক্ষতি কি? ইহাই অধিকাংশ লোকের মনোভাব। আমরাই বা কম কিসে, এ মনোভাবও কয়েকজন শিক্ষিত 'ফীলিংওয়ালা' বিহারীর আছে। কিন্তু ওই ফীলিং-দুষ্ট মনোভাবটুকুই আছে, যোগ্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে হইলে যে আগ্রহ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা নাই। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বাড়াইয়া ইন্‌স্পেক্টরের কাছে বাহাদুরি লইবার জন্যই তাঁহারা ব্যগ্র। স্কুল-কমিটীর কে মেম্বার হইবে এবং মেম্বারদের মধ্যে কে সেক্রেটারি হইবে, তাহা লইয়াই সকলে ঝগড়া করিয়া মরিতেছে আর এস.ডি.ও.র খোশামোদ করিতেছে। তাহারা যে স্কুল এবং স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন, তাহা প্রমাণ করিবার একটিমাত্র উপায় তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, স্কুলের নানা খুঁত ধরিয়া গোপনে ইন্‌স্পেক্টরের নিকট দরখাস্ত করা। খুঁতও সব অদ্ভুত ধরনের। সেদিন কে একজন লিখিয়াছে, বিদ্যালয়ের হাতায় ঘাস গজাইয়াছে, পরিষ্কার করানো হয় নাই, শিক্ষয়িত্রীর গাভীটিকে চরিবার সুবিধাদান করিবার জন্য কি স্কুলের হাতাটিকে জঙ্গলে পরিণত করা উচিত? মাসিক পনেরো টাকা কন্‌টিন্‌জেন্সির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য একজন মোক্তার মেম্বার বদ্ধপরিকর। খড়ি, কাগজ, কলম, দোয়াত, নিব প্রত্যেকটি কবে কেনা হইয়াছে, কেন কেনা হইয়াছে, নির্ভরযোগ্য রসিদ আছে কি না, থাকিলেও এত ঘন ঘন কেনা হইয়াছে কেন—এই সব লইয়া তিনি তাঁহার শাণিত আইনজ্ঞানের এমন সুতীব্র পরিচয় দিতেছেন যে, হাসি উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরিতে ভাল বই আনাইবার উপায় নাই। বিহারী লেখকের লেখা বিহারী প্রকাশকের প্রকাশিত বই সর্বাগ্রে আনাইতে হইবে। তাহা কিনিতেই টাকা ফুরাইয়া যায়, ভাল বই কেনা হয় না। হাসি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বিরক্ত হইয়াছে, শুধু বিরক্ত নয়, অপমানিতও বোধ করিয়াছে তাহার প্রতি সকলের অনুকম্পা প্রদর্শনে। সকলের ভাবটা যেন,' আহা, স্কুলটা চলুক, আর কিছু না হোক, একজন গরিব বিধবার

অন্নসংস্থান হইতেছে তো, বেচারীর একটা ছেলেও আছে। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য নয়, তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনেও নয়, তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সকলে স্কুলটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। শিক্ষিত বিহারী মেম্বারগণ আবার আইনের কষ্টিপাথরে বারম্বার যাচাই করিয়া দেখিতেছেন, মহিলাটি প্রকৃতই তাঁহাদের, অর্থাৎ বিহারীদের, দয়া পাইবার উপযুক্ত কি না! 'পাব্‌লিক মানি' লইয়া ছিনিমিনি খেলা তো উচিত নয়। খুঁত ধরা পড়িয়াছে, সে 'হিন্দী-নোয়িং' নয়। শঙ্করবাবু তাহাকে হিন্দী পরীক্ষা পাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। পরীক্ষা পাস করা অসম্ভব নয়, কিন্তু সে পরীক্ষা দিবে না। এই তুচ্ছ কাজের জন্য সে আর একবিন্দু শক্তি ক্ষয় করিবে না। মৃন্ময়ের সহধর্মিণীর এই কি উপযুক্ত কাজ? তাহার সঙ্কল্প—মৃন্ময়ের সহধর্মিণী হইবে সে, মৃন্ময়ের আদর্শকেই জীবনে সফল করিয়া তুলিয়া ধরিবে। কি সে আদর্শ? ত্যাগ। ন্যায়ের সমর্থন করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কি জীবনও। এই ত্যাগের স্বপ্ন দেখিয়াই সে এই অপরিচিত পল্লীগ্রামে শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসিয়াছিল। শঙ্কর তাহাকে বুঝাইয়াছিল, নারীত্বের যে লাঞ্ছনার প্রতিকার করিতে গিয়া মৃন্ময় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, সে লাঞ্ছনার সত্যকার প্রতিকার স্ত্রী-শিক্ষায়। এই স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে হাসি যদি সাহায্য করে, ইহার জন্য সে যদি সুখ সুবিধা স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলেই মৃন্ময়ের আত্মা তৃপ্ত হইবে। স্বার্থত্যাগ করিতেই হাসি আসিয়াছিল। কিন্তু এখানে এতদিন কাটাইয়া সে অনুভব করিতেছে যে, দেশের সমস্ত জনসাধারণকে মনুষ্যত্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বিচ্ছিন্নভাবে অবমানিত নারীত্বকে উন্নত করা যায় না। শঙ্করবাবু একা কি করিবেন? গদাই দত্ত, নেকি মাড়োয়ারী, গুলাব সিং, প্রমথ ডাক্তার, সুখদেও মোক্তার যে স্কুলের পরিচালকবর্গ, সে স্কুলের হাজার স্বার্থত্যাগ করিয়াও কিছু করা যাইবে না। পাষাণ-প্রাচীরে মাথা কুটিলে যদি ভাঙিয়া পড়িত, মাথা কুটিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাসি বুঝিয়াছে, মাথা কুটিয়া মাথা রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেও এ অনড় প্রাচীর নড়িবে না, তাহার কাণ্ড দেখিয়া লোকে শুধু হাসিবে। শুধু স্কুল-কমিটির দোষ নয়, গভর্মেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের

আইনও প্রকৃত শিক্ষার অনুকূল নয়। ভিতরে 'পলিসি' আছে। হাসির স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার নামে কতকগুলা বর্বরের খোশামোদ করা কি ত্যাগ? ইহাতে কি মহত্ত্ব আছে? ইহা তো ভণ্ডামির নামান্তর, ত্যাগের অজুহাতে নিজেকে খর্ব করিয়াও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকা। ত্যাগ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ সে এক দিনের জন্যও পায় নাই। সমস্ত অন্তর ভরিয়া কেবল গ্লানি, ক্ষোভ আর হতাশাই তো হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কোথায় গেলে শান্তি পাইবে? স্বার্থত্যাগ করিয়া, আত্মত্যাগ করিয়া, বৃহৎ একটা কিছু করিয়া স্বামীর আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য তাহার সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হইয়া আছে, প্রয়োজন হইলে সে ছেলের দিকেও ফিরিয়া চাহিবে না। প্রতিদিন রাত্রে মৃত মৃন্ময়ের উদ্দেশ্যে এই একই কথা সে রোজ লেখে, আজও লিখিয়াছে, আজও সে তাহাকে আশ্বাস দিয়াছে—তুমি অপেক্ষা কর, আমি প্রমাণ করিয়া দিব যে, আমিও তোমার অনুপযুক্ত ছিলাম না, যে সিংহাসনে স্বর্ণলতাকে বসাইয়াছিলে, সেখানে আমারও কিছু অধিকার আমি দাবি করিতে পারিতাম। কিন্তু কি করিয়া প্রমাণ করিবে? কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিবে, কে তাহাকে সেই মহাদেবীর মন্দিরে লইয়া যাইবে, যে মহাদেবীর পূজাবেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিলে অশান্ত হৃদয় শান্তিলাভ করে, অধন্য ধন্য হয়, অপূর্ণ পূর্ণতা লাভ করে? ধাত্রী পান্না, জোয়ান অব আর্ক যে পথে চলিয়াছিল, কোথায় সে পথ?

বিনিদ্র-নয়নে হাসি ভাবিতেছিল। রোজই ভাবে।

২৯

এই, নাও লে আও।

খেয়াঘাটের নৌকাটা ঘাট ছাড়িয়া প্রায় নদীর মাঝামাঝি চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় অশ্বপৃষ্ঠে নটবর ডাক্তার নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য সময় হইলে জানকী মাঝি অবিলম্বে নৌকা তীরে ভিড়াইয়া নটবর

ডাক্তারকে তুলিয়া লইত, আজ কিন্তু সে একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেল। প্রথমত নৌকায় নেকি মাড়োয়ারীর একটা 'বরিয়াত' রহিয়াছে, দ্বিতীয়ত রহিয়াছেন স্বয়ং দারোগা সাহেব। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও চটানো গরিব জান্‌কীর পক্ষে শক্ত। নেকি মাড়োয়ারীর কাছে আপদে বিপদে হাত পাতিতে হয়, তা ছাড়া সুশৃঙ্খলায় 'বরিয়াত'টা পার করিয়া দিলে হয়তো কিছু বকশিশও আজ মিলিতে পারে। আর দারোগা সাহেব তো স্বয়ং সম্রাটেরই প্রতিনিধি, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা রাজদ্রোহেরই সামিল। অথচ নটুটুবাবুকে ফেলিয়া যাওয়াও যে অসম্ভব। গরিবের 'মাই-বাপ' তিনি। জান্‌কী বেচারা একটু বিপদে পড়িয়া গেল। অনুমতির প্রত্যাশায় সে একবার নেকি মাড়োয়ারীর দিকে, একবার দারোগা সাহেবের দিকে চাহিল। নেকি মাড়োয়ারী চতুর লোক, সহসা 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিল না। দারোগাজীর সহিত নটবর ডাক্তারের ঠিক কি সম্পর্ক আছে জানা তো নাই, চট করিয়া কিছু একটা বলিয়া শেষে ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইবার মত বোকা লোক সে নয়। তাহার স্থূলকায় পুত্র 'কানাহাইয়া' চোখ পাকাইয়া জান্‌কীকে নৌকা ভিড়াইতে মানা করিতে যাইতেছিল, নেকি গোপনে পুত্রের গা টিপিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল। নেকি মাড়োয়ারীর মনের ইচ্ছাটা অবশ্য নটবর ডাক্তারকে না লওয়া, লোকটা ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া নৌকাতে উঠিবে, বরিয়াত জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বমুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার মত সাহস সে সংগ্রহ করিতে পারিল না। দারোগা সাহেব কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য সোৎসুক বিপন্ন দৃষ্টি তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল দারোগা সাহেব ন্যায়সঙ্গত কথাই বলিলেন।

চলো তুম। ডাক্‌টরবাবু দেরি করকে আয়েঙ্গে, পিছে যায়েঙ্গে।

এই, নাও ঘুরাও।

বজ্রনির্ঘোষে নটবর আবার হাঁক দিলেন।

জান্‌কী লগি ঠেলিতে ঠেলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ডাক্তারবাবুর পাহাড়ী ঘোড়াটা ঘাটে অধীরভাবে পরিক্রমণ করিতেছে। ঘোড়াটা দেখিয়া সহসা জান্‌কীর মনে দুই বৎসর আগেকার একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল

অন্ধকার গভীর রাত্রি, আকাশে ঘন-ঘটা, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে, ঝড় উঠিয়াছে, বৃষ্টি পড়িতেছে। দুর্যোগ মাথায় করিয়া দুর্গম পথে এই পাহাড়ী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া নটবর ডাক্তার ছুটিয়া চলিয়াছেন—তাঁহারই বাড়ির উদ্দেশে চলিয়াছেন। তাহার একমাত্র পুত্র জ্বরে অচৈতন্য। গরিব শুনিয়া হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আসিতে রাজী হন নাই, কবিরাজজীও আসিলেন না, নটুটুবাবু কিন্তু শুনিবামাত্র ঘোড়ায় সওয়ার হইলেন, 'ঝড়-ঝাপটি' কিছু মানিলেন না, আসিয়া বিনা পয়সায় 'জকসন' দিলেন, ঔষধ খাওয়াইলেন—ছেলে তাহার বাঁচিয়া গেল।

আরে, নাও ঘুরাতা হ্যায় কাহে ফের ?

জানকী আইনসঙ্গত অজুহাত একটা খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। বলিল, নৌকায় জল জমিয়া গিয়াছে, জল তুলিয়া ফেলিবার পাত্রটা সে ঘাটে ফেলিয়া আসিয়াছে, সেটা না লইলে যদি জল বেশি জমিয়া যায়, মাঝ-দরিয়ায় তাহা হইলে—। কথাটা সে সম্পূর্ণ করিল না। নেকি শশব্যস্ত হইয়া বলিল, নেই নেই, লে লেও ভাই, দো-পাঁচ মিনিটমে কেয়া হরজা হোয়েগা।

দারোগা সাহেব কিছু বলিলেন না। স্বল্পভাষী লোক তিনি। নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। নটবর ডাক্তার ঘোড়া হইতে না নামিয়া ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া নৌকায় উঠিলেন এবং জানকীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, ক্যা রে, কানমে আজকাল কম শুনতা হ্যায় ? জানকী একটু কুণ্ঠিত হাসি হাসিল। নৌকায় চড়িয়াও ঘোড়ার পিঠ হইতে নটবর নামিলেন না। জানকী জল তুলিবার পাত্রটা লইয়া আসিল।

রাম রাম ডাক্টারবাবু।

দন্ত বিকশিত করিয়া নেকি মাড়োয়ারী অভিবাদন করিল।

রাম রাম, শেঠজীর খবর কি, ছেলের বিয়ে নাকি ?

আপলোকা কিরূপা।

দারোগা সাহেবও নটবরকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

প্রতি-নমস্কারান্তে নটবর বলিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই

হ'ল। আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম, হরিয়াটার নামে কি আপনি বি.এল. কেস করেছেন?

হ্যাঁ। ও-ব্যাটা তো একের নম্বর লুচ্চা গুণ্ডা। শঙ্করবাবু জামিন হয়ে ছাড়িয়ে দিলেন, তা না হ'লে ওই থেফ্‌ট চার্জেই ফাঁসাতাম ওকে।

নটবর ডাক্তারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল এবং অনেকক্ষণ কুঞ্চিত হইয়াই রহিল।

বি.এল. কেস প্রমাণ করতে পারবেন ওর বিরুদ্ধে?

নিশ্চয়।

দারোগাবাবুর আত্মপ্রত্যয় দেখিয়া নটবর মনে মনে হাসিলেন, চক্ষুদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। চোখের দৃষ্টি যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ও বাবা! হরিয়াটা কাল গিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন। যদিও নবাগত দারোগা সাহেবের সঙ্গে তেমন আলাপ নাই, তবু ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাকে একবার বলিলেই ব্যাপারটা মিটিয়া যাইবে বোধ হয়। এখন দেখিতেছেন, লোকটির কর্তব্যজ্ঞান বেশ টনটনে। এ ধরনের জীবরা ভদ্রলোকের মর্যাদা বোঝে না। ইহাদের কাছে কোন অনুরোধ করা বৃথা। আর কিছু বলিলেন না, ঘাড় ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একটু হাসিও পাইল। হরিয়া লুচ্চা এবং গুণ্ডা! ছুঁচ এবং চালুনির গল্পটা মনে পড়িল।

৩০

উত্তেজিতভাবে নিপুদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমাকে তুমি মিছিমিছি আটক রাখলে শঙ্কর, এখানে কোন কাজ করা অসম্ভব।

আবার কি হ'ল?

রামলাল পড়বে না!

কেন?

বহুমাইজী মানা করেছে।

নিপুদা ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল।

বহুমাইজী মানে কুন্তলা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার কে? এম.এ. পাস করলে কি হবে, সেকেলে বুর্জোয়া সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি এখনও। হাজার হোক, বামুনের মেয়ে তো, কামারের ছেলে লেখাপড়া শিখছে—বরদাস্ত করতে পারছেন না সেটা।

নিপুদা কায়স্থ-সন্তান, ব্রাহ্মণদের উপর ভীষণ রাগ, সুযোগ পাইলে ছোবল দিতে ছাড়েন না। নিপুদার কথায় ব্রাহ্মণ-সন্তান শঙ্করের কান ঈষৎ গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু কিছু বলিল না সে। নিপুদার চালচলন কথাবার্তা কিছুই তাহার ভাল লাগে না, তবু তাহাকে সে যাইতে দেয় নাই। তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ একরূপ খোশামোদ করিয়াই আবার তাহাকে রাখিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে, নিপুদা না থাকিলে অনুন্নতদের উন্নত করিবার ভার কে লইবে? পল্লী-উন্নয়নের উহাই যে একটা প্রধান অঙ্গ। নিপুদার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে না। এ পল্লীগ্রামে কেহ আসিতেই চাহিবে না। আসলে অসহায় নিপুদার প্রতি অনুকম্পাবশতই যে তাহাকে সে যাইতে দেয় নাই, এ কথা নিজের কাছেও শঙ্কর স্বীকার করিতে চায় না। নিপুদা সত্যই উপযুক্ত লোক, অভাবের চাপেই মনটা বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোক যে, তাহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানা যুক্তি দিয়া নিজের মনকে বুঝাইয়াছে যে, এ দেশের স্বার্থের জন্যই নিপুদার থাকা প্রয়োজন। যদি মন দিয়া কাজ করেন, সত্যই অনুন্নত শ্রেণীর অনেক উপকার হইবে। ডোমপাড়ার নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের জন্য একটা পাঠশালা খাড়া তো করিয়াছেন। অনুন্নতদের উন্নত করিতে না পারিলে যে দেশের উন্নতি অসম্ভব, তাহা শঙ্করের অনেক দিনের বদ্ধমূল ধারণা। তাহাদের জন্যই সে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা করিয়াছে। স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাদের বাসস্থানের চতুর্দিক পরিষ্কার করাইয়াছে, ভ্যাক্সিন দেওয়াইবার জন্য, কুইনিন বিতরণ করিবার জন্য চৌধুরীকে নিযুক্ত করিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর একটি

বালকের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি-স্থাপনও করিয়াছে। কামার কুমোর তেলী অথবা নিম্নতর কোন বর্ণের বালক যদি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে এম.এ. পর্যন্ত পড়িবার খরচ উৎপলের এস্টেট হইতে দেওয়া হইবে। বালকটির সহিত একটি শর্ত থাকিবে কেবল—উপার্জনক্ষম হইলে টাকাটা তাহাকে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে, সেই টাকায় ভবিষ্যতে যাহাতে আর একটি ছেলের পড়া হয়। নিম্নশ্রেণীর কোন বালক এতদিন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাই দেয় নাই। এই বৎসর ঝক্সু কামারের পুত্র রামলাল ম্যাট্রিকুলেশন দিবে, পাস করিতে পারিবে কি না তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু তবু সে নিপুদা কর্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া 'যদি'র উপর নির্ভর করিয়া বৃত্তিটি দাবি করিয়াছে। নিপুদার উদ্দেশ্য—ক্যাপিটালিস্ট উৎপল সত্য সত্যই টাকাটা দেয় কি না তাহা যাচাই করিয়া দেখা এবং উৎপল সত্যই যদি টাকাটা দিয়া ফেলে (সে বিষয়ে নিপুদার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল), তাহা হইলে তাহা লইয়া ছোটলোক-মহলে নিজের বেশ একটা প্রতিপত্তি বিস্তার করা। উৎপল বিনা দ্বিধায় রামলালের দাবি মঞ্জুর করিয়াছে। সমস্তই ঠিকঠাক, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত বাধা আসিয়া উপস্থিত। রামলালের পিতা ঝক্সু হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়াছে। পুত্রকে সে আর 'অংরেজি' পড়াইবে না, বহুমাইজী বারণ করিয়াছেন। বহুমাইজীর কথা তাহার নিকট বেদবাক্য।

কুন্তলার এই বিরুদ্ধতায় শঙ্কর বিস্ময় বোধ করিল। শিক্ষিতা মহিলার নিকট এ আচরণ সে প্রত্যাশা করে নাই।

কুন্তলা মানা করলে ? কেন বুঝতে পারছি না তো !

আমিও প্রথমটা পারি নি, তাই জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম।

কি বললে ?

দেখা পর্যন্ত করলে না আমার সঙ্গে হে।

নিপুদার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

ভাবলে বোধ হয়, যেহেতু আমি এম.এ.-পাস নই, সেই হেতু ওর সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করবারও যোগ্য নই বোধ হয়। দি ইনসোলেন্ট স্লাট—

ইংরেজী গালাগালিটা অর্ধস্বগত উচ্চারণ করিয়া নিপুদা চুপ করিল, এবং যেমন তাহার স্বভাব, মুখে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। কুন্তলার সম্বন্ধে নিপুদার অপমানসূচক ভাষাটা শঙ্করের নিজের আত্মসম্মানকেই যেন আঘাত করিল। কিন্তু তবু সে কিছু বলিতে পারিল না। কুন্তলার সপক্ষে কোন যুক্তিই সে খুঁজিয়া পাইল না। নিপুদার সহিত সে কলহ করিতে চায় না, পল্লী-উন্নয়নের বিঘ্ন-হিসাবে কুন্তলার এই আচরণ তাহার নিকট বিরক্তিকর, তবু তাহার ভদ্র মন তাহার অজ্ঞাতসারেই কুন্তলার সপক্ষে একটা যুক্তি আহরণ করিতে ব্যস্ত হইল। নিপুদাকে মুখের মত একটা জবাব দিতে পারিলে সে যেন আরাম বোধ করিত। লোকটা ভারি অভদ্র। কিন্তু কুন্তলা—

কি ভাবছ? ওঠ, চল, যাওয়া যাক।

কোথা?

ঝকুমুর কাছে। তাকে রাজী করাতে হবে। যদি নেহাত রাজী না হয়, তা হ'লে রামলালকে তার বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব। ও যদি পাস করতে পারে, ওকে কলেজে ভরতি করবই আমরা, দেখি, কে আটকায়!

সেটা কি ঠিক হবে, মানে—বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাটা?

তুমি তোমার প্রিন্সিপ্‌লের খাতিরে বাপের বিরুদ্ধে যাও নি? রাশিয়াতে অ্যান্টি-রিভলিউশনারি বাপ-মাকে হরদম বর্জন করছে সেখানকার ছেলে-মেয়েরা, এবং বায়োলজিকালি—আত্মরক্ষার জন্য তা করা ছাড়া উপায় নেই।

সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সহিত কথাগুলি বলিয়া নিপুদা হাসিল।

শঙ্কর আর থাকিতে পারিল না।

আত্মরক্ষা মানে?

আত্মরক্ষা মানে আত্মরক্ষা, আবার কি?

কার আত্মরক্ষা? আমাদের, না, রামলালদের?

আমাদের সকলের।

বল্‌শেভিক রাশিয়ায় কিন্তু সকলে রক্ষা পায় নি। 'কুলাক' এবং

'নেপ্‌ম্যান'দের দুর্গতির অন্ত ছিল না সেখানে। এখানেও যদি সবাই বল্‌শেভিক হয়ে ওঠে, আপনি আমি বাঁচব না। বল্‌শেভিক শাস্ত্রমতে—আমরা, শোষকের দলে। বায়োলজিকালি আত্মরক্ষা করতে হ'লে রামলালদের বাড়তে না দেওয়াই উচিত। সে হিসেবে কুন্তলা দেবীর যুক্তি ঠিক।

কুন্তলা দেবীর যুক্তি স্বার্থপর পশুর যুক্তি।

বায়োলজিতে পরার্থ ব'লে কিছু নেই, স্বার্থ ই সেখানে মূলমন্ত্র।

মানলাম। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের জন্ম ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিতে হবে।

মানে—সোজা ভাষায় আমার স্বার্থ, আপনার স্বার্থ, আপনাদের বংশধরদের স্বার্থ সব বলিদান দিতে হবে। শ্রমিকদের বড় ক'রে নিজেদের অবলুপ্ত ক'রে ফেলতে হবে।

বাঁকা হাসি হাসিয়া নিপুদা বলিল, একদিন তা হবেই। শ্রমিকদের প্রাধান্তকে স্বীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গত্যন্তর থাকবে না যখন, তখন নেব। আগে থাকতে যেচে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনি কেন ?

যুক্তির পথে না গিয়া নিপুদা চটিয়া উঠিল।

তা হ'লে কি বুঝতে হবে তুমিও কুন্তলার দলে ? তোমার এ পল্লী-উন্নয়ন-টুন্নয়ন একটা 'শো' মাত্র। আমাকে তা হ'লে মিছিমিছি কেন—

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আহা, চটছেন কেন ? ব্যাপারটা বায়োলজির দিক থেকে ভেবে দেখছি একটু, সেদিন যেমন দেখছিলাম।

এ বায়োলজি নয়, এ তোমার কবিত্ব।

আর একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, কবিত্বই তো সত্য নিপুদা। ডারবিনও কবিই ছিলেন, struggle for existence, survival of the fittest—আসলে বোধ হয় কাব্য-কথাই। আমরা কি নিজেদের একজিস্‌টেন্সের জন্যে স্ট্রাগল করছি ? যদি নিছক পশু-প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হতাম, তা হ'লে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবার জন্যে এমন ক'রে উঠে-প'ড়ে লাগতাম

না। এটা ঠিক জানবেন, যাদের জাগাবার আমরা চেষ্টা করছি, তারা জাগলে আমরা কেউ বাঁচব না। বৃহত্তর মানব-সমাজ হয়তো রক্ষা পাবে—

তুমি ঝকৃস্থুর ওখানে যাবে, না, বাজে তর্ক করবে ব'সে ব'সে?

চলুন।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। পরিহাস-ছলে তর্ক করিতে গিয়া শঙ্কর যেন একটা সত্য আবিষ্কার করিল এবং মনে মনে চমৎকৃত হইয়া গেল। বায়োলজির দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে পতিতোদ্ধারের চেষ্টা করা, মানে— সত্যই তো আত্মবিলোপের আয়োজন করা। কোনও জীব কি সজ্ঞানে আত্মবিলোপের আয়োজন করে? বায়োলজিকালি রামলালদের হয়তো উপকার হইবে, কিন্তু আমরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছি কিসের প্রেরণায়? আমরাই তো উহাদের চোখ ফুটাইতেছি। নিজেদের সর্বনাশ সুনিশ্চিত জানিয়াও কিসের প্রেরণায় আমরা নিজেদের মারণাস্ত্র উহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি? ইহা জৈবিক নয়, ইহা জীবোত্তর প্রেরণা, ইহাই মনুষ্যত্ব, ইহাই মহত্ত্ব। এই প্রেরণাবশেই দধীচি বজ্র নির্মাণের জন্য নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ আত্মনিধনযজ্ঞে পৌরোহিত্য স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। নিজের কল্পনায় মশগুল হইয়া শঙ্কর পথ চলিতে লাগিল।

হুঁঃ, ক্যাপিটালিস্টদের লেখা কতকগুলো বাজে প্রোপাগ্যাণ্ডা প'ড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।—নিপুদা খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল এবং আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিল। শঙ্কর কোনও উত্তর দিল না। তাহার মন তখন আকাশে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

মুখময় বসন্তের দাগ, কাঁচা পাকা ঝাঁকড়া গোঁফ, কালো রঙ, এক-মাথা অবিন্যস্ত চুল, বিরাটকায় ঝকৃস্থু বিশাল হাতুড়িটা তুলিয়া চতুর্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করিতে করিতে তপ্ত লোহা পিটিতেছিল। শঙ্করের শিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ক বক্তৃতা অথবা নিপুদার কমিউনিস্টিক বচন সে শুনিতেছিল কি না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা শক্ত। রামলালও একটু দূরে দাঁড়াইয়া রোদ পোয়াইতেছিল এবং সব শুনিতেছিল।

শঙ্করের এবং নিপুদার বক্তব্য যখন শেষ হইয়া গেল, তখনও ঝকৃস্থ কিছু বলিল না, লোহাই পিটিতে লাগিল।

কি রে, কিছু বলছিস না যে? তোর এক পয়সা খরচ লাগবে না, খরচ যা লাগে, আমরাই দেব সব।

হাতুড়ি পেটা বন্ধ করিয়া বাম হাত দিয়া ঝকৃস্থ মাথার ঘাম মুছিয়া ফেলিল। ঠাকুর-বাবার শিষ্যকে ইহারা পয়সার লোভ দেখাইতে আসিয়াছে! এ সম্বন্ধে সে অবশ্য মুখে কিছু বলিল না। গলা-খাঁকারি দিয়া বাগ্‌যন্ত্রটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া সংক্ষেপে কেবল বলিল, বহুমাইজীকা বাতো সে হাম্ বাহার নেই হোবে পারব, অংরেজি উ আর নেহি পঢ়তে।

ওই এক বুলি ধরেছে।

নিপুদা হতাশভাবে হাত উলটাইল।

অংরেজি পড়তে দোষটা কি?—শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

ঝকৃস্থ হাতুড়ি তুলিয়া কাজ শুরু করিতে যাইতেছিল, এই কথায় হাতুড়ি নামাইয়া রামলালের দিকে নিজের বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহুটা প্রসারিত করিয়া সক্ষোভে বলিল, অংরেজি পঢ়ি কর্ শালারো হালত্ কি ভেলোছে দেখে তোঁ আপনে আঁখিসে দেখো।

পুত্রকে শালা সম্বোধন করাতে নিপুদা শঙ্করের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল। শঙ্কর হাসিতে সায় দিল না, রামলালের দিকে চাহিয়া সে অবাক হইয়া গেল। রামলালকে সে ইতিপূর্বে বহুবার দেখিয়াছে, কিন্তু এই পারিপার্শ্বিকে সে যেন রামলালকে নবরূপে আবিষ্কার করিল। এই ঝকৃস্থর পুত্র এই রামলাল! লিক্‌লিকে চেহারা, দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা, গায়ে শৌখিন কামিজ, গলায় রেশমের গলাবন্ধ, পায়ে গ্রীসিয়ান স্লিপার, গোঁফ কামানো! তাহাদের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে। পুরুষ নয়, যেন মেয়েমানুষ! একটা বটের চারা অস্বাভাবিক আওতায় পড়িয়া কেমন যেন লতানে-গোছের হইয়া গিয়াছে।

হোপ্‌লেস! চল, হরিহরবাবুর কাছে যাওয়া যাক, এর কাছে বকবক ক'রে কোন লাভ নেই। কি হে, গুম মেরে গেলে যে?

শঙ্কর কোনও উত্তর দিল না। ঝক্সু আবার লোহা পিটিতে শুরু করিয়াছিল। বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, আমরা ভুল পথে চলিতেছি না তো?

৩১

সমস্ত রাত শঙ্করের ঘুম হয় নাই। নিপুদা, কুন্তলা, ঝক্সু, রামলাল, সুরমা, উৎপল—সকলের সম্মিলিত প্রভাব একটা পাথরের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল। সে যেন স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও লইতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। কমানো বাতিটার স্বল্পালোকে চোখে পড়িল, অমিয়া এবং খুকী অঘোরে ঘুমাইতেছে। খুকীর গায়ে লেপ নাই, অমিয়ার খোঁপাটা এলাইয়া পড়িয়াছে। খুকীর গায়ের লেপটা সন্তর্পণে ঠিক করিয়া দিয়া সে মশারি হইতে চুপিচুপি বাহির হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে কপাট খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় আসিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ কোথায় আসিল সে! এ যে রূপকথার রাজ্য! তাহারই ঘরের বারান্দায় এই অপরূপ স্বপ্ন কতক্ষণ হইতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে! মেঘ-চাপা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় চতুর্দিক স্বপ্নাকুল। কিছু দূরে রাস্তায় যে অস্ফুট কলরব উঠিতেছিল, তাহা তাহার জ্যোৎস্না-অভিভূত মন প্রথমটা শুনিতেই পাইল না। একটু পরেই কিন্তু পাইল এবং উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। কিসের কলরব? রাস্তায় ভিড় কিসের? বারান্দা হইতে নামিয়া দেখিল, দলে দলে লোক চলিয়াছে। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ মাঘী-পূর্ণিমা। গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়াছে সব। গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড উৎসব আজ। মেলা বসিবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তীব্র হাওয়া উঠিয়াছে একটা, মাঘের কনকনে শীত। কিন্তু কিছুই ইহাদের নিরস্ত করিতে পারে নাই। দলে দলে চলিয়াছে সব। দূরদূরান্ত হইতে আসিয়াছে। মাঝে মাঝে 'টপ্পর'-দেওয়া গরুর গাড়ি,

তাহাতেও লোক ঠাসা। কি উৎসাহ! মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের উচ্চ হাস্য যাইতেছে, মাঝে মাঝে শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনও। 'জয় গঙ্গাময়ীকী জয়' বলিয়া এক-একটা দল মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি দিতেছে, কেহ ভজন গাহিতেছে, কেহ ঢোল খঞ্জনি বাজাইয়া কেহ কেহ কীর্তন ধরিয়াছে। মেঘ-মেদুর জ্যোৎস্নায় শঙ্কর স্পষ্ট কিছু দেখিতে পাইতেছিল না, কিন্তু সে অনুভব করিতেছিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই চলিয়াছে আজ। অন্ধ-খঞ্জ, সুস্থ-অসুস্থ, ধনী-দরিদ্র, কৃপণ-দাতা, চোর-সাধু, পাপী-পুণ্যবান কেহ বাদ নাই। তাহার মনে হইল, আমাদের মত 'কালচার্ড' কুসংস্কারমুক্ত ইংরেজী-পড়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকি সকলেই আজ গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। কিসের টানে চলিয়াছে? কোন্ অদৃশ্য আইন ইহাদের এই শীতের ভোরে হাঁটিতে বাধ্য করিতেছে? পুণ্যের লোভ? পরলোকের সদ্গতি? সে কিন্তু লোভ দেখাইয়া ইহাদের সৎপথে আনিতে পারিতেছে না তো! পাস করিলে চাকরি পাইবে, হাকিম হইবে—এসব লোভ দেখানো সত্ত্বেও তাহার অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র কই জুটিল! আর একটা ঘটনাও মনে পড়িয়া গেল। রাজীব দত্ত একবার মাতৃশ্রাদ্ধে গরিব-দুঃখীদের পোলাও খাওয়াইবেন বলিয়া ঢ্যাঁটরা দিয়াছিলেন। কয়েকজন অস্পৃশ্য ভিখারী ছাড়া তেমন বেশি লোক জোটে নাই। এই নিরন্ন বুভুক্ষু দেশে পোলাও খাইবার লোভে দলে দলে লোক ছুটিয়া গেল না তো! রাজীব দত্তের ঢ্যাঁটরা দিয়া পোলাও-খাওয়ানোর অশোভন অহমিকাকে এ দেশের গরিব-দুঃখীরাও প্রশ্রয় দিল না। না না, ঠিক লোভ নয়। বিশ্বাস, তৃপ্তি, নিগূঢ় সংস্কার বা ওই জাতীয় একটা কিছু ইহাদের অন্তরে এখনও আছে, যাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহারা যাহা বিশ্বাস করে, আমাদের তাহাতে বিশ্বাস নাই। এই বিশ্বাসের জোরে ইহারা বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসবে মাতিয়া উঠিতে পারে, আমরা পারি না, নিরুৎসব আমরা নাক সিঁটকাইয়া দূরে বসিয়া থাকি শুধু। মনে করি, যদি এই অসভ্যগুলোকে ধরিয়া সাবান-পাউডার মাখাইয়া ফিটফাট কেতা-দুরস্ত করিয়া মুখে বিদেশী বুলি এবং মনে বিলাতী সভ্যতার রঙটা ধরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই বুঝি ইহারা শান্তি পাইবে। কিন্তু

তাহাতে ইহারা বোধ হয় শান্তি পায় না। আমরাই কি পাইয়াছি? শীতের ভোরে খালি পায়ে হাঁটিয়া ভজন গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নান করিয়াই বোধ হয় ইহারা শান্তি পায়।…প্রত্যূষের অস্ফুট আলোকে তীর্থযাত্রী এই জনস্রোতের দিকে শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, সে যেন বিদেশী, ইহাদের চেনে না, ইহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক যেন তাহার নাই।

এই বিদেশীর জন্যই কিন্তু যমুনিয়া লুকাইয়া মুকুন্দ পোদ্দারের দ্বারস্থ হইয়াছিল এবং কিছু টাকা কর্জ করিয়া 'ঝান্ডা' উঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। বাজু জোড়া বাঁধা দিতে হইল। কিন্তু উপায় কি, মানত শোধ করিতে হইবে তো! মানত শোধের জন্য এত খরচ অবশ্য না করিলেও চলিত, কম পূজা দিলেও 'দেওতা' অসন্তুষ্ট হইতেন না; কিন্তু শঙ্করবাবুকে ভাল মাংস খাওয়াইবার সাধ তাহার অনেক দিন হইতে। সেদিন এক কথায় অমন একটা দামী পশমী দোশালা তাহাকে দিয়া দিলেন! সামান্য কিছু একটু প্রতিদান না দিলে কি ভাল দেখায়! সুতরাং মাঘী-পূর্ণিমার দিন 'দেও'স্থানে 'ঝান্ডা' উঠাইবার অজুহাতে সে একটা পাঁঠা, একটা পাঁঠী এবং পাঁচটা কবুতর চড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মেথরপাড়ার এই 'দেও'স্থানটি বড় জাগ্রত স্থান। ডাইনীর 'আঁখ লাগিয়া' কেহ যদি অসুস্থ হয়, দুরারোগ্য ব্যাধি যদি কাহারও না সারে, কাহারও যদি বার বার ছেলে হইয়া মরিয়া যায়, বিদেশী পুত্রের সংবাদ না পাইয়া কেহ যদি ব্যাকুল হয়, এই 'দেও'স্থানে আসিয়া সে মানত করে এবং মাঘী-পূর্ণিমার দিন পূজা চড়ায়। বিসুণের অনেক দিন কোনও খবর নাই, কলিকাতায় সেই যে সে গিয়াছে আর আসে নাই। চিঠিও লেখে না। চিঠি লিখিলে উত্তরও আসে না। ছেলের জন্যই যমুনিয়া মানত করিয়াছিল। মুশাই আপত্তি করে নাই, বরং খুশিই হইয়াছিল। অন্য কোন কারণে নয়, ন্যায়সঙ্গতভাবে মদ খাইতে পারা যাইবে বলিয়া। আজ যমুনিয়া আপত্তি করিবে না। একটা বিষয়ে সে কিন্তু যমুনিয়াকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, ধারের কথা বাবু যেন না জানিতে পারে। ইহা লইয়া বাবু যদি

তাহাকে 'বক্‌ঝক্‌' করে, তাহা হইলে কিন্তু সে মারিয়া ধুনিয়া দিবে। যমুনিয়াও ধারের ব্যাপারটা যথাসাধ্য গোপন রাখিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

৩২

পরম শ্রদ্ধাবিষ্ট কণ্ঠে হরিহর জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার সম্মুখে মন্ত্রপাঠ করিয়া ধ্যান করিতেছিলেন—

সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।
শঙ্খ-শার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তী চ দক্ষিণে।
রক্তবস্ত্র-পরিধানাং বালার্কসদৃশী তনুম্
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাম্ ভবসুন্দরীম্
ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনাল মৃণালিনীম্
রত্ন-দ্বিপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভব-গেহিনীম্।

ধ্যানান্তে ভক্তিভরে তিনি প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ প্রণত হইয়াই রহিলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, ত্রিভুবন-পালিনী, জগজ্জননী, সকলের মঙ্গল কর মা, সকলকে শান্তি দাও। সকলের জন্যই প্রার্থনা করিলেন তিনি, কেবল নিজের জন্য প্রার্থনা করিতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইল। কিন্তু নিজের জন্যও প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল তাঁহার। কিছুদিন হইতে তিনি কেমন যেন একটা অশান্তি অনুভব করিতেছিলেন। অশান্তিটা যে ঠিক কি এবং কেন, তাহাও তাঁহার অগোচর ছিল। স্পষ্ট কোন কারণ তো চোখে পড়ে না! তবু কেমন যেন একটা অস্বস্তি, অস্পষ্ট কিসের যেন একটা ছায়া তাঁহার মনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতেছিল। কিসের একটা অভাব যেন তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিলেন। এই অভাব-বোধটা কি কুন্তলাকে কেন্দ্র করিয়াই? মাঝে মাঝে এ কথা তাঁহার মনে হয়, আবার তখনই ভাবেন—না, কুন্তলার

আচরণ তো নিখুঁত। তাহার পতিভক্তি, গৃহকর্মনিপুণতা, দেবসেবা, কর্মশৃঙ্খলা সমস্তই তো অনিন্দনীয়। কেবল সে বড় বেশি গম্ভীর এবং আন্তরিক। একবার যাহা ভাল বলিয়া মনে করিবে, প্রাণপণে তাহা করিবেই। কলেজে-পড়া মেয়ে একটু যদি বিলাসিতা করিতই, কি এমন ক্ষতি ছিল তাহাতে? তাঁহার জন্যই হয়তো সে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে, এ সন্দেহ মাঝে মাঝে মনে জাগে এবং জাগিলেই তাঁহাকে বড ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাঁহার জন্য কেহ কষ্ট পাইতেছে, এ চিন্তা অতিশয় পীড়াদায়ক। তাঁহার জন্যই কি কুন্তলা এই কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে? জিজ্ঞাসা কবিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। তুমি বিলাসী হও—এ কথাও মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। অথচ···। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এতটা সনাতন মনোবৃত্তি কি ভাল? কে জানে! রামলাল যদি ম্যাট্রিক পাস করিয়া জমিদারদের খরচে আই.এ. পড়িত, কি এমন ক্ষতি ছিল তাহাতে? ইহা লইয়া অনর্থক একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। নিপুবাবু সেদিন যা মুখে আসিল বলিয়া গেলেন। কি দরকার ছিল এসবের? কুন্তলা কিন্তু কিছুতেই নিজের মত পরিবর্তন করিবে না। ঝকুমুও কুন্তলার মতের বিরুদ্ধে কিছুতে যাইবে না। কুন্তলা যাহা বলিতেছে, এক হিসাবে তাহা ঠিকই। সংস্কৃত-লজিক মুখস্থ করিয়া অবশেষে একটা অকর্মণ্য জীবে পরিণত হওয়া অপেক্ষা কুলকর্ম করাই রামলালের পক্ষে শ্রেয়···। কিন্তু কি দরকার আমাদের এসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাওয়ার? জগদম্বার চরণাশ্রয়ে যে শান্ত শুভ্র আনন্দিত জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন, তাহাব মধ্যে এসবের কোন স্থান ছিল না এতদিন। সকলের মঙ্গল কামনা করিয়া সকলকেই স্বীয় নিয়তি-নির্ধারিত পথে চলিতে দেওয়াই বিবেকসম্মত মনে হইত। কিন্তু কুন্তলাও হয়তো নিজের বিবেককেই অনুসরণ করিতেছে। স্বামিত্বের জোরে তাহাকে বাধা দিতে যাওয়াটাও কি ঠিক? তাহা ছাড়া কিছুদিন হইতে তাঁহার নিজেরও একটা খটকা লাগিয়াছে। সকলেই স্বীয় নিয়তি-নির্ধারিত পথে চলিতেছে—এই বলিয়া নির্বিকারভাবে বসিয়া থাকা কি ব্রাহ্মণোচিত? শস্যশ্যামলা দেশ আমাদের শ্মশান হইয়া উঠিল যে! সবই নিয়তি-নির্ধারিত? অসংখ্য লোকের অসংখ্য দুর্দশা এবং নিজেদের ক্লীবত্ব মনকে পীড়িত করিয়া

তোলে। ভিখারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমার কি করিবার আছে, আমি কি বলিতে পারি—বলিয়া বসিয়া থাকা কি উচিত? পুনরায় তিনি জগদ্ধাত্রী-চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, জগদ্ধাত্রী জননী সকলের মঙ্গল কর মা—সকলকে শান্তি দাও।

প্রণামান্তে বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন, কাঠের-পা-পরা সেই ভিখারীটা দাঁড়াইয়া আছে, সঙ্গে একটি শিশু। প্রাণপণে কি একটা জানোয়ারের ডাক ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। গলা একেবারে বসিয়া গিয়াছে। বড় ছেলেটা মহিষের ডাক ডাকিবার চেষ্টা করিল। কিছুই হইল না। এখনও ভাল শিখিতে পারে নাই।

হরিহর ভিতরে ঢুকিয়া চাল-কলা-ফল যাহা কিছু সব বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। ঝমরু চলিয়া গেল। হরিহর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৩৩

শঙ্করের পরিবর্তিত মনোভাব সম্বন্ধে সুরমা অচেতন ছিল না। নিগূঢ় উপায়ে সে ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল। বুঝিতে পারিয়াও কিন্তু নিজের সহজ আচরণকে সে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বিশেষ বিব্রত বা কুণ্ঠিতও সে হয় নাই। অন্তরের অন্তস্তলে সে বরং একটা সূক্ষ্ম গর্বই অনুভব করিতেছিল। অজ্ঞাতসারে নয় জ্ঞাতসারেই সে এই মুগ্ধ ভৃঙ্গটিকে মনে মনে যে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহা সতীসুলভ নহে, বিজয়িনী-সুলভ। কিন্তু তাই বলিয়া বিগলিত কিংবা বিচলিত সে হয় নাই। বাক্যে বা আচরণে এমন কিছু সে প্রকাশ করে নাই, যাহা অশোভন। সে যে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। তাহার সুমার্জিত ব্যবহারের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় এতটুকু ছন্দপতন হয় নাই, তাহা ঠিক আগের মতই সংযত অথচ অনাড়ষ্ট ছিল। কিন্তু শঙ্করের স্পন্দিত হৃদয়ের উন্মুখ প্রণয়োৎকণ্ঠা তাহার মনের নিভৃততম প্রদেশে যে সূক্ষ্ম আনন্দ অদৃশ্য পুষ্পসুরভির মত

সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহাতে সে ঈষৎ আবিষ্ট হইয়াছিল বইকি। কিন্তু সে মনে মনে বর্মাবৃতও হইতেছিল। ধরা দেওয়া হইবে না, লঘু ললিত-গতিতে স্থূলতাকে এড়াইতে হইবে, এমন আচরণ করিতে হইবে, যাহাতে এই অকথিত প্রণয়-আকুতি কথ্য প্রেমালাপের ইতরতায় পরিণত হইবার সুযোগ না পায়। নেপথ্য মানস-বিলাসকে নেপথ্যেই নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। কিন্তু স্থূলতা এড়াইবার এই চেষ্টাও আবার স্থূলভাবে প্রকট হইয়া না পড়ে, সে দিকেও তাহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নিজের কৃতিত্ব মনে মনে উপভোগ করিতে করিতে নিপুণা সার্কাস-অভিনেত্রী যেমন ছাতা-হাতে সরু তারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, সুরমাও মনে মনে অনেকটা সেই জাতীয় ক্রীড়ায় লিপ্ত ছিল। একটু তফাত অবশ্য ছিল। মানসলোকের প্রত্যন্তদেশে অতিশয় সঙ্গোপনে যে খেলা চলিতেছিল, তাহাতে ক্রীড়ক এবং দর্শক—উভয়েরই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল সে নিজেই। বাহিরের কোনও দর্শক সেখানে ছিল না।

৩৪

ভজহরি-প্রমুখাৎ বার্তা শুনিয়া মুকুন্দ পোদ্দার শুধু বিস্মিত নয়, কিঞ্চিৎ বিচলিতও হইলেন। অঙ্কে ভুল করিয়া ফেলিলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হয়, তেমনই অপ্রস্তুতও হইলেন তিনি একটু মনে মনে। সেদিন নিপুর ব্যবহারে তিনি মোটেই বিচলিত হন নাই। বস্তুত আজকালকার এই ডেঁপো ছোকরাদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার সপক্ষে আর একটা প্রমাণ পাইয়া মনে মনে বরং তিনি খুশিই হইয়াছিলেন। ছোকরা বাড়ি বহিয়া তাঁহাকে বলিতে আসিয়াছিল, আমি আপনার শত্রু, এ জেনেও যদি আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান করুন। ময়নাকে রসগোল্লা চিনাইতে আসিয়াছে! অ্যাঁ! ডাহা উজবুক না হইলে এতটা পথ হাঁটিয়া এ কথা বলিতে আসে কেহ? লোক চরাইতে চরাইতে মাথায় টাক পড়িয়া গেল, কে শত্রু, কে মিত্র তাহা তাঁহার এখনও চিনিতে বাকি আছে যেন! মিত্র কে? সব ব্যাটাই তো শত্রু। ঘাড় মটকাইবার সুযোগ পাইলে কোন্ দেবতা

তাহা ছাড়েন? তুই যে শত্রু, তা ভাল করিয়াই জানি; কিন্তু সেদিনকার ছোঁড়া তুই, তোর নাক টিপিলে এখনও বোধ হয় দুধ বাহির হইবে, আমার সঙ্গে কি শত্রুতা করিবি তুই? তোর মুরোদ কত? বাহাদুরি করিয়া এ কথা বলিতে আসিবার মানে কি? তাহা উজবুক না হইলে এ কাজ করে কেহ? নিপুর প্রতি পোদ্দার মহাশয়ের সেদিন সস্নেহ অনুকম্পাই হইয়াছিল একটু। নেহাত গাড়োল একটা। একমুখ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বেশ বেশ, আপনি যে শত্রু, তা না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু শত্রুরও উপকার যদি করি আমি, কার কি বলবার আছে তাতে? আপনি মানুষ তো, ভারতবাসী তো, হিন্দু তো, আপনি বিপন্ন হয়েছেন এইই যথেষ্ট নয় কি, অত শত্রু-মিত্র বিচার করার কি দরকার? গোটাকয়েক টাকা দিয়ে যদি আমি সাহায্যই করি আপনার, কার চণ্ডী অশুদ্ধ হবে তাতে, অ্যাঁ, কি বল ভজহরি? দাও, ওঁকে পঞ্চাশটা টাকা দাও, নোট নেবেন না, খুচরো, আর হাত-ঘড়িটাও ফেরত দিয়ে দাও। কথার নড়চড় করবার লোক নই আমি।

নিপু বলিয়াছিল, আপনার কাজ কিন্তু আমি করব না।

আপনার ধর্ম আপনার কাছে।—বলিয়া তিনি হাসিয়াছিলেন। সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলি চকচক করিয়া উঠিয়াছিল। কেবল নিপুর উপর নির্ভর করিয়াই বসিয়া থাকিবেন, এমন কাঁচা লোক তিনি নন। ইতিমধ্যে আরও দুই-তিনজন লোক মারফৎ তিনি হৃদয়বল্লভকে খবর পাঠাইয়াছেন। কেনারাম চক্রবর্তীকেই হাত করিবার ফিকিরে আছেন তিনি। আরও হাজার খানেক টাকা কবুল করিলেই লোকটি তাঁহার দিকে ঢলিয়া পড়িবে; বেশ বোঝা যাইতেছে। কেবলমাত্র নিপুর মত চ্যাংড়ার সাহায্যেই তিনি যে এত বড় জমিদারিটা কিনিয়া ফেলিবেন, এ হাস্যকর আশা তাঁহার কোনদিনই ছিল না। তবে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও যখন কাঠবিড়ালীকে উপেক্ষা করেন নাই, তখন তাঁহার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহা করিবে কোন্ সাহসে? স্পষ্ট ভাষায় শত্রুতা ঘোষণা করিলেও তাই তিনি কাঠবিড়ালীটার হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। এত লম্ফঝম্ফ তো, টাকা ও ঘড়িটা কিন্তু বেশ হাত পাতিয়াই লইল। তাহার পর অবশ্য আর কোনও খোঁজখবর পান নাই ছোকরার।

রাখেনও নাই। ভাবিয়াছিলেন, টাকা কয়টা বোধ হয় জলেই গেল। এই ভাবিয়া কেবল সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলেন যে, ছোকরা আর যাই করুক, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ অন্তত করিবে না। যে ছিদ্র দিয়া বুড়বুড়ি কাটিবার সম্ভাবনা ছিল, চাঁদির চাকতি দিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া গেল। ভজহরির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিবার পর কিন্তু এ বিশ্বাস টিকাইয়া রাখা শক্ত হইল। ছোটলোকদের মধ্যে এ অঞ্চলে তাঁহার যত খাতক ছিল, সকলেই সুদ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে যে, আর এক পয়সাও সুদ তাহারা দিবে না। দশ কিস্তিতে আসলটা তাহারা পাঁচ বৎসরে ক্রমশ শোধ করিয়া দিবে। তাহাতে যদি পোদ্দার মহাশয় সম্মত না থাকেন, মকদ্দমা করিতে পারেন। সকলের মুখেই এক বুলি এবং বুলিটি নিপুবাবুই নাকি সকলকে মুখস্থ করাইতেছেন!

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, অন্নছত্রে আজকাল লোক খাচ্ছে কত?

দশ জন খাবার কথা, খায় কিন্তু বারো-তেরো জন, মানা করলে শোনে না, এসে ব'সে পড়ে।

কাল থেকে এক শো জনের আয়োজন কর। একটা তরকারিও বাড়িয়ে দাও। কি তরকারি দিচ্ছ আজকাল? কদিন যেতেই পারি নি।

শাক বেগুন মুলো দিয়ে একটা ঘণ্ট হয়েছিল আজ।

লাউ সস্তা আজকাল, লাউয়ের তরকারি কর একটা কাল থেকে।

যে আজ্ঞে।

আর যারা যারা সুদ মাপ চায়, তাদের ব'লো—আমার সঙ্গে যেন দেখা করে তারা। ব'লো যে, তাদের বিপদে আপদে আমরাই চিরকাল করেছি, চিরকাল করবও। আজ হঠাৎ নিপুবাবুর কথায় নেচে মরছিস কেন তোরা? ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লো, বুঝলে? দুটো মিষ্টি কথা বলতে শেখো।

যে আজ্ঞে।

ভজহরি চলিয়া গেল। পোদ্দার মহাশয় স্মিতমুখে বসিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার চোখে আগুনের আভা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

৩৫

ফাল্গুনের কৃষ্ণা-চতুর্দশী।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। অতিশয় অসহায়ভাবে শঙ্কর গরুর গাড়ির ভিতর চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। মন্থরগতিতে গ্রাম্যপথে গাড়ি চলিয়াছে, মুশাই গাড়ি হাঁকাইতেছে, শঙ্কর ভাল করিয়া ভাবিতেও পারিতেছে না, এখন কি করা উচিত! কিছুক্ষণ পূর্বে লক্ষ্মীবাগে স্বচক্ষে সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল, তাহার অপ্রত্যাশিত আঘাতে তাহার মনন-শক্তিই যেন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সত্য সত্যই কিন্তু দিবা-দ্বিপ্রহরে একদল উন্মত্ত জনতা আসিয়া মারপিট লুটতরাজ করিয়া মণিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বেদখল করিয়াছে। মণির মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, অজ্ঞান অবস্থায় সে এখন সদর-হাসপাতালে। তাহার সমস্ত সম্পত্তি গুলাব সিং দখল করিয়া বসিয়াছে। মণির ঘরে মণিরই বিছানায় বসিয়া লোকটা সদলবলে আসর জমাইয়াছে। দলে আছে কেনারামের পুত্র জীবন, রাজীবের পুত্র গদাই, প্রমথ ডাক্তার ও স্থানীয় বেহারী উকিল দুইজন। ফুলশরিয়া মদ পরিবেশন করিতেছে। প্রাঙ্গণে জনতার মধ্যে ছিল ফরিদ, কাল্লু, হরিয়া, রহিম, কপূর্রা, পুরণ—চেনা-শোনা আরও কত লোক, সকলেই তাহাদের প্রজা। সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া চোরের মত লুকাইয়া পড়িল সব। লুকাইল না কেবল গুলাব সিং এবং ফুলশরিয়া। গুলাব সিং গোঁফে চাড়া দিয়া একপাত্র মদ আগাইয়া দিয়া বরং সম্বর্ধনাই করিল তাহাকে। স্বয়ং দারোগা সাহেবকে সে হাত করিয়াছে। শঙ্করবাবুকে তাহার কি ভয়? ফুলশরিয়া এক পাশে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। ফুলশরিয়া! এই ফুলশরিয়া নিপুদাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, নিজের গহনা বেচিয়া অসুস্থ হরিয়ার চিকিৎসা করিয়াছিল, এখন ডাকাতের দলে মদ পরিবেশন করিতেছে! পরিধানে চমৎকার একটি ছাপা বোম্বাই শাড়ি। একদিন তাহার মহত্ত্ব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া যে যেখানে পারিল আত্মগোপন করিল,

সে-ই কেবল কোথাও গেল না। এক ধারে একটু সরিয়া চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিল।

ফরিদ কারু রহিম কর্পূরা—প্রত্যেকের মুখ একে একে আবার তাহার মনে পড়িল। বিশেষ করিয়া ইহাদের কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। প্রত্যেককে আপদে বিপদে সাহায্য করিয়াছে সে।···সেদিন নিজে জামিন হইয়া ছাড়াইয়া আনিল, দুই দিন যাইতে না যাইতে ডাকাতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! দিনে-দুপুরে! কেবল অভাবের তাড়নাতেই তাহারা এসব করিতেছে—এ অজুহাতে আর মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। অভাব নয়, ইহাই উহাদের স্বভাব। স্বভাব! স্বভাবই যদি হয়, তাহার জন্যও কি উহাদের দায়ী করা যায়? বহু যুগের নানা অভাবই কি উহাদের স্বভাব গঠন করে নাই? শুধু অন্নাভাব বস্ত্রাভাব নয়, শিক্ষার অভাব। তখনই আবার মনে হইল, জীবন চক্রবর্তী, গদাই দত্ত, প্রমথ ডাক্তার, দুইজন বেহারী উকিল, গুলাব সিং—ইহাদের কিসের অভাব আছে? ইহারাই তো আসল ডাকাত, কারু-ফরিদরা তো উহাদের চালিত যন্ত্র মাত্র। শিক্ষা? জীবন চক্রবর্তী, প্রমথ ডাক্তার, দুইজন উকিল—ইহাদের কি শিক্ষার অভাব ছিল? ইহারা যে শিক্ষা পাইয়াছেন, সে শিক্ষা পাইলে ফরিদ-কারুদের বিশেষ কিছু উন্নতি হইত কি? রামলাল কি উন্নত হইয়াছে? প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়িয়া গেল। কাকের ঠোঁট সোনা দিয়া, পা মাণিক দিয়া এবং ডানা মুক্তা দিয়া অলঙ্কৃত করিলেও কাক কাকই থাকে, রাজহংস হয় না। কাককে রাজহংস করিবার তাহার এ আগ্রহ কেন? নিমগাছের তলায় দুধ ঢালিলেই তাহাতে আম ফলিবে, এ দুরাশা সে কেন করিতেছে? কেন করিতেছে—চিন্তা করিতে গিয়া অনিবার্যভাবে তাহার মনে হইল, করিতেছে নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য, করিতেছে তাহার আর কিছু করিবার নাই বলিয়া। যে শিক্ষার অন্তঃ-সারশূন্যতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ, সেই শিক্ষাই অপরকে জোর করিয়া গিলাইবার এই সাড়ম্বর আয়োজনের অন্য অর্থ আর কি হইতে পারে?—তাহা ছাড়া তাহার নিজের কি এমন যোগ্যতা আছে, কি এমন চরিত্রবল আছে, যাহার জোরে সে সমাজ-সংস্কার করিবার স্পর্ধা করে? বাহাদুরি

করিয়া সেদিন উৎপলের দেওয়া সিগারেটটা প্রত্যাখ্যান করিল বটে, কিন্তু মনে মনে তাহার স্ত্রীকে কামনা করিতে তো তাহার বাধিল না ? সে নিজেও কি কম পরস্ব-লোলুপ ? যে শিক্ষা তাহার নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারে নাই, সেই শিক্ষা দিয়া সে সমাজ-সংস্কার করিবে ! সে নিজেই যে ভণ্ড।

মুশাই !

কি বাবু ?

এখানে কাছাকাছি কোন দোকানে সিগারেট পাওয়া যাবে ?

কোশিস্ করলে সে মিলতে জরুর।

দেখ্ তো।

মুশাই গাড়ি থামাইয়া নামিয়া গেল। শঙ্কর শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল। সূচীভেদ্য অন্ধকার চতুর্দিকে। একা একা তাহার কেমন যেন গা-ছমছম করিতে লাগিল। চারিদিক নির্জন, কোথাও আলোর লেশমাত্র নাই। গরুর গাড়ির আলোটাও নিবিয়া গিয়াছে। মুশাইটা গেল কোথায় ? এখানে সিগারেট কোথা পাইবে ? না পাঠাইলেই হইত। শঙ্কর মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। দেখিতে পাইল, দূরে একটা আলো আসিতেছে। আলো, না, আলেয়া ? না, আলোই বোধ হয়। কাছাকাছি তো কোন জলাভূমি নাই ! শঙ্কর একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একটু কাছাকাছি হইলে প্রশ্ন করিল, কে ?

কোন উত্তর নাই। আর একটু কাছে আসিলে শঙ্কর দেখিতে পাইল, একজন স্ত্রীলোক, সঙ্গে কেহ নাই। এত রাত্রে একা এই নির্জন মাঠের মধ্যে কে এ !

কোন্ হ্যায়, কাঁহা যায়েগা ?

স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া পড়িল। আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, কে, শঙ্করবাবু নাকি ?

শঙ্কর চিনিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কুন্তলা !

এত রাত্রে একা কোথা চলেছেন ?

শিবমন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছি।

এত রাত্রে শিবমন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছেন!

হ্যাঁ। আজ শিবরাত্রি।

একা কেন?

মণি-ঠাকুরপোর খবর পেয়ে উনি হাসপাতালে চ'লে গেলেন, চাকরটারও অসুখ করেছে, তাই একাই যাচ্ছি। কি আর হবে!

আর কোন সঙ্গী পেলেন না?

কই আর পেলুম!

কুন্তলা একটু হাসিল। ম্লান বিষণ্ণ হাসি। শঙ্করের মনে হইল, সে হাসি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে, থিয়েটার সিনেমা হইলে অনেক সঙ্গী মিলিত, কিন্তু এই শীতে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে শিবপূজা করিতে যাইবে কে?

বলেন তো আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

না, থাক্।

কুন্তলা চলিয়া গেল। শঙ্কর একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ওই মেয়েটার তুলনায় নিজেকে কেমন যেন ছোট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পর-মুহূর্তেই সে নিজের সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল। নূতন যুগের নূতন পারিপার্শ্বিকে যাহারা পুরাতন প্রথাকে অবুঝের মত আঁকড়াইয়া আছে, তাহারা কি সত্যই শ্রদ্ধেয়? কুন্তলা রামলালের শিক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া নিষ্ঠাভরে শিবরাত্রি করিতেছে! মনে মনে কথাটি বলিয়াই সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। নিজেই তো সে এতক্ষণ এই শিক্ষার তুচ্ছতার কথা ভাবিতেছিল। চিন্তার সূত্রটা কেমন যেন হারাইয়া গেল। নিজেরই অন্তরের পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর আবর্ত ফেনাইয়া তুলিল। একবার মনে হইল, শিবরাত্রি করায় কি এমন মহত্ত্ব আছে? আছে শুধু দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমের অন্তঃসারশূন্য দম্ভ এবং তাহা বজায় রাখিবার জেদ। পর-মুহূর্তেই নিজেকে প্রশ্ন করিয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল। অন্তঃসারশূন্য? সত্যই কি ইহা অন্তঃসারশূন্য? নূতন যুগের নূতন ঢেউয়ের মুখে যে হালকা শোলাটা নাচিয়া

বেড়াইতেছে তাহারই অন্তর পরিপূর্ণ, আর যে পর্বত সমস্ত ঢেউ সত্ত্বেও অটল হইয়া আছে সে-ই অন্তরঃসারশূন্য ? সহসা ইহার কোন সদুত্তর মাথায় আসিল না, তবু কিন্তু নূতন যুগের নূতন দাবি যে একটা আছে তাহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। নূতন যুগের সে অভিনব দাবিটা কি ? কমিউনিজ্‌ম ? তাহাও কি পুরাতন মনোবৃত্তিরই পুনরাবর্তন নয় ? শক্তিমান শ্রমিক জরাগ্রস্ত ধনিকের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, ইহাতে অভিনবত্ব কোথায় ? শক্তিমান চিরকাল অশক্তের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। তবে ? নূতন যুগের নূতন দাবিটা যে কি, তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। একটু পরেই মুশাই আসিয়া হাজির হইল। দেখা গেল, তাহার অসাধ্য কিছু নাই, ঠিক এক প্যাকেট সিগারেট কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়াছে। কুন্তলার নিষ্ঠাকে ব্যঙ্গভরে অবজ্ঞা করিবার জন্যই শঙ্কর যেন সাড়ম্বরে একটা সিগারেট ধরাইল এবং অপ্রস্তুত মুখে ফসফস করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

৩৬

ভিতরে উত্তেজিত হইলে উৎপল বাহিরে খুব শান্ত হইয়া পড়ে। ভ্রূ উত্তোলন করা, পা দোলানো, গোঁফে তা দেওয়া প্রভৃতি মুদ্রাদোষগুলি সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়, এমন কি তাহার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিও অচঞ্চল হইয়া পড়ে। শঙ্কর যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন এইরূপ তুরীয় অবস্থায় সে নীচের ঘরে বসিয়া রেডিও শুনিতেছিল। শঙ্কর ঢুকিতেই সে রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিল। প্রবেশ করিয়াই শঙ্কর প্রশ্ন করিল, খবর জান ?

খুব জানি। জাপানীরা সিটাং নদী পেরিয়ে আঠারো মাইল এগিয়েছে। রেঙ্গুন যায়-যায়।

সে খবরের কথা বলছি না। মণির কথা বলছি। মণির খবর জান ?

মণির খবর তোমার জানবার কথা, আমার নয়।

জমিদারি কিন্তু তোমার, এবং মণি তোমারই প্রজা।

সেটা কাগজে কলমে, আসল মালিক তুমি।—বলিয়া সে হাসিল।

...রের ইচ্ছা করিতে লাগিল, উৎপলের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া একটা ঝাঁকানি ... দিতে, ছেলেবেলায় চটিয়া গেলে যেমন মাঝে মাঝে দিত। কিন্তু সে ...বেলা আর নাই, উৎপলের সে ঝুঁটি নাই, সে উৎপলও আর নাই বোধ ...। তাই সেসব কিছু না করিয়া কেবল বলিল, নন্‌সেন্স।

একটা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।

শঙ্করের আগমনে এবং কথাবার্তায় উৎপলের উত্তেজনা কমিয়া গিয়াছিল। ...র চোখের স্বাভাবিক কৌতুকদীপ্তিও ফিরিয়া আসিয়াছিল। শালটা ...ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে ভণ, শ্রবণ করি।

তুই কিছুই শুনিস নি ?

বৈশম্পায়ন না বললে তো জন্মেজয়ের শোনবার কথা নয়। মহাভারতের ...শন ওলটাই কি ক'রে, বল ?

...র আরম্ভ করিতে যাইতেছিল, উৎপল বলিল, দাঁড়াও।

সিগারেট-কেস হইতে সিগারেট বাহির করিতে করিতে উৎপল চকিত ...ইতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিল।

আমাকেও দে একটা।

উৎপল ভ্রূ উত্তোলন করিল এবং একটু হাসিল। শঙ্করও হাসিতে যোগ ... বটে, কিন্তু মনে মনে সে যেন মরিয়া গেল।

...নির ব্যাপার সমস্ত শুনিয়া উৎপল বলিল, আমাকে কি করতে বল ?

ব্যবস্থা কর।

আমার ব্যবস্থা কি তোমার পছন্দ হবে ?

দেখ্‌, ফের যদি ও-রকম ক'রে কথা বলিস, এক ঘুসি মারব তোকে।

উৎপল হাসিল।

শঙ্কর বলিল, ও-রকম ক'রে গা বাঁচিয়ে থাকলে চলবে না। অবিলম্বে ...টা ব্যবস্থা করতে হবে।

তোমার যদি আপত্তি না থাকে, অর্থাৎ হঠাৎ ভাবগ্রস্ত হয়ে তুমি যদি ... না দাও, খুব ভাল ব্যবস্থা হতে পারে।

আমার আপত্তি হবে কেন ?

উৎপল নীরবে বাম গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল।

কি ব্যবস্থা করতে চাও ?

বিকট রকম, অর্থাৎ ব্রিৎস্ক্রিগ।

মানে ?

উৎপল কিছুক্ষণ নীরবে গোঁফে তা দিল, তাহার পর বলিল, শোন তা হ'লে। প্রথমেই ওই দারোগাটাকে টাকা দিয়ে হাত করতে হবে। গুলাব সিং যা দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি দিয়ে আমাদের সপক্ষে আনতে হবে ওকে। দ্বিতীয়, জীবন চক্রবর্তীর নামে কেসটা তুমি 'উইথড্র' করবে ভাবছিলে, তা না ক'রে 'ফুল ফোর্সে' চালাতে হবে সেটা। তৃতীয়, ওদের দস্তুর ধানের গোলা আর পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে এক্কেবারে— পরের সম্পত্তি নষ্ট করার মজাটা বুঝুন একবার ভদ্রলোক, তার আগে একটা ওয়ার্নিং দিতে পার, খেসারৎ স্বরূপ যদি হাজার টাকা দেন, মাপ করতে পার এবারকার মত। চতুর্থ, তোমার ওই নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারকে আজই জবাব দিয়ে দাও। আজই যেন তাঁরা আমার এলাকা ত্যাগ করেন। জবাব দেবার আগে থামে বেঁধে চাবকে দিলেও মন্দ হয় না। পঞ্চম, ওই গুলাব সিংকে তিন দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। মণির হয়ে কেউ ওর নামে থানায় গিয়ে নালিশ ক'রে আসুক, আমাদের এলাকায় ওর যত জমি আছে সব আড়গড়া দিয়ে দাও, আর মুখে মুখে প্রচার ক'রে দাও (অবশ্য কথাটা যেন ওর কানে গিয়ে পৌঁছয়) যে, ওর মাথাটা কেউ যদি কেটে এনে দিতে পারে, তাকে হাজার টাকা বকশিশ দেব আমরা। ষষ্ঠ, তোমার ওই 'লেম ডাক্‌স্'দের—ফরিদ কারু আর কি কি নাম বলছিলে সেদিন, ওদের প্রত্যেককে ডেকে এনে বেশ ক'রে চাবকাও, তারপর ব'লে দাও যে, ওরা যদি সব মণির সপক্ষে সাক্ষী না দেয়, সর্বনাশ ক'রে দেব ওদের। সপ্তম, এ অঞ্চলের বেহারী বাঙালী যত উকিল মোক্তার আছে, সবাইকে মণির তরফে নিযুক্ত ক'রে ফেল ; যে দুজন ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা যদি আমাদের পক্ষে আসতে রাজী না থাকেন, তাঁদেরও আসামী ক'রে ফেল

আসামী করাই ভাল বোধ হয়। অষ্টম, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহায়তায় পুলিস ফোর্স নিয়ে মণির সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা কর।

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল।

এত না করলে হবে না?

হবে না। হবে না—হবে না—খোল তলোয়ার, এসব দৈত্য নহে তেমন। অবশ্য তোমার যদি মনে হয়, বাঘের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলে ফল হবে, ক'রে দেখতে পার, আমি কিন্তু সে সবের মধ্যে থাকব না।

সিগারেটটা শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সেটা ফেলিয়া দিয়া উৎপল আর একটি ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তুমি আর একটি ধরিয়ে ব্যাপারটাকে প্রণিধান কর। আমি বাথ-রুম থেকে ঘুরে আসছি একটু।

উৎপল চলিয়া গেল। শঙ্কর আর সিগারেট ধরাইল না। নীরবে বসিয়া রহিল। সে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। উৎপল কি ঠাট্টা করিতেছে? না, তাহা তো মনে হইল না। প্রয়োজন হইলে সত্যই সে যে এমন বীভৎস রকম নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে এ ধারণা তো শঙ্করের ছিল না কখনও। তাহার ধারণা ছিল, উৎপল খামখেয়ালী এাপিকিউরিয়ান মাত্র। তাহার আপাত-সৌম্য পেলব মূর্তির অন্তরালে যে এমন একটা রাক্ষস প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, তাহা কে ভাবিয়াছিল! মণি এবং গুলাব সিংয়ের কথা ভুলিয়া শঙ্কর উৎপলের কথাই ভাবিতে লাগিল। আবাল্যপরিচিত উৎপলের মধ্যে এই অপরিচিত ব্যক্তিত্বের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ দেখিয়া মানব-চরিত্রের বিবিধ সম্ভাবনা বিষয়েই আর একবার সে সচেতন হইল যেন। কিছুক্ষণ আগে ফুলশরিয়াকে দেখিয়া যেমন হইয়াছিল। এতগুলি ভয়ানক অনুষ্ঠানের তালিকা বেশ নির্বিকারভাবে দিয়া গেল তো! শক্তি আছে বলিতে হইবে। তখনই মনে হইল, শক্তি যে আছে, তাহা তো তাহার আগেই বোঝা উচিত ছিল। শক্তি না থাকিলে কেহ কি নিজের স্ত্রীর জবানিতে প্রেমপত্র লিখিয়া বন্ধুর নাড়ী পরীক্ষা করিতে পারে? শক্তি না থাকিলে কেহ কি এত টাকা এমন অবহেলাভরে খরচ করিতে পারে? এত বড় সম্পত্তির সমস্ত ভার তাহার

উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? আজ পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন করে নাই, কোনও জবাবদিহি চাহে নাই। শক্তি আছে বইকি। এ শক্তির সম্মুখে কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে বসিয়া রহিল। প্রতিকারস্বরূপ উৎপল যাহা করিতে চাহিতেছে, তাহাতে সায় দিবার শক্তি তাহার যে নাই। প্রতিশোধের কথা সেও যে ভাবিয়া দেখে নাই তাহা নয়, কিন্তু সেই কবিতাটা মনে পড়িতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কুকুর কামড়াইয়াছে বলিয়া কুকুরকে কামড়াইতে হইবে? তোমার যদি মনে হয়, বাঘের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পড়লে ফল হবে, ক'রে দেখতে পার...উৎপলের কথাগুলি মনে পড়িল। সত্যই কি উহারা বাঘ? সত্যই কি এ উপমা খাটে? পর-মুহূর্তেই মনে হইল, এখনই তো সে নিজেই উহাদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করিতেছিল। উহারা সত্যই যে পশু ছাড়া আর কিছু নয়, অন্তরের অন্তস্তলে নিজেই কি সে এ কথা বিশ্বাস করে না? উহাদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে যে কোন ফল হইবে না, ইহা কি সে নিজেই অনুভব করিতেছে না? তবে এই পশুসমাজে তাহার কি করিবার আছে? নখদন্ত বিস্তার করিয়া উহাদের সহিত কলহ করিবে, না, দূরে দাঁড়াইয়া উহাদের পশুত্ব লইয়া নৈতিক হাহাকার করিবে? এই দুইয়ের মধ্যে একটাকে বাছিয়া লওয়া ছাড়া অন্য আর কি করিবার আছে? পশুকে মানুষ করা? তাহার তো কোন সম্ভাবনাই নাই। যাহা করিলে পশু সত্য সত্যই মানুষ হয়, তাহা করিবার সুযোগ এই পরাধীন দেশে কোথায়? এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় রাজনৈতিক আইনের নিক্তিতে ওজন করিয়া। হিন্দু-মুসলমান বাঙালী-বেহারী প্রত্যেকের মন রাখিয়া ধর্ম-রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া যে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়, তাহার ফলে মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হয় না, পশু ছদ্মবেশী হয় মাত্র। তবে? কি কর্তব্য এখন? সে কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। মনে হইল, একটা বিপুল অরণ্যে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

কি ঠিক হ'ল?

উৎপল আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

আর একটা সিগারেট ধরাও না।

সিগারেট-কেসটা আগাইয়া দিল। শঙ্করের মনে হইল, তাহার চক্ষু দুইটি যেন কৌতুকে নাচিতেছে। মনে হইবামাত্র তাহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। অযৌক্তিকভাবে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া বসিল, তোমার জমিদারিতে তুমি যা ইচ্ছে করতে পার, যেখানে খুশি আগুন দিতে পার, যাকে ইচ্ছে চাবকাতে পার; কিন্তু তার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াব কি না ঠিক করতে পারি নি এখনও।

উৎপল কিছু বলিল না। নীরবে একটি সিগারেট তুলিয়া লইল।

শঙ্কর বলিয়া চলিল, কতগুলো অসহায় লোককে ধ'রে চাবকানো, অশিক্ষিত লোকের বাড়িতে আগুন দেওয়া, গরিব কর্মচারীদের ওপর অত্যাচার করার মধ্যে সত্যিকার পৌরুষের কোনও লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি হয়তো পাচ্ছ।

আমিও পাচ্ছি না।

তবে?

আমি মণির কথা ভাবছি। কতকগুলো হিংস্র জন্তু তাকে আক্রমণ করেছে—এই কথাই মনে হচ্ছে খালি। ঠিক কি ক'রে জগতের সম্মুখে নিজের পৌরুষ প্রদর্শন নিখুঁত হবে, সে চিন্তা আমার মাথায় আসে নি।

বেশ, তা হ'লে যা ভাল বোঝ, কর।

আমার কথা শেষ করতে দে আগে। একটা কথা জানিস?

কি?

বাথ-রুম নামক স্থানটি অতি উত্তম স্থান। ওখানে গেলে চ-চ ক'রে অনেক ভাল ভাল চিন্তা মাথায় আসে, বোঁ-বোঁ ক'রে বড় বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অর্থাৎ আমি খুব ভাল একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি হঠাৎ।

কি সেটা?

আমি এ বিষয়ে কিছুই করব না, যা করবার তুমিই কর।

রাগে শঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে লইয়া

খেলা করে, তাহার সন্দেহ হইল, উৎপলও তাহার সহিত তেমনই খেলা করিতেছে।

তুমি কিছুই করবে না কেন?

ভাবছি শুধু শুধু তোমার মনে কষ্ট দিয়ে কি হবে?

আমার ব্যক্তিগত কষ্টের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক আছে বইকি। তুমিই তো সব, ব্যক্তিই তো আসল ভাই।

উৎপলের কণ্ঠস্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল যে, বিড়াল-ইঁদুরের উপমাটা নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সহসা তাহার ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িল। স্কুলের ফুটবল-ম্যাচে সে একবার খেলিতে চাহে নাই। উৎপল সেবার ক্যাপ্টেন ছিল। আসিয়া ধরিয়া পড়িল, খেলিতেই হইবে। তুই-ই তো সব, তুই না খেললে আমরা দাঁড়াতেই পারব না।—বহু বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া উৎপলের কথাগুলি সহসা যেন ভাসিয়া আসিল। সেই উৎপল কি এখনও আছে?

ভুরু কুঁচকে দেখছিস কি?

তোমার কাণ্ডটা। বিপদে প'ড়ে তোমার পরামর্শ চাইতে এলুম, তুমি তা না দিয়ে কতকগুলো আজগুবি কসরৎ দেখাচ্ছ কেবল।

পরামর্শ তো দিয়েছি, এখন তদনুসারে চলা না-চলা তোমার ইচ্ছে। অর্থাৎ তুমি যা করবে, তাই হবে।

প্রতিশোধ না নিলে এর প্রতিকার হবে না?

আর কি উপায় আছে, বল?

শঙ্কর বলিতে পারিল না। বস্তুত সেও আর কোন উপায় ভাবিয়া পাইতেছিল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

অত দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই। তুমি ধীরে-সুস্থে ভেবে-চিন্তে যা হয় ক'রো। আপাতত আর একটা কাজ করা যেতে পারে বরং।

কি?

এই অসময়ে সুরমার কাছ থেকে এক কাপ ক'রে 'কফি' আদায় করবার

চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। আমি বগাতে ফ্ল্যাটলি 'না' ব'লে দিলে। তুমি কি চাও—

আমারও এখন খেতে ইচ্ছে করছে না ভাই।

বাই জোভ!

উৎপল অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস দিতে লাগিল।

আমি ছুটি চাইছি ভাই। আমি এখান থেকে কয়েক দিনের জন্যে পালাতে চাই। ও-সমস্যার সমাধান তুমিই যা ভাল বোঝ, কর।

ষ্ট্যাট্'স নট শঙ্কর-লাইক। পালাবি!

শঙ্করকে কে যেন কশাঘাত করিল। যদিও সে অবিলম্বে ঠিক করিয়া ফেলিল যে, পলাইবে না; তবু বলিল, কিছুদিন ছুটি নিতে ইচ্ছে করছে?

কেন?

এ সব নোংরামির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

পল্লীসংস্কার মানেই তো আবর্জনা সাফ করা।

দেশের লোক খুন করা নয়।

দেশের লোকই যদি আবর্জনা হয়ে ওঠে, তা হ'লে তাও করতে হবে বইকি।

কিন্তু যে দেশের লোক এককালে মনুষ্যত্বের জন্যে বিখ্যাত ছিল, সে দেশের লোক যে কারণে আবর্জনায় পরিণত হচ্ছে, সেই কারণটা দূর করবার চেষ্টাই কি সংস্কার নয়?

কে অস্বীকার করছে তা? রিসার্চ ক'রে রোগের কারণটা বার করবার চেষ্টা কর। কিন্তু রোগাক্রান্ত যে ব্যক্তিটি সত্যি মারা গেছেন, দেশের লোক হ'লেও তাঁকে পুড়িয়ে ফেলাই তো আমি উচিত মনে করি।

রিসার্চ করবার দরকার নেই। রোগের কারণ অনেক দিন আগেই ধরা পড়েছে, আর মারা আমরা সবাই গেছি, পোড়াতে হ'লে দেশসুদ্ধ সবাইকে পোড়াতে হয়,—তোমাকে আমাকে সবাইকে।

যদি দরকার হয়, তাই করতে হবে।

আমার মতে কিন্তু তার দরকার নেই। দস্যু রত্নাকরকে পুড়িয়ে ফেল বাল্মীকিকে পাওয়া যেত না। হাজার খারাপ হ'লেও মানুষ আবর্জনা নয় আজকের বিলাসী মিস্টার গান্ধী কাল মহাত্মা গান্ধীতে বিবর্তিত হয়ে যে পারেন; আজ যে দুর্বল জীর্ণ-শীর্ণ, কাল সে স্যাণ্ডো। মানুষের ইতিহাসে এ সব উদাহরণ মোটেই বিরল নয়।

নারদ সেজে তা হ'লে গুলাব সিংয়ের কাছে যাওয়া যাক, চল। কিছু বলা যায় না, লোকটা সত্যিই হয়তো মহাকাব্য লিখে ফেলতে পারে। অন্তত সম্ভাবনা যে আছে, তর্কের খাতিরে সে কথা মানতেই হবে।

উৎপলের চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল। শঙ্কর কিন্তু তাহা লক্ষ্য করি না। নিজেরই আলোচনার সূত্র ধরিয়া সে এক ভিন্ন লোকে উপনীত হইয়াছিল, যেখানে দীন দরিদ্র বালক প্রতিভাবান ফ্যারাডেতে পরিণত হয়, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তপস্বী বুদ্ধে রূপান্তরিত হন, সামান্য সৈনিক দেখিতে দেখিতে নেপোলিয়নের শৌর্যে বীর্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন—

বাই জোভ! সহসা এত দয়া!

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, সুরমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পিছনে বেয়ারা কফির সরঞ্জাম বহন করিয়া আনিতেছে।

কল্পনার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সুরমার আবির্ভাবে নূতন ধরনের একটা উত্তেজনা তাহার সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একটা আলো নিবিয়া গিয়া আর একটা রঙিন আলো যেন জ্বলিয়া উঠিল। শুধু তাই নয় নিমেষমধ্যে সে নিজের সহিত সেই পুরাতন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। বারম্বার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, অন্যায় করিতেছ, ভুল করিতেছ পাপ করিতেছ, চুরি করিতেছ। বন্ধুপত্নীকে দেখিয়া মনে মনে মুগ্ধ হইবার অধিকারও তোমার নাই; নির্বিকার থাক। প্রাণপণে সে নির্বিকার থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আপনার কাছে একবার যাব ভাবছিলাম।

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, সুরমার শুভ্র কপোলে কয়েকটি চূর্ণ অলক কাঁপিতেছে। শুভ্র নির্মল কপোল, আরক্তিম নয়।

কেন ?

গুলাব সিং লোকটাকে শিক্ষা দিয়ে দিন, সব শুনেছেন তো ? আমি আজ দুপুরে কুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম, তাকে কথা দিয়ে এসেছি, এর প্রতিকার আমরা করবই।

কি বললেন তিনি ?

বিশেষ কিছু বললে না, আজকাল বেশি কথা বলে না সে আর। শুধু বললে—অরাজক দেশে বাস করছি, মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হবে। আমি কিন্তু সহ্য করব না, এর একটা প্রতিবিধান করুন।

এতক্ষণ তুমি আমাকে কিছু বল নি তো ?—বিস্মিত উৎপল প্রশ্ন করিল।

জানি, তোমাকে বলা বৃথা।

উৎপল ভ্রূ-যুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইল।

শেষ পর্যন্ত শঙ্করবাবুকেই সব করতে হবে। রেডিও আর যুদ্ধ নিয়ে যা মেতেছ তুমি আজকাল !

না মেতে উপায় কি ? শত্রুবাহিনী দ্বারে হানা দিয়েছে।

এ কথায় কোন মন্তব্য না করিয়া সুরমা শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিল, ওই মেড়ো জমিদারটাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, আমরা, মানে বাঙালীরা, সত্যিই ভেতো নই। পারবেন তো ?

নিশ্চয়ই।

অতর্কিতে কথাটা শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর সামলাইয়া লইয়া বলিল, উৎপলের সঙ্গে এতক্ষণ সেই কথাই চলছিল। উৎপল তো একেবারে সপ্তমে চড়তে চায়।

চড়াই উচিত।—এই বলিয়া সুরমা কফির কাপটা উৎপলের দিকে আগাইয়া দিল। শঙ্করও এক কাপ লইল, প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। কফিতে এক চুমুক দিয়া উৎপল বলিল, শঙ্করের কিন্তু ইচ্ছে—

না, আমি ভেবে দেখলাম, তুমি যা বলছ তাই ঠিক। ও ছাড়া উপায় নেই।

শঙ্করবাবুর কি ইচ্ছে ?—সুরমা প্রশ্ন করিল।

ও বলছিল—

উৎপলের কথায় বাধা দিয়া শঙ্কর বলিল, দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ—এই বর্বর নীতিকে মানতে ইচ্ছে করছিল না আমার। ভদ্রতর কোন উপায়ে এ সমস্তার সমাধান হয় কি না আলোচনা করছিলাম।

আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আপনাকে বর্বর নীতিই মানতে হবে, তার কারণ আসলে আমরা এখনও বর্বরই আছি। যীশুখ্রীষ্ট বা বুদ্ধের বাণী আজও আমাদের মুখের বুলি মাত্র। তদনুসারে কোনদিন আমরা চলি না। এখন চলতে চেষ্টা করলে, সেটা ভীরুতা বা ভণ্ডামির নামান্তর হবে। নয় কি?

অনুত্তেজিত কণ্ঠে হাসিমুখে সুরমা কথাগুলি বলিল। শঙ্কর নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিরাট একটা বীরত্ব করিয়া সুরমার চোখে নিজেকে মহনীয় প্রতিপন্ন করিবার প্রবল বাসনা সহসা তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠিতে লাগিল। উৎপলের মুখে যে কথা শুনিয়া সে এতক্ষণ তাহাকে হৃদয়হীন ভাবিতেছিল, সুরমার মুখে ঠিক সেই একই কথা শুনিয়া সুরমাকে অতিশয় হৃদয়বতী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা সে নিজেই নিজেকে মনে মনে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল, নারীস্তাবক পশুটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। কোন যুক্তি আর টিকিবে না। ব্যঙ্গ করিল, কিন্তু বিহ্বলতা কমিল না। কফি পান করিয়া সোৎসাহে সে উৎপলের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কি উপায়ে গুলাব সিং এবং তাহার দলকে বিদলিত করা যায়?

শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল।

ভাবিতেছিল, ক্ষতি কি? বিশেষ একটা যুক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অসুখী হইবার কি হেতু থাকিতে পারে? সুখে বাঁচিয়া থাকাটাই আসল জিনিস। আনন্দই কাম্য, যুক্তি নয়। যত বড় যুক্তিই হোক না, তাহা যদি পারিপার্শ্বিককে শেষ পর্যন্ত নিরানন্দময় করিয়া তোলে, তাহা হইলে সে যুক্তি মানিবার সার্থকতা কি? আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ানোই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কি হইবে একটা বিশেষ মতবাদ লইয়া? সুরমাকে

একটু খুশি করিতে গিয়া সে যদি আগেকার মত পরিবর্তনই করিয়া থাকে, কি এমন ক্ষতি তাহাতে? সুরমাকে খুশি করিয়া সে আনন্দ পাইতেছে, ইহাই তো মত-পরিবর্তনের সপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি। উৎপলের বিপক্ষেও সে যুক্তি খাড়া করিয়াছিল স্বীয় চিত্তকে আনন্দিত করিবার জন্যই। আনন্দহীন যুক্তির মূল্য কি? বিবেক? বিবেকও একটা সংস্কার, তাহাকেও বারম্বার ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়া যায়। মরিয়া হইয়া শঙ্কর নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, মত-পরিবর্তন করিয়া সে অন্যায় কিছু করে নাই। পরস্ত্রীকে দেখিয়া এত মুগ্ধ হইবার কি অধিকার আছে তাহার—এই পুরাতন প্রশ্নটারও একটা উত্তর সে খাড়া করিয়াছিল। বারম্বার নিজেকে বলিতেছিল, মুগ্ধ করে, তাই মুগ্ধ হই। সন্ধ্যা উষা জ্যোৎস্না দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হই, সুরমাকে দেখিয়াও তেমনই মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার মতে মত দিয়া আনন্দ পাইতেছি। মুগ্ধ হইতে ক্ষতি কি? আর তো কিছুই করিতেছি না।...অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে পথ হাঁটিতে লাগিল। বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখিল, বাড়ির সামনে একটা পালকি রহিয়াছে। পালকি করিয়া কে আসিল? বেয়ারারা বারান্দার এক ধারে বসিয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু গুলাব সিংয়ের জেনানা রুক্মিণী দেবী আসিয়াছেন এবং তাঁহার অপেক্ষায় অন্দরে অপেক্ষা করিতেছেন। হঠাৎ? ভিতরে গিয়া দেখিল, রুক্মিনী দেবী অমিয়ার সহিত গল্প করিতেছেন। শঙ্করকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নমস্কারান্তে অবগুণ্ঠনটি একটু টানিয়া দিয়া নতনেত্রে নতমস্তকে দাঁড়াইয়াই রহিলেন। রুক্মিনী দেবীর রূপ দেখিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। স্বর্ণাভ গৌরবর্ণ, নিটোল নিখুঁত মুখশ্রী, আয়ত ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দুইটি, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পরিধানে কালো-পাড় বাসন্তী রঙের শাড়ি। শঙ্করের মনে হইল, স্বয়ং বৈদেহী যেন তাহার ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ম্যয় মাফি মাংনে আয়ি হুঁ।

মৃদুকণ্ঠে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া তিনি অমিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপহি সব কহিয়ে।

অমিয়া বলিল, ইনি গুলাব সিংয়ের স্ত্রী, লক্ষ্মীবাগের দাঙ্গার সম্পর্কে এসেছেন। স্বামীর হয়ে মাফ চাইতে এসেছেন উনি। বলছেন, এ ঘটনার জন্য উনি মর্মান্তিক দুঃখিত। মণিবাবুর চিকিৎসার যা খরচ লাগে তা উনি দেবেন, স্বামীকেও লক্ষ্মীবাগ ছেড়ে আসতে বাধ্য করবেন। স্বামী যদি ওঁর কথা না শোনেন, তা হ'লে স্বামীর বিরুদ্ধে উনি নিজে গিয়ে কোর্টে এজাহার দেবেন বলছেন, তোমরা যদি মকদ্দমা কর। কিন্তু তার বোধ হয় দরকার হবে না, কারণ ওঁর বিশ্বাস—স্বামী ওঁর কথা রাখবেন। উনি অনুরোধ করতে এসেছেন,—তোমরা আগে থাকতে ওঁর নামে কোন কেস ক'রো না। কারণ মকদ্দমা করা ওঁর স্বামীর একটা নেশা, একবার যদি শুরু হয়ে যায়, ওঁকে থামানো শক্ত হবে। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস, স্বামী ওঁর কথা রাখবেন, মকদ্দমা করতে হবে না।

অমিয়া যেন কথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। এই পর্যন্ত বলিয়া রুক্মিনী দেবীর দিকে চাহিল। রুক্মিনী দেবী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে তাঁহার বক্তব্য যথাযথ উক্ত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আঁচল হইতে একখানি হাজার টাকার নোট খুলিয়া অমিয়ার হাতে দিতে গেলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি ও?

উনি মণিবাবুর ক্ষতিপূরণস্বরূপ হাজার টাকা দিতে চাইছেন।

শঙ্কর বলিল, আমরা তা নিই কি ক'রে? মণিবাবুর সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তিনি ভাল হয়ে আসুন, তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন। তিনি যদি নিতে চান নেবেন।

রুক্মিনী দেবী নোটটা ক্ষণকাল ধরিয়া থাকিয়া আনতমস্তকে শঙ্করের কথাগুলি প্রণিধান করিলেন এবং তাহার পর ধীরে ধীরে সেটি আবার আঁচলে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, আপনি যে এখানে এসেছেন, তা কি গুলাব সিং জানেন?

রুক্মিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, জানেন না। তাহার পর অমিয়া

কানে কানে কি বলিলেন। অমিয়া শঙ্করকে জানাইল, উঁর স্বামী অন্য আর একটি মকদ্দমার তদ্বির করতে সদরে গেছেন, এখানে নেই তিনি।

ও।

রুক্মিনী দেবী আবার অমিয়ার কানে কানে কি বলিলেন।

অমিয়া বলিল, উনি জিজ্ঞেস করছেন, তা হ'লে উনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন তো? তোমরা কিছু করবে না তো?

শঙ্করকে বলিতেই হইল যে, ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটিয়া গেলে তাহারা আর কিছুই করিবে না। বলিয়াই কিন্তু দুঃখিত হইল, সুরমার মুখটা মনে

রুক্মিনী দেবী নমস্কারান্তে চলিয়া গেলেন।

অমিয়া বলিল, দই ক্ষীর কলা সন্দেশ কত কি এনেছে দেখবে এস।

খুকী কোথা?

যমুনিয়া পারুলদের বাড়ি নিয়ে গেছে তাকে।

এত রাত্রে সেখানে কেন?

সমস্ত দিন ঘুমিয়েছে, চোখে ঘুম নেই, কেবল আমাকে বিরক্ত করছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছি। বলে কি জান? মানাতে রঙ মাখিয়ে লজেন্‌চুষ ক'রে দাও। এত দুষ্টু হয়েছে!

অমিয়া হাসিল, শঙ্করও একটু হাসিল।

তোমার শরীরটা কি ভাল নেই? অমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

শঙ্করের শুষ্ক মুখ ও প্রাণহীন হাসি অমিয়ার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

অমিয়ার প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর আর একটু হাসিল।

কি যে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছ এ কদিন মণিবাবুর ব্যাপার নিয়ে! নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত ঠিক নেই। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

উৎপলের বাড়িতে। খিদে পেয়েছে, খাবার ঠিক কর।

খিদে পাবে না? সেই কোন্ কালে দুটি খেয়ে বেরিয়েছ! বেগুনগুলো ভেজে ফেলি, কুটে রেখে এসেছি।

অমিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। শঙ্কর ইহাই চাহিতে-

ছিল। সত্যই তাহার ক্ষুধা পায় নাই। তাহার মনে হইতেছিল, অমিয়ার মনোযোগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। নির্জনে বসিয়া সে নিজের সহিত বোঝাপড়া করিতে চায়। সিগারেট ধরাইয়া বাহিরের ঘরটাতে গিয়া সে বসিল। বসিয়াই মনে হইল, সে অন্যায় করিতেছে—ঘোরতর অন্যায়। সুরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবার সপক্ষে যেসব যুক্তি সে এতক্ষণ খাড়া করিয়াছিল, মনে হইল, তাহা অর্থহীন, দুর্বল মনের মূঢ় লোলুপতা মাত্র। সুরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া মানে বৃহত্তর সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া। তাহা করা কি উচিত? তা ছাড়া মনের এই কাঙালপনা আত্মসম্মান-হানিকর নয় কি? সুরমা না হয় খুবই সুন্দর, কিন্তু যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দেখিবে, অমনই তাহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতে হইবে? সেদিন তো সে নিজেই এক বিলাত-প্রত্যাগত শিক্ষিত ব্যক্তির বিলাত-ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, লোকটা বিলাতে গিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া গিয়াছে যেন! সেখানকার চাকরাণী হইতে শুরু করিয়া রাজরাণী পর্যন্ত সকলেই তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতি পদেই এদেশের সহিত ওদেশের তুলনা করিয়া গদগদ পঞ্চমুখে ওদেশের স্তুতি এবং এদেশের নিন্দা করিতে করিতে ভদ্রলোক বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছে যেন! একটা গ্রাম্য ববর যেন সর্বপ্রথম কলিকাতায় আসিয়া কৃতার্থ নয়নে হাইকোর্ট দর্শন করিতেছে। ভারতীয় বলিয়া তাহার মনে যেন কিছুমাত্র গর্ব নাই, বিলাতী ঐশ্বর্য দেখিয়া আত্মসম্মানশূন্য লোকটা লোভে ক্ষোভে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিজের আচরণও কি ঠিক অনুরূপ নয়? সুরমা সুন্দর, কিন্তু অমিয়াও কি কম সুন্দর? এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তাহার মনের গ্লানি যেন কাটিয়া গেল। সে বারম্বার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, অমিয়াও সুন্দর। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সুন্দর বইকি।

কোথা তুমি?

এই যে, বাইরের ঘরে।

অমিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

তুমি নিশ্চয় খুব রাগ করবে, আজ তোমার একখানা চিঠি এসেছিল, দিতে ভুলে গেছি।

কার চিঠি ?

খামের চিঠি, খুলি নি, মেয়েলী হাতের লেখা।

মুচকি হাসিয়া অমিয়া ড্রয়ার হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া দিল।

বেগুন-ভাজা হয়ে গেছে, রুটি সেঁকছি, এস তুমি।

অমিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল।—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি আমাকে চেনেন না। আমরা পলাশপুরে থাকি, আমার স্বামীর নাম লোকনাথ ঘোষাল। অত্যন্ত বিপদে প'ড়ে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। ইতিপূর্বে ওঁর মুখে আপনার যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে বিশ্বাস আছে যে, আপনি নিশ্চয় এ বিপদে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। পলাশপুর আপনার ওখান থেকে বেশি দূর নয়, দয়া ক'রে যদি একবার আসেন, স্বচক্ষে সবই দেখতে পাবেন। চিঠিতে আমার বিপদের কথা লেখা যাবে না। আসুন একবার। বেশি বিপদে না পড়লে আপনাকে এ অনুরোধ আমি করতাম না। ওঁকে না জানিয়ে গোপনে আপনাকে চিঠি লিখলাম, দেখবেন—উনি যেন না জানতে পারেন। আশা করি, যত শীঘ্র সম্ভব আপনি আসবেন। ইতি

বিনীতা—শ্রীমতী স্বরমা দেবী

পত্রটি পড়িয়া শঙ্কর বিস্মিত হইল, কিন্তু বাহিরে যাইবার একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে উৎপলকে সমস্ত কথা একটি পত্রযোগে জানাইয়া সে পলাশপুরের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। উৎপলের সহিত দেখা করিল না। কারণ তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেই সুরমার সহিতও দেখা হওয়ার সম্ভাবনা। এ লোভনীয় সম্ভাবনার সুযোগ লইতে তাহার সাহস হইল না।

৩৭

শঙ্করের পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া উৎপলের মুখে মৃদু হাসি এবং ভ্রূযুগলে কুঞ্চন জাগিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া পত্রখানি তৃতীয়বার সে পাঠ করিল।—

ভাই উৎপল,

লোকনাথবাবুর স্ত্রী খুব বিপন্ন হয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কাল ভোরেই তাই আমাকে পলাশপুর যেতে হচ্ছে। ফিরতে কত দেরি হবে তা বলতে পারি না, কারণ বিপদটা যে ঠিক কি জাতীয়, তা তিনি লেখেন নি। তুমি ইতিমধ্যে লক্ষ্মীবাগের ব্যাপারটার একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল। যা ভাল বোঝ, তাই কর। যদিও প্রথমে আমার মনে একটু খুঁতখুঁতানি ছিল (এবং সত্যি কথা বলতে কি, এখনও আছে) ; কিন্তু ভেবে দেখলাম, তোমার এবং সুরমার মতটাই ঠিক। এ অপমান হজম করা উচিত নয়। গুলাব সিংয়ের নামে এখন কিছু ক'রো না, কারণ কাল তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে দেখি, তাঁর স্ত্রী রুক্মিনী দেবী আমার বাড়িতে ব'সে আছেন। তিনি তাঁর স্বামীর হয়ে মাপ চাইলেন এবং ব'লে গেলেন যে, মণির সমস্ত ক্ষতিপূরণ করবেন তাঁরা, আমরা যেন এই নিয়ে কোর্টে না যাই। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রমথ ডাক্তার, নিপুদা, গদাই, কেনারাম এবং আর সকলের সম্বন্ধে তোমার যা খুশি ক'রো, আমি আপত্তি করব না। ইতি

শঙ্কর

কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া উৎপল কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। যদিও সে ইংরেজীনবিস লোক, তবু দুইটি প্রচলিত সংস্কৃত প্রবচন পর পর তাহার মনে পড়িয়া গেল। প্রথমটি—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহ', দ্বিতীয়টি—'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'। সে কেনারাম চক্রবর্তীকে ডাকিতে পাঠাইল। লক্ষ্মীবাগের দাঙ্গার পর কেনারাম একটা আহ্বান প্রত্যাশাই করিতেছিলেন। খুব একটা ক্ষুব্ধ মুখভাব লইয়া তিনি উৎপলের নিকট গেলেন। নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইল।

বিনা ভূমিকায় উৎপল বলিল, শঙ্কর এখানে নেই। আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

লক্ষ্মীবাগে মণির সম্পত্তি লুঠ করা ব্যাপারে যারা লিপ্ত ছিল, তাদের একটু শিক্ষা দিতে চাই। কে কে ছিল, খবর পেয়েছি আমি।

কেনারামের মুখের উপর নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া সে দৃষ্টি সরাইয়া লইল। গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে পাকাইতে গম্ভীরভাবে বলিল, সকলের সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে না। আপনি ফরিদ কারু হবিবা বহিম কর্পূরা—এই কজনের নাম থানায় পাঠিয়ে দিন; লিখে দিন যে, ওরা যে ডাকাতের দলে ছিল, তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আপনার দ্বিতীয় কাজ, নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারকে নোটিস দেওয়া। এক মাসের মাইনে অগ্রিম দিয়ে তাঁদের ব'লে দিন যে, যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা আমার এলাকা ত্যাগ না করেন, অপমানিত হবেন। তৃতীয় কাজ, রাজীব দত্ত। তাঁর ছেলে গদাইকেও শঙ্কর ওদের মধ্যে দেখে এসেছে। আপনি রাজীব দত্তকে গিয়ে বলুন যে, অবিলম্বে তিনি খেসারৎস্বরূপ যদি এক হাজার টাকা দিতে রাজী না হন, আমরা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করব।

কেনারাম মনে মনে উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলেন। কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়। রাজীব-প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা কয়টি বলিলেন, রাজীব এখানে নেই, কলকাতা গেছে।

গদাইকে গিয়ে বলুন তা হ'লে।

বেশ। কিন্তু গদাই যদি বলে যে, সে ওদের সঙ্গে ছিল না?

অবিচলিতকণ্ঠে উৎপল মিথ্যাভাষণ করিল, অস্বীকার করবার উপায় নেই। শঙ্করের কাছে ছোট্ট একটা পকেট-ক্যামেরা ছিল, সমস্ত দলটার ফোটো সে তুলে এনেছে।

এই সংবাদে কেনারাম চক্রবর্তী মনে মনে একটু অশান্ত হইয়া উঠিলেন। জীবনও সেখানে ছিল যে!

উৎপল চকিতে একবার কেনারামের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার

পর বলিল, জীবনও সেখানে ছিল। কিন্তু জীবনের কথা আমরা প্রকাশ করব না, আপনি নিজেই তাকে ধমকে দিন।

নিশ্চয়—নিশ্চয় ধমকে দেব। এ কথা তো আমার কানেই যায় নি!

উৎপল এ বিষয়ে আর বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। কেবল বলিল, হ্যাঁ, ও ছিল। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এটা মগের মুলুক নয়। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকেও চিঠি লিখছি আজ।

নতুন যিনি ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন, তিনি বড় বদমেজাজী লোক শুনেছি কারও সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান না বড়। সেদিন—

আমার সঙ্গে হয়তো দুর্ব্যবহার না-ও করতে পারে, একসঙ্গে বিলেতে পড়েছিলাম।

ও!

কেনারাম মতি স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখন আপাতত উৎপলের বিরুদ্ধাচরণ করা চলিবে না। তাঁহার মুখভাব সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অভিভাবকী ভঙ্গীতে বলিলেন, নিশ্চয়ই, এর একটা বিহিত করা দরকার বইকি। যা যা বললে, এখুনি আমি করছি সব। তুমি নিজে এসব ব্যাপারে মন দিয়েছ দেখে ভারি সুখী হলাম। এই তো চাই। শঙ্কর অবশ্য খুবই করে। তবু—। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, তবু তোমার নিজের সব দেখা চাই। কারণ জমিদারি তোমার।—এই কথা বলিবার পরই প্রসঙ্গত আর একটা কথাও যেন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, পাঁচ বছর পরে একটা যে হিসেবনিকেশ নেবার কথা ছিল, তারও সময় হয়ে এল প্রায়। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হিসেব আমি আপ-টু-ডেট ক'রে রেখেছি। অন্য অন্য ব্যাপারগুলোও শঙ্করকে ঠিক ক'রে রাখতে বলব, রেখেছে আশা করি, বেশ কেপেব্‌ল ছোকরা ও, তবু তুমি নিজে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিও সব। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, নিজের সম্পত্তি নিজে না দেখলে থাকে না, মা-লক্ষ্মীর আইনই ওই রকম। রাজবল্লভবাবু নিজে কিছু দেখতেন না ব'লেই তো সব গেল। কেনারাম আবার একটু হাসিলেন। উৎপল গম্ভীরভাবে আনত নয়নে ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত

করিয়া গোঁফই পাকাইতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। তাহার মনোভাব যে কি, তাহা ঠিক টের না পাইলেও কেনারাম প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলিতেও ছাড়িলেন না।

সেদিন হৃদয়বল্লভ এসেছিল। সে জমিদারিটা আবার ফিরে কিনে নিতে চায়। ভাল দামই দিতে চাইছিল। আমি অবশ্য তাকে ব'লে দিয়েছি যে, জমিদারি বেচবার কোনও কথাই ওঠে নি এখনও।

উৎপল ইহারও কোন উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কেনারাম অবশেষে বলিলেন, এখন উঠি তা হ'লে। প্রমথ ডাক্তার আর নিপুকে কি আজই নোটিস দেবে?

আজই।

বেশ। তা হ'লে ড্রাফ্‌ট ক'রে টাইপ ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সই ক'রে দিও।

দিন।

কেনারামবাবু চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবামাত্র উৎপলের মুখভাব পরিবর্তিত হইল। প্রচ্ছন্ন হাস্যে মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতে লাগিল।

৩৮

শঙ্করের সম্বন্ধে ফুলশরিয়ার অনেক দিন হইতেই একটা খটকা ছিল। হরিয়ার মুখে খবর শুনিয়া তাহা আরও বাড়িয়া গেল। কি রকম ধরনের লোকটা যেন! মণিবাবুর 'কানতে' যাহারা ডাকাতি করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সকলের নামে নাকি থানায় নালিশ হইয়া গিয়াছে! শঙ্করবাবুই নিশ্চয় ইহার মূলে আছেন, কারণ সব জিনিসের মূলে তিনিই থাকেন। এতদিন ধারণা ছিল, লোকটা সত্যই বোধ হয় দেবতা। কেন যে এমন অসম্ভব একটা ধারণা তাহার হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া নিজেরই উপর রাগ হইতে লাগিল। তাহার পতিতা-জীবনে অনেক লোকের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু 'দেওতা' তো একজনও চোখে পড়ে নাই, শঙ্করবাবুকেই বা শুধু

শুধু দেবতা ভাবিতে গেল কেন সে? লোকটাকে দেখিয়া 'তাজ্জব' লাগে, কিন্তু। হাব-ভাব-ইঙ্গিতে কোন প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ করে না, মাথা উঁচু করিয়া কেবল পরোপকার করিয়া বেড়ায়। এ যে আশ্চর্য ব্যাপার! নটুবাবু ডাক্তারও কম পরোপকারী নন, কিন্তু 'সরাব' পান করিয়া রাত-দুপুরে তাহার দরজা ঠেলাঠেলি করিতে তিনি কোনদিন ইতস্তত করেন না। এ লোকটা কিন্তু সে সবের ধার দিয়াও যায় না। পাথরের নয়, রক্তমাংসেরই শরীর নিশ্চয়, কিন্তু কোনরূপ বেচাল নাই। এমন নিখুঁত রকম 'বরহম্‌চারী' তো দেখা যায় না বড়। কিন্তু না, ফুলশরিয়া ওসব বিশ্বাস করে না। শঙ্করবাবু একদিন তাহার উপকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই, তাহাতে হইয়াছে কি? বাবু-ভেইয়াদের পায়ে পড়িলে অনেকেই অমন উপকার করিয়া থাকে। গরিব-দুঃখীদের কাকুতি-মিনতিতে গলিয়া পড়া অনেকের ঢঙ, অনেকের শখ। 'চুহা মুহা' নিপুবাবুও সকলের উপকার করিবার জন্য লালায়িত; উপকার করিয়াছেন বলিয়াই শঙ্করবাবুকে 'মহাৎমাজী' মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহা করিলে মানুষের সম্বন্ধে তাহার এতদিনকার ধারণাই যে বদলাইয়া ফেলিতে হয়। না, সে বিশ্বাস করে না। নিশ্চয়ই আর সকলের মত এ লোকটারও গলদ আছে। কিন্তু কোথায় সে গলদ? সেদিন লছমীবাগে গুলাব সিংজীর দরবারে হঠাৎ গিয়া হাজির। তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইলেন না পর্যন্ত। অথচ গুলাব সিংয়ের মত লোক তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে। আর একদিন কোথাও কিছু নাই, রাত-দুপুরে যমুনিয়ার বাড়ি গিয়া উপস্থিত। চীৎকার চেচামেচি শুনিয়া সে ভাবিল, এইবার হুজুর বোধ হয় ধরা পড়িলেন। কিন্তু কোথায় কি! পরে শোনা গেল, মুশাইকে শাসন করিবার জন্য আসিয়াছেন, ওই 'ডোক হুর'-মার্কা যমুনিয়াকে গায়ের দামী শালটি বকশিশ করিয়া গেলেন। দরদ দেখাইবার আর লোক পাইলেন না! গরিবদের প্রতি দরদ যে কত, তাহার নমুনা তো এইবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নিজেদের লেজে যেই পা পড়িয়াছে, অমনই ফোঁস করিয়া উঠিয়াছেন। মণিবাবুর 'কামৎ' যেই লুঠ হইয়াছে, অমনই যত গরিব-দুখীয়াদের নামে থানায় নালিশ হইয়া গেল।

আসল ডাকাত গুলাব সিংয়ের নামে নাকি নালিশ হয় নাই। যত দোষ ইহাদের। অথচ ইহাদের জন্য শঙ্করবাবুর দয়া একদিন উথলাইয়া উঠিয়াছিল। সকলের 'মাইবাপ' সাজিয়া বসিয়াছিলেন। নিজে জামিন হইয়া থানা হইতে ছাড়াইয়া পর্যন্ত আনিয়াছিলেন। কেন যে আনিয়াছিলেন, কে জানে! কিছু নয়, ও-সমস্ত লোক-দেখানো ঢঙ।…

ঘুঁটের উনুনে হাওয়া করিতে করিতে ফুলশরিয়া মনে মনে গজরাইতেছিল। সেদিন লক্ষীবাগে শঙ্কর যে তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়া দ্বিতীয় বার আর দেখে নাই, ইহাতে সে বড়ই মর্মাহত হইয়াছিল। শঙ্কর যদি তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া বকিয়া দিত, যদি বলিত—ফুলশরিয়া, তুই এখানে? তোকে এখানে দেখব আশা করি নি তো। তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাইত সে। বুঝাইয়া বলিতে পারিত যে, তাহারা অসহায় জনমজুর মাত্র, ধনীদের ডাকে সাড়া না দিলে তাহাদের দিন চলা ভার। ভাল কাজ মন্দ কাজের বিচার করিয়া চলিবার উপায় আছে কি তাহাদের? যাহাতে বেশি মজুরি, তাহাই তাহাদের কাছে ভাল কাজ; যাহাতে কম মজুরি, তাহাই মন্দ। তাহারা অন্নহীন বস্ত্রহীন সহায়সম্পদহীন দীন দরিদ্র যে। গুলাব সিংয়ের অত মজুরির লোভ তাহারা কি সামলাইতে পারে? এত কথা ঠিক এমনভাবে মনে জাগে নাই, কিন্তু এমনই ধরনের কিছু একটা সে শঙ্করকে বুঝাইয়া বলিতে পারিত। কিন্তু শঙ্করবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না পর্যন্ত। সে যেন মানুষ নয়, ডাকিয়া কথা বলিবার উপযুক্ত নয়, পোকামাকড় যেন। মাঝে মাঝে দয়া করিয়া কৌতূহলভরে নিরীক্ষণ করেন, কখনও আবার পায়ে দলিয়া চলিয়া যান। ইস্, ভারি বড়লোক আমার! অমন বড়লোক সে ঢের দেখিয়াছে। সজোরে আবার সে উনুনে হাওয়া করিতে লাগিল। হরিয়াটা আবার আসিয়া জুটিয়াছে। এত রাত্রে তাহার জন্য আবার রাঁধিতে হইবে। ঘরে চাল নাই, কিন্তু হরিয়া সে কথা শুনিবে না, ভাত সে খাইবেই। পয়সা লইয়া দোকানে চাল কিনিতে গিয়াছে। বলিল, উপর্যুপরি কয়েক দিন ভাত খাইতে পায় নাই, চুড়া মুড়ি কিংবা ছাতু খাইয়া কাটাইয়াছে। কে তাহাকে রাঁধিয়া দিবে! বউ

তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেয় না, সে নাকি আর একটা 'চুমানা' করিয়াছে। থানায় দারোগা ব্যাপার ধরিয়া তাহাকে দিয়া কয়েক দিন 'বরতন' মলাইয়াছিলেন, বেতন চাওয়াতে দূর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার নামে বি.এল. কেস করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। হরিয়ার মুখেই ফুলশরিয়া শুনিল যে, লক্ষ্মীবাগ লুঠ উপলক্ষ্যে সকলের নামে নালিশ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে এইবার কিছুদিন গা-ঢাকা দিতে হইবে। নালিশটা যে উৎপল করিয়াছে, শঙ্করের ইহাতে যে কোন হাত নাই, তাহা হরিয়া জানিত না।

হরিয়া চাল লইয়া প্রবেশ করিল এবং খবর দিল, শঙ্করবাবু পলাশপুরে চলিয়া গিয়াছেন। নটবরবাবু তাহার জন্য শঙ্করবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, দেখা হইল না। তিনি ফিরিয়া গেলেন। 'বদ্‌নসীব' বলিয়া হতাশ হইয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

বদ্‌নসীব তো হাম্ কি করবো? য়ঁহা কি ছে?

হরিয়া কিছু বলিল না, ফুলশরিয়া প্রজ্বলিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

দে, চাউল দে।

চাল লইয়া সে ধুইতে বসিল। সহসা নটবর ডাক্তারের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

পলাশপুর অভিমুখে যাইতে যাইতে শঙ্কর নিজের মনের আধুনিকতম সমস্যার কথাটাই ভাবিতেছিল। তাহা পল্লীসংস্কার নয়, গুলাব সিং নয়, সুরমা। সুরমাকে সে কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিল না। এজন্য সে লজ্জিত হইতেছিল, নিজেকে ধিক্কার দিতেছিল; কিন্তু কিছুতেই মনকে সুরমা-মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এই অশুদ্ধ অশান্ত চিত্ত লইয়া দেশের কাজ করিবার সত্যই কি কোন অধিকার আছে তাহার? কোনও কালে কি ছিল? বাষ্পে স্ফীত রবারের

বেলুনের মত এক-একটা ভাবে মাতিয়া কিছুকাল সে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। এত দুর্বল কেন সে? নারীর সান্নিধ্যে কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে না, সমস্ত আদর্শ সমস্ত শিক্ষা নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কেন এমন হয়? সে তো প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখে, তবু কেন তাহার অন্তরবীণার সমস্ত তার আচম্বিতে অকস্মাৎ এমনভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে? জীবনে এমন বহুবার হইয়াছে। কেন এমন হয়? অমিয়াকে ঘিরিয়া তাহার এ আকুলতা জাগে না তো! চুন্‌চুন, সুরমা, বেলা, নীরা তাহার মনে যে ঢেউ তোলে, অমিয়া তাহা পারে না কেন? মনকে সহস্র প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর মেলে না, মন কেবল স্বপ্ন দেখিতে থাকে। সে ভাবিয়াছিল, তাহার মনের এই স্বপ্নসাধ বুঝি মিটিয়া গিয়াছে। পল্লীসংস্কারের প্রেরণায় আদর্শবাদের কঠোরতায় তাহার চঞ্চল যৌবনচিত্ত বুঝি শান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু না, আজ সে সবিস্ময়ে দেখিতেছে, মনের এই প্রিয়প্রবণতা প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র, বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহা এতদিন পরে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিল কেন? এই সুরমাকে তো সে এতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, এতদিন তো কিছু হয় নাই! এতদিন পরে সুরমাকে ঘিরিয়াই আবার স্বপ্ন জাগে কেন? সহসা সে অনুভব করিল, তাহার মন যেন ত্রিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক অংশ অপরাধী, এক অংশ বিচারক এবং আর এক অংশ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা অংশ উভয় পক্ষেরই কথা শুনিতেছে, উভয় পক্ষের প্রতিই সে সহানুভূতিসম্পন্ন। মনের এই অংশই যেন নিগূঢ়ভাবে শঙ্করের প্রশ্নের উত্তর দিল। বলিল, তোমার কবি-চিত্ত যে প্রিয়া কামনা করে, অমিয়ার মধ্যে সে প্রিয়া নাই। অমিয়া তোমার প্রিয়া নয়, প্রয়োজন। প্রিয়াকেই তুমি মনে মনে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ এবং যে নারীর মধ্যে তাহার আভাস পাইতেছ, তাহাকে ঘিরিয়াই তোমার মন স্বপ্ন-রচনা করিতেছে। স্বপ্ন-রচনা করাই তোমার স্বভাব। এতদিন পল্লীসংস্কারের স্বপ্নে মগ্ন ছিলে, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে স্বপ্ন ক্রমশ ভাঙিতেছে, প্রাক্তন স্বপ্ন তাই ফিরিয়া আসিতেছে আবার। তাই কি?

লোকনাথ ঘোষালের জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। যে লোকটি তাহাকে লোকনাথের বাড়ি দেখাইয়া দিয়াছিল, সে বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে চাহিল না। আকারে ইঙ্গিতে সে এমন ভাব প্রকাশ করিল, যেন একটা বাঘের গুহা অথবা সাপের বিবর। দূর হইতে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে পারিলে সে বাঁচে। শঙ্করের প্রতিও লোকটা এমনভাবে দুই-একবার চাহিল, যাহার ভাবটা—আচ্ছা অসমসাহসিক ভদ্রলোক তো, ওখানে কি দরকার? তাহারই মুখে শঙ্কর শুনিল যে, লোকনাথবাবু স্কুলে আর চাকরি করেন না, স্কুল হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটা দাঁড়াইল না। চলিয়া গেল। শঙ্কর একা দাঁড়াইয়া রহিল।

সূর্য অস্ত গিয়াছে। সন্ধ্যা আসন্ন। লোকনাথ ঘোষালের জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্কর ইতস্তত করিতে লাগিল। লোকনাথবাবুর সহিত বহুদিন তাহার কোন যোগ নাই। কলিকাতা ত্যাগের পর হইতে দেখা তো হয়ই নাই, বছর দুই হইতে পত্রালাপও বন্ধ আছে। 'ক্ষত্রিয় পত্রিকাতেও আর সে লেখে না। লোকনাথবাবু উপর্যুপরি কয়েকবার তাহার লেখা প্রত্যাখ্যান করায় আর লেখাও পাঠায় নাই। বস্তুত লোকনাথবাবুর সহিত কার্যত কোন যোগ তাহার আর নাই। তবু সে হঠাৎ—মাত্র একখানি পত্র পাইয়াই—আসিয়া পড়িয়াছে। নিজের এই আচরণে নিজেই সে বিস্ময় বোধ করিতে লাগিল। আসিয়াছে বলিয়া বিস্ময় নয়। এতদিনের অদর্শন এবং এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও লোকনাথবাবুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এখনও অটুট আছে, ইহা আবিষ্কার করিয়াই সে বিস্মিত হইল। লোকনাথবাবুর প্রতি এ অহেতুক শ্রদ্ধা কেন? কি আছে লোকটার মধ্যে?

বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

ভাঙা পরুষকণ্ঠে কে যেন ধমকাইয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দড়াম করিয়া একটা গুরুভার পতনের শব্দ এবং নারীকণ্ঠের আর্ত করুণ একটা চীৎকার। শঙ্কর আর আত্মবিশ্লেষণ করিবার অবসর পাইল না, ভদ্রতার রীতি লঙ্ঘন করিয়া সামনের দরজা ঠেলিয়া সোজা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই যাহা তাহার চোখে পড়িল, তাহা অপ্রত্যাশিত। জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার

একটি রমণী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। শঙ্করকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া বসিলেন। শঙ্কর দেখিল, তাঁহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। লোকনাথবাবু একটা তক্তাপোশের উপর বসিয়া রহিয়াছেন, চতুর্দিকে বই খাতা ছড়ানো। তাঁহার রক্তচক্ষু কপালে উঠিয়াছে, দৃষ্টি দিয়া আগুনের হলকা বাহির হইতেছে, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, ঠোঁট কাঁপিতেছে, বাহু ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত, সমস্ত দেহটাই যেন আক্ষিপ্ত। সর্ব-অবয়বে যেন ক্রোধ এবং ঘৃণা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ, গলার চারিদিকে ঘা। পূর্বে গণ্ডমালা ছিল, এখন সেগুলি ঘায়ে পরিণত হইয়াছে। তৈলাভাবে মাথার চুল রুক্ষ অবিন্যস্ত। কপালে ঠোঁটের আশেপাশে কালো দাগ। শঙ্করের সহসা মনে হইল, লোকটা দগ্ধ হইতেছে।

কে—কে আপনি?

লোকনাথবাবু শঙ্করকে চিনিতেই পারিলেন না।

আমি শঙ্কর।

শঙ্করবাবু! ও। আসুন আসুন, আপনি এখানে এমন হঠাৎ?

বাঁচান আমাকে, বাঁচান।—ভয়ার্তা লজ্জা সমস্ত ভুলিয়া হররমা শঙ্করের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

ভেতরে যাও, ভেতরে যাও শিগগির, ভেতরে যাও বলছি।

লোকনাথবাবু এমন চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, শঙ্করের ভয় হইল, হয়তো আবার কি করিয়া বসিবেন! তাড়াতাড়ি নিজের পা ছাড়াইয়া লইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

ভেতরে যা—ও।

হররমা আর বসিয়া থাকিতে সাহস করিলেন না। মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া নাকের রক্ত মুছিতে মুছিতে উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবামাত্র লোকনাথবাবুর মুখভাব পরিবর্তিত হইল। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই, প্রফুল্লমুখে বলিলেন, তারপর হঠাৎ কি মনে করে?

বহুদিন পরে প্রিয়সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন উৎফুল্ল হইয়া

ডা

আসল সত্য গোপন করিয়া শঙ্কর বলিল, এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে যাই।

বেশ করেছেন। আসুন, বসুন। ভালই হ'ল এসেছেন, আপনাকে শোনানো যাক তা হ'লে। সময় আছে তো আপনার?

আছে।

বসুন তা হ'লে। একটা প্রবন্ধ লিখেছি, শুনবেন?

বেশ তো।

নিকটেই একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার ছিল, শঙ্কর তাহাতে উপবেশন করিল। লোকনাথবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রবন্ধ পাঠ শুরু করিয়া দিলেন। পড়িতে পড়িতে আবেগভরে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। প্রবন্ধের নাম—'বাঙালীত্ব'। শঙ্কর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা আবিষ্কার করিল যে, সে প্রবন্ধ শুনিতেছে না, এই অদ্ভুতপ্রকৃতির লোকটিকে অদৃশ্য একটা নিক্তিতে চড়াইয়া মনে মনে ওজন করিতেছে এবং তাহা লইয়া নিজের সহিত নানা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। একটা জিনিস যাহা ইতিপূর্বে ইঁহার সম্বন্ধে কখনও মনে হয় নাই, তাহাই সহসা যেন অতি স্পষ্ট এবং কষ্টদায়ক রূপে মনে প্রতিভাত হইল এবং চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল। অজাশিত হররমা-সম্পর্কিত ব্যাপার বাদ দিয়াও, শুধু তাঁহার সাহিত্যিক প্রকৃতি হইতে বিচার করিলেই অনিবার্যভাবে মনে হয়, অতিশয় সঙ্কীর্ণমনা লোকটা, এতটুকু উদারতা নাই। জগতের সহিত দূরের কথা, সমগ্র ভারতের সহিতই তাঁহার অন্তরের আত্মীয়তা নাই। নিরতিশয় স্বল্পপরিসর গণ্ডির মধ্যে নিজের 'বাঙালীত্ব' লইয়া তিনি আস্ফালন করিতেছেন। সমস্ত বঙ্গদেশ লইয়াও তাঁহার গর্ব নয়। তাঁহার ধারণা, পদ্মার ওপারে যাহারা থাকে, তাহারা সকলেই অসভ্য বর্বর, তাঁহার মতে বাঁকুড়া-মানভূমও প্রকৃষ্টরূপে মার্জিত নয়, তাঁহার যত গর্ব ভাগীরথীতীর-সন্নিহিত রাঢ় প্রদেশ লইয়া। শুধু তাহাই নয়, সাহিত্যের একটা বিশেষ নীতি, সীমাবদ্ধ মতবাদ, বিশিষ্ট ভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই তাঁহার চিত্তকে উদ্বোধিত করে না। সেই সীমার মধ্যে তাঁহার স্বকীয় সাহিত্য-চর্চা অবশ্য শক্তির পরিচায়ক, কিন্তু তাহা চর্চা মাত্র,

সৃষ্টি নয়,—সঙ্কীর্ণ মন লইয়া বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করা যায় না। বিদ্যাবত্তা এবং মনীষার সমন্বয়ে তাঁহার রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দেহ নাই, বিদগ্ধ চিত্তকে তাহা পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পরিমিত বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। মনে হয়, দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে, মুক্তি পাইলে বাঁচি। তাঁহার শুচিবায়ুগ্রস্ত সাবধানী মন নিজ বক্তব্যকে নিখুঁতরূপে সুস্পষ্ট করিবার প্রয়াসে শব্দবিন্যাসের এত নিপুণতা এত পাণ্ডিত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে এত দম্ভ এত বক্রোক্তি প্রকাশ করিয়াছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা কাব্য না হইয়া একটা জটিল গ্রন্থিসঙ্কুল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। তাহাতে স্বচ্ছতা নাই, স্নিগ্ধতা নাই, মনে হয়, বকবকানি ছাড়া যেন আর কিছুই নাই। সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠে। কেহ তাই তাঁহার লেখা পড়ে না। শ্রোতা পাইলে তাই তিনি দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। এই যে এতকাল পরে আসিলাম, আমাকে একটা কুশলপ্রশ্ন পর্যন্ত করিলেন না, আহারাদি হইয়াছে কি না খোঁজ লইলেন না, নিজের কৃতিত্ব জাহির করিবার জন্য একেবারে হুড়মুড় করিয়া প্রবন্ধ পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন। লোকটার সঙ্কীর্ণতা, আত্মম্ভরিতা এবং কাঙালপনা শঙ্করকে পীড়িত করিতে লাগিল। আবার তখনই মনে হইল, একটা বিশেষ পন্থায় বিশেষ দেবতার সাধনা মানেই সঙ্কীর্ণতা নয়। একসঙ্গে তেত্রিশ কোটির পূজা করা কি সম্ভব? একনিষ্ঠ পূজা মানেই কি নিজের বিশেষ দেবতাটি ছাড়া বাকি সকলের প্রতি ঔদাসীন্য নয়? এবং সেই ঔদাসীন্যের সহিত কোনভাবেও কি ঈষৎ বিতৃষ্ণা মিশ্রিত থাকে না? থাকাটাই তো স্বাভাবিক। বিশেষ একটি দেবতা বাছিয়া বরণ করার অর্থই তো অন্য দেবতার গুণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। যাঁহারা সমদৃষ্টি অথবা উদারদৃষ্টির বড়াই করেন, হয় তাঁহারা কোন দেবতারই উপাসক নন, না হয় তাঁহারা ভণ্ড। দেবতা সম্বন্ধে যাহা সত্য, সাহিত্যবুদ্ধি সম্বন্ধে বা রাজনীতি সম্বন্ধেই বা তাহা সত্য নহে কেন?

লোকনাথবাবু পড়িয়া চলিয়াছেন, "জীবনে কাহারও কৃপা, করুণা অথবা ক্রোধের তোয়াক্কা না রাখিয়া এ দেশের বিজ্ঞজনমণ্ডলীর আশীর্বাদ অভিশাপ উপেক্ষা করিয়া আমি যে ধরনের সাহিত্যচর্চা করিয়াছি, তাহাও এক হিসাবে আমার বাঙালীত্বেরই পরিচয় বহন করিতেছে। বাঙালী জাতির একটা

বৈশিষ্ট্য আছে। পরানুকৃতি তাহার একটা মজ্জাগত স্বভাব বটে, কিন্তু সকলে যখন অনুকরণের সুরায় বুঁদ হইয়া রহিয়াছে, তখন নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও উলটা কথা বলিবার শক্তি এই বাঙালীরই আছে। নেশা করিয়াও সে নেশার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতে পারে; তাই আজ যখন সকলের চিত্ত বিশ্বমুখী, কেহ যখন চীনের দুঃখে কাতর, কেহ যখন কমিউনিস্ট, কেহ যখন ইউরোপীয় ডেমোক্রেসির অধঃপতনে বিগতনিদ্র, তখন আমিই কেবল তারস্বরে বলিতেছি —আগে ঘর সামলাও; বিশ্বকে জানিবার পূর্বে নিজেকে জানো। নিজের বৈশিষ্ট্য-বিভবকে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের পবিত্র যজ্ঞাগ্নির মত রক্ষা করিতে শেখো; নিজের বৈশিষ্ট্যে যদি পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পার, তবেই তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক। পরের কথায় সায় দিয়া পরের সুরে সুর মিলাইয়া পরের হুজুকে মাতিয়া নাচিলে ইতঃ ভ্রষ্ট ততো নষ্ট হইবে মাত্র। ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি—সকলেই আগে নিজের ঘর সামলাইয়াছে, বস্তুত উহাই তাহাদের মুখ্য লক্ষ্য। নিজের ঘর সামলাইয়া তাহার পর তাহারা বিশ্বের দিকে নজর দিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বনজরের প্রকৃত তাৎপর্যও আজ সুধী সমাজে অবিদিত নাই। সুতরাং—"

লোকনাথবাবু আবেগভবে পড়িয়া চলিয়াছেন, শঙ্কর হঠাৎ বাধা দিল। বস্তুত তাহার মনে হইল, এই আহত রমণীটির সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ না করিলে তাহার আচরণ শুধু যে ভণ্ডামির নামান্তর হইতেছে তাহাই নয়, অস্বাভাবিকও হইতেছে। ভূপতিত রক্তাক্ত একটি নারীকে স্বচক্ষে এমন অবস্থায় দেখিবার পর সে সম্বন্ধে নীরব থাকা খুবই অশোভন। উনিই যে হররমা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু উনিই যদি হররমা হন, তাহা হইলে লোকনাথবাবুর এ কি রকম আচরণ!

মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল, একটা কথা—

কি বলুন?

আমি এসে যাঁকে দেখলাম, উনি—

শঙ্কর ইতস্তত করিতে লাগিল।

উনি আমার স্ত্রী।

লোকনাথবাবু শঙ্করের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, উনি আমার সাহিত্যিক জীবনের বাধা, অভিশাপ।

শঙ্কর সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বুঝতে পারছি না ঠিক।

পারতেন, যদি আপনিও একনিষ্ঠ সাহিত্যিক হতেন।

কেন, উনি করেছেন কি?

আমাকে সাহিত্য-পথভ্রষ্ট করবার জন্যে না করেছেন হেন কাজ নেই। আমার লণ্ঠনের পলতে ফেলে দিয়েছেন, দোয়াতের কালিতে জল মিশিয়েছেন, আমার খাতা কুঁচি কুঁচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছেন। ওঁর ইচ্ছে, ভারতীর নয়, ওঁরই আরতি আমি সারাজীবন ধ'রে করি।

লোকনাথবাবুর মুখভার কঠোর হইয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই বাজা মাগীটা জীবন দুর্বহ ক'রে তুলেছে আমার।

তিনি আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া হররমা পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

আমি তোমার জীবন দুর্বহ ক'রে তুলেছি? শুনুন তা হ'লে আপনি—

যাও, ভেতরে যাও।

আমার বিছে ফেরত দাও, এখুনি চ'লে যাচ্ছি।

দেব না। চ'লে যাও বলছি।

লোকনাথবাবুর চোখ দুইটা ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ়মুষ্টিতে তিনি একখানা বই চাপিয়া ধরিলেন। শঙ্করের ভয় হইল, হয়তো ছুঁড়িয়া মারিবেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং হররমাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

আমার যা কিছু গয়না কাপড় ছিল, সব বেচে বেচে ওই 'ক্ষত্রিয়' ছাপা হচ্ছে। খাট বিছানা আলমারি দেরাজ সব ওইতে গেছে। ওই বিছেটুকু লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাও জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে আজ। ওটুকু উদ্ধার ক'রে দিন আমাকে, আপনার পায়ে পড়ছি আমি।

বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও বলছি—

চুপ করুন আপনি।

ধৈর্যচ্যুত শঙ্কর হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল। গর্জন শুনিয়া লোকনাথবাবুও চমকাইয়া উঠিলেন। শঙ্করের এই রুদ্র রূপ তিনি কখনও দেখেন নাই। তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সহসা তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন।

৪০

শঙ্কর পলাশপুর হইতে ফিরিতেছিল।

হররমার বিছা উদ্ধার করিয়া সে প্রত্যর্পণ করিয়াছে বটে, কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব তাহাকে লইতে হইয়াছে। লোকনাথবাবুকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে যে, 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইবার সমস্ত ব্যয়ভার সে বহন করিবে। 'ক্ষত্রিয়ের' প্রবন্ধাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে লোকনাথবাবু তাহা শঙ্করের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং শঙ্কর নিজে কলিকাতায় গিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে তাহা ছাপাইয়া যথাস্থানে সেগুলি বিতরণ করিবে। আজকাল মূল্য দিয়া কেহ 'ক্ষত্রিয়' কেনে না। লোকনাথবাবুর বিচারে যাঁহারা সাহিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা বিনামূল্যে 'ক্ষত্রিয়' উপহার পাইয়া থাকেন। ইহা করিতে গিয়াই লোকনাথ-বাবু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হন নাই। কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না, শঙ্কর তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছে। যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু শক্তি এবং আমার ঘরে একখণ্ড কপর্দক অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ আমি থামব না। আমার স্ত্রী আমারই অর্থে তাঁর বোনপো-বউকে শাড়ি পাঠাবেন, আর অর্থাভাবে আমার কাগজ উঠে যাবে—এ কখনও হতে পারে না। এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য।...লোকনাথবাবুর কথাগুলি শঙ্করের মনে পড়িল। লাঞ্ছিতা হররমার কাতর অশ্রুসিক্ত মুখখানিও মনে পড়িল। কাহারও দাবি সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

আজকাল 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইতে কত খরচ পড়িতে পারে, মনে মনে তাহাই সে হিসাব করিতেছিল। শুধু তাহাই নয়, যে 'ক্ষত্রিয়'কে একদিন সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, যাহা একদিন তাহার দিবসের চিন্তা এবং রাত্রির স্বপ্ন

ছিল, সেই 'ক্ষত্রিয়' অদ্ভুতভাবে আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে—এই চিন্তায় সে বিভোর হইয়াছিল। সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া যাহাকে সে একদা স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিল! 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকাটাকে একটা জীবন্ত প্রাণবান কিছু বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল, মায়া কাটাইতে না পারিয়া পথ চিনিয়া আবার যেন ফিরিয়াছে। বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়িল। ছেলেবেলায় সে একটা কুকুর পুষিয়াছিল। যদিও অতি সাধারণ দেশী কুকুর, কিন্তু তাহাই তাহার ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে খাওয়ানো, নাওয়ানো, শোয়ানো, কসরৎ শেখানো ছাড়া আর কোন কাজ বা চিন্তা ছিল না। কিন্তু সে কুকুরকে ছাড়িতে হইল। মায়ের শুচিবায়ু প্রবল ছিল। কুকুরটাকে দেখিলেই তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেন। শঙ্কর ওটাকে লইয়া মাথামাখি করিতেছে—এ চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। বাধ্য হইয়া কুকুরটাকে ছাড়িতে হইল। না ছাড়িলে মা হয়তো পাগলই হইয়া যাইতেন। সহপাঠী অবিনাশের কুকুরটার প্রতি লোভ ছিল, তাহাকেই সে কুকুরটা দান করিয়া দিল। অবিনাশ কুকুর লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। তাহার বাড়ি দশ ক্রোশ দূরে। মাস দুই পরে একদিন মনে হইল, কে যেন কপাট আঁচড়াইতেছে, কুঁই-কুঁই শব্দও শোনা গেল। দ্বার খুলিয়া শঙ্কর দেখে, টম ফিরিয়া আসিয়াছে। দশ ক্রোশ হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার উৎসুক দৃষ্টি, আন্দোলিত পুচ্ছ—চোখের উপর ছবিটা আবার যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'ক্ষত্রিয়ে'র মলাটটা এবার নূতন ধরনের করিতে হইবে, কতই বা খরচ পড়িবে?

স্টেশনে গাড়ি ছিল না, শঙ্কর হাঁটিয়াই ফিরিতেছিল। হঠাৎ একটা কোলাহল কানে আসিল। চাহিয়া দেখিল, একদল লোক হাল্লা করিতে করিতে আসিতেছে। কিসের হাল্লা? কে ইহারা? ভ্যারা-রা-রা-রা—। ও, হোলির দল! সকলের মাথায় ফাগ, জামা-কাপড়ে রঙ, মুখের বাহারে ভাল লাল রঙ জোটে নাই, সবুজ হলুদ বেগুনী যে যাহা পাইয়াছে মাখিয়াছে, অনেকের মুখে তেল-কালি মাখানো, খচমচ করিয়া একটা বাজনা বাজিতেছে, সঙ্গে গোটা কয়েক ঢোলও আছে, দুই হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে হোলিতে

মাতিয়াছে সব। ছ্যারা-রা-রা-রা—। শঙ্কর একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আবার তাহার মনে হইল, কে ইহারা? ইহারাই কি তাহার স্বদেশবাসী? ইহাদের সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল কি আছে? এই ইহাদের উৎসব? এভাবে উৎসব করিবার কল্পনাও সে কি করিতে পারে? সভ্যতা ভব্যতা, শ্লীলতা শোভনতা, মানসিক যে সব উৎকর্ষকে আয়ত্ত করিবার জন্য সে এতদিন সাধনা করিয়াছে, এই জনতা কি তাহার মূর্ত প্রতিবাদ নয়? কিছুকাল পূর্বে "ভারতীয় সংস্কৃতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহার মনে যে গর্ব হইয়াছিল, তাহা সহসা যেন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ইহাই কি ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ? বসন্তোৎসবের সহিত যে মদনিকা-মালবিকা, আবীর-কুঙ্কুম, ঝারি-পিচকারি, যে রঙ ও রসের মধুর ছবি তাহার কল্পলোকে রঙিন হইয়া আছে, এই উন্মত্ত অসভ্য দেহসর্বস্ব জনতার মধ্যে তাহার কিছুমাত্র আভাস যে নাই। ইহারা কি সত্যই ভারতীয়? সত্যই তাহার আপন লোক? ইহাদের উদ্ধার করিবার জন্যই কি সে জীবন পণ করিয়াছে? ইহাদের এই মূঢ় বর্বরদের উদ্ধার করিবার সত্যই কি উপায় আছে কোন? নির্বাক বিস্ময়ে নূতন দৃষ্টিতে সে এই জনতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দূরে একটা নারী মূর্তি দেখা গেল। একটু কাছে আসিতেই দলের মধ্যে একজন আগাইয়া গিয়া অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীসহকারে মেয়েটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া অশ্লীল একটা ছড়া মুখে মুখে বানাইয়া সুর করিয়া গাহিতে লাগিল। জনতা গর্জন করিয়া উঠিল, হো-হো-হো-হো ছ্যারা-রা-রা-রা—। খচমচ খচমচ বাজনা উদ্দাম হইয়া উঠিল। মেয়েটা লজ্জায় মরিয়া গেল না, সরিয়া গেল না। ছদ্ম রোষভরে সে বরং আগাইয়া আসিল এবং রাস্তা হইতে এক আঁজলা ধুলা তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। শঙ্কর হঠাৎ চিনিতে পারিল। মেয়েটা অপর কেহ নয়, ফুলশরিয়া। তাহাকে দেখিয়া যে লোকটা গান ধরিয়াছিল, সে চানাচুরওয়ালা রামু। রামুর চোখে বোধ হয় ধুলা পড়িয়াছিল। তবু সে চোখমুখ কুঁচকাইয়া হাসিতে হাসিতে আগাইয়া গেল এবং ফুলশরিয়াকে ধরিয়া তাহার সমস্ত মুখখানাতে 'বাঁদুরে রঙ' মাখাইয়া দিল। আর একজন ঢালিয়া দিল পাতলা খানিকটা গোলাপী রঙ। বিস্রস্তকেশা ফুলশরিয়া এক মুঠা ধুলা

ছুঁড়িয়া মারিল। সর্বাঙ্গ তাহার রঙে ভিজাইয়া দিল 'ছোঁড়াপুতারা'! খচমচ খচমচ করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। হো-হো-হো-হো—হ্যারা-রা-রা-রা—উন্নত জনতা উদ্বাহু হইয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল। সহসা তাহারা শঙ্করকে দেখিতে পাইল এবং থামিয়া গেল। হঠাৎ ভিড়ের ভিতর হইতে ঈষৎ টলিতে টলিতে নটবর ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, আসুন, আজকের দিনে একটু ফাগ নিন। অমন টিপ-টপ হয়ে থাকা মানায় না আজকের দিনে।

দিন

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও কপালটা না বাড়াইয়া দিয়া সে পারিল না। নটবর তাহার কপালে ফাগ লাগাইয়া দিলেন।

সেদিন আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছি আমি।

কেন, কিছু দরকার ছিল ?

ছিল বইকি। হরিয়াটার নামে দারোগা সাহেব বি.এল. কেস চালাতে চান। এ গ্রাম থেকে একটি সাক্ষী যাতে না জোটে, তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।

হরিয়া এবং অন্যান্য অনেকের নামে পুনরায় থানায় নালিশ হইয়াছে—এ কথা তিনি হরিয়ার মুখে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান না করিয়া শঙ্করকে এ বিষয়ে কিছু বলাটা তাঁহার অনুচিত বোধ হইল। কেবল বলিলেন, কথা যখন দিয়েছি, তখন ও-ব্যাটাকে বাঁচাতেই হবে। আপনাকে সাহায্য করতে হবে একটু। ওরে হরিয়া!

ভিড়ের ভিতর হইতে রঙ-মাখা হরিয়া কুণ্ঠিতমুখে বাহির হইয়া আসিল।

কাল যাবি বাবুর বাড়িতে, গিয়ে একবার মনে করিয়ে দিবি। উনি পাঁচ কাজের মানুষ।

আচ্ছা, চলি তবে এখন আমরা। হৈ-হৈ করা যাক আজকের দিনটা—বছরে একটি দিন বই তো নয়।

দল আগাইয়া গেল। শঙ্কর দেখিল, দলের ভিতর শুধু হরিয়া নয়, কাঙ্গু,

ফকিরা, কপূর্রা, মধু, বেচু—সকলেই রহিয়াছে। রঙে নাহিয়া ফুলশরিয়া একটু দূরে আগে আগে চলিতেছিল। শঙ্কর তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

হঠাৎ আর একটা দল আবির্ভূত হইল। ইহাদের ধরনটা অন্যরূপ। একজনকে মড়া সাজাইয়া খাটের উপর শোয়াইয়াছে এবং শোভাযাত্রা করিয়া তাহাকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। শোভাযাত্রার আগে একজন এবং পিছনে একজন গাধার পিঠে চড়িয়া আসিতেছে। সকলে, এমন কি মড়া এবং গাধা দুইটা পর্যন্ত নানা বর্ণে রঞ্জিত। যে মড়া সাজিয়াছে, সে মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে এবং বাকি সকলে জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিতেছে। হোলির দিনে মৃত্যুকেও তাহারা রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে! হাসির হর্‌রা তুলিয়া মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতেছে, রাম নাম সৎ হ্যায়!

ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর উভয়েই রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। তাহাদের কেহ কিন্তু লক্ষ্যই করিল না, নিজেদের আনন্দেই সকলে মশগুল হইয়া রহিয়াছে।

ইহাদের পিছনে আর একটা তৃতীয় দলও দেখা দিল। ইহারা একটু প্রবীণ গোছের, পক্ককেশ বৃদ্ধও আছে। সকলেই ফাগ-মাখা, সকলেরই গায়ে রঙ। ঢোল এবং খঞ্জনি বাজাইয়া সমস্বরে গান গাহিতেছে—

সীতারাম সীতারাম, জয় জয় সীতারামকি—

রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম জয় জয় রাধেশ্যামকি—

গাহিতেছে ও নাচিতেছে। দুই হাত তুলিয়া উদ্দাম নৃত্য। ইহারাও চলিয়া গেল। ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর তখন পথে উঠিল। ফুলশরিয়া আগাইয়া চলিতে লাগিল। শঙ্কর গতিবেগ একটু মন্থর করিয়া দিল। ভাবিল, মেয়েটা আগাইয়া যাক। যে চিন্তাটা কিছুক্ষণ আগে তাহার মনকে আলোড়িত করিতেছিল, তাহাই মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল। আমরা সত্যই কি একজাতের? ফুলশরিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং একমুখ হাসিয়া বলিল, তু হাম সেনিসে ঘিন করইছ, নেই বাবু?

প্রশ্নটা শুনিয়া শঙ্কর বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার মনের কথা মেয়েটা টের পাইল কি করিয়া! উহাদের সম্বন্ধে ঘৃণা, বড় জোর অনুকম্পা ছাড়া অন্য কোন ভাব যে সে পোষণ করে না, তাহা নিজেই সে এতদিন স্পষ্ট করিয়া জানিত না। ইহাদের সহিত সত্যই তো তাহার কোন আন্তরিক যোগ নাই। শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে ব্যবহারে চিন্তায় কর্মে সত্যই সে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের লোক। গায়ের রঙ এবং মুখের ভাষা ছাড়া বিলাতী মিশনরিদের সহিত তাহার যে বিশেষ কোন তফাত নাই, সহসা এই সত্যটার সম্মুখীন হইয়া সে একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। ইহাদের সকলকে বর্বর মনে করিয়াই তো সে ইহাদের উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু ইহারা সত্যই কি বর্বর নয়? হঠাৎ নজরে পড়িল, কুলশরিয়া তাহার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া আছে। মুখময় কালচে সবুজ রঙ, মাঝে মাঝে আবীর লাগিয়াছে, বিস্রস্ত অলকগুচ্ছ কপালের দুই পাশে দুলিতেছে, হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক রকম সাদা, রঙে ভিজিয়া শাড়িটা সর্বাঙ্গে সাঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে। একটা ডাকিনী যেন। এই কি ভারতীয় রমণীর প্রতীক? এই কি শত-করা পঁচানব্বই জনের একজন? চকিতের মধ্যে কয়েকটা মুখ মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। অমিয়া, সুরমা, কুন্তলা, চুনচুন, বেলা, বউদিদি, মিষ্টিদিদি, রিনি, মুক্তো—ইহাদের মধ্যে কে ভারতীয়? সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কস্তুরবাই গান্ধী—ইহাদের মধ্যেই কি ভারতীয় রমণীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে? এইমাত্র যে হররমার গহনা-সমস্যা সে সমাধান করিয়া আসিল, সে-ই কি ভারতীয়? না, এই কুলশরিয়ারা? যমুনিয়ার শীর্ণ শুষ্ক মুখটাও মনে পড়িয়া গেল। ইহারাই তো সংখ্যায় বেশি। ইহাদেরও একটা জীবনযাপন নীতি আছে, কিন্তু আমাদের মানদণ্ড অনুসারে তাহা অসভ্য। সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহাদের সে সব বালাই নাই। ইহারাও চাষ করে, চাকরি করে, ব্যবসা করে, ভিক্ষা করে, চুরি করে, ডাকাতি করে, উপবাস করে, উৎসব করে। কিন্তু বিশেষ একটা কোন সভ্যতার আদর্শে সবাই চলে না। অথচ খুঁজিলে ইহাদের মধ্যে সবই

মিলিবে। অনার্য-আর্য-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সব রকম সভ্যতার উচ্ছিষ্ট আসিয়া ইহাদের মধ্যে জমা হইয়াছে। যেন একটা ডাস্টবিন!

ডাস্টবিনটা সহসা আবার কথা কহিয়া উঠিল, কহ না বাবু, তু হাম লোগি সে নফ্‌রত্‌ করইছ?

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ফুলশরিয়ার কথায় আবার আত্মস্থ হইল। অপ্রস্তুত মুখে ভুল হিন্দীতে আমতা আমতা করিয়া বলিতে হইল, না না, সে কি কথা, তোমাদের ঘৃণা করি না তো! আর কিন্তু সে ফুলশরিয়ার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না, দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। ফুলশরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিছন ফিরিয়া তাকাইলে শঙ্কর দেখিতে পাইত, ফুলশরিয়া তাহার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। তাহার চোখ দুইটা জ্বলিতেছে, যেন বাঘিনীর চোখ!

শঙ্কর কিন্তু ফিরিয়া তাকাইল না। তাহার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল এবং তাহাতে পল্লী-সংস্কার, লোকনাথ ঘোষাল, 'ক্ষত্রিয়', হররমা, অমিয়া, সুরমা, নিজের জীবনের আদর্শ, ভারতের ইতিহাস, ভবিষ্যৎ কর্তব্য—সমস্তই যেন অসংলগ্নভাবে আবর্তিত হইতেছিল। নতমস্তকে দ্রুতবেগে সে হাঁটিতে লাগিল, যেন একটা বিরাট ঝড়ের ভিতর দিয়া চোখ বুজিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে।

৪১

উৎপল নিবিষ্টচিত্তে রেডিও শুনিতেছিল। কি সর্বনাশ, রেঙ্গুন যে যায় যায়! কেনারাম চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন।

নিপুবাবু আর প্রমথবাবু চ'লে গেলেন। কিন্তু—

কেনারাম ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া উৎপল যে আবার কি মূর্তি ধরিবে, তাহা তিনি আন্দাজ করিতে পারিতেছিলেন না।

আবার 'কিন্তু' কি?

উৎপল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

গদাই দত্ত জরিমানা দিতে চাইছে না।

কি বলছে?

বলছে—দেব না, আপনারা যা করতে পারেন করুন।

উৎপল রেডিওর ডায়ালটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি। আপনি এখন যান।

কেনারাম কতকগুলি কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সেগুলি টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, ব্যাঙ্কের হিসেব এটা। আমি আপ-টু-ডেট ক'রে রেখেছি। হাজার দশেক টাকা লোকসান হয়েছে।

ওসব শঙ্করকে দেবেন। আমি তার সঙ্গেই কথাবার্তা কইব।

কেনারাম চলিয়া গেলেন।

উৎপল ক্ষণকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে তাহার অধরে হাসি ফুটিল। রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিয়া সে ভিতরে যাইবার জন্য উঠিল। সুরমার সহিতই পরামর্শটা করা যাক। ছোটখাটো একটা প্রলয় করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির সাহায্য লইলে নেহাত অশোভন হইবে না।

৪২

গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্কর দেখিল, গ্রামে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন লাগিয়াছে। পাটের গুদাম এবং ধানের গোলা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। রাজীব দত্তের বাড়ির চতুর্দিকে ভীড় এবং কোলাহল। দূর হইতে আকাশবিসর্পী লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উৎপল কথাকে কাজে পরিণত করিতে পারিয়াছে তাহা হইলে! রাগে ক্ষোভে দুঃখে তাহার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ যে কাহার উপর, ক্ষোভ ও দুঃখ যে কিসের জন্য, তাহা সে নির্ণয় করিতে পারিল না বলিয়াই সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বেদনায় আরও

টনটন করিতে লাগিল। দুষ্ট শাস্তি পাইয়াছে এবং সে শাস্তির আয়োজন তাহার অভিমত অনুসারেই হইয়াছে, ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছু নাই; সুরমাও ইহাতে খুশি হইবে—এ সব যুক্তি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল। হারিয়া গেলাম, নামিয়া গেলাম, সব নষ্ট হইয়া গেল। যাহা করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা হইল না। সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া চুপে চুপে সে বাড়ি ফিরিল। ফিরিবার পথে বারম্বার তাহার মনে হইতে লাগিল, ছাত্রজীবনে কোথাও আগুন লাগিয়াছে শুনিলে সে-ই সর্বাগ্রে ছুটিত আগুন নিবাইতে, এখন চোরের মত পলাইতেছে। কোন্ মুখ লইয়া সে এখন উহাদের কাছে যাইবে? ছি ছি, কি শোচনীয় অধঃপতন! কিন্তু কেন? কে সে নিজের আদর্শকে ছোট করিতেছে? সনাতন মনুষ্যত্বের আদর্শ ছাড়িয়া কোথায় কিসের লোভে চলিয়াছে সে? নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি দুর্বলতা সমস্ত ভুলিয়া তাহার মন সহসা এক নিষ্কলুষ স্বপ্নরাজ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওই স্বপ্নরাজ্যই তো তাহার লক্ষ্য। অপথে বিপথে কোথায় সে ঘুরিয়া মরিতেছে?

বাড়ি ফিরিতেই খুকী তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বাড়ির সামনেই ফাঁকা মাঠটায় সে দুইটি সমবয়সীর সঙ্গে সঙ্গে ধুলা মাখিয়া খেলা করিতেছিল তাহার ফ্রকে কে খানিকটা রঙ দিয়াছে। শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

বাবা, তুমি কোতা দেতলে?

পলাশপুর।

আমি পলাচপুর যাব।

এরা কে?

ছামিয়া বুদিয়া। কাও।

আধখানা-কামড়ানো একটা কুল সে শঙ্করের মুখে গুঁজিয়া দিল।

মুছাই এতো দুত্তু হয়েতে বাবা, কুল পেলে দিতে বললে দেয় না তাকে ব'কে দিও তো।

আচ্ছা।

বারান্দায় উঠিয়া সে খুকীকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। খুকী ছুটিল মাকে খবর দিতে। বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই শঙ্করের চোখে পড়িল, টেবিলের উপর কয়েক দিনের ডাক জমিয়া রহিয়াছে। উপরের পোস্টকার্ডখানা শ্বশুরের। তুলিয়া পড়িতে লাগিল—আসন্নপ্রসবা অমিয়াকে তিনি লইয়া যাইতে চান। অমিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কাপড় নানা রঙে বিচিত্র এবং সিক্ত।

এমন অসময়ে রঙ দিলে কে?

রঙ সকালে দিয়েছে। আমি এখন আমাদের খ'ড়ো চালে জল ঢালছিলাম। রাজীববাবুর গোলায় আগুন ধরেছে, দেখলে না?

হ্যাঁ, দেখলাম আসতে আসতে।

আহা, বেচারীর সব পুড়ে গেল! কি ক'রে যে লাগল আগুন!

শঙ্কর পোস্টকার্ডেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন দিল না।

একদিনের নাম ক'রে গেলে, এই বুঝি তোমার একদিন?

এ কথারও জবাব না দিয়া শঙ্কর বলিল, তোমার বাবা চিঠি লিখেছেন, দেখেছ?

দেখেছি।

যাচ্ছ কবে?

আমার আবার যাওয়া! আরও তিনজন পোষ্য জুটেছে—দাইয়ের ছেলেমেয়েরা তো আছেই।

আবার কে জুটল?

ঝমরু তার ছেলেদের নিয়ে হাজির হয়েছে এসে। তার গলা দিয়ে আর স্বর বেরোয় না, কেঁপে কেঁপে জ্বর আসছে রোজ। কাল দেখি, খিড়কি দরজার পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে। ছেলে ছুটো পাশে ব'সে আছে চুপ ক'রে। ছুদিন খেতে পায় নি বললে। ডেকে এনে খেতে দিলাম। আর নড়তে চাইছে না।

অমিয়া হাসিল। শঙ্করও হাসিল।

দীনদুঃখীদের প্রতি অমিয়ার একটা স্বাভাবিক করুণা অবশ্য আছে ; কিন্তু কেবল এই জন্যই সে যে বাপের বাড়ি যাইতে চাহিতেছে না, তাহা সত্য নহে। আরও একটা নিগূঢ় কারণ আছে। শঙ্করের পরিবর্তিত মনোভাব সেও টের পাইয়াছিল। মুখে সে কিছু বলে নাই, কোনদিন বলিবেও না, কিন্তু শঙ্করকে ছাড়িয়া এ সময় সে কোথাও যাইবে না।

দুই হাতে দুই মুঠা মটরশুঁটি লইয়া খুকী ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া পাশ কাটাইয়া বাহিরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

দেখেছ মেয়ের কাণ্ড ? রেখে আয় মটরশুটি।—বলিয়া অমিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। খুকী চোখ দুইটি বড় করিয়া নীরবে শঙ্করের পানে চাহিল। ভাবটা, মায়ের ব্যবহারটা দেখ একবার !

শঙ্কর বলিল, দাও, দাও, ছেড়ে দাও।

ছাড়িয়া দিতেই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এমন দস্যি হয়েছে ! ওরা এসে থেকে পর্যন্ত দিনরাত ওদের সঙ্গে আছে। কাল সন্ধ্যেবেলা ওদের কাছে গিয়ে শুয়েছিল পর্যন্ত।

ওরা শুচ্ছে কোথা ?

ভাঁড়ার-ঘরের পাশের গলিটায়।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া শঙ্কর কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইল না। বাহিরের ঘরে লোকের পর লোক আসিতে লাগিল। স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী আসিয়া দুই পাউণ্ড কুইনিন লইয়া গেলেন। বিরিপুরের একজন শিক্ষক আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, লছমন গোয়ালার পুত্রকে ক্লাস প্রমোশন দেওয়া হয় নাই বলিয়া লছমন তাহাকে শাসাইতেছে, মারিবে বলিতেছে। লছমন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বিরিপুরে তাহার প্রতিপত্তিও আছে। শিক্ষক মহাশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইহার ব্যবস্থা না করিলে কার্যে ইস্তফা দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। কাল্লু ফরিদ রহিম কর্পূরা ফকিরার দল এবং তাহাদের পরিবারবর্গ আসিয়া পায়ে উপুড় হইয়া পড়িল, দরোগার কবল হইতে বাঁচাইতে হইবে। কেনারামবাবু তাহাদের নামে থানায় নালিশ করিয়া

আসিয়াছেন। জমিরগঞ্জে উল্টা-মহরমের দিন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। জমিরগঞ্জ মুসলমান-প্রধান স্থান। একজন মৌলভী আসিয়া সমস্ত মুসলমানদের মন হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া তুলিয়াছে। সেখানকার হিন্দু-প্রজাদের মুখপাত্র গুলজার সিং আসিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। প্রতিকারের উপায়ও বলিয়া দিল। শঙ্করবাবু এবং গুলাব সিং আসিয়া যদি 'মদৎ' করেন, তাহা হইলে সে—গুলজার সিং—একাই উহাদের 'বীজ' পর্যন্ত জ্বালাইয়া দিতে পারে। বদমায়েসগুলা একটা কচি বাছুরের গলায় মালা পরাইয়া সেটাকে হিন্দুদের বাড়ির সামনে দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া গিয়া প্রকাশ্য স্থানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। গুলজার সিং আর একটা উপায়ও বলিল। রাজীব দত্ত ওই মুসলমানগুলার মহাজন। তিনিও ইচ্ছা করিলে প্রতিশোধ লইতে পারেন এবং শঙ্করবাবু অনুরোধ করিলে তিনি যে অস্বীকার করিবেন তাহা মনে হয় না। গুলাব সিং ও শঙ্করবাবুর অনুরোধ সে ঠেলিতে পারিবে না। চক্রবর্তী মহাশয় আসিয়া নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারের বিতাড়নবার্তা জানাইয়া গেলেন। প্রসঙ্গত আর একটি কথাও বলিলেন, পাঁচ বছর পুরে গেছে, উৎপল হিসেব চাইছিল। আমি ব্যাঙ্কের হিসেব ঠিক ক'রে রেখেছি। দশটি হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। তুমি বাকি সব ডিপার্টমেণ্টগুলোর হিসেব ঠিক রেখো। উৎপল বাইরে দেখতে ও-রকম হ'লে কি হবে, ভেতরে ভেতরে বেশ স্ট্রিক্ট আছে। খু—ব। চক্রবর্তী মহাশয় চলিয়া যাইবার পর ঝকু আসিল এবং বলিল যে, নিপুবাবুর সহিত তাহার পুত্র রামলালও অন্তর্ধান করিয়াছে। ডিস্ট্রিক্ট হেল্থ অফিসার একজন চৌকিদারকে দিয়া খবর পাঠাইলেন, আশপাশের গ্রামে এই অসময়ে (খুব সম্ভবত হোলির জন্য) কলেরা লাগিয়াছে। পাশের গ্রামেই দশজন মারা গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী আসিয়াছিলেন, তিনি তো কিছুই বলিলেন না, সম্ভবত কোন খবরই রাখেন না। অথচ প্রতি মাসে এই জন্য বেতন পান।

শঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া ছাদে চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় অমিয়াকে

বলিয়া গেল, কেহ যদি খুঁজিতে আসে, তাহাকে যেন বলিয়া দেওয়া হয় যে, সে বাড়ি নাই। রাত্রি দশটার সময় অমিয়া যখন তাহাকে খাইবার জন্ম ডাকিতে গেল তখনও নিস্তব্ধ হইয়াই বসিয়া ছিল।

চল, খাবে চল।

চল।

অমন চুপ ক'রে মন-মরা হয়ে ব'সে আছ যে! কি হয়েছে?

কিছু না।

নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বলবে না?

অমিয়াও পাশে বসিয়া পড়িল।

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর বলিল, ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। টাকাটা পুরিয়ে দিতে না পারলে উৎপলের কাছে মান থাকবে না।

অত টাকা লোকসান হ'ল কি ক'রে?

সবাই ধার নিয়েছে আর শোধ দেয় নি, মানে—দিতে পারে নি। আমি ভাবছি—

বলিতে গিয়া শঙ্কর হঠাৎ থামিয়া গেল।

কি ভাবছ?

একটা কথা তুমি জান—বাবা উইল ক'রে তাঁর সমস্ত টাকা আর সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে গেছেন?

জানি তো।

কি ক'রে জানলে?

তাঁর উইল তো ওই কাঠের আলমারির দেরাজে রয়েছে, দাদা সেবার এসে বার করলে যে। কেন, তাতে কি হয়েছে?

অমিয়া জানিত! জানিয়াও তাহাকে এতদিন কিছু বলে নাই! অমিয়া-চরিত্রের একটা অনাবিষ্কৃত অংশ সহসা যেন তাহার চোখে পড়িয়া গেল।

কি ভাবছ, বললে না?

ভাবছি— না থাক, তোমার টাকাগুলো নষ্ট ক'রে ফেলা ঠিক হবে না।

আমার টাকা তোমার টাকা ব'লে আলাদা কিছু আছে নাকি? কালই তুমি টাকা তুলে ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দাও। তোমার মানের চেয়ে তো আর টাকা বড় নয়।

বাবা যে কত টাকা রেখে গেছেন, তাও তো ঠিক জানি না। ও-টাকাতে যদি না কুলোয়—

যদি না কুলোয় তা হ'লে আমার গয়না বিক্রি ক'রে দাও। ওর জন্যে আর ভাবনা কি? চল, খাবে চল। রাত হয়েছে।

শ্রদ্ধায় শঙ্করের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝায়, অমিয়া তো তাহা নয়, তবু সে এত মহৎ! এত সহজে এত অনাড়ম্বরে এতগুলা টাকার অধিকার এমন অবলীলাক্রমে ছাড়িয়া দিল! অনিবার্যভাবে একটা কথা তাহার মনে পড়িল। অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে সুরমা কি ঠিক এই রকম পারিত?

৪৩

হাসি অত্যন্ত বিরক্ত চিত্তে বসিয়া জবাবদিহি লিখিতেছিল।

গত পরীক্ষায় এত কম সংখ্যক ছাত্রী পাস করিয়াছে কেন—স্কুল-কমিটী জানিতে চাহিয়াছেন। হাসি সত্য কথাই লিখিতেছিল। লিখিতেছিল, এই অল্প কয়েকজন ছাত্রীই যে পাস করিতে পারিয়াছে, এজন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষের ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। পিতামাতারা যদি নিজেদের কন্যাদের লেখাপড়া বিষয়ে অবহিত না হন, বাড়িতে যদি তাহারা পড়াশোনা না করে, তাহা হইলে কেবলমাত্র সাজিয়া গুজিয়া স্কুলে আসিলেই তাহারা কোনকালে পাস করিতে পারিবে না। স্কুলেও তাহারা নিয়মিত আসে না। যখন আসে, তখনও পড়ায় মন দেয় না। অমনোযোগী হইবার জন্য সামান্য শাস্তি দিলেও কান্নাকাটি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসে যে, কিছু বলিতে ভয় করে। অনেক অভিভাবক এবং স্কুলের কর্তৃপক্ষ শাস্তি দেওয়া পছন্দ করেন না। এ

অবস্থায় বেশি মেয়ে পাস করিলেই আমি বিস্মিত হইতাম। লেখাপড়ায় মেয়েদের এবং তাহার অভিভাবকদের যদি আন্তরিক নিষ্ঠা না থাকে—

এ পর্যন্ত লিখিয়া সে থামিয়া গেল। বারান্দায় কাহার যেন পদশব্দ পাওয়া যাইতেছে। বিছানায় বসিয়া হেঁট হইয়া লিখিতেছিল সে, কলম ছাড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিল।

দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল।

কে?

কোন্ উত্তর নাই।

কে?

খোলই না।

গলার স্বরটা যেন চেনা মনে হইল; কিন্তু কাহার, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া লইল এবং আগাইয়া গিয়া খিলটা খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিল একজন লাল-পাগড়ি কন্‌স্টেব্‌ল।

চিনতে পারছ?

লোকটার সামনের দাঁত একটাও নাই। এক মুখ গোঁফদাড়ি। তবু চোখের দিকে চাহিয়া হাসি চিন্ময়কে চিনিতে পারিল এবং বিস্মিত হইয়া গেল।

ঠাকুরপো।

ওষ্ঠে তর্জনী স্থাপন করিয়া চিন্ময় বলিল, চুপ, আস্তে। জেল থেকে পালিয়ে এসেছি।

পুলিসের পোশাক কেন?

ছদ্মবেশ।

হাসি আরও খানিকক্ষণ চিন্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি যে এখানে আছি, সে খবর কে দিলে তোমাকে?

বেলা মল্লিক।

সে আবার কে?

তুমি তাকে চেন না, আলাপ হবে, ভয় নেই।

চিন্ময় হাসিল। হাসিতেই তাহার মুখের বীভৎসতা আরও প্রকট হইয়া পড়িল। সামনের দাঁত একটাও নাই, ঠোঁটগুলা কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো—সমভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত হয় না।

তোমার দাঁত কি হ'ল ?

মেরে ভেঙে দিয়েছে। লোহার নাল বসানো বুটের লাথি—। বলিয়া সে আবার হাসিল।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হাসি চাহিয়া রহিল।

চিন্ময় বলিল, গোঁফ-দাড়ি দিয়েও এ হাসি ঢাকা যাবে না। ধরা পড়তে হবেই। তার আগে একটা দল গ'ড়ে দিয়ে যেতে চাই।

কিসের দল ?

সব বলছি।

৪৪

অর্ধনিমীলিত লোচনে শঙ্করের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রাজীবলোচনের অন্তরে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জাগিতে লাগিল। ছোঁড়ার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিলে কেমন হয়! পুণ্য যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলে কি! পিতার সঞ্চিত অর্থ হইতে নির্বিকারভাবে দশ হাজার টাকা তুলিয়া ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ করিবে! দেবতা, না, পাগল—কি এ!

বক্তব্য শেষ করিয়া শঙ্কর কুণ্ঠিতমুখে বলিল, আপনার কাছে অবশ্য বাবার কত টাকা জমা আছে, তা আমি জানি না ঠিক। কিন্তু দশ হাজার টাকা আমার চাই।

রাজীব অর্ধনিমীলিত লোচনেই খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চোয়ালটা বার দুই নড়িল।

আমার কাছে কত টাকা আছে, তা তোমার না-জানবার কথা নয়। টাকা নিয়ে তোমার বাবাকে আমি রসিদ দিয়েছি।

সে কোথায় আছে আমি খুঁজে দেখি নি।

রাজীবলোচনের ভাবলেশহীন মুখে প্রচ্ছন্ন হাসির একটা আভাস যেন ফুটিয়া উঠিল।

আমার কাছে টাকা আছে, তা হ'লে জানলে কি ক'রে?

ছেলেবেলা থেকেই জানি। বাবা আর তো কোথাও টাকা রাখতেন না।

এই বুদ্ধি লইয়া ছোকরা উৎপলের জমিদারি চালাইতেছে নাকি? মনে মনে মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, ছেলেবেলা থেকেই জানি! আরে বাপু, তার প্রমাণ কি? আমি যদি এখন অস্বীকার করি, একটি আধলা যদি না দিই? গাড়োল কোথাকার! তাঁহার চোয়াল আরও বার দুই নড়িল, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, এ বছরের সুদটা এখনও হিসেব করি নি। গত বছর পর্যন্ত কুড়ি হাজার টাকা ছিল। এ বছরের সুদ নিয়ে বেশি হবে আরও কিছু।

তা হ'লে দশ হাজার টাকা দিন আমাকে।

হঠাৎ রাজীবলোচন ভাল করিয়া চোখ খুলিয়া তাকাইলেন এবং তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টি শঙ্করের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, একটি কপর্দক দেব না।

দেবেন না! কেন?

তোমার বাবা আমার বন্ধু-লোক ছিলেন। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ এমনভাবে বরবাদ করতে দেব না আমি। বিশ্বাস ক'রে তিনি আমার হাতে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন।

শঙ্কর ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

একটু সসঙ্কোচে বলিল, কিন্তু আমার দরকার যে।

ও দরকার কোনও দরকারই নয়। ও টাকা কেনারাম দিক—ওই তো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল, ওই খেয়েছে টাকাটা, ওকে চেপে ধর।

আমার হুকুমেই টাকাটা খরচ হয়েছে, আইনত আমিই দায়ী।

আমার কাছ থেকে কিছু পাবে না।

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, এ কি রকম কথা বলছেন আপনি! আমার টাকা আমি পাব না!

টাকা তোমার নয়, তোমার স্ত্রীর। উইলের কপি আমার কাছেও দিয়ে গেছে অম্বিক।

বেশ, তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসছি আমি।

চিঠি নিয়ে এলেও হবে না, সাক্‌সেশন সার্টিফিকেট চাই, করালীচরণ বক্‌শিরও ফ্যাচাং আছে একটা।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রাজীবলোচনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এ সব সত্ত্বেও দিতাম যদি বুঝতাম, টাকাটা ন্যায্য খরচ হবে। তা যখন বুঝছি না, তখন বাগড়া দেব। বিশেষত তোমার কাছে যখন কোন প্রমাণ নেই যে, টাকাটা আমার কাছে আছে তখন তো কিছুই করতে পার না তুমি। আগে রসিদ বার কর।

রাজীবলোচনের চক্ষু দুইটি পুনরায় অর্ধনিমীলিত হইল। শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার কানের পাশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পিতৃবন্ধুকে কোন অসম্মানজনক কথা সে বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ রাজীবলোচন পুনরায় চোখ খুলিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

অতিশয় নির্বোধ তোমরা। অগ্রপশ্চাৎ কিছু চিন্তা কর না, হটাম্‌ ক'রে একটা কিছু ক'রে বসাটাই স্বভাব তোমাদের। গদাটাই যে অতি নচ্ছার তা আমি জানি, ওকে শাসন করাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ওকে ধ'রে চড়টা চাপড়টা দিলে পারতে, আমার গোলায় আগুন দিতে গেলে কেন বাপু? আমার কি ক্ষতি হ'ল তাতে, লাভই হ'ল বরং, ইন্‌সিওর করা ছিল সব। মরতে ম'ল কতকগুলো গরিব। ঠিক পাশের একটা ঘরে গরিব চাষীদের পাটের বাণ্ডিলগুলো ছিল, কোথাও রাখতে জায়গা পায় না, রেখে গিয়েছিল ওখানে, সেগুলো পুড়ে গিয়ে তাদেরই লোকসান হ'ল। আমার আর কি হ'ল?

আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না।

শঙ্কর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, আর বসিয়া থাকিতে পারিল না।

আচ্ছা, আমি চললাম এখন তা হ'লে।

টাকার জন্য চিন্তা ক'রো না, দরকারের সময় ঠিক পাবে, কিন্তু বরবাদ করতে দেব না আমি।

শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

রাজীব দত্ত একটু মুচকি হাসিলেন।

অন্ধকারে শঙ্কর গ্রামের পথে পথে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অবিলম্বে দশ হাজার টাকা কোথায় কি উপায়ে পাওয়া যায়? রাজীব দত্ত সত্যই টাকাটা দিবে না কি…নিপুদা গেলেন কোথায়…কলেরা ক্রমশ বাড়িতেছে…হরিয়া কারু ফরিদকে আবার উদ্ধার করা সম্ভব কি…সুরমা আর তো তাহার কোন খোঁজ করিল না…ডাকিতে না পাঠাইলে আর সে যাইবে না…নানা অসংলগ্ন চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ভিড় করিতেছিল।

অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন অমিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহার পদশব্দ শুনিবামাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

ছি ছি, কত রাত করলে তুমি!

বেশি রাত তো হয় নি, সাড়ে দশটা।

ও।

অমিয়ার চোখে ঘুম ছিল, তাই সে শঙ্করের চিন্তাচ্ছন্ন মুখটা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল না। তাড়াতাড়ি আহারাদি চুকাইয়া শুইয়া পড়িল। শঙ্করও শুইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিল না। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়াও যখন কিছু হইল না, তখন সে উঠিয়া বসিল। অমিয়া খুকী উভয়েই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর নিঃশব্দচরণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল পাশের ঘরেই আলমারিটা আছে। বাবার বিরাট আলমারিটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল সে। বহুকাল এটাকে খোলা হয় নাই। ইহার চা

যে কোন্‌টা, তাহার মনে নাই। চাবির গোছাটা আনিয়া একটার পর একটা লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। রসিদটা খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

চিঠির বাণ্ডিল খাতা ডায়েরি বই ফাইলের স্তূপের ভিতর বসিয়া শঙ্কর রসিদ খুঁজিতেছিল। নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া সহসা শব্দ হইল।

রাম নাম সৎ হ্যায়—

সে চমকাইয়া উঠিল। কে মারা গেল? ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, ভোর হইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া ভোরের আলো ঘরে ঢুকিতেছে। সমস্ত রাত খুঁজিয়াও কোন রসিদ বা পাস-বই পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল সে। কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিতেই চোখে পড়িল, লেটার-বক্সে একখানা চিঠি রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখিল, খামের উপর তাহারই নাম লেখা। কাহার চিঠি? খুলিয়া পড়িল—

শ্রীচরণেষু,

আমি আর থাকতে পারলাম না, চললাম। কেন বা কোথায়, তা বলব না। বৃহত্তর যে আহ্বানের অপেক্ষা করছিলাম, তা এসেছে। আমাকে খুঁজে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। 'তুমি' আপনার কাছে রইল। ওর ভার আপনাকে দিয়ে গেলাম। কোন্‌ অধিকারে যে এত বড় ভার স্বচ্ছন্দে আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি, তা জানি না। মনে হচ্ছে কিন্তু, অধিকার আছে। কোনও সঙ্কোচ হচ্ছে না। আর একটা কথা। যে দশ হাজার টাকার জন্যে আপনার বন্ধুর জেল হয়েছিল, তা আমার কাছেই ছিল এতদিন। টাকাটা আমাকেই এনে দিয়েছিলেন তিনি, আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। সে টাকা আমার ট্রাঙ্কের তলায় আছে। টাকাটা আপনিই নিন, আমি আর কি করব ও নিয়ে! এতবড় গোপনীয় চিঠিটা আপনার খোলা লেটার-বক্সে রেখে যেতে দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কি? একটা ভরসার কথা, খোলা জায়গাতেই গোপনীয় জিনিস সবচেয়ে নিরাপদে থাকে। সন্দেহ জাগে না কারও। আশা করি, আমার জন্যে বিপদে পড়বেন না। চিঠিটা প'ড়েই ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। আপনাকে একটা প্রণাম ক'রে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম

না, দূর থেকেই তাই প্রণাম জানাচ্ছি। আমার সম্বন্ধে যাহোক একটা বানিয়ে প্রচার ক'রে দেবেন। যদি কোনদিন ফিরি, আবার দেখা হবে আর না যদি ফিরি, তা হ'লে এই শেষ। ইতি

প্রণতা হাসি

শঙ্কর নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। হাসি কোথায় গেল? কেন গেল? তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল সে। হাসির কোয়ার্টার্সে গিয়া দেখিল, হাসি নাই। চাকরটা কিছুই বলিতে পারিল না। 'তুমি' উঠিয়াছে এবং গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ছোট মৃন্ময় যেন।

মা কোথায়?

জানি না।

আমাদের বাড়ি যাবে? চল।

'তুমি' গম্ভীরভাবে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইল।

তাহার পর বলিল, চলুন।

কোন আপত্তি করিল না, জামাটি গায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়ের সম্বন্ধেও কোন কৌতূহল প্রকাশ করিল না। শঙ্কর স্কুলের চাকরটাকে ডাকিয়া যখন তাহার মাথায় ট্রাঙ্কটা তুলিয়া দিল, তখনও সে কোন প্রশ্ন করিল না।

চল।

শঙ্করের পিছু পিছু সে চলিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল, তোমার মা একটা কাজে গেছেন। কিছুদিন পরে আবার আসবেন। ততদিন আমাদের কাছে থাক।

আচ্ছা।

হাসির ব্যবহারে শঙ্কর অবাক হইয়া গিয়াছিল। আরও অবাক হইয়া গেল 'তুমি'র ব্যবহারে। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'তুমি' যেন সব জানে, কেবল আত্মসম্মানে বাধিতেছে বলিয়া কিছু বলিতেছে না।

শঙ্কর অমিয়াকে সত্য কথাটা বলিল না। বলিল, হাসি স্কুলের কাজে

কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছে। যতদিন না ফেরে, ততদিন 'তুমি' তাহার নিকট থাকিবে।

অমিয়া বলিল, বেশ তো।

সবচেয়ে খুশি হইয়া উঠিল খুকী। সে তাড়াতাড়ি 'তুমি'র হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে নিজের ঐশ্বর্য-সম্ভার দেখাইতে বসিল।

এইতে হাতি, এইতে খুকু, এইতে মোতল—

শঙ্কর পুনরায় আসিয়া আলমারির সম্মুখে বসিয়া ছিল। খাতাপত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতে হইবে। তুলিয়া রাখিতে রাখিতে হাসির কথাই ভাবিতে লাগিল। বৃহত্তর আহ্বান কি হইতে পারে? হাসিকে সে কোনদিনই বুঝিতে পারে নাই। তখনই আবার মনে হইল, কাহাকেই বা আমরা বুঝি? যাহাকে বুঝি বলিয়া মনে করি, তাহাকে হয়তো ভুল বুঝি। চকিতে স্থরমার কথাটা মনে পড়িল। স্থরমার কথাই ভাবিতে লাগিল সে। কিছুক্ষণ পরে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। রসিদ খুঁজিবার আগ্রহ তাহার তো আর নাই। হাসির অপ্রত্যাশিত চিঠিটা পাইয়া সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। যদিও এখন ট্রাঙ্ক খুলিয়া—সহসা মনে হইল, ট্রাঙ্কের চাবি তো আমার কাছে নাই! বাসায় নিশ্চয়ই আছে কোথাও। পরে গিয়া লইয়া আসিলেই হইবে। টাকাটা আছে নিশ্চয়। হাসি শুধু শুধু মিথ্যা কথা লিখিবে কেন? তখনই আবার মনে হইল, ও-টাকা এমন ভাবে খরচ করাটা কি ঠিক হইবে? দেখা যাক।

চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল।

· রাম নাম সৎ হ্যায়, রাম নাম সৎ হ্যায়, রাম নাম সৎ হ্যায়—

আবার? শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া দেখিল, মুশাই আসিয়াছে। তাহার মুখে শুনিল, গ্রামে খুব কলেরা শুরু হইয়া গিয়াছে।

৪৫

সাইকেলে চড়িয়া শঙ্কর গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছিল। এমন অসময়ে যে এত কলেরা হইতে পারে, তাহা তাহার স্যানিটেশন বিভাগ কল্পনা করে নাই। চৌধুরী বলিলেন যে, প্রথমটা যদিও তিনি খবর পান নাই, এখন কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কূপে কূপে পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট দেওয়া হইয়াছে, গরিবদের পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট বিতরিত হইয়াছে, নূতন রোগী হইলেই স্থানীয় ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হইতেছে, কিছু কিছু ভ্যাক্সিনও দেওয়া হইয়াছে; তথাপি কেন যে ফলোদয় হইতেছে না, সে জবাবদিহি করিতে তিনি অপারগ। তিনি যথাকর্তব্য যথাসাধ্যই তো করিয়া চলিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শঙ্কর হতাশ হইয়া পড়িল। বহু লোক মরিতেছে। একটা ডাক-বাংলোয় গভর্মেণ্ট-নিয়োজিত একজন হেল্‌থ অফিসারের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। ভদ্রলোক খাকী হাফ-প্যাণ্ট হাফ-শার্ট পরিয়া মাথায় শোলার হ্যাট চড়াইয়া শঙ্করের মতই সাইকেল-যোগে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কলেরা কেন থামিতেছে না, জিজ্ঞাসা করায় তিনি ফস করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া সক্ষোভে উত্তর দিলেন, কি ক'রে বলব বলুন? কলেরা থামানো তো আমার কাজ নয়, আমার কাজ ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করা। তাই ক'রে যাচ্ছি প্রাণপণে। কলেরা থামল কি থামল না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর নেই আমার।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ইচ্ছেও নেই নাকি? দিন একটা আমাকে—আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।

এই যে আসুন। ইচ্ছে থাকবে না কেন মশাই, ইচ্ছে খুব আছে, উপায়ও জানা আছে, কিন্তু কিছু করা যাবে না।

করা যাবে না কেন?

বলি তা হ'লে শুনুন। কলেরার বিষ শুধু যে জল দিয়েই সংক্রামিত হয় তা নয়, যে কোন খাদ্যদ্রব্য দিয়েই তা হয়। কিন্তু আমাদের যত আক্রোশ কেবল জলের ওপর, অন্য সব বিষয়ে আমরা উদাসীন। এই ময়রানীগুলো

দুধ বেচছে, এই যে সবাই পেয়ারা চিবুচ্ছে, এদের ওপর আমাদের কোন কন্‌ট্রোল নেই। আমরা শুধু মৌখিক উপদেশ দিয়েই খালাস—সব ফুটাকে খাও। আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাতও করে না।

না করবার কারণটা কি?

আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে, ভেবেছেন? নট এ সিংগ্‌ল সোল। খাকী হ্যাট-কোট দেখলেই ভাবে পুলিসজাতীয় কেউ হবে বোধ হয় একজন—আমাদের হ্যারাস করতে এসেছে। আর আমরা পুলিসের হেল্‌প নিয়ে কাজও করি যে। সেইজন্যে লোকে আমাদের ভয় করে, বিশ্বাস করে না। ওদের যত বিশ্বাস বৈদ্য কবরেজ গোঁসাই এই সবের উপর। কুয়োয় পার্মাঙ্গানেট পর্যন্ত দিতে দেয় না মশাই। একটা কুয়োয় পার্মাঙ্গানেট দিয়ে মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি। ভাগ্যে বাইক ছিল, চোঁ-চোঁ দৌড়ে তবে প্রাণটা বাঁচে। আর একটু হ'লেই পশ্চিমে গোয়ালার লাঠিতে মাথাটি ফাটত আমার সেদিন। ডাক্তারবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সবিস্তারে গল্পটি বলিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এ অবিশ্বাসের হেতু কি?

তা জানি না মশাই, তবে এইটে বুঝেছি যে, ফরসা-জামা-কাপড়-ওলা সো-কল্‌ড ভদ্রলোক মাত্রকেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে। ফরসা কাপড় জামার ওপর ওদের ঘোর সন্দেহ। ওদের নিজেদের মধ্যেও কেউ যদি বেশ ফরসা কাপড় জামা প'রে একটু ফিটফাট হয়, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ধ'রে নেয় যে, তার চরিত্র খারাপ হয়েছে। মেয়েরা তো এই ভয়ে ফরসা কাপড় পরতেই চায় না। আর সত্যিই দেখা যায় যে, যারা বেশি ফিটফাট, তাদের চরিত্র খারাপ। আমাদের সম্বন্ধেও ওদের ধারণা যে, আমরা ভাল করবার ছুতোয় এসে ঠিক পকেট মেরে নিয়ে যাব।

একটু হাসিয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, আর পকেট মারিও আমরা। নেহাৎ মিথ্যে কথাও নয়।

পকেট মারেন?

মারি না? আজই তো এক পাউণ্ড পার্মাঙ্গানেট, এক পাউণ্ড কুইনিন

বেচলুম। কিন্তু খরচ দেখিয়ে দিলুম। শুধু যে বেচি তা নয়, দানও করি। বন্ধু-বান্ধবদের স্পিরিট, টিঞ্চার আইয়োডিন, কুইনিন তো হরদম দিচ্ছি। কি করি, চাইলে 'না' বলতে পারি না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

না বেচে কি করি বলুন, আমাদের ওপর তো জাস্টিস হয় না। দশ বছরের ওপর চাকরি করছি, এখনও পর্যন্ত একটা ডিস্‌পেন্সারি পেলাম না। অথচ আমার চেয়ে কত জুনিয়র ঢুকল আর পটাপট ডিস্‌পেন্সারি পেলে। আমার অপরাধ আমি বাঙালী আর হিন্দু। এই কংগ্রেস মিনিস্ট্রি আরও ডোবালে আমাদের মশাই। এতগুলো চোর যে কি ক'রে একসঙ্গে জুটল এত অল্প সময়ের মধ্যে! এর চেয়ে সাহেব মনিব ঢের ভাল ছিল মশাই, সাহেব জাত গুণের কদর বোঝে।

শঙ্কর চুপ করিয়াই রহিল।

ডাক্তারবাবুও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, লাক্ লাক্, সবই লাক্ মশাই। যখন আই.এস-সি. পাস করলুম, বাবা বললেন—যা, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়্‌গে যা। তখন কেমন একটা ভুল ধারণা ছিল, ডাক্তারিটা নোব্‌ল প্রফেশন, ডাক্তারই হতে হবে। মেডিকেল কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, কোথাও ঢুকতে না পেয়ে শেষে দুর্গা ব'লে কটক মেডিকেল স্কুলেই ঢুকলাম, তা-ও অনেক ঘুস-ঘাস দিয়ে। বার তিনেক ফেলও করলাম। শেষে অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে বেরিয়ে প্র্যাক্‌টিস করতে বসলাম দিনকতক। কিছু হ'ল না। আমাকে ডাকবে কে! ঢুকলাম শেষে চাকরিতে। বৃহৎ পরিবার ঘাড়ে, কি করি বলুন? কিন্তু চাকরির তো এই দশা—

বৃহৎ পরিবার বুঝি আপনার?

রাবণের গুষ্টি। আর সব এই শম্মার ঘাড়ে। গঙ্গাতে দিলে না মশাই, অনেক কষ্টে যেই দুটি একটি পাতা ছাড়ছি, অমনি কেউ না কেউ এসে মুড়িয়ে খেয়ে যাচ্ছে। আজ ভাগনে, কাল ভাইপো, পরশু বেয়াই, তরশু

বউ—একটা না একটা লেগেই আছে। শুধু মাইনেটি সম্বল ক'রে কি চলে মশাই? চলে না।

আপনাদের উপরি কিছু নেই বুঝি?

ওই যা অ্যালাউন্স পাই, তাও যৎসামান্য। আর এই চুরি-চামারি ক'রে যা দু-চার টাকা হয়। কলেরা থামবে কি ক'রে? আমরা কেউ কি উইলিং ওয়ার্কার? কেউ না। উইলিং হব কি ক'রে, বলুন? আমাদের হাতে ক্ষমতাও দেয় না, পয়সাও দেয় না, আমাদের ওপর সুবিচারও হয় না। আমাদের কেবল I have the honour to be sir, your most odedient servant পর্যন্ত দৌড়। তাই ক'রে যাচ্ছি। কেউ প্রাণ দিয়ে কাজ করে না। সব চোর। আমাদের কাজ হচ্ছে গ্রামের গুরুদের কাছে কুইনিন, পটাশিয়ম পার্মাঙ্গানেট দেওয়া। উদ্দেশ্য—তারা গ্রামের গরিবদের বিনা পয়সায় বিতরণ করবে। কেউ তা করে, ভেবেছেন? সব বিক্রি করে। আর এই যে আপনারা সব ছ টাকা আট টাকা মাইনে দিয়ে গুরু নিযুক্ত করেছেন, এরা কেউ কি পড়ায় ভেবেছেন ভাল ক'রে? পাজির পা-ঝাড়া ব্যাটারা। কারও বারান্দায়, কারও আটচালায়, থিয়োরেটিক্যালি এক-একটা পাঠশালা খুলে রেখেছে খালি, কতকগুলো ছোঁড়া সেখানে ব'সে গুলতানি করে মাঝে মাঝে, পড়াশোনা কিচ্ছু হয় না। অনেক গুরু আবার অন্য জায়গায় চাকরিও করেন। অথচ কাগজে কলমে দেখুন এত টাকা spent for education! এডুকেশন তো হচ্ছে কচু!

বলেন কি!

শুধু কচু নয়, কচু-পোড়া! এ দেশের উদ্ধার নেই মশাই। এই আপনারাই যে পল্লীসংস্কারের জন্যে এত টাকা ঢালছেন, তা কি হচ্ছে জানেন? আমার মতে দেশের পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে কেবল। অধিকাংশ টাকাই পাঁচজনে লুটে-পুটে খেয়ে ফেলছে, দেশ কিছুই পাচ্ছে না। কাজ করছে মিশনারিরা, দেখে আসুন গিয়ে।

কিন্তু আমাদের উপায় কি?

উপায়? উপায় ভগবান।

বলিয়া তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ওই যে আপনাদের চৌধুরী, যাকে আপনারা স্যানিটেশন বিভাগের কর্তা ক'রে রেখেছেন, একের নম্বর চোর ব্যাটা। চরণ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার মাঝে মাঝে কুইনিন নেয় আমার কাছে, হাফ প্রাইসে দিই তাকে আমি, এবারও তার জন্যে রেখেছিলাম কিছু, কিন্তু এবার সে নিলে না, বললে, চৌধুরীর কাছে পাঁচ পাউণ্ড পেয়েছে ওয়ান ফোর্থ দামে। চৌধুরী পাঁচ পাউণ্ড কুইনিন পায় কোথা থেকে মশাই?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল। কয়েকদিন আগেই চৌধুরী তাহার নিকট হইতে দুই পাউণ্ড কুইনিন লইয়া গিয়াছে।

ডাক-বাংলার চৌকিদারটা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহারই আত্মীয় একটি শিশুর কলেরা হইয়াছে। বলিল, চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। স্থানীয় কূপে 'দাবাই' দেওয়া হইয়াছে, ছেলেটিকে 'জক্‌সন'ও দেওয়া হইয়াছিল, একজন ডাক্তারবাবু আসিয়া 'পানি'ও চড়াইয়া গিয়াছেন, তবু ছেলেটির অবস্থা শোচনীয়। সাহেব যদি মেহেরবানি করিয়া একবার—

তোমার বাড়ি কতদূর?

নগিচে হুজুর।

যাবেন নাকি; চলুন না দেখে আসা যাক, কাছেই বলছে।

চলুন।

যাইতে যাইতে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, অ্যান্টি-কলেরা ভ্যাক্‌সিনের কি অভিজ্ঞতা আপনার?

সময়মত হিসেবমত দিলে খাসা কাজ করে। কাজেও বেশ উপকার হয়। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, ঠিক সময়ে ঠিকমত সব হয়ে ওঠে না। এরা সব সময়ে ইন্‌জেক্‌শন নিতেই চায় না। কাঁহাতক সাধ্যসাধনা ক'রে বেড়াই ব্যাটাদের।

রোগীর বাড়িতে গিয়া দেখা গেল, রোগী মুমূর্ষ। তিন-চারি বৎসরের একটি শিশু। শঙ্করদের ডিস্‌পেন্সারির ডাক্তারবাবু 'স্যালাইন সাব্‌কিউটেনিয়াস' দিয়া গিয়াছেন। বগলের নীচেটা ফুলিয়া আছে। ফো

ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা খাওয়ানো হইতেছে। গোপনে গোপনে বৈদ্যদের 'দাবাই'ও চলিতেছে। গলায় একটা মাদুলিও পরানো হইয়াছে। তবু অবস্থা শোচনীয়। চোখের কোণ বসা, মাথার চুল রুক্ষ, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, শুষ্ক অধর। অন্ধকার ঘরের ভিতর পচা ভ্যাপ্‌সা একটা গন্ধ। বমি ও বিষ্ঠার উপর মাছি ভনভন করিতেছে। কাল ইহার বড়টি মারা গিয়াছে, আজ এটিও যায় যায়। নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় মৃত—ক্ষীণ নিশ্বাস-প্রশ্বাসটুকু এখনও থামিয়া যায় নাই কেবল। ডাক্তারবাবু ঝুঁকিয়া নাড়ীটা দেখিলেন, তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া শঙ্করের পানে চাহিলেন।

মেয়েটা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, মাই গে!

মা পাশেই বসিয়া ছিল। ঝুঁকিয়া বলিল, কি বেটা?

মেয়েটা দুই শীর্ণ হাত দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। ভয় পাইয়াছে।

ডর নেই বেটা, ডাক্‌টরবাবু আইলোছে, ঘুর দেখে দ।

মেয়ে কিন্তু মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

মা তখন তাকে চুম খাইয়া খাইয়া ভুলাইতে লাগিল, লালু মেরা, ভুগা মেরা, ঘুর ঘুর দেখে দ।

ডাক্তারবাবু অধীর হইয়া উঠিলেন।

আর দেখবার দরকার নেই। যা দেখবার দেখে নিয়েছি। চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি হবে? আরে, ওইসে করকে চুম মৎ খাও। ফিন তুমরাভি হোগা।

মা কিন্তু চুম খাইতে লাগিল, বারণ শুনিল না।

ডিস্‌গাস্টিং! আসুন।

ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু শঙ্করও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারবাবু চৌকিদারটিকে বলিলেন যে, চিকিৎসা ঠিক মতই চলিতেছে, আর নূতন কিছু করিবার নাই। ফাজটা ঘন ঘন যেন খাওয়ানো হয়। চৌকিদার 'জি হুজুর' বলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল।

চলুন, যাওয়া যাক।

নির্বাক শঙ্কর ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু যেন যন্ত্রচালিতবৎ চলিতে লাগিল।

ওকে বললুম বটে, চিকিৎসা ঠিকমত চলছে, কিন্তু ঠিকমত চলছে না। অধিকাংশ ডাক্তারই মনে করে, কলেরা হ'লেই স্যালাইন দিতে হবে। কোন রকমে পানি চড়াতে পারলেই যেন চিকিৎসার চরম হয়ে গেল।… ও কি! আপনি অমন গুম মেরে গেলেন কেন?

শঙ্কর তবু কিছু বলিল না, গম্ভীর হইয়া রহিল।

আপনার কি মনে হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি। I respect your feeling—আপনার মনে হচ্ছে এত ক'রে কিছু হচ্ছে না। হবে কি ক'রে? স্বচক্ষেই তো দেখলেন, মা-টা ওর মুখে মুখ লাগিয়ে চুম খাচ্ছে, চতুর্দিকে মাছি ভনভন করছে, পাশেই সরাতে পান্তা ভাত বাসি ডাল রয়েছে, তাতে মাছি বসছে, একটু পরেই মাগী গিলবে ওগুলো গপগপ ক'রে। আমরা জলে পার্মাঙ্গানেট দিয়ে আর কি করব, বলুন?

ম্লান হেসে শঙ্কর বলিল, সব বুঝেও কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। আমি আর ডাক-বাংলোয় ফিরব না, আপনি যান।

আপনি কোথা যাবেন?

আমি আমাদের ডিস্‌পেন্সারির দিকেই যাই একবার।

আচ্ছা, তা হ'লে নমস্কার।

নমস্কার।

এক ছেলে মারা গিয়াছে, আশেপাশে সকলে মারা যাইতেছে, রোগটা কত ভীষণ তাহা অজানা নাই, কি করিলে রোগের হাত হইতে বাঁচা যায় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বারম্বার তাহা বলিয়া দিতেছেন, সমস্ত জানিয়া শুনিয়া তবু মা সন্তানকে চুম খাইতেছে। শঙ্করের নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহারই অমঙ্গল-আশঙ্কায় তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। তাহারই মঙ্গলের জন্য তাহার সান্নিধ্য তিনি এড়াইতে চান।…অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ডিস্‌পেন্সারির দিকে না গিয়া অন্য দিকে চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। মাঠে ফসল উঠিতেছে কলাই মুগ কুরথি কাটা হইয়াছে, এখন গরু দিয়া তাহা মাড়ানো হইতেছে—

এ দেশে 'দৌনি' বলে। পাশাপাশি আট-দশটা গরু মাঝখানে পোতা একটা বাঁশের খুঁটাকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক গরুর মুখে একটা করিয়া দড়ির জাল না দিলে ফসল খাইয়া ফেলিবে। গরুগুলা অনাহার-ক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ। যে লোকটা গরু হাঁকাইতেছে, সেও অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ। মাথায় একটা মলিন পাগড়ি, গায়ে জামা নাই, ছেঁড়া ময়লা কাপড় হাঁটুর উপর উঠিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার আনন্দের সীমা নাই। আশেপাশে যে এত লোক কলেরায় মরিতেছে, তাহা যেন সে জানেই না। আনন্দে গান ধরিয়া দিয়াছে। নিকটেই 'ওসৌনি' হইতেছে। একদল মেয়ে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে, প্রত্যেকেই এক-একটি করিয়া কুলা হাত দিয়া মাথার কাছে তুলিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতেছে। কুলায় আছে মাড়ানো ফসল। ফসল পায়ের কাছে পড়িতেছে, খোসাগুলি উড়িয়া যাইতেছে। মেয়েগুলিও সমস্বরে গান ধরিয়াছে। একটি যুবক ফসলগুলি মেয়েদের পায়ের নিকট হইতে সরাইয়া এক জায়গায় জমা করিতেছিল, সে একটি যুবতীর পায়ের নিকট আসিয়া কি একটা রসিকতাই করিল বোধ হয়, মেয়েটি সকোপকটাক্ষে ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাহাকে ছোট্ট একটি লাথি মারিল। সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গরুগুলি দ্রুততর বেগে ছুটিয়া যেন এ আনন্দে যোগ দিল। শঙ্করের মনের মেঘও সহসা যেন কাটিয়া গেল। এত দুঃখেও ইহাদের প্রাণের উৎসব থামিয়া যায় নাই তো! খাইতে পায় না, পরিতে পায় না, ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কলেরায় মরে, তবু এত আনন্দ! দুঃখে হাহাকার করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সুখের দিনে উৎসব করিতেও ইহাদের বাধে না। কোন 'পরব' বাদ দেয় না, একটা কিছু হইলেই হইল। উপার্জন করিয়া, ধার করিয়া, চুরি করিয়া, যেমন করিয়া হোক দলে দলে রঙিন কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইবে—মিঠাই কিনিবে, পুতুল কিনিবে, নাচিবে, গাহিবে। সে মিঠাই, সে পুতুল, সে নাচ, সে গান হয়তো উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু তাহাতেই উহারা আনন্দে বিহ্বল। আমরা উহাদের ঠিক চিনি না, উহারাও আমাদের ঠিক চেনে না, মাঝখানে কি একটা যেন বাধা সৃষ্টি করিয়াছে! কি সেটা?...হঠাৎ অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শুনিয়া শঙ্কর পিছু ফিরিয়া চাহিল। একরাশ ধূলা উড়াইয়া নটবর

ডাক্তার বিদ্যুৎবেগে চলিয়া গেলেন। মনে হইল, গ্রামের ভিতরই গেলেন। ওই মেয়েটাকেই দেখিতে গেলেন নাকি? শঙ্করও ফিরিল, সেই চৌকিদারের বাড়ির দিকেই আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। গিয়া দেখিল, তাহার অনুমানই ঠিক। চৌকিদারের বাড়ির সামনের বেঁটে খেজুরগাছটায় নটবর ডাক্তারের ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। আর একটু কাছে গিয়া শঙ্কর শুনিতে পাইল, নটবর তারস্বরে গালাগালি শুরু করিয়াছেন।

এতনা দের তক্ কেয়া করতা থা রে শালা সব? পুটুর পুটুর তাকে হ্যায়। আগিন্ বানাও জলদি—ফুকো জোরসে উল্লু কাঁহাকা। হট্।

শঙ্কর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। উঁকি দিয়া দেখিল, নটবর নিজেই উবু হইয়া বসিয়া একটা উনুনে ফুঁ দিতেছেন। তাঁহার বড় বড় লাল চোখ ধোঁয়ায় আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে। খানিকক্ষণ ফুঁ দিয়া তিনি বলিলেন, ফুঁক আচ্ছা করকে, এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইতেই শঙ্করের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল।

আরে, আপনাকেও ডেকে এনেছে নাকি ব্যাটা?

না, আমি এমনিই এসেছি।

চলুন, বাইরে চলুন, এখানে বড্ড ধোঁয়া। শালারা উনুনটা পর্যন্ত ভাল ক'রে ধরিয়ে রাখে নি। অথচ ঘণ্টা দুই আগে আমাকে যখন ডাকতে গিয়েছিল, তখন পই পই ক'রে ব'লে দিলাম, চরণ ডাক্তারকে খবর দিয়ে বিকেল নাগাদ আমি ঠিক পৌছব। তোরা উনুনে এক হাঁড়ি জল চড়িয়ে রাখ্‌গে যা, গরম জল চাই। কিচ্ছু করে নি শালা, কেবল ডাক্তার চেখে চেখে বেড়াচ্ছে, হেলথ অফিসারটাকে পর্যন্ত ডেকে এনে দেখিয়েছে বলছে। আর যার যা খুশি ওষুধ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে গেছে। এখন তুই শালা সামলা। আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথাও আছে। এ ব্যাটাদের শতরঞ্চি মাদুর কিচ্ছু নেই যে বিছিয়ে বসি, সব শুয়ে মুতে একশা হয়ে আছে। আঃ! আসুন, এইখানেই বসা যাক।

বাড়ির সামনে গোটা কয়েক ইঁট পড়িয়া ছিল। একটা ইঁট শঙ্করের দিকে

আগাইয়া দিয়া আর একটাতে নটবর উপবেশন করিলেন এবং হুকুম করিলেন, বেগ লে আও।

ত্রস্ত চৌকিদার তাড়াতাড়ি ঔষধের ব্যাগটি আনিয়া সম্মুখে রাখিল। নটবর ব্যাগ খুলিয়া কয়েকটা ইন্‌জেক্‌শনের ঔষধ বাহির করিয়া দেখিলেন; তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, এই মরেছে, কিছুই শালার মনে থাকে না, আঃ!

কি হ'ল?

পি.ডি.র পিটুইট্রিনটা আনতে ভুলেছি, অথচ ওটা দরকার এখুনি। যাই, চপ ক'রে গিয়ে নিয়ে আসি। জলটা ততক্ষণ গরম হোক। আপনি বসবেন? আমি যাব আর আসব। ঘোড়ার পিঠে দু কোশ যেতে আর কতক্ষণ লাগবে! আপনার সঙ্গে দরকার ছিল একটু, হরিয়ার সেই ব্যাপারটা— আচ্ছা সে পরে হবে না হয়, ওষুধটা আগে দরকার, যাই।

এখানে আমাদের ডিস্‌পেন্সারিতে ওষুধটা কি পাওয়া যাবে না?

যাওয়া তো উচিত।—বলিয়াই মুচকি হাসিয়া নটবর বলিলেন, কিন্তু আমার নাম শুনলে আপনাদের ডাক্তার দেবে কি না সন্দেহ। সেদিন মদের ঝোঁকে লোকটাকে জুতো নিয়ে তাড়া করেছিলুম।

এক মুখ হাসিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিলেন।

কেন, কি হয়েছিল?

সেদিন এই পাশের গ্রামেই ভোজু গোয়ালার বাড়িতে রুগী দেখতে গেছি। গিয়ে শুনলাম, ভোজু ওঁকেও খবর দিয়েছে। ব'সে রইলাম ওঁর অপেক্ষায়। খানিকক্ষণ পরে উনি সুট চড়িয়ে গটমট ক'রে এলেন, রুগী দেখলেন, আমার সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত কইলেন না। আমি নিজেই তখন উপযাচক হয়ে বললাম, পিঠের ডান দিকে নীচে 'ক্রিপিটেশান' আছে ব'লে মনে হচ্ছে, দেখেছেন সেটা কি? ব্যাটা বললে কি শুনবেন?

নটবরের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

কি?

বললে, কোয়াকের সঙ্গে আমি কন্‌সাল্ট করি না। শুনুন কথা একবার।

বললাম, তবে রে শালা, তোর পাসের নিকুচি করেছে, বেরোও এখান থেকে। এ ভোজুর বাড়ি নয়, আমার বাড়ি। আমিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এই ফী নাও, বেরোও এখান থেকে এখ্‌খুনি। তোমাদের নোট মুখস্থ ক'রে চুরি ক'রে ঘুস দিয়ে পাস করার যে মুরোদ কত, তা আমার জানা আছে। তেল দিতে পারলে আমিও একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পারতাম। নিকালো শালা—। টং টং ক'রে দুটো টাকা ফেলে দিয়ে দূর ক'রে দিলাম। শালা হেঁট হয়ে টাকা দুটো কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল। চিকিৎসার 'চ' জানে না, এটিকেট মারাতে এসেছেন! খুব সম্ভব, চুরি ক'রে পাস করেছে ছোকরা।

নটবরের হস্তে নিজেদের ডাক্তারের এই লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া শঙ্কর আহত হইল।

বলিল, তা হতে পারে। কিন্তু তাঁকে এমনভাবে অপমান করাটা ঠিক হয় নি আপনার।

নিশ্চয় হয় নি। কিন্তু একটি বোতল 'থাঁটি' তখন আমার মগজে চ'ড়ে আছে, বাজে 'ফর্ম্যালিটি' করতে দেবে কেন সে? সাদা চোখে একদিন অ্যাপলজি চেয়ে আসব ভেবেছি, কিন্তু ফুরসৎই পাচ্ছি না।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শঙ্করও হাসিয়া ফেলিল ও উঠিয়া দাঁড়াইল।

কি ওষুধ বললেন? পিটুইট্রিন?

হ্যাঁ, পি.-ডি.র।

দেখি, যদি আনতে পারি!

আপনি গেলে তো 'বাপ বাপ' ক'রে দেবে।

শঙ্কর চলিয়া গেল।

ডিস্‌পেন্সারি কাছেই, পাঁচ মিনিটের পথ। গিয়া দেখিল, ডাক্তার কম্পাউণ্ডার কেহ নাই। কলেরার মরশুম, দুইজনেই 'কলে' বাহির হইয়া গিয়াছেন। ড্রেসার ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার কাছে চাবিও ছিল। অনেকক্ষণ খুঁজিয়া সে ঔষধটা বাহির করিয়া দিল। শঙ্কর ফিরিয়া আসিয়া

দেখিল, উনুন ধরিয়া উঠিয়াছে, জলও গরম হইয়াছে, নটবর ডাক্তার নিজেই মেয়েটির হাতে পায়ে সেঁক দিতেছেন। মেয়েটি অনেকটা যেন চাঙ্গা হইয়াছে। নটবর ইন্‌জেক্‌শনটা দিলেন, ব্র্যাণ্ডি দিয়া এক দাগ ঔষধ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন, তাহার পর বলিলেন, এইবার স্যালাইনটার ব্যবস্থা করা যাক।

শঙ্কর বলিল, একবার দেওয়া হয়েছে শুনলাম।

আর একটু দেওয়া দরকার। আমি পেট ফুঁড়ে দেব। এঁদের ভয় হয়। কেউ বলেন, ইন্‌টেস্টাইন ছ্যাঁদা হয়ে যাবে; কেউ বলেন, পেরিটোনাইটিস হবে। আমি কিন্তু বহুৎ দিয়ে দেখেছি, কিছু হয় না, খুব ভালফল হয়। আর কত সহজে টপ টপ দেওয়া যায়। ব্যবস্থা ক'রে ফেলা যাক। চরণ ডাক্তারের আশায় কতক্ষণ আর থাকি! তিনি তাঁর প্রত্যেক রুগীর প্রত্যেক কথার উত্তর দিয়ে প্রত্যেকের পথ্যের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা ক'রে সকলের সব রকম আবদার মিটিয়ে তবে আসবেন। আশ্চর্য লোক! অথচ ওঁকে ছাড়া আর কারকে বিশ্বাস নেই আমার।

চরণ ডাক্তারকে এরাই ডেকেছে নাকি?

এরা ডাকবে কেন, আমি ডেকেছি। দায় কি এদের? দায় এই শালার। চরণবাবু বোধ হয় ফী নিতে চাইবেন না, কিন্তু দিতে হবে কিছু। ব'লে রাখি। এই, শুনতা হ্যায়, চরণবাবুকো বোলায়েঁ হেঁ। আঠ রুপিয়া ফিস লাগে গা।

হুজুর মাই বাপ, জো বোলিয়ে।

নটবর মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, জো বোলিয়ে! জো বোলিয়ে কি রে! রুপিয়া হ্যায়?

মেয়ের মা অশ্রু মুছিয়া সজলকণ্ঠে বলিল, থারি লোটা বন্ধক দে করিকে রুপিয়া আনব বাবু, বেটীকে মেরা বচাই দে—

এই গাইতে শুরু করেছে!—তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, যা দেখছি, শেষকালে I shall have to pay from my own pocket—এই ব্যাটারাই ফতুর করবে আমাকে। মেথরপাড়ায় এক মিশনারি সাহেব

সেবা ক'রে বেড়াচ্ছে দেখলাম, তাকেও কতকগুলো কাজ দিয়ে আসতে হ'ল। চাইলে 'না' বলতে পারলাম না। আর সত্যিই কাজ করছে লোকটা।

মেথরপাড়াতেও কলেরা হয়েছে নাকি?

চারটে মরেছে, দশটা ভুগছে।

তা হ'লে আমার তো একবার যাওয়া দরকার সেখানে।

নিশ্চয়। যান। যদি পারেন, কিছু সাহায্যও করুন। হ্যাঁ, আপনাকে সেই কথাটা ব'লে নিই। হরিয়ার নামে শুনলাম উৎপলবাবু নালিশ করেছেন। দারোগাও তার নামে বি.এল. কেস আগেই দায়ের করেছে। আমি কিন্তু ব'লে রাখছি, হরিয়ার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবেন না আপনারা। তার বিরুদ্ধে একটি সাক্ষী পাবেন না। মিছিমিছি অপ্রস্তুত হবেন শুধু। হরিয়া, বিষুণ, কারু, ফরিদ—সকলের হয়ে লড়ব আমি। এই জেলার সেরা উকিলরা বিনা পয়সায় আমার হয়ে খেটে দিয়ে যাবে। উৎপলবাবুকে ব'লে দেবেন কথাটা। তিনি সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করলেন না, কিন্তু একদিন তাঁকে এই শম্মার কাছে আসতে হবে, তা ব'লে দিচ্ছি। তাঁকে ব'লে দেবেন, শুধু যে সাক্ষী পাবেন না তা নয়, ধোপা পাবেন না, নাপিত পাবেন না, গোয়ালা পাবেন না, কিচ্ছু পাবেন না। এই গরিবরাই আপনাদের হাত পা, এদের পীড়ন ক'রে কোনও সুখ পাবেন না আপনারা। এ কলকাতা নয়, মফস্বল। এখানে পয়সা ফেললেই সব জিনিস পাওয়া যায় না। এদের কাছে হুকুম হাকিম নয়, ভালবাসাই হাকিম। এই অবস্থায় দরিদ্রদের পীড়ন করতে ইচ্ছেও হয় আপনাদের? আশ্চর্য!

শঙ্কর একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

আমি তো কিছুই করি নি। উৎপল করেছে। পলাশপুর থেকে আসার পর তার সঙ্গে দেখাও হয় নি আমার। কলেরা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে। তাকে বলব আপনার কথা।

বলবেন।

নটবর স্যালাইন দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বাহির হইয়া চলিতে শুরু করিল। পলাশপুর হইতে আসিয়া সত্যই সে উৎপলের সহিত

[illegible] করে নাই। কলেরার অজুহাত পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল। সুরমার সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিতেছিল। ও-ফাঁদে সে আর পা দিবে না। ফাঁদটা যে তাহার মনেই, এ খেয়াল তাহার ছিল না। নিপুলাকে, প্রমথ ঠাকুরকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এতগুলা গরিব লোকের নামে নালিশ করা হইয়াছে, রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন দেওয়া হইয়াছে, দুই দমনের এত আয়োজন উৎপল সাড়ম্বরে করিয়াছে, তাহার সহিত দেখা হইলেই নিশ্চয়ই সোৎসাহে সে এই সব আলোচনা করিবে। শঙ্করকে চুপ করিয়া সব শুনিতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। উৎপল তাহার উপরই সব ভার দিতে চাহিয়াছিল, সে লয় নাই, লইতে পারে নাই, সমস্যার সমাধান করিবার কোন সদুপায় তাহার মাথায় আসে নাই; সুরমার প্ররোচনায় প্রতিবাদ করিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া উৎপলের কথাতেই অবশেষে সায় দিয়া সামান্য একটা ছুতায় ভীরুর মত সে পলাশপুরে পলাইয়া গিয়াছিল।

মেথরপাড়ায় গিয়া সে দেখিল, মিশনারি সাহেব মলমূত্রসিক্ত কতকগুলি কাপড় জামা বাখারি করিয়া তুলিয়া প্রকাণ্ড একটি গামলায় ফেলিতেছেন। গামলায় ফিনাইল-মেশানো সাদা জল রহিয়াছে। সারি সারি অনেকগুলি গামলা। সাহেবের সঙ্গে শঙ্করের আলাপ ছিল।

গুড আফ্‌টারনুন মিস্টার রয়।—তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌টিং সয়েল্‌ড্‌ ক্লোদ্‌স্‌।

শঙ্কর প্রত্যভিবাদন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব বাংলাও জানেন। বলিলেন, আপনিও সেবাকার্য করছেন!

শঙ্কর ঘাড় নাড়িল।

উত্তম, খুব উত্তম। আমি আপনার সাহায্য পাইতে পারি কি?

নিশ্চয়, কি করতে হবে, বলুন?

আসুন।

সাহেবের পিছু পিছু শঙ্কর ছোট একটা কুঁড়েঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরে এত অন্ধকার যে, সে প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না, কিছু শুনিতেও

পাইল না। মৃত্যুর স্তব্ধতায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন যেন। একটা নিদারুণ দুর্গন্ধ কেবল তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সহসা সাহেব টর্চ জ্বালিলেন। তীব্র আলোকে প্রথমেই চোখে পড়িল, ঘরের এক কোণে গোটা দুই প্রকাণ্ড শূকর বাঁধা রহিয়াছে। তাহার পর দেখিতে পাইল, আর একধারে সারি সারি তিনজন শুইয়া আছে। দুইজনের মুখ ঢাকা, একজনের মুখ খোলা। যাহার মুখ খোলা, মনে হইল, সে যেন দুই চোখে কালো কালো ঠুলি পরিয়া আছে। সাহেব পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের উপর নাড়িতেই ভনভন করিয়া অসংখ্য মাছি উড়িয়া গেল। চক্ষুকোটর বাহির হইয়া পড়িল। চক্ষু দেখা যায় না, খালি কোটর। ঠুলি নয়, মাছির স্তূপ। হাত নাড়িয়া তাড়াইবার সামর্থ্য নাই।

সাহেব ঝুঁকিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, নাড়ী নাই, তবু এ বোধ হয় বাঁচিয়া আছে। এ লোকটাকে আমি হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি যদি এ দুজনের ক্রিমেশনের ব্যবস্থা করেন, বড় ভাল হয়।

শঙ্করের মুখে কথা সরিতেছিল না।

বাক্যস্ফূর্তি হইলে দুইটি মাত্র কথা সে বলিল, এ কি !

সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এই আপনার দেশ ! Your country lives in huts, not in palaces,—lives like this and dies like this—

শঙ্করের আত্মসম্মানে কেমন যেন আঘাত লাগিল। বলিয়া ফেলিল, I have read about Black Plague of your country too।

No offence please—চলুন, কাজ করা যাক। Let us be up and doing।

সাহেব বাহিরে আসিয়া ডিস্ইন্‌ফেক্‌টিঙে মন দিলেন।

শঙ্কর অকূল পাথারে পড়িল। একটি লোক নাই, কি করিয়া মড়া পোড়াইবার ব্যবস্থা করিবে সে ? এ পাড়ার সকলে পলাইয়াছে। অন্য কোন জাত মেথরের মড়া স্পর্শ করিবে না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া সে একটিমাত্র

লোকের নাগাল পাইল। ফুলশরিয়া। ফুলশরিয়ারই শরণাপন্ন হইল। সে যদি কোন লোক যোগাড় করিয়া দিতে পারে। ফুলশরিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শঙ্করবাবু তাহাকে ডাকিয়া কাজের ভার দিতেছেন! জরুর সে 'কোসিস' করিবে। মেথরদের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালি বর্ষণ করিতে করিতে সে বাহির হইয়া গেল, শঙ্কর আবার মেথরপাড়ায় ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া দেখিল, সাহেব তাঁহার 'ডিস্ইন্ফেক্টিং' শেষ করিয়াছেন।

লোক পেলেন?

ডাকতে পাঠিয়েছি।

সাহেবের চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মিটিমিটি করিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, পাওয়া শক্ত। কেউ আসিবে না। এ দেশের লোককে আমি চিনি।

সত্য কথাটা শুনিয়া শঙ্করের লজ্জা হইল। হঠাৎ রাগও হইল। আশ্চর্য স্পর্ধা এই বিদেশীটার! আমাদেরই অর্থে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া, আমাদের দেশের মাটিতেই দাঁড়াইয়া, আমাদেরই নিন্দা করিতেছে! আমাদের উপকার করিবার জন্য কে উহাকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল? উত্তরে একটা রূঢ় কথা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার অবস্থাও কি অনুরূপ নয়? তাহাকে কে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল এখানে আসিতে? সাহেব কিছু না বলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন এবং অবলীলাক্রমে মুমূর্ষু কলেরা রোগীটাকে কাঁধে তুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

আমি হস্পিটালে চলি। আপনি অপেক্ষা করুন। শীঘ্র কেহ আসিবে না। জানোয়ার সব—

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সাহেব চলিয়া গেলেন।

যতক্ষণ দেখা গেল, শঙ্কর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, স্কুলের স্পোর্টে একবার সে ফার্স্ট হইতে পারে নাই। তাহার অপেক্ষা বলিষ্ঠতর আর একজনের নিকট সে হারিয়া গিয়াছিল। পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সেই ছেলেটা যখন 'কাপ' লইয়া চলিয়া গেল, তখন তাহার যাহা মনে হইয়াছিল, এই সাহেবকে দেখিয়া ঠিক তাহাই

মনে হইল। সাহেবের মহত্ত্বে সে যতটা প্রীত হইয়াছিল, তাহার ওই 'জানোয়ার' কথাটায় ঠিক ততটাই বিরক্ত হইল সে। তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল যেন। মনে হইতে লাগিল, এই যে ইহারা আমাদের সকলকে অশিক্ষিত বর্বর মনে করিয়া অনুকম্পাভরে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার মূলে কি আছে? নিছক মানব-প্রেম? স্বার্থ নয়? ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা পর্যন্ত স্বদেশবাসীকে হীনচক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। আমাদের কবিও গাহিয়া গিয়াছেন—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা। কাহার ভাষা? সত্যই কি আমরা মূঢ়, সত্যই কি আমরা মূক, সত্যই কি আমরা ম্লান? সত্যই কি আমাদের নিজের কোন বুদ্ধি নাই, সৌন্দর্য নাই, ভাষা নাই? যে বিদেশী মানদণ্ডের মাপে এসব কথা বলিতে শিখিয়াছি, সেই মানদণ্ডটাই কি নিখুঁত? উহাদের চোখ দিয়া দেখিলে আমাদের হয়তো ম্লান দেখায়, উহাদের কান দিয়া শুনিলে আমাদের প্রাণের ভাষা হয়তো শোনা যায় না, কিন্তু উহাদের বিচারটাই কি শেষ বিচার? কলেরায় দলে দলে লোক মরিতেছে, দলে দলে লোক পলাইতেছে, ইহা লইয়া ঠাট্টা করিবার কি আছে? উহাদের দেশে পলায় না? নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে কে স্থির হইয়া থাকিতে পারে? পলাইয়াছে তো হইয়াছে কি? উহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায় না? প্রাণের ভয় কাহার নাই? ও-দেশের গরিবদের কথা কে না জানে? ও-দেশের 'স্লাম'বাসীদের তুলনায় আমাদের দেশের গরিব লোকেরা তো দেবতা। উহাদের সাহিত্যে স্লামের যে পাশবিক ছবি আমরা পাই তাহা বীভৎস, এ দেশে ও-ছবি কল্পনাও করা যায় না। আমাদের অনেক দোষ আছে—আমরা রুগ্ন, আমরা অশিক্ষিত, আমরা অসহায়; কিন্তু এ সবের মূল কারণ কি পরাধীনতা নয়? নিরীহ হরিণ বিরাট একটা পাইথনের কবলে পড়িয়া নানারূপ অশোভন ভঙ্গীতে ছটফট করিতেছে। এই অশোভনতা যদি দোষ হয়, তাহা হইলে আমরা দুষ্ট। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহার মনের গ্লানি অনেকটা যেন কমিয়া গেল। কিন্তু তাহা বেশিক্ষণ স্থায়ী হইবার অবসর পাইল না। ফুলশরিয়া আসিয়া হাজির হইল ও বলিল যে, ভন্টু এবং যোগীয়ার সহিত তাহার দেখা

হইয়াছিল, কয়েকদিন আগে তাহাদের দুইজনেরই ছেলে-বউ মরিয়াছে। এখন তাহারা কালালিতে বসিয়া মদ খাইতেছে। মড়া ফেলিবার কথা বলায় হা-হা করিয়া হাসিয়া অশ্লীল ভাষায় তাহাকে গালাগালি দিল। বাবু নিজে যদি গিয়া ছোঁড়াপুতাদের কান ধরিয়া টানিয়া আনেন, তবে ঠিক হয়।

শঙ্কর বলিল, দুটো ছোট খাটিয়া যোগাড় করতে পারিস?

হাঁ। উ আর কি ভারী বাত ছে।

তাই আন্ তা হ'লে। তোর আপত্তি আছে ছুঁতে? যদি না থাকে, তা হ'লে তুই আর আমি একে একে এদের নিয়ে যাই, চল্।

ফুলশরিয়া শিহরিয়া উঠিল।

উ বাবু হম নেহি সেকবো।

শঙ্কর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন গভীর রাত্রে শঙ্কর যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দুইটা, সমস্ত দেহ মন অবসন্ন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। সে কাহাকেও উঠাইল না। উঠাইবার প্রবৃত্তিও হইল না। বাহিরের ঘরে তাহার এক প্রস্থ বিছানা পাতাই থাকিত, বাহিরের ঘরের চাবিও তাহার কাছে ছিল, বাহিরের ঘরেই সে শুইয়া পড়িল। সাহেবের কথাগুলি তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল—Your country lives in huts, not in palaces—lives like and dies like this। তাহার ঘুম আসিল না। খানিকক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল, আলো জ্বালিয়া লিখিতে শুরু করিয়া দিল।

"যেমন করিয়া হোক ইহাদের আমি উদ্ধার করিব, তাহা করিতে গিয়া যদি আমার ধন প্রাণ সর্বস্ব যায়, তবু আমি নিরস্ত হইব না।..."

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে একটা শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিল, বারান্দায় একটা ছায়ামূর্তির মত কে যেন দাঁড়াইয়া আছে।

কে?

ছায়ামূর্তি আগাইয়া আসিল।

কি চাই এত রাত্রে?

কম্পিতকণ্ঠে ফুলশরিয়া বলিল, কুছু নেই।

শঙ্কর উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিতেই ফুলশরিয়া হঠাৎ আগাইয়া আসিল এবং তাঁহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

এ কি!

ফুলশরিয়া কিছুতেই পা ছাড়ে না। কি হইল? কাঁদিতেছে কেন? জোর করিয়া পা সরাইয়া লইতেই ফুলশরিয়া উঠিয়া বসিল এবং আঁচলে চোখ মুছিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। একটি কথাও বলিল না। নিজের অদ্ভুত আচরণে নিজেই সে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু না আসিয়া সে কিছুতেই পারে নাই। কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিতেছিল না। অনেকক্ষণ হইতেই সে শঙ্করের বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরিতেছিল। মেথরের মড়া বাবু নিজে কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া গেলেন! এ কি মানুষে পারে? এ লোককে প্রণাম না করিয়া থাকা যায়?

শঙ্কর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সকালে খোঁজ করিয়া শুনিল, ফুলশরিয়া বাড়িতে নাই। হাতে কোন কাজ ছিল না, মনে হইল, উৎপলের কাছে একবার যাওয়া যাক। তাহার সহিত দেখা না করাটা অশোভন হইতেছে। সুরমা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে তবে যাইবে, এ কি তাহার পাগলামি! সেখানেও গিয়া দেখিল, কেহ নাই। দারোয়ান বলিল, বাবু এবং মাইজী একটা জরুরি তার পাইয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন বলিয়া যান নাই।

৪৬

পরদিন একজন পাচক সমভিব্যাহারে শিরীষবাবু আসিয়া পড়িলেন এবং শুধু অমিয়াকে নয়, শঙ্করকেও লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অমিয়া বলিল, আমি যাই কি ক'রে, বল? হাসিদি তাঁর ছেলেকে আমার কাছে রেখে গেছেন। কার কাছে রেখে যাই একে?

চিবুকের তলাটা চুলকাইতে চুলকাইতে শিরীষবাবু বলিলেন, রেখে যাবি কেন? ও চলুক আমাদের সঙ্গে।

বাঃ, হাসিদি ফিরে এসে যদি ছেলে খোঁজেন?

শঙ্কর বলিল, তার ফিরতে এখন দেরি আছে। তুমি নিয়ে যেতে পার ওকে।

অমিয়া বলিল, তা ছাড়া বাড়িতে এতগুলি পোষ্য, তাদের দেখে কে?

ইহার জন্য শিরীষবাবু প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন।—সেই জন্যেই তো রাঁধুনি বামুনটাকে সঙ্গে এনেছি, ও স্বচ্ছন্দে সব চালিয়ে দিতে পারবে। শঙ্করও আমাদের সঙ্গে চলুক। চারদিকে কলেরা হচ্ছে, এখন এখানে থাকা ঠিকও নয়।

শঙ্কর বলিল, কলেরা হচ্ছে ব'লেই আরও আমাকে থাকতে হবে।

শিরীষবাবু জামাতার দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া আবার চিবুক চুলকাইতে শুরু করিলেন।

অমিয়া বলিল, যাই, বাবার চা-টা নিয়ে আসি। তুমিও খাবে না কি আর এক কাপ?

আন।

শিরীষবাবু সোৎসাহে বলিলেন, খাবে বইকি। আন্।

অমিয়া চলিয়া গেল।

শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। মুন্নাই আসিয়া ডাকের চিঠি দিয়া গেল।

ডাক এল নাকি?

হ্যাঁ।

শঙ্কর খামটা খুলিয়া দেখিল, উৎপলের চিঠি।

উৎপল লিখিয়াছে—

'ভাই শঙ্কর,

চিঠি পড়বার আগেই একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি। যা করেছি, তার প্রেরণা মানবসুলভ কৌতূহল, অন্য কিছু নয়। লোভটা

সামলাতে পারা গেল না। শুধু তাই নয়, সামলানো উচিত ব'লেও মনে হ'ল না। আগে তোমাদের কাউকে কিছু বলি নি, কারণ বললেই তোমরা বাগড়া দিতে। সুরমা এখনও দেবার চেষ্টা করছে, যদিও এখন আর ফেরবার পথ নেই, সই ক'রে দিয়েছি। অর্থাৎ, ইন ব্রিফ, কিংস্ কমিশন পেয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আগে থাকতেই গোপনে গোপনে চেষ্টা করছিলাম, লেগে গেছে। মানব-মনীষার এই নবতম বহ্ন্যুৎসবটা স্বচক্ষে দেখবার কি যে আগ্রহ হচ্ছে আমার, তা তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করব না; কারণ তোমরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক, তোমাদের ধরনধারণ সবই স্বতন্ত্র। যাক সে কথা। এখন যে কোন মুহূর্তেই উড়ব এবং চীন, না, কায়রো কোথায় গিয়ে যে হাজির হব, তা জানি না। যতদিন না ফিরি, সুরমা তার বাবার কাছে বম্বেতে থাকবে। তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না, তাই চিঠিতেই গোটাকতক কাজের কথা ব'লে যাচ্ছি, অবধান কর। আগে যেমন ছিলে, এখনও তেমনই তুমি জমিদারির সবময় কর্তা রইলে। তোমাকে সম্পূর্ণ ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে গেলাম অর্থাৎ আমার অবর্তমানে তুমি যা করবে, তাতে আমার অগ্রিম সম্মতি রইল এবং আইনত সেটা পাকা করবার জন্যে আমার উকিলকেও অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে গেলাম। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। শুধু একটা কথা। দেশোদ্ধারের যে এক্সপেরিমেণ্টটা আমরা করেছিলাম, তাতে যে খুব সুবিধে হয় নি, এতদিনে তুমিও সেটা বুঝেছ নিশ্চয়। অন্য একটা লাইন ধরলে কেমন হয়? অবশ্য কি লাইন ধরলে যে ভাল হবে, সেটা তুমিই ভেবে-চিন্তে ঠিক ক'রো।

মণির ব্যাপারে আমি যে বিকট কাণ্ড ক'রে এসেছি, তার ফল কি হ'ল? আমার পদ্ধতি উল্টে দিয়ে নূতন কোন উপায়ে তুমি যদি সমস্যাটার সমাধান করতে পার, ক'রো, আমার কিছু আপত্তি নেই। বিবেকদংশনে ক্ষত-বিক্ষত হবার দরকার কি! যাদের ক্ষতি হয়েছে, যদি ভাল মনে কর, তাদের *ক্ষতি-পূরণও ক'রে দিতে পার।*

তোমার নিপুদার সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল। রিক্রুটিং আপিসে দেখি, তিনি ওআরে নাম লেখাবার জন্যে এসেছেন। নেহাত পেটের দায়েই

এসেছিলেন ব'লে মনে হ'ল, যদিও অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট নানারকম বুকনি ঝাড়লেন। এ কথা মনে হবার কারণ, যেই তাঁকে বললাম—আপনি যদি চান সিভিল লাইনেই ভাল একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি আপনার, অমনই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। ভাল একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছি তাঁর। তিনি একটি অনুরোধ করেছেন। জমিদারি আমরা যদি বিক্রি করি, মুকুন্দ পোদ্দার বা রাজীব দত্তকে যেন না দিই। এ অনুরোধের অর্থ কিছু বুঝলাম না। জমিদারি আমরা বিক্রি করব, এ গুজব উঠল কি ক'রে? কেনারামও একদিন বলছিল এ কথা। হ্যাঁ, আর একটা কথা। ওই কেনারামটিকে সাবধান। বড় গভীর জলের মাছ উনি। আমাকে জানিয়ে গেছেন, ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছেটা এই নিয়ে তোমার সঙ্গে একটা মনোমালিন্য করি। আমি যে গভীরতম জলের জীব, এ খবর উনি জানেন না ব'লেই এ চেষ্টা করেছিলেন। পারতপক্ষে ওঁর সংস্পর্শ পরিহার ক'রো। আমার মতে লোকসান-টোকসান যা হয়েছে, তা 'রাইট অফ' ক'রে দিয়ে ব্যাঙ্কটা তুলে দাও। ধার হিসেবে না দিয়ে বছরে বছরে গরিব প্রজাদের যা পার দানই ক'রো বরং কিছু কিছু। সব দিক থেকে নিরাপদ সেটা, দেখতে শুনতেও ভাল।

আর বিশেষ কিছু লেখবার নাই। চুম্বন গ্রহণ কর।

সুরমা খুব হাসিমুখে থাকবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর ভেতরটা যে টনটন করছে, তা ঠিক ঢাকতে পারছে না, বোঝা যাচ্ছে একটু একটু। তবে সেটা আমার জন্যে, না, তোমার বিরহে, তা বুঝতে পারছি না ঠিক। ইতি—

উৎপল

অমিয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল।

কার চিঠি?

উৎপলের।

ডাকে আসবার মানে?

ওরা এখানে নেই। উৎপল যুদ্ধে যাচ্ছে।

আর সুরমা ?

সে বম্বে যাবে।

বাহির হইতে কে ডাকিল, শঙ্করদা !

শঙ্কর বাহিরে গিয়া দেখিল, নিমাই ঘটক দাঁড়াইয়া আছে।

কি খবর ?

আমাদের গ্রামেও কলেরা লেগেছে।

চৌধুরী মশাইকে খবর দাও তা হ'লে। আমাকে আজ কলকাতা যেতে হচ্ছে।

ও। কলকাতায় কোথায় উঠবেন ?

সপরিবারে যাচ্ছি যখন, ক্যালকাটা হোটেলেই উঠব। তেমন দরকার যদি বোঝ, খবর দিও।

আচ্ছা।

নিমাই ঘটক চলিয়া গেল।

সুরমা এখানে নাই এবং কিছুদিন এখন থাকিবে না—এই বার্তা শুনিয়া অমিয়া আর বাপের যাইতে আপত্তি করিল না।

শঙ্করও বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত যাই। উৎপলের সঙ্গে দেখা করা দরকার একটু।

শিরীষবাবু সোৎসাহে বলিলেন, বেশ তো, বেশ তো।

৪৭

অমিয়াকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া শঙ্কর গড়ের মাঠে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কাহারও সঙ্গ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। নির্জনে নিজের সঙ্গে সে বোঝা-পড়া করিতে চায়। উৎপল সুরমা কাহারও সহিত তাহার দেখা হয় নাই। বিমর্ষচিত্তে সে বারম্বার আবৃত্তি করিতেছিল, ভালই হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। গ্রামে সকলে যখন কলেরায় মরিতেছে, তখন সে তাহাদের ফেলিয়া

কলিকাতায় চলিয়া আসিল কেন ? এই না সেদিন উচ্ছ্বাসভরে লিখিতেছিল, "আমি যেমন করিয়া হোক উহাদের উদ্ধার করিব" ? এই কি উদ্ধার করিবার নমুনা ! কেন আসিল সে ? অমিয়ার জন্য আসে নাই, শ্বশুরের অনুরোধেও নয়, এমন কি উৎপলের সহিত দেখা করিবারও একটা বিশেষ আগ্রহ জাগে নাই তাহার, সে আসিয়াছিল সুরমার জন্য। নির্জনে এই রূঢ় সত্যটার সম্মুখীন হইয়া সে যেন মরমে মরিয়া গেল। ছি ছি, কেন এই হীন লোলুপতা ! আত্মসম্বরণ করিবার সামান্য এ শক্তিটুকু যাহার নাই, সে করিবে পরিত্রোদ্ধার ! চরিত্রের কোন্ সম্পদ আছে তাহার ! বেশ স্বচ্ছন্দেই তো সে হাসিকটাকাটা দিয়া নিজের ঋণপরিশোধের কল্পনা করিয়াছিল ! অতি সহজেই তো রাজীব দত্তকে স্পষ্ট মিথ্যা কথাটা বলিয়া আসিল, আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না ! পরোপকার করিবার ছুতায় সে এতদিন আত্মবিনোদন ছাড়া আর কি করিয়াছে ? কেবল কর্তৃত্ব করিয়াছে সকলের উপর। যে তাহার অহংকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছে, তাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছে ; যে পারে নাই, তাহাকে নির্যাতন না করিলেও অনুকম্পা করিয়াছে। পরের অর্থে নিজের অহঙ্কারকে পরিতুষ্ট করিতে করিতেই তো জীবন কাটিল। গৌরব করিবার মত তাহার নিজের কি আছে ? কিছুই নাই।...নিঃস্ব ভিখারীর মত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল সে। সহসা মনে পড়িল, শাস্ত্রে বলিয়াছে—আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান। নিজেকে ? অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার গুহায় লুব্ধ পশুটা বসিয়া আছে—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের মূর্ত প্রতিচ্ছবিটা। শিহরিয়া উঠিল। ওই কদাকার পশুটাই আমি ? আর কিছু নাই ? মিথ্যা কথা। আমার অন্তরে এত স্বপ্ন, পশু কি কখনও স্বপ্ন দেখে ? পশুর অন্তরে কি উচ্চাশা জাগে ? আমার অহঙ্কার অসংযম অপৌরুষ অসন্তোষ অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার যে কল্পনা আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হইতে চাহিতেছে তাহা কি পশুর কল্পনা ? এতদিনের এত শ্রম এত সাধনা সব পশু হইয়া যাইবে, পশুটারই জয় হইবে শেষে ? সহসা তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর বেগে বহিতে লাগিল, চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, অন্তরের ভাষা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, কিছুতেই না, পশুটাকে

আমি জয় করিবই। পরক্ষণেই মনে হইল, কিরূপে? অন্ধকার অন্তরলোকে তাহার ব্যাকুল মন কেবলই প্রশ্ন করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিরূপে? কিরূপে? কিরূপে? অন্ধকারের ভিতর হইতেই উত্তর আসিল, বিলাস বর্জন করিয়া কাজ কর। ভোগের শিখরে বসিয়া এতদিন কাজ করিবার অভিনয় করিয়াছ মাত্র, তোমার অন্ন অপরে উৎপাদন করিয়াছে, তোমার বস্ত্র অপরে বয়ন করিয়াছে, তুমি কেবল সাড়ম্বরে আস্ফালন করিয়াছ, আর কিছুই কর নাই। সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়া এইবার কাজে লাগ। কাজ করিলেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। অপরকে ভাল করিবার দায়িত্ব তোমার নহে, কায়মনোবাক্যে নিজে তুমি ভাল হও। নিজে যদি ভাল হইতে পার, তোমার সংস্পর্শে যাহারা আসিবে, তাহারাও ভাল হইবে। মুখের উপদেশ দিয়া নয়, নিজের পবিত্র জীবন দিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ কর। অন্য কোনও পথ নাই। নিজের বিবেকের চক্ষে নিজেকে যদি নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তাহাই তোমার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

এই কর্তব্যই পালন করিবে সে। এবার ফিরিয়া গিয়া জমিদারির সর্বময় কর্তা আর সে হইবে না। উৎপলের জমিদারির ভার লইবে উৎপলের প্রজারাই। তাহারাই নিজেদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসন-পরিষদ্ গড়িবে, নিজেদের হিতাহিতচিন্তা নিজেরাই করিবে। তাহাকে যদি নির্বাচন করে, ভৃত্যের মত সেবা করিবে সে। তাহার বেশি আর কিছু নয়। নিজে সে কৃষকজীবন যাপন করিবে। ফরিদ, কারু, বিষুণদের দলে মিশিয়া ঠিক উহাদেরই মত বাস করিবে। উহাদেরই মত নিজের হাতে চাষ করিয়া স্বোপার্জিত অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবে। বাবু আর সে থাকিবে না। মুশাইয়ের বাড়ির পাশে ছোট একখানি কুঁড়েঘর বাঁধিয়া··· কল্পনার ডানায় উড়িয়া উড়িয়া মন তাহার স্বপ্ন-রচনা করিতে লাগিল। আচ্ছন্নের মত সে বসিয়া রহিল। কখন যে তাহার চোখ বুজিয়া আসিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিল, তাহাও সে জানে না।

অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ খুলিল, তখন মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে। অদ্ভুত এক প্রেরণায় সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল, নিমাই ঘটক তাহার অপেক্ষায় হোটেলের সামনে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছে।

নিমাই যে, কি খবর ?

বড় দুঃসংবাদ। হরিদা কলেরায় মারা গেছেন, আর কুন্তলাদি সহমৃতা হয়েছেন তাঁর সঙ্গে।

সে কি!

হ্যাঁ। প্রমথ ডাক্তার চ'লে যাওয়ার পর থেকে গ্রামে তো আর ডাক্তার নেই। আপনি যেদিন আসেন, সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা হরিদার কলেরা হয়, পাড়ার কে যেন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছিল, কিছু হয় নি। কেউ কিছু জানে না। ভোরে ঝকুসু দেখতে পেলে, বাড়ির ভিতর থেকে ধোঁয়া আর গন্ধ বেরুচ্ছে। ডাকাডাকি করা হ'ল, কোনও সাড়া নেই। কপাট ভেঙে ঢুকে দেখা গেল, উঠনে চিতা জ্বলছে। ঘি আর ঘিয়ের খালি টিন প'ড়ে রয়েছে। বাড়িতে যত কাঠ কাপড়চোপড় ছিল, তাই নিয়ে চৌকির উপর চিতা সাজিয়েছেন কুন্তলাদি, আর তাইতেই পুড়েছেন স্বামীর সঙ্গে, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন নি, কেউ জানতে পারে নি।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুলিস এ নিয়ে গোলমাল করছে আপনার একবার যাওয়া দরকার।

নিশ্চয়। চল।—বলিয়াই চলিতে শুরু করিল।

এখন তো ট্রেন নেই।

এ কথা শঙ্কর শুনিতে পাইল কি না বোঝা গেল না।

সে দ্রুতবেগে চলিতেই লাগিল।

সমাপ্ত

সপ্তর্ষি

হংস-শুভ্র

।। এক ।।

শ্রীযুক্ত হংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায় চিঠিখানা পেয়ে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। বিরক্ত হলে তিনি গম্ভীর হবার চেষ্টা করেন। বিরক্তি প্রকাশ করাটা, তাঁর মতে, হার-স্বীকার করারই নামান্তর। কার সাধ্য তাঁকে বিচলিত করতে পারে? তাঁকে, যাঁকে মহাকালের নিষ্ঠুর প্রহার পর্যন্ত একচুল বিচলিত করতে পারেনি, তিন-তিনজন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু যিনি গম্ভীরভাবে সহ্য করেছেন—একফোঁটা চোখের জল না ফেলে, এত বড় পরিবারের এত বিভিন্ন রকম বিপর্যয় যিনি অবিচলিত হয়ে সহ্য করছেন, ধৈর্য হারাননি ক্ষণকালের জন্য, সারা জীবনের আদর্শ চোখের সামনে ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েও যাঁকে কাবু করতে পারেনি—হঠাৎ কুন্দর মুখখানা মনে পড়ল তাঁর, গড়গড়ার ডাক বন্ধ হয়ে গেল, গম্ভীরভাবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন তিনি।

সত্যি, বেশ বড় পরিবার তাঁর--এ অঞ্চলে শুভ্র-পরিবার নামে খ্যাত। পিতামহ যোগীশ্বর মুখোপাধ্যায় শুদ্ধ শান্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন বলেই বোধ হয় একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন শিব-শুভ্র। তারপর থেকেই এ বংশের সকলের নামের সঙ্গে 'শুভ্র' শব্দটি যুক্ত হয়ে আসছে, এমনকি মেয়েদের নামের সঙ্গেও আ-কার যোগ দিয়ে--কুন্দ-শুভ্রা, ইন্দু-শুভ্রা, শুক্তি-শুভ্রা, মুক্তা-শুভ্রা ইত্যাদি।

শিব-শুভ্র ভদ্রলোক ছিলেন যদিও, কিন্তু ঠিক শিব-প্রকৃতির ছিলেন না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি মৃত্যুকালে নগদ বিশ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাঁর দুই পুত্র—হংস-শুভ্র ও সোম শুভ্রকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক যোগীশ্বরের পুত্র কি উপায়ে এত বড় সম্পত্তি হস্তগত করলেন, তার ইতিহাস এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর, এইটুকু শুধু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ইংরেজ-শাসনের প্রথম আমলে যেসব কৃতী পুরুষ এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের যোগ স্থাপনের মধ্যবর্তিতা করে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র—হংস এবং সোম, সে-যুগের লক্ষ্মী-সরস্বতীর সে-যুগীয় প্রভাব পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রায়। সাহেব মাস্টারের কাছে সাহেবী কেতায় কেবল ইংরেজী লেখাপড়াই শেখেননি, পণ্ডিতের কাছে শিখেছিলেন সংস্কৃত, ওস্তাদের কাছে শিখেছিলেন গান-বাজনা, পালোয়ানের কাছে শিখেছিলেন কুস্তি, গুরুজনদের কাছে শিখেছিলেন সহবত এবং সে-যুগের 'ইয়ংবেঙ্গল'-দের সাহচর্যে শিখেছিলেন সে-যুগের রাজনীতি-চর্চা। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা হংস-শুভ্রকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তখনকার কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু, সুরেন বাঁড়ুজ্জেরা যে রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রভাব হংস-শুভ্র এড়াতে পারেননি। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মন এসব ব্যাপারে সাড়া দিত। আই. সি. এস.

সুরেন বাঁড়ুজ্জের যখন চাকরি গেল (আইনত যদিও সেটা তাঁর নিজের ত্রুটির জন্যই), তখন তা নিয়ে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে যে ক্ষোভ মথিত হয়ে উঠেছিল, কিশোর হংস-শুভ্রের মনেও ছাপ পড়েছিল তার। সেই অল্প বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন যে, যে অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের চাকরি গেল সে অপরাধ হামেশাই সকলে করে থাকে, তিনি শাস্তি পেলেন স্বাধীনচেতা বাঙালী বলে। কিন্তু এ নিয়ে আইনসঙ্গত আন্দোলন করেও যখন কোনও ফল হল না, তখন হংস-শুভ্রের মনে ধারণা হয়েছিল যে, দোষটা বোধ হয় সুরেনবাবুরই বেশি, কারণ বিলেতের সাহেবেরাও যখন সব শুনে এর কোনও প্রতিকার করলেন না, এমনকি ব্যারিস্টারি পড়বারও অনুমতি দিলেন না তাঁকে, তখন অপরাধটা লঘু নয় নিশ্চয়ই। সাহেবদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কল্পনাই কেউ করত না তখন। পরে এই সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে এসে-(তাঁর কাছে ফ্রী চার্চ কলেজে পড়েছিলেন তিনি)--তাঁর বাগ্মিতা-বিদ্যাবত্তা-স্বদেশপ্রাণতার যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তা আজও যদিও তাঁর জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে; কিন্তু একজন খাঁটি সাহেবের তুলনায় যে তিনি নিম্নতর স্তরের জীব—এ বোধের জন্য লজ্জিত হননি তিনি তখন, কারণ দেবতার সঙ্গে মানুষের তুলনায় দেবতাকে উচ্চতর স্থান দিতে কারও লজ্জা হয় না। সদ্য-আগত পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে সকলেই মুগ্ধ তখন। তখন রামগোপাল, রাধানাথ, রসিকমোহনরাই সকলের আদর্শ। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মত লোকেরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগানে পঞ্চমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রদীপ্ত প্রতিভায় জ্বলছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উদীয়মান। রাধাকান্তদেব, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের দল শিক্ষিতসমাজে উপহাসেরই খোরাক যোগাতেন তখন। স্বয়ং সুরেনবাবুই মনেপ্রাণে সাহেব ছিলেন, তাঁর বন্ধু রমেশ দত্ত, আনন্দমোহন বসুও। তখনকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সমাজের উন্মুখ মনোবৃত্তিকে রূপ দেবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত করেছিলেন, তাতেও যেসব বক্তৃতা হত তা ইংরেজী কেতায়, ইংরেজী ভাষায়। তখনকার দেশপ্রেমের নিদর্শন ছিলেন রাণা প্রতাপ নয়, ম্যাৎসিনি। তাঁর বিপ্লববাদকে গ্রহণ করবার কল্পনাও কেউ করত না অবশ্য—তাঁর স্বদেশ-প্রেম, তাঁর আত্মত্যাগ নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তখন সবাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলেই যে তাঁরা প্রত্যেকে ইংরেজের দাসখত লেখা গোলাম ছিলেন, ঠিক তা নয়। বস্তুত একটা জাগরণের সাড়াই জেগেছিল তখন দেশে—প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের আতপ্ত আবহাওয়ায় একটা অস্পষ্ট অধীরতাই যেন অনুভব করছিল সকলে এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশও করে ফেলেছিল তা। সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলের উত্তেজনাটা আজও ভোলেননি হংস-শুভ্র। মারকুইস অব সলস্‌বেরি আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার বয়স বাইশ থেকে কমিয়ে উনিশ করে দিয়েছিলেন কেবল ভারতীয়দের জন্য। তখনকার কালে প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিল--রাজ সরকারের অধিক-সংখ্যক চাকরি পাবার জন্যে আবেদন-নিবেদন করা। সলস্‌বেরির এই ব্যবহারে দেশের লোক ক্ষেপে উঠলেন যেন। সিভিল-সার্ভিস-বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ এই সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়ালকে দেশব্যাপী আন্দোলন করে তুললেন। কংগ্রেস হবার বহুপূর্বে এই আন্দোলনেই সর্বপ্রথম নিখিল ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায়। সেই সূত্রে হংস-শুভ্র প্রথমে, নাম শুনেছিলেন পাঞ্জাবের দয়াল সিং মাঝিটিয়ার, পণ্ডিত রামনারায়ণের, ডাক্তার সূরযবলের, উকিল কালীপ্রসন্ন রায়ের। সেদিনকার সার সৈয়দ আহমেদ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, রাজা আমীর

হোসেন, বাবু ঐশ্বর্যনারায়ণ, বাবু হরিশ্চন্দ্র, রামকালী চৌধুরী, বিশ্বনারায়ণ মাণ্ডলিক, কাশীনাথ তেলাং, ফিরোজ শা মেটা, রাণাডে-কে এখনও দেশের লোক মনে করে রেখেছে কি না হংস-শুভ্র জানেন না; কিন্তু তখন এঁরাই ছিলেন দেশের অগ্রণী এবং এঁরা সবাই সেদিন বাঙালী সুরেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধিত করে যেভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তা হংস-শুভ্রের অন্তরে আজও স্পন্দন তোলে। আজকালকার বাঙালী-বেহারী হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মত কুৎসিত জিনিস তখনকার দিনে ছিল না—সার সৈয়দ অহম্মদ যদিও মুসলমান-সম্প্রদায়েরই মুখপাত্র ছিলেন এবং বিশেষ করে মুসলমানদেরই উন্নতির জন্যে চেষ্টা করতেন, তবু তিনি সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলে সই করেছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই প্রতিবাদ করেছিল ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচারের। এই সিভিল সার্ভিস আন্দোলন ভারতেই নিবদ্ধ থাকেনি কেবল। লালমোহন ঘোষ এ নিয়ে বিলেত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। টাকা দিয়েছিলেন মহারানী স্বর্ণময়ী। ব্রিটিশ গর্ভমেন্ট দেশের দাবি মেনে নিয়ে উনিশ বছর কেটে যখন বাইশ বছর করলেন, তখন ইংরেজদের ন্যায়পরতার ওপর বিশ্বাস আরও অগাধ হয়ে উঠল সকলের। ভারতবর্ষের সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষিত-সমাজের প্রথম বাঙ্‌ময় বিদ্রোহ যে কর্তৃপক্ষের ভাল লাগেনি, তার প্রমাণ মিলল অবশ্য কিছুদিন পরেই। সলস্‌বেরি কিছুদিন পরেই পাঠালেন লর্ড লিটনকে, দুটি সাংঘাতিক 'অ্যাক্ট' তাঁর হাতে দিয়ে—ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং আর্মস্‌ অ্যাক্ট। সাধারণী', 'সমাজ দর্পণ', 'সোমপ্রকাশ', 'হিন্দু হিতৈষিণী' উঠে গেল। পুলিস সবার হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নিলে। হংস-শুভ্রের বাড়িতে যতগুলো বন্দুক, সড়কি, বল্লম ছিল সমস্ত বাজেয়াপ্ত হল। দেশী ইংরেজী কাগজগুলোতে কড়া-মিঠে মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। হতভম্ব হয়ে পড়ল যেন সবাই। কিন্তু দেশের শিক্ষিত-সমাজের মনে ইংরেজ-ভক্তি তখনও অটুট। হংস-শুভ্রেরও মনে হল যে, যে-ইংরেজ সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রকাশ্য ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করেনি, তারা নিশ্চয়ই অকারণে ভারতবাসীকে এমন নিরস্ত্র ও নির্বাক করে রাখবে না। নিশ্চয়ই ভেতরে কোন একটা কারণ আছে, হয়তো আফগান-যুদ্ধ, হয়তো দাক্ষিণাত্যের কৃষক-বিদ্রোহ বা ওই রকম একটা কিছু। ওপরে 'মুভ' করলেই যথাকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। 'মুভ' করাও হল। এই সময়ে একটা বিষয়ে তাঁর খটকা লেগেছিল, দেশের জমিদার-সম্প্রদায় এ বিষয়ে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। জমিদারদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একেবারে চুপ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ভোট দিয়ে এলেন। কাউন্সিলে তখন জনসাধারণের ভোট নিয়ে সভ্য নির্বাচিত হত না, গভর্ণমেণ্ট যাঁকে মনোনীত করতেন তিনিই সভ্য হতেন। এ রকম সভ্য যে কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করবেন, এ আশা দুরাশা হলেও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যবহারে দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি। বিরোধিতা করেছিলেন রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি। হংস-শুভ্রের কাছে ওই খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি আজও পূজ্য হয়ে আছেন। তাঁর মত ইংরেজীনবিশ অথচ ভারতীয়, তাঁর মত স্পষ্টবক্তা অথচ মিষ্টভাষী, তাঁর মত বিধর্মী অথচ ধর্মপ্রাণ লোক আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না হংস-শুভ্রের। তখন যদিও পলিটিকাল সভা রাজদ্রোহসূচক বলে গণ্য হত না, তবু ইনি এবং রেভারেণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড থাকাতে সবাই যেন নির্ভয় হয়েছিল—তা ছাড়া এই দুজন গণ্যমান্য খ্রীষ্টান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ-সভায় যোগ দেওয়াতে প্রতিবাদের মূল্যও ঢের বেড়ে গিয়েছিল। টাউন-হলে যে সভা হয়েছিল, তার ছবিটা এখনও মনে পড়ে হংস-শুভ্রের। তিলধারণের স্থান

ছিল না। তখন সবাই, এমনকি রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। সি আই. ডি বলে কিছু ছিল না। সেদিনকার সভার ভিড়ে আর উত্তেজনায় হংস-শুভ্র সোনার ঘড়ি, ঘড়ির-চেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে চিঠি লেখা হয়েছিল গ্ল্যাডস্টোনকে। চিঠি মুসাবিদা করেছিলেন সুরেন ব্যানার্জি, সংশোধন করেছিলেন কে. এম. ব্যানার্জি। স্বয়ং গ্ল্যাডস্টোনকে চিঠি লিখতে পারাটাই মস্ত বড় একটা পৌরুষ বলে মনে হয়েছিল সেদিন এবং তাকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশে যে উত্তেজনা জেগেছিল, আজকালকার সস্তা ওপেন লেটারের ছড়াছড়ির দিনে সে উত্তেজনার মূল্য কেউ বুঝবে না। ফল ফলেছিল, সে চিঠির, কিন্তু আংশিকভাবে। গ্ল্যাডস্টোন তাঁর 'মিড্‌লোথিয়ান ক্যাম্পেনে' দুটো অ্যাক্টের বিরুদ্ধেই যদিও বক্তৃতা করেছিলেন, কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল, প্রাইম মিনিস্টার গ্লাডস্টোন একটা অ্যাক্টকেই বাতিল করেছেন। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট উঠে গেল, আর্মস্‌ অ্যাক্ট উঠল না। রিপন সাহেব এই শুভ-বার্তাটি নিয়ে এলেন। এই উপলক্ষ্যে যেসব কৃতজ্ঞত-গদগদ সভাসমিতি হল, তাতে হংস-শুভ্র খুব প্রসন্নচিত্তে যোগ দিতে পারেননি! আর্মস অ্যাক্টটা থেকে যাওয়াতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তিনি। ক্ষোভ কিন্তু বেশিদিন রইল না। লর্ড রিপনের মত বড়লাটকে বেশিদিন অগ্রাহ্য করে থাকা সম্ভব ছিল না। সত্যিই তিনি ভারতের বন্ধু ছিলেন। তাঁর আমলেই স্থাপিত হয়েছিল লোকাল সেল্‌ফ্‌-গভর্নমেণ্ট। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি গড়বার ধুম পড়ে গেল। সুরেনবাবু এই নিয়ে মেতে উঠলেন একেবারে । স্বায়ত্তশাসনের কিঞ্চিৎ অধিকার পেয়ে শিক্ষিত-সমাজ আকাশের চাঁদই হাতে পেল যেন। হংস-শুভ্রকেও এই সময় একটা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার্‌ম্যানগিরি করতে হল দিনকতক। প্রথম প্রথম তাঁরও মনে হয়েছিল, সত্যি সত্যি আমরা স্বাধীনতার পথে কিছুটা এগোলাম বুঝি। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। লোকাল সেল্‌ফ্‌-গভর্নমেণ্টের ওপর নয়, দেশের লোকের ওপর। মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র করে যে জঘন্য দলাদলি স্বার্থপরতা নীচতা শঠতা অসাধুতা কুৎসিত আকারে আত্মপ্রকাশ করল, তা আরও বেশি করে তাঁর ইংরেজ-ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলল যেন। ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা করে নেটিভদের অযোগ্যতাই যেন তিনি দেখতে পেলেন প্রতি পদে। বিরক্ত হয়ে শেষে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্ক ত্যাগই করলেন। তাঁর ধারণা হল, এমন সুযোগ পেয়েও যখন দেশের লোক কিছু করতে পারলে না, তখন এদের কোন আশা নেই। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন ইংরেজ হবার। মাঝে মাঝে দু-একটা বদখত ইংরেজ তাঁর মেজাজ বিগড়ে দিত অবশ্য। একটা নীলকর সাহেব এবং দুর্দান্ত ম্যাজিস্ট্রেটের জ্বালাতেই নিজের জমিদারি বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি; কিন্তু ইংরেজ-ভক্তি কমেনি তাঁর। কারণ আদালতে মকদ্দমা করে উক্ত নীলকর সাহেবের কাছে তিনি খেসারত আদায় করে ছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেও বদলি করিয়েছিলেন। ব্রিটিশ জাস্টিসের ওপর ভক্তি অচলা ছিল তাঁর। সে ভক্তিও অবশ্য কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছিল সুরেন বাঁড়ুজ্জের কোর্ট-কন্‌টেম্‌প্‌ট কেসে। কিন্তু সেটাকেও ব্যক্তিবিশেষের দোষ বলেই মনে হয়েছিল—ইংরেজ জাতের ওপর চটবার কোন কারণ ঘটেনি। বরং এ নিয়ে আন্দোলন করলে যে ফল হবে, এও তাঁর আশা ছিল। আন্দোলন হয়েওছিল খুব। শালগ্রাম-শিলার ওপর যে খুব একটা ভক্তি ছিল তা নয়, কিন্তু জাস্টিস নরিস সেটাকে আদালতে নিতে বাধ্য করাতে সকলের আত্মসম্মানে যেন ঘা লেগেছিল। সুরেনবাবু তা নিয়ে তাঁর 'বেঙ্গলী'তে

যখন বেশ কড়ারকম একটা 'লিডারেট' লিখলেন, তখন সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। এই অপরাধে তাঁর দু মাস জেল হয়ে গেল। সমস্ত দেশে যেন ঝড় উঠল একটা। যেদিন তাঁর বিচার হয়, আদালত-প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছিল সেদিন। কলেজের সমস্ত ছেলেরা গিয়েছিল, হংস-শুভ্রও ছিলেন সে ভিড়ের মধ্যে। যখন রায় বার হল, তখন সে কি উদ্দাম উত্তেজনা! আদালতের জানলার একটি কাচও অক্ষত থাকেনি। শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্রও সাড়া জেগেছিল। সুরেনবাবুর অপমান সারা ভারতেরই অপমান বলে গণ্য হয়েছিল সেদিন। জাতীয়তাবোধ জাগছিল ধীরে ধীরে। জেল থেকে বেরিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আরও জাগিয়ে তুললেন সেটাকে। কিছুদিন আগে থেকে ইলবার্ট বিল নিয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী একটা গাত্রদাহ ছিলই—এ সম্পর্কে অ্যালবার্ট হলে সুরেনবাবুর বক্তৃতা ভোলবার নয়, এই সুরেনবাবুর অপমানে সারা দেশ যেন জেগে উঠল। সুরেনবাবু আর একবার ঘুরে এলেন ভারতের নানা স্থানে, ন্যাশনাল ফাণ্ডের জন্যে টাকা উঠল। জাস্টিস নরিসের বিশেষ কিছু হল না যদিও, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে দেশের লোকের আত্মসম্মানবোধ প্রবুদ্ধ হল যেন। ঠিক এর পরই বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স। সভাপতিত্ব করলেন আনন্দমোহন বসু। এ ঠিক বিদ্রোহীর সভা নয়, উপযুক্ত পুত্র পিতার কাছে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে বৈষয়িক ব্যাপারে অধিকার দাবি করে যে ভাষায়, ভারতবাসীরাও ঠিক তেমনই করে অধিকার দাবি করেছিলেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে। দাবি করেছিলেন—শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাবার, স্বায়ত্তশাসনের, শিক্ষাবিস্তারের, শাসনকর্তা ও বিচারকের কর্তব্য পৃথক পৃথক লোকের হাতে দেওয়ার এবং অধিক-সংখ্যক ভারতবাসীকে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করবার। এর কিছুদিন পরে যা ঘটল, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সবাই। ইংরেজরা সত্যিই যে এই অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করতে এসেছেন, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও। কিছুদিন আগে রিপন সাহেব চলে গেছেন, এসেছেন লর্ড ডাফরিন। তাঁর আনুকূল্যে এবং হিউম সাহেবের প্রেরণায় বম্বেতে বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ডব্লিউ. সি বনার্জি হলেন তার সভাপতি, এবং ইংরেজী ভাষায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-বিষয়ে যা বললেন, তাই তখনকার দিনে কাম্য ছিল—ইংরেজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতকে সভ্য করা। এই-ই সকলে তখন চাইত এবং হবে বলে বিশ্বাস করত। হংস-শুভ্রেরও ধারণা ছিল, ভারতের উন্নতি-সৌধ উঠবে রাজভক্তির বনিয়াদের ওপর এবং সে সৌধ অলঙ্কৃত হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে। হোয়াইট ম্যান্‌স বার্ডেনের আন্তরিকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর। তাই কংগ্রেসের প্রথম কয়েক বৎসর তিনিও নিষ্ঠাভরে দেশের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে এই বার্ষিক পিকনিকে যোগ দিতে যেতেন এবং রাজভক্তির সঙ্গে দেশভক্তি 'পাঞ্চ' করে যে বক্তৃতা-সুরা প্রস্তুত হত তারই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন সারাটা বছর। এ নেশাও কিন্তু ছুটে যেতে লাগল মাঝে মাঝে। লর্ড ডাফ্‌রিন যাবার সময় কংগ্রেসকে ঠাট্টাই করে গেলেন; শিক্ষিত সমাজকে বলে গেলেন—'মাইক্রসকপিক মাইনরিটি'। দিন কতক পরে এক সারকুলারে গভর্নমেন্ট-অফিসারদের কংগ্রেস যোগ দিতে মানা করা হল। এলাহাবাদে কংগ্রেস করাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল প্রায়—তাঁবু গাড়বার জায়গাই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু এঁরা ভগ্নোদ্যম হলেন না। ইংরেজদের ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার ওপর আস্থা রেখে তাঁদের কন্‌স্টিট্যুশনাল আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন মোলায়েম ভাষায় এবং

এর ফলেই সম্ভবত শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্বাচিত জনকয়েক দেশী সভ্যের স্থান হল, শিক্ষারও বিস্তার হল কিছু। কিন্তু কিছু দিন পরেই এলেন লর্ড কার্জন, তারপর ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট এবং তারই পিঠোপিঠি বেঙ্গল পার্টিশন। হংস-শুভ্রের সব স্বপ্ন ভেঙে গেল যেন হঠাৎ। তিনি আরও হতাশ হলেন পরবর্তী নেতাদের সুর শুনে। তিলক নিজেকে 'ন্যাশনাল' বলে ঘোষণা করলেন এবং যে 'নেটিভ' কুপ্রথাগুলোকে এতকাল তাঁরা বিদ্রূপ করে এসেছেন, সেইগুলোকে আস্ফালন করেই 'ন্যাশনালিজ্‌ম' জাগাতে চাইলেন সকলে। তিনি বাল্য-বিবাহের সপক্ষে দাঁড়িয়ে কন্‌সেণ্ট-বিলের বিরোধিতা করলেন, গো-হত্যা-নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন, গণেশ-পূজা নিয়ে মাতলেন, এবং ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, নেল্‌সন, নেপলিয়নকে ছেড়ে শুরু করলেন শিবাজী-উৎসব। বাংলা দেশেও ধর্ম-বাই জেগেছিল কিছুদিন আগে—ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছিল অনেকে, পরমহংসকে নিয়ে নরেন দত্তর দল হৈ-হৈ করছিল। শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনেরা সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করছিলেন। এসব জিনিস হাসির খোরাক যোগাত হংস-শুভ্রের বিলিতী মদের আড্ডায়। কিন্তু এই সব জিনিসেরই পলিটিকাল রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হল, এই সব কুসংস্কারই যেন নূতন চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে অরন্ধন আর রাখীবন্ধনের হিড়িকে, কালীপূজো করবার আর 'সন্তান' হবার আগ্রহে। বঙ্গভঙ্গের জন্যে আন্দোলন করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি, সাময়িকভাবে বিদেশী জিনিস বয়কট করবার চেষ্টাও যে করেন নি তা নয়, কিন্তু বিদেশী সভ্যতাকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে পিসিমা সাজতে প্রস্তুত ছিলেন না, মোটেই। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যে আর্যামি আত্মপ্রকাশ করছিল, তা কিছুতেই মানতে পারছিলেন না তিনি। তখনকার স্বদেশী সভা, সে সভা ভেঙে দেবার জন্যে পুলিসের বলপ্রয়োগ, রাস্তায় রাস্তায় স্বদেশী গান, পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা, সেকালের 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্‌', ফুলার সাহেবের হুমকি, সুরেন বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতা তাঁর দেশভক্তিকে খুবই উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, যে স্বদেশী তখন বাংলা দেশের আকাশে-বাতাসে, যে স্বদেশীতে তাঁর নিজের বন্ধুরা মেতেছেন, সে স্বদেশীকে তিনিও অস্বীকার করতে পারেননি—কিন্তু প্রথম যৌবনে যে কব্‌ডেন ডিজ্‌রেলি বার্ক শেরিডন, যে শেক্‌স্‌পিয়র মিল্টন স্কট ডিকেন্স, যে ম্যাল্‌থস মিল কাণ্ট হেগেল, যে নিউটন ডারউইন্‌ ওয়াট কেল্‌ভিন তাঁর চিত্তকে আলোকিত করেছিল, এই নতুন ঝড়ের ঝাপটায় তাদের শিখা নিবে যাবে—এ কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। মাইকেলের কাব্য পড়ার পর হেমচন্দ্রের 'বাজ্‌ রে শিঙ্গা' ও যেমন তাঁর ভাল লাগল না, দেবেন ঠাকুরের ছেলের মিহিসুরের ছড়াও তেমনই কানে লাগল না। ঝড় এলে লোকে যেমন ঘরদোর সামলাতে ব্যস্ত হয়, তিনিও তেমনই নিজের আদর্শ বাঁচাতে ব্যস্ত হলেন। ভিক্টোরীয় সভ্যতার যে উদাত্ত গম্ভীর আদর্শে তিনি মানুষ, কোন কারণেই তা যে বর্জন করা সম্ভব এ কথা ভাবতেই পারলেন না তিনি। মুখে স্বীকার করতে না পারলেও মনে মনে সাহেবই তখনও তাঁর কাছে দেবতা ছিল। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যখন 'বম' পড়ল মজঃফরপুরে। কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে লাগল না—মারা গেলেন দুজন নিরীহ মেমসাহেব। এর পর আর কংগ্রেসের সঙ্গে প্রাণের যোগ রাখা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। কংগ্রেসের খাতায় অবশ্য নাম রইল, কিন্তু 'মডারেট' দলে। এই মডারেটরাও কিছুদিন পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের নতুন দল গড়লেন—গোখেলের সঙ্গে তিলকের বনল না।

তাতে যোগ দেবার আর উৎসাহ পাননি হংস-শুভ্র। নিজের আদর্শ নিয়ে একান্তভাবে নিজের পারিবারিক জীবনেই নিবদ্ধ হয়ে রইলেন তিনি। দেশে আন্দোলন অবশ্য চলছিলই এবং তার ফলাফলও শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। বয়সও বাড়ছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর ইংরেজ-প্রীতি অনেকটা কমে গেছে যেন। ইংরেজ-ভক্তির যে দুর্গে তিনি আত্মরক্ষা করছিলেন, ইংরেজরা নিজেরাই একটার পর একটা গোলা ছুঁড়ে সে দুর্গকে ভূশায়ী করে ফেললেন, ক্রমে। সিডিশাস মীটিং অ্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, মর্লি-মিন্টো বিলের কৃপণতা, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সেই আইনটার জোরে বিনা-বিচারে দেশের লোককে আটক রাখা—প্রত্যেকটি এক-একটি গোলা। খবরের কাগজের একটি প্রবন্ধ লেখার জন্যে তিলকের ছ'বছর জেল হয়ে গেল—ম্যাণ্ডালেতে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। বাংলা দেশের কৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিনবিহারী দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুবোধ মল্লিক, শচীন বোস, সতীশ চাটুজ্জে, ভূপেন নাগ, অরবিন্দ ঘোষ সবাই জেলে। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্', সব উঠে গেল। দেশ ছেয়ে গেল সি. আই. ডি-র গুপ্তচরে। কিছুদিন পরে হঠাৎ আর একটা জিনিসও আবিষ্কার করলেন। তাঁর সমসাময়িক যে-সব নেতা বড় বড় স্বদেশী ছিলেন, এখন তাঁদের অধিকাংশই বড় বড় চাকরে হয়েছেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার থেকে শুরু করে মাদ্রাজের যত আয়ার এবং নায়ারের দল, সুরেন বাঁড়ুজ্জে, এ. চৌধুরী. এস. পি. সিন্‌হা, প্রভাস মিত্তির, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, হাসান ইমাম—সকলেই গভর্নমেন্টের বড় বড় কর্মচারী। মনে হল, এই মোক্ষলাভের জন্যেই যেন এঁরা এতদিন আন্দোলন করছিলেন। ফিরোজ শা মেটাও 'সার' হলেন। হলেন না কিন্তু কেবল গোখলে। তিনিই শুধু গোপালকৃষ্ণ গোখলে থেকে গেলেন। কিন্তু গোখলে কটা আছে? গোখলের সগোত্র যাঁরা, গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করেছিলেন বলে তাঁরা সবাই জেলে। এর কিছুদিন পরে উপর্যুপরি কয়েকখানা বই তাঁর হাতে এসে পড়ল। ওয়েণ্ডার্‌বার্নের লেখা হিউমের জীবনী, ডব্লিউ. সি. বনার্জির লেখা 'ইনট্রোডাক্‌শন টু ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স', লায়ালের লেখা 'লর্ড ডাফ্‌রিনের জীবনচরিত'। পড়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন, আমাদের দেশকে উদ্ধার করার জন্যে নয়, আমাদের দেশের উদীয়মান স্বাধীনতা-স্পৃহাকে একটা ভদ্র গণ্ডিতে শৃঙ্খলিত করে রাখবার জন্যেই হিউম সাহেব লর্ড ডাফ্‌রিনের সঙ্গে পরামর্শ করে কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিলেন। এর পর ইংরেজদের ওপরও আর ভক্তি রাখা গেল না। কিন্তু কংগ্রেসেও আর ফিরতে পারলেন না তিনি—তাঁর কাছে সমস্তই যেন বাজে হুজুক বলে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, এরা সব সুবিধাবাদীর দল, চাকরি বা বকশিশ পেলেই সব লম্ফঝম্প থেমে যাবে এদেরও।

ইংরেজ এবং দেশের লোক—দুয়েরই ওপর আস্থা হারিয়ে হংস-শুভ্রের অবলম্বনহীন মন যখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন হঠাৎ একদিন নজর পড়ল বুড়ো দারোয়ানটার ওপর। দেশের বড়লাট কে হল, না হল, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই ওর। ও ঠিক ভোরবেলা উঠে গঙ্গাস্নান করে, তুলসীতলায় জল ঢালে, পূজোপাঠ করে, রামায়ণ পড়ে, তিলক কাটে, ভজন গায়। বড়লাট রিপনই হোক বা মিন্টোই হোক, ওর স্বাধীনতা হরণ করতে পারেনি কেউ। বাইরের উত্তেজনার অভাবে আমাদের মন যেমন ক্ষণে ক্ষণে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে, ওর তেমন হয় না। ওর দিনচর্যা ঠিক আছে—কার্জনের আমলেও যেমন ছিল, হার্ডিঞ্জের আমলেও তেমনিই আছে। অথচ মানুষ হিসেবে ও কারও চেয়ে ছোট নয়। হংস-শুভ্র ওকে যত বিশ্বাস

করেন, নিজের ছেলে শশাঙ্ককে তত করেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, ভুল করেছি এতদিনে—তিলকই ঠিক বলেছিল। হিন্দুধর্মই আমাদের সনাতন আশ্রয়—ওই আমাদের 'ন্যাশনালিজম্', বাদ বাকি "সব ঝুটা হ্যায়"। গীতা মহাভারত পড়ে সে মত আরও দৃঢ় হল। প্রাচীন হিন্দুধর্মের সনাতন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অবশেষে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। যেগুলোকে আগে কুসংস্কার বলে মনে হত, সেই গুলোরই নূতন নূতন অর্থ যেন প্রতিভাত হতে লাগল তাঁর মানসচক্ষে। উগ্র সাহেব ছিলেন যিনি একদিন, খানসামা-বাবুর্চি-ডিনার-লাঞ্চ-স্যুট সিগারেট-সর্বস্ব সাহেবই নয়, মনে-প্রাণে সাহেব, স্ত্রী কাঞ্চনমালাকে মেম মাস্টারনী রেখে মেমসাহেব করবার চেষ্টা পর্যন্ত যিনি করেছিলেন (সফল হননি যদিও, কাঞ্চনমালা পানের বাটা ত্যাগ করতে রাজী হলেন না কিছুতে), ছেলেদের বিলেত পাঠিয়েছিলেন, মেয়েদের কলেজে পড়িয়েছিলেন, কোর্টশিপ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন, বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পর্যন্ত ত্রুটি করেননি, তিনি শেষ বয়সে একেবারে উলটে গেলেন। এখন পাঁজি ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না। নামাবলী গায়ে, কানে খড়কে গোঁজা, তর্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি অলঙ্কৃত এই লোকটির মধ্যে প্রাক্তন মিস্টার এইচ. এস. মোকার্জিকে খুঁজে বার করা সত্যিই অসম্ভব এখন।

একই শিক্ষার ফলে এবং এক রকম আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে দু ভাই কিন্তু ঠিক এক রকম হননি। সোম-শুভ্রের ওপর এই শিক্ষার ফল ফলে ছিল একটু ভিন্ন রকমের। তিনি ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সে-যুগের ব্রাহ্মধর্ম-গ্রহণের যে দুর্ভোগ, তা সবই ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। পিতা বেঁচে থাকলে হয়তো ত্যাজ্যপুত্রই করতেন, বিষয় থেকেও বঞ্চিত হতে হত, কিন্তু সে লাঞ্ছনাটা সইতে হয়নি, বিষয়ের অর্ধেক ভাগ ঠিকই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য তাঁকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়েছিল। উগ্র সাহেব হংস-শুভ্র ব্রাহ্মদের দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না, বিশেষ করে কেশব সেনের মেয়ের বিয়ের পর থেকে। তাঁর কেমন যেন ধারণা জন্মেছিল, ওরা সবাই ভণ্ড। দাড়ি রেখে চশমা পরে বেদ-উপনিষদের মুখস্থ বুলি আওড়ায় কেবল, মনেব এতটুকু প্রসারতা নেই, স্বতঃস্ফূর্ত জীবনী-শক্তি নেই, চিবিয়ে চিবিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে চারদিকে বাঁচিয়ে ওজন-করা কথা বলার প্রয়াসেই ওদের জীবনী-শক্তি নিঃশেষ হয়েছে। হয়তো হংস-শুভ্রের ধারণাটা ভুল, কিন্তু সেটা তাঁর বদ্ধ ধারণা হওয়াতে কিছুতেই তিনি সোম-শুভ্রের আকস্মিক ধর্মান্তর-গ্রহণকে ক্ষমার চক্ষে দেখেননি। সোম-শুভ্রের পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্নই করতে হয়েছিল। তাঁর নিজের পরিবারও গড়ে ওঠেনি, কারণ তিনি বিবাহই করেননি। বিহার-অঞ্চলে খানিকটা জমি কিনে কৃষিকর্ম করেই কাটিয়ে দিয়েছেন প্রায় সারা জীবনটাই। তাঁর এক কলেজী বন্ধু সুরেশ্বর চক্রবর্তীর পরিবারের সঙ্গেই সোম-শুভ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সুরেশ্বরও ব্রাহ্ম। প্রায় বছর দশেক আগে তিনি মারা গেছেন একটিমাত্র ছেলে রেখে। ছেলেটির মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। কৃষিকর্ম এবং এই পিতৃমাতৃহীন পরমানন্দই সোম-শুভ্রের মনের আশ্রয় ছিল। পরমানন্দকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে সে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন একটি মনোমত পাত্রীর সঙ্গে তার বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন। পাত্রী অনামিকা তাঁর এক বন্ধুরই মেয়ে। এদের কেন্দ্র করে সোম-শুভ্রের জীবন এক রকম কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিজের ভাইপো-ভাইঝিদের খবর তিনি নিতেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। শশাঙ্ক-শুভ্র, মৃগাঙ্ক-শুভ্র এবং কুন্দ-শুভ্রাকে তিনি কোলে করেছেন, কিন্তু বাকি কজনের—সিতাংশু-শুভ্র, সুধাংশু-শুভ্র, ইন্দু-

শুভ্রা—এদের সংস্পর্শ পাননি তিনি। সিতাংশু জন্ম হবার আগেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর থেকেই ছাড়াছাড়ি। দেখা হয়েছে অবশ্য বহুবার। সেদিনও শশাঙ্ক তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল। হিমাংশু যেবার ডি. এস-সি হল, সেবার সে নিজেই এসে কাকামণির সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। সিতাংশু ব্যারিস্টারি পাস করে কলকাতায় এসে নামল যেদিন, সেদিন তিনি নিজেই স্টেশনে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। সুধাংশুও অক্সফোর্ড থেকে বরাবর চিঠি লিখত তাঁকে। হিমাংশু, সিতাংশু কেউ নেই আজ, সব অকালে মারা গেছে। কুন্দও নেই, হয়তো সেও মরেছে, বেঁচে থাকলেও ভদ্রসমাজে তার অস্তিত্ব আর স্বীকার করা সম্ভব নয়। কুন্দর চিঠিখানা কিন্তু সোম-শুভ্রের কাছে এখনও আছে। মাঝে মাঝে চিঠিখানা এখনও খুলে দেখেন তিনি। ছোট চিঠি, দুটি ছত্র মাত্র লেখা—"কাকামণি, চললুম। আপনার বিদ্রোহ সমাজ মেনে নিয়েছে—আমার বিদ্রোহও যেদিন নেবে সেদিন ফিরে আসব, যদি বেঁচে থাকি।" যদিও তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ নীতিবাগীশ বলে বিখ্যাত, তবু কুন্দর জন্যে অন্তরের নিভৃত কন্দরে তিনি বেশ একটু দুর্বলতা পোষণ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়—আহা, মেয়েটার ঠিকানাটা যদি পেতাম, দেখা করে আসতাম গিয়ে। তার কচি সুন্দর মুখটা মনের ওপর ভেসে ওঠে। তাকে যখন তিনি শেষবার দূর থেকেই দেখেছিলেন, তখন তার বয়স বছর দুই হবে। দূর থেকেই তিনি এতকাল দাদার পরিবারের খবর নিয়েছেন এবং ভেবেছিলেন চিরকালই তাই হয়তো নিতে হবে; কিন্তু বছর দুই আগে হঠাৎ একদিন হংস শুভ্রের এক চিঠি পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। একটু পুলকিতও যে না হলেন তা নয়, কিন্তু একটু দুঃখ হল। যে সংসার থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন, সে সংসার তো নেই। সে সংসারের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণেব বস্তু ছিলেন যিনি, সেই বউদিদিই নেই, হঠাৎ মারা গেছেন সেদিন।.. .. হংস-শুভ্র রীতিমত সনাতন পদ্ধতিতে পত্র লিখেছিলেন।—

আশীর্বাদভাজন শ্রীমান্ সোম-শুভ্র মুখোপাধ্যায়

পরমকল্যাণবরেষু,

গতকল্য আমার আশী বৎসর পূর্ণ হইল। অতীত জীবন পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি। তোমার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাও একটা ভুল। ইহার জন্য অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু কখনও অনুতপ্ত হই নাই। কারণ, মনে একটি সান্ত্বনা ছিল, যাহা করিয়াছি তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছি। আজ কিন্তু আর সে সান্ত্বনা নাই, তাই অনুতপ্তচিত্তে ভুল সংশোধিত করিতে বসিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এতকাল যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আজ তাহাই বেঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। হিন্দু কখনও পরমত-অসহিষ্ণু নয়। হিন্দুধর্মে যত মত, তত পথ এবং সব পথই একলক্ষ্যাভিমুখী। হিন্দু ধর্মে মতের বিভিন্নতা আছে, অভিনবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আছে—কলহ নাই। বাস্তবধর্মী পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া তোমার সহিত মনোমালিন্য করিয়াছিলাম। সে মোহ কাটিয়াছে। তুমি আবার ফিরিয়া এস, আমি অনুতপ্ত চিত্তে আমার নিষেধ প্রত্যাহার করিতেছি। তুমি সত্যই ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা অবশ্য বিচার্য। বলা বাহুল্য, আসিলে আমি অতিশয় সুখী হইব।

সংসারে কাহারও সহিত মতের মিল হয় না। ছেলেরা এবং নাতিরা যাহার যাহা খুশি করিতেছে। সৎ পরামর্শ দিলে কেহ শোনে না। নিজের মতামত আস্ফালন করিয়া অপরের

জীবনযাত্রায় বিঘ্ন জন্মাইবারও প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি দমদমের বাড়িতে তারাপদকে লইয়া একাই থাকি। ইন্দুও আমার কাছে থাকে। কেন যে থাকে, বুঝি না। বার বার তাহাকে বলি, তুমি একাই যদি থাকিতে চাও, পার্ক স্ট্রীটে তোমার আলাদা একটা বাড়ি আছে, সেইখানেই যাও না, আমার কাছে কেন? সে কোন উত্তর দেয় না, যায়ও না, আমার বকুনি শুনিবার জন্য আমার কাছে পড়িয়া থাকে।

তুমি যদি এ অঞ্চলে আস, আমার সহিত দেখা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। সঙ্কোচের কোনই কারণ নাই। আমার আশীর্বাদ লও। আশা করি, ভাল আছ। ইতি—

আশীর্বাদক
শ্রীহংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায়

এ বছর দুই আগের ঘটনা।

তারপর থেকে সোম-শুভ্র মাঝে মাঝে দাদার কাছে যান। গেলে দাদা মনে মনে আনন্দিত হন নিশ্চয়ই, অন্তত সোম-শুভ্রের তাই ধারণা, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ বা প্রমাণ বড় একটা পাননি তিনি। হংস-শুভ্র তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন, তাঁর যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। ঠিক ভাইয়ের মত নয়, সম্মানিত অতিথির মত আলাপ করেন তাঁর সঙ্গে। সোম-শুভ্রের মনে হয়, ঠিক সুর যেন মিলছে না, কোথায় কিসের যেন একটা অভাব থেকে যাচ্ছে। তবু তিনি যান মাঝে মাঝে।

বাসন্তীর চিঠিখানা আর একবার পড়ে, হংস-শুভ্র অনুচ্চ কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, ছেলেটাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—

পাশের ঘরেই ইন্দু ছিল। বাবার অনুচ্চ কণ্ঠস্বরও তার কর্ণ এড়ায় না, সে বেরিয়ে এল।

কিছু বলছ বাবা?

না।—একটু হাসবার চেষ্টা করলেন হংস-শুভ্র।

ডাক এল নাকি? কার চিঠি ওখানা?

তোমার বড়বউদিদির।—মুখে হাসি ফুটিয়ে গড়গড়ার নলটা আবার মুখে তুলে নিলেন, এমন একটা ভাব করলেন, যেন খুব কৌতুকজনক একটা সংবাদ আছে চিঠিখানিতে। স্মিত মুখে নীরবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন। ইন্দুর বুঝতে বাকি রইল না যে বাবা বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু সে চুপ করে রইল। বাবা যদি বুঝতে পারেন যে, সে তাঁর মনোভাব টের পেয়েছে, তা হলে আরও বিরক্ত হবেন তিনি। তাই সে হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হল।

আজকের কাগজখানা দেখেছ? হিন্দু মহাসভা—

না, দেখিনি।

তারপর ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, কোন দিনই দেখি না। দেশের লোক দুটো পয়সা পাবে বলে কিনি।

সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দুকে বলতে হল, তা বটে, একটা খবরও সত্যি নয়।

কি করবে বেচারারা! পিঠের চামড়ার মায়া তো সবাই ত্যাগ করতে পারে না; মানুষের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মত শক্তও নয়, চাবকালে বেশ লাগে।

তোমার খড়মের ফিতেটা তারাপদ ঠিক করে দেয়নি দেখছি এখনও!

ইন্দু একটু ঝুঁকে খড়মটা তুলে নিলে।

একটা ছোট পেরেক দিয়ে দিলেই তো হয়, আমিই দিচ্ছি,—তারাপদের অবসর হবে না কোনও কালে।

খড়মটা নিয়ে ইন্দু চলে গেল। হংস-শুভ্র হাসলেন একটু। মেয়েটা সর্বদাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, ও অদরকারী নয়, খড়মের ফিতে থেকে আরম্ভ করে বালিশের ওয়াড়ের ঝালর পর্যন্ত সর্বত্র নিজের প্রতিপত্তিটুকু জাহির করে রাখা চাই সর্বক্ষণ। সহসা হংস-শুভ্রের কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়ল। সব সময়ে সুযোগ পেত না যদিও, কিন্তু সেও সর্বদা নিজের আয়ত্তের মধ্যে সব জিনিস রাখতে চাইত। খাওয়া-শোওয়া আসবাব পোশাক-পরিচ্ছদ তো বটেই, গামছা-খড়মের দরকার হলেও তার শরণাপন্ন না হলে পাওয়া যেত না। পুরুষদের স্বাধীনতা-হরণের এ কৌশলটা আজকালকার মেয়েদের ঠিক জানা নেই বোধ হয়। অনেক বাড়িতেই পুরুষদের আলাদা আলমারি, আলাদা ওয়াডরোব স্ত্রী-সংস্পর্শ-বর্জিত হয়ে খানসামার তদারকে থাকে। শঙ্কর যেমন। হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে পড়ল। ভাবলেন, বিয়ে করলেই স্ত্রী-লাভ হয় না সকলের ভাগ্যে, কনকের মত অমন—

এই নাও।—খড়মটা ঠিক করে ইন্দু নিয়ে এল। হংস-শুভ্র পায়ে দিয়ে বললেন, বাঃ, বেশ হয়েছে। খড়মটা পরতে গিয়ে চিঠিখানা কোল থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। সেটা তুলে নিয়ে পাশের তেপায়াতে রাখলেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

কি লিখছেন বড় বউদিদি?

পড়ে দেখ।

ইন্দু চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।—

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, আগামী রবিবার আমাদের ছোট্ট খোকনের মুখে ভাত দেব ঠিক করেছি। রবিবার ছাড়া অন্যদিনে হওয়ার অসুবিধা। কারও ছুটি নেই। সেদিন মনে করেছি সবাইকে বলব। ছোটঠাকুরপোর বম্বে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাকে ধরে রেখেছি। কাজলের বাবা দানাপুর থেকে এসে পৌঁছবেন—মানে, পৌঁছবার কথা—আগামী শুক্রবারে। কাল তাঁকে টেলিগ্রাফ করেছি, ঠিক যেন আসেন। বিয়ের পর থেকে তিনি তো আসেনইনি; হয়তো ভাবছেন, আমরা কিছু মনে করেছি; এই উপলক্ষ্যে এসে তাঁর সে ধারণাটা দূর হোক। কনককে অনেক করে লিখেছিলাম আসবার জন্যে, কোনও উত্তর পাইনি। মুক্তা আর শুক্তিকে বোর্ডিং থেকে আনিয়ে নেব সেদিন, সে দুদিন ওরা আমার কাছেই থাকবে। সুপারিন্টেন্ডেন্টের। অনুমতি পাওয়া গেছে শুনলাম ঠাকুরপোর কাছে। ভারি কড়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। আমি 'ফোন' করতে বললেন যে, গার্জেনের চিঠি না পেলে ছুটি দিতে পারবেন না। ভাগ্যিস ঠাকুরপো এখানে ছিল। ঠাকুরপোকে কত বার বলেছি, আমাকে ওদের লোকাল গার্জেন করে দাও, ওদের মাসীর চেয়ে তো আমি বেশি আপনার—ঠাকুরপো মুখে প্রত্যেক বারই বলে, আচ্ছা, তাই করে দেব, তোমরা ঝঞ্ঝাটে পড়বে বলেই করিনি। এতে ঝঞ্ঝাটটা কি বলুন তো? আর একটা কি মজা হয়েছে জানেন, কাকামণিও ঠিক সেই সময় এদিকে আসছেন। তিনি তো আমাদের পারিবারিক উৎসবে বড় একটা যোগ দেননি কখনও, এবার আসবেন লিখছেন। আমার বাবাকেও চিঠি লিখেছিলাম আসবার জন্যে। তিনি বুড়ো হয়েছেন, চোখে ভাল দেখতে পান না, তিনি যে আসতে পারবেন

সে আশা অবশ্য করিনি, তবু লিখতে হয় লিখেছিলাম। টুনি লিখেছে, তিনি নাকি আসবার জন্যে ক্ষেপেছিলেন, গাড়ি রিজার্ভ করতে লোক পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন নাকি, শেষে মণি কর্নেল হাউডকে ডেকে এনে থামায় তাঁকে। তিনি আসবেন না বটে, কিন্তু কত জিনিস যে পাঠিয়েছেন নাতির ব্যাটার জন্যে, তা এলে দেখতে পাবেন। দিল্লী শহরের যত মেওয়া ছিল সব ঝুড়ি ঝুড়ি, তা ছাড়া কত রকম টফি লজেন্‌জ বিস্কুট, কত হরেক ধরনের শিশি বাক্স কৌটা—একটা ঘর ভরে গেছে একেবারে। এর ওপর পাঁচশো টাকার চেকও পাঠিয়েছেন একখানা। চেকটা ভাগ্যে ওঁর হাতে পড়েনি, পড়লেই ফুট-কড়াই হয়ে যেত। ও আমি খরচ করব না, খোকনের নামে জমা করে দেব। উপহার আরও অনেক এসে জুটেছে। ওঁর বন্ধু মেজর চণ্ডা চমৎকার একটা দোলনা কিনে পাঠিয়েছেন। ঠাকুরপো একরাশ রেশমের খদ্দরি বিছানা এনে হাজির করেছে। বললাম, যা মুতুড়ে ছেলে হয়েছে, ওকে রেশম কেন, এক গাদা অয়েল ক্লথ কিনে দাও বরং। শুক্তি-মুক্তা দুজনে মিলে একটা পেরাম্বুলেটার দেবে বলেছে। নবনী তো বড় একটা আসে না, সেও সেদিন সুন্দর একটা ঝারা কিনে দিয়ে গেছে। ছেলের পাওনাভাগ্য খুব! শঙ্খ বলছে, আমি কিচ্ছু দেব না। কেবল কান মলে দিচ্ছে ব্যাটার। বেশ জোরে জোরে মলে দেয়—সেদিন তো ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল। হিমু-ঠাকুরপো ঠিক অমনই করে হীরুর কান মলে দিত—মনে আছে আপনার? কোথায় আজ হিমু-ঠাকুরপো, কোথায় বা হীরু। ভগবান যাদের নিয়ে নিয়েছেন, তাদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না; কিন্তু হীরু যে আমার থেকেও নেই। কবে যে জেল থেকে ছাড়া পাবে, কে জানে! দাদার ছেলে হয়েছে শুনে কি আনন্দ তার, কি চমৎকার চিঠি লিখেছে! কি নামই রেখেছিলেন ওর আপনি—হীরকের মত উজ্জ্বল, হীরকের মতই কঠিন! আপনার দেওয়া নামের মর্যাদা ও রেখেছে। সবই বুঝি, তবু কষ্ট হয়—মনে হয়, ও যদি কঠিন না হয়ে আর একটু কোমল হত, হয়তো ওকে ধরে রাখতে পারতাম। রজতের ব্যাপার তো জানেন, সে এখানে থেকেও নেই, কাজল মাঝে মাঝে আসে, সে কিন্তু ঘর থেকে আর বেরোয় না। সেদিন গিয়ে অনেক করে বলে এসেছি। যা খামখেয়ালী ছেলে, আসবে কি না জানি না।

আপনি ইন্দুকে নিয়ে নিশ্চয় আসবেন। আমি আগের দিন বিকেলে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বিকেলে, মানে—দুপুরবেলাই পাঠাব, আপনি যাতে তিনটে নাগাদ এখানে এসে পৌঁছতে পারেন। পাশাপাশি আরও দুখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি—অনেকে আসবে তো, একটা বাড়িতে কুলোবে না। আমাদের একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরগুলো আপনার জন্যে ঠিক করে রেখেছি, ওপরে আপনার কষ্ট হবে। বেশি কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে না, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়গুলো আনবেন কেবল। পুজোর জিনিসপত্র আনবার দরকার নেই। আমি আপনার জন্যে এক সেট সব কিনে রেখেছি, এমনকি শ্বেতপাথরের বাসন পর্যন্ত। আপনাকে আসতেই হবে, অমত করবেন না। আপনার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশনে আপনি না থাকলে চলে? ইন্দুকে আর আলাদা চিঠি লিখলাম না। আর তারাপদকেও আলাদা নিমন্ত্রণ-পত্র দিতে হবে না আশা করি।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইন্দুকে আশীর্বাদ দেবেন।

ইতি—প্রণতা বাসন্তী

চিঠিখানা পড়তে পড়তে ইন্দুর সুন্দর মুখখানাও যেন অজ্ঞাতসারে পাষাণের মত কঠোর

হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হতে লাগল, তা আর যাই হোক, আনন্দ নয়। নিজের ব্যর্থ ব্যথিত জীবনের অনতিক্রম্য অভিশাপ বহন করে সংসারের সমস্ত আনন্দ-উৎসব থেকে সে নিজেকে যথাসাধ্য দূরেই সরিয়ে রেখেছে, তার কারণ পাছে তার দুর্ভাগ্যের উত্তাপে আর কারও সৌভাগ্যের ফুল শুকিয়ে যায়, তা ঠিক নয়। আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখবার জন্যেই নিজেকে অবলুপ্ত করে দিতে চায় সে। যে মহাকালের নিদারুণ বিধানে তার সমাজ-জীবনের আশা-আনন্দ-আকাঙ্খা একবার নয় দু-দুবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সে মহাকালকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু পরাজয়-গ্লানি-লাঞ্ছিত এই ভাগ্য নিয়ে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে সেই সমাজ-জীবনে আর ফিরে যেতে চায় না। সে যেখানে গৌরবের আসন দাবি করেছিল, সেখানে সসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে কিছুতেই। বড়বউদিদি কেন তাকে যেতে লিখেছিলেন, তিনি কি তাকে চেনেন না? তাকে এমন অপদস্থ করবার মানে কি?

হংস-শুভ্র আড়চোখে একবার কন্যার মুখের পানে চেয়ে দেখলেন।

হাঁটুর আন্দোলন আরও বেড়ে গেল। কিছু বললেন না। গড়গড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ রইল না খানিকক্ষণ। ইন্দু চিঠিখানা পড়ে সযত্নে সেখানা খামের মধ্যে পুরে তেপায়ার ওপরে রেখে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় হংস-শুভ্র কথা কইলেন।

বড়বউ নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে শশাঙ্কটাকে নানা রকম হুজুকে ক্রমাগত। এদিকে ঋণে তো জেরবার হয়ে পড়েছে শুনছি।

ঋণ শোধ হয়ে গেছে বোধ হয়। নতুন একটা মিল কিনেছেন, শুনলাম সেদিন তারাপদর কাছে।

খুব শান্ত কণ্ঠে কথাগুলি বললেন ইন্দু-শুভ্রা। মিল কেনার কথা হংস-শুভ্রও শুনেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর মনে একটা জ্বালাও ছিল। অতর্কিতে উত্তপ্ত কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে।

হ্যাঁ, কিনেছে—বড় বউয়ের নামে।

ইন্দু চুপ করে রইল। তারপর অতিশয় নিরীহভাবে প্রশ্ন করলে, আপনার কি কি কাপড় গুছিয়ে দেব? যাবেন তো, বড়বউদি অত করে অনুরোধ করেছেন যখন?

খানিকক্ষণ গড়াগড়া টেনে অগ্নিবর্ষী চক্ষুর দৃষ্টি ইন্দুর মুখের ওপর স্থাপন করে বললেন, যাব কেন?

ইন্দু নতমুখে নতদৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্দুর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে থেকে হংস-শুভ্রের দৃষ্টির জ্বালা স্নিগ্ধতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল—সবেদন স্নিগ্ধতায়। এই তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান—কনিষ্ঠ এবং প্রিয়তম। এর ওপরই বিধাতার যত আক্রোশ। আই. এ. পাস করে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল মহীতোষকে, ছ মাসের মধ্যে বিধবা হল। বছর দুই পরে আবার বিয়ে দিলেন—বীরেনও বাঁচল না। ওর জন্যে আলাদা বাড়ি করে দিয়েছেন, আলাদা সম্পত্তি করে দিয়েছেন। যথেচ্ছাচার জীবন যাপন করবার কোন সুযোগের অভাব নেই। এ যুগের সবাই ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, ওই বা দেবে না কেন—তিনি নিজেও তো কম কিছু করেননি। পর পর কয়েকটা মুখ মানস-পটে ফুটে উঠল—জোহারা, স্বর্ণ, মিস এলিসন, মিসেস ঘোষ, মোক্ষদা, আরও কয়েকটা—কেউ তো একালে আত্মসম্বরণ করে বসে নেই, পারুক না-পারুক দু হাতে জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বিস্তার

করেছে সবাই। কুন্দর মুখখানা আবার মনে পড়ল, ইন্দুই বা কৃচ্ছ্রসাধন করবে কেন,এর মধ্যেই সব সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে যাবে কেন ওর! একটা ছেলে পর্যন্ত হল না। কলকাতায় নিজের বাড়িতে গিয়ে বেশ জমজমাট হয়ে থাকুক না; কিন্তু না, তা থাকবে না ও, থান পরে শুধু হাতে আমার চোখের সামনে হবিষ্যি করে যাবে দিনের পর দিন। মাথার সিঁদুরটা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছে। বাসন্তীর নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করবে ঠিক। হংস-শুভ্রের চোখের দৃষ্টি আবার প্রখর হয়ে উঠল।

আমি যাব কেন? আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা একটা ফরম্যুলা মাত্র একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার শুধু। আমি প্রাগৈতিহাসিক। শ্বেতপাথরের বাসন দিয়ে আমার যুগের সঙ্গে এ যুগের সেতু বাঁধবার চেষ্টা দুশ্চেষ্টা তোমাদের।

তবু আপনাকে যেতেই হবে শেষ পর্যন্ত।

তুমি যদি জোর করে নিয়ে যাও, তা হলে যেতেই হবে।

কন্যার মুখের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করে মৃদু হাসলেন হংস-শুভ্র। যে প্যাঁচটা কষেছেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়া ইন্দুর পক্ষেও অসম্ভব হবে ভেবে বেশ একটু পুলকিতই হলেন তিনি। ইন্দু তবু চেষ্টা করতে ছাড়লে না।

আমি ভাবছি—

তুমি কি ভাবছ, তা জানি। তুমি ভাবছ, বুড়োটা ওই হুল্লোড়ের মধ্যে গিয়া হোঁচট খেয়ে মরুক, আমি দিব্যি এখানে নিরিবিলিতে থাকি।

তোমরা সবাই স্বার্থপর।

ক্ষণকাল নীরব থেকে ইন্দু বললে, যাব তা হলে।

বলেই চলে যাচ্ছিল, হংস-শুভ্র ডাকলেন।

আজ সোম আসবে একটু পরেই। মনে আছে তো?

কাকামণির ঘরটাই ঠিক করতে যাচ্ছি।

পালংশাক আনতে দেওয়া হয়েছে?

তারাপদকে সুক্তোর সব জিনিসই আনতে দিয়েছি, কিন্তু এখনও তার পাত্তা নেই। তুমি ওকে বড্ড আসকারা দাও বাবা।

এ আলোচনা আর বেশি দূর অগ্রসর হবার সুযোগ পেল না, কারণ দ্বারপ্রান্তে ভট্টাচার্য মশাই দেখা দিলেন। এইবার মহাভারত-পাঠ শুরু হবে।

ইন্দু-শুভ্রা কাকামণির ঘর ঠিক করতে গেল।

।। দুই ।।

কাকামণির ঘর ঠিক করে ঘন্টাখানেক পরে ইন্দু নিজের ঘরে এসে ঢুকল। তার সমস্ত মন জুড়ে কি যে একটা হচ্ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। ঠিক রাগ নয়, ঠিক বিরক্তিও নয়, কি যেন একটা কি। মাঝে মাঝে তার এ রকম হয়। দু-দুবার বিধবা হয়েছে বলে যে গ্লানি

হওয়া স্বাভাবিক সে গ্লানি একা ঘরে তার হয় না, সে গ্লানি সামাজিক। দুবার বিধবা হয়ে সমাজের কাছে সে যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, উপর্যুপরি দুবার ট্রেন মিস্ করলে পাঁচজনের কাছে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হয়। মহীতোষ কিংবা বীরেনের সম্বন্ধে তার যে কিছুমাত্র মমত্ববোধ নেই—এ কথা অবশ্য ঠিক নয়, কিন্তু সে মমত্ববোধটা তার সমস্ত সত্ত্বাকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে থাকে না। দুটি যুবক তার জীবনে অতি অল্পদিনের জন্য এসেই চলেই গেছে, এদের মধ্যে কেউ একজন বেঁচে থাকলে হয়তো তার জীবন ফল-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠত, এই সব স্মৃতি-সম্ভাবনা নিয়ে সারা-জীবন হা-হুতাশ করে কাটিয়ে দেওয়ার মত নির্জীব মন তার নয়। তার পরনে থান, মাথায় সিঁদুর নেই, অঙ্গ নিরাভরণ, এক বেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করে কম্বলে শুয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য সে পালন করছে বটে, কিন্তু অন্তর তার নিরাসক্ত নয়, বৈরাগ্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। রবীন্দ্রসাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে সে। মুক্তি তার কাম্য বটে, কিন্তু সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় সে মুক্তি। কিন্তু কোথায় সে সহস্র বন্ধন, যা তাকে মহানন্দময় মুক্তির সন্ধান দেবে? স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর যে বন্ধন, কোন এক বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্যে যে সব সামাজিক বন্ধনে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বাঁধা পড়ে, তা কি সব সময়ে আনন্দময়? তা তো নয়। বাড়ির কার সঙ্গেই তার মনের সুর মেলে? যাদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাদের সঙ্গেই বা মিলত কি না কে জানে! মহীতোষের প্রেমে পড়েই তাকে বিয়ে করেছিল সে, মনে হয়েছিল যে, মনের সুর মিলেছে, কিন্তু দু দিনেই ভুল ভেঙেছিল। যে মহীতোষকে সঙ্গী করে স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে এক আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে আশা করেছিল, সেই মহীতোষ যখন বিয়ের পর খাকি হাফপ্যান্ট পরে পুলিসে চাকরি নেবার জন্যে স্থানে-অস্থানে সেলাম করে বেড়াতে লাগল, তখন তার স্বপ্ন-কাব্যে প্রথম ছন্দ-পতন ঘটল। পুলিস মাত্রেই যে খারাপ তা নয়, খাকি হাফপ্যান্ট অনেক ভদ্রলোকও পরে, তবু যে কেন বেসুরা বাজল তা ঠিক জানা নেই তার; কিন্তু বেজেছিল। হয়তো আবার সুর জমত এসব সত্ত্বেও, হয়তো জমত না, কিন্তু মহীতোষ বাঁচল না। তারপর এল বীরেন। বীরেনকে সে আগে চিনত না। বাবা সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিয়েতে মত দিয়েছিল মাত্র। অন্য কোন কারণে নয়, বিধবা-বিবাহ সামাজে প্রচলিত হওয়া উচিত—এই সুস্থ মতবাদকে সমর্থন করবাব জন্যেই মত দিয়েছিল। অপরে যা করতে ভয় পায়, সে যে তা অকুতোভয়ে করতে পারে—এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই মত দিয়েছিল। আবার বিয়ে করবার দিকে বিশেষ একটা লোলুপতা তার ছিল না। যৌন-সম্ভোগ-লালসা তার জীবনকে কোনদিনই নিয়ন্ত্রিত করেনি, অযৌন জীবন যাপন করলে যে নারী-জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবেই, এই হাস্যকর উক্তিকে সে কোনদিনই যুক্তিযুক্ত মনে করে না, সে বিয়ে করেছিল বিধবা-বিবাহের প্রতি সমাজের অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ। বিধবা-বিবাহ সমাজে সুপ্রচলিত থাকলে হয়তো সে বিয়ে করত না।... বীরেনও বাঁচল না। দু-দুটো বন্ধন খুলে গেল। কিন্তু তাই বলে সে কি দাদা-বউদিদিদের সংসারে ঢুকে সকলের অনুকম্পাভাজন হয়ে তাদের ছেলে-মেয়ে মানুষ করে নারীজন্ম সার্থক করবে? যাদের সঙ্গে এতটুকু মতের মিল নেই, সারা জীবন তাদের কথায় সায় দিয়ে গৃহলক্ষ্মী সেজে বসে থাকবে? পৃথিবীতে আর কাজ নেই? আর মানুষ নেই? আছে বইকি। অজস্র মানুষ আছে, সহস্র সহস্র মানুষ আছে, যাদের সে দেখেনি অথচ ভালবাসে, যাদের আদর্শকে সে শ্রদ্ধা করে, যাদের মনের সুরের সঙ্গে তার মনের সুর ঠিক ঠিক মিলে

যায়, তারাই তার আত্মীয়। তাদের জন্যেই বাঁচতে হবে, তাদের জন্যেই বৈধব্যের এই ছদ্মবেশ। তাদের জন্যই দরকার হলে বিলাসিনীর ভূমিকাতেও সে অবতীর্ণ হবে তার পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে; কিন্তু এখনও তার প্রয়োজন হয়নি, প্রয়োজন হলে সে সব করবে, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবে, কিন্তু এখন নয়। এখন তাকে দমদমের বাড়িতেই থাকতে হবে কিছুকাল।

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। যে কথাটা এতক্ষণ অস্পষ্টভাবে তার মনকে আকুল করে তুলছিল, সহসা সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কথা নয়, বর্ণনা। মেদিনীপুরের একটা বর্ণনা। বর্ণনাটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু এ বর্ণনার পেছনে যে ছবি প্রচ্ছন্ন আছে, তা ভয়ঙ্কর। সকালে যখন কাগজ পড়েছিল, সেই ছবিটা মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠেছিল তার মানস-পটে...তবু শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশন উৎসব করতে হবে, বউদিদির বাবা ঝুড়ি ঝুড়ি উপহার পাঠিয়েছেন---লজেন্‌জ, বিস্কুট, মেওয়া...হীরক জেলে--কম্‌রেড....হীরককে সে বুঝতে পারে না... নিজের দেশের চেয়ে রাশিয়া তার কাছে বড় হল! বুঝতে পারে না ঠিক, কিন্তু হীরককেই সে এখনও শ্রদ্ধা করে বাড়ির মধ্যে। রজতকেও করত, কিন্তু রজত বিয়ে করেছে, আর কোন আশা নেই তার কাছে, সেতারের তারগুলো এবার ঢিলে হয়ে যাবে ক্রমশ, দীপক রাগিণী আর আলাপ করা চলবে না তাতে! নন-ভায়োলেণ্ট নন-কো-অপারেটার ছোটদার কথা মনে পড়েই হঠাৎ অনঙ্গকে মনে পড়ল তার। অনঙ্গের অঙ্গ নাকি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে রোজ জেলে চাবুকের চোটে...অনঙ্গ জেলের আইন মেনে চলবে না কিছুতে...এ কি ছেলেমানুষি তার, বার বার মার খাবে, তবুও মানবে না! হঠাৎ মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ইন্দু, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা টেনে অনঙ্গের ফটোখানা বার করে নির্নিমেষে চেয়ে রইল সেটার দিকে! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, শার্লমেন, তৈমুর, চেঙ্গিস, নাদির শা বেঁচে থাকবে, ক্লাইবও থাকবে, কিন্তু অনঙ্গ থাকবে না। এই কচি কিশোর অনঙ্গ মহাকালের আবর্তে কোথায় তলিয়ে যাবে, কেউ তাকে মনে রাখবে না---যাদের জন্যে সে প্রাণ দিচ্ছে, তারাও না। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে--জল নয়--বিদ্যুৎ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হতে লাগল যেন।

।। তিন ।।

বাইরের ঘরে তখনও মহাভারত পাঠ চলছিল।

স্বর্গ থেকে পতনোন্মুখ যযাতিকে সম্বোধন ক'রে তাঁর মর্ত্ত্যবাসী দৌহিত্র অষ্টক প্রশ্ন করছিলেন, 'উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে?'' যযাতি উত্তর দিচ্ছিলেন, ''যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রম বিবর্জিত এবং কামাচার পরাঙ্মুখ, তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন এবং যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহিক সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ধর্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র...''

এমন সময় সোম-শুভ্র এসে পৌঁছলেন।

সোম-শুভ্রের বয়স ছিয়াত্তরের কাছাকাছি হলেও তিনি মোটেই অসমর্থ হয়ে পড়েননি।

এখনও বেশ খাড়া আছেন। মুখে প্রাজ্ঞতার ছাপ পড়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এমন একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্যও ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে যে, দেখলে ভয় করে না, সম্ভ্রম হয়। মাথাটি যেন বড় একটি কদমফুল, ছোট করে ছাঁটা ধপধপে সাদা চুলে ভরতি। এতটুকু টাক পড়েনি। গোঁফ দাড়ি কামানো নিটোল মুখে কোথাও জরার চিহ্ন নেই। চোখের দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। পরনে থান, সাদা লংক্লথের 'চায়না' কোট, পায়েও ধপধপে ক্যাম্বিসের ফিতাহীন জুতো। জুতোটির বিশেষত্ব আছে, ফরমাস দিয়ে তৈরি করানো। সোম-শুভ্রকে দেখলেই মনে হয়, শুভ্রতার মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি যেন বিশেষ রকম সচেতন। মলিনতার সামান্যতম গ্লানিও যেন তিনি নিজের ত্রিসীমানায় আসতে দেবেন না। আপাদমস্তক সব ধপধপ করছে।

ঘরে ঢুকেই সোম-শুভ্র হেঁট হয়ে দাদার পদধুলি নিলেন। ভট্টাচার্য মশাইকে নমস্কার করলেন।

তুমি এসে পড়লে? নটা বেজে গেল নাকি?

পকেট থেকে ঘড়ি বার করে সোম-শুভ্র বললেন, নটা কুড়ি।

স্টেশনে কাউকে পাঠাতে পারিনি, নেপালী চাকরটা পালিয়েছে—

তারাপদ স্টেশনে ছিল।

ও, ছিল বুঝি! তাই বাজার থেকে ফিরতে এত দেরি তার।

সঙ্গে সঙ্গেই তারাপদ কাঁধে সোম-শুভ্রের বিছানায় বাণ্ডিল ও হাতে বাজারের থলি নিয়ে ঢুকল। হংস-শুভ্রের কথার জবাবস্বরূপই বোধ হয় বললে, একা আর ক'দিক সামলাই, বল? এবং প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখে ভেতরের দিকে চলে গেল হনহন করে।

তারাপদ ও হংস-শুভ্র সমবয়সী। শুধু তাই নয়, সহপাঠীও। সেকালে শিব-শুভ্রের বাড়িতে ছোটখাট একটা পাঠশালা ছিল। শিব-শুভ্রের বাড়িতে খেয়ে এবং শিব-শুভ্রের নিকট বেতন নিয়ে একজন পণ্ডিত, শুধু হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রকেই নয়, পাড়ার সব ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াতেন। কাউকে কোন খরচ দিতে হত না। সেই পাঠশালায় তারাপদ হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রের সঙ্গে কিছুদিন পড়েছিল। সদ্‌গোপের ছেলে তারাপদর পড়া অবশ্য বেশি দূর অগ্রসর হয়নি, কিন্তু এই সুবাদে সে হংস-শুভ্র ও সোম-শুভ্রকে 'তুমি' এবং পরিবারের বাকি সকলকে অসঙ্কোচে 'তুই' বলে। তখন থেকেই সে একাধারে হংস-শুভ্রের বন্ধু এবং ভৃত্য, পার্শ্বচর এবং অনুচর। হংস-শুভ্র তার সমস্ত খরচ বহন করেন, সমস্ত আবদার সহ্য করেন। তারাপদও কম সহ্য করেনি—তার স্ত্রী মোক্ষদার সঙ্গে হংস-শুভ্রের যে সম্পর্ক ঘটেছিল, তাও সহ্য করেছিল, কিছু বলে নি। হংস-শুভ্র অবশ্য আর একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তারাপদর বিবাহ দিয়েছিলেন এবং আজীবন তার পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করে এসেছেন, তবুও এতটা কে সহ্য করতে পারত? হংস-শুভ্রের এই ধরনের অত্যাচার, শুধু একটা নয়, তারাপদ অনেক সহ্য করেছে। সেই ছেলে-বেলাতেই যখন পাঠশালায় পড়ত একটা সুন্দর পেন্সিল কুড়িয়ে পেয়েছিল। হংসকেই দিতে হল সেটা শেষ পর্যন্ত। না নিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না। তার বদলে পাঁচটা নতুন পেন্সিল কিনে দিলে অবশ্য, কিন্তু চ্যাপ্টা-গোছের ওই পেন্সিলটা সে নিলে। কলকাতার বাজারে ও-রকম পেন্সিল তখন পাওয়া যেত না, কোন সায়েবসুবোর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল বোধ হয়। তারাপদ জানে, হংসের স্বভাবই ওই রকম, যখন যেটা ধরে সহজে ছাড়ে না, একেবারে চূড়ান্ত করে তবে ছাড়ে। এখন ধর্ম নিয়ে পড়েছে। র‍্যাংকিনের বাড়ির স্যুট

ছাড়া যে এককালে আর কোন কিছু পরত না, সে এখন নামাবলী আর পাটের কাপড় পরে বসে আছে। হয়তো কোন্ দিন কমুণ্ডল নিয়ে ছাই মেখে বলবে—চললাম সংসার ছেড়ে। কিছুই বিচিত্র নয়। তারাপদর ধারণা, ঝোঁক চেপে গেলে হংস না করতে পারে এমন জিনিস নেই।

ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে সোম-শুভ্র ভেতরে চলে গেলেন।

মহাভারত-পাঠ আবার শুরু হল।

"রাজা যযাতির এবম্প্রকার ধর্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? এবং আপনি কোথা হইতে—"

আগামী রবিবার দিনটা কেমন দেখুন তো, এই পাঁজি নিন।

মহাভারতের সম্ভবপর্ব থেকে হঠাৎ গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকায় নীত হওয়াতে ভট্টাচার্য মহাশয়েব মানসিক অবস্থাটাও অনেকটা যযাতির মত হল। তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

আজ্ঞে, কি বলছেন?

আগামী রবিবার দিনটা শুভদিন কি না দেখুন, সেদিন অন্নপ্রাশন দেওয়া চলতে পারে কি না!

মিনিট পাঁচেক দেখে ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ করলেন, না, অত্যন্ত অশুভ দিন আগামী রবিবার।

হংস-শুভ্রের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। ভট্টাচার্য আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে পঞ্জিকাটি সন্তর্পণে মুড়ে রেখে পুনরায় যযাতির উপাখ্যান আরম্ভ করতে যাবেন, এমন সময় হংস-শুভ্র বললেন, আজ আর থাক্।

আচ্ছা।

ভট্টাচার্য ধীরে ধীরে উঠে গেলেন।

অগ্নিগর্ভ পর্বতের মত স্থির হয়ে বসে রইলেন হংস-শুভ্র।

ক্ষণকাল পরেই একটা সাদা প্লেট ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে তারাপদ প্রবেশ করতেই তিনি বললেন, পণ্ডিত মশাই চলে যাচ্ছেন, ডাক তো। ভট্টাচার্য আবার ফিরে এলেন।

অন্নপ্রাশনের একটা ভাল দিন দেখে দিন তো পণ্ডিত মশাই।

ভট্টাচার্য আবার পঞ্জিকার পাতা ওলটাতে লাগলেন। তারাপদ প্লেটটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে সে হংস-শুভ্রের দিকে যে দৃষ্টিটা নিক্ষেপ করে গেল, তার অর্থ—আবার কি নিয়ে মাতলে তুমি? ছেলেটার অন্নপ্রাশনে বাগড়া লাগাচ্ছ নাকি?

খানিকক্ষণ পাতা উলটে ভট্টাচার্য বললেন, এর পরের বৃহস্পতিটা খুব ভাল দিন।

এর পরই হংস-শুভ্র যে প্রশ্নটি করলেন, তার জন্য ভট্টাচার্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আপনি যজ্ঞ করতে পারবেন?

আজ্ঞে?

আমার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশন-অনুষ্ঠান রীতিমত হিন্দু পদ্ধতিতে করতে চাই। তাতে যজ্ঞ হোম ঠিক বৈদিক নিয়ম অনুসারে করতে হবে। আপনি কি অধ্বর্যু কিংবা অন্য কোন ঋত্বিকের কাজ করতে পারবেন?

ইতিপূর্বে কখনও করিনি। তবে সাধারণভাবে বৃদ্ধি-টৃদ্ধি—

না, সাধারণভাবে হবে না। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে করতে হবে। ভট্টাচার্য হংস-শুভ্রকে চিনতেন না। চুপ করে রইলেন।

কাশীতে খবর পাঠাতে হবে দেখছি। জিনিসপত্র যা যা লাগবে, তার একটা ফর্দ কোথা পাই—

আজ্ঞে, তা আমি করে দিতে পারব, বই আছে আমার কাছে।

বইটা আনুন তা হলে।

বলেই তিনি উঠে অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

যাচ্ছিলেন সোম-শুভ্রের কাছে। যেতে যেতে হঠাৎ ছবি-ঘরের কপাটটা তাঁর চোখে পড়ল। প্রকাণ্ড তালাটা ঝুলছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

তারাপদ!

তারাপদ এল।

এ ঘরটা খোল।

প্রকাণ্ড চাবির গোছাটা এনে তালাটা খুলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল তারাপদ, হংস-শুভ্র বললেন, পণ্ডিত মশাই একটা ফর্দ দেবেন, সেটা তুমি টুকে নাও গিয়ে।

কিসের ফর্দ?

যজ্ঞের।

হংস-শুভ্র ঘরের ভেতরে ঢুকে কপাটটা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ দ্বারের দিকে চেয়ে তারাপদ সবিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর চলে গেল।

ছবি-ঘরে অনেক দিন ঢোকেননি হংস-শুভ্র। একটা ঘরকে ছবি-ঘর নাম দিয়ে সেটাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান তিনিই করেছিলেন একদিন, বহুকাল পূর্বে। মৃত পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়স্বজনদের ছবিই শুধু নয়, অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত অনেক জিনিসও উত্তর দিকের এই ঘরখানিতে সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন তিনি। তারাপদকে বলেছিলেন, দুবেলা যেন ধুপধুনা দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় ঘরটা। তারাপদ অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন করে যাচ্ছে, তিনি নিজেই বহুদিন ঘরটাতে ঢোকেননি। হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রের মহাসমুদ্রে অবগাহন করে তাঁর মনে কিছুকাল থেকে এই প্রতীতি জন্মেছিল যে, যারা আত্মার অমরতায় আস্থাবান, মায়া-পাশ ছিন্ন করে অখণ্ড অব্যক্ত পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও জীবের গত্যন্তর নেই বলে যাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবকেই জন্মজন্মান্তরের আবর্তে আবর্তিত হয়ে অবশেষে সেই একই মহাসত্তায় মিশতে হবে—এই যারা সত্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে এই নশ্বর জীবনের দু-চারটে স্মৃতির টুকরোকে আঁকড়ে থাকার অর্থ—সেই বিরাট প্রবাহকে অস্বীকার করা, যার খরস্রোতে, তারা জানে যে, পর্বত সমুদ্রে এবং সমুদ্র মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আজকের পর্বতের প্রতিকৃতি নিয়ে কি হবে, ওটা তো ওর আসল রূপ নয়। নিয়ত-পরিবর্তনশীল পরমাণুপুঞ্জের একটা বিশেষ মুহূর্তের ছবি রেখে লাভ কি? নিত্য-চলমান বিশ্বজগতের পটভূমিকায় কল্পনানেত্রে দেখলে ওর স্বরূপ হয়তো দেখা যেতে পারে এবং তাই হয়তো সত্য দর্শন। বহুকাল তিনি ঢোকেননি ঘরটাতে। আজ কিন্তু ওই বড় তালাটা চোখে পড়াতে তাঁর দার্শনিক মন হঠাৎ যেন ক্রীড়া-প্রবণ হয়ে উঠল। দর্শনের বিজ্ঞ অধ্যাপক অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সঙ্গে খেলার মাঠে নেমে যেন ছড়োহুড়ি করে খেলতে উৎসুক হলেন।

ঘরে ঢুকেই প্রথম চোখে পড়ে শিব-শুভ্রের বিরাট অয়েল-পেন্টিং ছবিখানা। হঠাৎ দেখলে রামমোহন রায় বলে ভুল হয়। সেই চোগা চাপকান শামলা। হংস-শুভ্র পিতার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। যদিও ছবি ছবিই, তবু হংস-শুভ্রের মত দার্শনিকও মনে মনে কোন একটা প্রত্যাদেশের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে রইলেন যেন ক্ষণকাল। বাচনিক কোন প্রত্যাদেশ এল না বটে, কিন্তু অনেক দিন আগেরকার একটা ছবি ফুটে উঠল মনে। তাঁর আর সোম-শুভ্রের উপনয়নের ছবি। ভট্টপল্লী থেকে গৌরীকান্ত শিরোমণি এসেছিলেন, কাশী থেকে এসেছিলেন পণ্ডিত গোপীনারায়ণ। তা ছাড়া পুরোহিত, পণ্ডিত, শাস্ত্রী আরও অনেকে ছিলেন। বৈদিক মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনিতে বিরাট মণ্ডপটা গমগম করছিল, এখনও তাঁর মনে আছে। বিরাট উৎসব হয়েছিল। সাত দিন সাত রকম। প্রথম দিন হিন্দুমতে-ব্রাহ্মণভোজন, যাত্রা, ভাগবত-পাঠ। দ্বিতীয় দিন মুসলমানী মতে-পোলাও-কাবাব-কোপ্তার খানা, বাইনাচ, মুশয়রা। তৃতীয় দিন সাহেবদের জন্য সাহেবী হোটেলে সাহেবী ফ্যাশানে ডিনার, ড্রিঙ্ক, ডান্স। চতুর্থ দিনে কাঙালী-ভোজন—লুচি, ভাত, ডাল, পোলাও, তরিতরকারি, মিষ্টান্ন—সব রকম, যে যত খেতে এবং নিয়ে যেতে পারে, অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্তন, হয়েছিল। পঞ্চম দিন কেবল মেয়েদের খাওয়ানো হয়েছিল, সেও ভূরি-ভোজন। পুরুষদের কোন সম্পর্কই ছিল না তার সঙ্গে। মেয়ে রাঁধুনী, মেয়ে পরিবেশনকারিণী, মেয়ে কীর্তনীয়া, এমন কি মেয়ে-যাত্রা পর্যন্ত এসেছিল। ষষ্ঠ দিন কবির লড়াই, কবিদের সম্বর্ধনা করা হয়েছিল সেদিন। সপ্তম দিন হয়েছিল পালোয়ানদের কুস্তি, ওস্তাদদের গান, আর তাদের প্রত্যেকের ফরমাস অনুযায়ী খাওয়ার ব্যবস্থা। কেউ খেলেন বাদামের হালুয়া, কেউ মহিষের কাঁচা দুধ, কেউ স্বপাক আলোচাল গাওয়া-ঘি, কেউ সিদ্ধির সন্দেশ, কেউ মধু আর ফলাহার করলেন কেবল, কেউ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে নিলেন নিজের হাতে।....হঠাৎ চাবুকটা নজরে পড়ল হংস-শুভ্রের। চামড়ার ওই হান্টারটা দিয়ে সিতাংশুকে খুব মেরেছিলেন তিনি একদিন অবাধ্যতার জন্য। হংস-শুভ্র ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ছবির ভিড়ের মধ্যে সিতাংশুর ছবিখানা খুঁজতে লাগলেন। ওই যে হাসিমুখে চেয়ে আছে। ব্যারিস্টারের গাউনে কি সুন্দর মানাত ওকে! হিমাংশু-সুধাংশুর ছবিও পাশাপাশি টাঙানো রয়েছে, কিন্তু সিতাংশুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তিনি। ছেলেটা দুষ্টু ছিল বলেই বোধ হয় বেশি ভালবাসতেন তাকে। যা ধরত, তা করত। তার মতের বিরুদ্ধেই ব্যারিস্টারি পড়েছিল, কিছুতেই আই সি. এস. পরীক্ষাটা দিলে না। কিছুতেই সামলানো যেত না, একটা ঝড় যেন। ঝড় থেমে গেছে। হংস-শুভ্র এগিয়ে গিয়ে আর একটা অয়েল-পেন্টিঙের সামনে দাঁড়ালেন। দূরসম্পর্কের পিসিমা ভুবনমোহিনী দেবী। রক্তের দিক দিয়ে সম্পর্কটা দূর বটে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে এই ভুবনমোহিনী একদিন হংস-শুভ্রের অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বহু-বিবাহের যুগে বহুপত্নীবান যে কুলীনের গলায় মালা দিয়ে ভুবনমোহিনী সীমন্তে সিঁদুর পরবার অধিকার পেয়েছিলেন, তার গৃহেই সেই ন বছর বয়স থেকেই বহু সপত্নী সমভিব্যাহারে তিনি এমন নিঁখুত রকম সুন্দর অনাড়ম্বর আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করে গেছেন যে, সে কথা ভাবলে হংস-শুভ্রের শির এখনও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে হংস-শুভ্রের বাড়িতে আসতেন তিনি। প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। হংস-শুভ্র অবাক হয়ে যেতেন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর অনবদ্য রূপরাশি দেখে, প্রস্ফুটিত শতদল যেন। বেশি দিন বাঁচেননি, ভরা যৌবনেই মারা গেছেন। ইংরেজীকেতায়-মানুষ হংস-শুভ্র তাঁর এক গোছা চুল স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কেটে রাখতে

চেয়েছিলেন, ভুবনমোহিনী দেননি। ভাগ্যে কিছু দিন পূর্বে একটা ফোটো তুলিয়ে রেখেছিলেন, তাই এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। অনেক খরচ করে সেই ফোটো থেকে এই ছবিখানা করিয়ে রেখেছেন তিনি। হংস-শুভ্র যখনই এ ছবিখানার কাছে এসেছেন মনে মনে প্রণাম করেছেন, আজও করলেন। হংস-শুভ্র এগিয়ে গেলেন। ছবির পর ছবি, কত ছবি! দামী গ্লাস-কেসে একখানা শাল রাখা ছিল—কাঞ্চনমালার শাল। সেখানার সম্মুখে দাঁড়ালেন খানিকক্ষণ। পাশেই কুন্দর গয়নার বাক্সটা রয়েছে, যাবার সময় কুন্দ গায়ের সমস্ত গয়না খুলে রেখে গিয়েছিল। তারপরেই ভায়রাভাই রুদ্রবিলাস। এককালে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল লোকটার সঙ্গে, চমৎকার শেক্‌স্‌পিয়র আবৃত্তি করত। কবে মরে গেছে। শেক্‌স্‌পিয়ারের নামটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের আরও কতকগুলো প্রিয় নাম মনে প'ড়ে গেল—মিলটন, বেকন, লক, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, গিবন, রলিন্স.....স্বপ্নের মত মনে হল—বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মত। এদের কারও সঙ্গেই আর জীবন্ত সম্পর্ক নেই, সমস্তই স্মৃতি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

সোম-শুভ্র

।। এক ।।

টেবিলের ওপর সাদা একখানি চাদর পাতা। তার ওপর কয়েকটা সাদা প্লেট। এক ধারে একখানি খবরের কাগজ বিছানো। সোম-শুভ্র একটি চকচকে কাঁচি দিয়ে পালংশাক কাটছিলেন। যে পাতাটি পোকায় খেয়েছে অথবা যেখানে সামান্যতম মলিনতার সম্ভব আছে বলে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, তা তৎক্ষণাৎ কেটে বাদ দিয়ে খবরের কাগজে জমা করছেন। তিনি যা খাবেন, তা নিখুঁত রকম নির্মল হওয়া চাই এবং সে বিষয়ে তাঁর মন বেশি রকম সজাগ যে, তিনি নিজের হাতেই সব করেন। পাশেই চাল এবং ডাল রয়েছে। ইন্দু সব বেছে দিয়েছে একবার, তবু তিনি আর একবার নিজে দেখে দেবেন। কয়েকটি আলু, আধখানা বাঁধাকপি, গোটা দুই বিলিতী বেগুন হাতে করে ইন্দু ঢুকল। সোম-শুভ্র প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে তার দিকে হাসিমুখে চাইলেন।

গরম জলে ধুয়ে নিয়ে এলে? আচ্ছা, রাখ ওই প্লেট দুটোতে। আমার আর কিছু লাগবে না।

আপানার কুকারটা ঠিক করে দিই?

সব আমি করে নেব এখন, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

ইন্দু কোনও উত্তর না দিয়ে আলু, কপি আর বিলিতী বেগুনগুলো প্লেটে সাজিয়ে রাখতে লাগল। সোম-শুভ্র ক্ষণকাল ইন্দুর গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে থেকে যেন তার আবদার রক্ষা করছেন এই ভাবে বললেন, আচ্ছা, বেশ, তুমিই কর আজ সব। কুকারের বাটিগুলো গরম জলে ধুয়ে নাও একবার তা হলে। আমার বেতের বাক্সটাতে জল মাপবার ছোট্ট মগটা আছে। ঠিক এক মগ জল লাগবে ঝরঝরে ভাত হতে। ডালে এক মগের কম দিলেও চলবে, পাতলা ডাল পছন্দ নয় আমার। হাসলেন একটু। ইন্দুর মুখেও সামান্য হাসির আভাস ফুটে উঠল। সে কুকারটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সোম-শুভ্র পালংশাক কাটা শেষ করে চাল বাছতে লাগলেন।

যৌবনকালে সংসার বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন বলেই নয়, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে বাধ্য হয়ে স্বাবলম্বী হতে হয়েছে তাঁকে। সেকালে ব্রাহ্মরা গোঁড়া হিন্দুদের কাছে প্রায় অস্পৃশ্যই ছিলেন্। পরিচয় জানতে পারলে হিন্দু রাঁধুনী পর্যন্ত থাকতে চাইত না। সোম-শুভ্র কখনও কারও কাছে নিজের পরিচয় গোপন করেননি। ব্রাহ্মদের কাছে গিয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বেধেছিল; অপরিচ্ছন্ন চাকরের হাতে খেতে তাঁর চিরকালই অপ্রবৃত্তি, সুতরাং স্বপাক আহারেই অভ্যস্ত হতে হয়েছে তাঁকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন কিন্তু এমন হয়েছে যে অপরে রেঁধে দিলে তৃপ্তিই হয় না। সুরেশ্বরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক পরে হয়েছিল; ইক্‌মিক কুকারও অনেক পরের কথা। সে যুগে সনাতন প্রথাতেই

পিতলের বোকনোতে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেতেন তিনি। নিজে হাতে রেঁধে খেতে হত বলে তরকারি খাওয়ার অভ্যাসটা প্রায় নেই বললেই হয়,—তরি-তরকারি যা খান, তা হয় কাঁচা, না হয় সিদ্ধ। শরীরের জন্য আর যা দরকার, তা পূরণ করেন দুধ দিয়ে। চাষবাস নিয়েই ছিলেন, সুতরাং গরুর অভাব হয়নি কখনও। তারপর অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে—বিহার অঞ্চলে নিজের আস্তানাই গড়ে উঠেছে একটা—বন্ধুবান্ধবেরও অভাব হয়নি পরে—সুরেশ্বরদের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতাই হয়েছিল—ইচ্ছে করলে অন্য ভাবেও তিনি আহারের ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু স্বপাক ত্যাগ করেননি তিনি। যে স্বাধীন মনোভাব তাঁকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল, সেই স্বাধীন মনোভাব তিনি বরাবর বজায় রেখেছেন। কখনও কোনও কারণে অধীনতা স্বীকার করেননি। বাল্যকালে হংস-শুভ্রের সঙ্গে বিলাসের কোলেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত আদর্শের জন্য অশেষ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে তাঁকে জীবনে। সে আদর্শ স্বাধীনতারই আদর্শ। বিদেশী রাজা আমাদের দেশ দখল করেছে বলে প্রাণ-মনও তাদের পায়ে সঁপে দিতে হবে—এই হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের হিড়িকে সবাই যখন সাহেবদের নকল করতে ব্যস্ত, তখন তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধা হয়েছিল সেই মহাপুরুষটির প্রতি, যিনি সে যুগে মিশনারিদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, হিব্রু আর গ্রীক অধ্যয়ন করে প্রচলিত বাইবেলের ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, শাস্ত্র ঘেঁটে হিন্দুধর্মের কীর্তিকলাপ প্রচার করেছিলেন, পৌত্তলিকতাই যে হিন্দুধর্মের শেষ কথা নয়, তা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। রামমোহনের মনীষাই নয়, তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর আত্মসম্মানবোধ বেশি মুগ্ধ করেছিল সোম-শুভ্রকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও কম মুগ্ধ করেননি। সে যুগে সকলেই যখন বিলাসের তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তখন ওই ধনীর দুলালের সত্য-অনুসন্ধিৎসা, বিষয়ে বীতরাগ, পাশ্চাত্য সভ্যতার জারক প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। মহর্ষি নিজেই যে স্বাধীনচিত্ত ছিলেন তা নয়, অপরের স্বাধীনতার ওপর তিনি জোর করে কখনও হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না। তাই তাঁর প্রিয়শিষ্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যখন মতবিরোধ হল, তখন নিজের মতে নিজের পথেই চলতে দিলেন তাঁকে। নিজেরও আদর্শ পরিবর্তন করলেন না, তাঁকেও পরিবর্তন করবার জন্যে জবরদস্তি করলেন না। তাঁর সহধর্মিণীকেও তিনি পৌত্তলিকতা থেকে জোর করে বিরত করতে চেষ্টা করেননি। তাঁর এই স্বাধীনতা-নিষ্ঠা যদিও সোম-শুভ্রের মনকে খুবই নাড়া দিয়েছিল, তবু তিনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজে ঢোকবার চেষ্টা করেননি, তার কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, স্বাদেশিকতার ছদ্মবেশে সে সমাজে যে সনাতনী মনোবৃত্তি তখনও ওতঃপ্রোত হয়ে ছিল, তা ঠিক সংসারমুক্ত মনোবৃত্তি নয়। উপবীতধারী ব্যক্তি-মাত্রকেই ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। কেশব সেনের অতি-প্রগতিশীল আন্দোলনেও তাঁর চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয়নি, তা যেন বড্ড বেশি পাশ্চাত্য-ঘেঁষা ছিল। যদিও তিনিও মিশনারিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন, তাঁর 'সুলভ সমাচার' যদিও স্বদেশী ভাবই উদ্দীপ্ত করত তখন সকলকার মনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যেন যীশুখ্রীষ্টেরই ভক্ত হয়ে পড়লেন। যীশুখ্রীষ্টের ওপর কারও বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু দেশে তখন 'স্বদেশী' ভাব জেগেছে—বেদান্ত উপনিষদ ছেড়ে বাইবেলের ব্যাখ্যা শোনবার প্রবৃত্তি কমে আসছিল শিক্ষিত যুবকদের। দেশী কুসংস্কার এবং পাশ্চাত্য-বিহ্বলতা—এই উভয়েরই বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ তাঁর। তাই হংস-শুভ্র যখন মেতেছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্জের দলে, সোম-শুভ্র তখন দীক্ষা নিচ্ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে দীক্ষা নিচ্ছিলেন বলে যে মহর্ষির দলের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তা মোটেই নয়। নবগোপাল মিত্রের এবং রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধ তখন কোন্ যুবকের প্রাণে সাড়া না জাগাত! নবগোপাল মিত্রের নামই ছিল 'ন্যাশলাল মিত্তির'। তাঁর কাগজের নাম ছিল 'ন্যাশনাল পেপার'। তাঁর হিন্দুমেলায়, শঙ্কর ঘোষ লেনে তাঁর কুস্তির আখড়ায় সে যুগে কে না গেছে! সেই কুস্তির আখড়ায় সোম-শুভ্রও লাঠি খেলা, ছোরা-খেলা, তরোয়াল-খেলা শিখেছিলেন একদিন। লর্ড লিটন আসবার পর অবশ্য থেমে গেল সেসব। কেশব সেনের বক্তৃতা শুনতেও সাগ্রহে যেতেন তিনি। যেতেন না কেবল 'পলিটিক্যাল' সভায়। সেকালের বক্তৃতা-মুখর পলিটিক্যাল আন্দোলনে তাঁর প্রাণ ঠিক সাড়া দিত না। তাঁর মনে হত, সাহেবী পোশাক পরে বিলিতী মদ খেয়ে সভায় সভায় সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের লম্বা বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি যদি কার্যত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের মর্যাদা আমরা না দিতে পারি? আমাদের নিজেদেরই সমাজে যখন জাতিভেদের অসাম্য, স্ত্রীলোকদের পরদা সরিয়ে দেবার সাহস নেই, কুসংস্কারের পঙ্কে সমস্ত দেশ যখন পঙ্কিল, ভ্রাতৃবিরোধই যখন সমাজের প্রাত্যহিক ঘটনা, তখন সেখানে নিজেরা সেসব দূর করবার চেষ্টা না করে বক্তৃতা করলেই কি দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে? স্বায়ত্ত-শাসন তিনিও কাম্য মনে করতেন; কিন্তু তার চেয়েও তিনি বেশি কাম্য মনে করতেন স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্যতা অর্জন করাকেই। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি, তাই এ কথাটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায়নি যে, জনসাধারণ কর্তৃক জনসাধারণের হিতের জন্য যে শাসনবিধি আমরা চাইছি, তা কখনও স্থায়ী হবে না, জনসাধারণ যদি তার উপযুক্ত না হয়। নিজের চিত্ত স্বাধীন না হলে সত্যিকার স্বাধীনতা কে দিতে পারে? সমাজের পায়ে অসংখ্য কুসংস্কারের শৃঙ্খল আমরা নিজেরাই পরিয়ে রেখেছি, অথচ তার অগ্রগতির জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি বিদেশী বড়লাটকে। এই হাস্যকর ব্যাপারে তাঁর মন কখনও সাড়া দেয়নি। তাই তিনি কংগ্রেস-সভায় বিদ্রোহমূলক বক্তৃতা করবার চেষ্টা না করে সত্যি সত্যি বিদ্রোহ করেছিলেন সমাজের বিরুদ্ধে। প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁর পৌরুষ যেন কৃতার্থ হয়েছিল। ধর্মের প্রতি অনুরাগের জন্যে তিনি ব্রাহ্ম হননি, ব্রাহ্মধর্ম সে যুগে বিদ্রোহের প্রতীক ছিল বলেই তিনি সে ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আসলে তিনি বিদ্রোহী ছিলেন। কোনও গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তিনি যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি, তার প্রমাণ—ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেননি। সে সমাজেরও নানা কুসংস্কার, নানা গোঁড়ামি তাঁর মনকে পীড়িত করত। শেষকালে সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল অধিকাংশ ব্রাহ্মদের 'হামবড়া' ভাব। মুখে যদিও সকলে বিনয়ের অবতার ছিলেন, কিন্তু আচারে-ব্যবহারে কথায়-বার্তায় তাঁরা এমন ভাব প্রকাশ করতেন অব্রাহ্ম হিন্দুদের সম্পর্কে যে, সোম-শুভ্রের লজ্জা করত। কারও সঙ্গে খাপ খায়নি বলেই তিনি পালিয়েছিলেন বাংলা দেশ ছেড়ে বেহারের দেহাতে, এবং সেখানেই স্কুল করে, হাসপাতাল করে নিজের আদর্শ-জীবন-যাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন এতকাল। এক সময়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, বেহার অঞ্চলে অনেকখানি জমি কিনে নির্যাতিত ব্রাহ্মদের জন্যে একটা উপনিবেশ স্থাপন করবেন,—অনেকেই তখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্যে নির্যাতিত হতেন। অনেককে সাহায্য করতেন তিনি। ভেবে-চিন্তে উপনিবেশ স্থাপন করবার বাসনা ত্যাগ

করেছিলেন তিনি শেষকালে। ভেবে দেখলেন, এতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হওয়া সম্ভব। বহু সম্প্রদায়-বিভক্ত এই দেশে আর একটা সম্প্রদায় বাড়ালে বিরোধের আর একটা বীজ বপন করা হবে মাত্র। এটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায়নি যে, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটা প্রত্যঙ্গ—ওটাকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক করবার চেষ্টা করা অনুচিত। ওর যেটুকু ধর্ম সেটুকু সনাতন হিন্দুশাস্ত্র থেকেই নেওয়া, আর যেটুকু ঢঙ্ সেটুকু বিদেশী জিনিস। উপনিবেশ স্থাপন করলে অনিবার্যভাবে সেই ঢঙটুকুকেই প্রশয় দেওয়া হবে। নিছক ধর্মচর্চার জন্যে আলাদা উপনিবেশ স্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। সমাজ-সংস্কার করতে গেলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবার চেষ্টা করাই ভাল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পর হয়ে যেতে হয়, তাতে লাভ হয় না, লোকসান হয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। ধর্মের জন্যে, আদর্শের জন্যে কষ্ট স্বীকার না করলে, ঠিক যেন মূল্য দেওয়া হয় না তার। সুতরাং উৎসাহী ব্রাহ্ম-হিতৈষী হিসাবে ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁর খুব খাতির ছিল না। বন্ধু সুরেশ্বর ছাড়া আর কারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠও ছিলেন না তিনি। বেহারের যে অংশে তিনি জমি কিনেছিলেন, তা নেহাতই দেহাত—রেল-স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে—মেশবার মত বাঙালীও কাছে-পিঠে ছিল না বড় একটা। বেহারী জনমজুর, বেহারী চাকর-গোমস্তা, স্কুল, হাসপাতাল আর চাষ-বাস নিয়েই থাকতেন তিনি। বই পড়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। বাংলা দেশের সঙ্গে যোগ ছিল বাংলা সাহিত্যের মারফত। বাংলা ভাষার প্রত্যেক লেখককে তিনি চিনতেন। সাহিত্য ছাড়া তাঁর আর একটি শখ ছিল, তা বাগানের—শুধু ফলের নয় ফুলেরও। প্রকৃতির কোলেই কেটেছে সারাটা জীবন। তাই কোন বিষয়ের কোন গোঁড়ামিই তাঁর মনকে আবিল করে তোলেনি। তিনি মনের শুভ্রতা সত্যিই বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিবাহ করেননি, কোন স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসেননি, মিথ্যা কথা বলেননি, হীন কাজ করেন নি কখনও কোনও রকম। তাঁর মনের আর একটা অবলম্বন ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। কলেজ-জীবনে আর্টের চেয়ে বিজ্ঞানের প্রতিই বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর, বিশেষ করে উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতি। উদ্ভিদ-জীবনের গহন রহস্যে নানা তত্ত্ব অনুসন্ধান করে দিনের পর দিন তিনি কাটিয়েছেন। যশোলিপ্সা থাকলে তাঁর ওই সব অপূর্ব, অদ্ভুত এবং অনেক সময় আজগুবি গবেষণা ছাপিয়ে তিনি নাম করতে পারতেন, কিন্তু সেসব দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। সত্যকে সন্ধান করবার যে আনন্দ সেই আনন্দেই মশগুল থাকতেন, সে সব লিপিবদ্ধ করে কাজে লাগাবার খেয়াল কখনও হয়নি। এমনও হয়েছে যে, তাঁর কল্পনা, তাঁর গবেষণা অনেক পরে অন্য বৈজ্ঞানিকের যশের কারণ হয়েছে, কিন্তু সেজন্যে কখনও ক্ষুব্ধ হননি তিনি, আনন্দিতই হয়েছেন। গাছেরও যে অনুভূতি আছে—এ কথা জগদীশচন্দ্রের বহুপূর্বে তাঁর মাথায় এসেছিল। জগদীশচন্দ্র, ঠিক তাঁর সহপাঠী না হলেও, সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যখন উদ্ভিদের অনুভূতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, তখন সোম-শুভ্র নিজের কল্পনাকে একজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় মূর্ত দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। গাছের অনুভূতিই নয়, গাছ বিষয়ে নানা উদ্ভট কল্পনা আছে তাঁর। তাঁর ধারণা, পশুপক্ষীরাই শুধু যে মানুষের অনুরাগ বিরাগ বুঝতে পারে তা নয়, গাছেরাও পারে। গাছকে ভালবাসলে সে হৃষ্ট হয়, ঘৃণা করলে ক্লিষ্ট হয়। বায়লজিস্টরা গাছকে জীব-জগতের নিম্নতম স্তরে স্থান দিয়েছেন, গাছের পূর্ণ পরিচয় এখনও ঠিকমত পাননি বলে। ঘোড়ার শরীরে ডিপ্‌থিরিয়া এবং টেটানাস ঢুকিয়ে যখন প্রতিষেধক অ্যান্টি-টক্‌সিন তৈরি করা সম্ভব হল, তখন

সোম-শুভ্রের মনে হল, গাছের শরীরেও যদি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে গাছও হয়তো প্রতিষেধক কোনও ঔষধ প্রস্তুত করতে পারে। যে গাছ জীব-জগতের এত আহার এবং ঔষধ যোগাচ্ছে, তার পক্ষে এও অসম্ভব না হতে পারে। এই সব নিয়ে তাঁর কল্পনা-বিলাসের অন্ত নেই। এই সম্পর্কেই বিশেষ করে তিনি এবার কলকাতায় এসেছেন।

হংস-শুভ্র এসে প্রবেশ করলেন। উঠে দাঁড়ালেন সোম-শুভ্র।

ব'স ব'স। একটা কথা জানতে এলাম। শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশনের খবর পেয়েছ তুমি?

হ্যাঁ, দুতরফ থেকেই পেয়েছি। শঙ্খর শ্বশুড়বাড়ি থেকেও নিমন্ত্রণ করেছেন আমাকে। আগামী রবিবারে তো?

রবিবারে হবে না। ছুটির দিন দেখে অন্নপ্রাশন হয় না, শুভদিন দেখে হয়। পরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ভাল দিন আছে, সেই দিনই ঠিক করছি। তুমি থাকতে পারবে তো? প্রায় দিন দশেক পেছিয়ে গেল।

পারব।

তা হলে তো ভালই হল, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা হচ্ছিল। মৃগাঙ্ককেও চিঠি লিখে দিই তা হলে, তার এখন বম্বে যাওয়ার দরকার নেই। কংগ্রেসের একটা মীটিঙে ও না গেলে দেশোদ্ধার আটকে থাকবে না। সবাই দেশোদ্ধার করতেই মত্ত—নিজেকে উদ্ধার করা যে আগে দরকার, তা কেউ বুঝবে না।

হীরক এবং রজতের মুখ তাঁর মনে পড়ল। এই পৌত্র দুটির জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তাঁর। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে আজকাল ভাবাই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। হীরক জেলে; রজতের পেছনে নাকি এখনও পুলিস ঘুরছে, এত খরচ করা সত্ত্বেও। রজতের সম্বন্ধে একটা যা ভরসার কথা, ছোকরা প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে। মেয়েটাও নেহাত তুচ্ছ করবার মত নয়, কালো চোখের চাউনিতে আলো আছে। কাজলের ঢলঢলে মুখখানা মনে পড়ল। মুখে যদিও কিছু বলেননি তিনি, কিন্তু এক নজর দেখেই এই নাত-বউটিকে ভারি পছন্দ হয়েছিল তাঁর। রজত কি একে ফেলে পালাতে পারবে? কিন্তু রজত সব পারে। একটুও মুখবিকৃতি না করে কুইনিন-মিক্শ্চার খেয়ে বাজি জিতেছিল, একদিন ছেলেবেলায়। ট্রেন ফেল করে তুমুল বৃষ্টিতে হেঁটে এসেছিল কেবল কথা রাখবার জন্যে। সব পারে। আজকালকার এই ডাকাত ছেলেগুলোর অসাধ্য কিছু নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মনে হল, এর আগে এ দেশে এ রকম ছেলে ছিল কি? ক্ষুদিরাম? কানাইলাল?—বারীনের নামটা মনে পড়তেই মনটা খিঁচড়ে গেল হঠাৎ। না—না....হঠাৎ নজর পড়ল, সোম-শুভ্র তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

আশ্বস্ত হয়ে বললেন, ও, আচ্ছা, তুমি থাকছ তা হলে। দেখ, ভাবছি এই বোধহয় আমার জীবনের শেষ কাজ একটু ভাল করেই করব। কাশী থেকে ভাল পুরোহিত আনিয়ে রীতিমত যজ্ঞ করে, বুঝলে—,

উৎসাহভরে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন, সোম-শুভ্র চাল বাছছেন—ইতিপূর্বে আরও দু একবার দেখেছেন, তবু মেজাজটা বিগড়ে গেল নতুন করে।

গমনোদ্যত হয়ে বললেন, আচ্ছা, বিকেলে সব কথা হবে এখন।

বিকেলে আমি কলকাতা যাব ভাবছি।

ও, আচ্ছা।

একটু দ্রুতপদেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সোম-শুভ্র প্রশান্তভাবে চাল বাছতে লাগলেন। মিনিট দুই পরে একটা কাচের কুঁজো হাতে করে তারাপদ প্রবেশ করলে।

এই দেখ, তোমার মনোমত হয়েছে কি না। তিন বার ধুয়েছি।

কুঁজোটা তুলে ধরলে। সোম-শুভ্র-ভ্রূ-কুঞ্চিত করে দেখলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, এখনও ময়লা ভাসছে। থাক্ রেখে দাও তুমি, আমি নেব ঠিক করে এখন।

কোথা ময়লা, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু।

আবার বেরিয়ে গেল তারাপদ। একটু পরেই আবার জল ভরতি কুঁজো নিয়ে ঢুকল।

নাও, দেখ।

সোম-শুভ্র দেখে বললেন, রেখে দাও। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, রেখে দাও না, আমি সব ঠিক করে নেব।

তা তো নেবে। কিন্তু ওদিকে বড় কর্তা যদি টের পায় যে, তুমি নিজে সব ঠিক করে নিচ্ছ, তা হলে আর আস্ত রাখবে না আমাদের কাউকে। তোমাদের বংশে রাগটি তো কারও কম নয়, নেপালী চাকরটাকে এমন খড়ম ছুঁড়ে মারলে সেদিন যে—

তারাপদ!

হংস-শুভ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ওই শোন। এখন কলকাতা ছুটতে হবে আমাকে। অন্নপ্রাশনের তারিখ-ফারিখ সব উল্টে দিয়ে বসে আছে। যজ্ঞ হবে। বাণীকণ্ঠকে তার করা হয়ে গেছে।

বাণীকণ্ঠ কে?

এবাড়ির তোমরা কেউ চেন না তাকে। ওর এক ক্লাসের ইয়ার ছিল আগ্রায়। চমৎকার সারেঙ্গ বাজায়, এই তার গুণ।

তারাপদ!

উচ্চতর গ্রামে হংস-শুভ্রর ডাক শোনা গেল আবার।

আমি যাই। ইন্দু রইল, সে সব ঠিক করে দেব।

তারাপদ!

তারাপদ চলে গেল। কুকারের বাটিগুলি গরম জলে সাবান দিয়ে ধুয়ে একটা ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে ইন্দু প্রবেশ করলে একটু পরে।

চালগুলো ধুয়ে আনি?

আন, ছাড়বে না যখন।

ইন্দু, নিখুঁত নিপুণতা সহকারে বাছা চালগুলি গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সোম-শুভ্র ডালে মন দিলেন।

।। দুই ।।

সোম-শুভ্র কলকাতায় এলে পরমানন্দের বাসাতেই ওঠেন। শশাঙ্কের বাসায় উঠতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয় তাঁর। বাসন্তি এ নিয়ে অনেক অনুযোগ করেছে, কিন্তু তবুও তিনি ওঠেন নি। শঙ্খ রজত হীরক—এদের কাউকে তিনি চেনেন না। শশাঙ্ককে চেনেন, কিন্তু—এই কিন্তুটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি। অন্নপ্রাশনের দিনে যেতে হবেই, ভিড়ে গোলমালে কেটে যাবে কোন প্রকারে, এই ভরসা।

পরমানন্দ এবং অনামিকাকে আগে থাকতেই খবর দিয়েছিলেন। খবর না দিয়ে কোথাও যান না তিনি। পরমানন্দ এবং অনামিকা বিকেলে বেরিয়ে পড়ে সাধারণত। কোন মহদুদ্দেশ্য নয়, আড্ডা দিতে যায়। পরমানন্দ যায় নবকুমারের বাড়িতে, অনামিকা ইলার। পরমানন্দের চাকরি হয়েছে, নবকুমারের হয়নি। নবকুমার 'অধরা' নামক মাসিক-পত্রিকার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক। অনামিকার বিয়ে হয়েছে, ইলার হয়নি। ইলাও বিনা বেতনে শিক্ষয়িত্রীগিরি করেন সদ্য-স্থাপিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ে। পরমানন্দ নবকুমার শুধু যে এক জাতের লোক তা নয়, এক ধাতেরও। দুজনেই নোট-বই মুখস্থ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করেছে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণও করেছে, কিন্তু একজনও ঠিক ব্রাহ্মণ প্রকৃতির নয়। সুলভ সংস্করণের নানা পুস্তকের দৌলতে দুজনেই বিশেষ করে নবকুমার—আধুনিক জগতের অনেক সংবাদ রাখে। ফড়ফড় করে অনেক কিছু আউড়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে সাধারণত যে কোন লোককে। কিন্তু অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ওরা ঠিক ব্রাহ্মণ নয়, এমন কি শিক্ষিতও নয়। ওরা পল্লবগ্রাহী মাত্র। ওরা নানা বই থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ করে, চতুর্দিকে আস্ফালন করে বেড়ায় নিজেদের জাহির করবার জন্যে এবং সেটাও নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে। শিক্ষাটা মনে প্রবেশ করলে যে সংকোচ, যে দ্বিধা, যে বিনয় আত্মপ্রচারে বাধা সৃষ্টি করে, তা এদের নেই, এবং নেই বলেই যেন এরা গর্বিত। অনামিকা-ইলারও সেই দশা। লোক-দেখানো শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষিত হয়নি। মনোজগতের নয়, বস্তুজগতের সুখ-সুবিধা আহরণের জন্যেই ছটফট করে বেড়াচ্ছে সর্বদা নানা ভাবে নিজেদের ঢাক পিটিয়ে।

তবু সোম-শুভ্র এদের কাছেই আলোচনা করবেন ঠিক করেছিলেন। যদিও তিনি পরমানন্দকে মানুষ করেছেন এবং নিজে পছন্দ করেই অনামিকার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছেন, তবু এদের যে তিনি ঠিক চেনেন না, তা তিনি নিজেও বুঝতেন। আজকাল কোন ছেলেকে মানুষ করা মানে, তার জন্যে মাসে মাসে নিয়মিতভাবে কিছু অর্থ ব্যয় করা। সে সত্যিই মানুষ হচ্ছে কি না, তা নির্ধারণ করা সত্যিই প্রায় অসম্ভব। পছন্দ করে বিয়ে দেওয়াটাও অনেকটা ওই জাতীয় অসম্ভব ব্যাপার। যে মেয়েটিকে পছন্দ করা যায়, সে সত্যিই পছন্দসই কি না, তা এক নজর দেখে বা সামান্য একটু আধটু খবর নিয়ে বোঝা শক্ত। এসব জানা সত্ত্বেও সোম-শুভ্র এদের কাছেই নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আলোচনা করবেন ঠিক করলেন, তার কারণ, যৌবনের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, অসম্ভব এবং আজগুবি কল্পনা পরিহাসের পরিবর্তে স্বপ্ন উদ্রিক্ত করতে পারে কেবল যৌবনের মনেই। যৌবনের প্রতি তাঁর এই আস্থার গভীরতা এত অধিক ছিল যে, আধুনিক ছেলেমেয়েদের চপলতা, বিলাসপ্রবণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বেচালকেও তিনি সহ্য করতেন। মনে করতেন, প্রাণের জীবন্ত প্রবাহ

স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের তৈরি কৃত্রিম গণ্ডি অতিক্রম করে যায় মাঝে মাঝে। চিরকালই যায়। ও নিয়ে বেশি বিচলিত হয় তারাই, যারা সত্যকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। তবে এটাও ঠিক যে তিনি বেচাল পছন্দ করতেন না, সভ্যসমাজের রীতিনীতি মেনে চলাটাই ভাল লাগত তাঁর, নিজেও মেনে চলতেন। জীবন্ত প্রাণের আবেগকে স্বীকার করতেন বলেই তার দুর্দমনীয়তাকেও মানতেন। এই আবেগকে শুধু যে মানতেন তা নয়, এর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর।

জীবনের ছিয়াত্তর বছর যখন পূর্ণ হল, হঠাৎ যখন তাঁর পুরাতন ভৃত্য ঝক্‌সু সন্ন্যাস-রোগে মারা গেল এক ঘন্টার মধ্যে, তখন তাঁর মনে হল, জমা-খরচ মিলিয়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ এবার ঠিক করে ফেলা উচিত। যে কোন মুহূর্তে তাঁরও মৃত্যু হতে পারে। বিবাহ করেননি, উত্তরাধিকারী কেউ নেই। দশ লক্ষ টাকার যে পৈতৃক সম্পত্তি তিনি পেয়েছিলেন, তা থেকে কিছুই তিনি প্রায় খরচ করেননি। হাজার দশেক টাকা খরচ করে জীবনের প্রথম ভাগে তিনি সস্তায় যে দুশো বিঘে জমি কিনেছিলেন, তা থেকে শুধু তাঁর ভরণ-পোষণ নয়, অনেক উদ্বৃত্তও হয়েছে। স্কুল এবং হাসপাতাল চালাতে কিছু খরচ হয়েছে অবশ্য, বন্ধুবান্ধবরাও মাঝে মাঝে নিয়েছেন কিছু, শশাঙ্ককে কিছু দিয়েছিলেন একবার, পরমানন্দর জন্যেও কিছু গেছে, কিন্তু তবু এখনও সবসুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁর ব্যাঙ্কে জমা আছে। এ টাকাটার একটা সুব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া তাঁর যে সব গবেষণামূলক অদ্ভুত কল্পনা আছে, সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূর্তি দেবার চেষ্টা করাও উচিত—সম্ভব হলে যন্ত্র-সহযোগে সেসবের যথার্থ্যও প্রমাণ করতে হবে। এই সম্পর্কে তাই তিনি পরমানন্দ এবং অনামিকাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, তারা যেন তাদের দু-একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আনে বুধবার সন্ধ্যায়, সেই দিন তিনি কলকাতায় পৌঁছবেন এবং তাদের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে দু একটা আলোচনা করবেন। পরমানন্দ অনামিকা তাই সেদিন আড্ডা দিতে না গিয়ে নবকুমার-ইলাকেই নিমন্ত্রণ করেছিল নিজেদের বাড়িতে। নবকুমার কাগজের সম্পাদক, সবজান্তা, সবাইকে তাক লাগিয়ে কথা বলে। ইলা বি. এস-সি. পড়েছিল, তারও বৈজ্ঞানিক হতে বাধা নেই।

সোম-শুভ্র ঠিক সময়ে এসে পৌঁছলেন এবং পরমানন্দ, অনামিকা, নবকুমার, ইলার সম্মুখে এমন সসঙ্কোচে তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধটি পাঠ করলেন যে, যেন তিনি বিশ্ববিখ্যাত কোন বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মুখে কতকগুলি হাস্যকর উদ্ভটতার অবতারণা করে ধৃষ্টতা প্রকাশ করছেন।

পরমানন্দ অনামিকা সোম-শুভ্রের কাছে নানা ভাবে উপকৃত। এমন কি তাদের আশাও আছে যে, হয়ত সোম-শুভ্র তাদেরই তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যাবেন। সুতরাং সোম-শুভ্রের যে কোন প্রকার অদ্ভুত আচরণই তারা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তারাও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল (নবকুমার-ইলার কাছে) যখন তিনি অবিচলিত গাম্ভীর্য সহকারে ব্যক্ত করলেন যে, গাছেরাও মানুষেরই মতই কথা কয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করে। তাঁর মতে আমরা যাকে মর্মর বলি, তা ঠিক একই ধরনের ধ্বনি নয়। বিভিন্ন গাছের মর্মর যে বিভিন্ন তাই শুধু নয়, একই গাছের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ঋতুতে মর্মরধ্বনি বিভিন্ন—এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। বাতাসের গতি-বেগ এবং পত্রের আকৃতির ওপরই মর্মরধ্বনি প্রধানত নির্ভর করে, তা তিনি জানেন; কিন্তু এও তিনি অনুভব করেছেন এবং তার কতকটা প্রমাণও পেয়েছেন যে, কেবল বাতাসের গতিবেগ ও পত্রের আকৃতি দিয়েই সর্বপ্রকার মর্মরধ্বনির ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বিষয়ে গাছেদের নিজেদেরও যেন সজ্ঞান কিছু প্রচেষ্টা আছে বলে মনে

হয় তাঁর। যন্ত্র দিয়ে তিনি মেপে দেখেছেন যে, একই উত্তাপে ও বায়ুমণ্ডলের চাপে একই বাতাসের গতি-বেগে একই গাছ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রকম মর্মরধ্বনি শোনায়। ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র থাকলে তিনি প্রমাণ রাখতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর মতে গাছের ভাষা শুধু শ্রাব্য নয়, দর্শনীয়ও। চক্ষু এবং কর্ণ উভয় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে সে ভাষার মর্ম গ্রহণ করতে হয়। গাছের সব পাতা একসঙ্গে কাঁপে না, সব পাতার ওপর সূর্যালোক সমভাবে প্রতিফলিত হয় না। শুধু ফোনোগ্রাফ নয়, সিনেমাটোগ্রাফও দরকার, যদি কেউ বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছের ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা করতে চান। গাছের ভাষা শ্রাব্য এবং দৃশ্য তো বটেই, তা ছাড়া আর একটা জিনিস আছে বলেও তাঁর মনে হয়। সিম্‌বায়োসিস বলে যেমন এক ধরনের জীবনযাত্রা-প্রণালী উদ্ভিদ ও পশু-জগতে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন—যাতে দুটি বিভিন্ন প্রাণী অথবা উদ্ভিদ যৌথভাবে পরস্পরের সাহায্যে নিয়ে প্রাণ ধারণ করে--তেমনই, সোম-শুভ্রের ধারণা, গাছের ভাষা ও পাখির গান, গাছের ভাষা ও পতঙ্গের গুঞ্জন, পরস্পর পরিপূরক। একের সাহায্যে ব্যতিরেকে অপরে ঠিক যেন মূর্ত হতে পারে না। তাই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে গাছের ভাষার রূপও বিভিন্ন। সোম-শুভ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, তারা তাদের এই বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাব-বিনিময়ও করে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কল্‌কেফুলের গাছের পাতায় পাতায় হঠাৎ একটা শিহরণ জাগল, একটা কোকিল ডেকে উঠল তার ডালে। ঠিক পাশেই একটা আতা গাছ, একই রকম হাওয়া বইছে কিন্তু তাতে শিহরণও নেই, কোকিলও নেই। কিন্তু আর একটু দূরে আর একটা কল্‌কেফুলের গাছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাগল অনুরূপ শিহরণ, তার ডালেও ডেকে উঠল কোকিল। মনে হল, দুটো গাছ যেন কথা কয়ে উঠল একই ভাষায়। এসব ঘটনা এত বার তিনি লক্ষ্য করেছেন যে এদের তিনি কাকতালীয়বৎ বলে উড়িয়ে দিতে চান না। তবে তাঁর এই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য যে সব প্রমাণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তা ঠিক করে উঠতে পারেননি তিনি। তবু তিনি এগুলো ছাপার অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখতে চান এই উদ্দেশ্যে যে, ভবিষ্যৎ যুগের কোন বৈজ্ঞানিক হয়তো এ-নিয়ে কাজ করতে পারবেন, তাঁর এ কল্পনাও হয়তো সত্যরূপে মূর্ত হবে কোনদিন ভবিষ্যৎ কোন জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাবলে।

সম্পাদক নবকুমারের মনে হল, সোম-শুভ্র বোধ হয় এই সব প্রলাপ তার 'অধরা' পত্রিকায় ছাপাতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাকে বোধ হয় নিমন্ত্রণ করিয়েছেন আজ। এই হাস্যকর ব্যাপার বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই নিবৃত্তি করা উচিত, নবকুমারের মনে হল। কর্তব্য-প্রণোদিত অপ্রিয় কার্যটাকে কৌশলে মোলায়েম করবার উদ্দেশ্য তাই সে বললে, আপনার প্রবন্ধটা আমার কাগজে নিতে পারতাম; কিন্তু তাতে এত গম্ভীর প্রবন্ধ ঠিক চলবে কি না, বুঝতে পারছি না। আমার কাগজ ঠিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা তো নয়। তবে—

সোম-শুভ্রকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকতে দেখে নবকুমার থেমে গেল।

তোমার কাগজ আছে নাকি?

আমার ঠিক নয়। প্রোপ্রাইয়েটার হচ্ছেন রামদাস মল্লিক। আমি সহকারী সম্পাদক।

প্রোপ্রাইটার না বলে, প্রোপ্রাইয়েটর বললে, কারণ তার গর্ব, ইংরেজী কথা যখন বলে তখন অভিধান-সম্মত শুদ্ধ উচ্চারণই করে থাকে সে। সব সময় সফল হয় না যদিও কারণ সে ইংরেজ নয়, তবু চেষ্টা করে। বেণীমাধবের অভিধান উলটে-পালটে আজই সকালে প্রোপ্রাইয়েটর তার চোখে পড়েছিল। তাক মাফিক লাগিয়ে দিলে।

সোম-শুভ্র প্রশ্ন করলেন, রুবি মিলের রামদাস মল্লিক নাকি?

হ্যাঁ।

কাগজের নাম কি?

'অধরা'।

রামদাস মল্লিক সোম-শুভ্রের অপরিচিত নন। তিনিও ব্রাহ্ম। এই অজুহাতে এবং অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন এই কারণ দেখিয়ে বহুকাল পূর্বে তিনি সোম-শুভ্রের কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা চাঁদা নিয়েছিলেন। অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন,—হাজার টাকা অবশ্য আর কেউ দেননি, কিন্তু দশ বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ একশো—যার কাছে যতটুকু নেওয়া যায় তিনি নিয়েছিলেন। অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য হয়নি, কিছুকাল পরে একটি তেলের কল স্থাপিত হয়েছিল। বিধবাদের সঙ্গে এই তেলের কলটির কিছু সম্পর্ক যে ছিল না, তা নয়। রুবি-নাম্নী যে বিধবা মেয়েটির প্রেমে প'ড়ে রামদাস মল্লিক দ্বিতীয় পক্ষে তাকে বিয়ে করেছিলেন, তার নামের সঙ্গে মিলটির নাম যুক্ত ক'রে বিধবা-প্রীতির কিছু পরিচয় মল্লিক মশায় দিয়েছিলেন। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যায় না যে মল্লিককে, তিনি আজকাল 'অধরা' নামক এক পত্রিকারও স্বত্বাধিকারী হয়েছেন—এই বার্তা শুনে সোম-শুভ্রের মনের নেপথ্যে যে রসিকতা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তার আভাস মুখে অবশ্য ফুটল না কিছু। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে তিনি বললেন, ও! তোমাদের কাগজে চলে না বুঝি এ ধরনের লেখা?

আজ্ঞে না। আমরা পোস্ট-জর্জিয়ান লিটারারি মুভ্‌মেণ্ট নিয়েই আছি। তারই রূপটা বাংলা ভাষায় ফোটাতে চেষ্টা করছি।

হচ্ছে না কিন্তু কিছুই। —কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে বলেই সোম-শুভ্রের মুখের দিকে চেয়ে ইলা বুঝলে যে, কথাটা এখন এ ভাবে বলাটা অশোভন হয়েছে। ইলার অপ্রতিভ ভাবটা দেখে অনামিকাকে ঘাড় ফিরিয়ে হাস্য গোপন করতে হল। পরমানন্দ দৃষ্টির ইঙ্গিতে নবকুমারকে অনুরোধ করতে লাগল, যেন সোম-শুভ্রকে খুব বেশী নিরুৎসাহিত না করা হয়। সোম-শুভ্র প্রবন্ধের পাতাতেই নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। এসব তিনি দেখতে পেলেন না। বলা বাহুল্য, 'অধরা' পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপাবার কোনও আগ্রহ তাঁর জাগল না। জাগলেও তার জন্যে নবকুমারের অনুগ্রহপ্রার্থী হবার দরকার হত না তাঁর, রামদাস মল্লিক যখন সে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। কিন্তু এত কথা তিনি নবকুমারকে বললেন না। ক্ষণকাল নীরব থেকে একটু সসঙ্কোচেই তিনি বললেন, আমি যা লিখেছি তা বিশেষ কিছু নয় হয়তো, কিন্তু তবু এটা ছাপাব ঠিক করে ফেলেছি। ছাপালে পঞ্চাশ-ষাট পাতার একখানা চটি-বই হবে। এক হাজার কপি ছাপাতে কত খরচ পড়তে পারে?

নবকুমার উত্তর দিলে, দেড় শো টাকার মধ্যেই হবে।

দেড় হাজার টাকায় তা হলে দশ হাজার কপি হবে।

একেবারে দশ হাজার কপি ছাপাবেন? অত কি বিক্রি হবে?

বিক্রি করব না, বিতরণ করব।

এর জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। চর্তুদিকে সকলের যখন এত অভাব, তখন শুধু শুধু দেড়

হাজার টাকার এই অপব্যয়। পরমানন্দকে মানুষ করেছিলেন বলেই বোধ হয় তার ধারণা ছিল যে, সোম-শুভ্রের টাকাকড়িব ওপর তার একটা ন্যায্য দাবি আছে। তাই সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, তার মানে?

মনে করেছি, লাখ খানেক টাকা কোনও ভাল ব্যাঙ্কে জমা করে যাব। তারই সুদ থেকে প্রতি বছর এই বই ছাপা হয়ে বিতরিত হবে। হাজার দুই-তিন সুদ হবে বোধ হয়। দেড় হাজার যদি বই ছাপানোর খরচ হয়, বাকিটা হবে বিতরণের খরচ। যিনি বিতরণ করবেন, তাঁকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে, টিকিট প্রভৃতিও লাগবে কিছু—

ইলা আবার কথা কয়ে উঠল অপ্রত্যাশিতভাবে, আপনার টাকা অবশ্য আপনি যেমন ভাবে খুশি খরচ করতে পারেন---

তারপর একটু হেসে বললে, এ দেশে এখনও সে স্বাধীনতা আছে; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এতগুলো টাকা আরও ঢের ভালভাবে 'ইউটিলাইজ' করা যেত।

সোম-শুভ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন এবং চুপ করেই হয়তো থাকতেন, যদি না তাঁর মনে হত যে, তাঁব নীরবতাকে হয়তো উপেক্ষা বলে মনে করবে মেয়েটি। মৃদু হেসে তাই উত্তর দিলেন, সেটা নির্ভর করে ইউটিলিটি কাকে বল তুমি, তার ওপর। তোমার শাড়ি দেখে আমার কিন্তু ভরসা হচ্ছে যে, আমাদের দুজনের আদর্শে খুব বেশি তফাত নেই।

ইলার দামী রেশমের শাড়িটাব দিকে সস্নেহে চাইলেন তিনি।

ইলা লজ্জিত মুখে বললে, এর দামই বা কত? আর এ কটা টাকা দিয়ে কটা লোকেরই বা উপকার হবে? কিন্তু আপনার ওই এক লাখ টাকা দিয়ে—

তেত্রিশ কোটি লোকের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবলে এক লাখ টাকাও কিছু নয়। আর একটা স্কুল তৈরি করে আরও গোটাকতক লোককে কেরানী হবার সুযোগ দিতে চাও? না, আর কোন হিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কতকগুলো চোরকে প্রশ্রয় দিতে চাও? তোমার মতে কি হলে ভাল হয়, শুনি?

আপনার ওই বই ছাপিয়েই বা কি হবে?

হয়তো কিছু হবে না। আবার এমনও হতে পারে যে, আজ যা আজগুবি বলে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাই হয়তো কোন বৈজ্ঞানিকের প্রতিভায় প্রদীপ্ত হয়ে মানব-সভ্যতার রূপই বদলে দেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—

কথাটা বলতে গিয়ে একটু ইতস্তত করে থেমে গেলেন তিনি। ঘড়িতে আটটা বাজল। অনামিকাকে উঠে পড়তে হল। সোম-শুভ্রের আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। রাত্রে অবশ্য দুধ ছাড়া তিনি খাবেন না কিছু এবং সে দুধটুকুও নিজের প্যানে নিজের স্টোভে গরম করে নেবেন; কিন্তু তারও ব্যবস্থা করতে হবে অনামিকাকেই। অনামিকা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, সোম-শুভ্রের কথাবার্তা শুনে কিছু বলবার আর প্রবৃত্তিও ছিল না তার। আলেয়াকে নির্ভরযোগ্য আলো মনে করে বিভ্রান্ত পথিক অবশেষে যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, সোম-শুভ্রের আলোচনা শুনে অনামিকার মনের অবস্থাও অনেকটা তেমনই হয়েছিল। নিরীহ নির্দোষ পরমানন্দের ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছিল তার। একেই বলে—কালনেমির লঙ্কা ভাগ। সোম-শুভ্রের টাকার ওপর নির্ভর করে বালিগঞ্জের চৌমাথার ওপর জমির দর করা হচ্ছিল। দেড় শো টাকা মাইনের কেরানীর আশাও কম নয়! বামন হয়ে চাঁদে হাত মনের মধ্যে তুষানল জ্বলছিল

অনামিকার। সে আর বসে থাকতে পারলে না, উঠে গেল। পত্নীর মনের অবস্থা পরমানন্দেরও অজ্ঞাত রইল না। হঠাৎ বেফাঁস কিছু বলে না বসে! অনামিকার পিছুপিছু সেও উঠে গেল।

নবকুমার বললে, আপনার সবচেয়ে বড় কথাটা কি, তা তো বললেন না?

আমার নিজের তৃপ্তি।

একটু চুপ করে থেকে সোম-শুভ্র আবার বললেন, লম্বা লম্বা বক্তৃতার আড়ালে এই সত্য কথাটা ঢাকা পড়ে যায় অনেক সময়। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, বিবেকানন্দ পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক কবি দার্শনিক দেশনেতা সকলেই যা সন্ধান করেছেন, তার নাম আত্ম-তৃপ্তি। দৈবক্রমে তাতে আর পাঁচজনের উপকার হয়ে গেছে। না-ও যদি তা হলেও তাঁরা স্বধর্মচ্যুত হতেন না।

এতটা বলে সহসা তাঁর মনে হল, আত্ম-প্রশংসা করা হচ্ছে। সসঙ্কোচে চুপ করে গেলেন।

ইলা মুখরা মেয়ে। বলে উঠল, দশজনের উপকার করে যাঁরা তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁরাই পৃথিবীতে পূজনীয় কিন্তু।

ঈষৎ হেসে সোম-শুভ্র বললেন, পৃথিবীতে এ রকম লোক থাকাও অসম্ভব নয়, যাঁরা দশের পূজা এড়াতে চান। মানুষ অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণাকেই পূজা করে কিনা। গ্যালিলিও যদি লোকের পূজা চাইতেন—

এখন কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক মাত্রেই পূজনীয় নন কি?

এখন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তাঁব মতকে সমসাময়িক বিজ্ঞেরা শুধু আজগুবি বলেই মনে করেনি, তাঁকে লাঞ্ছিতও করেছিল সেজন্যে।

তারপর একটু হেসে বললেন, তা বলে আমি এ কথা বলতে চাই না যে আমি গ্যালিলিওর সমকক্ষ! এটা হয়তো আমার বাজে খেয়াল মাত্র। তর্কের খাতিরেই তর্ক করছিলাম শুধু।

এ পর্যন্ত বলে স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন তিনি।

একটু পরে নবকুমার কথা কইলে, ইলা দেবী কম্যুনিস্ট, তাই আপনার খেয়াল বোধ হয় ভাল লাগছে না ওর।

সোম-শুভ্র সস্নেহে ইলার দিকে চাইলেন।

ইলা বলে উঠল, যে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কম্যুনিস্ট না হয়ে পারে না। বর্তমান যুগে কম্যুনিজ্‌মই মুক্তি। আপনার মনে হয় না তা?

সোম-শুভ্র বললেন, হ্যাঁ, যাদের খেটে খেতে হবে, তাদের পক্ষে মুক্তি বইকি।

সকলেরই খেটে খাওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক সভ্যসমাজের উচিত—প্রত্যেক কর্মীকে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া।

সব মানুষের পক্ষে কি এক নিয়ম খাটে? তুঁতগাছ গুটিপোকার পক্ষে হিতকর স্বীকার করি, কিন্তু সব পোকার পক্ষে নয়। এমন কি সেই গুটি পোকাই যখন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়, তার পক্ষেও নয়। সেও তখন তুঁতপাতায় আবদ্ধ থাকে না, ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। গুটিপোকার চক্ষে যেটা নিরর্থক বিলাস, প্রজাপতির পক্ষে সেইটেই সার্থক কর্ম। এক নিয়ম কি খাটে সকলের বেলায়? বিশেষত মানুষের বেলায়?

উপমা দিয়ে কথা কইলে পারব না। নবকুমারবাবুর মত সাহিত্যিক তো আমি নই, লেখাপড়া শিখে বেকার বসে আছি, কারও গলগ্রহ হয়ে থাকবার ইচ্ছে নেই। তাই মনে হয়, সোভিয়েটের দেশে থাকলে হয়তো সসম্মানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতাম।

সোম-শুভ্র চুপ করে বসে রইলেন। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগল তাঁর। তাঁর বিশ্বাস যে, প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম-অনুসারে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য। মানুষের তৈরি সাম্যবাদের ছদ্মবেশ এতবার ধরা পড়েছে যে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন, জীবনটা সত্যিই যদি একটা যুদ্ধ হয় এবং তার প্রধান অস্ত্র যে শক্তি, তা প্রকৃতিই সকলকে যদি সমানভাবে না দিয়ে থাকেন, তা হলে নিখুঁত সাম্যের আশা দুরাশা মাত্র, আদর্শবাদীর স্বপ্ন শুধু। বাস্তব-জগতে সেটাকে মুখোশরূপে ব্যবহার করে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে নিজেদের কাজ হাসিল করে নেবেন হয়তো; কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গরাজ্য অথবা খ্রীষ্ট-বিরোধী লেনিনের সাম্যরাজ্য দুর্বলের কল্পলোকে অথবা আদর্শবাদীর স্বপ্নলোকেই থেকে যাবে। জীবলোকে তা কোনদিনই মূর্ত হবে না, হবার উপক্রম করবে, কিন্তু হবে না। এসবই জানেন তিনি। তবু রঙিন-শাড়ি-পরা ছিমছাম এই মেয়েটির—বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, যার কোন দুঃখই নেই, অথচ অন্তরে যার এত গ্লানি—এর স্বরূপ জানতে পেরে এবং নিজের সচ্ছলতার সঙ্গে তার তুলনা করে তাঁর ভদ্র অন্তঃকরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

নবকুমার একটু অধীর হয়ে উঠেছিল। সোম-শুভ্র অথবা ইলা কাউকেই তাক লাগাতে না পেরে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। অবশেষে সে উঠে পড়ল।

কিছু যদি মনে না করেন, আমি উঠি এখন।

খাবে না এখানে?

পরমানন্দ খেতে বলেছিল; কিন্তু হঠাৎ এখন মনে পড়ল, সার নীলরতনের সঙ্গে একটা ''এন্‌গেজমেণ্ট আছে আমার—থাকতে পারব না।

আচ্ছা।

নবকুমার রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ের পানের দোকানে একটা পাসিং-শো সিগারেট কিনে দেশলাইয়ের ওপর সেটা লঘুভাবে ঠুকতে ঠুকতে আগের মতই অস্বস্তি ভোগ করতে লাগল। ওখান থেকে উঠে এসে বা মিছে করে সার্ নীলরতনের নাম করে অস্বস্তির কিছুই উপশম হল না। নবকুমার চলে যাবার পর ইলা সোম-শুভ্রের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললে, আমি কিন্তু অত সহজে নিস্তার দিচ্ছি না আপনাকে। আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব।

আমি বুড়ো মানুষ, তোমার সঙ্গে পারব কি?

দ্বারপ্রান্তে অনামিকাকে দেখা গেল। সমস্ত মুখ থমথম করছে তার। স্টোভ জ্বেলেছি, আসুন। ইলা তুমিও এস, খাবার দেওয়া হচ্ছে।

নবকুমারবাবু কোথা গেলেন?

তাঁর একটা এন্‌গেজমেণ্ট ছিল, চলে গেছেন তিনি।

সকলে উঠে ভেতরের ঘরে গেলেন।

।। তিন ।।

সোম-শুভ্র নিবিষ্টচিত্তে বসে হিসেব লিখছিলেন। প্রত্যহ নিখুঁতভাবে পাই-পয়সার হিসেব মিলিয়ে তবে তিনি শুতে যান। বহুকাল থেকে এ কাজ করে আসছেন। আধ পয়সার হিসেব গোলমাল হয়ে গেলে রাত্রে ঘুম হয় না—আধ পয়সার জন্যে নয়, হিসেবে গোলমালের জন্যে। কোন হিসেবের একচুল গোলমাল অসহ্য তাঁর পক্ষে। সারাজীবন তিনি এমন নিখুঁতভাবে হিসেব রেখেছেন যে, যে-কোন মুহূর্তে বলে দিতে পারেন, জীবনে কত কুলি-ভাড়া দিয়েছেন, কত কাপড় কিনেছেন, কত চাল-ডাল কিনেছেন। সমস্ত প্রকার খরচের নির্ভুল হিসেব আছে তাঁর কাছে। শুধু টাকাকড়ির ব্যাপারেই নয়, সব ব্যাপারেই তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ম-নিবদ্ধ। কোন প্রকার অনিয়ম তাঁর সহ্য হয় না। এমন কি বিছানার চাদর কোথাও যদি সামান্য কুঁচকে থাকে, তা হলেও তাঁর অস্বস্তি বোধ হয়। ঘুম আসতে চায় না, সেটা ঠিক করে না নেওয়া পর্যন্ত মনের ভেতর খচখচ করতে থাকে। এ রকম লোকের জীবন অশান্তিপূর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু সোম-শুভ্রের জীবন আশ্চর্য রকম শান্তিপূর্ণ, কারণ তিনি স্বাবলম্বী, কারও কাছে—এমন কি নিজের চাকরদের কাছেও—জোর-গলায় কিছু দাবি করবার আত্মম্ভরিতা তাঁর নেই। বরং তার ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয়, তিনি সর্বদাই সঙ্কুচিত, যেন নিজের অস্তিত্ব দ্বারাই তিনি জীবনযাত্রায় বাধা-সৃষ্টি করছেন এবং সকলে তা সহ্য করছে বলে সকলের কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ।

ইলা এসে প্রবেশ করলে।

আমি আপনার বিছানাটা ঠিক করে দিয়ে যাই।

না না, কিছু দরকার নেই, তুমি বাড়ি যাও। আমি নিজেই করে নিতে পারব। অনু কেমন আছে?

ভাল আছে। সে-ই আসছিল, আমিই মানা করলাম তাকে। একটু চুপ করে শুয়ে থাকুক।

এর আগে কি ওর ফিট হয়েছি, কখনও?

কই, শুনিনি তো।

ইলা সোম-শুভ্রের বিছানা খুলে পাততে লাগল, সোম-শুভ্র বাধা দিতে পারলেন না--কোন ব্যাপার নিয়ে বেশী বাদ-প্রতিবাদ করাটাও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি হাসিমুখে হিসেব লিখতে লাগলেন।

মশারির দড়ি নেই বুঝি? নিয়ে আসি।

সব আছে; দাঁড়াও, দিচ্ছি।

সোম-শুভ্র উঠে তোরঙ্গ খুলে (সুটকেস পছন্দ করেন না তিনি) এক গুলি টোয়াইনের শক্ত সুতো, চারটি ছোট পেরেক এবং একটি ছোট হাতুড়ি বার করে ইলাকে দিলেন।

এসব আপনি সঙ্গে রাখেন বুঝি?

সোম-শুভ্র একটু হাসলেন শুধু। ওই তোরঙ্গের মধ্যে কত রকম জিনিস যে তাঁর সংগ্রহ করা আছে, তা দেখলে ইলা অবাক হয়ে যেত। খাম, পোস্টকার্ড, টিকিট, মনিঅর্ডার ফর্ম, চিঠি লেখার কাগজ, কলম, নিব, আলপিন, ফাউন্টেন পেন, ব্লটিং, সাধারণ পেন্সিল, লাল-নীল পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, দেশলাই, গালা, শিলমোহর, হরিতকী, মাজন—এসব তো আছেই,

অনেকেরই থাকে; কিন্তু এসব ছাড়াও এমন অনেক জিনিস আছে, যা অনেকের থাকে না। কয়েকটা ছোট ছোট কৌটোতে আধলা, পয়সা, আনি, দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা, এমন কি কয়েকটা গিনিও আলাদা আলাদা করা আছে। কয়েকটা শক্ত খামে আছে নানা মূল্যের নোট। এসব ছাড়া ছোট পুঁটুলিতে নানা রকমের কাপড়ের টুকরো, নানা রঙের সুতোর গুলি, সরু মোটা ছুঁচ, নানা ধরনের ছোট বড় বোতাম সংগ্রহ করা আছে। যখনই যে কাপড়ের জামা অথবা মশারি করান, তখনই তার খানিকটা ছাঁট সংগ্রহ করে রেখে দেন, ভবিষ্যতে যদি তালি দিতে হয়—এই ভেবে। পড়বার সময় চশমা লাগে, দু'জোড়া করিয়ে রেখে দিয়েছেন—এক জোড়া হঠাৎ হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেলে অসুবিধেয় যেন পড়তে না হয় অথবা অপরকে যেন অসুবিধেয় ফেলতে না হয়। অভিজ্ঞতা থেকে সোম-শুভ্র এটা বুঝেছেন যে, অ-গোছালো হলে নিজের তো অসুবিধে হয়ই, আশেপাশে যারা থাকে তারাও অস্বস্তি ভোগ করে। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি না পেলে জীবনযাত্রার ছন্দে তাল কেটে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায় যেন।

না না, ও ঠিক হচ্ছে না, ঠিক সমান করে মেপে নাও, যেখানে সেখানে পেরেক ঠুকলে ঠিক হবে না। মশারির চারিটি খুঁট ঠিক সমান হওয়া চাই তো।

আপনি কি লিখছেন লিখুন না, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সোম-শুভ্র আর বাধা দিলেন না, লিখতে লাগলেন; কিন্তু মনে মনে বুঝলেন, ঠিক হচ্ছে না, ও চলে যাবার পর ঠিক করে নিলেই হবে। যথাসাধ্য ভাল করেই ইলা মশারি টাঙালে, বিছানা-পাতা শেষ করে বললে, দেখুন।

চমৎকার হয়েছে।

যাবার আগে ইলা লীলাভরে হেসে বললে, আপনার যে এত কাজ করে দিচ্ছি, আমার একটু স্বার্থ আছে।

কি?

আমি যে স্কুলে পড়াই, সেখানে আমাকে মাইনে দেয় না। ভবিষ্যতে মাইনে পাব—এই আশায় ঢুকেছিলাম। স্কুলের যিনি সেক্রেটারি, তিনি এখন বলছেন, বি.টি. পাস লোক নেওয়া হবে। আমি যদি এক বছরের মধ্যে বি.টি. পাস করতে পারি, তা হলে তাঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন, না পারলে অন্য লোক নেবেন। স্কুলের সেক্রেটারি অনাদি সেন আপনাকে খুব খাতির করেন, আপনি যদি একটু রেকমেণ্ড করে দেন আমাকে—

কি রেকমেণ্ড করব?

আমাকে যেন চাকরি করতে করতে বি.টি.পাসের সুযোগ দেওয়া হয়। ওঁরা ইচ্ছে করলে তিন বছর পর্যন্ত সময় দিতে পারেন। আমি তা হলে টাকা কিছু জমিয়ে দিতে পারি, বি.টি. পড়ার অনেক খরচ তো।

কত খরচ?

তা মাসে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। এক বছরে ছ-সাত শো টাকা লাগবে। আপনি একটা চিঠি লিখে দিলেই কিন্তু হয়ে যায়।

তাদের স্কুলের বিষয় তো আমি কিছুই জানি না। তারপর একটু হেসে বললেন, তোমার বিষয়েই বা এমন কি জানি! চিঠি দেওয়াটা কি ঠিক হবে!

বেশ, তবে দেবেন না।

প্রণাম করে বেরিয়ে গেল ইলা। সোম-শুভ্র লক্ষ্য করলেন, তার হাসি-হাসি মুখখানি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। খুব খারাপ লাগতে লাগল তাঁর। কিন্তু কি করবেন তিনি, এমন ভাবে চিঠি দেওয়াটা কি উচিত হত? উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব মেটাতেই সারাজীবনটা কেটে গেল! কি যে কর্তব্য, তা ঠিক করা এত কঠিন। ইলার মুখখানা বারম্বার ভেসে বেড়াতে লাগল মনের ওপর। একখানা হাজার টাকার চেক লিখে দিলেই বোধ হয় ওর সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু এমনভাবে মহত্ত্ব আস্ফালন করে অপরিচিত একজন মেয়েকে একটা চেক ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে যে ইতরামি আছে, তার মধ্যে তার মধ্যে যেতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। তারপর হঠাৎ আর একটা কথাও মনে হল। যে শিব-শুভ্রের টাকা তিনি পেয়েছেন, তাঁর আত্মা যাতে তৃপ্ত হবে, টাকাটা কি সেই ভাবেই খরচ করা উচিত নয়? শশাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে হল। কে জানে, তার ব্যবসা কেমন চলছে আজকাল! বহুদিন তার কোনও খবর পাননি। গায়ে পড়ে খবর নিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। সে-ও বোধ হয় সঙ্কোচভরেই তাঁর কাছে আসতে পারে না। নিতান্ত প্রয়োজনবশেই সেবার আসতে হয়েছিল বলে মনে মনে লজ্জিত হয়ে আছে বোধ হয়। শশাঙ্কের ছেলে শঙ্খ, তারও আবার ছেলে হয়েছে! শিশু শশাঙ্ক-শুভ্রের মুখটা মনের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। চুপ করে বসে রইলেন তিনি।

শশাঙ্ক-শুভ্র

।। এক।।

কোন দামী মোটরকার যদি দৈব-দুর্বিপাকে বার বার ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরে যায় এবং যদি একাধিক মূর্খ মিস্ত্রী সস্তায় সেটাকে সারিয়ে দেবার অজুহাতে নানা রকম জোড়া-তালি লাগায় তাতে, তা হলে তার যা অবস্থা হয়, শশাঙ্ক-শুভ্রের বর্তমান অবস্থা অনেকটা তাই। শশাঙ্ক-শুভ্র মোটরকার নন—মানুষ, তাই অবস্থাটা জটিলতর।

প্রথম ধাক্কা খান যৌবনের প্রারম্ভে। বর্তমানের সাহেবী-স্যুট-পরা প্রৌঢ় শশাঙ্ক-শুভ্রকে দেখে অনুমান করা কঠিন যে, যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একদা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হয়ে বোমার দলে যোগ দিযেছিলেন। দেশের বাগ্দীদের সংঘবদ্ধ করে, ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করবার কল্পনাও তাঁর মাথায় একদিন এসেছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করের বই, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গান, সুরেন বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' তাঁরও চিত্তকে উদ্বোধিত করেছিল সেদিন স্বাধীনতার মন্ত্রে। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে মেরে কানাইলাল যখন ফাঁসি গেলেন, তখন যুবক শশাঙ্ক-শুভ্রও ঠিক করে ফেললেন যে, ওঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন তিনি। ও-পথে বিনা-বাধায় চলতে পেলে তিনি ঠিক কি যে হতেন, তা এখন আন্দাজ করা শক্ত। কিন্তু সে-পথে চলবারই সুযোগ তিনি পাননি ভালভাবে। যাত্রা করবার মুখেই তিনি ধাক্কা খেলেন। পথ-রোধ করে দাঁড়ালেন পিতা হংস-শুভ্র স্বয়ং। অনুগৃহীত একজন পুলিশ-কর্মচারীর মুখে যেই তিনি খবর পেলেন যে, শশাঙ্ক বোমার দলে মিশেছে, অমনই ডেকে পাঠালেন তাকে।

তুমি বোমার দলে যোগ দিয়েছ শুনছি।

দিয়েছি।

ও-দলে যোগ দেবার মত মনের জোর আছে তোমার?

আছে।

বেশ, দেখা যাক।

ড্রয়ার থেকে প্রকাণ্ড একটা চকচকে ছোরা বার করে বললেন, এই নাও। আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে কিছুতেই বোমার দলে যেতে দেব না। তোমার যদি মনের জোর থাকে, এই ছোরা আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে চলে যাও।

ছোরা হাতে করে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

হংস-শুভ্র বললেন, বুঝেছি। দাও ছোরাখানা। ইংরেজদের তাড়াবার চেষ্টা না করে ওদের ভাল গুণগুলো নেবার চেষ্টা কর। তোমাকে বিলেত পাঠাব ঠিক করেছি, তার জন্যে প্রস্তুত হওগে যাও।

বিলেত যাওয়ার নামে স্বদেশ-প্রেম কর্পূরের মত উবে গেল যেন।

ধাক্কাটা সামলাতে মাসখানেক লেগেছিল তবু।

মাস ছয়েক পরে বিলেত চলে যান তিনি।

দ্বিতীয় ধাক্কাটা খেয়েছিলেন বিলেতে—জনৈক বন্ধুর সঙ্গে সাহেবিয়ানায় পাল্লা দিতে গিয়ে। সেও আজ অনেক দিনের কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ছেলেটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভাব হয়েছিল, সেই ছেলেটিই যে ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর অধঃপতনের কারণ হবে —এ কথা তখন কে ভেবেছিল! অন্তরঙ্গতার অন্তরালে যে ঈর্ষার বীজ লুক্কায়িত ছিল, তা প্রথম অঙ্কুরিত হল একটি তরুণী মেমসাহেবকে কেন্দ্র করে। সনৎকুমারও সুশ্রী, অভিজাত বংশীয় ধনীর সন্তান, শশাঙ্কের চেয়ে কোন অংশে কম তো নয়ই, বরং কোন কোন বিষয়ে এক-কাঠি বাড়া। ছিপছিপে চেহারা, স্মার্ট যাকে বলে তাই। শশাঙ্ক ছিল মোটা নাদুস-নুদুস গোছের। নাচের আসরে কন্দর্পের বিচারে তারই জিত হল, বরমাল্যও হয়ত তারই গলায় দুলত, যদি স্বয়ং কুবের এসে মধ্যস্থতা না করতেন। নিছক টাকার জোরে শশাঙ্ক তাকে ছিনিয়ে নিয়ে, ঠিক পত্নীত্বে নয়, প্রণয়িনীত্বে বরণ করলেন। সনৎকুমার মুচকি হেসে চুপ করে রইলেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হল, হারটা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই শশাঙ্ককে হৃদয়ঙ্গম করতে হল যে, এই স্ত্রী স্বাধীনতার দেশে কোন ললনারই চরণে বা কণ্ঠদেশে কোনরকম শৃঙ্খলেরই স্থায়ী স্থান নেই, এবং তা নিয়ে হৈ-চৈ করাটা শুধু যে নিষ্ফল তা নয়, অশোভনও। দেঁতো হাসি হেসে শিভ্যল্রির অভিনয় করা ছাড়া উপায় নেই। সপ্তাহখানেক পরে তাই তিনি যখন টের পেলেন, তাঁরই দেওয়া সাড়ে সাত শো পাউণ্ডের নেকলেস গলায় দুলিয়ে তাঁর প্রণয়িনী সনৎকুমারের সঙ্গে প্যারিস ভ্রমণে গেছেন, তখন আরও কয়েক পাউণ্ড খরচ করে জরুরী তার যোগে তাঁকে উচ্ছ্বসিত আনন্দ-জ্ঞাপনও করতে হল। মর্মান্তিক সত্যটা মর্মে মর্মে অনুভব করেও কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্র থামতে পারলেন না। টাকা ঢালতে লাগলেন। যাঁদের টাকা ছাড়া আর কোনও সম্বল নেই, তাঁদের টাকার উপর অগাধ বিশ্বাস। তাঁদের ধারণা-টাকায় শেষ পর্যন্ত সব হয়। আকাশে পোস্ট-অফিস থাকলে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রকেও ঘুষ দেবার চেষ্টা করতেন বোধ হয় তাঁরা। বড়লোকের ছেলে শশাঙ্ক-শুভ্র দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান শূন্য হয়ে শুধু প্রণয় বাবদে নয়, নান বাবদে টাকা খরচ করে সনৎকুমারের সঙ্গে টক্কর দিতে লাগলেন। শেষটা হংস-শুভ্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলেন। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে পুত্রকে তিনি যা লিখলেন, তার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে—প্রিয় বৎস, একটা কথা যদি মনে রাখ, ভবিষ্যতে তোমারই উপকার হবে। প্রিন্স দ্বারকানাথের মত ধনীও অজস্র অপব্যয়ের আঘাতে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর তুলনায় আমাদের আয় সামান্য। বছরে মাত্র দশ লাখ টাকা। তোমার আরও চারটি ভাই, দুটি বোন আছে। প্রত্যেকের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাই তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার বরাদ্দ মাসহারার বেশি তুমি যা খরচ করবে, তা তোমার নামে লেখা থাকবে এবং তা তোমার অংশের প্রাপ্য থেকে বাদ যাবে ভবিষ্যতে। আর একটা কথা মনে রাখলেও সংযত হতে পারবে। কৃপণতা করে অকারণ কৃচ্ছ্রসাধন করা যেমন নোংরামি, বাহাদুরি করে পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে অকারণ অপব্যয় করাটাও তার চেয়ে কম নোংরামি নয়।

কিছুকালের জন্য সংযত হলেন শশাঙ্ক-শুভ্র এবং সেই সংযমের যুগেই কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রিটা অর্জন করলেন। সনৎকুমার হলেন ব্যারিস্টার। শশাঙ্ক-শুভ্রও যদি ব্যারিস্টারি পাস করে

আসতেন, তা হলে পরবর্তী যুগে জটিলতর সমস্যায় পড়তে হত না তাঁকে। স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করবার একটা পথ উন্মুক্ত থাকত। তিনি বিদেশী সভ্যতার হাব-ভাব কায়দা-কানুন সমস্ত আয়ত্ত করলেন, করলেন না কেবল বিদেশী প্রথায় টাকা রোজগার করবার কৌশলটা। চাকরি করলে কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রিটা হয়তো কাজে লাগতে পারত, যদি প্রথম প্রথম—মানে, বয়স থাকতে থাকতেই—তিনি সেটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বোমার দলে যিনি একদিন যোগ দিয়েছিলেন, 'অন প্রিন্সিপল' তিনি চাকরির বিরোধী ছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর তিনি যা করতেন, প্রায়ই 'অন প্রিন্সিপল' করতেন।

ফিরে এসে 'অন প্রিন্সিপল'ই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। পুরাতন যোগসূত্রকে পুনঃস্থাপন করবার জন্যই নয়—নূতন ক্ষুধাও একটা অনুভব করছিলেন। কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বিবেকানন্দের দিগ্বিজয়ের পর যে জাতীয়তা-বোধ কালক্রমে মিইয়ে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাতে যেন প্রাণসঞ্চার করলেন। জগৎ-সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব আবার নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হল যখন, তখন ভারতের জাতীয়তার প্রতীক যে কংগ্রেস, তাতে না দেওয়াটা ঘোরতর অকর্তব্য বলেই মনে হল শশাঙ্ক-শুভ্রের। গোখলে কিছুদিন আগে মারা গেছেন। ছাড়া পেয়েছেন তিলক। বিরুদ্ধপন্থী গোখলের চিতাপার্শ্বে তিলকের বক্তৃতাটা শশাঙ্ক-শুভ্রের এমন মর্ম স্পর্শ করল যে, তিলক-ভক্ত হয়ে পড়লেন তিনি হঠাৎ। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গোখলের 'সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া'র অধিনায়কত্ব করছেন বটে, কিন্তু তিলক তাঁর প্রাণেও সাড়া তুলেছেন। কোন্ কুল রাখবেন ঠিক করতে পারছেন না তিনি। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও তো নেতা হবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পারেনি। লালা লাজপত রায় দেশের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে একরকম বানপ্রস্থই অবলম্বন করেছেন আমেরিকায়। এস. পি. সিন্‌হা বম্বেতে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলেন বটে, কিন্তু তাঁর সুর পছন্দ হল না কারও। কিন্তু ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতি বুড়োর দল বাগড়া দিতে লাগলেন বলে শশাঙ্ক-শুভ্রের রাগ হল খুব। এ নিয়ে রাগারাগি তর্কাতর্কি ঘোরাঘুরি কম করেন নি; এস. পি সিন্‌হার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেছিলেন এবং কিছু করতে না পেরে শেষে যোগ দিয়েছিলেন তিলকের 'হোম-রুল লীগে'ই। তিলকের হোম-রুল আর পত্নী বাসন্তীর হোম-রুল কিন্তু এক নয়; তা ছাড়া বাসন্তীর বাবা একজন রায়-বাহাদুর। মনের প্রত্যন্তলোকে কিন্তু তিলক ভক্তিটা প্রাণপণে জাগ্রত রাখবার চেষ্টা করেছিলেন শশাঙ্ক-শুভ্র। তিলকই তাঁকে 'ডিসগ্যাসটেড' হবার সুযোগ দিলেন। তাঁর খুব খারাপ লাগল, যখন বিদ্রোহী তিলক মডারেটদের সঙ্গে আপস করে কংগ্রেসে ঢুকতে রাজী হলেন। যে ন্যাশনালিজমের বিপ্লবী সুর তুলেছিলেন তিনি, শশাঙ্কের মনে হল, তা অনেকখানি নেমে গেল যেন। একটা 'থিওরি'ই খাড়া করে ফেললেন তিনি—এদেশের জল-হাওয়ায় বিদ্রোহ টিকতে পারে না—ভারি স্যাঁতসেঁতে দেশ। স্যাঁতসেঁতে দেশ ছাড়াও যে প্রবলতর আর একটা কারণ আছে, তার প্রমাণও পাওয়া গেল। যতীন মুখুজ্জে বালাশোরের জঙ্গলে পুলিসের সঙ্গে লড়তে লড়তে প্রাণ দিলেন। বিবাহ করার ফলেই হোক বা বিশ্লেষণ করার ফলেই হোক, শশাঙ্ক-শুভ্রের ধারণা হল এ দেশে বিপ্লব-পন্থা অনুসরণ করা মানে প্রাণ দেওয়া বা নষ্ট করা। কোনটা করতেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। অথচ স্বদেশী কিছু একটা করবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল। এই সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালীর ছেলেকে ডাক দিয়ে বললেন—তোমরা ব্যবসা কর; স্বাধীন ব্যবসা করে নিজের পায়ে

দাঁড়াবার চেষ্টা করাটাই দেশসেবা করা। কথাটা বড় ভাল লাগল। যুদ্ধ বেধেছে, এই সময় দেশী 'ইন্‌ডাস্ট্রি' গুলোকে সচেতন করে তোলা যেতে পারে। আর একটা থিওরিও খাড়া করলেন। ইংরেজরা বণিক, আঁতে ঘা দিলেই ওরা টলবে। কতকগুলো কেরানী, উকিল আর মাস্টারের বাজে চীৎকার ওরা গ্রাহ্য করবে কেন? হঠাৎ ব্যক্তিগত একটা কথা মনে পড়াতে আরও বেশি উৎসাহিত হলেন। সনৎ ব্যারিস্টারি করে আর কটা টাকা রোজগার করতে পারবে? আমি যদি ভাল করে ব্যবসা করতে পারি, তরতর করে দুদিনেই উঠে যাব ওকে ছাড়িয়ে। ব্যবসাই করতে হবে।.... থিওসফি ত্যাগ করে অ্যানি বেসান্ট যখন 'সম্মিলিত' কংগ্রেসের অধিনেত্রী হয়ে পুরো দমে হোম-রুল আন্দোলন শুরু করেছেন, শশাঙ্কের মাথায় তখন অঙ্কুরিত হচ্ছে নানা রকম ব্যবসার প্ল্যান।

তৃতীয় ধাক্কা এইবার খেতে হল। ব্যবসা করতে হলে টাকা চাই এবং টাকার মূল উৎস হংস-শুভ্র। তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে তাঁর সঙ্গেই মনান্তর ঘটতে লাগল।

বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর শশাঙ্ক যা করতেন,'অন্ প্রিন্সিপল'ই করতেন। সুতীক্ষ্ণ একটা বিলেতী বিবেক তাঁর দেশী মস্তিষ্ক বিবরে আড্ডা গেড়ে ছিল। হংস-শুভ্রের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণ এই বিবেকই। হংস-শুভ্র নিজে এক কালে খুব সাহেব ছিলেন, এখন কিন্তু সাহেবিয়ানা তাঁর চক্ষুশূল। বিদেশী সভ্যতার আপাত-চটকদার জলুস একদিন তাঁর চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রতারিত করেছিল বলেই সে জলুসের ওপর এখন তিনি জাতক্রোধ। দেহ ও মন থেকে বাজে বিলিতী খোলসটাকে দূর করে দিয়ে যখন নিজের চতুর্দিকে হংস-শুভ্র সনাতনী পরিবেষ্টনী গড়ে তুলতে শুরু করেছেন, তখন শশাঙ্ক বিলেত থেকে ফিরলেন এবং পরিবর্তিত পিতাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। প্রথম প্রথম এ নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেননি তিনি। কিন্তু ক্রমেই দেখলেন, যাকে বার্ধক্য জনিত মস্তিস্ক-বিকৃতি ভেবে সানুকম্প লঘু হাস্যভরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তা মোটেই লঘু হাসিতে উড়ে যাবার মত হালকা জিনিস নয়। আঘাত করেও তাঁকে বিচলিত করা গেল না, কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ উড়ল শুধু, এবং তাতে ক্ষতি হল শশাঙ্ক-শুভ্রেরই। হংস-শুভ্রের মনস্তত্ত্বটা তিনি বুঝতে পারেননি সম্ভবত। পারলে এত কাণ্ড হয়তো হত না। হংস-শুভ্র সেকালে যেমন উগ্র সাহেব ছিলেন, একালে তেমনই উগ্র হিন্দু হয়েছেন। তফাত শুধু এই যে, উগ্র সাহেব হংস-শুভ্র তাঁর পারিপার্শ্বিককে মনের মত করে গড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন, ছেলেমেয়েদের সেই আদর্শে মানুষ করেছিলেন; কিন্তু উগ্র হিন্দু হংস-শুভ্র বৃদ্ধবয়সে নিজের দলে কাউকে পেলেন না। সাহেব হংস-শুভ্রের কীর্তিকলাপ হিন্দু হংস-শুভ্রের শান্তি বিঘ্নিত করতে লাগল এবং এইটেই বোধ হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করলেন না কারও কাছে, তাঁর নবতম ধ্বজাকে উদ্যত করে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও নিজের দুর্গে অটল হয়ে রইলেন। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যাই হোক, আধিভৌতিক হিসাবে এতে শশাঙ্ক-শুভ্রেরই ক্ষতি হল।

পিতার সঙ্গে শশাঙ্ক-শুভ্রের প্রথম সংঘর্ষের কাহিনীটা এই রকম। পিতামহ যোগীশ্বর এককালে স্বগ্রামে জগদ্ধাত্রীপূজা করতেন। শিব-শুভ্রও কিছুকাল করেছিলেন, পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। যোগীশ্বরের আদি নিবাস সেই হিঙ্গুল গ্রামে পুরাতন বাস্তু-ভিটা সংস্কার করিয়ে জগদ্ধাত্রীপূজা পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন হংস-শুভ্র। হিঙ্গুল গ্রাম স্থানটি মোটেই সুগম নয়।

রেল-স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে, কাঁচা-রাস্তায় গরুর গাড়ি করে যেতে হয়। বলা বাহুল্য, এসব বাধা প্রবুদ্ধ হংস-শুভ্রকে নিরস্ত্র করতে পারেনি। তিনি প্রতি বছর হিঙ্গুল গ্রামে যেতেন এবং আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতিবর্গ সকলকে নিমন্ত্রণ করে মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রীপূজা যথানিয়মে করতেন। পানা-পুকুরের জল, মশার কামড়, সুখাদ্যের অভাব প্রভৃতি তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে মৃগাঙ্ক ও ইন্দু তাঁর সঙ্গে প্রায় প্রতি বছরই হিঙ্গুল গ্রামে গিয়েছে। প্রথম যখন পূজা আরম্ভ হয়, তখন হিমাংশু সিতাংশু সুধাংশু—তিনজনেই বিলেতে। শশাঙ্ক ফিরেছেন এবং কিছুদিন হোম-রুল করে অবস্থান করছেন শ্বশুরবাড়ি দিল্লীতে। হংস-শুভ্র তাঁকে আসতে লিখেছিলেন; কিন্তু তিনি আসেননি, অক্ষমতা এবং দুঃখ জ্ঞাপন করে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন মাত্র। হিমাংশু, সিতাংশু এবং সুধাংশুকেও হংস-শুভ্র পত্রযোগে পূজার খবরটা সাড়ম্বরে জানিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন, উত্তরে তারাও অনুরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে। তিনজনেরই উত্তর এসেছিল, কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করা দূরের কথা, এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখই কেউ করেনি। হিমাংশুর চিঠি এক সুইডিশ প্রফেসারের গুণগানে ভরতি ছিল। ডোমিনিয়নের ডেলিগেট্‌স, বিকানীরের মহারাজা এবং সার্‌ এস. পি. সিনহাকে নিয়ে বিলেতে তখন যে ইম্পিরিয়াল ওআর কন্‌ফারেন্স বসেছিল, তাতে এস. পি. সিন্‌হার বক্তৃতায় ব্রিটিশ পাবলিক যে কি রকম মুগ্ধ হয়েছে, তারই বর্ণনা করেছিল সুধাংশু। আর সিতাংশু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল অ্যানি বেসান্ট, অ্যারুন্‌ডেল এবং ওয়াডিয়ার অন্তরিত হওয়ার খবরে এবং উল্লাস প্রকাশ করেছিল মিষ্টার জিন্না হোম-রুল লীগে যোগ দিয়েছেন বলে। বিলেতে বসেও ভারতবর্ষের খবর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল সে। সুরেন বাঁড়ুজ্জে, রাসবিহারী ঘোষ ভূপেন বোস, মদনমোহন মালবীয়, কে. জি. গুপ্ত. মহম্মদাবাদের রাজা, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, ভি. এস. শাস্ত্রী, সি. পি. রামস্বামী আয়ারকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে কংগ্রেস বিলেতে ডেপুটেশন পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চেম্বারলেন সাহেব কিছুতেই নিজের পলিসি প্রকাশ করলেন না, ভারতীয় সৈন্য-বিভাগে ভারতীয়দের কমিশন দিতেও চাইলেন না—সুতরাং সে ডেপুটেশন গেল না। সার্‌ এস. পি. সিনহাকে নিয়ে নমো-নমো করে যে কনফারেন্সটা হয়ে গেল, সিতাংশুর তা মোটেই মনঃপূত হয়নি। এই সব নিয়েই দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল সে। তবে সে-ই কেবল পুনশ্চ দিয়ে পুজোর বিষয় এক লাইন লিখেছিলেন—জগদ্ধাত্রী পুজোর খবরটা শুনে সে কিউরিয়াস হয়েছে। মৃগাঙ্ক তখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে। হংস-শুভ্র ঠিক করলেন, ওকে আর বিলেতে পাঠাবেন না। পাঠানওনি। সোম-শুভ্রও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, মানে, ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র একখানা ডাকযোগে তাঁর উদ্দেশ্যেও প্রেরিত হয়েছিল। অনুতপ্ত হংস-শুভ্র যখন সোম-শুভ্রকে পত্রযোগে আহ্বান করেন, এটা তার আগের ঘটনা। যোগীশ্বরের পৌত্র হিসাবে তাঁকে খবরটা দেওয়া উচিত—এই ভেবেই খবরটা দিয়েছিলেন হংস-শুভ্র। একটু খোঁচা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল হয়তো। সোম-শুভ্র এর উত্তরে দেবী সূক্তের একটা নূতন ধরনের ব্যাখ্যা এবং গ্রামের গরিব-দুঃখীদের খাওয়ার্বার জন্য শ' পাঁচেক টাকা পাঠিয়েছিলেন। শশাঙ্ক-শুভ্র শ্বশুরবাড়িতে বসে রইলেন, অথচ জগদ্ধাত্রী পুজোয় এলেন না, এতে হংস-শুভ্র মনে মনে খুবই চটলেন। মুখে কিন্তু কিছু বললেন না। পিতা-পুত্রে যে সংঘর্ষটা হয়ে গেল, তা মানসিক।

দ্বিতীয় বছরের পুজোয় শশাঙ্ক-শুভ্র কাঁচা রাস্তা ভেঙে শকটারোহণে হিঙ্গুল গ্রামে সস্ত্রীক হাজির হলেন। বাসন্তী জেদাজেদি না করলে সেবারও যেতেন কি না সন্দেহ। বাসন্তীর

জেদাজেদি করবার দুটো কারণ ছিল। বুদ্ধিমতী পুত্রবধূমাত্রেই শ্বশুড়-শাশুড়ীর স্নেহ আকর্ষণ করতে চায়। আমি সকলের স্নেহ আকর্ষণ করতে পারি, আমাকে দেখলে কেউ না ভালবেসে পারে না—এই ধরনের একটা গর্বও বাসন্তীর মনে সদা-জাগরুক থাকত এবং সে গর্বের ন্যায্য খোরাক সংগ্রহ করবার জন্যে সে না পারত এমন কাজ নেই। সবাই আমাকে ঘিরে বাহবা বাহবা করুক সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির কেন্দ্রবর্তিনী হয়ে না থাকলে জীবনই বৃথা—এই ছিল তার জীবনের মূল প্রেরণা। অনেকে এমনিতেই অর্থাৎ বাসন্তীর কোনো আয়াসের অপেক্ষা না রেখেই বাহবা দিত, অনেকের কাছে বাহবা আদায় করবার জন্যে বাসন্তীকে রীতিমত কষ্ট-স্বীকার করতে হত, তৃতীয় একটা একগুঁয়ে দল ছিল যারা কিছুতেই বাহবা দিত না। এই তৃতীয় দল সম্বন্ধে বাসন্তীকে বাধ্য হয়ে মিথ্যাভাষণই করতে হত—উচ্চকণ্ঠে সোচ্ছ্বাসে প্রচার করতে হত যে, ওরাও ওর সম্বন্ধে গদগদ। পরিচিত মহলে কেউ যে ওর সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে এবং আর পাঁচজনে সেটা জানবে, এ চিন্তা বাসন্তীর পক্ষে অসহ্য। তাই সেবার বাসন্তী প্রথমত এবং প্রধানত গিয়েছিল হংস-শুভ্রের বাহবা আদায় করবার জন্যে। দ্বিতীয় কারণটা—মজা দেখা। গরুর গাড়ি চড়ে মাঠের পর মাঠ ভেঙে পূর্ব পুরুষদের বাস্তুভিটেয় পৌঁছে, আত্মীয়-আত্মীয়া-পরিবৃত হয়ে জগদ্ধাত্রীপুজো দেখার মধ্যে যে মজা আছে, তা তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেওয়ার মত বস্তুতান্ত্রিক মন বাসন্তীর তখনও হয় নি। সেই সবে বিয়ে হয়েছে। শশাঙ্কর কিন্তু হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে যে মজায় তার মন সাড়া দিত, সে মজার প্রধান উপকরণ অর্থ। নিরর্থক গরুর গাড়ি চড়ে একটা অজ-পাড়া-গাঁয়ে গিয়ে জগদ্ধাত্রীপুজোর নামে অকারণ শক্তি ও সময় অপব্যয় করার মধ্যে কি মজা যে থাকতে পারে, তা তাঁর মাথায় আসেনি। কিন্তু তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তরুণী ভার্যা যখন হিঙ্গুল গ্রামে যাবে বলে ঝুঁকলে, তখন 'অন্ প্রিন্সিপল' তিনি বাধা দিতে পারলেন না। সঙ্গেও আসতে হল। দুরূহ রাস্তায় অবলা পত্নীকে একা আসতে দেওয়াটাও 'অন্ প্রিন্সিপল' অনুচিত। সুতরাং বিবেকের খাতিরেই সেবার শত অসুবিধা ভোগ করেও তিনি হিঙ্গুল গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন। আশা করেছিলেন, পিতা উল্লসিত হয়ে উঠবেন। হয়তো মনে মনে হয়েছিলেন, কিন্তু ভাষায় যা প্রকাশ করলেন, তাতে সুর কেটে গেল। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা ছিল নিম্নলিখিত প্রকার ঃ

হংস-শুভ্র খালি গায়ে একটি মোড়ার উপরে বসে হুঁকোয় কাঁঠালপাতার নল লাগিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। অদূরে একটা ঝি বাসন মাজছিল, খড়ো চালের একটি ঘরে নগ্নগাত্র কুৎসিত-দর্শন জনকয়েক ময়রা ভিয়ান চড়িয়েছিল, চণ্ডীমণ্ডপে অবস্থিত গ্রাম্য শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন জগদ্ধাত্রী-প্রতিমাটির সম্মুখে এক পাল উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ রুগ্ন ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভিড় করে। দূর-সম্পর্কীয় কয়েকজন আত্মীয়া সিক্তবসনে কলসী কাঁখে জল আনছিলেন পাশের পুষ্করিণী থেকে। এমন সময় গরুর গাড়িটা এসে থামল এবং তার থেকে নামলেন সাহেবী-সুট-পরা শশাঙ্ক-শুভ্র এবং হাই-হিল-জুতো-পরা বাসন্তী। উভয়ে এগিয়ে এসে প্রণাম করতেই হংস-শুভ্র হুঁকোটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, গুড মর্নিং, আশা করি, মিসেস মুখার্জির রাস্তায় কোনও রকম কষ্ট হয়নি।

শশাঙ্ক-শুভ্রের মুখ লাল হয়ে উঠল।

বাসন্তী কিন্তু একমুখ হেসে বললে, বাবা কি যে বলেন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে শশাঙ্ক-শুভ্র স্ত্রীকে বললেন, নুইসেন্স! এর পর আর থাকতে ইচ্ছে করছে না, চল, ফিরে যাই।

বাসন্তী আবার একমুখ হেসে বললে, পাগল নাকি!

মনান্তরের এই সূত্রপাত। বহুকাল পূর্বের এই সূত্রটি নানা ঘটনা পরম্পরায় নানারূপ আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক পাক খেয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছিল, তার ঠিক স্বরূপটি বাইরের লোকের দৃষ্টিগোচর হত না। কিন্তু এরই বিপাকে পড়ে শশাঙ্ক-শুভ্র ব্যবসায়-ব্যাপারে হংস-শুভ্রের দাক্ষিণ্য-লাভে বঞ্চিত হলেন। একটা-না-একটা খিটিমিটি লেগেই থাকত দু'জনের মধ্যে। বাসন্তী মাঝে মাঝে থাকাতে কলহটা কোলাহলে পরিণত হতে পারে নি। হংস-শুভ্র বাসন্তীকে যে খুব পছন্দ করতেন না নয়, বরং ঠিক উল্টো। মেয়েটার কোনো রকম খুঁত ধরতে না পেরে, তার সর্বদা সব রকমে সবাইকে খুশি করবার চেষ্টা দেখে, তার বাপের অগাধ ঐশ্বর্যের ঝনৎকারে মনে মনে জ্বলে যেতেন তিনি। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। কোন অজুহাতে না পেলে কি নিয়ে রাগ করবেন? বাসন্তী রাগ করবার কোন সুযোগই কখনও দিত না। মাঝে মাঝে মৃগাঙ্কর স্ত্রী কনকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তির্যক-পথে বাসন্তীকে আঘাত দেবার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু সে আঘাতও বাসন্তীকে কাবু করতে পারত না। কনকের আরও বেশী প্রশংসা করে বাসন্তী হংস-শুভ্রকে অপ্রতিভ করে দিত। হংস-শুভ্র মনে মনে চটতেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার উপায় থাকত না। শেষটা এমন হয়েছিল যে, হংস-শুভ্র বাসন্তীকে মনে মনে ভয় করতেন। বাসন্তীর মধ্যস্থতাতেই পিতা-পুত্রের অন্তরবহ্নি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠেনি। সব দিক বজায় রেখে সকলের প্রশংসা আদায় করে হাসিমুখে অসম্ভবকে সম্ভব করবার শক্তি পরিবারের মধ্যে একমাত্র বাসন্তীরই আছে। বাসন্তী হাসিমুখে কারও কাছে কখনও কিছু চাইত যখন, 'না' বলবার সামর্থ্য থাকত না তার। যা নিত, তার দশগুণ প্রত্যর্পণও করত সে নানা উপায়ে। আদরে, অবদারে, অভিমানে, অযাচিত উপহারে, অজস্র স্তুতিতে প্রত্যেক পরিচিত লোকের মনে যে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করত সে, তাতে কোন কিছু বেসুরো বাজা অসম্ভব। বাসন্তীর জগৎ ছিল ঐকতানের জগত। এরকম স্ত্রীকে নিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র বিব্রত হয়েছেন সারাজীবন। তাঁর সমস্ত হিসাব-নিকাশ, সমস্ত 'প্রিন্সিপল' বারম্বার ভেসে গেছে বাসন্তীর খুশির খরস্রোতে। বাসন্তী যা চাইবে তাই হবে। তাই হওয়াবে সে। অথচ বাসন্তীর উপর বেশিক্ষণ চটে থাকাও অসম্ভব। হেসে-কেঁদে শেষ পর্যন্ত সে ভাব করে নেবেই।

শশাঙ্ক-শুভ্রের সারাজীবনব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতার একটা কারণ হয়তো বাসন্তী। কিন্তু বাসন্তী না থাকলে তাঁর অশান্তি আরও শতগুণ বাড়ত। বাসন্তী থাকাতে অনেক অশান্তিজনক ব্যাপার গ্লানিকর হয়ে ওঠেনি তাঁর জীবনে। তিনি রেগে এমন অনেক কাণ্ড করে ফেলতে উদ্যত হয়েছেন, যার পরিণাম নিশ্চয়ই ভয়াবহ রকম বিষময় হয়ে উঠত, বাসন্তী যদি দু'হাত প্রসারিত করে না আটকাত তাঁকে। তাঁর হঠাৎ-রাগী চিত্ত-তুরঙ্গমের মুখে বাসন্তী-বল্গা না থাকলে কোন্ দিন কোন্ অতল গহ্বরে পড়ে তলিয়েই যেতেন তিনি। বাসন্তীকে না হলে তাঁর চলে না।

সবই বুঝতেন। কিন্তু তবু তাঁর দুঃখ হত। বাসন্তী যদি তাঁর মুখ চাইত একটু। বড্ড বেশি রকম খরচ করে—একেবারে বেপরোয়া। কিছু বলবার উপায় নেই, বললেও শুনবে না। ছেলেবেলা থেকেই ওই ভাবে মানুষ হয়েছে। বাপ অগাধ বড়লোক, আর সে তাঁর আদুরে মেয়ে।

।। দুই ।।

চাকরি-বিমুখ আভিজাত্য-গর্বে গর্বিত সাহেবী মেজাজ শশাঙ্ক-শুভ্র যদি দৈবাৎ আলাদিনের প্রদীপ একটা সংগ্রহ করতে পারতেন, তা হলে হয়তো তাঁর কোনোক্রমে কুলিয়ে যেত। অল্প আয়াসেই অর্থ-সমস্যা সমাধান করতে পারতেন তিনি। পিতৃ-প্রদত্ত বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বন্দীজীবন যাপন করতে হত না তাঁকে। আলাদিনের প্রদীপ আরব্য উপন্যাসের কল্পলোকেই সম্ভব—এ কথা শশাঙ্কর মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকের অবিদিত থাকবার কথা নয়; তবু তিনি সারাজীবনই ওই আলাদিনের প্রদীপের সন্ধানেই কাটিয়ে দিলেন। যৌবনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন তাঁর মনে, তদনুসারেই তিনি চলেছিলেন; কিন্তু তিনি মাড়োয়ারী নন, বাঙালী ভদ্রলোক—তাই জটিলতাই বাড়ল কেবল, অর্থাভাব ঘুচল না। যোগ্যতা থাক না থাক, অর্থ চাই-ই। পিতা বিমুখ—নিজেকেই উপার্জন করতে হবে তা। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে স্বল্প আয়াসে রাশি রাশি টাকা আসবে—সংক্ষেপে এই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বহুবিধ-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার হয়ে, নানা কারবারে বহু টাকা নিযুক্ত করে অল্প সুদে টাকা ধার করে বেশী সুদ-দেনেওয়ালা ব্যাঙ্কে তা জমা রেখে, নানা রকম শেয়ার কিনে এবং দাঁও মাফিক তা বিক্রি করে, নূতন ধরনের জীবনবীমা-কোম্পানি সৃষ্টি করে, আম জাম কাঁঠাল প্রভৃতি দেশী ফলকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিদেশী বাজারে চালান দিয়ে, দেশলাই-কারখানা বানিয়ে, নূতন ধরনের ভদ্র ছাপাখানা বানিয়ে—বিবিধ বিচিত্র উপায়ে তিনি অর্থাগমের উপায় আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু ব্যারিস্টার সনৎ-কুমারকে নিষ্প্রভ করে দেবার জন্যে। কিন্তু পারেন নি। পারেন নি, কিন্তু থামেনও নি। বিলিতী মদের মত বিলিতী ব্যবসায়ের নেশাও পেয়ে বসেছিল তাঁকে, অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছিল যেন। তিনি ছাড়তে চাইলেও সেই কম্‌লি কিছুতেই তাঁকে ছাড়ে নি। যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে—সাহেবী-মেজাজের লোক হলেও এই প্রবাদটি তিনি বিশ্বাস করতেন। বস্তুত তাঁর জীবনে এবং মনোবৃত্তিতে দেশী-বিদেশীর একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যাওয়াতে তিনি আরও বেশী বিপন্ন হয়েছিলেন। যদিও বোমা-নন্‌সেন্স্ তাঁর মন থেকে অনেক দিন আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল, কিন্তু মনে-প্রাণে তিনি ন্যাশনালিস্ট ছিলেন। এইজন্যেই হোক বা পরশ্রীকাতরতার বশেই হোক, সাহেবদের তিনি সুচক্ষে দেখতেন না। তাই পারতপক্ষে কোনো সাহেবী ব্যাঙ্কে তিনি টাকা রাখেন নি, কোনো ব্যবসায়ে সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত করেন নি। দেশী ব্যাঙ্কে টাকা রেখে দেশী কর্মচারীদের সহায়তায় তিনি সাহেব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করতেন। নিজে জমিদারের ছেলে, দিলদরিয়া আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন চিরকাল, ব্যবসায় পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে যে বক-ধ্যান বা কাক-বুদ্ধির প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। তিনি প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া করে ব্রেকফাস্ট্-লাঞ্চ-টিফিন-ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে দামী মোটরকার বাহিত হয়ে প্রতিদিন (হ্যাঁ, রবিবার ছাড়া প্রায় প্রতিদিনই) দেশী কর্মচারী চালিত ব্যবসায়ের কাগজী তত্ত্বাবধান করতেন ফ্যানের তলায় বসে বসে স্টেনো এবং প্রাইভেট সেক্রেটারির সহায়তায়। এই করতেই ঘেমে উঠতেন। নানারূপ স্নায়বিক অবসাদ ঘটত। বন্ধুবান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সপরিবারে সিমলা কিংবা শিলং দৌড়তে হত বছরে অন্তত একবার। ফলে যা হয়েছিল—বলা বাহুল্য—তার ইতিহাস অতিশয়

করুণ। দেশী ব্যাঙ্ক ফেল হল, দেশী কর্মচারীদের অপটুতা অসাধুতা প্রকট হয়ে উঠল ক্রমশ, মুখার্জি সাহেবের স্বদেশ-হিতৈষণা ঋণজালে জড়িত হয়ে উপহাসের খোরাক যোগাতে লাগল সকলের। শেষে দেশী চরিত্র, দেশী সংস্কার, দেশী প্রথা—এনিথিং দেশীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। বিদেশীদের উপর বরাবরই রাগ ছিল, স্বদেশীদের উপরও বীতরাগ হয়ে কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়লেন তিনি কিছুদিন।

চতুর্দিকে অব্যবস্থা; মাথায় নানা রকম বিজ্‌নেস-প্ল্যান; বাসন্তীর প্রশংসা-কাঙাল পর-ভোলানো ঘর-জ্বালানো স্বভাবের জন্যে সংসার-খরচ মাসিক দশ হাজারে উঠেছে; কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই—ছেলেরা অবাধ্য, প্রত্যেকটি কর্মচারী চোর; সনৎকুমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছে, চৌরঙ্গীতে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি কিনবে নাকি; অথচ তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কোনো দিকই সামলাতে পারছেন না। প্রত্যেকটি ব্যবসা টলমল করছে, কয়েকটা ডুবেই গেছে; কিছু টাকা পেলে হয়তো সামলে উঠতে পারা যেত—বেশি নয়, লাখখানেক টাকা। কিন্তু হংস-শুভ্র দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, বরাদ্দ টাকার বেশি এক কপর্দকও দেবেন না। নাতিদের টাকাদেবেন—শঙ্খ রজত হীরক কম টাকা ওড়ায় নি তাঁর—নিতান্ত বাজে ব্যাপারে উড়িয়েছে, কিন্তু ব্যবসায় উন্নতির জন্যে একটি পয়সা দেবেন না তাঁকে তিনি। কাশীর পণ্ডিতদের টাকা দিচ্ছেন, তাঁকে দেবেন না। অদ্ভুত মনোবৃত্তি!

এই সঙ্কটের মুখে শশাঙ্ক-শুভ্রের মনে পড়ল কাকামণিকে। কাকামণি ইচ্ছে করলে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। কাকামণি কেন যে ব্রাহ্ম হয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন শুধু শুধু, তা আজও তাঁর মাথায় ঢোকে নি। ধর্ম জিনিসটার উদ্ভব বর্বর সমাজের কুসংস্কার থেকে--আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই কথাই বলেন। নানা বুদ্ধিমান লোক ওই দিয়ে নানা ধরনের মুখোশ তৈরি করে নিজেদের কাজ হাসিল করেছে বোকা-বোকা লোকদের ঠকিয়ে যুগে যুগে। কাকামণি বোকা লোক নন, তিনি কেন যে প্যাঁচে পড়ে পর হয়ে গেলেন, তা শশাঙ্কের বুদ্ধির অতীত। এই সামান্য কারণে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা অনর্থক বাধো-বাধো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধো-বাধো ভাবটা কাটিয়ে উঠতে খুব বেশী সময় অবশ্য লাগেনি শশাঙ্ক-শুভ্রের। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ এর চেয়ে ঢের বেশী দুরূহ কাজ করে থাকে। ঠিক সময়েই কাকামণির কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি। এই সম্পর্কে কাকামণির যে ছবিটি তাঁর মনে আঁকা আছে, তাও অপরূপ। পূর্বে কোনো খবর না দিয়েই শশাঙ্ক গিয়েছিলেন। খবর দিয়ে তাঁর মনকে প্রশ্ন-সঙ্কুল করে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হয় নি। আচম্বিতে গিয়ে পড়লে কোন কিছু আন্দাজ করবার অবসর পাবেন না তিনি, এবং তাতেই সুফল ফলবে বলে শশাঙ্কর মনে হয়েছিল। গিয়ে দেখেন, ছোট্ট পরিচ্ছন্ন একটি বেতের মোড়ায় ওপর ধপধপে সাদা লংক্লথের ফতুয়া পরে সোম-শুভ্র অনিমেষ নয়নে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছেন। মাঠের দিকে চেয়ে শশাঙ্ক-শুভ্রকেও ক্ষণকালের জন্যে নির্নিমেষ হয়ে পড়তে হল। বিরাট একখানা সবুজ মখমলের গালিচা কে যেন চক্রবাল-রেখা পর্যন্ত বিছিয়ে দিয়েছে। অবশ্য ক্ষণকালের জন্যেই——পর-মুহূর্তে তিনি সোম-শুভ্রের দিকে চেয়ে দেখলেন। সোম-শুভ্র বসেই আছেন। শশাঙ্কর জুতোর শব্দ হয়েছিল নিশ্চয়; কিন্তু সে শব্দে সোম-শুভ্রের ধ্যানভঙ্গ হয় নি—ধ্যানই করেছেন, শশাঙ্কের প্রথমে ধারণা হয়েছিল। অমন নিস্তব্ধ তন্ময় বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে মানুষ যে গম-ক্ষেতের দিকে চেয়ে বসে থাকতে পারে, তা শশাঙ্কর পক্ষে

বিশ্বাস করা শক্ত হত, যদি না তিনি দেখতে পেতেন যে, সোম-শুভ্রের দুটো চোখই খোলা রয়েছে। খোলা চোখে এ কি রকম ধ্যান! বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল শশাঙ্ককে। একটু গলাখাঁকারি দিয়েও যখন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা গেল না, তখন শশাঙ্ককে ডাকতে হল।

কাকামণি।

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়ে যেন চমকে উঠলেন তিনি। তারপর চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে শশাঙ্কের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ—নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

শশাঙ্ক! তুই এমন সময়ে হঠাৎ?

তখনও হংস-শুভ্র চিঠি লেখেন নি তাঁকে, তখনও তিনি স্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে নির্বাসিত-জীবন যাপন করছেন। সুট-পরিহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের আকস্মিক অভ্যাগমে অপ্রত্যাশিত এমন একটা আনন্দোচ্ছ্বাসে সমস্ত অন্তর পরিপ্লাবিত হয়ে গেল তাঁর যে, চোখে জল এসে পড়ল। শশাঙ্ক তা হলে এখনও ভোলে নি তাঁকে! হাজার হোক, কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন তো! এর পরই তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন শশাঙ্ক-শুভ্রের সম্বর্ধনার জন্যে। শশব্যস্ত হবারই কথা। নিজে তিনি চা খান না, মাংস খান না, সিগারেট খান না। শশাঙ্কর কিন্তু সবই চাই বোধ হয়, ও কষ্ট সহ্য করতে পারে না—জানেন তিনি। চারদিকে লোক ছুটিয়ে দিলেন। নিজের তাড়াতাড়ি স্টোভ জ্বালতে বসে গেলেন।

হাত-পা-মুখ ধুয়ে, গরম দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খা ততক্ষণ! চা এসে পড়বে এক্ষুণি। আগে যদি একটু খবর দিতিস, কোনও কষ্ট হত না। স্টেশনে আমার শামপানিটা রেখে দিতাম। স্প্রিং-দেওয়া গাড়ি, ভাল বলদ, কোনও কষ্ট হত না তোর। নতুন যে বলদ জোড়া কিনেছি, ঘোড়ার মত দৌড়ায়।

গম্ভীর সোম-শুভ্র শিশুর মত প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন।

কথাবার্তায় ফাঁকে ফাঁকে পারিবারিক প্রসঙ্গের নানা আলোচনার আড়ালে-আড়ালে শশাঙ্ক নিজের বর্তমান জটিল অবস্থাটা ক্রমশ ফুটিয়ে তুললেন। কাকামণির সঙ্গে অনেক দিন ছাড়াছাড়ি, তাঁর মতামত ঠিক জানা নেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ না হবারই কথা, তাই, এইটেকে প্রাধান্য দিয়ে হঠাৎয়েই কথা আরম্ভ করলেন তিনি। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ এ দেশে অনুসরণ করতে গিয়েই যে তিনি বিপন্ন, তা প্রতিপন্ন করবার জন্যে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁর দুরবস্থার জন্যে যে ঘটনা-পরম্পরা দায়ী, তার ঠিক কোন্ কোন্‌গুলিতে বেশী রঙ ফল্যাও করলে সোম-শুভ্রের হৃদয় বিগলিত হবে, তা আন্দাজ করে নিতে বেশী বেগ পেতে হল না। বহু ব্যবসায়ে বহু লোকের সংস্পর্শে এসে এ দক্ষতাটা লাভ করেছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ আলাপ করবার পরই লোক-চরিত্র খানিকটা বুঝতে পারতেন। সোম-শুভ্রের চরিত্র তো অনেকটা জানাই ছিল; সুতরাং তাঁর মর্মস্থলে পৌঁছতে বেশী দেরি হল না। ইচ্ছে করলেই তিনি যে একটা বড় চাকরি পেতে পারতেন, কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্যে তার চেষ্টা করেন নি; ব্যবসায়ে উন্নতি করতে না পারলে এ দেশের উন্নতি নেই, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি নানা রকম ব্যবসা ফেঁদেছিলেন এবং স্বদেশী লোকের ওপর অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করার ফলেই যে নৈষ্ফল্য

ছাড়া আর কিছু অর্জন করতে পারেন নি—এই সব কথা এমন একটা করুণ আন্তরিকতার সঙ্গে কখনও হেসে কখনও গম্ভীরভাবে তিনি বর্ণনা করলেন যে, কিছুক্ষণের জন্যে সোম-শুভ্র অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর ধারণা হল, শশাঙ্ক তাঁরই মত একটা আদর্শের জন্যেই জীবনপাত করছে এবং হংস-শুভ্র একটা অযৌক্তিক জেদের বশবর্তী হয়েই তাকে সাহায্য করছেন না। শশাঙ্কর বর্ণনাটা আরও মর্মস্পর্শী হয়েছিল বিশ্বাস-প্রসূত বলে। তিনি নিজে সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, একটা বড় প্রিন্সিপলের খাতিরেই তিনি অনেক কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে এই সব ঝড়ঝঞ্ঝাপাত মাথা পেতে নিয়েছেন। এমন কি কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ আছে বলে অনেক সাহেব খদ্দেরের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত—তবু যতক্ষণ কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল, কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি তিনি। এখন অবশ্য কংগ্রেসের কেউ নন তিনি। মৃগাঙ্কর মত মহাত্মাজীর আধ্যাত্মিক রাজনীতিতে আস্থা নেই তাঁর। রজতের মত ঢাল-খাঁড়া-হীন বিদ্রোহী নিধিরাম সাজতেও চান না তিনি। হীরকের সমাজতন্ত্রবাদ তো তাঁর মাথাতেই ঢোকে না। বস্তুত আজকালকার কোন রকম হুজুকে আর আস্থা নেই তাঁর। অর্থনৈতিক উন্নতি না হলে দেশের মুক্তি নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য করে আগে দেশের লক্ষ্মী-শ্রী ফিরিয়ে আনতে হবে—পরাধীন দেশে অবশ্য তার অনেক বাধা আছে, কিন্তু বাধা সত্ত্বেও তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং ভালভাবে তা করতে পারলেই বাধা আপনি সরে যাবে—এই তিনি বোঝেন এবং এইজন্যেই তিনি স্বাধীন ব্যবসাতে সর্ব্যশক্তি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বুঝলে না।

সোম-শুভ্র নীরবে তাঁর বর্ণনা শুনে যাচ্ছিলেন। একটু ফাঁক পড়তেই হেসে বললেন, এখানে এসে পড়লি হঠাৎ কি মনে করে? একটু বিশ্রামের জন্যে বুঝি? ভালই করেছিস, খুব খুশি হয়েছি আমি। বউমাকেও আনলে বেশ হত। তাঁকে তো দেখিই নি আমি।

শশাঙ্ক-শুভ্রের ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁকে মন্ত্রণা দিলে—এই সুযোগ, বলে ফেল, আর দেরি করো না। লোহা গরম থাকতে থাকতেই আঘাত করা উচিত।

আঘাত করলেন। ফলও হল আঘাত করার মতই। শোনামাত্রই সোম-শুভ্র বিবর্ণমুখে খানিকক্ষণ মুহ্যমান হয়ে রইলেন। মুখভাবের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে শশাঙ্ক-শুভ্র ভীতই হয়ে পড়লেন প্রথমে। আড়চোখে একবার চুপ করে রইলেন। ক্ষণকাল অস্বস্তিকর নীরবতার পর সোম-শুভ্র ধীরে ধীরে নিজের চোখ-মুখের ওপর হাত বুলিয়ে সমস্ত গ্লানিটা যেন তুলে নিলেন—কোনো বিষয়ে মনঃস্থির করবার পূর্বে এ রকম করেন তিনি। তারপর প্রশ্ন করলেন, কত টাকার দরকার তোমার?

অন্তত লাখখানেক না হলে তো সামলাতে পারব না।

সোম-শুভ্র উঠে গেলেন, যখন মিনিট পাঁচেক পরে তিনি ফিরে এসে অত্যন্ত সহজভাবে এক লাখ টাকার চেকখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও। এর জন্যে আসবার দরকার ছিল না তোমার এত কষ্ট করে। চিঠি লিখলেই পারতে। এর পর কিন্তু আর জমল না। আঘাত পেলে শামুক বা কাছিম যেমন শক্ত খোলের মধ্যে নিজের সর্বাঙ্গ গুটিয়ে নেয়, দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্যের মধ্যে সোম-শুভ্র তেমনই আত্মগোপন করলেন। টাকার জন্যেই শশাঙ্ক এখানে এসেছে, তাঁর জন্যে নয়—এ ধারণাটা মনে স্পষ্ট হওয়ামাত্রই তিনি আর একবার হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, পারিবারিক বৃক্ষের ছিন্ন শাখা তিনি, অন্তরের যোগ লুপ্ত হওয়ার চেষ্টা যে বৃথা তা নয়, আত্ম-সম্মানহানিকর। সে চেষ্টা তিনি আর করলেন না।

ঢেকে পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই ব্যবসায়-সংক্রান্ত জরুরি কাজের অজুহাত দেখিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র কলকাতা অভিমুখে রওনা হয়ে পড়লেন। আরও দু-একদিন থাকতে পারতেন, কিন্তু কাকামণির আচরণটা কেমন যেন 'ফানি' বলে ঠেকল তাঁর। কলকাতায় পৌঁছে তিনি নিজে যা করলেন, তা আরও 'ফানি'। ব্যবসা সামলাবার জন্যে এক লাখ টাকার সত্যিই অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু ফিরে এসেই—মানে, হাওড়া স্টেশনেই একজন দালালের মুখে যেই খবর পেলেন যে, ব্যারিস্টার সনৎকুমার চৌরঙ্গীতে যে বাড়িটা কিনবেন প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন, সে বাড়িটা এখনও তাঁর কেনা হয় নি, বাড়ির মালিক এক লাখ টাকার কমে বাড়িটা ছাড়তে রাজী নন এবং এক লাখ টাকা দিতে সনৎকুমার ইতস্তত করছেন—অমনই তিনি বাড়ি না গিয়ে সোজা হাজির হলেন সেই বাড়ির মালিকের কাছে এবং কালবিলম্ব না করে নিয়ে ফেললেন বাড়িটা। ব্যবসাতে ঘা খাবার সম্ভাবনাটা রইল অবশ্য। কিন্তু ইতিপূর্বে বহু বার বহু রকম ঘা খেয়ে খেয়ে মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ছিলই, ভাবলেন—এটাতে নতুন আর কি হবে। সনতের উপরে টেক্কা দিয়ে বাড়িটা কিনে ফেলতে পারাতে বরং সে ক্ষতের উপর আরামপ্রদ মলম পড়ল একটা। ব্যবসাতে লোকসান হল কিছু, ছ'মাসের মধ্যে কিন্তু টাকাও জুটে গেল কিছু আবার। শেয়ার-মার্কেটে অপ্রত্যাশিত রকম কিছু পেয়ে গেলেন। নিজেদের অমন প্রকাণ্ড একটা বাড়ি হওয়াতে গদগদ বাসন্তী তার পঞ্চাশ হাজার টাকার গয়নার সেটটা বাঁধা দিতে রাজী হল। সময় দিলেন অনেক পাওনাদার। পরের বছর ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করে উদ্ধারকরলেন গয়নার সেট, শিলং শহরে বাড়ি কিনে ফেললেন একটা। কিন্তু হুস করে সব ডুবে গেল আবার পাটের ব্যবসায়ে অত্যধিক ঝুঁকি নিতে গিয়ে তার পরের বছর। কয়েক-জনের পরামর্শে শটিফুডের ব্যবসাতে নামলেন। তাতেও গেল কিছু টাকা। ......উত্থান-পতন চলছেই সারাজীবন ধরে। সমস্ত খতিয়ে এই কিছুদিন আগে সম্প্রতি অনুভব করেছেন যে, পতনের দিকটাই ভারী বেশী। সমস্তই যেন পতনোন্মুখ। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার বলেই নিয়েছেন তিনি—বাসন্তীর নামে মিল কিনেছেন একটা। তাতে কিছু লাভ হয়ে যদি কিছু ধার শোধ হয়! ধার, ধার, চতুর্দিকে কেবল ধার! বাবার সঙ্গে মতের মিল নেই.....কার সঙ্গেই বা আছে।

।। তিন

মাস ছয়েক পরে।

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিয়ে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে বাইরের ঘরে বসে ভাবছিলেন শশাঙ্ক-শুভ্র। একি অত্যাচার। বাড়িটা ধর্মশালা নাকি। যার যখন খুশি আসবে, যতদিন খুশি থাকবে। হলই মাসতুতো ভাই। পক্ষাঘাতগ্রস্ত কাকাকে নিয়ে আমার এখানে গুষ্টিসুদ্ধ মিলে চিকিৎসা করাবে তার। কলকাতায় বাড়ি আছে বলে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি নাকি। বাবা লিখেছেন, নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন তাঁদের—বুড়ো বয়সে এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াবার কি দরকার তাঁর? আত্মীয়-বাৎসল্যটা আরও যেন বেড়েছে, কেউ গিয়ে ধরলেই হল। যেখানে-সেখানে এ রকম

উপকার করবার মানেই বা কি? ওরা কি 'নীডি'? মোটেই নয়। বাঙালী-জাতের স্বভাবই হচ্ছে পরের স্কন্ধে আরোহণ করা। না, 'অন প্রিন্সিপল' এসব তিনি সহ্য করবেন না। বাবা চটবেন, চটুন। কান্ট্ হেল্প।

...ঈজি-চেয়ারে শুয়ে পায়ের পাতা নাচাতে নাচাতে আবার পাইপটা ধরালেন। বহুদিন আগেকার আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। ষষ্ঠী-চরণকে নিয়ে সে কি কাণ্ড। বাবার দূরসম্পর্কের পিসি ভুবনমোহিনী দেবীর বহুপত্নীক স্বামীর বংশধর ষষ্ঠীচরণ, কোথাও কিছু নেই, একদিন বাবার এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির। সমস্ত পরিচয় দিয়ে বাবা লিখেছেন--অর্থাভাবে পড়তে পারছে না, তোমার বাসায় রেখে বি. এ.পড়বার সুযোগ দিও একে। ছোকরা গরিব ছিল অবশ্য, কিন্তু মূর্তিমান জানোয়ার একটা। হাতের নখ কাটত না, চোখের পিচুটি পুঁছত না, চবর-চবর করে পান চিবোত খালি, আর পিক ফেলত যেখানে সেখানে; পেটে পিলে, মাথায় প্রকাণ্ড টিকি। সব সহ্য করে তবু তাকে বাসায় রেখেছিলেন শশাঙ্ক। ছোকরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। নবোদ্ভিন্নযৌবনা বাসন্তীকে দেখে—বাসন্তীর তখনও ছেলেপিলে হয় নি—ছোকরা মাথা ঘুরে গেল। তার সঙ্গে বার বার হেসে হেসে কথা কয়ে, আর সদা-সর্বদা তার সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে তার মাথা আরও গুলিয়ে দিলে বাসন্তী নিজেই। হঠাৎ একদিন বাসন্তীকে প্রণয়-নিবেদন করে বসল সে। এর পর আর তাকে বাড়িতে রাখা চলল না। চাবকে দূর করা উচিত ছিল, কিন্তু বাসন্তী তা করতে দেয় নি, ভদ্রভাবেই বিদেয় করতে হল। হস্টেলে গিয়ে রইল সে। 'ওয়ার্ড' দিয়েছিলেন তাকে বি. এ. পর্যন্ত পড়াবেন, 'ওয়ার্ডের নড়চড় করলেন না। তিনি হস্টেলের সমস্ত খরচ বহন করলেন। ষষ্ঠীচরণকে হস্টেলে পাঠানো হয়েছে শুনে অসন্তুষ্ট হংস-শুভ্র পত্রযোগে যে গালাগালিটা দিয়েছিলেন তাঁকে, তা ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হলেও শোভনতার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। কিচ্ছু বলেন নি শশাঙ্ক-শুভ্র, আসল কারণটা খুলে বলা সম্ভবও ছিল না। উত্তরে কেবল লিখেছিলেন—ও রকম একটা নুইসেন্স্‌কে ভদ্র-বাড়িতে রাখা সম্ভব নয় বলেই হস্টেলে পাঠাতে হয়েছে। হংস-শুভ্র এর উত্তর দেন নি কোনো। বছর খানেক কোনো চিঠিই লেখেননি। এ ঘটনার প্রায় বছর চারেক পরে—শঙ্খ সবে হয়েছে তখন—হিঙ্গুলগ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে যাবার জন্যে চিঠি লিখলেন হংস-শুভ্র। দেশের বাড়িতে সব রকম পূজারই পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন তিনি। শশাঙ্ক লিখলেন—যেতে পারলে খুবই খুশি হব, কিন্তু ষষ্ঠীচরণ যদি আসে, তা হলে আমি যাব না, অকারণ একটা অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে চাই না। ফেরত-ডাকেই হংস-শুভ্রের উত্তর এল—আজকাল তোমাদের আত্মসর্বস্ব স্বজনবিমুখ মনোভাব দেখে দুঃখ হয়। কিন্তু এটা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনিবার্য ফল ভেবে চুপ করে থাকি। তোমার ভয় নেই, তুমি এস, ষষ্ঠীচরণের আসবার কোনও সম্ভাবনা নেই। সে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রফেসারি করছে, পূজোর ছুটিটা ওই অঞ্চলেই কাটাবে লিখেছে। শশাঙ্ক-শুভ্রের যাবার ইচ্ছে ছিল না, বাসন্তীর জেদেই সেবারও যেতে হয়েছিল। রুষ্ট শ্বশুরকে তুষ্ট করবার আগ্রহে শশাঙ্ক আপত্তি টেঁকে নি। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ষষ্ঠীচরণ সশরীরে বর্তমান। আপাদমস্তক জ্বলে উঠল তাঁর।

পিতাকে আড়ালে প্রশ্ন করলেন, আপনি লিখেছিলেন, ষষ্ঠীচরণ আসবে না, কিন্তু ও তো এসেছে দেখছি। আমাকে আগে লিখলে—

এসে পড়ল, কি করি বল? মানা তো করতে পারি না।

আমি থাকব না তা হলে।

তোমার খুশি। আমি ওকে চলে যেতে বলতে পারব না। ও আমার আত্মীয় লোক।He has as much right on my house as you have.

বেশ, আমি চললাম তবে।

সোজা বাসন্তীর কাছে গিয়ে বললেন, চল, এখানে আর এক দণ্ড থাকব না।

বাসন্তীর হাসিটা এখনও মনে পড়ছে তাঁর। বাসন্তী হেসে উত্তর দিয়েছিল, কি ছেলেমানুষি করছ তুমি!

তুমি থাক, আমি তা হলে চললাম।

সেবার অষ্টমীর রাতটা একা একা মেঠো রাস্তা ভেঙেই কেটেছিল তাঁর।

বাসন্তী সঙ্গে আসে নি। পিতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না, বাসন্তীকেও ত্যাগ করব-এই জাতীয় নানা প্রতিজ্ঞা করতে করতে পথ হেঁটেছিলেন তিনি, বেশ মনে পড়ছে। ম্লানায়মান জ্যোৎস্নালোক নদী পারের শুভ্র কাশবনের ছবিটাও মনের মধ্যে আঁকা আছে এখনও। আশ্চর্য।

বাবাকে কি টেলিগ্রাম তুমি, আমাকে না জিজ্ঞেস করে?

জিজ্ঞেস আবার করব কি। সত্যি কথা লিখে দিলাম—রিগ্রেট। হাউস ফুল, নো রুম।

আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু। এমন মুশকিলে ফেল তুমি।·ও রামদয়াল, পাশের বাড়িটো দেখ তো, ' টু লেট' লেখা ঝুলছিল দেখছিলাম; দেখ তো, কোনো ভাড়াটে এসেছে কি না!

দরোয়ান রামদয়াল চলে গেল।

শঙ্খ পাশের ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে বললে, ভাড়াটে আসে নি এখনও। যা ভাড়াও হাঁকছে, মাসে আড়াই শ' টাকা।

ভাড়া যাই হোক, তুই ঠিক করে আয় বাবা। কাল তোর দাদু আসছেন নবীন ঠাকুরপোদের নিয়ে। এ বাড়িতে কুলুবে না। তাঁকে আর একটা টেলিগ্রাম করে দে যে, বাড়ি ভাড়া করেছি একটা।

বাধ্য বালকের মত চলে গেল শঙ্খ-শুভ্র, শশাঙ্কের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই। শশাঙ্কর অনুমতির অপেক্ষা রাখে না কেউ; অথচ শশাঙ্ককেই সব টাকা যোগাতে হয়।

শঙ্খ চলে গেলে বাসন্তীর দিকে চেয়ে শশাঙ্ক বললেন, মাসে আড়াই শ' টাকা এখন পাব কোথা থেকে? তুমি তো সুব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হলে।

তুমি টেলিগ্রাম না করলে এই বাড়িতেই কুলিয়ে নেওয়া যেত কোন রকমে। শঙ্খ না হয় তোমার ঘরেই শুত। হীরু আর রজতের ঘর দুটো তো খালিই পড়ে আছে।

হীরক-রজতের কথায় ক্ষণিকের জন্যে বাসন্তী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মাতৃহৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠল ক্ষণকালের জন্যে। ওদের জন্যে। ওদের জন্যে ঘর আলাদা করা আছে বটে, কিন্তু সে ঘরে ওরা আসবে না, তা সবাই জানে।...সত্যি কি আসবে না?

শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, তিনখানি ঘরে কি হবে ওদের, পঙ্গপাল আসছে এক দঙ্গল।

একতলায় যে ঘরটায় বাক্স-আলমারি-খাট আছে, সেটাও খালি করে দেওয়া যেত—ফার্নিচারগুলো চারিয়ে দিতাম সব ঘরে।

তা হলে বাড়ি ভাড়া করতে পাঠালে কেন?

মুচকি হেসে বাসন্তী বললে, তোমার মান রাখবার জন্যে। তুমি যে লিখে দিয়েছ, নো রুম। কাল বড় মোটরখানা নিয়ে বেরিও না তুমি। আমি ওটা নিয়ে স্টেশনে যাব বাবাকে আনতে। নিজে না গেলে হয়তো আসবেনই না তিনি। আচ্ছা, তনিমার কোন খবর আসে নি এখনও?

কই, না।

বেয়ানটি বেশ কিপ্‌টে আছেন। ফোনের দু আনাও খরচ করতে রাজী নন। আমাকেই ফোন করতে হবে রোজ। আমি সেখানেই যাচ্ছি। বাড়িটা তুমি ঠিক করো।

হেসে বেরিয়ে গেল বাসন্তী।

শশাঙ্ক-শুভ্র চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। বাসন্তী সব উলটে-পালটে দিয়ে গেল। সারাজীবন ধরে সবাই তাঁর সব বিধি-ব্যবস্থা বারংবার উলটে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর মুখের দিকে কেউ চাইবে না; এমন কি ছেলেরাও না। শঙ্খ এক হিসেবে ভাল বটে, রজতের মত খামখেয়ালী নয়, হীরকের মত পাগলও নয়। কিন্তু ওর বুকের পাটা বলে কোন জিনিসই নেই যেন। কেমন যেন অত্যন্ত ভালমানুষ-গোছের; সর্বদা যেন সঙ্কুচিত হয়ে আছে।—ওকে দেখলে পুত্র-গর্বে মন ভরে ওঠে না। নিয়মিত আপিস করে, সন্ধ্যাহ্নিক করে, সরু-গোছের একটা টিকিও রেখেছে। নিজের ঘরটিতে চুপচাপ বসে বই পড়ে খালি, কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। বাবা ওকে ছেলেবেলায় কাশীতে এক টোলে পাঠিয়ে সেই যে ওর মনে কি এক ঘুণ ধরিয়ে দিলেন, কেমন যেন জরদগব-গোছ হয়ে গেছে। জোর করে টেনে এনে হিন্দু-স্কুলে ভর্তি করে না দিলে ওর কোন পদার্থই থাকত না আর। এই উপলক্ষ্যে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্যের কথাটা মনে পড়ল। মুখে যদিও কিছুই বলেন নি, কিন্তু আমলকী-ভেঞ্চারে একটি পয়সাও সাহায্য করলেন না এইজন্যে।

বেয়ারা এসে একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল—মৃগাঙ্ক জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। মৃগাঙ্কটাও যেন কি! হল ডাক্তার, মাতল খদ্দর নিয়ে। যা কিছু রোজকার করে, ওতেই যায়। দুটো মেয়ে আছে, একটা ছেলে আছে, সে-সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। বোর্ডিঙে বোর্ডিঙে মানুষ হচ্ছে তারা। বাবা বলছিলেন, আমার বাসাতে থেকেই পড়ুক ওরা—বাসন্তীও সায় দিয়েছিল তাতে। আশ্চর্য মনোবৃত্তি এদের! আমি যেন একটা অফুরন্ত জলাশয়, যার যখন খুশি এসে কলসী ভরে ভরে নিয়ে যাবে। বাসন্তী সায় দিয়েছিল—বাসন্তী তো দেবেই; কনক কিন্তু রাজী হয় নি। বাবার কাছ থেকে মাসহারা নিতেও রাজী হয় নি সে। রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল ওম্যান। ওই তো ঠিক। শুক্তি-মুক্তো-ননীর পড়ার খরচ নিশ্চয় এস্টেট থেকে বাবা দেন... মৃগাঙ্কর দাতব্য চিকিৎসালয়ের খরচও বাবা দেন বোধ হয় কিছু। মৃগাঙ্ককেও তো বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেবার কথা। টাকার কথা মাথায় এসে পড়াতে শশাঙ্ক-শুভ্র অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, মনে মনে তিনি যোগ করছেন, আগামী মাসে কার কত টাকা দেনা শোধ করতে হবে। মিলটা যদি ঠিকমত চলে, আর গমের দর মণ-প্রতি যদি আট আনা করেও চড়ে, তা হলে দেনা শোধ করতে কতক্ষণ। রজত আর হীরক যদি ওসব বাজে ব্যাপারে উন্মত্ত না হয়ে ব্যবসাতে নাবত আমার সঙ্গে—শেষ পর্যন্ত নাবতে হবেই, ওসব বাজে নন্‌সেন্স নিয়ে বেশিদিন কাটানো যায় না। আমিও একদিন বোমার দলে যোগ দিয়ে ছিলাম, হেঃ—। রজত,

হীরক দুজনের মুখই পর পর ভেসে উঠল মনের ওপর। ছেলে দুটো...নিজের মনের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন একটু পরে। মনের অন্তরতম প্রদেশে ছেলে দুটো যেন আসন অধিকার করে আছে, তা শ্রদ্ধার আসন। বাই জোভ--না না, শ্রদ্ধা করবার মতন কিছুই নেই ওদের আচরণে, ওরা ভুল পথে চলছে--অর্থনৈতিক উন্নতি করতে না পারলে দেশের উন্নতি নেই। পিস্তল ছুঁড়ে কিংবা কুলি ক্ষেপিয়ে তা হবে না। ওয়েট এ বিট। তিনি নিজেই হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবেন দেশের উন্নতি কি করে করতে হয়। ভাল একটা ব্যাঙ্ক খুলতে হবে আগে। সোৎসাহে উঠে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে পাইপটা ধরালেন আবার।

ঝনঝন করে ফোনটা বেজে উঠল।

হ্যালো, কে? বাসন্তী? হ্যাঁ, আমি। ও, তনিমার ছেলে হয়েছে? এক্ষুণি? ব্যাটাছেলে? বাঃ আচ্ছা, যাচ্ছি।

বাসন্তী ফোন করছে শঙ্খর শ্বশুরবাড়ি থেকে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনে হল, বুড়ো হয়ে গেলাম, পৌত্র হল! তারপরেই মনে হল, নাতিকে কেন্দ্র করে বাসন্তী এইবার একটা খরচের তুফান তুলবে। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে পাইপটা কামড়ে ধরলেন। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলেন না কিন্তু। স্টেশনেও যেতে হবে একবার, মৃগাঙ্ক আসছে এই ট্রেনে।

মৃগাঙ্ক—শুভ্র

।। এক ।।

ছেলেবেলায় হিঙ্গুল-গ্রামে একবার জগদ্ধাত্রী-পূজা উপলক্ষে গিয়ে মৃগাঙ্ক-শুভ্র এক বৈষ্ণবীর মুখে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক একটি কীর্তন শোনেন। সে কীর্তন কিশোর মৃগাঙ্ক-শুভ্রের প্রাণ স্পর্শ করেছিল। জ্ঞাতসারে না হোক, অজ্ঞাতসারেই সেদিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কোন্ সুরে তাঁর জীবন-বীণা বাজবে। রাধা জাতি কুল মান সমস্ত ত্যাগ করে পাগলিনী হয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে। কোনও বাধাকেই বাধা বলে মনে করেন নি তিনি। কোন কৃচ্ছ্র-সাধনই কষ্টকর বলে মনে হয়নি তাঁর কাছে। কৃষ্ণপ্রেমে-বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে কৃতার্থ হয়েছিল তাঁর অন্তর। প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের এই অপরূপ কাহিনী ভারতবর্ষের কাব্যে-দর্শনে ধর্ম-কর্মে প্রাসাদে-পর্ণকুটিরে ধনী-দরিদ্র আপামর-ভদ্র সকলের অন্তরে যে মন্ত্রবলে আজও সুধা-সিঞ্চন ক'রে চলেছে সেই মন্ত্রবলেই কিশোর মৃগাঙ্ক-শুভ্র সহসা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ত্যাগ না করতে পারলে জীবন বিফল—ত্যাগই তৃপ্তি, ত্যাগই সুখ। রূপসী বৈষ্ণবীর কমনীয় কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে জীবন-যজ্ঞের মূলমন্ত্রটি যেন তাঁর মর্মস্পর্শ করেছিল সেদিন! ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বৃহৎ আদর্শের জন্য প্রয়োজন হলে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে পারতেন। সেদিন কিন্তু সামনে কোন আদর্শ ছিল না, প্রয়োজন হয় নি। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হলেন যখন, বৃহৎ কোন আদর্শ চিত্তকে উন্মুখ করে নি তখনও। মা মারা গেলেন হঠাৎ। দাদা তখন হোম-রুল করে বেড়াচ্ছেন তিলকের সঙ্গে। মৃত্যুকালে মায়ের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হল না তাঁর। শ্রাদ্ধের সময় এলেন বটে, কিন্তু কামাতে চাইলেন না। সহসা পিতার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হল মৃগাঙ্ক-শুভ্রর! মায়ের মৃত্যুতে, দিদির গৃহত্যাগে, তিনজন উপযুক্ত পুত্রের অকাল মরণে, ইন্দুর বৈধব্যে, কাকার ধর্মান্তর-গ্রহণে, দাদার অসদ্ব্যবহারে যে পিতার অন্তর অহরহ পুড়ে যাচ্ছে, তাঁকে কি করে একটু শান্তি দেওয়া যায়—এই হল মৃগাঙ্ক-শুভ্রর তখনকার লক্ষ্য। কায়মনোবাক্যে তিনি পিতার অনুবর্তী হয়ে চলতে লাগলেন। সবে তখন আই. এস-সি. পাস করে বি. এস-সি পড়ছেন, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, বাবার ইচ্ছা অনুসারে সন্ধ্যাহ্নিক একাদশী করেন, মুরগি খাওয়া পাপ বলে মনে হয়। বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিন হাতে এল বিবেকানন্দের বই একখানা। নূতন একটা আদর্শের সন্ধান পেলেন যেন। যে মহাপুরুষের বাণী সমসাময়িক বঙ্গদেশের কানে ঢোকে নি, উদ্বুদ্ধ করেছিল মাদ্রাজকে, আমেরিকাকে, লণ্ডনকে, তাঁর বজ্রনির্ঘোষে সহসা ঘুম ভেঙে গেল যেন মৃগাঙ্ক-শুভ্রর। মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করলেন গিয়ে, বিবেকানন্দের সমস্ত বই পড়ে ফেললেন রাতের পর রাত জেগে। এই বীর সন্ন্যাসীর বাণী তাঁর মনে অনেকদিন আগে শোনা সেই সুরটিকেই আবার যেন জাগিয়ে তুলল। আত্মত্যাগ করে, স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আত্মোৎসর্গ না করতে পারলে সুখ নেই। সন্ন্যাসী হতে হবে, দেশহিতব্রতে সর্বত্যাগী বীরের মত অগ্রসর হতে হবে।

ব্রহ্মচর্য করে শক্তিসংগ্রহ করতে হবে তাঁর মনে অনেকদিন আগে শোনা সেই সুরটিকেই আবার যেন জাগিয়ে তুলল! আত্মত্যাগ করে, স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে হবে, কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে লাগলেন কিছুদিন। মনে হল, যেন বৃহত্তর জীবনের আহ্বান এসে পৌঁছেছে—যেমন এসে পৌঁছেছিল বুদ্ধের কাছে, চৈতন্যের কাছে, বিবেকানন্দের কাছে। হিমাচল থেকে কুমারিকা, গুজরাট থেকে আসাম—বিরাট কর্মক্ষেত্রে পড়ে রয়েছে। সূচীভেদ্য অন্ধকার চতুর্দিকে—তামসিকতার অন্ধকার। সে অন্ধকারকে দূর করতে হবে আমাদের স্বকীয় সভ্যতার আলোকপাত করে। সন্ন্যাসীর আদর্শেই গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে মনে মনে—রাখাল মহারাজের সঙ্গে দেখা করতেন প্রায়ই গিয়ে—দীক্ষা নেবেন-নেবেন করছেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন সব ভেঙে গেল।

হংস-শুভ্র একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, একটি গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার করতে হবে। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি।

নির্বাক হয়ে রইলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র।

হংস-শুভ্র বলতে লাগলেন, মেয়েটি সুন্দরী। লেখাপড়া জানে, এবার ম্যাট্রিক পাস করেছে।

মৃগাঙ্ক নির্বাক।

চুপ করে আছ কেন?

আমি ভেবেছি, বিয়ে করব না।

ও। এ রকম অদ্ভুত কথা ভাববার মানে?

রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবার ইচ্ছে—

হংস-শুভ্র কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, গেরুয়া সিল্কের জোব্বা পরে বক্তৃতা দেওয়ার বাসনা হয়েছে? বিয়ে করেও তা করা যায়। কালই হাফ-এ-ডজন অর্ডার দিয়ে আসতে পার। কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে দাঁড়ালেই শ্রোতা জুটে যাবে। বক্তৃতার বিষয়টা কি? বেদান্ত, না, বিজ্ঞান?

মৃগাঙ্ক চুপ করে রইলেন নতনেত্রে।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে হংস-শুভ্র আবার বললেন, পৃথিবীতে এমন কোন মহৎ কাজ নেই, যা বিয়ে করে করা যায় না। স্বয়ং রামকৃষ্ণও বিবাহিত ছিলেন। যাক, অত কথায় কাজ নেই, তুমি যা ঠিক করেছ তাই কর, আমি—

হংস-শুভ্র হঠাৎ থেমে গেলেন এবং একটু হাসলেন। তাঁর এ হাসিটি বড় মর্মান্তিক। খুব রাগ হলে বা দুঃখ হলে এই হাসিটি হাসেন তিনি। হাসি শুনে মৃগাঙ্ক-শুভ্র পিতার দিকে চেয়ে দেখলেন, স্মিত অপ্রস্তুত মুখে হংস-শুভ্র জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হল, ওই স্মিত-হাসির অন্তরাল ভেদ করে তাঁর সারা জীবনের শোক-দুঃখ ক্ষোভ পরাজয় যেন ঠেলে বেরুতে চেষ্টা করছে, হংস-শুভ্র আর যেন আত্মসম্বরণ করতে পারছেন না। স্মিত-হাসির সূক্ষ্ম পরদাটা কাঁপছে। আত্মীয়স্বজন, সমাজ, শাসনকর্তা, অদৃষ্ট,ভগবান—কেউ তার প্রতি সুব্যবহার করে নি। তিনি আশা করেছিলেন, মৃগাঙ্ক হয়তো তাঁর মনের মত হবেন। মৃগাঙ্ক নিজেও তাই আশা করেছিলেন, এতদিন পিতার অনুবর্তী হয়েই আদর্শ পুত্রের জীবন যাপন করে এসেছেন তিনি, কায়মনোবাক্যে পিতাকে সুখী করাই এতদিন জীবনের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু...। হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হল, পিতাকে সুখী করবার জন্যে নিজের আদর্শ ত্যাগও তো

ত্যাগ—সে ত্যাগটাও তো কম বড় নয়, কিন্তু...। আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। পিতার সুখের জন্যে নিজের আদর্শ ত্যাগ করতে হৃদয় কুণ্ঠিত হচ্ছে কেন, অনিবার্যভাবে যে কথাটা এর পর তাঁর মনে হল, তাতে তিনি চমকে গেলেন। বাবাকে তিনি ভালবাসেন না, এতদিন ভালবাসর একটা ভান করে এসেছেন শুধু। প্রাণ দিয়ে সত্যি সত্যি যাকে ভালবাসা যায়, তার জন্যে আদর্শ কেন, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে যে-কোন কষ্ট স্বীকার করতে কুণ্ঠা হয় না, আনন্দ হয়। বাবার প্রস্তাবে মনে দ্বিধা জাগছে মানে, বাবাকে তিনি ভালবাসেন না। তিনিও বাবাকে ভালবাসেন না।...

অমন গম্ভীর হয়ে যাবার দরকার নেই। তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর। আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি তাদের যে, তোমার বিয়ে করবার মত নেই। তোমার মতামত যে নিতে হবে, এটা খেয়াল হয় নি আমার। হওয়া উচিত ছিল।

হংস-শুভ্র উঠতে যাচ্ছিলেন, মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আপনি যদি ঠিক থাকেন, তা হলে তাই হোক, আমার আপত্তি নেই।

মত বদলাবার আগে আর একটা কথাও শোনা দরকার তোমার। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে তোমাকে যেতে বাধ্য করছি—এ রকম কোন অপবাধ নিতে রাজী নই আমি। তুমি এ বিয়ে করলে আমি অবশ্য খুবই খুশী হব; কিন্তু না করলে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করব, তা ভাববার দরকার নেই। এটুকু অন্তত জেনে রাখ, সাবালক হবামাত্র তোমার প্রাপ্য বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি নিয়মিত পাবে, শশাঙ্ক যেমন পাচ্ছে।

এই কথায় পিতার প্রতি এমন একটা গভীর শ্রদ্ধা মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে উৎসারিত হল যে, ভাবাবেগে তিনি নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

এ কথা শোনবার পরও তোমার আর আপত্তি নেই?

না।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র বেরিয়ে চলে গেলেন। হংস-শুভ্র চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তাঁরও শ্রদ্ধা জেগেছিল ইদানীং। হঠাৎ মনে হল, ছেলেকে ধর্মপথ থেকে বিরত করে অন্যায় করলুম কি? তখনই মনে হল আবার, সে রকম নিষ্ঠা থাকলে ও রাজী হত না কখনও; তা ছাড়া গার্হস্থ্য-ধর্মও ধর্ম..

উঠে চলে গেলেন।

সাত দিনের মধ্যেই কনকের সঙ্গে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের বিয়ে হয়ে গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই হংস-শুভ্র অনুভব করলেন যে, আবার ভুল করেছেন তিনি। বুঝতে পারলেন, গরিবকে দয়া করাটা হৃদয়বত্তার পরিচায়ক হলেও গরিবের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়াটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় সব সময়ে। দরিদ্র-কন্যা কনকের মনটাও যে দরিদ্র, তা তাঁর অতি পরিমিত আহারে-ব্যবহারে, ব্যয়-সংক্ষেপ করবার চেষ্টায়, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতনতার অভাবে, দাস-দাসীদের চুরি ধরবার আগ্রহে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা লক্ষণে অগোচর রইল না হংস-শুভ্রের কাছে। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন যদিও, বাইরে কিন্তু কনকের ধ্বজাটাকেই যখন-তখন সাড়ম্বরে উচ্চে তুলে আস্ফালন করে বেড়াতে লাগলেন তিনি সকলের কাছে। কনক মিতভাষিণী, শান্ত-প্রকৃতির এবং কনকের বাবা কেরানী হলেও আচার-নিষ্ঠ হিন্দু, আপিসে

যাওয়ার আগে টিকিতে ফুল বেঁধে পূজো করেন প্রত্যহ—এই দুটো কারণকেই আঁকড়ে ধরে উচ্ছ্বসিত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টির নিকষে কনকের গিল্‌টিত্ব ধরা পড়লেও এই বলে তিনি সান্ত্বনা পাবার প্রয়াস পেলেন—খাঁটি সোনা দুর্লভ আজকাল, যা পাওয়া গেছে তাই যথেষ্ট। আর যাই হোক, বাসন্তীর মত পর-ভোলানে উড়নচণ্ডে হবে না। পরে যদিও ঘা খেয়েছিলেন, গোড়ায় গোড়ায় কিন্তু গিল্‌টিরই গুণগান করলেন তিনি কিছুকাল। অসম্ভবও হয় নি। কিঞ্চিত লেখাপড়া শেখার কল্যাণে কনকের বহিঃশোভাটা নিন্দনীয় ছিল না নেহাত।

আজন্মব্রহ্মচারী মৃগাঙ্ক-শুভ্র আত্মসমর্পণ করলেন রূপসী কনকের কাছে। কারও কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে তাঁর মন উন্মুখ হয়েই ছিল। কনকের ঔদার্য আছে কি নেই, আদর্শ জীবনসঙ্গিনী হবার উপকরণ তাঁর চরিত্রে কতটুকু আছে—এসব বিশ্লেষণ করবার তিনি অবসরও পেলেন না, প্রয়োজনও বোধ করলেন না। তন্বী গৌরাঙ্গী অর্ধ-স্ফুট-যৌবনা বধূকে বাহু পাশে বেঁধে আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি। আত্মস্থ হলেন যখন, তখন, শুক্তি মুক্তা নবনী জন্মগ্রহণ করেছে।

ইতিমধ্যে ডাক্তারটাও পাস করে ফেলেছিলেন। যথারীতি প্র্যাক্‌টিস করবার জন্যে একটা ডিস্‌পেন্‌সারিও খোলা হল। কিন্তু সেখানে জুটতে লাগল রোগী নয়, কংগ্রেস-কর্মীর দল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তখন সমস্ত ভারতবর্ষ তোলপাড় হচ্ছে।

।। দুই ।।

দাম্পত্য-জীবনের যে চরিত্রটা নির্বিঘ্নে কেটেছিল বলে কনকের বিশ্বাস, ঠিক সেই সময়টাতেই কিন্তু মৃগাঙ্ক-শুভ্র প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে। নিজের অজ্ঞাতসারেই বীজ তখনই উপ্ত হচ্ছিল, ফসলটা নয়ন-গোচর হল পরে, অর্থাৎ যথাসময়ে। পরে যা অপ্রত্যাশিত, এমন কি অযৌক্তিক বলে কনকের মনে হয়েছিল, নেপথ্য-লোকে অনেক আগে থেকেই তার যুক্তিযুক্ত একটা উদ্যোগ-পর্ব গড়ে উঠেছিল বই কি। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের আচরণে তা আভাসিতও হয়েছিল, কিন্তু কনকের চোখে তা পড়ে নি। আর একটু কম অহঙ্কারী কিংবা আর একটু বেশি কল্পনা-কুশলী হলে পড়ত। সেই সব সামান্য আভাস থেকেই মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সম্ভব্য পরিণামটা আন্দাজ করে নেওয়া অসম্ভব হত না। কিন্তু রূপ-গুণ-বিদ্যা দিয়ে তৈরী যে দুর্গে মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে সে বন্দী করে রেখেছিল, তার দুর্ভেদ্যতা সম্বন্ধে কনকের লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভাবতেও পারে নি যে, ভূমিকম্পের এক নাড়াতেই দুর্গের দেওয়ালগুলো হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়বে একদিন। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের দিকে মনও সে তেমন দিতে পারে নি। মাতৃত্ব-ভার বহন করতে করতে এম. এ. পর্যন্ত পরীক্ষা দেবার ঝোঁক পেয়ে বসলে স্বামীর মনের দৈনন্দিন ছোটখাট বিক্ষোভগুলো চোখে না পড়াটাই স্বাভাবিক—বিশেষত স্বামী যদি একনিষ্ঠ হন। ওই একটি বিষয়েই কেবল স্ত্রীলোক মাত্রেই মন সদা-জাগরূক। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের নিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলে তাঁর শুষ্ক মুখের বা অনিদ্রার হেতু নির্ণয় করবার

সঙ্গত কারণ ঘটত। কিন্তু রাউলাট অ্যাক্ট যে ব্যক্তির নিদ্রা বিঘ্নিত করছে অথবা চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা যার আহারের রুচি হরণ করছে, তার সম্বন্ধে চিন্তিত হওয়ার মত কল্পনাশক্তি কনকের ছিল না, অবসরও ছিল না। এসব নিয়ে আলোচনাও হয় নি কখনও স্বামীর সঙ্গে। স্বভাবতই মিতভাষিণী সে। চুপচাপ নিজের পড়াশুনা নিয়েই থাকত। স্বামী অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে খেয়ে শুয়ে পড়তেন। তার সঙ্গে অহেতুক বাক্যালাপ করবার প্রয়োজনই অনুভব করত না সে। সে জানত, স্বামী তার রূপে মুগ্ধ, শ্বশুর গুণে উচ্ছ্বসিত, পাড়া-পড়শী বিদ্যায় বিস্মিত। এই রূপ-গুণ-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করাটাই তার জীবনের লক্ষ্যে হয়ে উঠেছিল। নীরবে অনন্যমনা হয়ে তাই সে করে যাচ্ছিল। স্বামীর মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি সে লক্ষ্যই করে নি। তা ছাড়া বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বছর নীরবে নেপথ্যে যে দ্বন্দ্ব তাকে করতে হয়েছিল—খাপ-খাইয়ে-নেওয়ার সে দ্বন্দ্বেও তার সমস্ত চিত্ত ব্যাপৃত থাকতে অহরহ। এঁদো গলির খোলার-ঘর-বাসিনী কেরানী-কন্যাকে যখন হংস-শুভ্ররূপী হারুন-অল-রশিদের খেয়ালে শুভ্র-পরিবারের বধূর কঠিন ভূমিকায় অকস্মাৎ অবতীর্ণ হতে হল, তখন যেমন করেই হোক, সে ভূমিকার মর্যাদা সে রক্ষা করবেই—এই জেদ তাকে পেয়ে বসল। শুধু মর্যাদা রক্ষা নয়, মর্যাদা বৃদ্ধিও সে করবে—এই হল তার পণ। যদিও বাইরে সে স্মিতমুখে চুপ করে রইল, ভেতরে কিন্তু সে ঠিক করে ফেললে, সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, কেরানীর মেয়ে বলে যে হেয় নয়। এই সঙ্কল্পের তাড়নাতেই সে এম. এ. পাস পর্যন্ত পাস করে ফেললে তিন-তিনটে সন্তান হওয়া সত্ত্বেও। এম. এ পাস করা ছাড়া এ বাড়িতে কৃতিত্ব দেখাবার অন্য কোন পথ ছিল না। কেবল বিধিপ্রদত্ত রূপের জোরে এ বাড়িতে সম্মান আদায় করা শক্ত, কারণ এখানে শুধু যে মেয়েরাই রূপসী তা নয়, পুরুষরাও রূপবান। এম. এ. পাস করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই ডিগ্রী-অর্জনের সাধনায় যে পরিমাণ একাগ্রতা তাকে পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ করতে হল, ঠিক সেই পরিমাণ একাগ্রতা সে যদি মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ওপর নিবদ্ধ করতে পারত, তা হলে হয়তো তার ক্রমপরিবর্তমান মনোবৃত্তির কিছু আভাস সে পেত। কিন্তু রূপ-মুগ্ধ যৌবন-লোলুপ যে ব্যক্তিটির পরিচয় সে বিবাহের কিছুদিন পরেই পেয়েছিল, তার সম্বন্ধে যে আর অধিক কিছু জানার প্রয়োজন আছে—এ কথা তার মনেই হয় নি। বহুবার-পড়া পুঁথির মত তাকে সে ঔদাসীন্যভরে সরিয়েই রেখেছিল। তারও যে বিবর্তন হওয়া সম্ভব, একনিষ্ঠ প্রেমিক যে একনিষ্ঠ বৈরাগী হয়ে উঠতে পারে—এ কল্পনাও সে করে নি। আর একটা জিনিসও তার কল্পনাতীত ছিল। এত কষ্টে অর্জন করা এম. এ. ডিগ্রী তাকে ঠিক সেই মর্যাদা দিতে পারলে না, যা সে মনে মনে কামনা করেছিল। প্রভূত বিদ্যার অধিকারী হয়েও কৃষ্ণকায় খ্রীষ্টানকে শ্বেতকায় খ্রীষ্টান-সমাজে যেমন সসঙ্কোচে বাস করতে হয়, বিদ্যার তকমা পরে তাকেও তেমনই এই অভিজাত পরিবারে সসঙ্কোচে বাস করতে হল। নিজের মন থেকেই তার সঙ্কোচ গেল না। যদিও বাড়ির বড়রা তাকে যথারীতি স্নেহ করতেন, ছোটরাও যথারীতি সম্মান দেখাতে ত্রুটি করত না, তবু তার কেমন যেন মনে হত, এরা সব নিয়ম-রক্ষা করছে কেবল। মনে মনে তাকে সেই খোলার ঘরের আঁস্তাকুড়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট করে রেখেছে সবাই।

আই. এ. পরীক্ষাই কিছুদিন আগে ইন্দু তো একদিন ঠাট্টাই করে বসল খোলাখুলি।

কেন ওই বাজে বইগুলো মুখস্থ করে মরছ বউদি?

ভিন্‌সেন্ট স্মিথের লেখা হিস্ট্রি, বাজে হল?

আমরা নিজেদের হিস্ট্রি নিজেরা আগে লিখি, কতটা সত্যি কতটা বানানো আগে সেটা ঠিক হোক. তারপর পড়ো ওসব।

এতে যা লেখা আছে তা মিথ্যে?

অন্ধকূপ-হত্যাটা যে মিথ্যে, তা তে প্রমাণ হয়েই গেল। ওদের লেখা ইতিহাসে আমাদের অতীত গৌরবের কথা কতটুকু পড়েছ? বুদ্ধ-অশোককে নেহাত চাপা দেওয়া যায় না বলেই ওদেরর সম্বন্ধে দু-চার কথা শুনতে পাওয়া যায়। ওদের দু-চারজনকে বাদ দিলে স্কুলপাঠ্য ইতিহাসগুলোতে আমাদের অতীত তো অন্ধকারময়। যা কিছু আলো ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে---

ইন্দুর চোখে বিদ্যুত দেখে কনক চুপ করে রইল। তার মনে হল, তার নিজের চোখের দৃষ্টিতে অমন বিদ্যুৎ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে না—উঠবেও না কোন কালে—হাজার চেষ্টা করলেও উঠবে না। কেমন যেন ভীতু বাছুরের মত চোখ তার। আয়নার দেখা নিজের চোখের প্রতিচ্ছবি মনের ওপর ফুটে উঠল নিমেষেমধ্যে।

তা ছাড়া কি হবে পড়ে?

মৃদু হেসে কনক উত্তর দিয়েছিল, আর কিছু না হোক, ডিগ্রী হবে।

চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না।

ইন্দু উঠে চলে গেল। কিন্তু কথাগুলোর দাগ থেকে গেল কনকের মনে। সে তা হলে চেনা বামুন নয়, তাই উপবীতগুচ্ছটাকে আস্ফালন করবার চেষ্টা করছে সাড়ম্বরে। কি স্পর্ধা মেয়েটার! সত্যই মেয়েটার স্পর্ধা অস্বস্তিকর। দুবার বিধবা হয়ে সকালের মাথা কিনে বসেছে যেন। কারও কিছু বলবার জো নেই। তা ছাড়া কি যে সব কাণ্ড করে গোপনে গোপনে, ভাবলেও শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। একদিন দুপুরবেলা এক বোরখা পরে এসে হাজির। বাড়িতে কেউ তখন নেই। কনক একা বসে পড়ছিল। ঘরে ঢুকে বোরখা খুলে ছোট একটা পুলিন্দা বার করে বললে, রেখে দিতে হবে এটা লুকিয়ে। কাল এসে নিয়ে যাব। একটা প্রতিশ্রুতি কিন্তু চাই।

কি?

খুলে দেখতে পাবে না, এর ভেতরে কি আছে। এর সম্বন্ধ কাউকে বলতেও পাবে না। বললে আমার মৃত্যু। রাজী আছ?

বেশ।

এইবার আমাকে তোমরা জড়োয়া গয়নাগুলো আর একখান বেশ রঙচঙে ভাল শাড়ি দাও। বোরখাটা এইখানে থাক্। কাল তোমার গয়না শাড়ি ফেরত দিয়ে এইগুলো নিয়ে যাব।

গয়না শাড়ি পরে গটগটে করে বেরিয়ে চলে গেল—যেন একটা রাজারাণী। রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসল। কি সপ্রতিভ! হাজার চেষ্টা করলেও কনক ও-রকম পারত না। দেখলে হিংসে হয়, রাগও হয়। কনক নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে নি। কৌতুহল সম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তার পক্ষে। পুলিন্দাটা খুলে দেখেছিল—দেখে শিউরে উঠেছিল। দুটো রিভল্‌ভার। যদিও কাউকে বলে নি সে কথা, তবু ইন্দুর কাছে গিয়েছিল তার পরদিন।

সামান্য এ লোভটুকু সামলাতে পারলে না বউদি—কি তুমি!

ইন্দুর চোখের সে হাস্যপ্রখর ব্যঙ্গশাণিত দৃষ্টি সে ভুলতে পারবে না কোনদিন। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয়েছিল সেদিন ইন্দুর কাছে। কার কাছেই বা নিজের মহত্ত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে সে? বাসন্তীর মহিমার তুলনায় সে তো নগণ্য। বাসন্তীর হাস্য-আলাপ দয়া-দাক্ষিণ্য দান-প্রতিদান-উৎসব-ঐশ্বর্য-অলংকৃত সহস্রবিধ অজস্রতার উচ্ছ্বসিত কলস্রোতের মুখে খড়ের টুকরোর মত ভেসে তার সঙ্কুচিত ব্যক্তিত্ব। বাসন্তীর পাশে তাকে সূর্যকিরণ-লাঞ্ছিত চন্দ্রের মত ম্লান দেখায়। নিজেই সে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। শঙ্খ-রজত-হীরকের দিকেও সে ভাল করে চোখ তুলে চাইতে পারে না, অথচ তাদের কত কচি কচি দেখেছে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল সব, তাকে ছাড়িয়ে উঠলো। বর্ধমান শালচারাদের দিকে বিস্মিত নয়নে চেয়ে রইল ছোট পেয়ারাগাছ সে। নিজের পেটের ছেলে নবীনকেই সে ভাল করে বুঝতে পারে না। কেমন করে যেন কথা কয়, কেমন করে যেন চায়! অত শখ করে অত দামী পিয়ানোটা কিনলে, অথচ একজন বন্ধু চাইবামাত্র দান ক;ের দিলে এক মুহূর্তে! জিজ্ঞেস করাতে হাত উলটে কেমন করে যেন হাসলে একটু! এরা ভিন্ন জাতের লোক, ভিন্ন জগতের, এদের সঙ্গে তার মেলে না। মেলে না, কিন্তু মেলাবার চেষ্টা করতেও ছাড়ে নি সে। পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা অভিনয় করতে করতেই সারাটা জীবন কাটল। অপটু অভিনেতা যেমন অত্যাধিক বেশি হাত-পা নেড়ে বা অস্বাভাবিক চীৎকার করে অভিনয়ের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করে, সেও তেমনই একটা বড় রকম ডিগ্রী আস্ফালন করে অনাভিজাত্যের কলঙ্ক স্খালন করবার চেষ্টা করেছিল এবং তা করতে গিয়ে স্বামীর দিকে পর্যন্ত ভাল করে দৃষ্টি দিতে পারে নি। যে শ্বশুর তার গুণবত্তায় মুগ্ধ বলে তার ধারণা ছিল, সেই শ্বশুরকেও সে যে সন্তুষ্ট করতে পারে নি, তার প্রমাণ মিলল বি. এ. পরীক্ষা দিতে যাবার দিন। সকাল সকাল খেয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করতে গেছে—হংস-শুভ্র তখন কলকাতার বাড়িতেই থাকতেন—তিনি প্রশ্ন করলেন, এত সকালে কোথাও বেরুচ্ছে নাকি?

আজ আমার পরীক্ষা যে।

ও। সমস্ত দিন তুমি বাড়িতে থাকবে না, তোমার ছেলেমেয়েগুলোকে দেখবে কে?

শ্বশুরের কাছে সে প্রশংসা পাবে ভেবেছিল, এ কথা প্রত্যাশা করে নি। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হংস-শুভ্র বললেন, সাহেবদের নকল করে, পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছ কেন বল দিকি? লেখাপড়া শেখ না, ডিগ্রীর জন্য অত কাঙালপনা কেন?

কনক প্রত্যুত্তর দিতে পারত। কিন্তু চিরকাল মিতভাষিণী সে, চুপ করে রইল। হংস-শুভ্র আবার বললেন, ভালও লাগে এসব করতে? তুমি বই কোলে করে বসে থাকবে, আর তোমার ছেলেমেয়েদের কোলে করে বসে থাকবে তোমার দাই-চাকরগুলো? মৃগাঙ্কটাও ডাক্তারি ছেড়ে কংগ্রেস করে বেড়াচ্ছে বোধ হয় তোমার ডিগ্রীর ঝাঁজে বাড়িতে টিকতে না পেরে।

কনক আরও ক্ষণকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল।

পরীক্ষা দিয়ে ফিরে শুনলে, শ্বশুর দমদমে চলে গেছেন। শশাঙ্ক অনেক আগেই আলাদা বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। সমস্ত বাড়িটা কেমন যেন শূন্য বলে মনে হল। ইন্দু পর্যন্ত চলে গেছে বাবার সঙ্গে। সে লেখাপড়া শিখছে, এটাকে অপরাধ বলে গণ্য করছে সবাই? আশ্চর্য!

মৃগাঙ্ক-শুভ্র প্রায় সমস্ত দিন কি যে করতেন, তা জিজ্ঞাসা না-করাটাই শ্রেয় মনে হত কনকের। একদিন প্রশ্ন করে যে উত্তর পেয়েছিল, তাতে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়েছিল তার পক্ষে। চরকা চালিয়ে ইংরেজকে তাড়াবেন এঁরা! যে ইংরেজরা নেপোলিয়নকে হারিয়েছে, কাইজারকে হারিয়েছে, জল-স্থলে-অন্তরীক্ষে যাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এঁরা খদ্দর বানিয়ে কাবু করে দেবেন! উচ্ছ্বসিত হয়ে বক্তৃতা করে গেল লোকটা। যারা বেকার, তারাই এসব করে বেড়ায়—কর্তার প্র্যাক্টিস বোধ হয় জমে নি এখনও, তাই এই সব ছেলেমানুষি করে বেড়ানো হচ্ছে, প্র্যাক্টিস জমলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ নিয়ে আর সে মাথাই ঘামায়নি, ভেবেছিল, দুদিনের খেয়ালে দু'দিনেই মিটে যাবে। এম. এ. পড়ার আয়োজনে মত্ত হয়েছিল সে। তবু কিন্তু মাঝে মাঝে তার কেমন যেন একা মনে হত। মনে হত, সে যেন, একঘরে হয়ে আছে, কেউ তাকে পৌঁছে না, চায় না। মৃগাঙ্ক-শুভ্র প্রায়ই বাইরে থাকতেন। ফিরে এসে একদিন হঠাৎ বললেন, তুমি গিয়ে বাবাকে ফিরিয়ে আন। আমি সময় পাচ্ছিনা। আজ আবার মেদিনীপুর যেতে হবে একটা দরকারে।—বলেই বেরিয়ে গেলেন।

দমদম থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হল। ফিরে দেখে, বাড়িতে কেউ নেই। জনবহুল কলকাতা শহরের বুকেও যে এমন নির্জনতা, এতখানি নিঃসঙ্গতা থাকা সম্ভব, তা সেই দিনই সে প্রথম বুঝেছিল। প্রকাণ্ড বাড়িটায় কেউ নেই। ছেলেমেয়েরা স্কুলে, দাই-চাকরগুলো বাড়ি গেছে, বুড়ো দারোয়ানটা ঘুমুচ্ছে নিজের ঘরে খিল দিয়ে। খাঁ-খাঁ করছে প্রকাণ্ড বাড়িটা। তেতলার ঘরে ঢুকে উঠে প্রথমেই চোখে পড়ল কনভোকেশনের গাউনটা..... ইন্দুর মুচকি হাসিটা মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে ...দমকা হাওয়ায় দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল কপাটটা......।

।। তিন ।।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রও প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনে তেমন আস্থাবান ছিলেন না। আত্মার শক্তিতে তিনি বিশ্বাস করতেন, কিন্তু সেটা আধ্যাত্মিক মার্গে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে এ শক্তিকে অস্ত্রের মত প্রয়োগ করা সম্ভব, সম্ভব হলেও আপামর-ভদ্র সকলে যে সহসা এই তপস্বী-সুলভ শক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে পারে, এ সম্বন্ধে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সন্দেহ ছিল। তথাপি তিনি গান্ধীপন্থী হয়েছিলেন, তার কারণ, আদর্শবাদী শিক্ষিত ভারতবাসীর সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ ছিল না তখন। পর্বত শিখর থেকে উৎপন্ন নদী যেমন ঢালু ভূমি অনুসরণ করে অবশেষে সাগরে উপনীত হয়, সে যুগে তেমনই আত্মত্যাগমূলক উচ্চ-শিক্ষা-শিখর থেকে উৎপন্ন মন অনিবার্য যুক্তিপ্রবণতার অমোঘ আকর্ষণে অবশেষে যে সিদ্ধান্ত সমুদ্রে গিয়ে আত্মহারা হত, তার নাম—দেশসেবা। মৃগাঙ্ক-শুভ্র-জাতীয় সমস্ত লোকই তখন নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন যে দেশসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেবা না করলে দেশকে গড়ে তোলা যাবে না, আর দেশকে গড়ে তুলতে না পারলে জীবনই বৃথা। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের বিবর্তন একটু দেরিতে হয়েছিল। বৈষ্ণবীর গান এবং বিবেকানন্দের বাণীতে যে তরুণ চিত্ত একদা উদ্বুদ্ধ হয়েও পথ খুঁজে পায় নি, কনকের নিবিড়-সান্নিধ্য-সঞ্জাত ভোগরস পরম উপাদেয় হলেও ঠিক সেই কাম্য অমৃত নয়—এ কথা একদা সহসা উপলব্ধি করে যে হতাশ মন দিশহারা হয়ে পড়েছিল এবং

দাম্পত্যজীবনের বাহ্যাড়ম্বর বজায় রেখেও গোপন পথে তৃপ্তি সন্ধান করতে করতে দেশসেবা-স্বপ্নে মগ্ন হয়েছিল, তার বিবর্তন বিলম্বিত হলেও স্বাভাবিক পথেই হয়েছিল। বিবেকানন্দের আহ্বানেই তাঁর মন ছুটে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যবিধাতার বিধানে তাকে ঠিক সেই জিনিসটাই বরণ করতে হল, বিবেকানন্দ বারম্বার যা বর্জন করতে বলেছেন। কনকের রূপ-যৌবনে তিনি মুগ্ধ ও হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর মুগ্ধ অন্তরে কিসের যেন ছায়াপাত হত, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যুবতী পত্নীর পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে সহসা লজ্জিত হয়ে পড়তেন তিনি। যে বীর সন্ন্যাসীর বাণী মনের গ্লানিই মোচন করে নি শুধু, যাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকা অন্ধত্ব মোচন করেছিল, যাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা ভারতের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রত্যেক ভারতবাসীকে আত্মসম্মান আত্মবিশ্বাস আত্মশক্তির প্রেরণা দিয়েছিল, তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে না পেরে মৃগাঙ্ক-শুভ্র মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন। চুম্বনমদির মধুযামিনীর স্বপ্ন হঠাৎ যেন ভেঙে যেত, জ্যোৎস্না নিবে যেত, প্রাসাদ মিলিয়ে যেত.....মনে হত, ঘনঘাচ্ছন্ন অমাবস্যা নিশীথে পঙ্কিল পিচ্ছিল পথে জীর্ণবসন শীর্ণকান্তি কারা সব চলেছে যেন দলে দলে.....কাঙালের মিছিল। হঠাৎ সব মিলিয়ে যেত আবার....মনে হত, না—না, আমি পারব না, আমি ভিন্ন পথের পথিক হয়েছি, ওদিকে চাইবারও অধিকার নেই আমার। নিবিড়তর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতেন কনককে।

.....খবরের কাগজ এড়াবার উপায় ছিল না কিন্তু। ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস। পড়তেই হত। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের উন্মাদনা, অরবিন্দ, বারীন, উল্লাসকর, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, রাণাডে, গোখলে, তিলক, মিন্টো রিফর্ম, মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট—সবই খবরের কাগজ থেকে পাওয়া। মনেও থাকে না যদিও দুদিন পরে কিছু,—পুরানো খবরের কাগজ যথাসময়ে ওজন-দরে মুদীর দোকানে গিয়ে হাজির হয়—তবু খবরের কাগজ না পড়লে চলে না। খবরের কাগজের পাতাতেই হঠাৎ একদিন চোখে পড়েছিল, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামক এক ব্যক্তি আফ্রিকা থেকে দিগ্বিজয় করে দেশে ফিরেছেন। পড়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। অদ্ভুত লোক তো! অহিংসা, সত্যাগ্রহ, ব্রহ্মচর্য, বুদ্ধ-চৈতন্য-যীশুখ্রীষ্ট-টল্‌স্টয়-থোরোর অসম্ভব কল্পনা বিলাসকে এই গুর্জরবাসী আইনজীবী রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করে স্মাট্‌সের মত জাঁদরেল লোককে কাবু করে দিয়েছে! সত্যি? প্রকাণ্ড-পাগড়ি-পরা শীর্ণকান্তি লোকটার ছবির দিকে নীরব বিস্ময়ে তিনি চেয়ে ছিলেন খানিকক্ষণ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোকান থেকে এসে হাজির হল একটা বিল। কনকের শাড়ি শেমিজ তেল পাউডার, ছেলেমেয়েদের পেনি নিকারবোকার প্যারাম্বুলেটার টফি—একগাদা বিলিতী জিনিসের লম্বা একটা বিল। গান্ধীর ছবির ওপরেই 'চেক' বইটা রেখে 'চেকটা' লিখে দিলেন। পরের দিন আর গান্ধীর কথা মনেই রইল না। কিছুদিন পরেই প্রবলভাবে মনে পড়ল আবার চম্পারণ জেলার আইন অমান্য ব্যাপারে। বাধল যুদ্ধ। যুদ্ধের হিড়িকে গান্ধী কোথায় তলিয়ে গেলেন। একবার শোনা গেল, বিলেতে তিনি ইংরেজদের সাহায্যার্থে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে কাইজার-ই-হিন্দ্ মেডেল পেয়েছেন। কেমন যেন খটকা লাগল। কিন্তু ঘটনাপুঞ্জে তাও চাপা পড়ে গেল দু'দিন পরে। গান্ধীর স্মৃতি মন থেকে যখন প্রায় মুছে এসেছে, প্রথম যৌবনের আধ্যাত্মিক প্রেরণার শিখাও যেন নির্বাণোন্মুখ, ব্যাঙ্কের মোটা টাকা, গৃহিণী-পুত্র-কন্যার স্নেহনিবিড় সঙ্গ মনকে যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন করে তুলেছে, তখন হঠাৎ যেন চাবুক খেয়ে জেগে উঠলেন তিনি। রাউলাট অ্যাক্ট

এবং ঠিক তার পিঠ-পিঠ জালিয়ানওয়ালাবাগ। ভারতের আকাশে প্রদীপ্ত সূর্যের মতন উদিত হয়েছেন মিস্টার এম. কে. গান্ধী নয়—গান্ধী মহারাজ। তার পরই অমৃতসর কংগ্রেস। সেও আর এক বিস্ময়। ডায়ার-ও' ডয়ারের কান্ডের পর গান্ধী দুঃখ প্রকাশ করলেন নিজের দেশবাসীর বর্বর আচরণের জন্যে—পাঞ্জাবে গুজরাটে উত্তেজিত জনতা মাথা ঠিক রাখতে পারেন নি। গান্ধী বললেন, রাজপুরুষেরা জালিওয়ালাবাগ করুক, কিন্তু আমরা কেন নিরীহ ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে হত্যা করব, ঘরে ঘরে আগুন লাগাব? সমস্ত দেশ পঞ্চমুখ হয়ে যখন ইংরেজদের সমালোচনা করছে, তখন আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে লজ্জা প্রকাশ করা! গান্ধী কিন্তু বললেন, সত্যিই আমি লজ্জিত। এতো সত্যাগ্রহ নয়। আমি গুন্ডা চাই না, বক্তা চাই না, হুজুগে চাই না,—সত্যাগ্রহী চাই। ভীরু নয় বীর চাই। শুধু তাই নয়, মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড স্কীমের সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত হলেন তিনি। বললেন—"Do not return madness with madness, but return madness with sanity, and the whole sitution will be yours." হিন্দু ভারতবাসীর আচরণে পরিস্ফুট হয়ে উঠল যীশুখ্রীষ্টের মহিমা—চিত্তরঞ্জনের মত প্রতিভাবান প্রতিপক্ষও অভিভূত হয়ে হার মানলেন। মৃগাঙ্ক-শুভ্রও শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন সেদিন। শিষ্যত্ব গ্রহণ করার মধ্যে আড়ম্বর ছিল না তেমন কিছু। কংগ্রেসের মেম্বর হলেন, খদ্দর পরলেন, চরকা কিনলেন। চরকা এবং খদ্দর নিয়ে বাড়ি ফিরে কিন্তু উৎসাহ পেলেন না। মনে হল, যেন অন্য দেশে প্রবেশ করলেন, যে দেশে পরাধীনতার গ্লানি নেই, কংগ্রেস নেই, যাদের নিজেদের কোন দুঃখ নেই, অপরের জন্যে দুঃখবোধ নেই—মনে হল, অন্ধ-বধির কতকগুলো লোক যেন দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে নিজেদের স্বার্থটুকু আঁকড়ে ধরে আছে, তার বেশি আর কিছু দেখে না, দেখতে পায় না, শোনে না, শুনতে চায় না। চরকা দেখে কনক মুখ টিপে একটু হাসলে, ছেলেমেয়েরা ভাবলে, নতুন ধরনের একটা খেলনা বুঝি! শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, ননসেন্স্‌! হংস-শুভ্র তখনও দমদমে যান নি, তিনি বললেন, এনেছ, দু দিন চালিয়ে দেখ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও টিকবে না। বাঙালী-বাবুদের ধাতে সইবে না। শেষকালে ওটা মাকড়সা আর ধুলোর আড্ডা হবে। ডাক্তারী বিদ্যেটাও বিদেশী বলে বর্জন করবে নাকি? তা যদি পার, তা হলে কিছু একটা হল। তা কিন্তু পারবে না।—এই বলে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেলেন, খড়মের চটচট শব্দ যেন অট্টহাস্য করতে লাগল। ইন্দুটা পর্যন্ত ঠাট্টা করে বলে গেল, আমাদের দেশে তো চরকা ছিলই ছোটদা, সেটা কি করে উঠে গেল তার ইতিহাসটা আলোচনা করে তারপর চরকা চালাবার চেষ্টা করলে ভাল হয় না? উঠে যাবার কারণটা না দূর করলে তোমার চরকা আবার থেমে যাবে যে! একমাত্র শঙ্খ-শুভ্রই একটু যা সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। সে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে তখন, সে-ই প্রায় রোজ চুপিচুপি তাঁর কাছে আসত আর সূতো কাটত। বেশি কিছু বলত না। চুপ করে শুনত সব আর চরকা ঘোরাত। বিশেষ কিছু উচ্ছ্বসিত হয় নি একদিনও, তার মা বাসন্তীই বরং উচ্ছ্বসিত হয়েছিল বেশি। খুব দামী একখানা খদ্দরের শাড়ি পরে প্রায়ই আসত। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হত, এরাই বোধ হয় তাঁর মনের কথাটি ঠিক বুঝেছে। বস্তুত এরা ছাড়া আর কেউ বড় আসত না তাঁর কাছে। কনক পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। বাজে ব্যাপারে মন দেবার অবসর ছিল না তার; যখন অবসর হত, তখন মৃগাঙ্ক শুভ্রের এই সব খদ্দরী খেলাকে সকৌতুক ঔদাসীন্যভরেই লক্ষ্য করত সে। খেলা যে শেষে জীবনমরণ-সমস্যায় রূপান্তরিত

হয়ে উঠবে, তা সে ভাবতেই পারে নি। যেটাকে রবারের সাপ ভেবেছিল, সেটা সত্যিই যখন ফণা তুলে দংশন করতে উদ্যত হল, তখন নির্বাক হয়ে গেল সে।

খেলাফতের অজুহাতে মহাত্মা গান্ধী পরের বছর যখন নন-কোঅপারেশন শুরু করে দিলেন এবং সেই অহিংস-যজ্ঞে চারিদিক থেকে দলে দলে উকিল শিক্ষক ছাত্র, রাশি রাশি খেতাব, বোঝা বোঝা বিলিতী কাপড় আহুতি পড়ে অগ্নি-শিখা যখন গগন-বিসর্পী হয়ে উঠল—চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, জওহরলাল, বিঠলভাই, বল্লভভাই, কেলকার, মুঞ্জে, মদনমোহন, রাজেন্দ্র-প্রসাদ, রাজাগোপালাচারি, রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার,সত্যমূর্তি, শওকৎ আলি, মহম্মদ আলি, আবুল কালাম আজাদ, আনসারি, সুভাষচন্দ্র—দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা যখন সমস্ত ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে, ঘরে ঘরে চরকা চলতে লাগল, গ্রামে গ্রামে তাঁত বসল, তখন মৃগাঙ্ক-শুভ্রও তাঁর উঠতি-পসারের মোহত্যাগ করে গা ভাসিয়ে দিলেন সেই তুফানের মুখে। মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে মার খেলেন পুলিসের হাতে। জেল হয়ে গেল। জেলকে তখন ভয় করে কে? জেল তখন তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে।

জেলে গিয়েই কিন্তু তাঁর সর্বপ্রথম খটকা লাগল। জেলে যাদের সঙ্গে বাস করতে হল তাঁকে—যারা স্কুল-কলেজ-চাকরি-পসার বর্জন ক'রে দেশের জন্য জেলে এসেছে, তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। এই ছ্যাবলা চ্যাংড়ার দল দেশোদ্ধার করবে? এদের না আছে নিষ্ঠা, না আছে গাম্ভীর্য, না আছে আত্মসম্মান। এদের দেখে তো শ্রদ্ধা হয় না, রাগ হয়। গৌরবে মন ভরে ওঠে না, লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে। এদের ওপর নির্ভর ক'রে মহাত্মাজী এক বছরের মধ্যে স্বরাজ পাবেন আশা করেছেন নাকি? এদের কি তিনি ঠিকমত চিনতেন? এদের গান হাসি হল্লোড়ের মাঝে, জেলকর্তৃকপক্ষের কাছে এদের নানা রকম অশোভন অসঙ্গত আত্মসম্মানহানিকর আবদারের হীনতায় আদর্শবাদী মৃগাঙ্ক-শুভ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। কিছুদিন কেমন যেন মুষড়ে গেলেন তিনি। তাঁর দ্বিতীয় খটকা লাগল অহিংস আন্দোলনের চেহারা দেখে। জেলে ব'সেও খবর পাচ্ছিলেন তিনি। চারিদিকে দাঙ্গা বেধে উঠেছে, পুলিস গুলি চালাবার সুযোগ পাচ্ছে, প্রিন্স্ অব ওয়েল্সের আগমন উপলক্ষ্যে বম্বেতে যে কাণ্ড হয়ে গেল, তা লোমহর্ষকর—কোনমতেই অহিংস বলা চলে না তাকে। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সেই প্রথম মনে হ'ল, টল্স্টয়ের আদর্শ সে যুগে এক টল্স্টয় ছাড়া আর কেউ যেমন পুরোপুরি পালন করতে পারে নি, এ যুগে তেমনই এক মহাত্মাজী ছাড়া আর কেউ বোধ হয় পারবে না। কায়মনোবাক্যে অহিংস থাকা অশিক্ষিত জনতার সাধ্য নয়। তাই যদি না হয়, তা হ'লে এ অসম্ভব অসাধ্য আন্দোলন চালাবার মানে কি?...

মৃগাঙ্ক-শুভ্র জেল থেকে যখন বেরুলেন, তখন চৌরিচৌরা হয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধী জেলে। অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ। জেলের গেটে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হীরক ও তার বন্ধুবান্ধবেরা। হীরকের মুখ উদ্ভাসিত। কাকা দেশের জন্যে জেল খেটে বেরুলেন, এ যেন বিশেষ ক'রে তারই গৌরব। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে মাল্যভূষিত হয়ে মোটরে উঠে বসলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। একটা কথা বার বার মনে হতে লাগল, কনক আসে নি। শুক্তি মুক্তা নবনী—কেউ আসে নি। কারণটা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে কেমন যেন লজ্জা হতে লাগল। কেউ একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে নি। শুক্তি মুক্তা নবনী না হয় ছেলেমানুষ, কনকও লেখে নি।

তিনি জেল থেকে কনককে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, তা যে তার জীবন-ধারা বদলে দেবে, এ কল্পনা তিনি করেন নি। কারণ স্ত্রী হ'লেও কনককে তিনি ঠিক চিনতেন না।

তিনি লিখেছিলেন, "আমার হঠাৎ যে জেল হয়ে যাবে, তা ভাবি নি। দেশের জন্যে এ ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি কিন্তু ধন্য হয়েছি। আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে, তা তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব না। কারণ তুমি বুঝতেই পারবে না। স্বামী-স্ত্রী হ'লেও আমাদের জীবনের আদর্শ যে ভিন্ন, তা আমি কিছুদিন থেকে অনুভব করছিলাম। বিশেষ করে অনুভব করলাম সেইদিন, যেদিন তুমি আমার খদ্দরের কাপড়গুলোকে চট বলে ঠাট্টা করেছিলে। তারপর সবাই যখন দলে দলে স্কুল কলেজ পরীক্ষা বয়কট ক'রে চ'লে আসছে, তখন তোমার ডিগ্রী-লাভ করবার উৎকট আগ্রহ দেখেও আমার মনে হয়েছিল, তুমি ভিন্নজাতের লোক। আমার ছেলেমেয়েদের আমি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারতাম অবশ্য, কিন্তু তারা কেবল আমার ছেলেমেয়ে নয়, তোমারও ছেলেমেয়ে। তুমি যখন জোর ক'রে বললে যে, তাদের তুমি এসব বাজে হুজুকে মাততে দেবে না এবং দরোয়ান সঙ্গে দিয়ে স্কুলে পাঠাতে লাগলে, তখন তোমার মান এবং দাবি বজায় রাখবার জন্যেই আমি কিছু বলি নি। কিন্তু তখন নিঃসংশয়ে বুঝে ছিলাম যে, আমার আদর্শ তোমার কাছে মূল্যহীন; তাই জেলে এসে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। এক হিসেবে অবশ্য তোমার ভাগ্য ভাল। কারণ আমি জেলে চ'লে আসার জন্যে, আর যাই হোক, অন্নবস্ত্রের অভাবে তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। এই জেলে আমার সঙ্গেই এমন লোক আছেন, যাঁরা জীবিকা উপার্জনের একমাত্র উপায় বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। তাঁদের পরিবারবর্গকে হয়তো অন্নবস্ত্রের জন্যে পরের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আমার পূর্বপুরুষের দৌলতে সে ভোগ তোমাকে ভুগতে হবে না। ভালভাবে খেয়ে প'রে এমন কি নভেল পড়ে, সিনেমা দেখেও দিন কাটাতে পারবে। আমার ব্যাঙ্কের টাকা তোমার নামে করে নিও। 'চেক' পাঠালাম। বাবাকেও লিখে দিলাম যে, তিনি যেন তোমার হিসাবেই টাকা দেন, আমি যতদিন জেলে থাকব।..."

এর উত্তরে কনক কোন চিঠিই লেখে নি। বাসন্তীর চিঠিতেই মৃগাঙ্ক জানতে পারেন যে, কনক ভালভাবে এম. এ. পাস করেছে।

মোটর দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। গলা থেকে ফুলের মালাটা নামিয়ে রেখে মৃগাঙ্ক-শুভ্র জিজ্ঞাসা করলেন, শঙ্খ রজত কোথা?

দাদাকে বাবা কি একটা কাজে টাটা পাঠিয়েছেন। মেজদা বোধ হয় নৈনিতালে।

হীরকের মুখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

জানেন ছোটকাকা, মেজদার পেছনেও পুলিস লেগেছে।

জ্বলজ্বল করতে লাগল তার চোখ দুটো, মুখের হাসি আরও যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল।

শুক্তি মুক্তা নবনীরা এল না যে? খবর পায় নি নাকি তারা?—জিজ্ঞাসা না ক'রে পারলেন না মৃগাঙ্ক-শুভ্র।

কি জানি, খবর পেয়েও আসতে পারে নি হয়তো। হস্টেল থেকে সব সময় ছুটি দেয় না তো।

ওরা হস্টেলে নাকি?

হ্যাঁ। কাকীমা দিল্লী চ'লে যাবার সময় ওদের হস্টেলেই তো রেখে গেলেন।

হীরক আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের দিকে। তার সদা দীপ্যমান মুখের হাসি একটু অস্বচ্ছ হয়ে এল ক্ষণিকের জন্য। কেমন যেন সন্দেহ হ'ল কাকা বোধ হয় জানেন না। চুপ ক'রে রইল। মৃগাঙ্ক-শুভ্রও চুপ করে রইলেন। নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে মোটর ছুটতে লাগল। মোটর যখন শশাঙ্ক-শুভ্রের গাড়ি-বারান্দার নীচে থেমেছে, তখনও মৃগাঙ্ক-শুভ্র অন্যমনস্ক। ..হঠাৎ অনেকগুলো শাঁখের শব্দে সচকিত হয়ে উঠলেন এবং তারপর বিব্রত হয়ে পড়লেন লাজবর্ষণের প্রাচুর্যে। লক্ষ্য করলেন, শুধু লাজ নয়, পুষ্পবৃষ্টিও হচ্ছে। ওপরের দিকে চেয়ে দেখতেই চোখে পড়ল, গাড়ি-বারান্দার ছাতে আনন্দে আত্মহারা বাসন্তী খই আর ফুল ছড়াচ্ছে। সঙ্গে পাড়ার এক দল মেয়ে, প্রত্যেকেরই অঙ্গে নানা উজ্জ্বল বর্ণের বিচিত্র সজ্জা, কারও হাতে ফুলের ডাল, কারও মুখে শাঁখ—একটা সাগ্রহ সম্বর্ধনা মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন। ক্ষণিকের জন্যে সব ভুলে গেলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র, এমন কি অভ্যর্থনাকারিণীদের সাজসজ্জার কোন উপকরণই যে খদ্দর নয়, তাও নজরে পড়ল না তাঁর—তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মোটর থেকে নামতেই একদল কিশোরী মেয়ে এগিয়ে এসে প্রণাম করে মাল্য-চন্দন দিয়ে অভিনন্দিত করল তাঁকে, সঙ্গে সঙ্গে কমনীয়কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' শুরু হয়ে গেল ড্রয়িং-রুমে। অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন করেছিল বাসন্তী।

আদর-অভ্যর্থনা-অভিনন্দনের ধুম চলল কয়েক দিন ধ'রে পাড়ায় পাড়ায় বন্ধুবান্ধব-মহলে। কেমন যেন নেশা লাগল। নিজেরই মনে হতে লাগল, কয়েকমাস জেলে বাস করে সত্যিই একটা দিগ্বিজয় করে ফিরেছেন তিনি। এসব কিন্তু বেশি দিন ভুলিয়ে রাখতে পারলে না তাঁকে। পরাজয়ের গ্লানিটা ছাপিয়ে উঠতে লাগল সমস্ত মালা-গান-হাততালিকে। অসহযোগ-আন্দোলন থেমে গেছে। নিবে গেছে সব। রাগ হতে লাগল মহাত্মা গান্ধীর ওপর। এমন করে সব থামিয়ে দিলেন কেন তিনি? মনে পড়ল তিলককে। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে কি এমন করে থামিয়ে দিতেন সব? অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সেই লোকমান্য বীর কি এত বড় একটা ভুল করতেন? হ'লই বা চৌরিচৌরা, হ'লই বা একটু-আধটু ত্রুটি-বিচ্যুতি, সমস্ত দেশের জাগ্রত আত্মচেতনাকে এমন ভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবার কি অধিকার ছিল মহাত্মাজীর? 'ট্রুথ' ট্রুথ' ক'রেই গেলেন লোকটি তিলকের কাছে কিন্তু ট্রুথের চেয়েও দেশ বড় ছিল। দাদাভাই নাওরোজি আর গোখেলের শিষ্য গান্ধীর কাছে কিন্তু ট্রুথ বড়, দেশ নয়। এ রকম শুচিবায়ু-গ্রস্ত লোকের দেশের কাজে নাবার দরকার কি ছিল? একটা ভাষাহীন অবরুদ্ধ ক্ষোভে সমস্ত চিত্ত উন্মথিত হতে লাগল তাঁর। কোন অবলম্বন না পেয়ে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন তিনি। আবার ডিস্‌পেন্সারি ফেঁদে ডাক্তারি করবার প্রবৃত্তি আর ছিল না। পারিবারিক জীবনেও কোন আশ্রয় মিলল না। কনকের ব্যবহারে তাঁর পারিবারিক জীবনের মূলোচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। কনক তাঁর ব্যাঙ্কের টাকার এক কপর্দকও স্পর্শ করে নি—দিল্লীতে গিয়ে মাস্টারি শুরু করেছিল সে। শুক্তি-মুক্তা-নবনীর হস্টেলের খরচ নাকি সে-ই পাঠায়। সবাই আশা করেছিল, মৃগাঙ্ক গিয়ে কনককে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি কিন্তু সে-সব কিছুই করলেন না। তিনি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে হস্টেলে গিয়ে দেখা করলেন। এমন ভাব প্রকাশ করলেন যেন তাঁরই নির্দেশে তারা হস্টেলে এসেছে এবং কনকও চাকরী নিয়েছে তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে। তাঁর মনে হ'ল, যে ভাগ্যবিধাতা একদিন ভুলক্রমে তাঁর জীবনের সঙ্গে কনকের

জীবন জড়িত করেছিলেন, সেই ভাগ্যবিধাতাই এখন বোধ হয় আবার নিজের ভুল সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রথমবার মৃগাঙ্ক আপত্তি করেন নি, এবারেও করলেন না।

দমদম থেকে হংস-শুভ্র আর ফেরেন নি। মৃগাঙ্ক যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন অপ্রত্যাশিত রকম স্নেহপ্রবণ ব'লে হ'ল তাঁকে। তাঁর দিকে এক নজরে চেয়ে বললেন, বড্ড রোগা হয়ে গেছ দেখছি। অসুখ বিসুখ করেছিল নিশ্চয়।

না।

তবে? খেতে দিত না?

মৃগাঙ্ক-শুভ্র মৃদু হাসলেন একটু, কোন উত্তর দিলেন না। হংস-শুভ্রও কিছু না বলে অন্য দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমার স্ত্রী যখন স্বাবলম্বী হয়েছে, তখন তোমার আর ভদ্রস্থ নেই।

মৃগাঙ্ক চুপ ক'রে রইলেন। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে হংস-শুভ্র আশ্বাস এবং সান্ত্বনা দেবার সুরে শান্তকণ্ঠে বললেন, তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে অবশ্য ভাবনা নেই তোমার। টাকা দিয়ে যতটা সম্ভব, তা আমি করব। তারাপদকে পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা করেওছি। বউমাও শুনেছি ওদের টাকা পাঠায়। তা পাঠাক.....

হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন। তারপর বললেন, বউমা হঠাৎ চাকরি নিতে গেল কেন বুঝলাম না! ঝগড়া হয়েছিল তোমার সঙ্গে?

ঠিক ঝগড়া নয়, মতের মিল ছিল না।

ও।

হংস-শুভ্রের চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বললেন, ভেতরে যাও, তারাপদ আছে। ইন্দু নেই। হঠাৎ দু'দিন আগে কার এক টেলিগ্রাম পেয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। কি যে করছ তোমরা, তা তোমরাই জান।

সমস্ত দিন আর কোন কথা হ'ল না।

বিকেলে ফেরবার সময় হংস-শুভ্র কেবল প্রশ্ন করলেন, কি করবে ঠিক করেছ?

কিছু ঠিক করি নি এখনও।

ঠিক করতে বেশি দেরি হয় নি অবশ্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ডাক এসে পৌঁছল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। একটা কাজ পেয়ে তিনি বেঁচে গেলেন যেন। ভদ্রতার খাতিরেও কনকের সঙ্গে দেখা করবার যে ইচ্ছেটা মনে জাগছিল, তা ভেসে গেল উত্তর-বঙ্গের প্রবল বন্যায়। চার-চারটে জেলা ডুবে গেছে। ফসল গেছে, ঘর-বাড়ি গেছে, গরু-বাছুর পর্যন্ত নেই। অসংখ্য মানুষ মরেছে। যারা মরে নি, তারা গাছে গাছে ঝুলছে সাপের সঙ্গে। ঝুলেও নিস্তার পাবে না। অনাহার এবং মহামারী বসে আছে মুখব্যাদান করে। পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র গ্রামে গ্রামে নৌকোয় নৌকোয়। অন্ন বস্ত্র ওষুধ অজস্র বিতরণ করলেন দু'হাতে। তবু অসংখ্য রকম দাবি মেটানো অসম্ভব একার পক্ষে। জিনিসটা যদিও অজ্ঞাত ছিল না, স্বচক্ষে দেখে আবার নূতন ক'রে মর্মে মর্মে অনুভব করলেন যেন—সত্যিই কত অসহায় আমরা, সত্যিই কত পরাধীন! মানুষই নই, পশুর দল যেন। পশুরাও এমন ভাবে মরে না,পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। আমাদের পালাবার পথ নেই, পথ থাকলেও শক্তি নেই, সঙ্গতি নেই। দুঃখের দিনে ঝড়ে বন্যায় মহামারীতে অসহায়ভাবে মরি, সুখের দিনে ভয়ে ভয়ে প্রবল-সবলের হস্তে

আত্মসমর্পণ করে বেঁচে থাকি কোনক্রমে। যে মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে আস্থা কমে আসছিল, সেই মহাত্মা গান্ধীকে মনে পড়ল হঠাৎ--ক্ষীণ-দেহ-উলঙ্গ-প্রায় নাতি-দীর্ঘ সেই লোকটিকে, --মনে হল, জীর্ণশীর্ণ ভারতবর্ষের আত্মার মূর্ত প্রতীক যেন তিনিই। বিলাতী-শিক্ষা-পুষ্ট মুষ্টিমেয় ড্রইং-রুম-বিলাসীদের তিনি প্রতিনিধি। মনে পড়ল রেভারেণ্ড হোম্‌সের কথা--When Gandhi speaks it is India that speaks. When Gandhi acts, it is India that acts. When Gandhi is arrested it is India that is outraged and humiliated.মনে পড়ল আহ্‌মেদাবাদের আদালতে গান্ধীর উক্তি। আদালত যখন প্রশ্ন করলে, তোমার পেশা কি? অকম্পিত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন---Farmer and weaver। সব যদিও থেমে গেছে, মহাত্মাজী জেলে, তাঁর অহিংস আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠে শত্রুপক্ষের হাসির খোরাক যুগিয়েছে, তবু কিন্তু এই ভীত ত্রস্ত অপমানিত অগণিত অসহায় ভারতবাসীর দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হ'ল, সত্যাগ্রহী মহাত্মাজী দেশের সত্যকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছেন ব'লেই থেমে গেছেন। এই সব ভীরু ভীতু লোভীরা কি সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের উপযুক্ত? এদের আত্মার সুপ্ত শক্তিকে জাগাতে হবে আগে। জাগাতে হবে ভারতবর্ষেরই শাশ্বত মন্ত্রে। সে মন্ত্র হিংসার নয়---প্রেমের, ভিক্ষার নয়---ত্যাগের, পরমুখাপেক্ষীর নয়---স্বাবলম্বীর, ভীতির নয়---শক্তির। সে মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতবাসী অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, কিন্তু গুলি-গোলা কামান-বন্দুক দিয়ে নয়, আত্মার শক্তি দিয়ে। প্রয়োজন হ'লে দলে দলে প্রাণ বিসর্জন করবে, কিন্তু ভুলেও কখনও কারও প্রাণহননের চেষ্টা, এমন কি চিন্তাও করবে না--অসম্ভব বলে নয়, অমানুষিক ব'লে। যে ভারতবর্ষ যুগে যুগে পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছে, সেই ভারতবর্ষ চরম দুর্দশাতে পড়েও তার অতীত মাহাত্ম্যের গৌরব থেকে চ্যুত হবে না কিছুতেই। তখনই আবার মনে হল, পারব কি আমরা এ মন্ত্রে দীক্ষা নিতে? মুখ বুজে পুলিসের মার খেতে পারবে কি সবাই? পারবে যে, তার প্রমাণ পরে অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন ধরসনা লবন-আইন-অমান্য আন্দোলনে।

.....উত্তর-বঙ্গের নানা স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। যেখানে সম্ভব চরকাও বিতরণ করলেন। একটা অনিশ্চিত অসহায় উন্মাদনার মধ্যে দিন কাটতে লাগল। এই সময় হঠাৎ কাকামণির একটা পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। ব্রাহ্ম সোম-শুভ্রের প্রতি মনটা বরাবরই বিরূপ ছিল। ব্রহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটা অঙ্গ, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষেরই বৈদিক আর্যধর্মকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিজেদের ভারতীয়ত্বের যে পরিচয় দিয়েছিলেন---এ কথা অবিদিত ছিল না; তবুও ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে প্রসন্ন ভাব ছিল না তাঁর। বারম্বার মনে হ'ত, ওরা শ্রেষ্ঠম্মন্যতা-ভরে নিজেদের আলাদা ক'রে রেখেছেন আমাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। ব্রহ্মের উপাসনাটা ছুতো মাত্র, আসলে ওরা উপাসনা করে বিদেশী সভ্যতার। সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ প'ড়ে এ কথা আরও বেশী মনে হচ্ছিল তাঁর। সমানে সমানে ছাড়া কোন মিলনই যে শোভন হয় না, এ-কথা রবীন্দ্রনাথের মত লোকও যে বুঝতে পারেন নি, তার কারণ---মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হয়েছিল--চাকচিক্যময় বিদেশী সভ্যতার ইন্দ্রজাল। সোম-শুভ্রের প্রতি বিরূপতার প্রধান কারণটা ছিল অবশ্য পারিবারিক, এমন কি ব্যক্তিগতও। কাকামণি বাবার বিরাগ-হাজার টাকার একখানা 'চেক' এবং ছোট্ট একখানা চিঠি পেয়ে মতটা যেন বদলে গেল। মনে হ'ল, কাকামণিকে ঠিক যেন জানা যায়

নি। অকারণে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে এতদিন। আড়ম্বরহীন ছোট্ট চিঠিখানা আরও মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। অতিশয় সংক্ষেপে এবং একটু যেন সঙ্কোচভরে তিনি লিখেছেন—দেশের এই দুর্দিনে সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। তোমার আচরণ প্রশংসনীয়। ইচ্ছে থাকলেও তোমার সঙ্গে সশরীরে যোগ দেবার সামর্থ্য আমার নেই। সেজন্য লজ্জিত আছি। সামান্য কিছু পাঠালাম, যদি কাজে লাগাতে পার, অতিশয় সুখী হব। আরও সুখী হব, আমার নামটা কোথাও যদি প্রকাশ না কর। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জেনো। ইতি--আশীর্বাদক তোমার কাকামণি।...এই টাকা দিয়েই মৃগাঙ্ক-শুভ্র তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়ের গোড়াপত্তন করেছিল। তারপর অবশ্য আরও অনেক টাকা দিয়ে বাড়িয়েছেন সেটাকে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সোম-শুভ্রের পাঁচ হাজার টাকা না পেলে হয়তো শুরুই করতে পারতেন না কাজটা। হাতে তখন কিছু ছিল না। বন্যাপীড়িতদের অন্ন বস্ত্র ওষুধ যোগাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর বার্ষিক বরাদ্দ থেকে এক কপর্দকও উদ্বৃত্ত ছিল না হাতে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে ডাক্তারি এবং অন্ন বস্ত্র চরকা বিতরণ করবার ফাঁকে ফাঁকে যে একবারও কনককে মনে পড়ত না, তা নয়। একাধিকবার পড়ত। কিন্তু কনকের দিক থেকে কোন সাড়া না পেলে তিনি যাবেন কোন্ অজুহাতে? তাঁকে অবহেলা করে যে চলে গেছে, বিনা আহ্বানে কিছুতেই তার কাছে ফিরে যাওয়া যায় না--তা হোক সে কনক। হংস-শুভ্রের পুত্র তিনি, আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করে কিছু করা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। পুত্রকন্যাদের সঙ্গে সম্বন্ধে অবশ্য বজায় ছিল, কিন্তু কনকের অভাবে তাও কেমন প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল যেন। এমন কি, কনক চলে যাওয়ার সময় তার কলিকাতা-বাসিনী এক বোনকে ছেলেমেয়েদের লোকাল গার্জেন নিযুক্ত করে গিয়েছিল, মৃগাঙ্ক-শুভ্র সে ব্যবস্থাও বদলাবার চেষ্টা করেননি। অর্থাৎ কনক-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করবার প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর। কনক একটা চিঠি লিখেও যে তাঁর খোঁজ নেয় নি, এ খবর তিনি কারও কাছে প্রকাশ করতেন না। কনকের বিরুদ্ধেও কোন কথা বলতেন না কখনও। তাই অনেকেরই ধারণা ছিল যে, কনক বোধ হয় তাঁর সম্মতি-ক্রমেই চাকরি করছে। কনক কিন্তু একটি চিঠিও লেখে নি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার প্রয়াসে ডিগ্রী-অর্জনের দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হয়েও সে যখন একদিনের জন্যেও কারও প্রশংসা পেলে না—নিন্দা ব্যঙ্গ শ্লেষই যখন তার প্রাপ্য হল, তখন মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখ চেয়েই সে সব সহ্য করেছিল--যে স্বাভাবিক প্রেরণা-বশে স্ত্রী-মাত্রেই স্বামীর ওপর নির্ভর করে, সেই প্রেরণা বশেই সে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ঔদাসীন্যকে অগ্রাহ্য করে তার আনুকুল্যেই প্রত্যাশা করেছিল। সেই মৃগাঙ্ক-শুভ্রও যখন একটা তুচ্ছ হুজুকে মেতে তাকে ফেলে চলে গেলেন, শুধু চলে গেলেন নয়, জেল থেকে চিঠি লিখলেন যে, ভয় নেই, অন্নবস্ত্রের জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে, তখন চাকরি নেওয়া ছাড়া আর গতি রইল না তার। ঝোঁকের মাথাতেই সে চাকরি নিয়েছিল। আশা করেছি, মৃগাঙ্ক-শুভ্র তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন যথাসময়ে। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়েও যখন মৃগাঙ্ক তার প্রতি তেমন কোন মনোযোগ দেখালেন না, তখন তার মনে হল, নীরবে দূরে সরে থাকাই ভাল। বিগত দিনের মহিমময় স্মৃতিগুলো এখনও বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে যায় নি। প্রথম যৌবনের দিনে সম্রাজ্ঞীর মত কৃপা বিতরণ করেছিল যাঁকে, তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে উপযাচিকার মত? কখনও না। এখনও তার আশা আছে, মৃগাঙ্ক-শুভ্র একদিন কিন্তু আসবেনই।

উত্তর-বঙ্গের বন্যার প্রাবল্য যখন কমে এল ক্রমশ, অসংখ্য লোকের অজস্র দুঃখ-দুর্দশার একঘেয়ে কাহিনী শুনতে শুনতে মনও ক্রমশ অসাড় হয়ে এল যখন, তখন মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ক্লান্ত চিত্ত হয়তো কনকের সঞ্জীবনী স্পর্শ লাভ করবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠত, কিন্তু নতূন একটা উন্মাদনার ঘূর্ণি উঠল তখন বাংলা দেশে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করে স্বরাজ-পার্টি গড়বার জন্যে ডাক দিলেন দেশের লোককে। মনে হয়, গয়ার পরাজয় বাঙালীর আত্মসম্মানকেই যেন আঘাত করেছে। মেতে উঠল সবাই এর প্রতিবিধানকল্পে। অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনের শবদেহেব ওপর ব'সে শুরু হয়ে গেল নতূন রকম তান্ত্রিক সাধনা। সিদ্ধিও যে না মিলল, তা নয়। দিল্লী কংগ্রেস থেকে জয়ধ্বনি করতে করতে বাঙালী ভলান্টিয়ারের দল দেশে ফিরে এল। মৃগাঙ্ক-শুভ্র এতে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু প্রাণে ঠিক সুরটি যেন বাজল না। মহাত্মা গান্ধীর পথ দুর্গম দুঃসাধ্য হ'লেও তাঁর আদর্শের নিষ্কলুষ নির্ভীকতায়, তাঁর কর্মপদ্ধতির বৃহৎ বীরত্বে চিত্ত যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, কাউন্সিলে ঢোকবার জন্যে যেন-তেন-প্রকারেণ ভোট-সংগ্রহ ব্যাপারে ঠিক সে ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'ল না। যদিও স্বরাজ-পার্টির আন্দোলন তির্যকপথগামী অসহযোগ-আন্দোলনই—এই হয়তো পলিটিক্সের সুসাধ্য রণকৌশল—কিন্তু মৃগাঙ্ক-শুভ্রের অন্তর স্বরাজ-পার্টির আহ্বানে ঠিক তেমন আবেগভরে সাড়া দিলে না, যেমন দিয়েছিল মহাত্মাজীর ডাকে। হয়তো একেবারেই দিত না। কিন্তু স্বীরাজ্য পার্টির আহ্বান যে চিত্তরঞ্জনের আহ্বান—যিনি দেশের ডাকে এক মুহূর্তে ভোগের উচ্চ শিখর থেকে পথের ধূলায় এসে দাঁড়িয়েছেন—তার আহ্বান অমান্য করা যে অসম্ভব। যন্ত্রচালিতবৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন শহরে শহরে স্বরাজ্য-পার্টির ধ্বজা বহন করে। মনে কিন্তু শান্তি ছিল না । মনে হচ্ছিল, এইবার বুঝি সব ভেঙে পড়বে। মূলতান অমৃতসরে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গেল। স্থাপিত হ'ল 'তানজিম', 'তাবলিগ', 'হিন্দু মহাসভা'। 'সংগঠন'-আন্দোলন শুরু করলেন হিন্দুরা, 'শুদ্ধি'র সুর তুললেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কেনিয়াতে ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার চলতেই লাগল। গৌরের ' রেসিপ্রোসিটি বিল', শাস্ত্রীর বিলেত যাওয়া, Wood-Winterton Agreement—ব্যর্থ হয়ে গেল সব। এসব সত্ত্বেও উন্মাদনা ছিল কিছু অবশ্য। গভর্মেন্টেব নিজের অস্ত্রেই বারম্বার তাকে পরাভূত করে খবরের কাগজে তুফান তোলার মধ্যে হুজুকপ্রিয় উত্তেজনাপ্রবণ বাঙালীর মনের খোরাক কিছু ছিল বইকি। তা ছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনের কত বিরাট প্রতিষ্ঠানের চেহারা দিন দিন বদলে যাচ্ছিল স্বরাজিস্ট্দের হাতে পড়ে। সীমাবদ্ধ কর্তৃত্বের মদিরাতেও ধমনীতে রক্তস্রোত একটু দ্রুতবেগেই বইছিল তখন। এমন সময় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, নাগপুরে জাতীয় পতাকা নিয়ে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন শুরু হয়েছে আবার। জাতীয় পতাকা নিয়ে পুলিস রাজপথ দিয়ে চলতে বাধা দেওয়াতে দলে দলে লোক জাতীয় পতাকা নিয়ে রাস্তায় বেরুচ্ছে আর জেলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল এ আন্দোলন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রও একদিন জাতীয় পতাকা ঘাড়ে ক'রে বেরিয়ে জেলে চ'লে গেলেন।

অল্প দিন পরেই ছাড়া পেয়ে ভাবলেন, অবলুপ্ত প্রায় সত্যাগ্রহ-আন্দোলনকেই আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। জাতীয়-পতাকা-আন্দোলন দেখে তাঁর আশা হয়েছিল, অহিংস আন্দোলনের মর্ম দেশের যুবকেরা উপলব্ধি করেছে এবার বোধ হয়। আশা কিন্তু বেশিক্ষণ টিকল না। গোপীনাথ সাহার গুলিতে শুধু মিঃ ডে-ই মারা গেলেন না, মৃগাঙ্ক-শুভ্রের আশা-

ভরসাও নিঃশেষ হয়ে গেল যেন। পুলিস এসে তাঁর বাড়ি, শশাঙ্ক-শুভ্রের বাড়ি, দমদমের বাড়ি খানাতল্লাশি করে গেল। যদিও বিশেষ কিছু পেলে না, তবু এটা অস্পষ্ট রইল না যে, রজতকে তারা সন্দেহ করছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে বেশিদিন অবশ্য নিস্ক্রিয় থাকতে হল না। দেশবন্ধু শুরু করলেন, তারকেশ্বর সত্যগ্রহ। তার আবর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আবার জেলে গিয়ে উঠলেন তিনি। বস্তুত জেলই তখন কাম্য মনে হচ্ছিল তাঁর। জেলের বাইরে যা কিছু হচ্ছিল, তা যেন প্রাণহীন প্রহসন। মহাত্মাজী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নির্জনবাস করছিলেন সমুদ্রতীরে। তুরস্কদেশীয় যে খিলাফতের আঠায় মেড়ে হিন্দু-মুসলমানকে মেলাতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি, তুরস্কদেশীয় কামাল পাশা সে আঠাটুকু নিঃশেষে তুলে নেওয়াতে হিন্দু-মুসলমানের একতা-ইমাল্‌শন বেশিদিন টিকল না—তেল ও জল আত্মপ্রকাশ করল। নিদারুণ রকম স্পষ্টভাবে। দেশ জুড়ে বাধল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। ভারতের স্বাধীনতার পথ অবরুদ্ধ করে অভ্রভেদী হয়ে উঠল সারি সারি মন্দির আর মসজিদ! মুসলমানদের দিকে অযথা পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে দেশবন্ধু করলেন প্যাক্ট, মহাত্মাজী উপবাস। ফল কিছুই হল না।

হ্যাঁ, জেলে গিয়ে যেন বেঁচে গেলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। জেলেই খবর পেলেন, দেশবন্ধু মারা গেছেন।

কিছুদিন পরে জেল থেকে যখন বেরুলেন, তখন তাঁর সমস্ত প্রাণ অসাড় হয়ে গেছে। এত অসাড় হয়ে গেছে যে, দেশব্যাপী সাইমন কমিশন বয়কটে যোগ দিতে আর উৎসাহ পেলেন না। কালো পতাকা ঘাড়ে করে করে সভা-সমিতির ভড়ং করতে ভাল লাগল না আর। দেশের যে পরিচয় ক্রমশ পাচ্ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল, আঁচলের গেরোর ওপর গেরো বেঁধে লাভ কি, সোনাই যদি বাইরে পড়ে থাকে? দেশের লোক যদি মানুষ না হয়, তা হলে কার জন্যে স্বাধীনতা অর্জন করা? বাজে হৈ-চৈ না করে গ্রামে গিয়ে দেশের লোককে শিক্ষিত সুস্থ সবল স্বাবলম্বী করাই সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে মনে হল। হৈ-চৈ করবার মত উত্তেজনাও ছিল না কিছু। দেশবন্ধু মারা গেছেন, মহাত্মাজী তন্ময় হয়ে আছেন All India Spinner's Association নিয়ে। ফিরে গেলেন তিনি তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়ে। দেশকে গড়ে তোলাই হল উদ্দেশ্য। বিনা পয়সায় ওষুধ এবং চরকা বিলিয়ে, তাঁত বসিয়ে, নাইট স্কুল করে দিন কাটতে লাগল গ্রামে গ্রামে একা। পরিচিত কারও সঙ্গে, এমন কি খবরের কাগজের সঙ্গেও, সম্পর্ক রইল না কিছুদিন। এর যা অবশ্যম্ভাবী ফল, তা ফলল। বিদ্যাসাগর-প্রমুখ পরোপকারী মহাজনদের অদৃষ্টে যা ঘটেছিল, তাঁর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। কৃতজ্ঞতার বদলে কৃতঘ্নতা, উপকারের বদলে উপহাস,—এসব তো পেলেনই, স্থানীয় জমিদার এবং ডাক্তারের সঙ্গে শত্রুতাও হল। ছোটলোকদের স্পর্ধা বাড়িয়ে দিচ্ছেন বলে চটলেন জমিদার এবং বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে রুগী ভাঙিয়ে নিচ্ছেন বলে চটলেন ডাক্তার। পুলিসের নেকনজর তো ছিলই। জমিদার, ডাক্তার, পুলিস—এঁরাই মফস্বলের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এঁরা সমবেতভাবে রুষ্ট হলে গ্রামে টেকা যায় না। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ঘর পুড়ে গেল একদিন, এবং যাদের তিনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছিলেন, তারাই আগুন নেবাবার ছুতোয় এসে যথাসর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেল তাঁর। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, দেশসেবার পুরস্কারই এই, দমে গেলে চলবে না, ভালবাসা দিয়ে এদের জয় করতে হবে, আমার মধ্যেই নিশ্চয় গলদ আছে কোথাও মনে মনে এই সব

আবৃত্তি করতে করতে মৃগাঙ্ক-শুভ্র দ্বিতীয় বার প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন তারাপদ এসে হাজির।

কোথায় আছিস তুই? ছি ছি! এ যে যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখছি!

তুমি হঠাৎ যে?

হঠাৎ হবে কেন? নবনীর ভয়ানক অসুখ। চল্।

নবনীর?

হ্যাঁ গো।

কি অসুখ?

পেটে ভয়ানক ব্যথা, ফিট হচ্ছে ক্রমাগত।

তাই নাকি?

শিয়ালদহ স্টেশনে নেবে তারপদ ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে অন্তর্ধান করলে, মৃগাঙ্ক-শুভ্র খুঁজে পেলেন না তাকে। নবনীর বোর্ডিঙে গিয়ে শুনলেন, সে কলেজে। কলেজে গিয়ে দেখা করলেন। নবনী বিস্মিত হয়ে গেল। কই, তার কিছু হয়নি তো? তারপর একটু মৃদু হেসে বললে, কিছু হলেও তোমাকে বিরক্ত করতে যাব কেন শুধু শুধু? ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজল, ক্লাসে চলে গেল সে। কোঁচানো শান্তিপুরী কাপড় পরা, আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে,পায়ে চকচকে পামসু, কোঁকড়ানো চুল, ধপধপে রঙ—এই সুন্দর সুশ্রী যুবক যে তাঁরই ছেলে, এ কথা নিজেরই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। নবনী-শুভ্রের কাছে মোটা বকশিশ পেয়ে কলেজের যে চাকরটা তাকে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে সেলাম করত রোজ, সেই চাকরটাই একটু রূঢ়কণ্ঠে এসে বললে, তুমি আবার কি চাও এখানে হে? হাঁটুর-ওপরে-ওঠানো খদ্দরে কাপড় পরনে, আড়ময়লা খদ্দরের ফতুয়া-পরা ব্যক্তিটি যে নবনীবাবুর বাবা হতে পারেন, তা কল্পনা করা অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে চেহারাটাও তাঁর শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল।

কিছু না, আমি যাচ্ছি।

একটু অপ্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে এলেন তিনি।

বেরিয়ে বাড়ির দিকে গেলেন এবং সেখানে পৌঁছে বুঝলেন, তারাপদর আসল উদ্দেশ্য কি। বাইরের ঘরে ভ্রূকুঞ্চিত করে হংস-শুভ্র বসে ছিলেন। প্রণাম করে মুখ তুলতেই প্রশ্ন করলেন, কোথা ছিলে তুমি এতক্ষণ?

নবনীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

আমি তোমার অপেক্ষায় বসে আছি সকাল থেকে।

আপনার কথা তো তারাপদ বলেনি! সে বললে, নবনীর অসুখ।

তারাপদ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সেকথা না বললে তুমি আসতে নাকি?

হংস-শুভ্র ধমক দিয়ে বললেন, মিথ্যে কথা বলতে তো বলিনি তোমাকে।

তারাপদ কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ক্ষণকাল অস্বস্তিকর নীরবতার পর মৃগাঙ্ক-শুভ্র বললেন, আমি খবর পেলে দমদমেই যেতাম। আপনি কষ্ট করে এখানে এলেন কেন?

কষ্ট করে আমাকে প্রায়ই আসতে হয়। না এলে তোমার বাড়ি ভূতের বাড়ি হয়ে উঠত এতদিন।

কথাটা মিথ্যে নয়। হংস-শুভ্র কিছুদিন থেকে প্রায়ই মাঝে মাঝে এই খালি বাড়িটাতে এসে চুপ করে বসে থাকেন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আমার কষ্টের কথা ভাবতে হবে না তোমাকে। যে জন্যে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি শোন। এ বাড়িটা তোমার নামে লিখে দিয়েছিলাম, তুমি সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করবে বলে। কিন্তু যা দেখছি, জেলে জেলে আর গ্রামে গ্রামেই কাটছে তোমার। তোমার বউ চাকরি করছে বিদেশে। তোমার ছেলেমেয়েরা বোর্ডিঙে। নবীনকে বলেছিলাম, বোর্ডিং ছেড়ে এখানে এসে থাকতে। কিন্তু সে তাতে রাজী নয়।

কেন?

কেন যে, তাও খুলে বলে না। বাড়ির কারও সঙ্গে সে বিশেষ মেশেও না। ছুটি হলেই মায়ের কাছে চলে যায়।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র চুপ করে রইলেন। একটু আগে নবনীর মুখে যে কথাগুলো শুনেছিলেন তা মনে পড়ল। কেমন যেন একটা অস্পষ্ট বেদনা সঞ্চরণ করতে লাগল মনের ভেতর। হংস-শুভ্র অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করে দিলেন আরও।

পরের ছেলেমেয়েদের আপন করবার জন্যে তুমি প্রাণপাত করে বেড়াচ্ছ শুনলাম; অথচ তোমার নিজের ছেলেমেয়েরা পর হয়ে যাচ্ছে। তোমার কর্তব্য অবশ্য তুমিই ভাল বোঝ। আমি কিন্তু এ বাড়িটা নিয়ে কি করি এখন? বুড়ো বয়সে একটা শূন্যবাড়ি পাহারা দিতে হবে নাকি বসে বসে।

হংস-শুভ্র কণ্ঠস্বরে যদিও একটা ব্যঙ্গের সুর ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর শেষের কথাগুলো আর্ত মিনতির মত শোনাল। সেটা তাঁর নিজের কানেই বাজল এবং বাজবামাত্রই তিনি চটে গেলেন।

বলে উঠলেন, তা বলে তোমার ভাববার কোন দরকার নেই যে, তোমার সাহায্য ভিক্ষা করবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। আমার কর্তব্য আমি নিজেই যথাসাধ্য করে যাব। তোমার দিকটা সম্বন্ধে তোমাকে সচেতন করে দেওয়া উচিত বলেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে। চিঠিতে সব কথা বলা যায় না। আচ্ছা, আমি চললাম এখন—জিনিসটা ভেবে দেখো।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই তিনি উঠে গেলেন। সম্ভাব্য উত্তরটাকে এড়িয়ে পালিয়ে গেলেন যেন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। 'কিছু হলেও তোমাকে খবর দিতে যাব কেন শুধু শুধু?'—নবনীর কথাগুলো আবার কানের কাছে বেজে উঠল। আত্মসম্মানে আঘাত লাগল যেন। পরক্ষণেই ভাবলেন, এরা ভিন্ন জাতের লোক। এদের সঙ্গে মিলবে কেন? জোর করে মেলাবার চেষ্টা করা বৃথা। পরের ট্রেনেই স্বস্থানে ফিরে যাবার ইচ্ছে হল। হঠাৎ পাঁচফোড়নের মৃদু গন্ধ ভেসে এল একটা। বাড়ির ভেতরে কেউ রাঁধছে নাকি! ভেতরে ঢুকে দেখলেন, চারদিক তকতক ঝকঝক করছে। পুরনো ঠাকুর এবং চাকর কাজে লেগে গেছে। শোবার ঘরের পালঙ্কে ধপধপে বিছানা পাতা। বাথরুমে পরিষ্কার খদ্দরের ধুতি, তোয়ালে, সাবান, এমন কি জবাকুসুম পর্যন্ত। শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চায় টলটল করছে জল। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের

কৃচ্ছ্রসাধন-ক্লান্ত মন প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। ঠিক করে ফেললেন, কিছুদিন অন্তত থেকে যাই—শরীরটাকেও বিশ্রাম দেওয়া হবে, বাবার অনুরোধটাও পালন করা হবে। বাবার অনুরোধটা যে ঠিক কি, তা স্পষ্ট ভাবে না শুনলেও বুঝতে কষ্ট হয়নি। এখানে কিছুদিন থাকলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

এই কিছুদিনের মধ্যেই শশাঙ্ক-শুভ্র এলেন একদিন বাসন্তীকে নিয়ে। বাসন্তী পীড়াপীড়ি করতে লাগল তার কাছে গিয়ে থাকবার জন্যে। অল্প দিন পরেই শঙ্খর বিয়ে, বিয়েতে মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে কি কি করতে হবে, তারই উচ্ছ্বসিত আলোচনা করতে লাগল সে। সোৎসাহে দীর্ঘ ফর্দই বানিয়ে ফেললে একটা। তারপর বললে, আমি এখন উঠি, মিসেস হালদারের ওখানে যেতে হবে একবার। তোমাকে কিন্তু আমি পাকড়ে নিয়ে যাব এসে, কোন আপত্তি শুনব না। হেসে বেরিয়ে চলে গেল। শশাঙ্ক বাসন্তীর সামনে পারতপক্ষে মুখ খোলেন না। বাসন্তী চলে গেলে, দু-চার কথার পর শুরু করলেন নিজের প্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা। ঈষৎ অনুযোগভরে বললেন, কেন যে এমন ভাবে সময় নষ্ট করে বেড়াচ্ছ তুমি, তা তো বুঝি না। স্বদেশী করতে মানা করছি না। কিন্তু সেটা ইকনমিক বেসিসে না করলে শেষ পর্যন্ত কিছুই দাঁড়াবে না যে। তোমার ডাক্তারী বিদ্যেটাকে কাজে লাগাও না। কন্টিকারি, আমরুল, শিলাজতু—কত সব দিশী ওষুধ রয়েছে, সেগুলো যদি সত্যিই উপকারী বলে মনে কর, পেটেন্ট করে চালান দাও বিদেশের বাজারে। বিদেশের টাকা ঘরে না আনতে পাবলে কোন দিনই উন্নতি হবে না আমাদের। এঁরা অবশ্য নানা রকম ডিউটি বসিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করবেন আমাদের, সন্দেহ নেই—কিন্তু উই মাস্ট ফাইট দ্যাট—ওই সব নিয়েই ফাইট করতে হবে। মালব্যজীর ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টিই ঠিক পথ ধরেছে আমার মনে হয়। যাতে দেশের লোকের দু পয়সা লাভ হয়, তাই করতে হবে। শুধু চরকা চালিয়ে লাভ কি—ইকনমিক্যালি ওটা কি খুব একটা সাউণ্ড ব্যাপার? তোমাদের মহাত্মাজীর মাথায় কি যে আছে, তা জানি না। এবারকার ক্যালকাটা কংগ্রেসে কি ফার্সটা হল দেখলে তো? মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ গর্ভমেন্টকে যে 'আলটিমেটাম' দিলেন, এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস না দিলে আবার নন-কো-অপারেশন করবেন তিনি—তাঁর কি ধারণা, ব্রিটিশ গভর্মেন্ট ভয়ে ভয়ে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিয়ে ফেলবে? আর দিয়ে যদি না ফেলে, তা হলে তিনি ওই ভাড়া-করা কতকগুলো চ্যাংড়াকে দিয়ে দেশোদ্ধার করে ফেলবেন? আই থিঙ্ক, দিস ইজ—

বাক্যটা সম্পূর্ণ না করে তিনি পাইপটা ধরালেন। মৃগাঙ্ক-শুভ্র একটি কথাও বললেন না। পাইপ ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে শশাঙ্ক বললেন, ওদিকে জওহরলাল আর সুভাষ বোস ছোঁড়াগুলোকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমাদের হীরু লেবারের দুঃখে কাতর। একটা মাড়োয়ারীদের মিলে কি সব করেছে যেন শুনেছি। রজত আউট অব কন্ট্রোল। মুসলমান গুণ্ডাদের সঙ্গে মেশে, কে যেন বলছিল। মুসলমান গুণ্ডাদের সঙ্গে মেশ্বাবার মানে? ওদের জিন্না তো..... আঃ, সিকেনিং!

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করে রইলেন।

তুমি পেটেন্ট মেডিসিনের কথাটা ভেবে দেখো। সিরিয়াস্‌লি যদি করতে চাও, আমি ফিনান্স করতে রাজী আছি। আমাদের ওখানে আসছ কি?

না, এইখানে তো বেশ আছি।

সে তুমি আর বাসন্তী বোঝ, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।

পাইপটা কামড়ে 'শ্রাগ' করলেন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র জিজ্ঞেস করলেন, হীরু কোথা?

সে সারা ভারতময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গিয়েছিল বারদৌলি, সেখান থেকে ফিরে জামসেদপুরে কাটাল কিছুদিন, এখন নরিম্যানের বক্তৃতা শুনতে বম্বে গেছে। বম্বেতে টেকস্‌টাইল মিলগুলোতে স্ট্রাইক চলছে, তাতে মাতল কি না কে জানে। কাল আসবে শুনছি।

তারপর একটু থেমে বললেন, তোমাকে ভক্তি করে। ফিরলে ওকে একটু বুঝিয়ে বলো দেখি, এ রকম হৈ-চৈ করে লাভটা কি? তোমার কথা শুনলে হয়তো মত বদলাতে পারে।

আচ্ছা, আসুক।

আমি এখন উঠি। বাসন্তীকে তুলে নিতে হবে আবার।

শশাঙ্ক-শুভ্র চলে গেলেন।

হীরক আর ফেরেনি। মীরাট কন্‌স্‌পিরেসি কেসে ধরা পড়েছিল সে। শঙ্খ আর আসত না তাঁর কাছে। মৃগাঙ্কর মনে হল, আসন্ন বিবাহের রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে হয়তো, নীরস চরকা কাটবার প্রবৃত্তি এখন নেই বোধ হয়। একা একাই দিন কাটতে লাগল তাঁর। পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে যতটা আরাম প্রত্যাশা করেছিলেন, ঠিক ততটা পেলেন না,—পারিবারিক আবেষ্টনীই ছিল না যে! কনককে ফেরবার জন্যে তিনি কিছু লিখলেন না, কনকও ফিরল না; শুক্তি মুক্তা নবনী এসে দেখা করে যেত বটে, তারাও বাড়িতে থাকতে চাইল না, নানা অজুহাত দেখিয়ে বোর্ডিঙেই থেকে গেল। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মৃগাঙ্ক-শুভ্র বুঝতে পারলেন যে, ভেতরে ভেতরে ওরা মায়ের দিকে। সব বুঝেও কিছুই বললেন না তিনি। সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে বহুকাল পূর্বে তিনি অপ্রস্তুত বোধ করেছিলেন। এখন আর সে ভাব নেই। মনের ওপর কড়া পড়ে গেছে। জবাবদিহি করে অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা ভিক্ষা করার প্রবৃত্তি আর ছিল না। একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য সমস্ত সত্তাকে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাড়িতেই থাকতেন সমস্ত দিন। নিয়মিতভাবে চরকা কাটতেন আর বই পড়তেন। নানা রকম বই—নভেল, নাটক, সাংখ্য, গীতা—তামিল ভাষাটাও শেখবার চেষ্টা করছিলেন, ইচ্ছে ছিল দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলো আয়ত্ত করে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরুবেন। নাড়ী টিপে ডাক্তারি করবার ইচ্ছে আর ছিল না। গ্রামসংস্কারের বাসনাও মন থেকে অবলুপ্ত হয়ে আসছিল ক্রমশ। শশাঙ্ক-শুভ্রের কথায় ডাক্তারী রিসার্চ করবার ইচ্ছেটা হচ্ছিল বটে মাঝে মাঝে—ভাবছিলেন, তা করতে হলে জার্মান ভাষাটাও শেখা দরকার কিন্তু প্রবলভাবে কোন কিছুতেই মন সায় দিচ্ছিল না। খবরের কাগজের মারফত রাজনৈতিক যে সব সংবাদ পাচ্ছিলেন, তা মোটেই আশ্বাসজনক নয়। লাহোরে পুলিস-ইন্‌স্পেকটর মিস্টার সণ্ডার্সকে খুন করে গেল কে যেন। যদিও এই সণ্ডার্সই লাহোরে আন্টি-সাইমন-কমিশন শোভাযাত্রা ভাঙতে গিয়ে লালা লাজপত রায়ের মাথায় লাঠি চালিয়েছিলেন, যার ফলে অবশেষে তাঁর মৃত্যু হ'ল—তবু সণ্ডার্সের মৃত্যুতে ব্যথিত হলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। তারপরই বম পড়ল অ্যাসেম্ব্লিতে। সরদার ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ধরা পড়ল। মহাত্মাজীর আদর্শকে এমন ভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। বাংলা দেশে সুভাষ বোসের গান্ধী-বিরোধী বামপন্থী সুরও ভাল লাগছিল না তাঁর। খবরের কাগজ পড়াই বন্ধ করে দিলেন। তেতলার ঘরটাতে একা চুপ করে বসে থাকতেন।

হঠাৎ দুপুরে একদিন ইন্দু সেখানে এসে হাজির। এক পিঠ কালো কোঁকড়ানো চুল, চোখ জ্বলছে, মুখে তীক্ষ্ণ হাসি—মূর্তিমতী কালবৈশাখী যেন। চরকাটার দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে সে বললে, আমি দাঁড়াতে পারব না, তোমাকে একটা খবর দিতে এলুম। তুমিও শুনেছ বোধ হয়—

কি খবর?

লাহোর জেলে যতীন দাস মারা গেছে।

খবরটা বলেই ইন্দু বেরিয়ে চলে গেল।

মারা গেছে! যুবক যতীন দাসের মুখটা মনের ওপর ভেসে উঠল।

আলাপ ছিল তার সঙ্গে। হঠাৎ কশাহত হয়ে যেন উঠে দাঁড়ালেন। সামনে একটা সুট্‌কেস ছিল, সেইটি হাতে করে ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে লাহোরের একটা টিকিট কেটে চড়ে বসলেন ট্রেনে। লাহোরে গিয়ে কি হবে, তা ভেবে দেখবার মত যুক্তি তখন মাথায় ছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল, অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার, যা হোক একটা কিছু—অন্ততপক্ষে লাহোরের দিকে ছুটে যাওয়া।....

লাহোর পর্যন্ত অবশ্য পৌঁছতে হয়নি তাঁকে। পথে এক গুজরাটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দুজনে একসঙ্গে জেলে ছিলেন বহুকাল। তিনি মৃগাঙ্ক-শুভ্রের অসহায় ভাব, অসংলগ্ন ভাষা, উত্তেজিত চোখের দৃষ্টি দেখে জোর করে তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন বম্বেতে নিজের বাসায়। সেখানে কাটল কিছুদিন। শান্তিতেই কাটল। এমন কি সেখানে একটা ডিস্‌পেন্সারিতে গিয়েও বসতেন মাঝে মাঝে।

তারপর আবার মহাত্মাজী হঠাৎ দেখা দিলেন রাজনৈতিক আকাশে।

৩১ এ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ২৬ এ জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস পালিত হল সারা দেশ জুড়ে.... কংগ্রেসের অসহযোগ-আন্দোলনের বার্তা আবার প্রচারিত হল, দেশের আকাশে বাতাসে। ঠিক হল, লবণ-আইন অমান্য করবেন মহাত্মাজী। এ শুনে হাসল অনেকে। 'স্টেট্‌সম্যান' ঠাট্টা করে লিখলে, "মহাত্মা মে গো অন বয়েলিং সি-ওয়াটার টিল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ওয়াজ অ্যাটেণ্ড !" মৃগাঙ্ক-শুভ্রেরও কেমন যেন একটু সন্দেহ জন্মাল। এ কি করে হবে? যথাসময়ে কিন্তু শুরু হয়ে গেল মহাত্মাজীর ডাণ্ডি-অভিযান আটাত্তর জন সঙ্গী নিয়ে। যাত্রা করলেন তিনি পদব্রজে, গ্রামে গ্রামে তাঁর অসহযোগবার্তা প্রচার করতে করতে। অপ্রত্যাশিত রকম ফল ফলল। তাঁর পদস্পর্শে দেশের মাটি পর্যন্ত সজীব হয়ে উঠল যেন। প্রতি পদক্ষেপে পেলেন তিনি জাগ্রত জনতার বিপুল অভিনন্দন। দেশময় জাগল সাড়া। সর্বত্র ধুম পড়ে গেল লবণ-আইন অমান্য করবার। কলকাতায় নুন তৈরি করবার সুযোগ ছিল না। সেখানে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন আইন অমান্য করলেন প্রকাশ্য সভায় রাজবিদ্রোহমূলক রচনা পাঠ করে। শুরু হয়ে গেল ফের বিদেশী-বর্জন, শুরু হয়ে গেল মদের দোকানে চৌকিদারি। ভদ্র-ঘরের পরদানশীন মেয়েরা পর্যন্ত দলে দলে এসে যোগ দিলেন দেশের কাজে। জারি হতে লাগল জরুরি আইনের পর জরুরি আইন। বর্ষণ হতে লাগল লাঠি আর গুলি সত্যগ্রহীরা জনতার ওপর। ফাটল অনেক মাথা, প্রাণও হারাল অনেকে—সত্যাগ্রহীরা থামল না কিন্তু। গুলির মুখেও নির্ভয়ে এগিয়ে গেল তারা। পেশোয়ারে এক দিনেই মরলো শত শত সত্যাগ্রহী, তবু তাদের আগ্রহ কমে না। এক দল সরে গেলেই আর এক দল এসে দাঁড়ায়, তারা মরে গেলে আর এক দল। প্রতিবাদ করে না, হাত তোলে না,

নীরবে এগিয়ে আসে খালি। গাড়োয়ালী সেনারা গুলি চালাতে অস্বীকার করলে শেষ পর্যন্ত। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সমস্ত চিত্ত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। এই তো চাই, এরই স্বপ্ন তো দেখছিলেন এতদিন। ধরস্নায় চলে গেলেন তিনি কংগ্রেস-ক্যাম্পের ডাক্তার হয়ে। সেখানে অভিযান শুরু হবার পূর্বে সরোজনী নাইডু তাঁদের যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা অনেকদিন পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে—মহাত্মাজীর দেহ যদিও আজ জেলে, কিন্তু তাঁর প্রাণ রয়েছে তোমাদের সঙ্গে। ভারতের মর্যাদা আজ তোমাদের হাতে। কোন হিংসা, কোন উগ্রতা যেন প্রকাশ না পায় তোমাদের ব্যবহারে। ধীর অনিবার্য গতিতে এগিয়ে যাও তোমরা, মার খাবে, কিন্তু প্রতিরোধ করবে না, লাঠির ঘা আটকাবার জন্যেও হাত তুলবে না কেউ, শান্ত দৃঢ় পদে এগিয়ে যাবে শুধু পুলিসের লাঠিকে তুচ্ছ করে!

সরোজনী নাইডুর কথা রেখেছিল সবাই। লোহা বাঁধানো লাঠি অবিরাম পড়তে লাগল সত্যগ্রহীদের নগ্ন শিরের ওপর, অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল দলে দলে, কিন্তু টুঁ শব্দটি করলে না কেউ। সকলের সাদা খদ্দর রক্তে রাঙা হয়ে গেল, স্ট্রেচার-বেয়ারারা নিঃশব্দে এসে তুলে নিয়ে গেল তাদের। আবার এগিয়ে এল আর এক দল। মার খেয়ে তারাও শুয়ে পড়ল, এল আর এক দল...তার পর আর এক দল....পুলিসের লাঠি সমানে চলতে লাগল.....অজ্ঞান মৃগাঙ্ক-শুভ্র যখন চোখ খুললেন, তখন তিনি জেল-হাসপাতালে। বিচারে দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়ে গেল।

হাওড়া স্টেশনে থার্ড ক্লাস গাড়ির কামরা থেকে নামল যখন মৃগাঙ্ক-শুভ্র, তখন ভিড়ের মধ্যে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি। চারদিকে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি। চটের-মত কাপড় পরা মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে সমীহ করবার প্রয়োজনই মনে করলে না কেউ। বরং কেউ কেউ তাঁর খদ্দরের দিকে অবজ্ঞাভরেই চাইলে দু-একবার। মহাত্মাগান্ধীর ওপর বাংলা দেশ তখন অপ্রসন্ন। বিহারে কংগ্রেস-মিনিষ্ট্রির বাঙালী-নির্যাতন চলছে তখনও পুরোদমে—নামাবলীর মত খদ্দর এবং গান্ধীটুপি বাঙালীর চক্ষে ভণ্ডামীর আবরণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন। তা ছাড়া এক মুখ কাঁচা পাকা গোঁফ-দাঁড়ি, রোগজীর্ণ শরীর—মৃগাঙ্ক-শুভ্রের চেহারার মধ্যেও সম্ভ্রম উদ্রেক করবার মত কিছু ছিল না। অনেক কষ্টে কুলীর মাথায় নিজের বিছানা-বাক্স চাপিয়ে মৃগাঙ্ক-শুভ্র এদিক ওদিক চেয়ে ভাবলেন, দাদা টেলিগ্রামটা পাননি বোধ হয়। অগ্রসর হতে যাবেন, এমন সময় নিঁখুত সাহেবী-সুট পরা শশাঙ্ক শুভ্র এসে দাঁড়ালেন সামনে।

গড! আমি দু-দুবার এখান দিয়ে পাস করলুম, তোমাকে চিনতেই পারিনি।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখে মলিন হাসি ফুটে উঠল, হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন অগ্রজকে।

এঃ, চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে!

হঠাৎ শশাঙ্ক-শুভ্রের চোখে জল এসে পড়ল, নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। বাই জোভ, হোয়াট'স দিস্!

তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, চল গাড়ি এনেছি। একটা সুখবর আছে, শঙ্খর ছেলে হয়েছে, একটু আগে খবর পেলুম। এখনও যাওয়া হয়নি সেখানে।

ও, তাই নাকি?

ছিপছিপে ফরসা সদাসঙ্কুচিত, মুখে বিনীত-মৃদু-হাসি শঙ্খর চেহারাটা মনে পড়ল মৃগাঙ্ক-শুভ্রের।

শঙ্খ-শুভ্র

।। এক ।।

যাঁরা স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন বাস্তববাদী, যাঁরা সব জিনিসের বাইরেটা দেখেই তার মূল্য নিরূপণ করেন, তাঁরা শঙ্খ-শুভ্রকে ঠিক বুঝবেন না। শঙ্খ-শুভ্র-চরিত্রের আসল সৌন্দর্যটা বারংবার এড়িয়ে যাবে তাঁদের। কারণ সেটা স্থূল বস্তু নয়, সূক্ষ্ম রূপ। বস্তুত বস্তুর বাজারে শঙ্খ-শুভ্র মূল্যহীন। আস্ফালন করবার মত শব্দ-বহুল বা বর্ণ-বহুল এমন কিছুই নেই তার, যা তাক লাগিয়ে দিতে পারে সকলকে। সে মার্জিত-রুচি ভদ্রলোক। ভদ্রতা জিনিসটা যদিও বিরল, কিন্তু এই বিরল গুণ কারও মধ্যে প্রত্যক্ষ করলে আমরা বাহবা দিয়ে উঠি না। ভদ্রতাটা আমরা যেন সকলের কাছে প্রত্যাশা করি। না পেলে ক্ষুন্ন হই, পেলে চমৎকৃত হই না। সত্যিকার ভদ্রলোক হতে হলে ছোট-বড় যেসব ত্যাগ অহরহ করতে হয়, সেসব ত্যাগের মূল্য দিতে আমরা অভ্যস্ত নই। প্রকাণ্ড একটা কিছু প্রচণ্ড ভাবে এসে আমাদের চৈতন্যলোককে নাড়া না দিলে আমরা সাড়া দিই না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে আমরা হাততালি দিতে কার্পণ্য করি না, কিন্তু যদি কেউ নিজের একমাত্র মশারিটি অতিথিকে দিয়ে সারারাত মশার কামড় ভোগ করেন, তাঁর ব্যবহারে চমকপ্রদ কিছু অনুভব করবার প্রয়োজন আমাদের হয় না। শঙ্খ-শুভ্র আজীবন নিজের মশারিটি পরকে দিয়ে মুখে বিনীত হাসিটি ফুটিয়ে নীরবে মশার কামড় ভোগ করেছে। এ নিয়ে পাঁচজনের কাছে বাহাদুরি করতে তার ভদ্রতায় বেধেছে, পাঁচজনও এ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হবার কোন প্রেরণা পাননি।

ছেলেবেলায় প্রথম যখন সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে সানন্দে নিজের কৃতিত্বটা সম্যকরূপে উপভোগ করবার আয়োজন করছে, ক্লাসের মাস্টারেরা বিশেষ করে থার্ড মাস্টার, যখন সবে তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন—শৈশবের সেই স্বর্গলোকে একদিন এসে হানা দিলেন ঠাকুরদা।

কথায় কথায় হংস-শুভ্র একদিন বললেন, শশাঙ্ক-শুভ্রকে, আমার ইচ্ছে করে, শঙ্খ রজত হীরক—তিনজনকেই হিন্দু আদর্শে গড়ে তুলি, অবশ্য তোমার যদি না আপত্তি থাকে।

ষষ্ঠীচরণকে নিয়ে যা কাণ্ড ঘটেছিল, তার জের অনেকদিন গড়িয়ে গড়িয়ে মাত্র কিছুদিন আগে মিটেছে, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু টাকারও দরকার তখন, শশাঙ্ক-শুভ্র সোজাসুজি আপত্তি করতে পারলেন না।

বললেন, আমার আর আপত্তি কি! তবে সে রকম আর্দশ হিন্দু স্কুল কোথা। রবিবাবুর শান্তিনিকেতনে অবশ্য—

না, শান্তিনিকেতনে পাঠাতে বলছি না। কাশীতে আমার একজন বাল্যবন্ধু গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে একটি পাঠশালা খুলেছে—

কি হয় সেখানে?

সংস্কৃত পড়ানো হয়, ব্রহ্মচর্যের সব নিয়ম পালন করতে হয়। বাবুয়ানি চলবে না সেখানে, মাথা কামিয়ে টিকি রাখতে হবে।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে রইলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

শঙ্খ ঠাকুরদার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। মনে হল, তাঁর চোখ দিয়ে আগ্রহ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, হীরু অবশ্য মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না এখন, শঙ্খ রজত যদি যেতে চায়---

রজতও সেখানে ছিল, সে সঙ্গে বলে উঠল, আমি মাথা কামিয়ে টিকি রাখতে পারব না।

তুমি?

হংস-শুভ্র শঙ্খর দিকে ফিরে চাইলেন। তখন শঙ্খর বয়স যদিও খুব বেশি নয়, তবু সে অনুভব করলে ঠাকুরদার জীবন-মরণ যেন নির্ভর করছে তার উত্তরের উপর। মাথা কামিয়ে টিকি রাখবার ইচ্ছে তারও ছিল না, কিন্তু ঠাকুরদার মুখের দিকে চেয়ে সে ইচ্ছা সে প্রকাশ করতে পারলে না। তার এত বড় বীরত্বের আসল মূল্য কিন্তু কেউ দেয় নি। হংস-শুভ্র সগর্বে ভাবলেন যোগীশ্বরের বংশের ছেলে তো! এই ছেলেটাই বংশের মুখ রাখবে দেখছি। শশাঙ্ক-শুভ্র ভাবলেন, একটা নতুন জায়গায় যাবার লোভেই রাজী হয়েছে বোধ হয়। বাসন্তী ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু শ্বশুরের জেদ, স্বামী মুখ ফুটে বলেছেন---আপত্তি নেই, ছেলেও যেতে চাইছে, এই ঐকতানে বেসুর তুলে রসভঙ্গ করবার মেয়ে বাসন্তী নয়। পরে অবশ্য অন্য উপায়ে উদ্ভাবন করে হংস-শুভ্রের হিন্দু আদর্শকে ভূশায়ী করেছিল সে; তখন কিন্তু মত দিতে হয়েছিল।

বাল্যবন্ধুর সংস্কৃতবহুল অতিশয়োক্তিপূর্ণ চিঠির উপব নির্ভর করে স্বয়ং হংস-শুভ্র শঙ্খকে নিয়ে কাশী গেলেন। জটা-বল্কল-ধাবী-মুনি-ঋষি-পূর্ণ-মৃগ-ময়ূর-অধ্যুষিত তপোবন অবশ্য তিনি প্রত্যাশা করেননি; কিন্তু ভদ্রগোছের কিছু একটা দেখতে পাবেন, এ আশা ছিল তাঁর। কিন্তু কাশীর সেই গলিতে পদার্পণ করে একটু কেমন যেন হতাশ হয়ে গেলেন তিনি। আবর্জনাপূর্ণ অত্যন্ত নোংরা একটা গলি। পিছন দিক থেকে পাচক ব্রাহ্মণের মত যে লোকটিকে ডেকে তিনি বললেন, ওহে, পণ্ডিত মশায় কোথায় আছেন একবার ডেকে দাও তো। সে লোকটি যখন মুখ ফেরালে, তখনও হংস-শুভ্র চিনতে পারলেন না। কপালে-শির-ওঠা কোটরগত-চক্ষু এই ব্যক্তিটিই যে তাঁর বাল্যবন্ধু মথুরামোহন, সংস্কৃত কলেজে এঁরই বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে তিনি যে একদা মুগ্ধ হতেন, এ সত্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও বিশ্বাস করতে একটু দেরি হল তাঁর। পরিচয় হতেই অবশ্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন উভয়ে। ক্রমশ আলাপ ঘনিষ্ঠতর হল। মথুরামোহন অবশেষে হংস-শুভ্রকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, নিদারুণ দারিদ্র্য, বিমুখ রাজশক্তি, উদাসীন সমাজ---এই ত্রিবিধ দুরতিক্রম্য বাধাকে অতিক্রম করে বহুকষ্টে তিনি সনাতন-হিন্দু-আদর্শমূলক এই যে প্রতিষ্ঠানটি খাড়া করে তুলেছেন, তা আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও আদর্শে ক্ষুদ্র নয়। চারটি ছাত্রকে তিনি খেতে দেন এবং সংস্কৃত পড়ান। ছাত্রদের অভিভাবককে কোন খরচ দিতে হয় না, তিনিই সমস্ত ভার বহন করেন। অর্থাৎ বিদ্যা বিক্রয় করেন না তিনি, দান করেন। ছাত্রদের শুধু পড়তেই হয় না, সমস্ত হিন্দু আচার শিখতে হয়, সমস্ত গৃহকর্মাদি স্বহস্তে করতে হয়। হংস-শুভ্র ঠিক মুগ্ধ না হলেও ক্ষুব্ধ হতে পারলেন না। তাঁর মনে হল,

সমাজের বর্তমান অবস্থায় একজনের চেষ্টায় এর চেয়ে বেশি আর কি হবে। মথুরামোহন ইচ্ছে করলেই রাজসরকারে চাকরি নিতে পারত, বিদ্যা এবং সুযোগ দুইই ছিল তার, কিন্তু সে-সব না করে নিজের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রেখে হিন্দু-সংস্কৃতি সেবায় সে আত্মনিয়োগ করেছে, হাততালির লোভে নয়, কর্তব্যবোধে। মথুরামোহনের চোখের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে এবং উদ্দীপনাপূর্ণ আলাপ শুনে হংস-শুভ্রের মন থেকে সমস্ত দ্বিধা মুছে গেল। শঙ্খকে তো রেখে এলেনই টোলে, কিছু সাহায্যও করে এলেন। আর একটা অপ্রত্যাশিত কাজও তিনি করে এলেন, ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে যা ঠিক খাপ খায় না। শঙ্খ-শুভ্রকে নিকটবর্তী পোস্ট-অফিসে নিয়ে গিয়ে তার নামে হাজারখানেক টাকা জমা করে পাস-বইটা হাতে দিয়ে বলে এলেন, দরকার হয় তো খরচ করিস।

শঙ্খ-শুভ্রকে অবশ্য এক মাসের বেশি থাকতে হয়নি।

এই এক মাসের মধ্যেই সে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিল কিন্তু। ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে 'ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারি' জপ করে শয্যাত্যাগ করতে, নিজের হাতে কাপড় কাচতে, বাসন মাজতে, গো-সেবা করতে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহ সূত্রগুলো আয়ত্ত করতে কষ্ট হত তার খুবই; কিন্তু সপ্তাহে যে দুখানা চিঠি সে বাড়িতে লিখত, তাতে তার আভাসমাত্র থাকত না। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হত তার এক সহপাঠীর আচরণে। শঙ্খ-শুভ্রের নিরীহ নম্র ব্যবহার, অভিজাতসুলভ ভদ্রতা, মূল্যবান কাপড় জামা বালিশ তোষক ছেলেটাকে হিংস্র করে তুলেছিল যেন। সে সুযোগ পেলেই আড়ালে শঙ্খ-শুভ্রকে অশ্লীল কথা শোনাতে অদ্ভুত অশ্লীল ভঙ্গীভরে। এমন সব অদ্ভুত অসভ্য কথা বলত, যা শঙ্খ-শুভ্র শোনেওনি কোনদিন। একদিন ছুরি চালিয়ে তার বালিশটা কেটে দিলে, কালি ঢেলে বিছানার চাদরে। শঙ্খ-শুভ্র কোন নালিশ করেনি এ নিয়ে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবার, সকলকে ভালবাসবার। ঠাকুরদার স্বপ্নকে সফল করে তোলবার আগ্রহ সত্যিই জেগেছিল তার মনে। গায়ত্রী পাঠ করবার সময় সত্যিই সে মনকে যথাসম্ভব প্রসারিত করে বরেণ্য সবিতার জ্যোতি কল্পনানেত্রে দেখবার চেষ্টা করত। পরিবর্তিত অবস্থায় পড়ে শুধু সে যে নুয়ে পড়েনি তা নয়, ওই আদর্শে ওই অল্প সময়ের মধ্যেই সে বেশ খানিকটা অনুপ্রাণিতও হয়েছিল, এবং হয়তো তার জীবন ওই ছাঁচেই ঢালা হয়ে যেত, যদি না বাসন্তী হঠাৎ এসে হাজির হত সে সময়।

বাসন্তীর মামা যেই সিভিল সার্জন হয়ে বদলি হয়ে এলেন কাশীতে, অমনই বাসন্তী এসে হাজির হল একদিন। যে কারণে শঙ্খ ঠাকুরদার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল, ঠিক সেই একই কারণে তাকে বাসন্তীর প্রস্তাবেও রাজী হতে হল, এবং তখন যদিও তার স্পষ্টভাবে বোঝবার বয়স হয়নি, তবু আভাসে সে অনুভব করেছিল বোধ হয় যে, নিজের অন্তরতম আদর্শকে অক্ষত রাখতে হলে ভদ্রতা নামক সর্বরঞ্জন সুকুমার বৃত্তিটিকে মনের সদর থেকে সরিয়ে দুর্মুখ দুর্ধর্ষ কোন দরোয়ান সেখানে বসানো প্রয়োজন। সারাজীবন ধরে সে এই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেনি। ভদ্রতার খাতিরে অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে হয়েছে বার বার।

বাসন্তী এসে তাকে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বললে, তোকে পেটব্যথার ভান করতে হবে।

শঙ্খ বিস্মিত হয়ে গেল।

সে কি! পেটব্যথার ভান করতে হবে কেন?

অসুখের ভান না করলে তোকে নিয়ে যাই কি করে এখান থেকে? তোর ঠাকুরদাকে চিনিস তো!

নিয়ে যাবে কেন? আমার বেশ তো লাগছে এখানে। গুরুদেব গুরুমা দুজনেই খুব ভালবাসেন, যত্ন করেন। আমার কিছু তো কষ্ট হয় না।

কিন্তু আমার যে বড্ড কষ্ট হয় বাবা, তোকে ছেড়ে থাকতে। সে আমি পারব না।

বাসন্তীর কণ্ঠস্বরে কি যে একটা বেজে উঠল, শঙ্খ-শুভ্রের সমস্ত বিরুদ্ধতা অবলুপ্ত হয়ে গেল নিমেষে। মায়ের চোখের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে রইল সে। চোখে জল টলটল করছে।...স্বয়ং সিভিল সার্জন যখন বললেন যে, কাশীর জল-হাওয়া এ ছেলের সইবে না, তখন হিন্দু আদর্শের অজুহাতে শঙ্খ-শুভ্রকে মথুরামোহন আটকে রাখতে সাহস করলেন না। হংস-শুভ্রেরও আপত্তি করবার পথ রইল না আর। পারিবারিক আবহাওয়া অনুকূল থাকলে হংস-শুভ্র হয়তো কলকাতা শহরে কোন টোল বার কবতেন বা সৃষ্টি করতেন, কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্রের ওপর মর্মান্তিক চটে ছিলেন তিনি তখন। এত টাকা লোকসান দিয়েও ছেলেটার চৈতন্য হল না, আবার আমলকির মোরব্বা করে বিলেতে চালান দেবার আয়োজন করছে! মানা করলে শুনবে না। ওর কোন সংস্রবেই আব থাকবেন না তিনি। শঙ্খ নির্বিবাদে এসে হিন্দু স্কুলে ভরতি হয়ে গেল। হংস-শুভ্র টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না।

।। দুই ।।

যথাসময়ে হিন্দু স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে শঙ্খ-শুভ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে ঢুকল এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাস করতে লাগল সসম্মানে। কিছুদিন পরে হঠাৎ যেন সে আবিষ্কার করলে নিজেকে। নানাবিধ সহপাঠীর সংস্রবে এসে নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাত আহত-প্রতিহত হয়ে বহু প্রকার আলাপ-আলোচনা শুনে, হরেক রকম বই পড়ে, পারিবারিক আনন্দ উত্তেজনার দোলায় দুলে, ব্যক্তিগত হর্ষ-বিষাদের কারণ অনুসন্ধান করতে করতে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন নিজের জগৎ তৈরি করছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে, সে জগতে সে ছাড়া আর কেউ নেই---সেখানে নিজেই সে নিয়ন্তা এবং নিয়ন্ত্রিত। সেখানকার আকাশ বাতাস ফুল পাখি, রঙ রূপ সুর, সবই তার নিজের সৃষ্টি, বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে যে, নিদারুণ ভিড় এবং কলরবের মধ্যেও সে তার এই স্বতন্ত্রলোকে নির্জনবাস করছে।... কলেজের কমন-রুমে হৈ-হৈ করছে যখন সবাই মোহনবাগানের খেলা নিয়ে, ডিবেটিং ক্লাবে মার্ক্সিজমের সপক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতার তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে যখন, নন-কো-অপারেশনের উত্তেজনায় সমস্ত কলেজ যখন আন্দোলিত, তখন শঙ্খ-শুভ্র সে-সবের মধ্যে থেকেও কেমন যেন অন্যমনস্ক। সব সময় অন্যমনস্ক থাকা সম্ভবপর হত না অবশ্য, আলোচনায় যোগ দিতে হতই, কিন্তু যা দু-চার কথা বলত সে, তা অত্যন্ত সাবধানে, অত্যন্ত অনাসক্ত অনাবদ্ধভাবে। ফরসা-জামা-কাপড়-পরা শৌখিন বিলাসীকে পায়ে হেঁটে কোন কর্দমাক্ত গলি যদি পার হতে বাধ্য করা হয়, তা হলে সে

যেমন কোঁচাটি তুলে সাবধানে এটা ওটা ডিঙিয়ে কাদা বাঁচিয়ে সেটা পার হয়ে যায়, শঙ্খ-শুভ্রও অনেকটা তেমনই করত। গলিটা কেমন তা ভাল করে দেখবার আগ্রহ হত না তার, গলিটা নোংরা—এ জ্ঞান মনে স্পষ্ট হবামাত্রই তার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে উঠত ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে। ভদ্রতার খাতিরে যদিও তাকে ঢুকতে হত মাঝে মাঝে নানা নোংরা গলিতে, কাদার ছিটেও লাগত মাঝে মাঝে গায়ে, কিন্তু গলি-জাতীয় সঙ্কীর্ণ নোংরামিকে কোন দিন প্রশ্রয় দেয়নি সে নিজের জগতে। পারতপক্ষে এড়িয়েই চলত ওসব। দলবদ্ধ জনতার জয়ধ্বনি মুখরিত অন্তঃসারশূন্য উৎসব অথবা সীমাবদ্ধ পরিচিত-গোষ্ঠির অতিশয় মামুলী আলাপ কোনটাই তার চিত্ত স্পর্শ করত না। জয়ধ্বনি-মুখরিত উৎসবগুলো ববং খানিকটা সহ্য করতে পারত সে—অন্তঃসারশূন্য হলেও ওগুলো প্রাণের আবেগ-প্রসূত, এবং যা প্রাণের আবেগ-প্রসূত তা প্রাণকে খানিকটা স্পর্শ করেই; কিন্তু তথাকথিত বন্ধুবান্ধবদের তথাকথিত বিশ্রম্ভালাপ অসহ্য ছিল তার পক্ষে। টম্‌সন সাহেব মিস্টার চাটার্জিকে কি বললেন, কার মোটরের রেডিয়েটার ফেটে কি হল, কে কোন্ কথা বলে কাকে থ করে দিয়েছে, অথবা কে কত সস্তায় চাল কিনতে পারে—এই সব আলোচনার আবর্তে পড়লে সত্যিই কষ্ট হত তার। সবচেয়ে ভয় করত সে সেই সব নিরীহ লোককে, যারা দেখা হলেই হাসি-মুখে এগিয়ে আসে এবং শুরু করে—খবর সব ভাল তো, তারপর আছ কেমন বল। পালিয়ে আত্মরক্ষা করত সে। পালিয়ে যেত সেই জগতে, সেখানে একটা বিশেষ ব্র্যাণ্ডের সিগারেট নীরবে জ্বলছে পছন্দ-করে কেনা হোল্‌ডারটি মুখে, বিশেষ ধরনের চা ধূমায়িত হচ্ছে চাঁপারঙের পেয়ালাটিতে, বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কবি গ্রন্থকার চিত্রকার বিশেষ ধরনের জীবন-দর্শনে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন সেখানকার বিশিষ্ট মানসিকতাকে, যেখানকার নির্জন নিঃসঙ্গতা মধুর হয়ে ওঠে কল্পনার সাহচর্যে, যেখানে বিশেষ একটু বন্ধুর সামান্য একটু হাসি বা ছোট্ট একটু কথা আলোক-রেখা বা শিশির-বিন্দুর মত পরিস্ফুট করে তোলে প্রাণ-পুষ্পকে। এই কাম্য জগতে সে আবিষ্কার করলে নিজেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢোকবার কিছুদিন পরেই।

....এবং তার কিছুদিন পরেই সেই জগতের দ্বারে এসে অহিংস সত্যাগ্রহ শুরু করে দিলেন মহাত্মা গান্ধীর দল এবং সে দলের শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান—অপর কেউ নয়, তার নিজের কাকা। মৃগাঙ্ক-শুভ্র অবশ্য নিজে মুখ ফুটে বাড়ির কাউকে কিছু করতে বলেননি। কিন্তু তাঁর অশরীরী আত্মা নীরব ভাষায় যা বলছিল, শঙ্খ-শুভ্রের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। তা ছাড়া মহাত্মা গান্ধীর আবেদন যে একেবারে তার চিত্ত স্পর্শ করেনি, তা নয়। প্রথমে শ্রদ্ধাই হয়েছিল।

সে স্বতন্ত্র জগতে একক বাস করত বলে যে পৃথিবীর আর সকলকে অবজ্ঞার চোখে দেখত, তা নয়। বরং ঠিক তার উলটো। ট্রেনে সহযাত্রীদের বাক্স-বিছানা সম্বন্ধে অধিকাংশ ভদ্রলোকের যে মনোভাব, তারও ঠিক সেই মনোভাব ছিল সকলের সম্বন্ধে, এমন কি নিজের পরিজনদের সম্বন্ধেও। সে মনোভাব ঠিক অবজ্ঞা নয়, ঠিক ঔদাসীন্য নয়, তা শিক্ষিত স্বাতন্ত্র্যবাদীর মনোভাব। যদি কোন কারণে অপরের সুটকেসের ডালা খুলে যায় এবং তার প্রতি অনিবার্যভাবে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তা হলে সেদিকে যে দৃষ্টি সে নিক্ষেপ করবে, তা অবজ্ঞার দৃষ্টি নয়, কৌতূহলের দৃষ্টি। তার সঙ্গে সম্ভ্রম থাকাও সম্ভব। কিন্তু কোন কারণেই সে অপরের সুটকেস হাঁটকাবে না, কিংবা নিজের সুট্‌কেসের জিনিসের সঙ্গে পরের সুট্‌কেসের জিনিস মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলবে না, কিংবা উচ্ছ্বসিত হয়ে অপরের সুট্‌কেসের নকলে নিজের

সুট্‌কেসের চেহারা বদলে ফেলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে না। নিজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তার মন যেমন সজাগ, অপরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সে তেমনই সশ্রদ্ধ। নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঢাক পেটাতে তার যেমন লজ্জা, অপরের বৈশিষ্ট্যকে বিধ্বস্ত করতে তার তেমনই সঙ্কোচ। প্রকৃতির প্রত্যেক সৃষ্টিই যে স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত, প্রত্যেক মতবাদের মূলেই যে কিছু-না-কিছু মহৎ প্রেরণা আছে--এ কথা সে যেমন স্বীকার করত, তেমনই এ কথাও সে মনে মনে জানত যে, তার স্বকীয় মহিমা, স্বকীয় মতবাদও তুচ্ছ নয়, তা বর্জন করে অপরের মহিমা অপরের মতবাদ গ্রহণ করলে কিছুতেই তার জীবন সার্থক হবে না। তাই ইতরের মত হুড়োহুড়ি করে সে যেমন নকলও করতে যেত না, ইতরের মত হৈ-হৈ তর্ক করে নিজেকে জাহির করবার দুরন্ত আগ্রহে অপরকে নিষ্প্রভ করে দেবার প্রবৃত্তিও তার হত না কখনও। বরং নিজের রুচির সঙ্গে নিজের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাইরে থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে পারলে সে যেন কৃতার্থ হয়ে যেত। তাই বলে তার অন্তরলোকে যে বাণীমূর্তি সে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল, তার মুকুটে যে কোন চকচকে রত্ন বহুমূল্য বলে লাগিয়ে দিলেই যে তার তৃপ্তি হত তা নয়, সামান্য পালকেও তার মন ভরে উঠত যদি মুকুটের সঙ্গে ঠিক মানিয়ে যেত সেটা।

ছন্দ-পতন হল বলেই মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে গিয়ে ফিরে এল সে। চারদিকে যখন স্কুল-কলেজ বয়কট চলছে, কলেজের গেটে গেটে যখন পিকেটিঙের ধুম, তখন সে কলেজে যায়নি বিদেশী শিক্ষা বর্জন করা উচিত মনে করেছিল বলে নয়--যায়নি ইতরামি এড়াবার জন্যে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ কলেজ যাওয়া নিয়ে একটা নাটকীয় কাণ্ড করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তার, মনে হয়েছিল, এর চেয়ে কামাই করে জরিমানা দেওয়া বরং ভাল। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে কিন্তু চরকা ঘোরাতে গিয়েছিল সে সত্যিকার প্রেরণা নিয়ে। সত্যিকার প্রশ্ন জেগেছিল মনে। কিন্তু মৃগাঙ্ক-শুভ্র নিজেই অজ্ঞাতসারে তার সে প্রেরণার মূলে কুঠারাঘাত করলেন একদিন। তর্কপ্রসঙ্গে তাঁর এক বন্ধুকে যখন বললেন তিনি যে, চরকা চাল্যানোই এখন আমাদের একমাত্র পথ, নিরস্ত্র জাতের পক্ষে এই এখন প্রুডেন্স্, তখন—প্রুডেন্স্ কথাটা শোনামাত্রই তার মনে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ব্লেকের একটা লাইন মনে পড়ে গেল-- "Prudence is a rich ugly old maid courted by Incapacity"....আলোটা টপ করে যেন নিবে গেল হঠাৎ। চরকা যদি এই হীনতার প্রতীক হয়, তা হলে চরকার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তা ছাড়া সব দুয়ার এঁটে বন্ধ করে দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে বর্জন করলেই কি আমাদের ভারতীয়ত্ব বেশি করে ফুটবে? সে ছেলেবেলায় টিকি রেখে সন্ধ্যাহ্নিক করতে শিখেছিল, এখনও তার টিকি আছে, এখনও সে সন্ধ্যাহ্নিক করে, ভাল লাগে বলেই করে। নির্জন ঘরে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে বসে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে অনন্ত কল্পলোকে উড়ে বেড়াতে ভাল লাগে তার, বিশেষ বিশেষ মূর্তিকে কেন্দ্র করে একটা অদ্ভুত রকম আনন্দ পায় সে। অনেক উপহাস অনেক ব্যঙ্গ সহ্য করেও তাই সে এখনও আঁকড়ে আছে এসব—ভারতীয় বলে নয়, ভাল লাগে বলে। কি এসে যায় অপরের উপহাসে বা ব্যঙ্গে! সে সিগারেট খায়, চা খায়। বাঁধা গতের সঙ্গে মিলত থেলো হুঁকোয় তামাক এবং পাথরের গ্লাসে গুড়ের শরবত খেলে—আরও বাহবা পেত হয়তো জুতো না পরে খড়ম পায়ে দিলে। কিন্তু বাঁধা গতে 'সংগত' করে সকলের কাছে হাততালি পাওয়াই তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়—বস্তুত, তার বিশেষ কোন উদ্দেশ্যই নেই, নিজের জীবন নিজের মত করে যাপন করতে চায় সে কারও কাছে কোনও

কৈফিয়ত না দিয়ে। গীতা-উপনিষদের সঙ্গে বায়রন-কীট্‌স কেন পড়ছে— এ জবাবদিহি করবার হীনতা সে কিছুতেই স্বীকার করবে না, বায়রণ-কীট্‌স বিদেশী বলে তাদের ত্যাগও সে করতে পারবে না। বিদেশী বর্জনের ওই আস্ফালনের মধ্যেই একটা হীনতা আছে। কোনরকম হীনতার সংস্পর্শে এলেই মনের সমস্ত আনন্দ ম্লান হয়ে যায় যেন। প্রুডেন্স্‌-এর জন্যে চরকা চালাতে হবে শুনেই শঙ্খ-শুভ্রের সমস্ত উৎসাহ নিবে গেল। আর একটা হেতু গোড়া থেকেই তার মনকে বিরূপ করে রেখেছিল। যে কোন হাল্লা-হৈ-চৈ-আস্ফালন-আড়ম্বর পীড়াদায়ক মনে হত তার কাছে। আমরা স্বদেশী, আমরা আত্মিক-শক্তি-সম্পন্ন, আমরা অহিংস, আমরা সত্যাগ্রহী—আপিসে-আদালতে দোকানে দোকানে কলেজের গেটে গেটে পতাকা ঘাড়ে করে সেটা সগর্জনে প্রকাশ করার মধ্যে কেমন যেন একটা নোংরামি আছে, সে অনুভব করত। তবু মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে সে গিয়েছিল মৃগাঙ্ক-শুভ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ। কিন্তু ফিরে আসতে হল; মন কিছুতেই পাখা মেলতে চাইল না। কতকগুলি বাঁধা বুলি আউড়ে ব্রাহ্মণত্বের ভড়ং করে অতি স্থূল আধিভৌতিক সংগ্রামে লিপ্ত হবার উৎসাহে মোটেই পেলে না সে। অহিংস সত্যাগ্রহের নানারকম ব্যাখ্যা শুনেও এ বিশ্বাস তার মন থেকে কিছুতে ঘুচল না যে, ওটা বিপক্ষকে জব্দ করার ফাঁদ মাত্র এবং অনন্যোপায় হয়ে সে ফাঁদ পাতা হয়েছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। তার মনে হল, যীশুখ্রীষ্টের প্রেমের বাণীকে সেণ্ট্‌ পল যেমন ক্রিশ্চানিটিতে পরিণত করেছিলেন, বুদ্ধ-চৈতন্যের অহিংসা-নীতিকে মহাত্মাজী তেমনই রাজনীতিতে পরিণত করতে চান। সেণ্ট্‌ পলের ক্রিশ্চানিটির ওপর তার যেমন শ্রদ্ধা ছিল না, এর ওপরও তেমনই কোন শ্রদ্ধা হল না। কিন্তু না হলে কি হবে, চরকা তবু ঘোরাতে হল কিছুদিন। হঠাৎ ছেড়ে চলে আসতে ভদ্রতায় বাধল কেমন যেন। তা ছাড়া মাও আসতে দিলে না। কাশীতে বাসন্তী যেমন তাকে মিথ্যাচারণ করতে বাধ্য করেছিল, এখানেও ঠিক তেমনই করলে। মা তাকে এমন বিপদে ফেলে মাঝে মাঝে! অথচ মায়ের মুখের দিকে চাইলে তার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবার শক্তিই যেন হারিয়ে ফেলে সে। বস্তুত, কারও সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করবার শক্তি তার নেই। রুচি বিরুদ্ধ হলেও পরের অনুরোধে বারম্বার তাকে এঁদো গলিতে ঢুকতে হয়েছে। মাসখানেক চরকা ঘোরাবার পর তার ক্লান্ত মন যখন চরকা-পর্বে যবনিকা-পাত করবার আয়োজন করছে, তখন হঠাৎ বাসন্তী একদিন বলে বসল, তুই তবু ছোট কাকার মান রক্ষে করেছিস বাবা। আর তো কেউ চরকা ছুঁলেও না।

আমিও আর পেরে উঠছি না।

তা বলে তুমি থামতে পাবে না। মন ভেঙে যাবে তা হলে বেচারীর। কাল তোর কত প্রশংসা করছিল আমার কাছে।

শঙ্খ-শুভ্র সত্যি কথাটা বলতে গিয়ে সসঙ্কোচে চুপ করে গেল।

মনে হল, মা যদি আবার বলে দেন, কষ্ট পাবেন তিনি। আসল কথাটা না বলে ইতস্তত করে বললে, ভাল লাগছে না খুব।

তা হোক। একটু-আধটু চরকা ঘোরালে কি আর এমন কষ্ট হবে তোমার? ঠাকুরপোর মনে কত বড় একটা গর্ব যে, তুই রোজ চরকা কাটিস। বাসন্তীর প্রশংসা-লোলুপ মন কিছুতেই থামতে দিলে না শঙ্খ-শুভ্রকে। যদিও তার নিজের জগতে চরকার ঘর্ঘর-ধ্বনিকে সে ঢুকতে দিলে না, কিন্তু বাইরের জগতে ভদ্রতার খাতিরে রোজ তাকে চরকা কেটে যেতে হল দিনের

পর দিন। নিজের 'প্রিন্সিপল' আস্ফালন করে রজত বা হীরকের মত সরে থাকতে পারলে না সে কিছুতে। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের জেল হবার পর সে যেন কারা-মুক্ত হল, এবং সহসা সন্দেহ-মুক্তও হল যেন। জেলে যাবার দিন কাকামণির যে মুখচ্ছবি দেখেছিল যে, তা অপরূপ। পুলিসের ব্যাটনের ঘায়ে ফাটা মাথায় রক্ত-ভেজা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো, নাকটা থেঁতলে গেছে, মুখে কিন্তু কি প্রশান্ত হাসি! তার মনে হল, না না, ভুল করেছি বোধ হয়। এই তো বীরত্ব! এর মধ্যে লেশমাত্র হীনতা থাকতে পারে না। এ কথা স্বীকার করেও কিন্তু সে কাকার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারলে না। সেই কারণে প্যারলে না, যে কারণে সবুজ-রঙের পক্ষপাতী লোক চুনিকে ভাল পাথর স্বীকার করেও কেনবার বেলায় পান্না কেনে। তার মন যে আকাশে উড়ে আনন্দ পেত তা সাহিত্যের আকাশ, যে সমুদ্রে অবগাহন করে তৃপ্তি পেত তা রসের সমুদ্র। সে আকাশ, সে সমুদ্রে কোন গণ্ডি নেই, কোন সীমা নেই, কোন জাতিভেদ নেই। সেখানে গল্স্ওয়ার্দি, শেক্স্পিয়র, কালিদাস, ভল্টেয়ার, গেটে, ভার্জিল, চণ্ডীদাস, ইয়েট্স, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রেমব্রাণ্ট, র‍্যাফেল অবলীলাক্রমে এক পংক্তি-ভোজনে বসতে পারেন, রসস্রষ্টা সাহিত্যিক গান্ধীরও সেখানে অবাধ গতি। কিন্তু যে গান্ধী সি. আর. দাশকে হারিয়ে দেবার জন্যে ভোটারদের সহযোগিতা কামনা করেন, লেফ্‌ট উইংকে নিষ্প্রভ করে দেবার জন্যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবি থেকে লম্ফ দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে উপনীত হন, যাঁর নেতৃত্বে ভাড়া-করা ভলাণ্টিয়ায়ের দল অহিংসার ভড়ং করে বেড়ায় যেখানে সেখানে, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানকে মেলাবার জন্যে যিনি তুরস্ক দেশীয় খিলাফতের সহায়তা নিতে ইতস্তত করেন না--সেই মহাত্মা-নামধেয় কৌশলী গান্ধীর সঙ্গে—তাঁর অতি বিশুদ্ধ স্বদেশ-হিতৈষণা সত্ত্বেও তাঁর মহত্ত্ব বীরত্ব আত্মত্যাগ স্বীকার করে নিয়েও—শঙ্খ-শুভ্র কিছুতেই নিজের সুর মেলাতে পারেনি। এ নিয়ে কোন কলহ বা আস্ফালন সে করেনি, সসঙ্কোচে পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে মাত্র। যে জগৎ তার মানস-লোক, সে জগতেও মানুষের সুখ-দুঃখ আশা নিরাশা আনন্দ-উদ্বেগ সবই আছে---তা মানুষেরই জগৎ--কিন্তু তা কোন এক বিশেষ দেশের মানুষের নয়। সে জগতেও উদারতা প্রশংসনীয়, কিন্তু তা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিশেষ রকম ছাপ-মারা উদারতা নয়, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারবাসীর দুর্দশায় তা অবিচলিত থেকে গুর্জরবাসী চাষার দুর্দশায় তা বিচলিত হয় না শুধু, সে উদারতা সর্বজনীন সহজ সহৃদয় উদারতা—স্বয়ম্প্রভ, স্বতঃস্ফূর্ত সহজবোধ্য; ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে এই উদারতা যখনই সে দেখেছে, তখনই তার অন্তর জয়ধ্বনি করে উঠেছে। কিন্তু তাঁর 'ইনার ভয়েস'-এর বিচিত্র আচরণে আবার কেমন যেন অস্বচ্ছ হয়ে গেছে সব—এমন কথাও মনে হয়েছে, লোকটা ভণ্ড নয় তো! অর্থাৎ শঙ্খ-শুভ্র ন্যাশনালিস্ট্ নয়, কবি; রাজনৈতিক নয়, সাহিত্যিক। দেশকে সে যে ভালবাসে না, তা নয়; খুবই বাসে, তার স্বাধীনতার স্বপ্নের সুনির্দিষ্ট কোন রূপ নেই। পত্রান্তরালচারিণী সুর-স্বরূপিণী নাইটিংগেলের প্রতি কীট্‌সের যে মনোভাব, স্বাধীনতার সম্বন্ধে শঙ্খ-শুভ্রেরও অনেকটা সেই মনোভাব যেন। তা অরূপা, অলক্ষ্যা, কল্পলোকবিহারিণী। তা রূপ ধরে আছে আদর্শের যে উর্ধ্বলোকে, সেখান থেকে তাকে নাবিয়ে আনতে চায় না সে। তার আশা, নিজেই সেখানে সে যাবে একদিন। আকুল আগ্রহে তাকে পেতে চায়, কিন্তু কোন রকম নোংরামির মধ্যে দিয়ে নয়।

"Away! away! for I will fly to thee

Not charioted by Bacchus and his pards
But on the viewless wings of poesy
Though the dull brain perplexes retards."
এ স্বপ্ন অনবদ্ধ নিষ্কলুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা—
"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ তোমার,
আমি পাই না তোমারে।"

শঙ্খ-শুভ্র কবি বটে, কিন্তু অদ্যাবধি একটিও কবিতা লেখেনি সে। চমৎকার যে খাতাখানা কিনে এনে রেখেছিল, তার সবগুলো পাতাই সাদা আছে এখনও। কি লিখবে? যে মেয়েটিকে তার ভাল লেগেছিল, সে আলেয়ার মত সরে গেল। যে বন্ধুটি প্রাণে সুর তুলেছিল, সে মরে গেল হঠাৎ একদিন। তা ছাড়া যা কিছু ধরতে যায়, ছুঁতে যায়, হাতে কালি লাগে। সাবান দিয়ে সে কালি ওঠাতেই অবসরটুকু কেটে যায়। হতাশা বেদনা কালি আর সাবানের কবিতা সে লিখবে না! মনের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের পাখা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ে আসে মাঝে মাঝে—আসে, আবার চলে যায়। ভাষার ফাঁদ পেতে তাদের ধরতে ইচ্ছে করে না, ভয় হয়, ডানা খসে যাবে, রঙ ঝরে যাবে, মরে যাবে হয়তো....। কোন্ পথে তারা নিজে এসে ধরা দেবে, তারই সন্ধান সে করে স্বপ্নাতুর নয়নে আপন নিভৃত জগতে বসে বসে। একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে, প্রতীক্ষা করে। ভয় হয়, রবীন্দ্রনাথের ক্ষাপ্যার মত পরশমণি পেয়েও হয়তো সে হারিয়ে ফেলবে অন্যমনস্ক হয়ে। উন্মুখ সমনস্কতা সব সময়ে বজায় থাকে না যে! বাইরের জগতে নিরন্তর কলরব, কোলাহল উঠছেই। একটু ফাঁক পেলেই কাব্যকুঞ্জে দুদ্দাড় করে এসে হাজির হয় মত্ত মাতঙ্গ, তাকে সামলাতেই সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—নিমেষের মধ্যে সব তছনছ করে দিয়ে চলে যায়। এই মত্ত মাতঙ্গদের এড়াবার সামর্থ্য নেই তার। এসে পড়লে ভদ্রতা করে চেয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিতে হয় এবং তাদের শুষ্ক আস্ফালন শুধু দেখতে হয় নয়, দেখে মুগ্ধ হয়েছি—এ ভাবও চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলতে হয়। তা ছাড়া মত্ত মাতঙ্গ সব সময় যে বাইরে থেকে আসে তা নয়, পরিবারের মধ্যেও মত্ত-মাতঙ্গের অভাব নেই। রজত একদিন হুড়মুড় করে এসে হাজির হল। বাঁ হাত দিয়ে অ্যাশ-ট্রেটাকে টেবিলের কোণ থেকে সরিয়ে দিলে—খানিকটা ছাই যে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল, সেদিকে লক্ষ্যই করলে না—টেবিলের কোণটাতে বসে তার শৌখিন মালক্কা বেতের চেয়ারের হাতলে স্যাণ্ডাল-সুদ্ধ পা-টা তুলে দিয়ে উদ্ভাসিত চক্ষে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, বুঝলে দাদা, ভোটে জিতেছি। তোমাকেই এবার আমাদের অ্যাথ্‌লেটিক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হতে হবে।

শঙ্খ-শুভ্র বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানত না। সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। মনে ঈষৎ আতঙ্কের সঞ্চার হল। বুক-পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে রজত বললে, এই কাগজটায় সই করে দাও—এইখানটায়।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটু অধৈর্যভরে রজত-শুভ্র টেবিলের কোণটায় বাগিয়ে বসতেই সে তাড়াতাড়ি নিজের ফাউন্টেন-পেনটাকে সরিয়ে নিলে টেবিল থেকে।

হরেনবাবু এবার প্রেসিডেন্টশিপ থেকে রিটায়ার করেছেন, শুনেছ তো?

শঙ্খ কিছুতেই শোনেনি। চুপ করে রইল।

রজত বলতে লাগল, বিজন জগদীশবাবুকে প্রেসিডেন্ট করবে বলে খাড়া করেছিল। জগদীশবাবুকে! লোকটা টি-টি করে কথা বলে—এক নিশ্বাসে দুটো কথা বলবার ক্ষমতা নেই। আমি তাই বিশুকে দিয়ে তোমার নামটা প্রোপোজ করিয়েছিলাম—ভোটে আমরা জিতেছি।

শঙ্খ মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও রজতের মুখের দিকে চেয়ে 'না' বলতে পারলে না। অনেক ক্লাবেই সে নিয়মিত চাঁদা দেয়, রজতের ক্লাবেও দেয়। স্কুলে পড়বার সময় স্বাস্থ্যচর্চাও করেছিল অবশ্য কিছুদিন; কিন্তু তাই বলে স্বাস্থ্যচর্চা-সমিতির পাণ্ডাগিরি করবার কল্পনাও সে করেনি কখনও। কিন্তু রজতকে থামানো শক্ত। তবু একটু ইতস্তত করে বললে, আমি কি তোমাদের প্রেসিডেন্ট হবার উপযুক্ত? আমাকে কেন—

বাঃ, তুমি হলে ভাদুড়ী-মেডেল উইনার। তা ছাড়া ইংরিজীতে ফার্স্ট-ক্লাস ফার্স্ট। তোমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত লোক আর কে আছে?

স্কুল-জীবনে সে একবার ভাদুড়ী-মেডেল পেয়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফার্স্ট-ক্লাস ফার্স্টও হয়েছে।

কিন্তু ওসব তো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমাকে আর ওসবের মধ্যে টানছ কেন?

করুণ দৃষ্টিতে সে রজতের দিকে চাইলে।

না না, সেসব শুনব না, সই করে দাও।

সই করে দিতে হল। শুধু তাই নয়, 'কাব্যে অভিনবত্ব' নাম দিয়ে সে যে প্রবন্ধটা লিখবে ভেবেছিল, তার মালমসলা সরিয়ে রেখে 'স্বাস্থ্যচর্চা' নামে নতুন একটা প্রবন্ধ ফাঁদতে হল কিছুদিন পরে। শুধু ফাঁদতে হল নয়, মাততে হল তা নিয়ে। কোন জিনিস অসম্পূর্ণ করে করা তার স্বভাব নয়। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে বাধ্য হলেও সেটা সুন্দর করে করাই তার স্বভাব। তাই প্রবন্ধে শুধু অ্যাকিলিস অ্যাগমেমনন ভীম অর্জুন থেকে শুরু করে আশানন্দ-গামা গোবরের ফর্দ দিয়েই ক্ষান্ত হল না, দেহের স্বাস্থ্যের সঙ্গে মনের স্বাস্থ্য এবং মনের স্বাস্থ্যের সঙ্গে জাতির স্বাস্থ্যও যে কিরূপ জড়িত, এমন কি সাহিত্যও যে স্বাস্থ্যেরই বিকাশ, তা নানা উদাহরণ-সম্বলিত করে লিখতে হল তাকে। লিখতে লিখতে এমন তন্ময় হয়ে গেল যে, নিজেরই মনে হতে লাগল, স্বাস্থ্যচর্চা করাই সম্ভবত মানব-জীবনের একমাত্র কর্তব্য। প্রবন্ধ শেষ হয়ে যাবার পর অনুতাপও হল—ছি ছি, বাজে জিনিস লিখে অনেক সময় নষ্ট হল! রজতের ওপর রাগও হল একটু। কিন্তু কারও ওপর রাগ করে থাকা তার স্বভাব নয়, বিশেষতঃ রজতের ওপর। তার যে রূপটা চোখে পড়ে, তা এমন বলিষ্ঠ এমন আবেগময় এমন দৃপ্ত যে, তাকে ভাল না বেসে পারা যায় না। কি সুন্দর ছবি আঁকতে পারে, কিন্তু কিছুতেই ছবি-আঁকায় মন দেবে না। আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজে ব্যাপার নিয়ে। পুলিসের সন্দেহ, ও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নাকি! হতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয় ওর পক্ষে। সব দোষ সত্ত্বেও কিন্তু এমন একটা কি আছে ওর মধ্যে যা কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না—সতেজ প্রদীপ্ত প্রাণবান নির্ভীক কি একটা যেন। একটা ছবি শঙ্খ-শুভ্র কখনও ভুলবে না। কিছুদিন আগে একবার রজত হীরক আর সে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিল এক জায়গা থেকে। পায়ে হেঁটেই ফিরছিল। সে একটু এগিয়ে এসেছিল। হীরক আর রজত পেছনে ছিল। কড়েয়ার

কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ চার-পাঁচজন গুণ্ডা এসে ঘিরে ধরলে তাকে। আংটি বোতাম ঘড়ি খুলে দিতে বললে। শঙ্খ যে দুর্বল তা নয়, মারামারি করলে হয়তো ও ওদের দু-একজনকে ঘায়েল করতে পারত, কিন্তু মারামারি জিনিসটার ওপর ওর বরাবর বিতৃষ্ণা, ভাব ছিল, কি করা যায়—আংটিটা খুলে দিয়ে দেব নাকি—এমন সময় রজত আর হীরক এসে পড়ল। সেই গুণ্ডার দলে রজতের যে সিংহমূর্তি সে দেখেছিল সেদিন, তা ভোলবার নয়। গুণ্ডাগুলো সহজে রণে ভঙ্গ দেয়নি, রীতিমত লড়েছিল। কিন্তু রজতের কাছে তারা দাঁড়াতে পারেনি। তাদের একজন ছোরাও বার করেছিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে জুজুৎসুর এক প্যাঁচে রজত ছোরাটা কেড়ে নিলে তার হাত থেকে এবং যুগপৎ ঘুষি আর লাথি চালিয়ে ঘায়েল করে ফেললে দুটো লোককে। 'বাপরে' বলে শুয়ে পড়ল তারা, বাকিগুলো পালাল ঊর্ধ্বশ্বাসে। হাতের খানিকটা কেটে গিয়েছিল, নির্বিকারভাবে তাতে রুমালটা বেঁধে একটু ঝুঁকে ভূশায়ী লোক দুটোর দিকে চেয়ে বললে, না, মরেনি ব্যাটারা। চল, এবার যাওয়া যাক, পুলিস মহাপ্রভুরা আসবেন এইবার। যেন কিছুই হয়নি।

রজত যদিও নিজের বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায় সাধারণতঃ, কিন্তু মাঝে মাঝে আঁধির মত আচমকা এসে শুভ্র-শুভ্রের সাজানো বাগান ওলট-পালট করে দিয়ে চলে যায় সে। হীরক বড় একটা ঘেঁষে না। কিন্তু সেও অস্বস্তিজনক। সে তার মার্কস্ এবং এংগেল্স, ডাংগে এবং নরিম্যান, জওহরলাল এবং যোশী নিয়ে নিজের জগতেই থাকে। অত্যন্ত বেশি নীরব হয়ে থাকে বলে কেমন যেন ভয় করে তাকে। তার যে বিশেষ কোন একটা মতবাদ আছে, তা জানাই ছিল না কারও। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সে একটা মিলের কুলিদের ধর্মঘটের নেতা হয়েছে। তাদের মাইনে বাড়িয়ে তবে ছাড়লে। অথচ বাড়িতে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক দূরে থাক্, একটি কথাও বলে না। চুপচাপ আসে, চুপচাপ থাকে। বাবা একদিন বকলেন, হাসিমুখে চুপ করে রইল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল শুধু। কিন্তু মনে হল, সে দৃষ্টিতে জ্বালা নেই, ব্যঙ্গ নেই, আছে আত্মপ্রত্যয়। একটু করুণার এবং ক্ষমার আভাসও আছে বলে মনে হল। তার ভাবটা যেন—তোমরা কেন যে বুঝতে পারছ না বা বুঝতে চাইছ না, তা আমি জানি; কিন্তু এও আমি জানি যে, একদিন তোমাদের বুঝতে হবেই। তখন তোমাদের যে কি দশা হবে, তাই ভেবে কষ্ট হচ্ছে আমার। যখনই কেউ বকে তাকে, তার চোখে এই দৃষ্টি ফুটে ওঠে। তার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টির এই অমোঘ অর্থ অনুভব করে শঙ্কিত হয়ে পড়ে শঙ্খ-শুভ্র। তার নিজের জগতে কেমন যে ছায়া নামতে থাকে, ফুল ঝরে যায়, প্রজাপতি উড়ে যায়....মনে হয়, কোদাল কাস্তে হাতুড়ি শাবল নিয়ে পিলপিল করে ঢুকছে যেন চাষাভুষো কামার-কুমারের দল...ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের ছবিটা মনে পড়ে...মনে পড়ে রাশিয়ার বিদ্রোহ। হীরকের শত্রু বলে মনে হয়। তখনই আবার মনে হয়, হীরক—আমাদের হীরু—সে কি শত্রু হতে পারে? কিন্তু সে কি যে হতে পারে আর কি যে হতে পারে না, তা বোঝবার উপায় নেই—সে দূরে দূরে থাকে, কাছে ঘেঁষে না।

ইন্দু-শুভ্রাও পরিবারের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণী, যার চলাচলন আচার ব্যবহার কথাবার্তার মধ্যে কোন সঙ্গত অর্থ খুঁজে না পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে শঙ্খ-শুভ্র। ছোট পিসি যে নিষ্ঠাবতী বিধবা, তার রাজনৈতিক মতামত যে একটু উগ্র রকমের স্বদেশী, এই কথাই জানা ছিল তার। হঠাৎ সেদিন মেছুয়াবাজারে নজরে পড়ল, এক ট্যাক্সিতে এক পুলিস অফিসারের পাশে ইন্দু-

শুভ্রা বসে আছে। তার চোখ মুখ দিয়ে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাকে প্রেমবিহ্বলতা বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু তা ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে। ভূমিকম্প হলে মনের যেমন অবস্থা হয়, শঙ্খ-শুভ্ররও ঠিক তেমনই হল। আরও বেশি অস্থির হয়ে পড়ল এ কথা কাউকে বলতে পারলে না বলে। মায়ের কাছে প্রায়ই কোন কথা গোপন করে না সে, কিন্তু এ কথাটা বলতে বাধল। ইন্দু-শুভ্রার প্রদীপ্ত মুখখানা মনের মধ্যে প্রেতের মতন ঘুরে বেড়াল কয়েক দিন। রাত্রে ঘুম হল না। একদিন দমদমে চলে গেল। গিয়ে দেখল, ইন্দু-শুভ্রা কোণের ঘরটাতে বসে নিবিষ্ট চিত্তে কানাইলালের জীবনী পড়ছে। পরনে সাদা থান, মাথার চুল রুক্ষ। মেছুয়াবাজারের ছবির সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নেই। সে ঘরের ভেতর ঢুকল, বেরিয়ে এল, ইন্দু মুখ তুলে চাইলে না পর্যন্ত। একেবারে অন্য লোক যেন। দুটো ছবিই এত সত্য বলে মনে হল তার কাছে যে, কোনটাকেই অস্বীকার করতে পারলে না সে ফলে অস্বস্তি বাড়ল। দুটো ছবিকে মেলাতে পারলে না বলে অস্বস্তি। তার শুচি-বাই নেই। কুন্দ-শুভ্রার সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধাই আছে। বাড়ির লোক কেউ যদিও কুন্দ-শুভ্রার নামোচ্চারণ পর্যন্ত করে না, কিন্তু তারাপদর কাছে কুন্দ-শুভ্রার গল্প শুনেছে সে একদিন লুকিয়ে। এক মুসলমান ওস্তাদের প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে চলে গেছেন তিনি। শঙ্খ-শুভ্র মাঝে মাঝে ভাবে, এর জন্যে বাড়ি সুদ্ধ সকলের এত লজ্জা কেন? প্রেমের জন্যে লজ্জা? তা হলে রাধাকৃষ্ণের ছবি ঘরে ঘরে টাঙিয়ে রাখার অর্থ কি? মুসলমান বলে লজ্জা? তা হলে সভায় সভায় কাগজে কাগজে হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্যে এ আগ্রহ কেন? চলে গেছে বলে লজ্জা? সমাজে সম্মানের আসন না দিলে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? শঙ্খ-শুভ্র নিজের অন্তরে কিন্তু কুন্দ-শুভ্রাকে যে আসনে বসিয়ে রেখেছে, তা শ্রদ্ধার আসন। না, এসবের জন্যে নয়, ইন্দু-চরিত্রের রহস্য উদ্ভেদ করতে না পেরে মনে মনে উৎসুক হয়ে আছে সে, অস্বস্তি ভোগ করছে। তা ছাড়া এই জাতীয় কোন ঔৎসুক্য তাকে অন্যমনস্ক করে দিলে সে ভীতও হয়ে পড়ে। ভয় হয়, পরশমণিটা কখন হাতে এসে হয়তো চলে যাবে, কিংবা গেছে।...বর্হিজগতেব রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়াও এই ধরনের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কুশাঙ্কুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কন্টকিত করে তোলে তার নিভৃত জগতের নির্জন পায়ে চলার পথটিকে—যে পথটি মাঠের মাঝ দিয়ে, ঝাউবনের পাশ দিয়ে, নদীর আঁকে-বাঁকে চলে গেছে রূপকথা-লোকে। কিছুতেই এড়াতে পারে না সে এই কুশাঙ্কুরদের। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে হা-হুতাশ করতেও লজ্জা করে তার। নীরবে সহ্য করে সমস্ত। রাজনৈতিক মতামতকে আর সে তত ভয় করে না। ওদের এড়াবার মস্ত বড় একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছে সে। তর্ক করে না, সায় দিয়ে যায় স্মিত মুখে। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে সে গান্ধী-ভক্ত, রজতের কাছে সে সুভাষ-পন্থী, হীরকের কাছে কমিউনিস্ট। হীরক অবশ্য কাছে আসে না বড় একটা। কিন্তু হীরক জাতীয় আরও অনেকে আসে। রাজনীতির ধ্বজা নিয়ে কেউ এলে নিজের মনটাকে সাময়িকভাবে জলবৎ করে ফেললেই গোল থাকে না আর। যখন যে পাত্রে ঢুকতে হয়, তখনই তার আকার ধারণ করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সহজে। চেষ্টা করে মনকে যে জলের মত করতে হয় তাও নয়, জলের মতই স্বচ্ছ সাবলীল মন তার। পাত্র না থাকলে তা ঝিরঝির করে পড়ে নিজের নির্জন-লোকের পাহাড়ী ঝরনায় বয়ে যায় শুভ্র সিকতার উদার আবেষ্টনীর মাঝ দিয়ে অজানা সাগরের উদ্দেশ্যে।

তাতেও উপলখণ্ড পড়ে বাধা সৃষ্টি করে মাঝে মাঝে। যে দুটি উপল পর পর এসে

হাজির হল একদিন অনিবার্যভাবে, সে দুটি যেমন অনড় তেমনই দুরতিক্রম্য। তার সাধ ছিল, সারাজীবন সাহিত্যসাধনা নিয়েই থাকবে। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করেই কাটাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জোরে ভাল একটা অধ্যাপকের চাকরিও জুটেছিল, কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্র বাধা দিলেন।

বললেন, চাকরি করতে হবে না, 'বিজনেসে' ঢোক। চাকরির মোহ ত্যাগ না করলে বাঙালীর ভদ্রস্থ নেই।

শঙ্খ-শুভ্র চুপ করে রইল। শশাঙ্ক-শুভ্র তার মুখের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে পাইপটা ধরিয়ে বললেন, এদিকে তো স্বাধীনতার লম্বা লম্বা 'লেক্‌চার' দিয়ে বেড়াও তোমরা, কিন্তু চাকরি করবার কোন সুযোগই তো ছাড়তে চাও না দেখি।

শঙ্খ-শুভ্র কোন দিনই স্বাধীনতা নিয়ে 'লেক্‌চার' দিয়ে বেড়ায়নি, কিন্তু নির্বাক হয়ে রইল সে। বাদ-প্রতিবাদ করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। চাকরি করলেও যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে, তথাকথিত স্বাধীন ব্যবসায়ীরাই যে সত্যিকারের দাসখৎ-লেখা গোলাম—এ কথা তার মনে এল, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুল না। বাবা শেষ পর্যন্ত কি বলেন, তাই শোনবার জন্যে সভয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল সে।

শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, রজত ছবি আর গুণ্ডামি নিয়ে মেতেছে, হীরক লেনিন-ট্রটস্কি-স্টালিনের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছে। আমার আশা ছিল, বুড়ো বয়সে তোমার হাতে 'বিজ্‌নেসে'র ভারটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারব। কিন্তু তুমি যদি চাকরি করবে ঠিক করে থাক, তাহলে আমাকেই শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ঘানি টানতে হবে। উপায় কি? কেবল দেখবার লোকের অভাবে আমলকীগুলোতে ছাতা ধরে গেল। আমি একা আর কত দিক দেখি!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, চাকরিতে মাইনে কত?

দুশো।

বেশ, আমিই তোমাকে মাসে দুশো টাকা দেব, আমারই কাজ কর তুমি। শাক্‌চিতে একটা 'নিগোশিয়েট' করতে হবে, কালই চলে যাও।

শশাঙ্ক-শুভ্রের গাম্ভীর্য ভেদ করে একটা চাপা হাসি ফুটে বেরুবার চেষ্টা করছিল। বাছাধন এইবার কি করেন দেখা যাক! শঙ্খ একটি কথারও প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্র প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলেন, শঙ্খ প্রতিবাদ করবে ঠিক। রজত-হীরককে যেমন জোয়ালে জোতা গেল না, একেও যাবে না। চাকরি করবার ছুতোয় এও ঠিক ফসকে পালাবার চেষ্টা করছে। আসল উদ্দেশ্য—কাব্য করে বেড়ানো। কিন্তু টাকা না হলে যে আজকালকার জগতে কিছু হবার উপায় নেই এবং 'বিজনেস'ই যে সে টাকার মূল—এ কথা কিছুতে বুঝবে না আজকালকার ছোকরারা। শঙ্খ কোন প্রতিবাদই করলে না। মাসিক দুশো টাকা বেতন নয়, সাহিত্যই যে তার চাকরি নেবার প্রেরণা—এ কথা সে তার অতিশয়-বস্তুতান্ত্রিক পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে যে বিফলকাম হত, তা নয়। শশাঙ্ক-শুভ্র প্রতিবাদ প্রত্যাশাই করছিলেন মনে মনে। কিন্তু তাঁর একটা কথা শশাঙ্ক-শুভ্রের সমস্ত যুক্তিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল—'আমাকেই শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ঘানি টানতে হবে। উপায় কি?'—সে চুপ করে রইল।

শশাঙ্ক-শুভ্র আর একবার আড়চোখে তার দিকে চেয়ে একবার পাইপ ধরালেন। তা হলে কি ঠিক হল, শাকচি যাচ্ছ তো কাল?

বেশ।

শশাঙ্ক-শুভ্র পুত্রের এই সুমতিতে বাইরে খুব উল্লসিত হয়ে উঠলেন অবশ্য, কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন একটু। সে রুখে দাঁড়ালে তিনি যেন খুশি হতেন। শঙ্খ চলে যাবার পর পাইপটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে তিনি ভাবলেন, ছেলেটা কেমন যেন গোবরগণেশ গোছের। 'বিজনেস' ও ঠিক পারবে কি?

দ্বিতীয় উপল এল বাসন্তী—বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

একটি মাত্র মেয়েকে একবার ভাল লেগেছিল তার, তাও দূর থেকে। অবিরাম সান্নিধ্যের সংঘর্ষে সে ভাল-লাগা বিবর্ণ হয়ে যায়নি। তাই ভাল লাগা ব্যাপারটা ঘিরে মনে মোহ ছিল। তার ধারণা ছিল, চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, আলোর কাছে যেমন ছুটে আসে বিচিত্র-পক্ষ পতঙ্গ অজানা অন্ধকার থেকে, তার মনের টানে তেমনই আবির্ভূত হবে তার জীবনসঙ্গিনী অকস্মাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে। কোথায় কখন তা ঠিক নেই, এবং ঠিক নেই বলেই স্বপ্নটা আরও মধুর, প্রত্যাশাটা আরও মদির। দোকানে গিয়ে বাছাই করে জুতো জামা কেনার মত কুমারীদের হাটে গিয়ে সে পাত্রীনির্বাচন করবে না কখনও, করতে দেবেও না কাউকে। মানসী মূর্ত হবে নিজেই একদিন সহসা। সে আহরণ করবে না, অভ্যর্থনা করবে। বাসন্তীর প্রস্তাব শুনে স্বপ্নচারীর হঠাৎ জাগরণ হল যেন রূঢ় বাস্তব-লোকে। সব ঠিক হয়ে গেছে! হয়তো সে প্রত্যাখান করত—এই একটি বিষয়ে অন্তত নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখবার চেষ্টা হয়তো করত সে; কিন্তু ছোট দাদু এতে জড়িত আছেন শুনে তার উদ্যত রসনা সংযত হয়ে গেল। ছোট দাদুর সম্বন্ধে শঙ্খর যে দুর্বলতা আছে, তা অজ্ঞাত ছিল না বাসন্তীর। কতদিন কত আলোচনা হয়েছে এ নিয়ে তার সঙ্গে। সোম-শুভ্রের চিঠিখানা বাসন্তী হাতে করেই এনেছিল। পাত্রীর মাতামহের সঙ্গে সোম-শুভ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই তিনি সোম-শুভ্রকে প্রথমে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, যদি তিনি বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারেন এই আশায়। উত্তরে সোম-শুভ্র যা লিখেছিলেন, তা মোটেই আশ্বাসজনক নয়। পাত্রী-পক্ষ ভিন্ন পথে গিয়ে হংস-শুভ্র, শশাঙ্ক এবং বাসন্তীকে ধরে সফলকাম হন। কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে যাবার পর সোম-শুভ্রের চিঠিখানা তাঁরা দেখিয়েছিলেন শশাঙ্ক এবং বাসন্তীকে। বাকি ছিল শঙ্খর মত নেওয়া। বাসন্তী সোম-শুভ্রের চিঠিখানা অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করলে।

সোম-শুভ্র লিখেছিলেন—

সুহৃদ্বরেষু, আপনার দৌহিত্রী শ্রীমতী তনিমার সহিত, শঙ্খ-শুভ্রের বিবাহ হইলে আমি অতিশয় সুখী হইব। কিন্তু আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে করা কঠিন—প্রায় অসম্ভব। যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করা তত কঠিন নয়, কারণ সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইলে অপমানের বেদনাটা তেমন নিদারুণভাবে বাজে না, যেমন বাজে প্রত্যাখ্যানটা নিকটতম প্রিয়জনের নিকট হইতে আসিলে। শশাঙ্ককে আমি কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি, কিন্তু বিধির বিধানে তাহার পুত্র শঙ্খর সহিত আমার পরিচয় পর্যন্ত নাই। দেখা হইলে পরস্পরকে চিনিতে পারিব না। কিন্তু তাই বলিয়া সে আমার কম প্রিয় নয়। বরং তাহাকে কাছে পাই নাই বলিয়া সে প্রিয়তর। তাহার অনেক গুণের কথা নানা লোকের মুখে শুনিয়াছি। জীবনে হয়তো কখনও তাহাকে কাছে পাইব না ভাবিয়া মাঝে মাঝে সত্যই আমার ক্ষোভ হয়। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। তনিমা যে সর্ববিষয়ে

তাহার উপযুক্তা পাত্রী, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিবাহ হইলে আমি খুবই সুখী হইব। কিন্তু এ বিষয়ে তাহাকে অথবা তাহার অভিভাবকদের আমি কোন অনুরোধ করিতে পারিব না। সে অধিকার স্বেচ্ছায় আমি একদিন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। পরিত্যক্ত বেদখল ভূমিতে পদার্পণ করিবার লোভ থাকিলেও সাহস আমার নাই। এ বিবাহ হউক—সর্বান্তঃকরণে আমি ইহা ইচ্ছা করি। আমার এ ইচ্ছার মর্যাদা তাহারা দিবে কি না তাহা নিশ্চিতরূপে জানি না বলিয়াই এ বিষয়ে তাহাদের কোন অনুরোধ করিতে পারিলাম না। আমার অবস্থা বুঝিয়া আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আশা করি, কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার লউন। কল্যাণীয়দের আশীর্বাদ দিবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীসোম-শুভ্র মুখোপ্যাধায়

চিঠি পড়ে তার মনের যে অবস্থা হল, তা অবর্ণনীয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাটা সহসা যেন বহুগুণ বেড়ে গেল। ইতিপূর্বে ছোট দাদুর আর একখানা চিঠিও সে দেখেছিল তার এক ব্রাহ্ম-বন্ধুর বাড়িতে। ধর্ম ও কুসংস্কার সম্বন্ধে তাতে তিনি সুন্দর একটি উপমা দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, পুঁজের সমস্ত উপকরণ যেমন রক্তের মধ্যে আছে, কুসংস্কারের সমস্ত উপাদানও তেমনই ধর্মের মধ্যেই আছে। একটা মৃত এবং আর একটা জীবন্ত, তফাত শুধু এইটুকু।....কেবল এই উপমাটির জন্যেই ছোট দাদুকে সে মাথায় করে রেখেছে মনে মনে। বড় দাদু যে ছোট দাদুর প্রতি অবিচার করেছেন—এ কথাও বারংবার মনে হয়েছে তার। অনেক বার ইচ্ছে হয়েছে ছোট দাদুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসবার। বড় দাদুর কথা ভেবে পারেনি। বড় দাদুর রাগটাকেও না হয় অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু সত্যি সত্যি দুঃখ পান যদি! বড় দাদুর দোষ অনেক আছে, কিন্তু তাঁর মনে দুঃখ দেওয়ার কল্পনাও সে করতে পারে না। তাঁর কত অসঙ্গত আবদার যে রক্ষা করেছে সে! বি. এ. তে ইকনমিক্স্ নিলে আরও ঢের বেশি ভাল করতে পারত, কিন্তু তাঁর অনুরোধে সংস্কৃত নিতে হল। হিঙ্গুল গ্রামে জগদ্ধাত্রী-পুজো উপলক্ষ্যে কলেজের দলবল নিয়ে গিয়ে অভিনয় করতে হল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। সেই পাড়াগাঁয়ে সংস্কৃত কে বুঝবে! অবুঝ বড় দাদু কিন্তু ছাড়লেন না। ছোট দাদু কখনও কোন অনুরোধ করেননি, করবার সুযোগই পাননি। নির্বাসিত ছোট দাদুর অদেখা মুখটা ভাববার চেষ্টা করলে সে। মনে হল, সে যেন দেখতে পাচ্ছে, আত্মসম্মানী ছোট দাদু অপ্রতিভ অপ্রস্তুত মুখে কি যেন একটা বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না।....

অনুক্ত অনুরোধটা মূর্ত হয়ে উঠল যেন চোখের সামনে।

।। তিন ।।

তনিমা এঁদো গলি নয় বরং ঠিক উলটো। সে যেন মোগল-হারামের অতি সুসজ্জিত বিশ্রামকক্ষ অপরূপ, কিন্তু রহস্যময়। প্রবেশপত্র নিয়ে প্রবেশ করলেও মনে হয়, অনধিকার প্রবেশ করেছি। গা ছমছম করে। সম্মানিত অতিথির আসনে বসেও এ সম্ভাবনা মন থেকে

তিরোহিত হয় না। যে, যে কোনও মুহূর্তে একটু বেচাল হলেই চক্ষের ইঙ্গিতে পরদার অন্তরাল থেকে ছোরা-হাতে হাবসী খোজা বেরিয়ে আসতে পারে।। রূপসী বিদুষী মিষ্টভাষিণী ধনীর দুল্যালী তনিমাকে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু ধরা যায় না; তার সঙ্গে আলাপ করা যায়, কিন্তু অন্তরঙ্গতা জন্মে না। ভাবে ভঙ্গীতে, ভ্রূর ঈষৎ কুঞ্চনে, আঁখি-পল্লবের সামান্য-কম্পনে তার যে সত্তা আত্মপ্রকাশ করে, তা অবজ্ঞা করাও যেমন কঠিন, তার অস্পষ্টতায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করাও তেমনই শক্ত। তার ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের আসল স্বরূপটি যে ঠিক কি, তা সে নিজে পুরোপুরি কখনও ব্যক্ত করে না—হয়তো নিজেই জানে না; বস্তুত, এ সম্বন্ধে তার সঙ্কোচই আছে যেন, আভাসে ইঙ্গিতে তা প্রকট হয়ে পড়লে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের মর্মোদ্‌ঘাটন না করতে পারলে তো কিছুই করা যাবে না—পারলেও কিছু করা যাবে কি না, এ ভয়েও শঙ্খর হয় মাঝে মাঝে।.... রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতাটা একদিন আবেগভরে তাকে পড়ে শোনাচ্ছিল, হঠাৎ লক্ষ্য করলে, তার চোখের দৃষ্টিতে নাসিকার আকুঞ্চনে যে ভাব প্রকাশিত হয়েছে, তাকে কিছুতেই ভাল-লাগা বলা চলে না—নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ওষুধ গিলছে যেন! কবিতাটি পড়ে শেষ করতে হল, কিন্তু কণ্ঠস্বরের আবেগটা শেষ পর্যন্ত রইল না। পড়তে পড়তেই সে ভাবতে লাগল, রবীন্দ্রনাথের এমন কবিতা ওর ভাল লাগছে না! কেন? অত্যন্ত বেশি যৌন বলে? বিবস্ত্রা রমণীটির পদপ্রান্তে নিরস্ত্র মদন যে পরাজয় স্বীকার করলে, তা রমণীটির মানসিক কোন উৎকর্ষে মোহিত হয়ে নয়, তা তার ''ললাটে অধরে উরু'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়'' মধ্যহ্ন-রৌদ্রের ঝলক দেখে—এতেই ওর রাগ হল নাকি! আজকালকার আলট্রা মডার্ন মেয়েদের মত এও নিজেব দেহটাকে উপেক্ষা করে মন-সর্বস্ব হয়ে উঠেছে বোধ হয়। কবিতা শেষ করে কিন্তু তার দিকে যখন চেয়ে দেখলে, তখন সে চোখ নীচু করে মুচকি মুচকি হাসছে। শঙ্খর মনে হল, এটা বোধ হয় ও ভণ্ডামি করছে তার খাতিরে। ওর আসল রূপ পরিস্ফুট হয়েছিল ওর অজ্ঞাতসারে একটু আগে। তার গালে ছোট্ট একটি টোক্কা মেরে অন্তরঙ্গতার অভিনয় করে সে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু সহধর্মিণীর স্বধর্মের কোন পরিচয় না পেয়ে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে রইল সে। তাকে খোশামোদ করে বশ করা অথবা জোর করে দখল করা এ দুয়ের কোনটাই শঙ্খ-শুভ্রের মনঃপূত নয়। সে চাইছিল মুগ্ধ হতে এবং মুগ্ধ করতে কোন কিছু আস্ফালন না করে। কিন্তু কি করলে যে তা হবে, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না সে।...মোগল-হারামের সুসজ্জিত কক্ষে একা বসে সে অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছিল, পরদা সরিয়ে শাহজাদী কখন আসবেন—তনিমার অপরূপ দেহ-দেহলীতে কখন এসে দাঁড়াবে তনিমার সেই প্রকৃতি, যার আসার অপেক্ষা করে আছে তার সংযত পৌরুষ অবিচল নিষ্ঠাভরে। কিন্তু কিছুতেই সে আসছে না। পরদার ওপার থেকে কখনও নূপুর-শিঞ্জনে, কখনও পাদুকার শব্দে, কখনও কলহাস্যে, কখনও হঠাৎ-চীৎকারে, কখনও সোহাগ-বচনে, কখনও ভর্ৎসনার সুরে, কখনও সরবতায়, কখনও নীরবতায় যে মূর্তি আভাসিত হচ্ছে, তা এত পরস্পর-বিরোধী যে, কোন একটা বিশেষ ছবিতে সেগুলোকে শঙ্খ-শুভ্র খাপ খাওয়াতে পারছে না। একটা ছবি যেই গড়ে তোলে, অমনই আর একটা ছবি এসে অবলুপ্ত করে দেয় সেটাকে। 'বিজয়িনী' পড়ার পরদিনই সে শুনতে পেলে, পাশের ঘরে শুক্তি-

মুক্তার কাছে সে খুব আবেগভরে 'গীতগোবিন্দ' পড়ছে—"অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণম্!" আগের দিনের ধারণাটা ঘুচে গেল। 'গীতগোবিন্দ' যার ভাল লাগে, বিজয়িনী' তার খারাপ লাগবার কথা নয়। আর একদিন দেখলে, কীট্‌সের 'ওড টু সাইকি' পড়ছে মন দিয়ে, তার পরদিন 'ওমর খৈয়াম'। তার পরদিন আবার অন্য রকম—একেবারে 'হেল্‌প্‌স এসেজ'। ওয়াল্‌ট্‌ হুইটম্যানও পাওয়া গেল একদিন বালিশের তলা থেকে। হীরকের সঙ্গে কমিউনিজ্‌ম নিয়ে একদিন খুব তর্ক করলে, মনে হল, ওসবের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধাই নেই বুঝি। হঠাৎ একদিন উপবাস করলে। কেন—জিজ্ঞেস করাতে বললে, খেতে ইচ্ছে করছে না। সন্ধ্যেবেলায় দেখা গেল, জওহরলাল নেহেরুর ছবিতে একটা মালা দুলছে। তখন শঙ্খর মনে হল, আজ জওহরলালকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু উপবাসের কারণ যে জওহরলাল, কিংবা ফুলে মালা যে তনিমাই ঝুলিয়েছে, তা কিছুতেই সে স্বীকার করলে না। জিজ্ঞেস করাতে মুচকি হেসে বললে, আমার বয়ে গেছে জওহরলালকে নিয়ে মাথা ঘামাতে!—কিছুতেই যেন ধরা-ছোঁওয়া যায় না তাকে। এমন কি সে গম্ভীর প্রকৃতির, না লঘুপ্রকৃতির; শান্ত, না, চঞ্চল; তাও ঠিক করে বোঝবার উপায় নেই। শুক্তি-মুক্তা যখন আসে (এবং প্রায়ই আসে তারা, তনিমা তাদেরই কলেজের নাম-করা মেয়ে), তখন তাদের সঙ্গে নিজের তেতলার ঘরে হাসি-গান হুল্লোড়ে মেতে থাকে যে ব্যক্তি, শঙ্খর কাছে তার আর এক রূপ—টিপটপ কেতাদুরস্ত। আবার শ্বশুড়-শাশুড়ীর কাছে, এমন কি ছোট পিসীর কাছেও, একেবারে নিরীহতার প্রতিমূর্তি সে যেন! অথচ যে রকম ছেলেমানুষির সঙ্গে এ ধরনের দুষ্টুমি ঠিক মানায়, ততটা ছেলেমানুষ যে সে নয়, তার প্রমাণেরও অভাব নেই। রজত-হীরকের সম্পর্কে পুলিস যখন বাড়ি খানাতল্লাশি করতে এল, তখন একমাত্র তনিমাই বাড়ির মধ্যে মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিল। পারিবারিক মর্যাদা বজায় রেখে পুলিস-অফিসারের সঙ্গে যে ভাবে সে কথা কইলে, তাতে শুধু শঙ্খ নয়, সবাই অবাক হয়ে গেল। মা এই নিয়ে কিছুদিন পরিচিত-মহলে সাড়ম্বরে গল্প করবার সুযোগ পেলেন। তারপর রজত যখন অপ্রত্যাশিতভাবে কাজলকে বিয়ে করে বসল, তখন তনিমা সব দিক বাঁচিয়ে যে ভাবে তাকে ভদ্ররূপ দিলে, তা কোন ছেলেমানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। না, তনিমাকে ছেলেমানুষ বলা যায় না। আড়াল থেকে শঙ্খ লক্ষ্য করেছে, সে যখন আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়, কিংবা যখন একলা বসে সেলাই করে বা পড়ে, তখন তার মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে তা তরলমতি কিশোরীর নয়, রহস্যময়ী যুবতীর। কিন্তু সে রহস্যলোকে প্রবেশের পথ শঙ্খ খুঁজে পাচ্ছে না কিছুতেই। সে ওর প্রেমে পড়তে চায়, কিন্তু কিছুতেই তা হয়ে উঠছে না—ক্রমাগত ভদ্রতা করে অভিনয় করে যেতে হচ্ছে খালি।

বাবার 'বিজ্‌নেসে' ঢুকেও তার ঠিক এই দশা। সে ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করছে নিজেকে উপযোগী করে তোলবার, চেষ্টার কোন ত্রুটি তার নেই, কিন্তু কিছুতেই যেন পেরে উঠছে না। শশাঙ্ক-শুভ্র মাঝে মাঝে বাহবা দিয়ে উঠলেও তার নিজের বিবেকের কাছে সে একবারও বাহবা পাচ্ছে না। দোষ যে সব সময় তার নিজের তাও নয়, সে কিন্তু দোষী করছে নিজেকেই। অসৎ কর্মচারীকে বিশ্বাস করে প্রথম বার ঠকে, সৎ কর্মচারীকে অবিশ্বাস করে ঠকতে হচ্ছে দ্বিতীয় বার। তৃতীয় বার ঠকছে নিজেই সব

করতে গিয়ে সব দিক সামলাতে না পেরে। বহু চোরের মাঝখানে একজন সাধুর, বহু ইতরের মাঝখানে একজন ভদ্রলোকের, বহু মূর্খের মাঝখানে এক জন পণ্ডিতের যে দুর্দশা, 'বিজ্‌নেস'-জগতে ঢুকে শঙ্খ-শুভ্রেরও ঠিক সেই দুর্দশা হয়েছে। সে কিন্তু হার মানবে না। সেই ছেলেবেলায় কাশীতে সে যেমন ভেঙে পড়েনি, নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, সারা জীবন ধরে নানা বিরুদ্ধে অবস্থাতেও সে যেমন পরাজয় স্বীকার করেনি, এখানেও করবে না। ব্যবসাতে যখন নামতে হয়েছে, নিখুঁতভাবেই করবে সেটা। ভেঙে পড়লে চলবে না। তাই সে কাব্যগ্রন্থের ওপর ব্লু-বুক রেখে, রেডিওতে গানের বদলে 'কর্মর্শ্যাল নিউজ' শুনে, পূর্ণিমা -সন্ধ্যায় বাড়ির নির্জন ছাদের পরিবর্তে সারা হ্যারিসন রোড ক্লাইভ স্ট্রীটে ঘোরাঘুরি করে, নানা জাতের দালাল-ফড়ে-গোলাদার -আড়তদারদের ন্যক্কারজনক সান্নিধ্যে এসে প্রাণপণে চেষ্টা করছে বাণিজ্য-রসে নিমগ্ন হতে। কিন্তু নিমগ্ন হবার মত সাগর সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। সর্বত্রই হাঁটু-জল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্যাচ-পেচে কাদা। কিন্তু তবু সে সাহেবী সুট পরে, পোর্টফোলিও বগলে করে এই কর্দমাক্ত পথেই ছপাৎ ছপাৎ করে হেঁটে চলেছে সেই সাগরের উদ্দেশ্যে, জনশ্রুতি—যার তলায় লক্ষ্মী থাকেন।...হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে কিন্তু এখনও সে নিজেকে আবিষ্কার করে নিজের সেই নির্জন জগতে, যেখানে কালো-ধবল পালক-মেঘ সূর্যালোক-স্পর্শে মহিমময় হয়ে উঠেছে নির্মল নীল আকাশের বুকে, যেখানে নির্জন দ্বিপ্রহরে সমস্ত প্রকৃতি, এমন কি মধ্যগগনের জ্বলন্ত সূর্য পর্যন্ত, তন্ময় হয়ে শুনছে কপোতকণ্ঠের মৃদু করুণ কাকালী-ধ্বনি।...হঠাৎ আবার আত্মস্থ হয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে সে।

তনিমাকে সে পেয়েও পায়নি, 'বিজ্‌নেস' -জগতে ঢুকেও সে ঢুকতে পারে নি। তবু একদিন জানা গেল, তনিমা সন্তান-সম্ভবা এবং তার বিজ্‌নেসে লাভ হয়েছে। সবাই উল্লসিত হল, সে কিন্তু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে রইল।...এই সময় শোনা গেল, রজত-শুভ্রের একখানা ছবি বন্ধু-মহলে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মানুষের ছবি নয়, কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও ছবি নয়, একটা ছোরার ছবি। প্রকাণ্ড একখানা ছোরা বিরাট একটা হৃৎপিণ্ডকে যেন বিদীর্ণ করছে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। শঙ্খের মনে হল, রজত কি করে নিজের মনের মত পথ খুঁজে পেয়েছে? কে জানে! অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

রজত-শুভ্র

।। এক ।।

রজতও নিজের মনের মত পথ খুঁজে পায়নি। তার স্বভাবের মধ্যে বিধাতা যে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির সমাবেশ করেছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই সে দুই শক্তির বিপরীত আকর্ষণে সে কেবল বিপর্যস্তই হয়েছে, এক পাও অগ্রসর হতে পারেনি। ছেলেবেলা থেকেই সে শিল্পী, ছেলেবেলা থেকেই সে গোঁয়ার। সৃষ্টির স্বপ্নে তন্ময় হয়ে যাবার ক্ষমতা তার যেমন ছিল, ধ্বংসের তাণ্ডবে মেতে ওঠবার ক্ষমতা তার চেয়ে কিছু কম ছিল না। প্রবল এই দুই শক্তির দুর্নিবার তাড়নায় যে কখনও সৃষ্টি করত, কখনও ধ্বংস করত। স্কুলে যখন পড়ে, তখন একবার তাল তাল মাটি নিয়ে ভারা বেঁধে দিনরাত খেটে বিরাট এক মহাবীরমূর্তি খাড়া করেছিল সে বাড়ির উঠানে। মূর্তি শেষ হয়ে গেলে সবাই প্রশংসা করতে লাগল। রজত নিজে কিন্তু একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখলে, তারপর বললে, না কিছু হয় নি। বলেই ক্ষান্ত হল না, তার পরদিন লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে সে মূর্তিকে চুরমার করে ফেললে। কারও মানা শুনলে না। সে যে কত ছবি এঁকেছে আর ছিঁড়েছে, কত পুতুল গড়েছে আব ভেঙেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আর ধ্বংসকর্তা মহেশ্বর যেন পাশাপাশি বাসা বেঁধেছেন তার মনের মধ্যে, পালনকর্তা বিষ্ণুকে বয়কট করে। ভয়ানক খুঁতখুঁতে মন, কিছুতেই কোন জিনিস পছন্দ হয় না। তা ছাড়া আত্মসম্মান-জ্ঞান অতিশয় প্রবল। কোন কিছু খারাপ, তা ছবি বা পুতুল যাই হোক, তার নামে চলবে—এ সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। কল্পনায় যা ফুটেছে, বাস্তবে ঠিক যতক্ষণ সেটা না ফোটাতে পারছে, ততক্ষণ তৃপ্তি নেই, ক্রমাগত ছিঁড়বে আর ভাঙবে সে। গোঁয়ার বলে কারও সঙ্গে মিলত না তার। ক্লাসের অধিকাংশ ছেলের সঙ্গে ভাব ছিল না, বাড়িরও অধিকাংশ লোকের সঙ্গে না। বিরক্তি চেপে রেখে কারও সঙ্গে ভদ্রতা করতে পারত না সে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যে হয় গাড়োল, না হয় চোর, না হয় চাকর, না হয় পাজি—এই বদ্ধমূল ধারণাকে বাঙ্ময় করতে কোন সঙ্কোচ হত না তার। কাউকে গ্রাহ্যই করত না, স্কুলের মাস্টারের সঙ্গে মারামারি করে বসল একদিন। বাড়িব মধ্যে একটি লোককে সে সম্ভ্রম করত, ইন্দু-পিসীকে। ইন্দু-পিসীর প্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে, পরিমিত কথাবার্তায় এমন একটা আত্মসম্মানের আভা ফুটে বেরুত যে, রজত মুগ্ধ হয়ে যেত মনে মনে। আর ভালবাসত দুটি লোককে—দাদাকে আর দাদুকে, তাদের নানা দোষ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও। বাবা-মাকে ভয় করত এবং তাদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত যথাসাধ্য। শঙ্খ-শুভ্রের ভালমানুষি দুচক্ষে দেখতে পারত না, কিন্তু চমৎকৃত হয়ে যেত তার অনাড়ম্বর বীরত্ব দেখে, চুপচাপ থাকে, কিন্তু ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট হয়। কোন উচ্চবাচ্য না করে নীরবে কাশী চলে গিয়ে মাথা কামিয়ে টিকি রেখে টোলে ভরতি হয়ে যেতে পারে কেবল দাদুর মান রাখবার জন্যে! স্পোর্ট্‌সে নামতে চায় না, কিন্তু নামলেই ফার্স্ট। অথচ মুখে কথাটি নেই, সর্বদাই যেন সঙ্কুচিত হয়ে আছে। দিনরাত বই নিয়ে লাইব্রেরিতে বসে থাকত যে ব্যক্তি, সে বাবার কথায় সাবানের কারখানায় আর পাটের গুদামে ঘুরে

বেড়াচ্ছে এবং নাম করছে সেখানেও। মনে মনে তারিফ করত সে দাদাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করত, বেশ করে ঝাঁকানি দিয়ে বুঝিয়ে বলে, এ কি করছ তুমি? কেন করছ? একবার পরের মন যুগিয়ে চলতে শুরু করলে কি অন্ত পাবে তার? ইচ্ছে করত, কিন্তু বলতে পারত না। শঙ্খ-শুভ্রের চোখে-মুখে অনির্বচনীয় কি যে একটা আছে, যার বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ওপর তেমন শ্রদ্ধা ছিল না তার। মহাত্মা গান্ধীর ওপরই ছিল না। ওটেন সাহেবকে ঠেঙিয়েছিল যে সুভাষ বোস, সেই ছিল তার আদর্শ। সুভাষ বোসের সঙ্গে গান্ধীর যখন মিলছে না, তখন গান্ধীর কথা শোনার দরকার নেই, এই ছিল তার সোজা হিসেব। অত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ফ্যাখ্যার ধার ধারত না সে। সুবিধে পেলেই সায়েব ঠেঙাত। এ বিষয়ে দাদুর সহানুভূতি আছে বলেই দাদুর সঙ্গে তার ভাব। একবার ফুটবলের মাঠে এক গোরার সঙ্গে মারামারি করে যখন পুলিস-কেসে পড়ল সে, তখন গোঁয়ার্তুমির জন্যে উপদেশ আর বকুনি দিতে কেউ কসুর করেননি, গান্ধী-ভক্ত ছোটকাকার চোখ দিয়ে জলই বেরিয়ে পড়েছিল, দাদুই কেবল হঠাৎ বলে বসলেন, বংশের মুখ বক্ষা করেছিস তুই। অনর্গল টাকা খরচ করে বড় বড় ব্যারিস্টাব লাগিয়ে মকদ্দমা লড়লেন এবং জিতলেন। বাড়ির মধ্যে দাদুই তার বন্ধু। দাদুর কাছে কোনও কথা গোপন করে না সে। ইন্দু-পিসির কাছেও অবশ্য করে না। দাদুর সঙ্গে সৌহার্দ্যের ফলেই কিন্তু পলিটিক্সে ঢুকতে হল তাকে। দাদু সেদিন কথাটা অমনভাবে মাথায় ঢুকিয়ে না দিলে সে এসব নিয়ে মাথাই ঘামাত না বোধ হয় জীবনে। গুণ্ডামি আব ছবি আঁকা নিয়েই জীবন কাটত তার। ঘটনাটা সামান্যই। এক বন্ধুর বিয়েতে মদ খেয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারেনি সে। মা-বাবাকে মিছে কথা বলেছিল। কিন্তু দাদু আর ইন্দু-পিসী যখন জিজ্ঞেস করলেন, তখন মিছে কথা বলতে বাধল। এঁদের কাছে কখনও সে মিছে কথা বলেনি। ইন্দু-পিসী শুনে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলেন, দাদু কিন্তু বোমার মত ফেটে পড়লেন। সামনে থেকে সরে পড়তে হল। চুপচাপ কাটল সমস্ত দিন। রজত ভাবলে, দাদু মা-বাবাকেও বলে দেবেন বোধ হয়। কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না তিনি। সন্ধ্যের সময় তাকে আড়ালে ডেকে বললেন, দেখ্ বাজে মদ খেয়ে শরীর নষ্ট করিসনি। মদ যদি খেতেই চাস, আমার পরামর্শ নিস। এককালে আমি ও-বিষয়ে ওস্তাদ ছিলাম। মুগ্ধ হয়ে গেল রজত। ইন্দু-পিসীও কিছু বললে না। কিছুদিন পরে তার আর্টিস্ট বন্ধুদের একটা পার্টি দিয়েছিল সে। আর্টিস্ট বন্ধুদের পার্টিতে মদের ব্যবস্থা না করলে অঙ্গহানি হয়। দাদুর পরামর্শ চাইতে তিনি শুধু ভাল ভাল মদের নামই বলে দিলেন না, সে সবের দামও দিয়ে দিলেন, একটুও আপত্তি কবলেন না, কোন নীতি-উপদেশ দিলেন না। কিন্তু একটু হেসে যে কথাটি বললেন, তা রজতের আত্মসম্মানকে আঘাত করল হঠাৎ। বললেন, আজকাল খদ্দর-চরকার দিনে এ বিলিতী নেশাটা আউট অব ডেট। বড় পেছিয়ে আছিস তুই দেখছি। সে পেছিয়ে আছে? সে-ই তো অগ্রণী! সবাই যখন হয় ডিগ্রী, না হয় বিজনেস, না হয় পলিটিক্স, না হয় ধর্ম নিয়ে উন্মত্ত, তখন সেই তো বাড়ির মধ্যে একা আর্টের সাধনায় তন্ময় হয়ে আছে, যে আর্টে টাকা নেই, নাম নেই, যা গতানুগতিক নয় এবং সেই জন্যেই যা সর্বযুগের সভ্যতম মানুষের ধ্যানের বিষয়, যা মানুষকে সৃষ্টিকর্তার সমকক্ষ করে তোলে, সেই আর্টের চর্চা করছে সে, সে আউট অব ডেট। দাদু বলে কি!

হংস-শুভ্রের কথাটা কিন্তু টাইম বমের মত নীরবে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল তার মনে। বিস্ফোরণ হল প্রায় মাসখানেক পরে মেকলে-সাহেবের লেখা বাঙালী-বর্ণনাটা পড়বার পর। সঙ্গে সঙ্গে হাতের আস্তিন গুটিয়ে বলে উঠল সে, স্পর্ধাতো কম নয় লোকটার! সেই দিনই স্বদেশী হয়ে গেল সে। মদ ছাড়লে, কলেজ ছাড়লে, খদ্দর ধরলে। সাহেব গ্রন্থকারদের লেখা সমস্ত ইতিহাসের বইগুলো পুড়িয়ে

ফেললে স্তূপাকার করে। এর পর থেকে চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হত বিশেষ করে সাহেবদের সেই কীর্তিগুলির ওপর, যা শুনলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে, বলতে ইচ্ছে করে—ভগবতী বসুন্ধরে, দ্বিধা হও। সাহেব দেখলেই হাত নিসপিস করত, রাগে গিসগিস করে উঠত আপাদমস্তক। যারা আমাদের এতটা হীনচক্ষে দেখে, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আপোস চলতে পারে না। যারা আমাদের টিকিট থাকা সত্ত্বেও ফার্স্টক্লাস গাড়ি থেকে কান ধরে নামিয়ে দেয়, লাথি মেরে পিলে ফাটায়, জালিয়ানওয়ালা-বাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করেও যারা আস্ফালন করে, মিস মেয়োকে দিয়ে বই লেখায়, আমাদের দেশের সম্মানিত বড়লোকেরা যাদের দেশের হোটেলে পয়সা দিয়েও স্থান পায় না কেবল কালো রঙের জন্যে, আমাদেরই শিল আমাদেরই নোড়া নিয়ে উপকার করবার ছুতোয় যারা আমাদের দাঁত ভাঙছে অহরহ, তাদের মহত্ত্ব দেখে আর যে-ই মুগ্ধ হোক, রজত-শুভ্র হবে না। যে পলিটিক্স সম্বন্ধে তার বিতৃষ্ণা ছিল, যার জন্যে সে ছোটকাকাকে, হীরককে কত ঠাট্টা করেছে, সেই পলিটিক্সের জালে সেও জড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রমশ। ছবি আঁকা ছেড়েই দিলে দিনকতক। তার কেবলই মনে হতে লাগল, এই লাথি, জুতো, অপমানের হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে তো কিছুই করা যাবে না। এ অবস্থায় আর্ট-চর্চা করা খাঁচার পাখির বুলিকপচানোর মত হাস্যকর ব্যাপার। তবু কিন্তু এই হাস্যকর ব্যাপারেই উন্মত্ত হয়ে পড়ত সে মাঝে মাঝে এসব সত্ত্বেও। খাঁচার কোকিল যেমন নিজের বন্দীত্ব ভুলে কুহু-কুহু করে ওঠে মাঝে মাঝে, সেও তেমনই মেতে উঠত রঙ আর তুলি নিয়ে। ঘরে খিল দিয়ে আপন মনে এঁকে ছবির পর ছবি—বাস্তব ছবি, অবাস্তব ছবি, সম্ভব অসম্ভব কত রকমের ছবি। ভুলে যেত পরাধীনতার গ্লানি, ভুলে যেত বাইরের জগৎ, এমন কি নাওয়া-খাওয়ার কথাও মনে থাকত না তার সব দিন। মনের আকাশে ইংরেজ-বিদ্বেষের মেঘ বজ্রবিদ্যুতে ঘন-ঘোর হয়ে উঠত কিছুদিন, তখন অস্বস্তিতে অধীরতায় অনিদ্রায় পাগলের মত অবস্থা হত তার। হঠাৎ তারপর কোথাকার এক খেয়ালী দমকা-হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত সেসব, কোথা থেকে ছুটে আসত রঙিন আলোর বন্ধ-হারা প্রবল বন্যা, কালো মেঘের টুকরোগুলোকে বিপর্যস্ত করে দিত বহুবর্ণের তরঙ্গতাণ্ডবে। কিছুদিন পরে আবার থেমে যেত সব। ছবির ছেঁড়া টুকরোগুলো উড়ে বেড়াত বাগানে উঠোনে ছাতে রাস্তায়। প্রতিবাদ করতে সাহস করত না কেউ। প্রতিবাদে সে সহ্য করত পারত না। উলটো ফল হত। কলেজ যাওয়া নিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র একদিন বকা-ঝকা করলেন খুব। বললেন, কলেজ যেতেই হবে তোমাকে।

কিছুতেই যাব না আমি।

কলকাতার বাড়ি ছেড়ে হাজির হল গিয়ে দমদমে দাদুর বাড়িতে এবং সেই দিনই দাক্ষা হল তার।

হংস-শুভ্র সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ এত অনুগ্রহ! এ কি, খদ্দর পরে ভদ্দরলোক হয়েছ দেখছি।

মদও ছেড়ে দিয়েছি।

বাঃ

কলেজও।

কলেজও? এখন কি করবে তা হলে? খালি সাহেব ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বেড়াবে?

রজত-শুভ্র হাসলে একটু।

সমস্ত দিনটা করবে কি? ছবি আঁকবে? ভাল।

নাতিকে হংস-শুভ্র চিনতেন, বেশি ঘাঁটাতে সাহস করলেন না।

বাবার মত আপনিও কলেজ যাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করবেন নাকি? তা যদি করেন, তা হলে এখান থেকেও পালাব।

পেড়াপেড়ি করবার মত জোর নেই আমার, বুড়ো-হয়েছি।

রজত-শুভ্র আর অধিক বাক্যালাপ না করে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। বাড়ি ঢোকবার মুখেই তারাপদর সঙ্গে দেখা।

তারাপদ, আমি এসেছি, মাংস আনতে দাও।

তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ইন্দু এখানে রয়েছে যে!—বলেই তারাপদ শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে, ইন্দু কাছাকাছি কোথাও নেই তো? সে শুনতে পেলে আবার এক কাণ্ড করে বসবে। তার বৈধব্যের জন্যে যে বাড়ির কারও সামান্যতম অসুবিধে হবে এ কিছুতেই বরদাস্ত করবে না সে। আশ্চর্য মেয়ে! তার দ্বিতীয় স্বামী কিছুদিন আগে মারা গেছে। এমন মেয়ে যে, মরবার সময় একফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেলেনি এবং তার পর থেকে বরাবর এমন হাসিমুখে রয়েছে যে ওর সামনে যেতে তারাপদর ভয় করে। ও যদি গলা ফাটিয়ে কাঁদত, তারাপদ করবার মত কিছু একটা পেত। কিন্তু নিজের জন্যে ও কাউকে কিছু করতে দেবে না, এমন কি সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পর্যন্ত দেবে না। ইন্দু কাছাকাছিই ছিল। তারাপদর কথাও শুনতে পেয়েছিল সে।

বেরিয়ে এসে বললে, ও, রজত এসেছিস! মাংস আনাও না তারাপদ, আমার নাম করে হাঙ্গামার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছ বুঝি! আমার কোন আপত্তি নেই।

না, এতে আর হাঙ্গামাটা কি?

পাশ কাটিয়ে সরে পড়ল তারাপদ।

রজত গিয়ে ঢুকল ইন্দুর ঘরে?

হঠাৎ এসে পড়লি যে?

বাবা কলেজ যাবার জন্যে রোজ তাড়া দিচ্ছেন। পালিয়ে এলাম।

আর যাবি না?

না!

কেন? মহাত্মা গান্ধীর ওপর ভক্তি হয়েছে?

ওরকম নিরামিষ লোকের ওপর আমার ভক্তি হয় না!

তবে?

যে কারণে মদ ছেড়েছি, খদ্দর পরেছি, সেই কারণে কলেজেও আর যাব না।

কি সেটা?

ইংরেজদের ওপর রাগ। যারা প্রতি পদে আমাদের এত অপমান করে, তাদের কোনও রকম সংস্পর্শে থাকতে চাই না।

তা হলে ছবি আঁকাও ছাড়তে হয়, রঙগুলোও সব বিলিতী।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে রজত বললে, তাও ছাড়ব তা হলে।

ঝোঁকের মাথায় বলে বসল।

ইন্দু খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। চোখের দৃষ্টি তার উজ্জ্বল হয়ে এল ক্রমশ—ভেতরে যেন একটা আলো জ্বলে উঠল ধীরে ধীরে।

ওদের সংস্রব ত্যাগ করলেই কি আমাদের দুঃখ কমবে?

কি করতে বল তা হলে?

সত্যিই যদি এর প্রতিকার করতে চাও, তা হলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। আবেদন-নিবেদনে কিছু হবে না, অহিংসার ঢঙ করেও কিছু হবে না। যে তোমার গালে চড় মারবে, তার নাকে ঘুষি লাগাবার মত সাহস সংগ্রহ করতে হবে।

সাহসের অভাব নেই। কিন্তু সাহস প্রকাশ করি কোথায়? খেলার মাঠে গোরা ঠেঙিয়ে মন ভরে না।

উপায় বলে দিতে পারি। কিন্তু শোনবার আগে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

কি?

এ কথা কাউকে বলতে পাবে না।

বেশ।

সেই দিনই দুপুরবেলা অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা নিলে রজত-শুভ্র। সমস্ত শুনে বললে, বেশ, রাজী আছি।

ভাল করে ভেবে দেখ, যদি না পার, এ কাজে নেবো না!

নিশ্চয়ই পারব।

মুখ বুজে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।

পারব।

আচ্ছা, দেখি কেমন পারিস। বাঁ হাতের আঙুল কপাটের ফাঁকে ঢুকিয়ে দে দিকি।

বাঁ হাতের আঙুল? কেন, কি করবে?

তুই দে না।

রজত আঙুল ঢুকিয়ে দিলে।

এবার বন্ধ করি কপাট?

ও, আচ্ছা, কর।

আঙুলটা পিষে গেল। রজতের মুখের একটি পেশী বিচলিত হল না। রক্তাক্ত আঙুলে টিংচার আয়োডিনের পট্টি বাঁধতে বাঁধতে ইন্দু-শুভ্রা বললে, তুই পারবি মনে হচ্ছে।

রজত-শুভ্রের আর্টিস্ট সত্তা নেপথ্যে তখন হাসছিল মুখ টিপে।

।। দুই ।।

ঠিক কিছুদিন আগে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেল। সে অধিবেশনে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেলেই সন্তুষ্ট থাকব—মহাত্মাজীর এই প্রস্তাবে দেশের যুবকদের, বিশেষত বিপ্লবপন্থীদের, মন একেবারে ভেঙে গেল। তারা যেন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলে, এই নিরীহ আপোস-উন্মুখ ব্যক্তিটির নেতৃত্বে এ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার কোন আশা নেই। স্বাধীনতা পেতে হলে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। এঁর ভরসায় বসে থাকলে চলবে না। সারা দেশময় দেখা দিতে লাগল নানা নামের যুবক-সঙ্ঘ। কলকাতায় মহাসমারোহে হয়ে গেল 'ইউথ কংগ্রেস,' উদ্দীপনা আরও বাড়ল যতীন দাসের মৃত্যুতে। রজত মেতেছিল এই সব নিয়ে, হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্র অন্তর্ধান করলেন একদিন তাঁর তেতলার ঘর থেকে। কিছুদিন আগে হীরক ধরা পড়েছিল। এদের দুজনের কারও মতের সঙ্গে

যদিও সে সায় দেয়নি কখনও, তবু পর পর এদের দুজনের অন্তর্ধানে তার মনে হল, ঠাস ঠাস করে দুগালে দুটো চড় মেরে গেল যেন কেউ। ক্ষোভে অপমানে যেন দম-বন্ধ হয়ে গেল, মনে হল, প্রতিকার কিছু একটা না করতে পারলে আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমন অসহায়ভাবে আর কত মার খাব আমরা! ঘুরে ঘুরে বেড়াল কয়েকদিন অনিশ্চিতভাবে। যে দলে যোগ দিয়েছিল, অবিলম্বে প্রতিকারের কোন উপায় তারাও বলতে পারলে না কিছু। ইন্দু-শুভ্রা বললে, ছটফট করো না, যথাসময়ে করবার মত কাজ পাবে। ছোটকাকা বা হীরকের কথা তত তীব্রভাবে তাকে চঞ্চল করছিল না, বস্তুত তাদের সম্বন্ধে অনুভূতির তীব্রতাটা কমেই আসছিল দিন দিন, তাকে চঞ্চল করে তুলেছিল, কিছু একটা করবার আগ্রহ। অলস প্রতীক্ষার নিষ্ক্রিয়তা আর সে সহ্য করতে পারছিল না। হঠাৎ একদিন দাদুর কাছে গিয়ে হাজির হল।

কিছু টাকা চাই।

টাকা! কত টাকা?

হাজার খানেক অন্তত।

কি হবে অত টাকা নিয়ে?

ছোটকাকার খোঁজে বেরুব। তোমরা তো কেউ কিচ্ছু করছ না।

উত্তরটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক এ কথা ভেবে সে যায়নি। সে কোথাও বেরিয়ে পড়তে চাইছিল, যেখানে হোক। হংস-শুভ্র মনে মনে হয়তো খুশি হলেন, কিন্তু মুখে বললেন, তার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

মাথা থাকলেই মাথা ব্যথা করে মাঝে মাঝে।

হংস-শুভ্রের মুখের ওপর চোটপাট জবাব রজত ছাড়া আর কেউ দিতে সাহস করে না।

তোমাদের যার যা খুশি করবে আর টাকা দিয়ে আমি তা সামলাব, টাকা আমার অত সস্তা নয়।

রজত চলে যাচ্ছিল, হংস-শুভ্রকে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠতে হল এবং খোশামোদ করে চেকখানা গুঁজে দিতে হল হাতে।

রজত কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। কারও সঙ্গে দেখা করবার দরকার অনুভব করলে না সে, এমন কি ইন্দু-শুভ্রার সঙ্গে পর্যন্ত না। হাওড়ার দিল্লী-এক্সপ্রেস ছাড়ছিল, তারই একখানা টিকিট কিনে উঠে বসল সে তাতে। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় একা বসে বসে দুধারের চলমান দৃশ্য দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ পরে সে যেন সমস্ত সমস্ত ভুলে গেল। দেশের দুঃখ, জাতির অপমান, ছোটকাকা, হীরক——কিছু মনে রইল না তার। দ্রুত গতিতে দ্রুত-পরিবর্তনশীল নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে কেমন অনায়াসে ছুটে চলেছে সে। এরই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বসে রইল সে অনেকক্ষণ। কিছুক্ষণ পরে কখন যে সে অন্যমনস্ক হয়ে সুটকেস থেকে খাতা পেনসিল বার করেছে, তা তার খেয়াল নেই। যখন জ্ঞান হল, তখন দেখলে, খাতাটায় ছবির পর ছবি—অনেকগুলো ছবি এঁকে ফেলেছে সে। ইন্দু-শুভ্রার সঙ্গে কথা হবার পর থেকে রঙ আর কেনেনি সে। দেশী পেনসিলে দেশী ড্রয়িং-কাগজের ওপরই শখ মেটাতে হত তাকে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠত দেশী জিনিসের অযোগ্যতায়। ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত সব। তবু কিন্তু বিলিতী জিনিস কিনতে প্রবৃত্তি হত না আর। মনে হত, বিলিতী জিনিস কিনতে যাওয়া মানে মেকলে আর মাইকেল ও'ডায়ারদের কৃপাপ্রার্থী হতে যাওয়া। তা সে মরে গেলেও হবে না। ছবিগুলো উলটে উলটে দেখলে সে কয়েকবার। একটাও মনের মত হয়নি। কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে সবগুলো। তারপর মনে হল, কোথায় চলেছে

সে? কেন চলেছে? ছোটকাকাকে কোথায় খুঁজে পাবে? তা ছাড়া সত্যিই আর ছোটাকাকার জন্যে প্রাণ কাঁদছে না তো! কোনদিনই কাঁদেনি। বরং কাকীমার জন্যে কষ্ট হয় তার। ছোটকাকা দেশের জন্যে অনেক ত্যাগস্বীকার করেছেন তা ঠিক, কিন্তু সমস্তই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। যে গান্ধী স্বরাজ পাবার একটা দিন স্থির করে শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারলেন না, আকারে ইঙ্গিতে ব্যবহারে যিনি ক্রমাগত বামপন্থীদের বিরোধীতাই করে চলেছেন, অথচ নিজে কিছু করতে পারছেন না, তাঁর মধ্যে ছোটাকাকা যে কি দেখতে পেয়েছেন, তা তিনিই জানেন। পুলিসের কাছে অহিংসার বাণীর মূল্য কি? যে কন্‌স্টেব্‌লটার রুলের ঘায়ে তাঁর মাথা ফাটল, সে কি কোনদিন তাঁর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মর্ম বুঝবে? সে যতদিন লাঠি চালাবার জন্যে মাইনে পাবে, ততদিন লাঠি চালিয়ে যাবে। হীরকও জেলে গেল অত্যন্ত বাজে একটা ব্যাপার মাথা ঘামাতে গিয়ে। টাইফয়েড-রুগীর পায়ের কড়া সারাবার চেষ্টা করার মত হাস্যকর ব্যাপার ওটা। দেশ স্বাধীন হলে কুলি মজুর আপামর ভদ্র সবাই নিস্তার পাবে। বিশেষ করে ওদেব নিয়ে অস্থির হয়ে পড়বার কি দরকার ছিল এখন? সর্বপ্রথম দরকার স্বাধীনতা, ইংরেজদের কবল থেকে নিজেদের উদ্ধার করা।....হঠাৎ রজত ঠিক করে ফেললে, দেশের যেখানে যত যুবক-প্রতিষ্ঠান আছে, সব কটার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। এরাই এখন দেশের আশা-ভরসা। দিল্লীতে নেবে সে টিকিট কাটলে লাহোরের। লাহোরে নেমে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করলে। গাড়োয়ানকে বললে, জেলে নিয়ে চল। জেলে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেবে জেলের গেটের সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে সে। এই জেলে যতীন দাস মারা গেছে, এই জেলে এখনও আছে ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত। জেলের পাহারাওয়ালা, গাড়ির গাড়োয়ান—দুজনেই বিস্মিত হল। নওজোয়ান ভারতসভার অনেক সভ্যের সঙ্গে আলাপ হল তার লাহোরে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগটাও দেখে এল একদিন। তারপর গেল পুণা। মহারাষ্ট্র জেগে উঠেছে আবার। কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্র যুবক-সঙ্ঘ জওহরলালকে সভাপতি করে বিরাট এক সভা করেছিল। বালগঙ্গাধর তিলকের দেশে গিয়ে রজত যেন নতুন প্রাণ পেল। নতুন করে সে যেন অনুভব করলে, আবেদন-নিবেদন আপোস-উপবাস চরকা-রামনামে কিছু হবে না। স্বাধীনতা-অর্জন করতে হবে বাহুবলে, রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জন দিয়ে। বেশি নয়, দেশের এক হাজার যুবক যদি প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, তা হলেই হবে। তেত্রিশ কোটি লোক যে দেশে, সে দেশে এক হাজার যুবক পাওয়া যাবে না? তখনই মনে হল, বিবেকানন্দও চেয়েছিলেন, কিন্তু পাননি। কিন্তু বিবেকানন্দ পাননি বলে তো হতাশ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। পুণা থেকে সে গেল নাগপুরে, নাগপুর থেকে বেরার। দু জায়গাতেই সুভাষ বোস সভাপতি হয়েছিলেন ছাত্র-সঙ্ঘের অধিবেশনে। সেখান থেকে মাদ্রাজ বোম্বাই বেনারস ঘুরে সে যখন দেশে ফিরল, তখন সে পুরোপুরি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক। ভারতব্যাপী বিরাট অগ্নিকাণ্ডের একটি আয়োজন করে ফিরেই কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল মহাত্মাজীর কাণ্ড দেখে। লাহোর কংগ্রেসের পর লোকটি অপ্রত্যাশিত সুর বদলে ফেলেছে। সত্যাগ্রহের আগুন লেগে গেছে সারা দেশে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পড়ে তাক লেগে গেল তার। মহাত্মাজী লিখছেন—None should find himself free or alive at the end of the effort! শুরু হয়ে গেল তার দাণ্ডি-অভিযান, বিরাট একটা উন্মাদনা শুরু হয়ে গেল সারা দেশ জুড়ে। শুধু লবণ-আইন নয়, সব রকম আইন অমান্য করতে লাগল সবাই। দেশবন্ধুর স্বরাজ-আন্দোলনের পর এত বড় নাড়া বাংলা দেশকে আর কিছুতে দেয়নি। সবাই মেতে উঠল যেন। যুবকদের নেতা সুভাষ বোসও ঝাঁপিয়ে পড়লেন এতে, জেল হয়ে গেল তাঁর। রজতও হয়তো যোগ দিত, কিন্তু যে দলের সঙ্গে গোপনে যোগ দিয়েছিল সে, তার দলপতির আদেশ না পেলে কিছু করবার উপায় ছিল না

তার। সে নিরুপায় হয়ে দেখতে লাগল নিরীহ সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিসের অত্যাচার। লাঠি বন্দুক দিয়ে যতটা সম্ভব, সবই হতে লাগল। মেদিনীপুর শ্মশান হয়ে গেল, বারদোলি থেকে দলে দলে লোক পালাতে লাগল ভিন্ন গ্রামে। ভর্তি হয়ে গেল সমস্ত জেল। নতুন জেল তৈরি হল। জেলের বন্দীদের ওপরও লাঠি চলতে লাগল। একদিন খবর পাওয়া গেল, আলিপুর জেলে সুভাষ বোস, যতীন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, প্রফেসর নৃপেন বাড়ুজ্জে, 'লিবার্টি'র সম্পাদক বক্‌শি মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এ খবর পেয়ে রজত যেন ক্ষেপে গেল। ক্ষেপে হয়তো কিছু করে ফেলত একটা, কিন্তু ঠিক সেই সময় এল দলপতির আদেশ—এক বাক্স রিভল্‌ভার পৌঁছে দিতে হবে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের কাছে।....বেরিয়ে পড়ল রজত একদিন অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে।

এর পর থেকে রজতের জীবনের রঙ যেন বদলে গেল কিছুদিনের জন্যে। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে—কখনও হাঁটাপথে, কখনও নৌকা করে, কখন ও ফকিরওয়ালা সেজে, কখনও ধর্মশালায় কখনও আস্তাবলে কাটিয়ে রিভল্‌ভারের বাক্স সে ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু আর বেশি কিছু করবার সুযোগ সে পায়নি। আর্মারি রেডে অংশ নেবার লোভ থাকলেও হুকুম পায়নি সে। যেদিন আর্মারি রেড হয়ে গেল, সেদিন সে পাটনায়। পাটনায় এসে সে খবর পেল, মিঃ স্লোকম্ব্ নামক একজন সাহেব র্জানালিস্ট্ মহাত্মাজীর সঙ্গে জেলে দেখা করে একটা মিটমাট করবার চেষ্টায় আছেন নাকি। এ সব নিয়ে বেশিক্ষণ মাথ ঘামাবার অবসরই সে পেল না, অবিলম্বে তাকে ফিরে আসতে হল কলকাতায় রিভল্‌ভার সংগ্রহের জন্যে। তার ওপর ভার পড়েছিল, আরও কিছু রিভল্‌ভার সংগ্রহ করে মেদিনীপুরে বিতরণ করে আসার। উগ্রতর কোন কর্তব্য পেলে সে সুখী হত। কিন্তু যে পাঞ্জাবী যুবকটি তাদের দলপতি ছিল, সে বললে, রিভল্‌ভার ছোঁড়বার লোক অনেক আছে, কিন্তু রিভল্‌ভার সংগ্রহ করবার লোক বেশি নেই, তোমাকেই এ ভারটা নিতে হবে। এতে চমকপ্রদ কিছু নেই, কিন্তু এইটেই আসল কাজ।You must play the part of the root to feed the flowers.....তাই মাটির অন্তরালে শিকড় যেমন থাকে, আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনদের অন্তরালে বাস করে সে তেমনই রসদ সংগ্রহ করতে লাগল বিপ্লবীদের জন্যে। মিশতে হল জাহাজের দেশী বিদেশী খালাসীদের সঙ্গে তারাই ভিন্ন-দেশ থেকে রিভল্‌ভার কিনে এনে বিক্রী করে। চোর-ডাকাত-বাটাপাড়েরও খোশামোদ করে বেড়াল সে কিছুদিন। তারাও নানা স্থান থেকে চুরি করে আনে রিভল্‌ভার। দিনকতক মন্দ লাগল না। গোপনে গোপনে বেপাড়ার অন্ধকার গলিতে খুঁজিতে, খিদিরপুরডকে, সিনেমা-হলে, গড়ের মাঠে, পড়ো বাড়িতে, বহুবিধ বিচিত্র প্রাণীর রহস্যময় সংস্পর্শে এসে রজতের শিল্পীমন যেন লণ্ডন-রহস্যের বিপজ্জনক 'পরিস্থিতি'তে এক অপূর্ব রসে অভিভূত হয়ে রইল দিনকতক। কিছুদিন পরেই, কিন্তু এর নোংরামিটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে। কতদিন আর এই ইতর লোকগুলোর খোশামোদ করে বেড়ানো সম্ভব? এর মধ্যে যেটুকু অভিনবত্ব তা দুদিনে ফুরিয়ে গেল, অবশিষ্ট রইল এর একঘেয়েমি আর নোংরামি। চোরের মত অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানো, পুলিস দেখলে সশঙ্ক হয়ে পড়া, অতিশয় হীনচরিত্রের গুণ্ডাকে প্রচুর টাকা দিয়ে হাতে রাখা, সর্বদাই একটা ছদ্মবেশ ধরে অনর্গল মিছে কথা বলা,—কিছুদিন পরে হাঁপিয়ে উঠল রজত-শুভ্র। তার মনে হতে লাগল, না না, এর মধ্যে কোন মহত্ব নেই। রূটের পার্ট সে প্লে করতে পারবে না, যদি ওর মধ্যে থাকতেই হয়, ফ্লাওয়ারই হবে সে। দলপতি কিন্তু রাজী হলেন না। বললেন, ভাল না লাগলেও ডিসিপ্লিনের খাতিরে তোমার কর্তব্য তোমাকে করতে হবে।

....তবু রজত-শুভ্র একদিন পিছু নিলে এক সাহেবের। দুপুরের একটা চলতি ট্রামে উঠে বসল সে সাহেবটার পাশে। ট্রামে আর কেউ ছিল না। সাহেবটা জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল। পাশ

থেকে তার মুখটা ভাল করে দেখতে গিয়ে এক কাণ্ড ঘটে গেল। হঠাৎ সে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। বাঃ, কি চমৎকার প্রোফিল! রেশমের মত চুলগুলো ফুরফুর করে উড়ছে, টকটকে লাল কানটা, কি বলিষ্ঠ চোয়াল, চিবুকের গড়ন কি সুন্দর! রিভল্‌ভারের একগুলিতে এমন সুন্দরী সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ফেলবে? এ তো কোনও অপরাধ করেনি! তার অন্তরাত্মা বলে উঠল, না না না। তুমি স্রষ্টা, তুমি শিল্পী, সৃষ্টি করাই তোমার ধর্ম, সুন্দরকে নষ্ট করবে কেন তুমি? টপ করে নেমে পড়ল সে ট্রাম থেকে এবং উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘুরতে লাগল রাস্তায় রাস্তায় লোডেড রিভল্‌ভারটা পকেটে করে।...ঘুরতে ঘুরতে মনে পড়ল দলপতির কথা। তিনি বলেছিলেন দোষী-নির্দোষী বিচার করবার প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা যাকে পাব, তাকেই মারব। এ দেশে ওদের জীবন দুর্বহ করে তুলতে হবে। Make the soil unsuitable for their growth ....এসব কথা ভেবেও কিন্তু মনে জোর পেলে না সে। উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরতেই লাগল।....

.....অনেকদিন পরে ঠিক সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল সে চুপ করে। অনেকদিন থেকেই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না তার বড়। বাইরের সিঁড়ি দিয়ে কখন আসত, কখন যেত, টের পেত না কেউ। শশাঙ্ক বা বাসন্তী ঘাঁটাতে সাহস করতেন না তাকে। জানতেন, প্রতিবাদ করলে সে আরও বেঁকে বসবে। লাহোর-পুণা-বোম্বাই ঘুরে আসবার পর শশাঙ্ক আর একবার পিতার কর্তব্য পালন করবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, বাড়িতে এমন শুয়ে বসে কাটানোর চেয়ে একটা কাজ করাই তো ভাল।

রজত উত্তর দিয়েছিল, কাজ তো করছি।

কি কাজ?

বলতে পারি, যদি আপনি ওয়ার্ড অব অনার দেন যে, সে কথা কাউকে বলবেন না।

ক্ষণকাল নীরব থেকে বিস্মিত শশাঙ্ক বললেন, বেশ, বল।

আমি টেররিস্ট্‌ মুভমেন্টে কাজ করছি।

চমকে গেলেন শশাঙ্ক। নিজের যৌবনের দিনগুলো মুহূর্তে ভেসে উঠল মনের ওপর, শ্রদ্ধা হচ্ছিল, এমন সময় প্রৌঢ় পিতার বিজ্ঞতা অবলুপ্ত করে দিলে সব।

বললেন, এককালে আমিও ওসব হুজুক করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—। রজতের চোখের দিকে চেয়ে কিন্তু থেমে যেতে হল তাঁকে।

থেমে যেতেই রজত বললে, এ বিষয়ে কোনও তর্ক আমি করব না। আপনি যদি জোর করে এ নিয়ে আলোচনা করেন, এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাকে।

ভীতু শশাঙ্ক-শুভ্র চকিতে পুত্রের মুখের দিকে একবার চেয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। এরপর এ বিষয়ে আর কোনও আলোচনা করেননি তিনি। বাসন্তীকেও করতে দেননি। সে যে মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে, এইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন তাঁরা।......ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সবিস্ময়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল রজত। বিস্ময়ের প্রধান কারণ আত্ম-আবিষ্কার। হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করে যেন চমকে গিয়েছিল সে। এতদিন বিপ্লবের যে ধ্বজাটা সে আস্ফালন করে বেড়িয়েছে, তা যে নিতান্তই বাহ্যাড়ম্বর—এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছিল, কিন্তু অস্বীকার করবারও উপায় ছিল না। শত্রুকে নাগালের মধ্যে পেয়ে হঠাৎ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সত্যিই পেছিয়ে এল সে। অমন একটা সুন্দর জিনিসকে নষ্ট করতে কিছুতেই হাত উঠল না তার। ইন্দু-পিসী শুনলে বলবে কী? ইন্দু-পিসীর শানিত-হাস্য-দীপ্ত মুখখানা কল্পনায় যেন দেখতে পেলে সে। এবং তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যেন

তড়াক করে উঠে বসল। আমার যা খুশি আমি করব, কার কি বলবার থাকতে পারে তাতে? ইন্দু-শুভ্রার কল্পিত প্রতিবাদের উত্তরে মনে মনে এই কথাগুলো আবৃত্তি করে অনেকদিন পরে নিজেব পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটি জ্বেলে সে ছবি আঁকতে বসে গেল।

দুয়ারে টোকা পড়ল।

কে?

আমি, তনিমা।

ও, এস বউদি।

তনিমা ঘরে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেল ছবিটা দেখে।

বাঃ, কার মুখ এটা?

একটা সাহেবের। চমৎকার নয়?

হ্যাঁ, বেশ সুন্দর। এখন কিন্তু খাবে চল। কাটলেটগুলো ভাজছি, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভাল লাগবে না।

হঠাৎ কাটলেট?

শুক্তি-মুক্তা এসেছে, তাদের খাওয়াচ্ছি করে।

ও।

শুক্তি-মুক্তার ঘন ঘন আসাটা রজত তেমন পছন্দ করত না। অন্য কোন কারণে নয়, তার মনে হত, এখানে বার বার এসে ওরা যেন খুড়ীমাকে অপমান করছে। খুড়ীমা যখন নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে এত কাণ্ড করেছেন, তখন তাঁর মেয়েরা এমন ভাবে গায়ে-পড়ে এখানে আসে কেন? নবনীর নির্লিপ্ততা ভাল লাগত তার। খেতে বসে এই শুক্তি-মুক্তাই কিন্তু তাকে নতুন পথের ইঙ্গিত দিলে। রাজনৈতিক আলোচনা উঠল। শুক্তি-মুক্তার কথার ভাবে বোঝা গেল, তারাও বিদ্রোহিনী। মেয়ে দুটোকে যত অপদার্থ ভেবেছিল, ঠিক তত অপদার্থ নয় তারা। দুজনেই সুভাষ বোসের ভক্ত। সুভাষ বোসের চরম পন্থায় তারা আস্থাবান। মহাত্মাজীও শেষকালে যে চরমপন্থী হয়ে উঠে আইন অমান্য শুরু করেছেন, এতে তারা মহাখুশি। তাদের মতে এখন সকলেরই উচিত মহাত্মাজীর পতাকার তলে এসে দাঁড়ানো। রজত তাদের সামনে কিছু না বললেও—বয়ঃকনিষ্ঠদের সামনে অতিশয় স্বল্পভাষী সে চিরকালই—মনে মনে ভেবে দেখলে যে, বিপ্লব-পন্থা ত্যাগ করে দেশের রাজনীতির সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে হয়, তা হলে গান্ধী-পন্থী হওয়াই উচিত। লুকিয়ে-চুরিয়ে লোক খুন না করে ব্যাপকভাবে আইন-অমান্য-আন্দোলনই চালানো উচিত যতক্ষণ না আমরা পূর্ণ-স্বাধীনতা পাচ্ছি। কংগ্রেস যখন এত বড় বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে পেরেছে সারা দেশে, তখন কংগ্রেসে যোগ দেওয়ারও আর কোন সঙ্গত বাধা নেই। বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা লাভ করাই তো উদ্দেশ্য।

এরপর কিছুদিন কংগ্রেসের কাজে উৎসাহী হয়ে উঠল সে। যদিও দেশের সব নেতা জেলে, যারা বাইরে আছে তারাও পুলিসের লাঠির চোটে নিস্তেজ হয়ে আসছে ক্রমশ। তবু এখনও থামবার সময় হয়নি, রজতের মনে হল। এখনও দেশে এত লোক আছে যে, দশ বছর এ সত্যাগ্রহ চালানো যায়, এবং তাই চালাতে হবে। ছবি-আঁকা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত উৎসাহভরে সে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে বেড়ালে কিছুদিন আবার মহিষবাথানে যাবার জন্যে। সতীশ দাশগুপ্ত, সুরেশ বাঁড়ুজ্জে জেলে গেছে তো কি হয়েছে? রজত নিজেই যাবে এবার। ওদের দেখিয়ে দিতে হবে যে, দেশে লোকের অভাব নেই।

হঠাৎ নীল আকাশ থেকে বজ্রপাত হল।—গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট। তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল

যেন। লোকটা আবার আপোস করতে উদ্যত হয়েছে! জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত প্রতিবাদ করলেন না! প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকে সহযোগিতা করতে দেশ যে কারণে অস্বীকার করেছিল, সে কারণ কি অন্তর্হিত হয়েছে? দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেস যাবে কোন্ মুখ নিয়ে? সদাশয় আরুইন কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন কেবল অহিংস-রাজবন্দীদের জন্যে। রজতের মনে হল, কেন, দেশের জন্যেই কি সবাই কারাবরণ করেনি? এক দলকে ছেড়ে দিয়ে আর এক দলকে আটকে রাখবার মানে? মহাত্মাজী চুপ করে রইলেন। শোনা গেল কেবল, তিনি চেষ্টা করছেন। তাঁর চেষ্টা বিফল হল যখন, তখন তিনি প্যাক্ট ভঙ্গ করলেন না, চুপ করে রইলেন। বিপ্লবপন্থীরা নিজেরাই চেষ্টা করতে লাগল জেল থেকে। গভর্মেন্টকে আবেদন জানালেন তারা যে, গভর্মেন্ট সত্যিই যদি দেশের শান্তি চান, তা হলে কেবল মহাত্মাজীর সঙ্গে প্যাক্ট করলেই হবে না, তাদের সঙ্গেও করতে হবে এবং তা তারা করতে প্রস্তুত আছে, গভর্মেন্ট যদি পুলিসের মারফৎ কথাবার্তা না চালিয়ে নিজেরা চালান। যতীন সেনগুপ্ত এ সম্পর্কে বক্সা জেলে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে দেখাও করলেন, গভর্মেন্ট কিন্তু পুলিসের সম্পর্ক ছাড়তে রাজী হলেন না কিছুতে। সব ভেঙে গেল। তাদের কথা কেউ শুনলে না, শোনাবার দরকারও মনে করলে না। মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশ্য রাজপথে পুলিস যে মেয়র সুভাষ বোসকে, এডুকেশন-অফিসার মিস্টার চ্যাটার্জিকে, লাইসেন্স-অফিসার মিস্টার ঘোষালকে ধরে মার দিলে, আইন-অমান্য-প্রতিরোধ-অজুহাতে মেদিনীপুরে, যুক্তপ্রদেশে, গুজরাটে পুলিসের যে যথেচ্ছাচার হয়ে গেল, তার কোনও অনুসন্ধান পর্যন্ত হবে না—মহাত্মাজী বড়লাটের সঙ্গে শর্ত করেছেন। রজত-শুভ্রের সমস্ত বুকটা যেন জ্বলতে লাগল। সে জ্বালা আরও বাড়ল, যখন বিঘোষিত হল সরদার বল্লবভভাই প্যাটেল আগামী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করবেন। প্রচলিত বিধি অনুসারে সভাপতি নির্বাচিত হল না, হল ওয়ার্কিং কমিটি খেয়াল অনুসারে। মহাত্মাজী লাট সাহেবের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন, তা যাতে করাচী কংগ্রেসের অনুমোদন পায়, তার ব্যবস্থা করতে ওয়ার্কিং কমিটি বদ্ধপরিকর। তা না হলে মহাত্মাজীর অপমান হবে যে! মতিলাল নেহরু মারা গেছেন, জওহরলাল 'বাপুজী'র বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। আর কারও কাছ থেকে কোন বিরুদ্ধাচরণ প্রত্যাশা করা যায় না, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার আগেই বিতাড়িত হয়েছেন। আমেদাবাদ-বম্বে-দিল্লীর বড় বড় ব্যবসায়ীরাও শান্তির জন্যে উন্মুখ, কারণ আন্দোলনে তাঁদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে যে! সুতরাং গান্ধী-আরুইন প্যাক্টকে করাচী কংগ্রেসে পাকা করবার জন্যে তাঁরা অজস্র টাকা ঢালতে লাগলেন অর্থাৎ তাঁদের মনোমত ডেলিগেট সংগৃহীত হতে লাগল, তাঁদের যাতয়াতের ভাড়া ইত্যাদির ব্যবস্থাও হয়ে গেল। লেফ্ট-উইংগাররা সব জেলে। গভর্মেন্টের চক্ষে তাঁরা নন-ভায়োলেন্ট নন বলে ছাড়া পাননি কেউ। সুতরাং বিরুদ্ধাচরণ করবে কে? সুভাষবাবু ছাড়া পেয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি একা কি করবেন? তাঁর সপক্ষে বাংলা দেশে যারা জেলের বাইরে আছে, তাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত-ঘরের যুবক, বাংলা দেশ থেকে করাচী পর্যন্ত যাবার গাড়িভাড়াই জোটাতে পারবে না অনেকে। এদের ভাড়া দেবার মত দেশ-বন্ধু আর তো দেশে নেই। হঠাৎ রজত-শুভ্র ক্ষেপে উঠল। যেমন করে হোক, একাই এর প্রতিবাদ করবে সে। কংগ্রেস শুরু হবার সাত দিন আগে হঠাৎ সে উধাও হল একদিন বাড়ি থেকে। ঝড়ের মত ছুটে চলেছিল সে দিল্লী এক্সপ্রেসে করাচীর দিকে। আর কিছু না পারুক, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বলবে সে, ভুল করছ, তোমরা ভুল করছ। এরা সব দেশের প্রতিনিধি নয়, ভাড়া-করা-লোক এরা—বড় লোকদের সুবিধা করবার জন্যে এসেছে, দেশের নয়। কিন্তু দিল্লীতে নেবেই একটা খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে। তার দেহের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। ভগৎ সিং আর তার দুজন সঙ্গীর

ফাঁসি হয়ে গেছে। যে গভর্মেন্ট কংগ্রেসের আনুকূল্য চায়, কংগ্রেস বসবার ঠিক চার দিন আগে তার এ কি ব্যবহার! এর একটি অর্থই হতে পারে, রজতের মনে হল। যারা নাম-লেখানো গান্ধী-পন্থী নয়, কংগ্রেস তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবে না, এবং গভর্মেন্ট সে কথা ভালভাবে জানে বলেই তাদের নিয়ে যা খুশি করবে। ফাঁসি দেবে, বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটকে রাখবে, তাদের বাপ-মা-ভাই-বোনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে, তাদের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখবে না। যদিও তারা ভারতের মুক্তির জন্যেই সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তাদের হয়ে একটি কথাও বলবে না, যেহেতু তারা খদ্দরের লেংটি পরে অহিংসার ভণ্ডামি করেনি দুর্গম পথে নির্ভীক বীরের মত যাত্রা করেছে স্বদেশের স্বাধীনতা কামনায়। রজতের হঠাৎ মনে হল, এ কংগ্রেসে গিয়ে লাভ কি? সেখানে কিছু বলতে যাওয়া তো অরণ্যে রোদন করা। দিল্লীর রাস্তায় পাগলের মত ঘুরতে লাগল। একবার ইচ্ছে হল, মামার বাড়িতে যাই, কিন্তু রায়বাহাদুর মাতামহর কথা মনে পড়তেই সে ইচ্ছা অন্তর্হিত হল। খুড়ীমাও এখানে আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়! কিন্তু কি জানি তিনি কি মনে করবেন, এই ভেবে তাঁর খোঁজ করবার চেষ্টাও করলে না সে। চাঁদনি-চকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরে ঘুরে অবশেষে ঠিক করলে, যাব। সুভাষবাবুর সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করা দরকার।

সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করে, তাঁর কথা শুনে আরও অবাক হয়ে গেল সে। তিনি ঠিক করেছেন, লেফ্‌টিস্টদের তরফ থেকে একটা লিখিত বিবৃতি দেবেন কেবল যে, গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট তাঁরা সমর্থন করেন না; কিন্তু প্রকাশ্য সভায় এর বিরুদ্ধাচরণ করবেন না তিনি। হেরে যাবার আশঙ্কা তো ছিলই, আর একটা কারণও তিনি দেখালেন। তিনি বললেন, কংগ্রেস বসবার ঠিক চার দিন আগে, ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি দেওয়ার অর্থ—গভর্মেন্ট চান, এই নিয়ে একটা বিরোধ হোক কংগ্রেসের মধ্যে। সুতরাং সে বিরোধ সৃষ্টি করা সমীচীন হবে না। তা ছাড়া তিনি বললেন, মহাত্মাজীকে আমরা যখন নেতা বলে মেনে নিয়েছি, তখন বিপক্ষের কাছে তাঁর মান-রক্ষা করাই কর্তব্য। সুভাষবাবুর ওপর রজতের ভক্তি ছিলই, এ কথা শুনে তা গাঢ়তর হল। তা আরও বাড়ল নওজওয়ান-ভারত-সভায় তাঁর বক্তৃতা শুনে। ভক্তি বাড়ল বটে, কিন্তু বক্তৃতায় তিনি যা বললেন, যুক্তির দিক দিয়ে তা মূল্যবান হলেও রজত-শুভ্রের রুচিকর হল না। তিনি বললেন, কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে কংগ্রেস দখল করবার চেষ্টা কর তোমরা। কংগ্রেস দখল করবার চেষ্টা মানে—নিজেদের দলে লোক সংগ্রহ করে নিজেদের ভোট বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ টাকা খরচ করে খোশামোদ করে বেড়ানো। কিন্তু দেশের টাকাওয়ালা বণিকেরা স্বার্থের খাতিরে শান্তি-প্রিয় গান্ধী-ভক্ত হয়ে উঠেছে, চাকুরেরা তো বটেই; অধিকাংশ ভদ্রলোকও হয় শান্তি-কামনায়, না হয় মহাত্মা-ভক্তিতে আন্দোলন করতে আর চায় না। এদের খোশামোদ করে বেড়াতে হবে? স্বাধীনতার জন্যে অশান্তির আগুন জ্বালাবে যারা, তাদের সাহায্যে করবার মত বোকা লোক কটা আছে? এই সব লোককে খোশামোদ করে ভজানো রজত-শুভ্রের কর্ম নয়। তার চেয়ে বরং...সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ট্রামে-দেখা সাহেবের মুখটা—বলিষ্ঠ চোয়াল চিবুক—রেশমের মত চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে।

তা হলে কি করবে সে? তার পৌরুষ ব্যর্থ হয়ে যাবে কোনও পথ না পেয়ে? সুভাষবাবুর দলে লোক-সংগ্রহ করে বেড়ানোই তার জীবনের কাজ হবে নাকি? এ কাজ সে পারবে না। হঠাৎ ঠিক করে ফেললে, ছবি আঁকব আবার। দেশের কথা ভাবলে পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'প্রবাসী' না 'ভারতী' কোথায় যেন অবনীবাবুর লেখা একটা প্রবন্ধ পড়েছিল। তার প্রথম লাইন কটা

প্রায় মুখস্থই ছিল তার। মনে পড়ল সেই লাইন কটা, ইন্দ্রনীলমণির ঢাকনা দিয়ে ঢাকা এই প্রকাণ্ড রসের পেয়ালা সামনে রয়েছে, এর ঢাকনা খুলতে বাধা কি? কত শক্ত শক্ত কাজে আমরা এগিয়ে যাই, এইটেই কি খুব দুঃসাধ্য হল? দুঃসাধ্য কথাটা উদ্দীপ্ত করে তুলল তার কল্পনাকে। ঠিক করে ফেলল, এই দুঃসাধ্য কাজই সাধ্য করতে হবে তাকে। স্বদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান অপরে করুক, তার দ্বারা হল না ওসব।

রীতিমত 'স্টুডিও'ই গড়ে তুললে আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া করে। কল্পনা-তুরঙ্গম এমন দ্রুতবেগে ছুটল যে, দেশী-বিদেশীর সম্বন্ধে হুঁশ রইল না আর বড়। বিদেশী রঙ তুলি কাগজ ক্যাম্বিস কিনতেও দ্বিধা হল না। টাকা যোগালেন হংস-শুভ্র। বস্তুত হংস-শুভ্র যেন মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। গোঁয়ারটা যা খুশি করুক, কিন্তু চোখের সামনে করুক। আজ বম্বে, কাল মীরাট, পরশু করাচী, তার পরদিন চট্টগ্রাম করে বেড়ানোর চেয়ে কতকগুলো রঙ আর তুলি নিয়ে যদি ভুলে থাকে, থাক্। তা ছাড়া মুখে যদিও তিনি রজতের ছবি নিয়ে ব্যঙ্গই করতেন, কিন্তু মনে মনে তারিফ করতেন খুব। তাই টাকা দিতে কার্পণ্য করলেন না তিনি। শশাঙ্ক-শুভ্র অবশ্য মনে মনে চটছিলেন, বাজে ব্যাপারে এতগুলো টাকা নষ্ট হচ্ছে বলে। কিন্তু কিছু বলবার উপায় ছিল না তাঁর, সাহসও ছিল না। এক হিসেবে অবশ্য নিশ্চিন্তও হয়েছিলেন তিনি, যে দলে মিশছিল তা ত্যাগ করে যদি ছবি-আঁকা নিয়ে থাকে, তাও মন্দের ভাল। তাই চুপ করে ছিলেন। তার স্টুডিওতে অবশ্য যাননি একদিনও, ওসব নন্‌সেন্স্ ভালই লাগত না তাঁর। বাসন্তী কিন্তু খুব মেতে উঠল ছেলের স্টুডিও নিয়ে। পরিচিত-মহলে আস্ফালন করার নূতন একটা বিষয় পাওয়া গেল। তার যে ছেলেকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না এতদিন, তার গুণপনা এবার দেখুক সবাই। প্রথম প্রথম রজত নিতান্ত অবহেলা ভরে যে ছবিগুলো এঁকেছিল—এক ঝাঁক প্রজাপতি, একরাশ ফুল, একটা ময়ূর, ছিড়ে ফেলার আগেই কাঙালের মত সেগুলো সংগ্রহ করেছিল বাসন্তী এবং আরও সংগ্রহ করবার আশায় প্রায়ই যেত স্টুডিওতে। যা দেখত, যা পেত, এত বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তা নিয়ে যে, রজত বিরক্ত হত।

একদিন সে বলেই ফেললে, ছবির তুমি কিছু বোঝ না মা। কতকগুলো বাজে ছবি বাঁধাচ্ছ খালি দামী ফ্রেম দিয়ে। কি হবে ওগুলো রেখে?

আমার ভাল লাগে, তাই রাখি।

কিন্তু ওগুলো যে আমার আঁকা, তা বলে বেড়াতে পারবে না সকলকে। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল বাসন্তী। মনে মনে একটু শঙ্কিতও হল। আস্ফালন করবার জন্যেই সে ছবি সংগ্রহ করছিল না কেবল, উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বেড়াজালে বন্দী করবার চেষ্টাও করছিল তাকে। ধরবার ছোঁবার আগেই হীরক জেলে চলে গেল নিঃশব্দ। একে যেতে দেওয়া হবে না, ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকাতেই হবে কোন রকমে। রজতেই তার লক্ষ্য, ছবিগুলো উপলক্ষ্য মাত্র।

যেন অসম্ভব কিছু একটা করতে বলছে, মুখের এমনই একটা ভাব করে বাসন্তী বললে, আমি কার মুখ চাপা দেব, বল্? নন্টু, ময়না, মিসেস হালদার, বক্সীর বউ—যে দেখছে, সে-ই প্রশংসা করছে। সেদিন আমার সঙ্গে সেই যে মেয়েটি এসেছিল—পূর্ণিমা ব্যানার্জি, সে তো বললে, নামজাদা ইটালিয়ান আর্টিস্টদের আঁকা ছবির চেয়েও তোর ছবি ভাল। 'খুনে' নাম দিয়ে ছবিটা এঁকেছিস, সেটা তো সে চেয়েই নিলে আমার কাছ থেকে। আমার দেবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মুখ ফুটে চাইলে যখন—

রজত ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ছবিতে রঙ দিয়ে যেতে লাগল কোন উত্তর না দিয়ে। অনেকক্ষণ

উভয়েই চুপ করে রইল। বাসন্তী ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেল। তন্ময় অথচ নির্বিকার কে এ? প্রশংসা দিয়ে কি একে ভোলানো যাবে?

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ বললে, পূর্ণিমা মেয়েটিকে কেমন লাগল তোর?

দেখিনি ভাল করে।

তোর যদি আপত্তি না থাকে তো বল্‌, সম্বন্ধ করি।

'খুনে' ছবিটা যদি ওর ভাল লেগে থাকে, তা হলে ওর সঙ্গে সারা জীবন বাস করা যাবে না।

খুনে ছবির বিষয়ে পূর্ণিমা কোন মন্তব্যই করেনি। বস্তুত কোন বিষয়েই কিছু বলেনি সে। গল্পটা বাসন্তী বানিয়ে বলেছিল। নিজের অস্ত্রে নিজেই আহত হয়ে চুপ করে রইল।

তোর খাবার টিফিনকেরিয়ারে দিয়ে গেলুম, খাস যেন মনে করে।

অত রকম খাবার আন কেন রোজ রোজ, কে খাবে অত?

আজ বেশি নেই।

বাসন্তী বেরিয়ে চলে গেল। কিছুতেই ছেলেটাকে বাগাতে না পেরে সে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়েছিল। আর কেউ না বুঝলেও তার মাতৃ-হৃদয়ের কাছে এ কথা অবিদিত ছিল না যে, এই খেয়ালের খেলাঘরে ও বাঁধা পড়েনি, আর এক খেয়ালের ঝোঁকে এক নিমেষে সমস্ত চুরমার করে দিয়ে চলে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ও।

কিছুদিন নির্বিঘ্নেই কাটল। তার কারণ, রজত নিজেই জেদ করে নিজেকে বন্দী করে রেখেছিল। খবরের কাগজ পড়ত না, পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করত না, পাছে দেখা হয়ে যায়—এই ভয়ে ট্যাক্সি ছাড়া রাস্তায় বেরুত না সে। স্টুডিওর দরোয়ানের ওপর কড়া হুকুম ছিল, বাড়ির লোক ছাড়া আর কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়। সে যেন চোখ বুজে কাণে তুলো দিয়ে বাইরের খবরকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল প্রাণপণে। সে খবর ভয়ঙ্কর, তা জানতে পারলেই শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠবে, তার হল্‌কায় শিল্পকলার সমস্ত সৌন্দর্য পুড়ে কালো হয়ে যাবে এক নিমেষে-এ ধারণা তার ছিল বলেই জোর করে সে নিজেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল রাজনৈতিক আবর্ত থেকে। বারম্বার বোঝাতে চেষ্টা করছিল মনকে— ছবির জগতেই মূর্ত কর তুমি নিজেকে। নখদন্তের নির্বিচারে ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত হও যখন, তখন পশুর জগতে তোমার স্থান নেই। নিরন্তর এই মন্ত্র জপ করে সে ক্রমাগত ছবি এঁকে যাচ্ছিল। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে একটা অস্বস্তির তুষানল ধিকধিক জ্বলছিল গোপনে গোপনে। নানা রঙের প্রলেপ দিয়েও আহত আত্মসম্মানের কুৎসিত কালো রঙটাকে কিছুতেই অবলুপ্ত করতে পারছিল না সে একেবারে।

মনে হত, ভীরু ভীতু নপুংসক আমি, তাই পালিয়ে এসেছি, যতীন ঘোষের বিধবাকে বাঁচিয়ে তার স্বামীকে হত্যা করতে পারছিল যে, সে-ই বীর। তুলি থেমে যেত। মনে পড়ত ইন্দু-পিসীর কথাগুলো, পুলিস অফিসাররা মরতে ভয় পায় না, তারা জানে যে, তারা মরে গেলে তাদের স্ত্রী-পুত্রদের গভর্মেন্ট প্রতিপালন করবে, চাকরি দেবে, জায়গীর দেবে। তাই পুলিস অফিসারটিকে মেরে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না, তাদের বংশলোপ করতে হবে। বিধবাটা বেঁচে থাকবে শুধু হাহাকার করবার জন্যে।

রজত শিউরে উঠত, প্রাণপণে চেষ্টা করত ছবিতে মন দেবার। লজ্জায় ক্ষোভে আত্মগ্লানিতে, পরিপূর্ণ হয়ে উঠত সমস্ত অন্তর।

হঠাৎ একদিন স্টুডিওতে এসে দেখলে, তার টেবিলের ওপর মোটা লম্বা খাম রয়েছে একখানা।

দারোয়ান বললে, বাইসিক্লে করে এক বাবু এসে চিঠিখানা দিয়ে গেছেন। কোন ঠিকানা নেই—খোলা খাম। তার থেকে বেরুল এক তাড়া কাগজ এবং খবরের কাগজের কার্টিং। রজত পড়তে লাগল এবং পড়তে পড়তে নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে গেল তার। করাচী কংগ্রেসের পর থেকে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক খবর লেখা ছিল, কাগজগুলোতে। সে এতদিন ইচ্ছে করেই কিছু জানতে চায়নি, জানবার পর কিন্তু পাগল হয়ে উঠল। কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী একাই চলে গেছেন বিলেতে গোল-টেবিল-বৈঠকে যোগ দেবেন বলে। কংগ্রেসের এই একমেবাদ্বিতীয়তম্ ভক্তিতে রজতের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল যেন। লর্ড আরুইনও বিদায় নিয়েছেন এবং তার পরিবর্তে এসেছেন লর্ড ওয়েলিংডন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্যাক্ট করবার দুর্বলতা দেখিয়ে পাদ্রীপ্রতিম লর্ড আরুইন ব্রিটিশ গভর্মেন্টের যে মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন, লর্ড ওয়েলিংডন সেই মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। প্যাক্টের শর্ত যে গভর্মেন্টের তরফ থেকে পুরোপুরি প্রতিপালিত হচ্ছে না, এ কথা জেনেও মহাত্মাজীর বিলেত যাবার আবেগ কিছুমাত্র কমেনি। গুজরাটের চাষীদের বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দিতে নানা বখেড়া করেছেন গভর্মেন্ট, যুক্তপ্রদেশের গরিব চাষীদের খাজনা মাফ করা হয়নি, বাংলা দেশে এখনও দলে দলে লোককে বিনা বিচারে আটক করা হচ্ছে। মহাত্মাজী শেষ-মুহূর্তে এসব সম্বন্ধে যা হোক একটা আপোস করে বিলেত চলে গেছেন। সবাই কিন্তু চুপ করে থাকেনি। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীরা ছাড়া বাকি সকলে তারস্বরে প্রতিবাদ করেছে প্যাক্টের। বাংলা দেশ প্রতিবাদ করেছে আরও সক্ষমভাবে। কিছুদিন আগেই ঢাকা-ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার অন্তরালে যে রূঢ় সত্য প্রত্যক্ষ করেছে বাঙালী, তার ফলে মিস্টার লোম্যানকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আসামীকে খোঁজবার জন্যে পুলিস বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যে কাণ্ড করছে...হঠাৎ হাত থেকে কাগজের তাড়াটা কে যেন ছিনিয়ে নিলে। রজত চমকে চেয়ে দেখলে, ইন্দু-শুভ্রা। তার চোখে মুখে যেন ঝঞ্ঝা স্তব্ধ হয়ে আছে।

অতিশয় ধীরকণ্ঠেই সে কিন্তু বললে, এ নিয়ে আর তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন, এ গুলো আমার জন্যে এসেছে।

আমি যদি ঘামাই ক্ষতি কি?

এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকার নেই তোমার। তুমি ছবি আঁক।

রজতের মনে হল, তার গালে কে যেন চড় মারলে একটা।

ইন্দু-শুভ্রা কাগজের তাড়াটা হাতে করে যাচ্ছিল।

ছোট পিসী, যেও না, একটা কথা শোন আমার।

কাগজগুলো পড়বার পর রজতের যে ব্যবহার ইন্দু প্রত্যাশা করেছিল, রজতের কম্পিত কণ্ঠস্বরে তারই আভাস পেয়ে ফিরে দাঁড়াল সে।

তোমার প্রলাপ শোনাবার অবসর আমার নেই। সত্যি যদি করতে চাও, সঙ্গে আসতে পার।

বাধ্য বালকের মত উঠে গেল রজত-শুভ্র।

পড়ে রইল স্টুডিও আর চতুর্দিকে ছড়ানো অসংখ্য ছবি।

এর পর কিছুদিন তার যে ভাবে কাটল, তার বর্ণনা সে নিজেও বোধ হয় করতে পারত না সম্পূর্ণভাবে। সব কথা সম্পূর্ণভাবে জানবার সুযোগই হয়নি তার। অন্ধভাবে যন্ত্রচালিতবৎ যে সব কাজ-তাকে করতে হয়েছে, তার কোন অর্থই সে বুঝতে পারেনি অনেক সময়ে। বোঝবার হুকুমও

ছিল না। ছবিই আঁকতে হয়েছে নানা রকম। উড়ন্ত পাখির, ঘুমন্ত শিশুর, ভিখারীর, তরুণীর, মন্দিরের, ঘড়ির, কত রকম যে তার ঠিক নেই। ছবিগুলোর সঙ্কেত যে কি, কার কাছে সেগুলো কবে কেন পাঠানো হচ্ছে, এসব কিছুই জানবার উপায় ছিল না। দিনকতক রিভলভার নিয়ে চাঁদমারি করতে হল এক অচেনা পল্লীগ্রামের জনমানবহীন ধ্বংসোন্মুখ বাগান-বাড়িতে গিয়ে। সেই নিঃসঙ্গ পুরীতে চোরের মত লুকিয়ে বাস করতে হত শুকনো পাঁউরুটি চিবিয়ে, আর যে কোনও বস্তুর ওপর গুলি চালিয়ে ঠিক করতে হত হাতের লক্ষ্য। ঠিক ছিল, পরীক্ষক আসবেন একদিন। হঠাৎ অচেনা যুবক এলেন একজন কোন খবর না দিয়েই, আবির্ভূত হলেন যেন ঝোপের ভেতর থেকে। পকেট থেকে বার করে দেখালেন তারই আঁকা উড়ন্ত পাখির ছবি, বোঝা গেল দলেরই লোক। গাছ থেকে একটা ডাব পেড়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে বললেন, মারুন দিকি। রজতের হাতের লক্ষ্য দেখে খুশি হয়ে গেলেন। বললেন, আচ্ছা, আপনি কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন। হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বরের প্ল্যাটফর্মে কালো-রঙের-সাহেবী-সুট-পরা এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করবেন আপনার জন্যে, কাল ঠিক বেলা বারোটার সময়। তিনি আপনাকে যথাস্থানে নিয়ে যাবেন। কালো-সাহেবী-সুট-পরা ভদ্রলোক তাকে নিয়ে গেলেন একটা হোটেলে। সেখানে আরও কয়েকটি যুবক অপেক্ষা করছিল। নাম লটারি করা হল। রজতের নাম উঠল না, উঠল বিনয়ের। মিস্টার সিম্‌প্‌সনকে গুলি করবার ভার পড়ল তার ওপর। রজতকে বলা হল, পরশু রাত্রে তুমি লুপ লাইনের ঘোঘা আর কহল্‌গাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গাতে রেল-লাইনের বাঁ ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে টর্চ হাতে করে। লুপ এক্‌স্‌প্রেস যখন যাবে, তখন কয়েকবার টর্চ জ্বালাবে কেবল, আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। অন্ধকার রাত্রে একহাঁটু ঘাসের মধ্যে প্রেতের মতন দাঁড়িয়ে রইল সে। যথাসময়ে টর্চও জ্বালালে, কিন্তু কেন তা জানবার উপায় ছিল না। এই ষড়যন্ত্রের বিরাট ফ্যাক্টরিতে সে যেন একটা 'নাট' কিংবা 'বল্টু' যখন যেখানে দরকার লাগানো হচ্ছে তাকে। রিভল্‌বারও সংগ্রহ করে বেড়াতে হল আবার কিছুদিন। সায়নাইডও। নানা রকম ছদ্মবেশে ধরে একজন সি. আই. ডি অফিসারের পেছনে ঘুরে ঘুরে তার গতিবিধির ইতিহাসও যোগাড় করতে হল। সুসঙ্গে কুসঙ্গে অনাহারে অনিদ্রায় পদব্রজে ট্রেনে স্টীমারে নৌকায় কত জায়গায় কত দুর্গতির মধ্যে ঘুরে বেড়ালে যে সে, তার আর ইয়ত্তা নেই। কিছুদিন পরে মনে হতে লাগল, তার দেহ-প্রাণ-মন-আত্মা কিছুই যেন তার নিজের নয়। হৃদয়ের নেপথ্যলোকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের বিদ্যুৎ চিকমিক করে উঠত। মনে হত, নির্বিচারে এমন ভাবে নিজের স্বাধীন সত্তার শ্বাসরোধ করা কি ঠিক হচ্ছে? তখনই মনে পড়ত ছেলেবেলায় পড়া সেই ইংরেজী কবিতাটা---They are not to make reply, They are not to reason why, They are but to do and die... প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে থাকত সে। বহুদিন আগে ট্রামে সাহেবের সুন্দর মুখশ্রী দেখে তার মনে যে সুকুমার-বৃত্তি জেগে উঠেছিল, সবলে তার টুঁটি চেপে ধরবার চেষ্টা করত সে। বার বার আবৃত্তি করত মনে মনে, ওসব দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, You are but to do and die। মেরে মরবার জন্যে প্রস্তুতই হয়েছিল সে মনে মনে। লটারিতে নাম উঠলে সে-ই যেত।...হঠাৎ খবর এল, সিম্‌প্‌সন মারা পড়েছে, কিন্তু বিনয়ও পালাতে পারেনি। ধরা পড়ে গেছে সে। একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। লুকিয়ে পড়ল সবাই। হ্যাঁ, ভয়ে ভয়েই। খবর এল, পুলিস তার বাড়ি সার্চ করেছে। চট্টগ্রামে, ঢাকায়, মেদিনীপুরে প্রতি ঘরে ঘরে পুলিস হানা দিচ্ছে। গ্রেপ্তার করেছে অনেককে—অনেক নিরীহ লোককে, বিপ্লবের 'ব'ও যারা জানে না। তবু চোরের মত আত্মগোপন করে থাকতে হল। পুলিসের ছায়ামাত্র দেখলে পালিয়ে যেতে হত, বেরালের ভয়ে ইঁদুর যেমন পালায়। পালিয়ে গিয়ে কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যেত

তার এ কি হীনতা! একদিন সে দলপতিকে বললে, এ রকম পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে, আসুন, আমরা প্রকাশ্যভাবে সবাই মিলে আক্রমণ করি ওদের। যদি কিছু নাও করতে পারি, ওদের গুলি খেয়ে রাস্তার মরে পড়ে থাকাও ঢের বেশি গৌরবজনক। তিনি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, ওয়েট, ইওর চান্স্ উইল কাম। কিন্তু কিছুতেই তার নাম উঠল না। পর পর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট মারা গেল মেদিনীপুরে, কিন্তু তার ভাগ্যে এক লুকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার সুযোগ এল না। কি গ্লানিকর এই লুকিয়ে থাকা! ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের লোমহর্ষক কাহিনী সব কানে আসছে, তবু লুকিয়ে থাকতে হবে নিজের প্রাণভয়ে নয়, দলের খাতিরে! অসংখ্য নিরীহ লোক নির্যাতিত হচ্ছে, কিন্তু মুখ ফুটে সত্য কথা বলবার উপায় নেই। হিজলি ক্যাম্পে রাজবন্দীদের ওপর গুলি চলল—সন্তোষ মিত্তির, তারকেশ্বর সেন মরে গেল, তবু স্থির হয়ে থাকতে হবে! শুধু বাংলা দেশ নয়, অন্যত্রও অশান্তির আগুন জ্বলছিল। পশ্চিম-সীমান্তে আবদুল গাফ্‌ফার খাঁ এবং তাঁর খুদাই-খিদামৎগাররা পুলিসের বেড়াজালে ধরা পড়ে জেলে পচছিলেন। খাজনা দিতে অসমর্থ যুক্তপ্রদেশের চাষীরা কিষাণ-সভার নেতৃত্বে আবার নো-রেন্ট-ক্যাম্পেন শুরু করেছিলেন, কিন্তু গভর্মেণ্ট নূতন অর্ডিনেন্স করে সব থামিয়ে দিলেন। সেখানেও দলে দলে লোক জেলে যাচ্ছে। হঠাৎ খবর এল, গোল-টেবিল-বৈঠক থেকে মহাত্মা গান্ধী শূন্যহস্তে বম্বেতে অবতরণ করেছেন যদিও, তবু মহাসমারোহ পড়ে গেছে সেখানে। জওহরলাল এবং সেরওয়ানি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ট্রেনেই পুলিস গ্রেপ্তার করেছে তাঁদের। দেশে যখন তুমুল ঝড় বইছে, তখনও ভস্ম মেখে দাড়ি-জটা পরে রজতকে লুকিয়ে থাকতে হবে! খবর এল, পুলিস আরও দুবার তার বাড়ি সার্চ করেছে, মাকে বউদিদিকে পর্যন্ত অপমান করেছে নাকি! বাড়ি ফিরে যাবে কি না ভাবছিল, এমন সময় বড়লাটের সঙ্গে টেলিগ্রাম-চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে মহাত্মাজী আবার শুরু করে দিলেন সত্যাগ্রহ-আন্দোলন। গভর্মেণ্টি এবার প্রস্তুতই ছিলেন। তাঁরাও কংগ্রেস-সম্পর্কিত সব-কিছুকে ঘোষণা করলেন বে-আইনী বলে। পুলিসের আইন অমান্য করে তবু কিন্তু শুরু হয়ে গেল পার্কে পার্কে মাঠে মাঠে সভা, বেরুতে লাগল বড় বড় শোভাযাত্রা পথে পথে। জওহরলাল নেহেরুর বৃদ্ধা জননী পুলিসের হাতে মার খেলেন এক শোভাযাত্রার নেত্রীরূপে, থামলেন না তবুও। শুরু হল পিকেটিং, শুরু হল বয়কট, উড়তে লাগল আবার ত্রিবর্ণ-পতাকা হাটে বাটে মাঠে, হর্ম্যে, মন্দিরে, কুটীরে, গাইতে লাগল সবাই স্বদেশী গান, তৈরি হতে লাগল নুন। কংগ্রেস-অধিবেশন দিল্লীতেই বসল, সভাপতি মদনমোহন মালবীয়কে গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও। চাঁদনি-চকের ক্লক-টাওয়ারের নীচে বসল, আমেদাবাদের রণছোড়দাস অমৃতলাল সভাপতিত্ব করলেন। পুলিস বাধা দিলে অবশ্য, কিন্তু কংগ্রেস-অধিবেশন বসল এবং কংগ্রেস তার পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা না করে ছাড়ল না। ভরে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের সমস্ত জেল। রজত যদিও গান্ধী-ভক্ত নয়, তাঁর গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়া, তাঁর সমস্ত কার্ড টেবিলের ওপর রাখা, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অহিংসা-মন্ত্র প্রচার, তাঁর প্রথমে ছলে-বলে-কৌশলে বামপন্থীদের ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা এবং পরে বেগতিক বুঝলেই অপটুভাবে তাদের অনুসরণ করা, তাঁর গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট, কথায় কথায় উপবাস, এর কোনটাই রজতের পছন্দ হত না; তবু কিন্তু সত্যাগ্রহীদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। এক-একবার ইচ্ছে করতে লাগল, ছুটে গিয়ে ওদের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে পুলিসের মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়তে, পারলে না কেবল দলের খাতিরে। স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান-লাইক হবে না বলে। অসীম কষ্ট সহ্য করে অজ্ঞাতবাসই সে করতে লাগল।...ম্যালেরিয়া ধরল, ডিসেন্ট্রি হল, খাবার ঠিক নেই, শোবার জায়গা নেই, তবু কিন্তু আত্মপ্রকাশ করলে না সে। যত কষ্টই হোক, দলের আদেশ মানতে হবে। হঠাৎ একদিন দলের একজনের সঙ্গে

দেখা হল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও রজতকে চিনতে পেরেছিল সে। আড়ালে ডেকে বললে, পালাও পালাও, বনে জঙ্গলে হিমালয়ের বর্মায় যেখানে পার, পালাও শিগগির। আমাদের দলের কয়েকজন অ্যাপ্রুভার হয়েছে, আরও হবে। যে কজনের নাম করলে, তারা সবাই রজতের পরিচিতি। এরা অ্যাপ্রুভার হয়েছে?...নির্বাক হয়ে বসে রইল সে। মনে হল পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য আর কিছু নেই যেন...পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। হঠাৎ ঠিক করে ফেললে, যে দলে অ্যাপ্রুভার থাকে, সে দলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না সে। সে দলের হুকুম মানবার প্রয়োজন নেই আর, স্পোর্ট্‌স্‌ম্যানদের সঙ্গেই স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান-লাইক ব্যবহার করা চলে, বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে নয়। আর সে অজ্ঞাতবাস করবে না, আত্মপ্রকাশ করবে এবার। পুলিস যদি ধরে ধরুক। এর মধ্যে বরং খানিকটা বীরত্ব আছে, লুকিয়ে থাকার মধ্যে নেই। জটা-দাড়ি খুলে ফেলে একটা পুকুরে নেবে ভাল করে স্নান করলে সে। স্নান করে উঠে ব্যাগ থেকে ধুতি পাঞ্জাবি বার করে পরতে পরতেই কিন্তু কম্প দিয়ে জ্বর এল—ভীষণ কম্প। কিছুদূর গিয়েই আর চলতে পারলে না সে। রাস্তার ধারে একটা বাড়ির সামনে শুয়ে পড়ল চোখ বুজে, ব্যাগটা মাথায় দিয়ে। দিন দশেক পরে যখন চোখ খুললে, তখন দেখলে, রাস্তায় নয়, বিছানায় শুয়ে আছে সে এবং তার দিকে উৎসুক আগ্রহে চেয়ে আছে একজোড়া কালো চোখ। কাজল।

।। তিন ।।

কাজল বড় ভাল মেয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে কেন্দ্র করে যা ঘটল, তার জন্যে দায়ী কেবল তার রূপ নয়, সে রূপের টীকাকার শিল্পী রজতও। রজতের মনে হল, কাজলের চোখ শুধু কালো নয়, তার দৃষ্টিও ভাষা-ভরা। মনে হল, ওর দেহ শুধু মাংস-মেদ-মহিমাব সাবলীল প্রকাশই নয়, সে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লেখা আছে আমন্ত্রণও। কাজল নিজে কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন নয়। তার উৎসুক চোখের দৃষ্টি নীরব ভাষায় রজতকে বললে, এতদিন পরে তুমি এলে!—তখন জ্ঞাতসারে তার মনে এ রকম কোন ভাব জাগে নি। গৌরকান্তি প্রশস্তললাট রজতকে দেখে তার ভাল লেগেছিল অবশ্য, কিন্তু আর কিছু নয়। তার পীবর স্তনযুগল, কম্পিত করপল্লব, সুঠাম শ্রোণী, সন্নত দৃষ্টি, লজ্জারুণ কপোল, রক্তিম বিম্বাধর যখন নীরব ভাষায় আহ্বান করছিল রজতের পারুষ্যকে, তখন জ্ঞাতসারে কিন্তু সে সঙ্কুচিত হচ্ছিল মনে মনে। ভাষার দ্বারা তো নয়ই, চিন্তাতেও সে রজতকে প্রণয়ী হিসাবে প্রশ্রয় দেয়নি। রজত কিন্তু মুগ্ধ হচ্ছিল। তার শিল্পী মন কাজলের কালো চোখের দৃষ্টিতে নিত্যনূতন ভাষা আবিষ্কার করছিল ক্ষণে ক্ষণে। কখনও মনে হচ্ছিল, সে দৃষ্টি যেন বলছে, —ছি ছি, কি ভীতু ভালমানুষ তুমি! আবার কখনও বলছে, ভয় কি তোমার? সে যখন মুখ ফিরিয়ে বাতায়ন-পথে চেয়ে থাকত, রজতের মনে হত, সে দৃষ্টি থেকে যেন অভিমান ক্ষরিত হচ্ছে; ক্ষণপরেই মৃদু হেসে যখন চাইত তার দিকে, মনে হত, কালো চোখের তারা থেকে উপচে-পড়া আলোর ঝলক যেন বলে গেল কানে কানে, ইস্, ভারি বয়ে গেছে আমার! আবদার অনুযোগ বিস্ময় প্রশ্ন অনুরাগ অভিমানের এমন ভাবাময় স্বচ্ছ প্রকাশ কারও চোখের দৃষ্টিতে রজত দেখেনি। এই দূর বিদেশে দুর্বল দেহে হতাশ চিত্তে সে যখন লুটিয়ে পড়েছিল পথের ধুলায়, তখন কি আশ্চর্য, যে রহস্যময়ী তাকে এমন ভাবে সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছে, সে কুৎসিত নয়। তার দৃষ্টির অন্তরালে শিল্পীকাম্য রহস্য লুকিয়ে আছে! যে আদর্শের জন্যে সে জীবনপাত করেছে, বিশ্বাসঘাতকতার আগুনে তা যখন পুড়ে গেল দাউদাউ করে, আত্মপ্রকাশ করে

পুলিসের কবলে পড়বার জন্যেই সে যখন প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল, তখন এ কি অপরূপ মধুর জগতে উত্তীর্ণ করে দিলেন তাকে বিধাতা! যুবতী নারীর এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ইতিপূর্বে সে আর আসেনি কখনও! যে জীবন সে এতকাল যাপন করেছে, তাতে আদি-রসের কোন স্থান ছিল না।...এখন হঠাৎ যেন অনুভব করলে, বঞ্চিত হয়ে ছিলাম এতদিন। যে কেবল লক্ষ্যই করছিল কোন প্রশ্ন করেনি। প্রশ্ন করবার সঙ্গত বিষয় একটা অন্তত ছিল। অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করতে পারত, বাড়িতে এক ঝি ছাড়া অন্য লোক নেই কেন, আর সবাই কোথায় গেল? দু-চারজন যারা খোঁজ নিতে আসে, তারা পাড়াপড়শী, আসে আর চলে যায়। কিন্তু কিছুই জানবার সাহস হচ্ছিল না তার, মনে হচ্ছিল, জানতে পারলেই স্বপ্ন ভেঙে যাবে বোধ হয়।...

সুস্থ হয়ে উঠল যখন, তখন কাজলই একদিন প্রশ্ন করলে তাকে, আপনার বাড়ি কোথায়?

কলকাতা।

এই কথায় কাজলের চোখের দৃষ্টিতে যে আলো ঝলমল করে উঠল, রজতের মনে হল, তার অর্থ—তাই এমন!

আপনার নাম কি?

রজত—শ্রীরজত-শুভ্র মুখোপাধ্যায়।

কাজলের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল আনন্দ। রজতের মনে হল, সে দৃষ্টি যেন বলে উঠল, বেশ নামটি তো!

এখানে এসেছিলেন কেন?

তা বলব না।

কাজলের দৃষ্টির স্বচ্ছতায় নামল অভিমানের ছায়া।

রজত কোনও প্রশ্নই করলে না। কেবল বললে, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। এইবার যাব ভাবছি।

চোখের দৃষ্টিতে সকরুণ মিনতি যে এমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে, তা রজতের কল্পনাতীত ছিল। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সে।

কাজল মুখে বললে, এর মধ্যেই যাবেন কেন? আর একটু সেরে উঠুন, তারপর যাবেন। এখনও তো দুর্বল আছেন।

রজত থেকে গেল। 'আপনি' 'তুমি'তে পর্যবসিত হল ক্রমশ এবং কয়েকদিন পরে যে কাণ্ড সে করে বসল তা ভদ্রভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার নিজের কাছে এর একটা সঙ্গত জবাবদিহি ছিল অবশ্য, এবং এক কাজল ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে সে প্রস্তুত ছিল না। তার ভরসা ছিল, কাজল তাকে ক্ষমা করবে। প্রথমে কাজল বাধা দিয়েছিল একটু, কিন্তু সেটা খুব প্রবল বলে মনে হয়নি রজতের। ঘটনাটা ঘটে যাবার পরও কাজলের যে দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল, তা, রজতের মনে হল, ঘৃণার নয়, আনন্দের। কাজল মুখে কিন্তু বললে, এ কি করলেন আপনি?

তুমি সর্বাঙ্গ দিয়ে ডাকছিলে আমাকে, সাড়া না দিয়ে পারলাম না।

আমি ডাকছিলাম?—দৃপ্ত কণ্ঠে তর্জন করে উঠল সে। যে চোখ দুটি হাসছিল বলে রজতের মনে হয়েছিল, তাতে দপ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

রাগ করো না। আমি তোমাকে চাই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তোমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিতেও প্রস্তুত আছি আমি।

রাগ করো না। আমি কে, কোন্ জাত কিছুই জানেন না, দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছেন?

আছি।

আমি যদি বিবাহিত হই?

তোমার মাথায় সিঁদুর তো নেই!

সব জাত সিঁদুর পরে না।

তা হলেও ছিনিয়ে নিয়ে যাব, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

আর আপত্তি থাকে যদি?

তা হলে জোর করব না, আর যা করেছি তার জন্যে যদি শাস্তি দিতে চাও, নিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত।

মৃত্যুদণ্ড চাইলেও দেব কি করে? আপনার গায়ে যা অসুরের মত জোর!

তার ব্যাগটা ঘরের কোণেই রাখা ছিল। উঠে গিয়ে রজত তার থেকে রিভল্‌ভারটা বার করে এনে বললে, এই নাও, লোডেড আছে।

বিস্ময় ফুটে উঠল কাজলের চোখে। মুখে বললে, খুব হয়েছে, রেখে দিন।

দু দিন পরেই কাজলের বাবা ফিরে এসে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর মাতৃহারা মেয়েটিকে ঝিয়ের জিম্মায় রেখে তারই পাত্রের সন্ধানে বঙ্গদেশে গিয়েছিলেন ছুটি নিয়ে। পাত্র যোগাড় হয়নি, কারণ গরিব লোক ছিলেন তিনি। আত্মীয়স্বজনও বিশেষ কেউ ছিল না। কাজলই তাঁর একমাত্র সন্তান। নিজেই মানুষ করেছিলেন মা-হারা মেয়েকে, বিয়ে না দিয়ে মেয়েকে বড় বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়েছেন----এই অপরাধে পাড়ার লোকেরাও কেউ বিশেষ সদয় ছিলেন না তাঁর উপর। তাই তাঁর অবর্তমানে কাজল যখন একটা অজ্ঞাতকুলশীল অজ্ঞান যুবককে ঘরে টেনে তুললে, তখন পাড়ার লোক তাকে মানা তো করলেই না, ভবিষ্যৎ সান্ধ্য-আড্ডার খোরাক-সংগ্রহমানসে ভাবে ভঙ্গীতে উৎসাহই দিতে লাগল বরং।

প্রায় বছর দেড়েক অজ্ঞাতবাসের পর কাজলকে নিয়ে সে যখন কলকাতায় ফিরল, তখন মহাত্মা গান্ধী আবার উপবাস শুরু করেছেন অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে। মালবীয়জীর অনুরোধে হিন্দুনেতারা হৈ-হৈ করছেন তাঁকে ঘিরে পুণা জেলে। সত্যাগ্রহের উত্তেজনা মিইয়ে গেছে, সমস্ত উত্তেজনা মহাত্মাজীকে ঘিরে। গভর্মেণ্ট কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছেন দেশের ঘাড়ে নূতন কন্‌স্টিট্যুশন চাপাবার জন্যে, নরম মেজাজের নেতাদের নিয়ে তৃতীয় গোল-টেবিল-বৈঠকও বসবে নাকি আবার। বাংলা দেশের পুলিস নব নব অর্ডিনেন্সের বলে বলীয়ান হয়ে ডগ্‌লাস এবং এলিসন হত্যার প্রতিশোধ তুলেছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, চব্বিশপরগনার ঘরে ঘরে। বিপ্লবীদের কেউ জেলে, কেউ ফাঁসি গেছে, কেউ অ্যাপ্রুভার হয়েছে। রজত কাজলকে নিয়ে একটা হোটেলে এসে উঠল। বাড়িতে স্থান পাবে কিনা সন্দেহ ছিল। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল একটা চাকরির। হাতে একটি পয়সা ছিল না। কিন্তু চেষ্টা করলেই চাকরি পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন সে ঘুরে বেড়াতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়, কাজলকে হোটেলের ঘরে একা বসিয়ে রেখে। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে পার্কে এসে বিশ্রাম করত। তেষ্টা পেলে জলখেত রাস্তার কল থেকে। হঠাৎ একদিন শঙ্খ-শুভ্রের সঙ্গে হয়ে গেল রাস্তায়। শঙ্খ দেখতে পায়নি, রজতই ডাকলে তাকে। ডেকেই কিন্তু মনে হল, ভুল করেছি।

কালো-রঙ, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, উস্কোখুস্কো-চুল এই লোকটাই যে রজত, তা পরিচয় না দিলে শঙ্খ চিনতেই পারত না।

সমস্ত শুনে বললে, কি হয়েছে তাতে? বাড়ি চল্।

বাবা যদি তাড়িয়ে দেন?

রজতের ভীত কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে গেল শঙ্খ। সেই রজত কি হয়ে গেছে!

আচ্ছা, আমি বলব বাবাকে। তোর ঠিকানাটা কি?

সহসা সাবেক রজত আত্মপ্রকাশ করলে যেন।

ঠিকানা দিচ্ছি। আমার জন্যে অনুরোধ করতে হবে না কাউকে।—গর্জন করে উঠল যেন।

শঙ্খ বললে, অনুরোধ করব না, খবরটা দেব খালি।

ঠিকানা নিয়ে শঙ্খ চলে গেল। রজত চেয়ে রইল নিখুঁত সাহেবী-সুট-পরা শঙ্খর দিকে। তারই দাদা!

শঙ্খ খবরটা তনিমাকেই বলেছিল প্রথমে। বাবাকে বলতে তারও সাহস হয় নি। সব শুনে তনিমা খানিক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল, তারপর মুচকি হাসলে একটু।

সমস্ত ব্যাপারটা তুমি যদি আমার হাতে ছেড়ে দাও, তা হলে আমি সব ঠিক করে দিতে পারি। তুমি কিন্তু কাউকে একটি কথা বলতে পারবে না।

বেশ।

তনিমা বাসন্তীকে গিয়ে বললে, মা, আমার এক বন্ধুর মুখে আজ শুনলাম, ঠাকুরপো নাকি পছন্দ করে বিয়ে করেছে কাজল বলে এক মেয়েকে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল বাসন্তী।

কোথায়?

তা সে জানে না। খবর নিতে বলেছি।

কে বন্ধু তোমার?

আপনি চেনেন না তাদের। চট্টগ্রামে বাড়ি। ঠাকুরপোর সঙ্গে খুব আলাপ। আমি যখন সকালবেলায় বেরিয়েছিলাম, তখন দেখা হল তার সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায়।

বাসন্তী খবর দিলেন শশাঙ্ক-শুভ্রকে। শশাঙ্ক মুখে যদিও বললেন—মরুকগে, মনে মনে কিন্তু তিনিও কম উৎসুক হলেন না।

দু দিন তনিমা চুপ করে রইল।

তৃতীয় দিন বাসন্তী আবার জিজ্ঞেস করলেন, রজতের কোনও খবর পেলে?

এখনও পাইনি।

ঘণ্টা-দুই পরে শশাঙ্ক আবার প্রশ্ন করলেন এবং সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তুমি ভাল করে খোঁজ কর আজই। গাড়িটা নিয়ে যাও না হয় তাদের বাড়ি।

তনিমা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এসে বললে, শুনলাম, কাল তারা কলকাতায় আসছে। এসে বউবাজারের একটা হোটেলে উঠবে।

হোটেলে?—প্রশ্ন করলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

তাই তো শুনলাম।

ঠিকানা এনেছ?

এনেছি।

সইয়ে সইয়ে খবরটা বলাতে ফল হয়েছিল। তনিমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল শঙ্খ।

তার পরদিন যখন চেনা 'মিনার্ভা' গাড়িখানা হংস-শুভ্র, শশাঙ্ক-শুভ্র, বাসন্তী এবং তনিমাকে নিয়ে বউবাজারের গলিতে সেই হোটেলের সামনে হর্ন দিয়ে দাঁড়াল, তখন রজতের যেন মাথা কাটা গেল। দয়াপরবশ হয়ে অনুগ্রহ করতে এসেছেন সবাই! আঃ, কি লজ্জা!

সামনাসামনি হতেই সে বলে উঠল, কেন এসেছ তোমরা? আমি যাব না।

যাবি না কেন?—বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলের অবস্থা দেখে চোখ ফেটে জল আসছিল তাঁর।

যে সর্বনাশকে আমি স্বেচ্ছায় জীবনের সাথী করেছি, তার সঙ্গে তোমাদের জড়াব কেন?

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল হংস-শুভ্রের চোখ দুটো।

তোমার মত লোকের সঙ্গে বাস করবার ইচ্ছে আমাদেরও নেই।

তোমার পূর্বপুরুষ তোমার জন্যে যে সম্পত্তি রেখে গেছেন, তার ভার বয়ে বেড়াবার দায়িত্বও আমরা নিতে রাজী নই। এই নাও।

বিশ হাজার টাকার চেক তিনি লিখেই এনেছিলেম।

এই টাকাটা তোমার অংশে জমা আছে। তোমার বাকি সম্পত্তির হিসেব তুমি গিয়ে বুঝে নিও একদিন—ওর হাঙ্গামা পোয়াতে আমি পারব না। আমি চললুম।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর রজতের চোখে পড়ল, মা কাঁদছেন, বাবা অস্বাভাবিক রকম চুপ করে আছেন।

তনিমা বললে, আজকের মত চল অন্তত ঠাকুরপো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রজত বললে, বেশ, চল।

তারপব কাজলের দিকে ফিরে বললে, মাকে, বাবাকে, বউদিকে প্রণাম কর। দাদু সত্যিই চলে গেলেন নাকি?

বেরিয়ে গিয়ে দেখে এল, সত্যিই চলে গেছেন। গাড়িটা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা করছে।

কাজল কলকাতায় এসে থেকে অসম্ভব রকম নীরব হয়ে গিয়েছিল, তার দৃষ্টির সে মুখরতাও আর ছিল না যেন। দৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে ছিল খালি ভয়। তার জীবনে ঝঞ্ঝার মত এসে এই লোকটি কোন্ অনিশ্চিত পরিণামের দিকে তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, তার কোনও আভাসই সে পাচ্ছিল না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলেই নীরব হয়ে ছিল। বিয়ের আগে রজতের সমস্ত ইতিহাস শুনেছিল সে। শ্বশুরকে সব কথা না বললেও তার কাছে রজত কিছুই গোপন রাখেনি। রজতের শেষ কথাগুলো সব সময়েই যেন কানে বাজত তার—আমার মত খামখেয়ালী লোকের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন জড়াবার আগে একটা কথা জেনে রাখা ভাল। নীরবে যদি আমার অনুসরণ করতে না পার, দুঃখ পাবে। অনুসরণ করলেও যে দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাবে, তার ভরসা নেই। কিন্তু বাদ-প্রতিবাদ করলে সে দুঃখ আরও গ্লানিকর হয়ে উঠবে। আমি তোমাকে পেলে কৃতার্থ হয়ে যাব, কিন্তু তোমার দিকটা তুমি ভেবে দেখ ভাল করে।

নারীমাত্রেই পুরুষের মধ্যে যে বীরকে পূজা করতে চায়, যে আত্মভোলা সর্বশক্তিমানকে বাঁধতে চায় মায়ার বন্ধনে, রজতের মধ্যে সেই দুর্জয়কে প্রত্যক্ষ করে কাজল মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার সেদিনকার দুষ্কৃতিটাকেও আর দুষ্কৃতি বলে মনে হচ্ছিল না তার। বরং এই দুরন্ত পুরুষ যে তার তুচ্ছ দেহটার মোহে ক্ষণিকের জন্যেও অভিভূত হয়েছিল, এজন্য একটা সূক্ষ্ম গর্বই জাগছিল তার মনে। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের সেই লাইনটা—"যে পথিক পথের ভুলে, এল মোর প্রাণের কূলে, পাছে তার ভুল ভেঙে যায়—"

মৃদুকণ্ঠে সে উত্তর দিয়েছিল, আমি কোনও প্রতিবাদ করব না।

তাই কোনও প্রতিবাদ সে করেনি, কেবল অনুসরণ করছিল।

দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল।

দুই না তিন, তা-ও রজতের খেয়াল রইল না। আলাদা একটা বাড়িতে কাজলকে নিয়ে তন্ময় হয়ে রইল সে। তার কত পোজের যে ছবি আঁকলে, তার আর ইয়ত্তা নেই। উচ্ছ্বসিত বাসন্তী এসে একদিন খবর দিয়ে গেল, শঙ্খর ছেলে হয়েছে। দেখতে যাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করলে। অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু হয়ে ওঠেনি আজও। কিছুই মনে থাকে না, কিছুই ভাল লাগে না আর। এমন কি কাজলও ফুরিয়ে গেছে যেন। আবার দেশের কাজে নামলে কেমন হয়? মনটা আবার উন্মুখ হয়ে উঠল।.....পিওন চিঠি দিয়ে গেল দুখানা। দুটোই অপ্রত্যাশিত। একটা হীরকের, আর একটা সোমশুভ্রের অ্যাটর্নির। হীরকের দীর্ঘ চিঠি। ধীরে সুস্থে পরে পড়া যাবে। ভ্রূকুঞ্চিত করে অ্যাটর্নির চিঠিটা পড়তে লাগল রজত। সোম-শুভ্রের নির্দেশ অনুসারে তিনি সোম-শুভ্রের উইলের কপি পাঠিয়েছেন। শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, শঙ্খ, রজত, হীরক, শুক্তি, মুক্তা, নবনী, পরমানন্দ—প্রত্যেকে তিনি নগদ এক লাখ টাকা করে দিয়েছেন। এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছেন শিক্ষিতা অবিবাহিতা দরিদ্র হিন্দু কুমারীদের সৎপথে থেকে অর্থোপার্জনে সহায়তা করবার জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর শিব-শুভ্রের বংশের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠতম জীবিত থাকবেন, তিনিই ভবিষ্যতে এ বিষয়ে উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন করবেন। এই এক লাখ টাকার সুদ প্রতি বছরে একজন করে পাবেন। এ বছরে পাবেন ইলা দেবী। আর এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকবে তাঁর 'বৈজ্ঞানিক কল্পনা' নামক পুস্তিকার মুদ্রণ ও প্রচারের জন্য। বাকি আঠারো লক্ষ টাকা তিনি সমানভাবে দান করে গেছেন তাঁর স্থাপিত স্কুল ও হাসপাতালে। তাঁর বিহারের জমি তিনি দান করেছেন তাঁর জনমজুরদের। দীর্ঘ তালিকা রয়েছে তাদের নামের। সোম-শুভ্রের পরিচয় পেয়ে রজত বিস্মিত হল এবং মুগ্ধও হল।....

আবার মনে হল, এই এক লাখ টাকা নিয়ে দেশের কাজে নামলে কেমন হয়? কিন্তু তখনই মনে হল, কারবার কি আছে? সুভাষ বোস চিকিৎসার জন্যে ইউরোপে; বিঠলভাই প্যাটেল, যতীন সেনগুপ্ত মারা গেছেন; জ্যাক্‌সনকে মারতে গিয়ে বীণা দাস ধরা পড়েছে; সত্যাগ্রহের শিখা নির্বাপিত। তবু ইচ্ছে করতে লাগল, দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে। কিন্তু কাকে নিয়ে কি করবে? পুরানো দল ভেঙে গেছে, নূতন দলের কাউকে চেনে না সে। ইন্দু-শুভ্রা সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, একটা কথা পর্যন্ত বলে না আজকাল। পুলিস পর্যন্ত স্পর্শ করলে না তাকে। মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে ভাবে, কেন করলে না? হংস-শুভ্র গোপনে গোপনে যে তার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা সে জানত না। হঠাৎ আবার মনে হল, কাজল ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু কাজলের দায়িত্ব তো ফুরোয়নি।

কই, কোথায় আছ তুমি?

এই যে। পাশের ঘর থেকে কাজল উত্তর দিলে।

তোমার সেই বেদিনীর পোশাকটা পরে এস তো, আর একটা ছবি আঁকি।

একটু পরেই কাজল হাসিমুখে এসে 'পোজ' দিয়ে দাঁড়াল।...

পোজ দিয়ে দাঁড়িয়েই রইল অনেকক্ষণ।

রজত তার দিকে ফিরেও চাইল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতহস্তে তুলি চালিয়ে ছবি আঁকছিল একটা। হঠাৎ কাজলের নজরে পড়ল, তার ছবি নয়,—বিরাট একখানা ছোরা মূর্ত হয়ে উঠেছে ক্যান্‌ভাসের উপর, ছোরাটা বিদ্ধ করেছে প্রকাণ্ড একটা হৃদ্‌পিণ্ডকে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।....

হীরক-শুভ্র

হীরক-শুভ্র রজতকে জেল থেকে যে চিঠি লিখেছিল, তা এই—

শ্রীচরণেষু,

মেজদা অনেকদিন তোমার কোনও খবর পাইনি। বাড়ির সবাই আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, এক তুমি ছাড়া। তুমি অবশ্য কোন কালেই কলমের কারবার কর না, তুলিই তোমার মনের বাহন, একটা ছবি এঁকে পাঠালেও তো পার। সেদিন বউদির চিঠিতে জানলাম, তুমি বিয়ে করেছ। খবরটা আনন্দজনক হওয়া উচিত, নতুন বউদিদিকে দেখবার একটা কৌতূহলও যে না হচ্ছে তা নয়; কিন্তু তোমার মতন তেজী লোক যে বিয়ে করে অবশেষে নীড় আশ্রয় করবে—এটা ঠিক আশা করিনি। যদিও তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না, তবু তোমার কাছে প্রকাণ্ড কিছু আশা করেছিলাম আমি। তুমি বিয়ে করেছ, এ খবর পেয়েও সে আশ ত্যাগ করিনি এখনও। যে সব খবরের কাগজ আমরা পড়তে পাই, প্রতিদিনই সেগুলোর পাতা ওল্টাই-তোমার নাম কোথাও দেখতে পাব বলে। তোমার মতন একটা উদ্দাম প্রকৃতি যে চুপচাপ থাকবে, এ কথা ভাবতেই পারি না। তোমার অসহিষ্ণু স্বভাবের জন্যে আমার কথা তোমাকে ভাল করে বোঝাতেই পারি নি কোনদিন। তুমি কোনদিনই ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত আমার কথা শোনে নি। চাষী-মজুরদের নামোচ্চারণ করবামাত্র তুমি ক্ষেপে উঠেছ এবং আমাকে থেমে যেতে হয়েছে। দাদাকে আমি কোনদিন বোঝাবার চেষ্টা করিনি, কারণ তিনি আলাদা জাতের লোক। বোঝালে তিনি বুঝবেন, সায়ও দেবেন হয়তো, কিন্তু কর্মী হিসাবে কিছুতেই ধরা দেবেন না। ওঁরা স্বপ্ন-সম্বল লোক। তোমার ওপর কিন্তু আমার আশা ছিল এবং এখনও আছে। তাই মনে করেছি, আজ ভাল করে আমার কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলব। চিঠিতে বলার একটা সুবিধে—ধমক দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিতে পারবে না। যে আদর্শকে আঁকড়ে ধরে আমি জীবনের আর সব-কিছু বিসর্জন দিয়েছি, সে আদর্শে অনুপ্রাণিত না হও, তার মর্মটা অন্তত বোঝবার চেষ্টা কর—এ দাবিটুকু কি আমি করতে পারি না? বাবা মা দাদু যে ভাষায় আমাকে চিঠি লেখেন, তা অনুকম্পার ভাষা। তাঁরা মনে করেন, নির্বোধ আমি একটা বাজে হুজুগে মেতে বিপন্ন হয়েছি। আমার আদর্শের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখি না তাদের চিঠিতে। তাঁদের সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা যেন-তেন-প্রকারেণ আমাকে জেলের পাঁচিলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ক্যাপিটালিস্ট্ সমাজের ভাল ছেলে করে তোলবার। এর জন্যে তাঁদের সুপারিস-তদ্বিরের অন্ত নেই। দাদু, শুনেছি, এর জন্যে অনেক টাকাও নাকি খরচ করছেন স্থানে-অস্থানে। আমার আদর্শ নিষ্ঠার এই কি পুরস্কার? আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় ছোট্ট পিসীর চিঠি পড়ে। আমি ভারতবর্ষের লোক হয়ে রাশিয়া নিয়ে মেতেছি, এ নিয়ে তাঁর শানিত মন্তব্যগুলি ছুঁচের মত বেঁধে। আমি রাশিয়া নিয়ে মাতিনি, আমি একটা আদর্শ নিয়ে মেতেছি—এক কথা কেন যে তিনি বোঝেন না, জানি না। আজ যদি রাশিয়া তার মহৎ আদর্শকে ত্যাগ করে, তা হলে

রাশিয়ার সঙ্গেও আমার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। রাশিয়া এই আদর্শকে মূর্ত করেছে বলেই রাশিয়ার ওপর আমার ভক্তি। ছোট পিসী আমার কথা বোঝেন না, তার কারণ তিনি ভিন্ন পথের পথিক।

ছোট দাদুর সঙ্গেও ভাব করেছি আমি। ছোট দাদুও আদর্শবাদী লোক। কিন্তু কমিউনিজ্‌মের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা থাকলেও আস্থা নেই। তাঁর বিশ্বাস—বৈষম্যই প্রকৃতির নিয়ম এবং প্রকৃতিই ছলে-বলে-কৌশলে সাম্যবাদ-প্রচেষ্টাকে বিফল করে দেবে বার বার। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব আমরা? আশ্চর্য যুক্তি তাঁর! তা ছাড়া তিনি কেমন যেন সন্দেহবাদী হয়ে উঠছেন। লিখছেন, "ইংরেজরা এ দেশে যখন আসে, তখন আমরা সবাই ইংরেজ-গুণগানের যে সব কথা বলেছিলাম তা সেকালের সংবাদপত্রগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে এখনও। মিলিয়ে দেখো, তোমাদের কমিউনিজ্‌ম-গুণগান সেগুলোর সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাবে। ইংরেজদের সম্বন্ধে ভুল যখন ভেঙেছে, তখন একটা নতুন ফাঁদে পা দেওয়াটা কি খুব সমীচীন?" এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ওঁদের সকলের সম্বন্ধেই একটা কথা ভেবে আমি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি। ওঁরা সমস্ত বুঝেও এসব কথা বলছেন আত্মরক্ষার জন্যে। জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে এই প্রকৃতিই ওঁদের মর্মমূলে রয়েছে। পৃথিবীর যে নবজাগরণ আসন্ন, তার যৌক্তিকতা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করলে যে শোষণ যন্ত্রের ওঁরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অসম্ভব হয়। নিজেদের স্বার্থের জন্যই মানব-সমাজের বৃহত্তর আদর্শকে মনে মনে স্বীকার করলেও মুখে মানবার সাহস নেই ওঁদের। কিন্তু তোমারও কি নেই? তোমার সাহসের অভাব আমি কল্পনাই করতে পারি না। তোমাকে সুবিধাবাদী বলে ভাবতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমার মনে হয়, নিজের খেয়ালে মত্ত আছ বলে এ দিকটা ভাল করে ভেবেই দেখনি তুমি। অভিজাতসুলভ ঔদাসীন্যে ভুলে আছ সব। কিন্তু আজ তোমাকে আমার কথা শুনতেই হবে। একটা কথা জান? শুনলে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবে—আমার মনে এর বীজ তুমিই বপন করেছিলে একদিন। আমাদের ছট্টু বলে একটি চাকর ছিল, মনে আছে তোমার? বেচারা দু টাকা মাত্র মাইনে পেত, খেত আমাদের পাতের এঁটো-কাঁটা কুড়িয়ে। সশঙ্ক হয়ে থাকত বেচারা। কি সামান্য অপরাধে তাকে হান্টার দিয়ে খুব মেরেছিলে তুমি। আমি ভাবলাম, আর বুঝি আসবেই না। কিন্তু বিকেলে দেখলাম ঠিক এসেছে এবং ক্রমাগত চেষ্টা করছে তোমার মন যুগিয়ে চলবার। ধনীর হাতে দরিদ্রের শোচনীয় অপমানের চিত্রটা গভীর রঙে তুমিই এঁকে দিয়েছিলে সেদিন আমার মনে। সেই দিনই আমি ঠিক করেছিলাম যে, যদিও আমি ধনীর ঘরে জন্মেছি, তবু গরিবদের দিকেই থাকতে হবে আমাকে, আর কিছুর জন্যে না হোক, আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে। আমরা বড়লোক বলে অপরিসীম লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়েছিল যেন সেদিন আমার। টলস্টয়, মার্ক্‌স, লেনিন, স্টালিন অনেক পরে পড়েছি—মিলের কুলিদের সংস্পর্শে এসেছি তারও অনেক পরে।

কমিউনিজ্‌মের মূল কথাটি নিয়ে আলোচনা করব তোমার সঙ্গে। যারা এর মুখোশ পরে নিজেদের নানা কাজ হাঁসিল করে বেড়াচ্ছে, তাদের বিষয় আমার আলোচ্য নয়। তাদের উদাহরণ উদ্ধৃত করে অনেক লোক কমিউনিজ্‌মকে গাল দেয় শুনেছি। কমিউনিজ্‌মকে গাল না দিয়ে তাদের গাল দিলেই ভাল হয়। টিকি-তিলক-নামাবলীধারী ভণ্ডকে দেখে হিন্দুধর্মের বিচার করা ঠিক নয়। কমিউনিজ্‌মের কথা আলোচনা করবার সময় একটা কথা মনে রাখা উচিত। ফলের থেকে বীজ এবং বীজের থেকে অঙ্কুরের আবির্ভাব যেমন অনিবার্য, মানবের ইতিহাসে ফিউডালিজম্ থেকে ক্যাপিট্যালিজ্‌ম এবং

ক্যাপিটালিজম্ থেকে কমিউনিজম্ ও তেমনি অনিবার্য। নির্যাতিতদের দুঃখে বিচলিত হয়ে জনকতক উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যক্তি নিছক বক্তৃতায় চোটে এতবড় ব্যাপারটাকে সম্ভবপর করে তুলেছে—এ কথা যারা ভাবে, তারা ভুল ভাবে। রাত্রির পর যেমন দিন আসে, ক্যাপিটালিজ্‌মের পর শ্রমিকদের অভ্যুত্থান তেমনই অতিশয় স্বাভাবিক ব্যাপার একটা। মানব-সভ্যতার যাবতীয় কীর্তির সমস্ত সম্মান যাদের প্রাপ্য তাদের বঞ্চিত করে জনকতক অলস ধনী কতদিন আর ভোগ করবে এই বসুন্ধরাকে? যারা কর্মী, যারা বীর, তারা এই বার জেগেছে, ভীরু প্রবঞ্চকদের সরে পড়বার সময় হল এবার। নির্যাতিতেরা চিরদিন অত্যাচার সইতে পারে না। অত্যাচারীর চাবুকই মরিয়া করে তোলে তাদের একদিন। সেদিন এসেছে এবং সে কথা প্রসন্ন চিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করতে হবে এবং যারা ত্যাগ করতে রাজী নয়, তাদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে মোহ-মুদ্গরের! তোমাকেই করতে হবে, তুমি যদি এর যৌক্তিকতা স্বীকার কর। সামাজিক মানুষ হিসাবে তা হলে তুমি ওর সহযোগিতা না করে পারবে না।

একদল সূক্ষ্ম তার্কিক আছেন, তাঁরা বলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকলে জীবনে আর সুখ কি, সমাজের সঙ্গে প্রাণের নিগূঢ় যোগাই বা কোথায়? বারোয়ারিতলায়, ওয়েটিং-রুমে বা ধর্মশালায় বাস করে কি আমরা শান্তি পাব? মানুষ যে কিসে শান্তি পায় আর কিসে পায় না, তা জানি না। একটা কথা কিন্তু জানি। যুগে যুগে মানুষ সমাজের হিতার্থে নূতন নূতন নিয়ম করেছে এবং সে নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে কালক্রমে শান্তিও পেয়েছে। সবাই হয়তো পায় না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে পেয়েছে, তা মানতেই হবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মানব-সমাজে একদিন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। যে কোনও পুরুষ নিছক গায়ের জোরে যে কোনও নারীর দেহ দাবি করতে পারত। বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হওয়াতে কতকগুলি পুরুষের দুঃখের কারণ ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিবাহ-প্রথাকে মেনে নিয়ে আমরা কি খুব অশান্তিতে আছি? বিবাহ-প্রথারও আবার নানা রকম চেহারা ছিল। Group marriage ছিল, বহু -বিবাহ ছিল। এখন সভ্যসমাজ থেকে সেসব উঠে গেছে। বহুপত্নীর মালিক হবার সাধ যাঁর, তাঁর হয়তো অসুবিধে হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই যে এক পত্নীকে জীবনে সন্তুষ্ট আছেন, তা অস্বীকার করি কি করে? কমিউনিস্টরা এখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক ভালবাসার বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন স্বীকার করতে চায় না, বাইরের মিথ্যা আইনের হাঙ্গমা চুকিয়ে দিয়ে তারা অন্তরের সত্য আইনকে আশ্রয় করেছে। যাঁরা বিবাহ-আইনের নাগপাশে বেঁধে দাম্পত্য-জীবনকে রক্ষা করবার পক্ষপাতি, তাঁদের হয়তো রাগ হবে; কিন্তু যতদূর শুনেছি, অধিকাংশ লোকই সুখে আছে সেখানে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্বন্ধেও ওই কথা। কতকগুলো স্বার্থপর লোকেরই কষ্ট হবে হয়তো, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে সুখেও থাকবে অনেকে। বিচিত্র মানুষের মন! সবই সে সহ্য করে নেয় কালক্রমে। শুধু তাই নয়, কোন একটা নিয়ম সে বেশিদিন মানতেই চায় না। পুরাতন শৃঙ্খল ভেঙে নূতন শৃঙ্খল পরবার জন্যে সে সতত উন্মুখ। এরই নাম হয়তো আধুনিকতা। আধুনিকতার দাবি যদি না মানতে চাও, 'ফসিলের' দলভুক্ত হতে হবে তোমাকে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, কমিউনিজ্‌ম সমাজের যে ব্যবস্থা করতে চাইছে, অধিকাংশ লোকের পক্ষে তা ভাল, না, মন্দ? রাশিয়ার দিকে চাইলেই এর উত্তর পাবে। সেখানে বেকার লোক নেই, অলস লোকের স্থান নেই, বংশ বা অর্থগত জাতিভেদ নেই। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তারা এই ক বছরের মধ্যে যা করেছে, তা বিস্ময়কর।

যেসব সমালোচক আরাম-কেদারায় বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তাদের নানারকম ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করেন, একটা কথা ভুলে যান তাঁরা—কাজ করতে গেলেই ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, অলস লোক ক্বচিৎ ভুল করে, মরা লোকে একেবারেই করে না। ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সত্ত্বেও তারা যা করেছে, তার কিছু আভাস রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তে পাবে, অন্য কোন বই যদি হাতের কাছে না-ও পাও।

বর্তমানে সভ্যসমাজে 'ডিমক্র্যাসি' নামে যা প্রচলিত, আসলে তা পুরাতন রাজতন্ত্রেরই নব-রূপ। নূতন রাজাটির নাম 'টাকা'। ডিমসের মাথা বিকিয়ে আছে এই টাকার পায়ে। মাথা বিকিয়ে দিয়েও কিন্তু তাদের স্বস্তি নেই। ইংলণ্ডের মত সভ্যদেশেও বেকার-সমস্যা ঘোচেনি, এখনও সেখানে লোকে পেটের দায়ে টেম্‌সের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এখনও সেখানে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি হয়, এখনও সেখানকার ভ্রূণহত্যা-শিশুহত্যার তালিকা আতঙ্কজনক। অধিকাংশ লোকের সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের শ্বাস-রোধ করে কয়েকজন পুঁজিবাদী যেখানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সেইখানেই এই অবস্থা। আমাদের বিদ্রোহ এই ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে।

তুমি হয়তো বলবে, কেন, ফ্যাসিজ্‌ম তো বেকার-সমস্যা সমাধান করেছে! সেখানেও কি আধুনিক পদ্ধতিতে মানব সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে না? আপাতদৃষ্টিতে হচ্ছে হয়তো, এবং যেটুকু হচ্ছে তা সম্ভবত সোশ্যালিজ্‌মের কল্যাণেই হচ্ছে। কারণ এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ফ্যাসিজ্‌ম সোশ্যালিজ্‌মেরই পরিবর্তিত বক্ররূপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও-জিনিস টিকবে না। ওটা ক্যাপিটালিস্টদের আত্মরক্ষার প্রয়াস, এবং আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ-প্রয়াস হবে। টবে কখনও অশ্বত্থগাছ হয় না। হয় সে মরে যাবে, না হয় টবকে বিদীর্ণ করে সনাতন মাটিতে শিকড় চালাবে সে। অশ্বত্থগাছের সম্বন্ধে চিন্তা নেই, কর্মীরা নিজেদের শক্তির সম্বন্ধে একবার যখন সচেতন হয়েছে, তখন তাদের থামাতে পারবে না কেউ—ওর ক্যাপিটালিস্টিক খোলসটাই যথাসময়ে খসে যাবে আশা করি।

আমার কল্পনায় যতটুকু কুলিয়েছে আমি ভেবে দেখেছি ভবিষ্যৎ-মানব-সমাজকে বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের মত বাস করতে হবে। ক্যাপিটালিস্ট্ সমাজের ছোটখাট একান্নবর্তী পরিবারের যেসব গলদ থাকে, এতে তা থাকবে না। এ একান্নবর্তী পরিবারে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না আলস্যকে, প্রশ্রয় দেওয়া হবে না নীচতাকে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকেও খর্ব করা হবে না কোন দিক দিয়ে। খাওয়া-পরার জন্য আত্ম-বিক্রয় করতে হবে না, মামলা করতে হবে না সম্পত্তির অংশ নিয়ে। মানুষের অনুরাগ-বিরাগের মাপকাঠি হবে ভাল-লাগা, অন্ন-বস্ত্রের জন্য বাধ্যতামূলক ভণ্ডামি নয়। অর্থাৎ তখনই 'বার্ড্‌স অফ এ ফেদার'রা 'ফ্লক টোগেদার' করবার প্রকৃষ্ট সুযোগ পাবে। বস্তুতান্ত্রিক সুখ-সুবিধার জন্যে গরিব হাঁসকে বড়লোক কাকের মোসায়েবি করে বেড়াতে হবে না সে সমাজে। যে অন্নবস্ত্র বাসস্থানের জন্যে লোকে মনুষ্যত্ব বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তখন কাজের পরিবর্তে—যে কোন কাজের পরিবর্তেই—মানুষ তা পাবে এবং প্রত্যেকেই সুযোগ পাবে নিজের যোগ্যতা এবং রুচি-অনুসারে কাজ করবার। সুতরাং তখনই গড়ে উঠবে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সমাজ নিজের নিজের স্বাভাবিক প্রেরণাবশে। তখন যে জাতি-ভেদ থাকবে, তা স্বাভাবিক জাতিভেদ এবং অন্নবস্ত্রের সমস্যা না থাকাতে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকবে না—প্রকৃতির রাজত্বে মহিষ এবং ময়ূরে যেমন বিরোধ নেই। মানুষ এতদিন যা নিয়ে ঝগড়া করেছে, তা অতি-স্থূল বস্তু-সম্পত্তি, ভবিষ্যৎ মানুষদের সে বালাই থাকবে না। একমাত্র 'প্রাইভেট প্রপার্টি যা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তা তার বুদ্ধি এবং

মন। নিখিল মানবের কল্যাণের জন্য সে মনেরও উৎকর্ষ সাধন করতে হবে, তার যথেষ্ট সুযোগও দেওয়া হবে তাকে। অর্থাৎ নিজের হিত-চিন্তা করলেই হবে না শুধু, সকলের হিতের কথাই মনে রাখতে হবে। Love thy neighbour—এই উপদেশই পর্যাপ্ত হবে না তখন, Love the humanity as a whole–এই হবে তখনকার মনোভাব। তখন আলাদা আলাদা nation থাকবে না, frontier থাকবে না, foreign ambassador থাকবে না; তখনই সফল হবে কবির স্বপ্ন—'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানবজাতি'।

কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, নিজের নিজের যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে জেলের কয়েদীরাও তো অন্নবস্ত্র পায়। কমিউনিস্ট সমাজ তা হলে বৃহদায়তন একটা জেলখানা হবে নাকি? জেলখানায় জেলের প্রাচীরের বাইরে যাবার হবে নেই কারও এবং এই বন্দিত্বই শাস্তি। এ শাস্তিটা না থাকলে সত্যিই তো জেলখানার বন্দোবস্তে নিন্দা করবার বিশেষ কিছু নেই। ক্যাপিটালিস্ট্ সমাজে গরিব মানুষেরা জেলেই তো ভাল থাকে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করবার অনুমতি পেলে তারা জেল ছেড়ে আসতে চাইত কি না সন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ছে। বম্বের সনুর গল্পটা। মার্গারেট রীডের'Indian Peasant Uprooted ' বইটাতেও গল্পটা আছে। তার থেকেই অনুবাদ করে দিচ্ছি আমি।

সনুর মাইনে ছাব্বিশ টাকা। কিন্তু কোন মাসেই পুরো মাইনে পায় না বেচারা। মিলের কাপড় নষ্ট করছে— এই অজুহাতে কোন মাসে পাঁচ, কোন মাসে দশ, কোন মাসে পনর টাকা মাত্র মেলে। মিলের গেট থেকে বেরিয়েই দেখে, লাঠি-হাতে কাবুলীওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। কাবুলীকে দেখেই চট করে গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ভিড় হোক একটু ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়া যাবে। ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে সে গেট থেকে নির্বিঘ্নে বেরুল বটে, কিন্তু কাবুলীর শ্যেনদৃষ্টি সে এড়াতে পারলে না। কাবুলী ঠিক তার পিছু নিয়েছিল। যেই একটা গলির মধ্যে সনু ঢুকতে যাবে, অমনই ক্যাঁক করে ধরলে, তার ঘাড়টা এবং এমন জোর করে একটা ঝাঁকানি দিলে যে, বেচারার ঘাড়ে কাছের জামাটা ছিঁড়েই গেল।

শালা বাগ্‌তা কাহে? রূপিয়া দেও—

নিরুপায় সনুকে কম্পিত হস্তে কাপড়ের খুঁট থেকে বার করতে হল টাকা। ছয় টাকা কাবুলীর হাতে দিয়ে কাতর চক্ষে চেয়ে রইল সে। কাতর চক্ষের দৃষ্টিতে বিচলিত হবার লোক কাবুলী নয়।

সে বললে, সুদ আট রূপি হ্যায়—আওর দো রূপি দেনো ওগা—তোম্‌হাবা পাস্ হ্যায়—দে দেও—

নিষ্করুণ কণ্ঠের নিষ্ঠুর আদেশ। সশঙ্ক সনু তখন হাত কচ্‌লে কচ্‌লে আগা সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে লাগল যে, এ মাসে তার দশ টাকা মাইনে কাটা গেছে, এ মাসে আর বেশি দিতে পারবে না সে। দেওয়া সম্ভব নয় কিছুতেই। পায়ে ধরতে লাগল তার।

কাবুলী খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর বললে, ই দো রূপি আসলমে চলা যায়েগা তব। বুঝা?

সনু ঘাড় নেড়ে বললে, বুঝেছে। কোনক্রমে নিস্তার পেলে বাঁচে সে। কাবুলী নিস্তারই দিলে তাকে অবশেষে দু টাকা সুদ আসলের অন্তর্ভুক্ত করে।

সনু চলল বাড়ির দিকে। ইচ্ছে ছিল, মদের দোকানে ঢুকে আজ মাইনে পাবার দিনটা অন্তত এক পাত্র টেনে যাবে, কিন্তু তা আর হল না। কোন রকমে টাকা কটা বাড়ি নিয়ে ফিরত পারলে বাঁচে সে। বাড়ির দরজায় কিন্তু আর একজন পাওনাদার দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতি মাসেই মাইনে পাবার দিন কাবুলীওয়ালার মত এ লোকটাও দাঁড়িয়ে থাকে।

বাড়ি ভাড়া দাও।

সনুকে আবার গেরো খুলে ছয় টাকা দুআনা বার করে দিতে হল। একটি মাত্র ঘরের ভাড়া ছয় টাকা দুআনা। বাকি রইল তিন টাকা চৌদ্দআনা। সমস্ত মাস হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর পরের মাসের বিশে তারিখে এই তার উপার্জন। ঘরের ময়লা দেওয়ালটায় ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হতে লাগল, বাঁচব কি করে আমরা?

খানিকক্ষণ পরে বিড়িটি ধরিয়ে ঘরের দরজাটিতে এসে যেই বসল, বউও বসল এসে এবং অনর্গল বকে যেতে লাগল।

কি করে চলবে সমস্ত মাস? যে কাপড় মিলে নষ্ট হয়েছে তা বাজারে বেচে কি দশ টাকা উঠবে? পাঁচ টাকা, বড় জোর ছয় টাকা—তার বেশি কেউ দেবে না। ফি মাসে দেখছি তো! আমি এ মাসে অবশ্য ষোলো টাকা রোজগার করেছি—কিছু চাল কিনতে পারব। কিন্তু তোমার জামা যে ছিঁড়ে গেছে একেবারেই তা কি করে হবে? ছেলেটা বাবুদের জুতোয় কালি-বুরুশ করে রোজ দু-তিন আনা রোজগার করতে পারে অবশ্য। কিন্তু সেও যদি বাইরে যায়, ছোট ছেলেগুলোকে খাওয়াবে কে? আমি তো বাড়িতে থাকি না। কোলের ছেলেটাকে আপিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাই, নেশা ছুটে গেলেই সে উঠেই চেঁচাবে খাওয়ার জন্যে। পেট ভরে মাই খাইয়ে যেতে পারি না, বুকে দুধই নেই, খাওয়াব কোথা থেকে? ছটা মরেছে, এটাও যাবে। দশজনকে পেটে ধরেছিলাম, চারটি বেঁচে আছে, তাও কোনক্রমে। মায়ের যত্ন না পেলে কি ছেলে বাঁচে? আমি যত্ন করি কখন, রোজগার করতে না বেরুলে যে পেট চলে না। আচ্ছা, আমাদের ঘরে তো জায়গা আছে—আরও দুজনে ভাড়াটে নিলে কেমন হয়? দুজন কুলী আজ আমায় বলছিল। দুটো লোক অনায়াসেই নেওয়া যায়। অনেকটা সাহায্য হয় তা হলে। সমস্ত দিন ছেলেগুলো খিদেয় কাঁদে, রাত্রে একটু পেট ভরে খেতে দিতে পারি তা হলে।

দশ ফিট বাই দশ ফিট ঘরের মধ্যে আরও দুজন পুরুষ ভাড়াটে নেবার প্রস্তাবে সনু যেন ক্ষেপে উঠল। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে অশ্লীল ভাষায় সে গালাগালি দিতে শুরু করলে। বউকে গাল দিলে, মিলের মালিককে গাল দিলে, ক্যাশিয়ারকে গাল দিলে, কাবুলীকে গাল দিলে, বাড়িওয়ালাকে গাল দিলে, ভগবানকে গাল দিলে। পরিশ্রান্ত হয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ল খানিকক্ষণ পরে। মনে পড়ল, চোদ্দ বছর আগে বিয়ে করবার জন্যে কাবুলীর কাছে যে টাকা সে ধার করেছিল, তা রোজই বেড়ে যাচ্ছে। প্রতি মাসে ছয়টাকা আট-টাকা, কোন মাসে দশটাকাও সে দিয়েছে, শোধ কিন্তু হচ্ছে না। অতীতের কথা মনে পড়ল।...তার নিজের বয়স যখন সাত-আট বছর, তখন তার মা তাকে নিয়ে বম্বেতে এসেছিল। মা মিলে কাজ করত, সে খেলা করে বেড়াত রাস্তায়। মাঝে মাঝে একটা স্কুলেও যেত। ....তার বড় ছেলেটাকে ইস্কুলে দেবার কথা মনে হয় তার। কিন্তু ছেলেটা যেতে চায় না। সে বুঝেছে যে, স্কুলে গিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে জুতো বুরুশ করে যদি সে রোজ তিন-চার আনাও রোজকার করতে পারে, বাবা-মার সাহায্যে হয়। ছ বছরের মেয়েটা রাস্তার নালার ধারে খেলা করে

বেড়ায় সমস্ত দিন। ছোট শিশু দুটো পড়ে থাকে অন্ধকার ঘরটার মধ্যে আপিঙের নেশায় অজ্ঞান হয়ে।....আরও যদি কিছু টাকা থাকত! আর চারটি বেশি ভাত, আর একটু বেশি ডাল মেখে দিয়ে খেতে পারতাম। তাড়ি তো খেতেই পাই না আজকাল। একটা ধুতি, একটা জামা আর না কিনলে চলছে না। বউটাকে কতদিন বলেছি, আসছে মাসে ঠিক একখানা নতুন শাড়ি কিনে দেব। কিছুতেই হয়ে উঠছে না। টাকার অভাবে কতদিন যে দেশে যাই নি!.....ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সনু। বউটা আগেই ঘুমিয়েছিল। ঘুমের জন্যে দাম দিতে হয় না, তাই তারা ওই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে ঘরের মেঝেতেই শুয়েই প্রাণ ভরে ঘুমুতে লাগল।

এ গল্পে এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। এই সনু যদি সপরিবারে জেলে একসঙ্গে থাকবার হুকুম পায়, জেলে যাবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠবে ও। কিন্তু যিনি কমিউনিস্ট্ সমাজকে রূপান্তরিত জেল বলে ঠাট্টা করেন তিনি জানেন না যে, একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজেই সভ্য মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পাবার আশা করতে পারে। কারণ স্বাধীনতার বাধা যে আধিভৌতিক সমস্যা, তার সমাধান সে সমাজে করেছে। একটা কথা অবশ্য মনে রাখা উচিত। যে কোন সমাজে বাস করতে গেলেই অনিবার্যভাবে খানিকটা পরাধীনতা স্বীকার করতেই হয়, প্রত্যেকে সমাজেরই নিজস্ব আইন-কানুন আছে এবং তা না মেনে সে সমাজে বাস করা যায় না। কমিউনিস্ট্ সমাজেরও নিজেদের আইন আছে এবং সে আইন হয়েছে ওই সনুদের বাঁচাবার জন্যে। সে সমাজে শুধু সনুরাই বাঁচবে না, কর্মী মাত্রেই বাঁচবে সেখানে। সেখানে স্থান নেই কেবল অলসের। এই সমাজের বিধি-ব্যবস্থা যাঁদের কাছে জেলের বিধি-ব্যবস্থা। বলে মনে হয়, তাঁরা যে কি করে হিন্দু সমাজের হাজার রকম কুপ্রথা মেনে ইংরেজ শাসনের স্টিলফ্রেমের মধ্যে টিকে আছেন জানি না। তাঁরা হয়তো বলবেন, এর মধ্যেও আমরা স্বচ্ছন্দে নেই—এ-ও আমরা চাই না, আমরা স্বাধীনতা চাই। কমিউনিস্ট্ সমাজের স্বাধীনতাও যদি তাঁদের রুচিকর না হয়, তা হলে আর কি রকম স্বাধীনতা যে তাঁদের কাম্য হতে পারে, তা তো ভেবে পাই না। নিরঙ্কুশ বর্বরের আত্মসর্বস্ব স্বাধীনতা? সে রকম স্বাধীনতা ছিল অতীতকালে বন্য মানব-সমাজের দলপতিদের, এখন আছে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের বিজ্‌নেস-ম্যাগনেটদের। সেকালের বন্য মানব-সমাজ অবলুপ্ত হয়েছে, একালের ক্যাপিটালিস্ট্ সমাজও হবে। ওদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। সুতরাং সে রকম স্বাধীনতা যদি কারও কাম্য হয়, তার লোভ ছাড়তে হবে তাঁকে। এ ধরনের স্বাধীনতা-কামী ছাড়া আর একদল লোক আছেন, যাঁরা কমিউনিজ্‌মের বিরোধিতা করেন হিন্দুসভ্যতার প্রতি ভক্তির আধিক্যবশত। তাঁরা বলেন, এবং আমিও সে কথা বিশ্বাস করি, হিন্দুসভ্যতার মধ্যে ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল না। পঞ্চায়েৎ-শাসিত গ্রামে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত সবাই। অশোক হর্ষবর্ধন প্রভৃতির উদাহরণ উদ্ধৃত করে সেকালকে ফিরিয়ে আনতে চান তাঁরা। ফিরিয়ে আনতে পারলেও আমরা সুখী হতাম না। কারণ নানা দিক দিয়ে একাল অনেক এগিয়ে গেছে। মানবের মনীষা স্থাণু হয়ে বসে নেই এক জায়গায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তি আমাদের হবে না আশা করি। হওয়া উচিতও নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর ফলে যে মানবসমাজের অনেক উন্নতি হয়েছে, সময় এবং দূরত্বকে জয় করতে পেরেছি আমরা, বহু ভয়াবহ ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, যে প্রকৃতিকে একদিন নিয়তির মত ভয় করতাম, তাকে দাসীর মত খাটাচ্ছি আজ। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর সুবিধে নিয়ে একদল চতুর স্বার্থপর লোক নিজেদের বড় করে তুলেছে অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত করে। উদ্ভব হয়েছে ক্যাপিটালিজ্‌মের। যেসব যন্ত্র মানব-সমাজের উপকার লাগত, সেই সব যন্ত্র দিয়েই তারা পেষণ করছে অধিকাংশকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্যে। এরোপ্লেন থেকে বম পড়ছে, রেডিও

দিয়ে মিথ্যে প্রচার হচ্ছে, মিলে-ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে জীবন-ধারণের উপযোগী বস্তুসম্ভার নয়—যুদ্ধের মাল-মসলা; এবং তার জন্যে খেটে মরছে যেসব মজুরের দল তারা মরছেই, বাঁচছে না কেউ। বৃদ্ধি পাচ্ছে কেবল ক্যাপিটালিস্টদের মেদ-ভার। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানবসমাজের এই যে দুর্গতি হয়েছে, তা থেকে তাকে বাঁচাতেই হবে—এই হচ্ছে কমিউনিজ্‌মের লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমস্ত সুবিধা সবাই সমান ভাবে ভোগ করবে। যে সাম্য যে উদারতার জন্যে তোমরা হর্ষবর্ধনের আমলকে ফিরিয়ে আনতে চাও, কমিউনিস্ট্‌রা সেই সাম্য, উদারতাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন এ যুগে। অর্থাৎ হর্ষবর্ধনের আমলের উদারতার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে সর্বজনহিতকরভাবে মেলাবার চেষ্টার নামই কমিউনিজ্‌ম। সে চেষ্টা যদি সার্থক হয়, তা হলে আমরা যতটা খুশি হব, অপরিবর্তিত হর্ষবর্ধনের যুগ ফিরে পেলে ততটা হব কি না সন্দেহ। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। হিন্দুসভ্যতায় আর্থিক ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল না হয়তো, কিন্তু মানসিক ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল। ব্রাহ্মকে সমাজের শিরোমণি বলে মানতে হত সবাইকে। সে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যতদিন বজায় ছিল, ততদিন কোনও গোল ছিল না; তাঁর বিদ্যাবত্তা চরিত্রবল স্বতই সকলের শ্রদ্ধা উদ্রেক করত, শ্রদ্ধা আদায় করে বেড়াবার প্রয়োজন হত না তাঁর। কিন্তু তাঁর মূর্খ বংশধরেরা যখন কেবলমাত্র অর্কফলা ও উপবীত আস্ফালন করে সে সম্মান দাবি করতে লাগলেন এবং নানা ফন্দির-ফিকির করে তা আদায়ের ব্যবস্থা করলেন, তখনই ক্যাপিটালিজ্‌মের মত কুৎসিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। টিকি-তিলকধারী আচার-সম্বল ভণ্ডের প্রভুত্ব বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানের সহায়ক হল। বৌদ্ধধর্মেও এই দোষ দেখা দিয়েছে পরে, এবং এর বারম্বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে ইতিহাসে। হেরিডিটি নিয়ে অনেকে তর্ক করেন। বলেন, ব্রাহ্মণের ছেলেরই তো ব্রাহ্মন হওয়ার কথা। হেরিডিটি সম্বন্ধে জ্ঞান আর একটু বেশি থাকলে এ কথা বলতেন না। হওয়ার কথা নয়, হওয়ার সম্ভাবনা, পারিপার্শ্বিক এবং আরও বহুবিধ অবস্থা যদি অনুকূল থাকে। তা ছাড়া অত সূক্ষ্ম তর্কেরই বা প্রয়োজন কি? দেশ জুড়ে যেসব রাঁধুনি-বামুন, মূর্খ পুরুত, ভণ্ড বাবাজী, শিষ্যালোলুপ গুরুর দল, কিলবিল করে বেড়াচ্ছে, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তো বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেও এরা ব্রাহ্মণ হয় নি। এই অযোগ্যদের চরণে মাথা নত করতে বাধ্য করে হিন্দুসমাজ এক হিসেবে ক্যাপিটালিজ্‌মকেই প্রশয় দিয়েছে।

এতক্ষণে তুমি বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠেছ। বিশ্বাস কর, আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপে করবার চেষ্টা করেছি। কমিউনিজ্‌মের মূল কথাটা তোমাকে বললাম, এর শাখা-প্রশাখা অনেক আছে; ভয় নেই, সে সম্বন্ধে কিছু বলবে না। সেগুলোতে datails- এর তফাত খালি। কিন্তু একটা কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতবর্ষে যে কমিউনিস্ট মুভমেণ্ট হয়েছে, তার উদ্দেশ্য এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কিছু বলা উচিত। সব কথা অবশ্য বলা যাবে না, যেহেতু আমরা এখনও 'বে-আইনী'। এ চিঠি যদি ধরা পড়ে, তুমি-আমি দুজনেই বিপদে পড়ব। লুকিয়ে এ চিঠি পাঠাচ্ছি—জেলের বাইরে লুকিয়ে পোস্ট্ করে দেবে একজন। সুতরাং এ চিঠিতে সব কথা খোলাখুলি লেখা নিরাপদ নয়। মীরাট মামলার সরকারী উকিলের সওয়ালে আর জজেদের রায়ে আমাদের ইতিহাস খানিকটা নিবদ্ধ আছে। খবরের কাগজে কিছু বেরিয়েছিলাম, তুমি পড়েছ কি না জানি না।

কানপুর কমিউনিস্ট্ মামলার সময়েই সর্বপ্রথমে লোকে জানতে পারে যে, ভারতে কমিউনিস্ট্ পার্টি বলে একটা পার্টি আছে। তার আগে এর নামই শোনে নি কেউ। আমার যতদূর মনে পড়ে, বিঁটলভাই প্যাটেলের আনুকূল্যে মিস্টার ডাংগে প্রথমে সোশ্যালিজ্‌ম-আন্দোলন শুরু করেন বম্বেতে। আমি তখড় সবে কলেজে ঢুকেছি, চৌরিচৌরা হয়ে গেছে। মহাত্মাজী আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ

করে দিয়ে জেলে গেছেন। চরকা চালানো, অস্পৃশ্যতা-পরিহার, মাদকদ্রব্য-বর্জন, বিদেশী-বয়কট— এসব ছাড়া দেশে তখড় উগ্রতার আর কিছু হচ্ছে না। দেশবন্ধুর দল অধরা হয়ে কাউন্সিলে ঢোকবার আয়োজন করছেন। কমিউনিস্ট্‌দের তখন দল বলে কিছু নেই। দুচারজন লোক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছেন দেশের মধ্যে। কিছুদিন পরে বাংলা দেশে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজ্যান্ট্‌স পার্টি স্থাপিত হল কলকাতায়। আমি যোগ দিলাম তাতে। প্রথম আমিও যে সকলের মত মহাত্মাজীর স্বদেশী-আন্দোলনে মেতেছিলাম, তার প্রধান কারণ ছিল—তাঁর অভিযান ইংরেজদের বিরুদ্ধে, যে ইংরেজ, ক্যাপিটালিজ্‌মের প্রতীক হিসেবে, আমাদেরও শত্রু। পরে আবিষ্কার করলাম, ভারতের স্বাধীনতা অপহারক যে ইংরেজ, তারই সঙ্গে বিরোধ তাঁর, ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে তাঁর কোনও শত্রুতাই নেই, বরং ভারতের ক্যাপিটালিস্ট্‌দের পক্ষপটু দিয়ে ঢেকে রক্ষা করবারই আগ্রহ তাঁর। এ কথা আবিষ্কার করার পর আর কংগ্রেসের ওপর কোন আস্থা রইল না। যদিও তার কিছুদিন আগে লাহোরে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে দেশবন্ধু সভাপতির অভিভাষণে তারস্বরে বলেছিলেন, স্বরাজ আমরা সকলের জন্যে চাই, একটা বিশেষ শ্রেণীর জন্যে নয়। টাটার লেবার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও ছিলেন তিনি কিছুদিন, কিন্তু তার উক্তিকে কাজে পরিণত করতে হলে জনসাধাণের মনে যে প্রেরণা জাগানো উচিত ছিল, তাদের আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার যে ব্যপক আয়োজনের প্রয়োজন ছিল, সেসব কিছুই করতে দেখলাম না তাঁকে। ভোট-সংগ্রহ করে স্বরাজ্য-পার্টি গড়ে কাউন্সিলের সৌধমঞ্চে তিনি সেই জাতীয় উন্মদনা সৃষ্টি করতে মত্ত হলেন, যা দানীবাবু শিশিরবাবু বহুবার করেছেন রঙ্গমঞ্চে এবং যা আমরা প্রতিদিন উপভোগ করি খেলার বা ঘোড়-দৌড়ের মাঠে। কাগজে কাগজে তাঁর জয়জয়কার হতে লাগল, কিন্তু যে জনসাধারণের জন্যে তিনি স্বরাজ অর্জন করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে গেল। তাঁর শিষ্য সুভাষবাবুরও অনুরূপ ব্যবহার দেখলাম। ইনি যদিও অনেক শ্রমিক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু দেশের ধনিকরা এঁকে শ্রমিকসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু দেশের ধনিকরা এঁকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রের মত ব্যবহার করেছে অনেকবার। এঁরা বড় বক্তা, বিরাট বিদ্বান, অসাধারণ মেধাবী, রাজনৈতিক দাবাখেলায় সুদক্ষ, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের কেউ নন এঁরা। আমার মনে হল ইংরেজদের তাড়িয়ে কংগ্রেস সত্যিই যদি স্বরাজ পান, তা হবে বড়লোকদের স্বরাজ, যেসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে কবি ভাষা ফোটাতে চেয়েছিলেন, তারা মূঢ় ম্লান মূকই থেকে যাবে। আর একটা মজার ব্যাপার, এই সময় সকলে তখন বলতে লাগল, মহাত্মা গান্ধীই জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ এনেছেন। ঠিক ভাষা হত 'মত্ততা এনেছেন' বললে। নিজেদের উন্নতি-অবনতি, সুখ-দুঃখ বিস্মৃত হয়ে মহাত্মাকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সবাই। অর্থাৎ যে কর্তা-ভজা মনোবৃত্তির জন্য ভারতের অধঃপতন, সেই অন্ধ-ভক্তির শিখরে দাঁড়িয়েই গান্ধীজী মহাত্মা হলেন এবং অশিক্ষিত লোকের মনে সেই সব আশা-ভরসা জাগিয়ে তুললেন (হয়তো অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও), যা সফল হওয়া কলিকালে অন্তত অসম্ভব। এ যুগে যন্ত্রসভ্যতাকে অস্বীকার করে রাম-রাজত্ব স্থাপনের প্রয়াস থেকে তিনি কিন্তু নিবৃত্ত হলেন না কিছুতেই। দুর্বল অশিক্ষিত লোকেদের সবল শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা না করে তাদের শোনালেন অহিংসা-মন্ত্র, এবং বয়কট করতে বললেন শিক্ষা। শিক্ষা শব্দটার পূর্বে বিদেশী বিশেষণটা থাকাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জন করাটাই স্বদেশ ভক্তির অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। মূর্খের মূর্খতাটাই হয়ে উঠল গর্বের বস্তু। শুনেছি নাকি স্বদেশের কাজে নামবার আগে গোখ্‌লের নির্দেশমত ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছিলেন তিনি। ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেও তিনি যদি এই তাদের মুক্তি উপায় ঠিক করে থাকেন, তা হলে

আমার আর বলবার কিছু নেই। আমি আর একটা কথাও ভেবে পাই না। দরিদ্র জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেলে বড়লোক মিল-ওনারদের সঙ্গে কি করে বন্ধুত্ব রাখা সম্ভব ? মোট কথা, মহাত্মাজীর আন্দোলনে আমি আশ্বাস পেলাম না। যাঁরা হিংস্র পথ অবলম্বন করে লাট-বড়লাট মারছিলেন, তাঁদের কার্যকলাপও আমার প্রাণ স্পর্শ করল না যেন। কতকগুলো সাহেব মেরে লাভ কি ? ফলে নিরাপরাধ বহু লোক নির্যাতিত হবে শুধু। তা ছাড়া, দেশ বলতে সত্যি সত্যি যা বোঝায়, সেই অশিক্ষিত অসহায় নগ্ন রুগ্ন ক্ষুধার্ত জন-মজুর-চাষীব দল, তাদের কি কোনও উপকার হবে দু-চারজন সাহেব মেরে ? আমার তো তা মনে হয় না। তারা সবল হোক, শিক্ষিত হোক, জাগুক—এই আমি চাই।

সুতরাং এদের জাগরণের জন্যেই শেষে আত্মনিয়োগ করলাম আমি পুরোপুরি। আমার কাজ হল তাদের শিক্ষিত করবার চেষ্টা করা, অন্যান্য দেশের শ্রমিকরা কেমনভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে সে খবর তাদের এনে দেওয়া, তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং স্বার্থরক্ষা করা। চরকা বা পতাকা ঘাড়ে করে অহিংস শোভাযাত্রার শোভা-বর্ধন করলে অথবা দু-একটা সাহেব খুন করলে আমার স্বদেশ-সেবার বাজার-দর বেড়ে যেতে পারত কিন্তু যাদের ম্লান মুখে শত শতাব্দীর করুণ কাহিনী লেখা রয়েছে তাদের মুখ চেয়ে ওসব পথে যেতে আমার প্রবৃত্তি হল না।

কাজে নেবে কিন্তু দেখলাম, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করা বড় সহজ কাজ নয়। আমার ভদ্র চেহারা আর ভদ্র পোশাকই প্রথম বাধা হল। প্রথমে আমার কথা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইল না। 'নাইট স্কুল' করলাম, নিজে পড়াবার জন্য রোজ যেতাম, ছাত্রই জুটত না। তা ছাড়া অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর এবং বয়স্ক, অ-আ থেকে শুরু করে তাদের শিক্ষিত করে তোলা সহজও ছিল না আমার পক্ষে। বক্তৃতা করতাম, আমার বক্তৃতার ভদ্র ভাষা কেউ বুঝত না। বক্তৃতা দেবার জন্যে শেষে তাদের মধ্যে থেকেই চালাক-চতুর একজন লোককে বেছে নিয়ে বাহাল করলাম মাসিক ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে। একটা ম্যাজিক-লণ্ঠন এবং স্লাইডও কিনলাম কিছু। অল্পবয়স্কদের অক্ষর-পরিচয় করাবার জন্যেও একজনকে নিযুক্ত করলাম। নিজে রাত জেগে জেগে দেশী-বিদেশী খবরের কাগজ থেকে নানা খবর অনুবাদ করতাম। সেগুলো ছাপাতাম একটা সাইক্লোস্টাইলে। একটা সাইক্লোস্টাইলও কিনেছিলাম সেজন্যে। তোমার মনে আছে কি, একবার একটা নিমন্ত্রণে যাবার সময় শাল আংটি ঘড়ি পরে যাইনি বলে, তোমরা রাগ করেছিলে ? তখন বলিনি, এখন কিন্তু বলতে বাধা নেই, শাল আংটি ঘড়ি আমার ছিল না, সবই বিক্রি করে দিয়েছিলাম এই কাজের জন্যে। দাদু মাসে মাসে আমাকে যে পকেট-মনি দিতেন, কলেজের বই কেনবার জন্যে যে টাকা পেতাম, সবই এর জন্যে খরচ করেছি। লাইব্রেরিতে বসে আর ক্লাসের নোট টুকে পরীক্ষার পড়া করতাম, একটাও বই কিনিনি। নিজের বাহাদুরি করবার জন্যে তোমাকে এসব লিখছি না, যা যা করেছি তাই অকপটে বর্ণনা করছি কেবল। যাদের আমরা বহু যুগ ধরে শোষণ করেছি, তাদের জন্যে এই সব সামান্য ত্যাগ খুব যে একটা বড় কিছু তাও আমার মনে হয় না। যাই হোক, এত করেও কিন্তু মন পাই নি ওদের; যে চালাক-চতুর ছোকরাকে বক্তৃতা দেবার জন্যে বাহাল করেছিলাম, সে আমার সামনে যদিও কমিউনিজমের বক্তৃতা দিত, আড়ালে কিন্তু আমারই নামে লাগাত মনিবদের কাছে গিয়ে। শুধু মনিবদের কাছেই নয়, নিজেদের মধ্যেও গোপনে প্রচার করত যে, আমার মত ধনীর দুলাল ধাওড়ায় যাতায়াত করছে, অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়, মেয়েমানুষের খোঁজে। তার দোষ ছিল না বিশেষ। ইতিপূর্বে দু-একজন ধনীর দুলাল তাদের উপকার করবার ছুতোয়

এসে সত্যিই নারী-ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছিলেন। আমার নিঃস্বার্থ পরোপকারের মর্ম তারা বোঝেনি বলে প্রথমটা আমি মর্মাহত হয়েছিলাম; কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, নিঃস্বার্থ পরোপকারের মর্ম খুব কম লোকেই বোঝে। অধিকাংশ লোকই নিজেরা স্বার্থপর মতলববাজ বলে প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক কাজের পেছনেই মতলব অনুসন্ধান করে, না পেলেও মনে ভাবে, নিশ্চয়ই আছে কিছু একটা। রঘ্‌ঘুকে এজন্যে অপরাধী করি না আমি। সে মনিবদের কাছে আমার নামে লাগাত, সেখানে থেকেও টাকা পেত বলে। যে টাকার লোভ বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সামলাতে পারেন না—যার লোভে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রীধারীরাও মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখছেন, মিথ্যে রায় দিচ্ছেন, মিথ্যে মকদ্দমা করছেন, বস্তুত না করছেন হেন অপরাধই নেই—তার লোভে পড়ে রঘ্‌ঘুও যদি এ কাজ করে থাকে, খুব বেশি দোষ কি দেওয়া যায় তাকে? অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অসুখের এপিডেমিক যেমন স্বাভাবিক, ক্যাপিটালিজ্‌মের আওতায় অর্থগৃধ্নুতাও তেমনই একটা স্বাভাবিক জিনিস। কারণ নিছক পরিশ্রম বা যোগ্যতার পরিবর্তে এ সমাজে সসম্মানে সৎপথে থেকে সুখে জীবনযাপন করা যায় না, অথচ কিছুমাত্র পরিশ্রম না করে অযোগ্যতম ব্যক্তিও রাজার হালে থাকতে পারে টাকা থাকলে। তাই সবাই টাকা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়। রঘ্‌ঘুও হয়েছিল। পরে এসব কথা ভেবে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি। তখন কিন্তু দুঃখ হয়েছিল খুবই, বিশেষ করে যেদিন আমার ম্যাজিক-লণ্ঠনটা চুরি গেল! এত কষ্ট হয়েছিল যে, পুলিসে খবর পর্যন্ত দিয়েছিলাম। পুলিস অবশ্য এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি, তারা তখন মদের দোকানে পিকেটিং বন্ধ করতে ব্যস্ত ছিল। আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেও দুঃখ পেয়েছিলাম। দিস্তা দিস্তা কাগজ কিনে যেসব জিনিস আমি সাইক্লোস্টাইল করতাম, তা সবাই আগ্রহ করে নিত। এক দিন আবিষ্কার করলাম, তা তারা নেয় পড়বার জন্যে নয়, জিনিসপত্র মুড়ে নিয়ে যাবার জন্যে। তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি করবার চেষ্টাও আমার সফল হয়নি। যেখানে সেখানে থুতু ফেলা অন্যায়, ঘরের আশপাশে জল জমতে দেওয়া উচিত নয়, ঘরদোর বিছানাপত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার না রাখলে নানা রকম অসুখ হয়, মশা-মাছি-ছারপোকা থেকে আত্মরক্ষা মানে যে নানাবিধ রোগ থেকেই আত্মরক্ষা, ঘরের কপাট-জানালা যতদূর সম্ভব খুলে রাখাই উচিত— আমার এই সব বক্তৃতা শুনে তারা হাসত। দু-একজন মাঝে মাঝে আমার প্রতি দয়া-পরবশ হয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করত, কিন্তু তা দু-একদিন। একটি পথ দিয়ে গিয়ে কেবল তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিলাম। যখন তাদের বোঝাতে পারলাম যে, দিন-রাত পরিশ্রম করে তারাই মিল চালাচ্ছে, অথচ মোটা মুনাফাটা যাচ্ছে কতকগুলো অকর্মণ্য লোকের পকেটে, তখন যেন তাদের একটু সাড়া পেলাম। ধর্মঘট করে তাদের দাবি জাহির করতে পারলে ওই সব মেকী মালিকেরা যে সব দাবি মেটাতে বাধ্য হবে, এ কথা শুনে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল তারা। ক্যাপিটালিস্ট্‌ সমাজে ওই একটি মাত্র জিনিস আছে, যা লোকের প্রাণে সত্যিকারের উৎসাহ জাগাতে পারে—বক্তৃতা নয়, আদর্শ নয়, মহত্ব নয়—টাকা। আয় বাড়াবার লোভ দেখাতেই ওদের ঘুম ভাঙল যেন। আমাদের পাড়ার 'মিলে' কুলী-স্ট্রাইক আমিই যে করেছিলাম, তা বোধহয় জান। কিন্তু তার জন্যে কি বেগ যে আমায় পেতে হয়েছে, তা বোধ হয় জান না। আমার কথায় তারা তো স্ট্রাইক করলে, কিন্তু আড়াই শো বুভুক্ষু পরিবারের দিন চলা ভার হয়ে উঠল, যখন মুদীরা ধার দেওয়া বন্ধ করে দিলে। এটা যে সম্ভব, তা আমি কল্পনা করিনি। মুদীরা যে কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে যোগ দেবে, এ কথা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাদের আমি স্বদলভুক্ত মনে করেছিলাম।

কর্তৃপক্ষ নাকি অগ্রিম টাকা দিয়ে তাদের সব জিনিস কিনে নিয়েছিলেন। সাত দিন কাটতে না কাটতে অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। তারা দলে দলে এসে আমাকে বলতে বাধ্য হল, অবিলম্বে খাওয়ার বন্দোবস্ত না করলে কাজে যোগ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তাদের। আমার রোখ চড়ে গিয়েছিল। বললাম, তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আমিই করব, তোমরা এক মাস অন্তত কাজে যোগ দিও না বলে তো বসলাম, কিন্তু পরে হিসেবে দেখলাম আড়াই শো পরিবারে খাওয়ার ব্যবস্থা করা মানে দৈনিক আড়াই শো টাকার ব্যবস্থা করা অন্তত। আমার নিজের হাতে তখন কিছু নেই। মেডেলগুলো পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছি। এক মাস যদি স্ট্রাইক চলে, প্রায় আট হাজার টাকার দরকার। ধার করবার জন্যে বেরুলাম। বড়লোক বন্ধু যারা ছিল, সব হিতৈষী হয়ে উঠল একযোগে। কেউ আমায় পাগল ভেবে চিন্তিত হল কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করলে, কেউ রাগ করলে, কেউ হাসলে—টাকা কেউ দিলে না। কাবুলীরা বিনা বন্ধকে অত টাকা দিতে রাজী হল না। আমার তখন বন্ধক দেওয়ার মত কিছু নেই। বাবা-মাকে এ কথা বলতেই সাহস হল না আমার। সাহস হলেও সফল হতাম কি না সন্দেহ। কারণ বাবা নিজেই তখন চর্তুদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন টাকা ধার করবার জন্যে। মাকে ধরে পড়লে তাঁর গয়নাগুলো দিতেন হয়তো, কিন্তু কেঁদে কেটে এমন একটা অনর্থ করতেন যে, মুশকিলে পড়ে যেতাম আমি। এই ভয়ে পারতপক্ষে বাড়িতে এসব আলোচনাই আমি করতাম না কারও সঙ্গে। মরিয়া হয়ে শেষে অসমসাহসিক কাজ করে ফেললাম একটা। দমদমে গিয়ে দাদুকে সব কথা খুলে বললাম। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে যে আলাপ হয়েছিল, তার প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট মনে আছে আমার এখনও।

সব শোনবার পর তিনি বললেন, মিলের কুলীদের জন্যে তোমার হঠাৎ এত দুঃখ হল কেন?

বড়লোক মিল-ওনার ওদের ঠকাচ্ছে বলে।

ঠকাচ্ছে? যে মাইনে দেবে বলেছিল, তা দিচ্ছে না?

যা দিচ্ছে, সেটা অত্যন্ত কম।

অত কমে ওরা রাজী হল কেন?

রাজী না হয়ে উপায় কি? স্বেচ্ছায় ওর বেশি কেউ দেবে না।

দেবে কেন, ওই হল ওদের বাজার-দর। কুলী আবার কত মাইনে পাবে?

বুঝলাম, দাদুর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। যে লোকের সা-রে-গা-মা-সম্বন্ধে ধারণা নেই, তাকে বেহাগ-ভৈরবীর তফাত বোঝাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম।

চুপ করে রইলাম। দাদুই কথা কইলেন আবার।

কুলীকে তুমি বাবু বানাতে চাও নাকি?

কুলীকে আমরা কুলী করে রেখেছি বলেই সে কুলী। বাবু হতে তার বাধা কি? সেও তো মানুষ।

ও, বটে।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, অতএব এই মহৎ কর্ম করবার জন্যে তুমি এনতার টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হয়েছ।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আমার সর্বস্ব, এমনকি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কেটে দিতে আমি প্রস্তুত আছি ওদের বাঁচানোর জন্যে।

কিন্তু সেটা ধীরে-সুস্থে করলে ক্ষতি কি? এক্ষুনি আট হাজার টাকাই খরচ করতে হবে?

এক্ষুনি আট হাজার টাকা না পেলে আমার মান থাকবে না; আমার কথায় আড়াই শো লোক স্ট্রাইক করে অনাহারে আছে—আমি কথা দিয়েছি, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করব।

কথা দিয়েছ?

হ্যাঁ।

তা হলে এ নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। ভদ্দরলোকের কথার দাম আট হাজার টাকার চেয়ে নিশ্চয় বেশি। নিয়ে যাও। কিন্তু তোমার হিসেবে এটা লেখা থাকবে, মনে থাকে যেন। আর তোমার ওই প্রোলিটারিয়েদের এত লম্ফঝম্প যে একজন ক্যাপিটালিস্টের ফুলিশ উদারতায়, সে কথাও তারা ভুলে যাবে না আশা করি।

দাদু সেদিন টাকাটা না দিলে যে কি করতাম, জানি না। তারপর থেকেই আমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হল যে, আয় বাড়াবার প্রলোভন না দেখালে শ্রমিক-কিষাণ কারও সাড়া পাওয়া যাবে না এবং বার বার আমি একা তার তাল সামলাতে পারব না। সুতরাং পার্টিতে যোগ দিতে হল। প্রথম প্রথম অবশ্য কিছুদিন আমরা একটা ঘরে বসে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিনি, কারণ কাজ করবার মত যথেষ্ট অর্থ আমাদের হাতে ছিল না তখন। শুধু বক্তৃতা করে শ্রমিক বা কৃষকের মন গলানো যায় না, তারা হাতে হাতে ফল দেখতে চায়। তবু কিন্তু আমাদেরই চেষ্টায় এই সময় খড়গপুর রেলওয়ে স্ট্রাইকটা হয়েছিল, যদিও সেটা বিশেষ কিছু নয়। আর এই সময়টা মাঝে মাঝে প্রায়ই জামসেদপুর যেতাম সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্যে। ছোটকাকা সেই সময় জেল থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে নিয়ে দিনকতক হৈ-চৈ করলাম। কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়, তিনি ছোটকাকা বলে। দেশের জন্যে তাঁর ত্যাগটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া কাকীমা চলে যাওয়াতে ব্যাপারটা সত্যিই নিদারুণ হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। তাই তাঁকে ঘিরে একটা উৎসব-কোলাহল সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। কিন্তু সেসব যে তাঁর চিত্ত স্পর্শ করতে পারেনি, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যেত। এ ছাড়া আর কোনও দিক দিয়ে কংগ্রেসের ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলাম বলে মনে পড়ে না। এমন কি, সাইমন-কমিশন-বয়কট হুজুগে মাতবারও প্রেরণা পাইনি আমি, যদিও আমাদের দলের জনকয়েক খুব মেতেছিল এ নিয়ে। লর্ড বার্কেন্‌হেডকে মুখের মতন জবাব দেবার জন্যেও দিল্লীতে যখন অল পার্টিজ কন্‌ফারেন্স চলছিল এবং কন্‌স্টিটিউশনে শতকরা কতজন হিন্দু, কতজন মুসলমান, কতজন শিখ থাকবে.....এ নিয়ে যখন নেতারা মাথা ঘামাতে লাগলেন এবং অবশেষে মতিলাল নেহেরুকে মহাত্মা গান্ধী যখন ভার দিলেন রিপোর্ট তৈরি করবার, তখনও তাতে উল্লসিত হবার কোন হেতু ছিল না আমার দিক দিয়ে। আমার মনে হয়েছিল, সাইমন কমিশন এবং নেহেরু কমিশন একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ, দেশের নাইন্টিএইট পার্‌সেন্টদের জন্যে যে সাম্য আমার কাম্য, তার আভাসমাত্র সাইমন বা নেহেরু কেউ দেবেন না। সুতরাং ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি।

কিছুদিন পরে সহসা কিন্তু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম বারদোলির খবর পেয়ে। গভর্মেন্ট খাজনা বাড়িয়েছেন বলে সেখানকার চাষীরা খাজনা দিতে অস্বীকার করেছে। বল্লভভাই প্যাটেল তার নেতৃত্ব করেছেন। আমি আর কলকাতায় থাকতে পারলাম না। চলে গেলাম বারদোলিতে। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তা অপূর্ব। বারদোলির কৃষকদের বীরত্ব ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হতে দেখলাম আমার চোখের সামনে। আবালবৃদ্ধবনিতার যে শৌর্য, যে আত্মত্যাগ সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা সত্যি সত্যিই যদি সারা ভারতের শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারত, তা হলে ভাবনা ছিল না।

বারদোলিতে হয়েছিল বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যে। মহাত্মাজী তাঁকে যে 'সরদার' উপাধি দিয়েছিলেন সত্যিই সর্বতোভাবে তাঁর উপযুক্ত তিনি। যদি আর কিছু না করে তাঁর এই সঙ্ঘবদ্ধ করবার শক্তিকে জনসাধারণের কাজে লাগাতেন, মস্ত বড় কাজ হত একটা। এই শক্তিমান পুরুষ তা হলে খুব বড় একজন কমিউনিস্ট নেতা হতে পারতেন। কিন্তু জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে, শক্তিমান করে তোলবার আগ্রহ এঁদের ততটা নেই, যতটা আছে ইংরেজকে জব্দ করবার আগ্রহ, এবং সেই উদ্দেশ্যেই এঁরা সঙ্ঘবদ্ধ অন্ধ জনতাকে মাঝে মাঝে অস্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। অন্ধ জনতা মাথা তুলতে পারেনি। সরদারজীর স্থান নেবার মত দ্বিতীয় লোক সেখানে দেখা যায়নি। ইংরেজকে জব্দ আমরাও করতে চাই, কিন্তু তার চেয়েও আমরা বেশি করে চাই জনসাধারণকে নিজের শক্তির সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে। তা যদি করতে পারি, ইংরেজ আপনিই জব্দ হয়ে যাবে। একজন গান্ধী, একজন বল্লভভাই, একজন সুভাষ, একজন নেহেরু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাই না আমরা। আমরা ঘরে ঘরে গান্ধী-বল্লভভাই-সুভাষ-নেহেরুকে পেতে চাই এবং তা পাওয়া সম্ভব হবে যদি আমরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিক্ষা দিতে পারি, যা গান্ধী-বল্লভভাই-সুভাষ-নেহেরু বরাবর পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর-ফ্যারাডে দীন-দরিদ্রের ঘরে জন্মেও বড়লোক হতে পেরেছিলেন—এ কথা উল্লেখ করে যাঁরা সাম্যবাদের সমালোচনা করেন, নির্মম দারিদ্রের পেষণে কত প্রতিভা যে অকালে নষ্ট হয়ে যায়, সে খবর তাঁরা রাখেন না। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। জামালপুরের শ্রমিকদের অবস্থাটা কি রকম দেখতে গিয়ে অপরূপ জিনিস দেখেছিলাম একবার একটা। দেখলাম, ওয়র্ক্‌শপের জিনিসপত্র দিয়ে একটা বারো বছরের ছেলে ছোট্ট একটা এঞ্জিন বানিয়েছে। অল্প কয়লাতে বেশ খানিকক্ষণ চলে সেটা। সেই এঞ্জিনের সাহায্যে ছেলেটা নিজের ঘরে টানা-পাখা লাগিয়ে দিব্যি হাওয়া খায় রোজ। দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। বললাম, তুমি এটা পেটেন্ট কর, খরচ যা লাগে আমি দেব। এই কথা শুনে তার বাপ-মা ভয় পেয়ে গেল। ওয়র্ক্‌শপের জিনিসপত্র চুরি করে জিনিসটা তৈরি হয়েছিল, জানাজানি হয়ে গেলে তাদের চাকরি থাকবে না। পরে খবর পেয়েছি, সে ছেলে বিদ্যাসাগরও হয়নি, ফ্যারাডে ও হয়নি। হয়ে ছিল ওই ওয়ার্কশপেরই একটা নগণ্য মজুর। ওভার-টাইম খেটে, না খেতে পেয়ে যক্ষ্মা হয়ে মরেছিল, শেষ কালে। সোভিয়েট দেশে তার এ পরিণতি হত না বোধ হয়। নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরে যাওয়াই স্বাভাবিক, বেঁচে থাকাটা আকস্মিক, বড় হওয়া সুদূরপরাহত। তা ছাড়া দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ না করতে হলে বিদ্যাসাগর-ফ্যারাডে যে আরও বড় হতেন না, তাই বা কে বললে, তাঁদের?

বারদোলি থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম। এসে পড়লাম অল-বেঙ্গল স্টুডেন্ট্‌স কন্‌ফারেন্সের হিড়িকে। পণ্ডিত জওহরলাল সভাপতি। তুমি সেই সময়টা তেতলার ঘরে খিল দিয়ে ছবি-আঁকায় মগ্ন থাকতে বলে বোধ হয় টের পাওনি যে, তখন ছাত্রমহলে কি উত্তেজনাটা হয়েছিল। জওহরলালের বক্তৃতায় কমিউনিজ্‌মের অনেক খোরাক ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, জওহরলালই কমিউনিজ্‌মের সুরটা ভালভাবে তুলেছিলেন আমাদের মনে। তখন খুব ভাল লেগেছিল, পরে কিন্তু পণ্ডিতজীর ব্যবহারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এখন বুঝেছি, কমিউনিজ্‌ম তাঁর প্রাণের জিনিস নয়, মুখের কথা মাত্র। তিনি তাঁর শিক্ষা এবং চিন্তার মারফৎ—অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক্যাল—কমিউনিজ্‌মের যে অনিবার্যতা

অনুভব করছিলেন, তাই ওজস্বিনী ভাষায় বলে বেড়িয়েছেন সভায় সভায়, কিন্তু আসলে অর্থাৎ মনেপ্রাণে তিনি একজন অ্যারিস্টক্র্যাট, ঐশ্বর্যের কোলে লালিত-পালিত মতিলাল নেহেরু একমাত্র পুত্র, নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর মন যে ছাঁচে ঢালা তা আমীরী ছাঁচ। তাকেই হেড এবং হার্টের সঙ্গে তাঁর এত বিরোধ এবং তাই তাঁর কমিউনিজ্‌মের এত বক্তৃতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বাপুজীর কাছে তাঁকে হার মানতে হয়েছে। সুভাষবাবুর সঙ্গে যদিও আমার মতের পুরোপুরি মিল নেই, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে বাহাদুরি দিই আমি। মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের ধ্বজাটা তিনি উঁচু করেই রাখতে পেরেছেন। আমার নিজেরই অতীত মাঝে মাঝে ভীত করে তোলে আমাকে। যে ক্যাপিটালিজ্‌মের বীজ আমার রক্তধারায় সুপ্ত আছে, তা একদিন জেগে উঠে আমার এতদিনকার গড়া আর্দশের অট্টালিকায় ফাটল ধরিয়ে দেবে না কি, কে জানে! সান্ত্বনা পাই টল্‌স্টয় এবং আরও অনেক বড়লোকের কথা ভেবে, যাঁরা টাকার দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড় ছিলেন, তবু কিন্তু যাঁরা মানবজাতির কল্যাণের জন্যে চিত্তকে উন্মুখ রেখে অশেষ কৃচ্ছ্র সাধন করতে পশ্চাৎপদ হননি।

স্টুডেন্ট্‌স কন্‌ফারেন্স শেষ হবার পর আর একটা বড় রকম কাজ নিয়ে পড়লাম আমরা। এটা প্রত্যাশাই করছিলাম। জামসেদপুর স্ট্রাইক। এর ইন্ধন আগে থেকেই যুগিয়ে রেখেছিলাম আমরা. গর্কির 'মাদার' যদি পড়ে থাক, তা হলে আমাদের কর্মপদ্ধতির ধারা অনেকটা বুঝতে পারবে। ঠিক অমনই করে লুকিয়ে প্যাম্‌ফ্লেট বিলি করে আসতাম, ওই রকম লুকিয়ে মীটিং করতে হত। গালাগালি তো বটেই, মারও খেতে হয়েছে একবার। এই সময়েই ভাল করে পুলিসের নজরে পড়ি। আমাদের চেষ্টা কিন্তু সার্থক হয়েছিল। এক কথায় ১৮০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে বসল। কিন্তু তার পরই মুশকিল হল—চিরন্তন মুশকিল। ধর্মঘট ভাঙবার জন্যে কর্তৃপক্ষের প্রাণপণ চেষ্টা তো ছিলই, দেশের অনেক নেতাও চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে এটা না টেকে। টাটা স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, তাকে ভাঙবার চেষ্টা তো স্বদেশদ্রোহিতার সামিল, এই হল অনেকের ধুয়ো। নিজেদের এবং নিজেদের দলের নানা স্বার্থে জড়িত বিজড়িত হয়ে তথাকথিত নেতারা কখন যে কোন্ কথা বলেন, তার গোপন ইতিহাস বিবৃত করবার এ স্থান নয়। যদি কোনদিন দেখা হয়, বলব। সে বড় কৌতুকজনক ইতিহাস। আর এই খবরের কাগজের কর্তৃপক্ষেরা! এরা কার কাছ থেকে কত ঘুষ খেয়ে কি যে কখন লিখে বসবে তার ঠিক নেই। বিজ্ঞাপন পাওয়ার লোভেই এরা জনসাধারণের সর্বনাশ করতে পারে। তা ছাড়া ব্ল্যাকশিপ সব দেশেই থাকে, এদের দলেও ছিল, এবং সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছিল, তাদের চিনতে দেরি হচ্ছিল বলে। এরাই শ্রমিকদের অধীর করে তুলছিল নানারকম গুজব আর ভেংচি আর ভাংচি দিয়ে গোপনে গোপনে। শেষটা এমন হল, সব ভেঙে পড়ে বুঝি! সুভাষবাবু এলেন মিটমাট করতে। মিটমাট হল, শ্রমিকদের দিক দিয়ে মোটামুটি ভালই হল, অন্ততপক্ষে মন্দের ভাল বলতে হবে। কিন্তু তাও ভেস্তে গেল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে গিয়ে আবার। এই সময় একটা জিনিস লক্ষ্য করে হতাশ হয়েছিলাম। পরে বম্বে টেক্সটাইল স্ট্রাইকেও এ জিনিসটা লক্ষ্য করেছি। নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে বৃহত্তর স্বার্থকে বলি দিতে অনেকে ইতস্তত করে না। শ্রমিকদের যতক্ষণ পর্যন্ত সৈনিকের মত শিক্ষা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মুক্তি নেই। একতাই প্রত্যেক আন্দোলনের শক্তি। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থের কুঠার যদি তার মূলে আঘাত করে, তা হলে কতক্ষণ টিকবে? কিন্তু এর উপায় কি? যুক্তি দিয়ে অশিক্ষিত শ্রমিককে বোঝানো যাবে না, লাঠির গুঁতো কিংবা টাকার গুঁতো ছাড়া অন্য কিছুই তাদের ফেরাতে পারে না। কিন্তু ওই দুই বস্তুই বিপক্ষের হাতে। সুতরাং সে হিসেবে আমরা নিরুপায়। বম্বে

টেক্সটাইল স্ট্রাইকে এই সত্যটা আরও মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করলাম। মিলওয়ালাদের সঙ্গে গভর্মেণ্টও যোগ দিলেন এবং স্ট্রাইক ভাঙবার জন্যে গুণ্ডা পর্যন্ত আমদানি করলেন বাইরে থেকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ই লিলুয়াতে স্ট্রাইক হল, জামসেদপুরের টিন্‌প্লেট কম্পানিতে হল, বজবজে হল, কলকাতার জুটমিলগুলোতে হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না কিছুই। থেমে গেল সব। কারণ শ্রমিকরা এখনও এদেশে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সচেতন হয়নি। এখনও ভদ্রলোকের বেকার ছেলেরাই আলতো আলতো ভাবে কমিউনিজ্‌ম করছে—লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি, বইয়ের দোকান, মাসিক-পত্রের সম্পাদকী অথবা হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্‌টিস করতে করতে, এবং তারাও সবাই খাঁটি লোক নয় বলে শ্রমিকদেরও খাঁটি করে তুলতে পারছে না।

বম্বে থেকে ফেরবার পথেই আমি ধরা পড়লাম। জেলে বসে এখন কমিউনিজ্‌ম নয়, ভাষাতত্ত্ব চর্চা করছি। জেলে বসে খবরের কাগজের মারফৎ কিছু কিছু খবর অবশ্য পাই এখনও। মনে হয়, না পেলেই ভাল হত। কারণ যা পাই, তা আশ্বাসজনক নয়। কমিউনিজ্‌ম এখন নাকি কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হয়েছে, অর্থাৎ সেইদলের অঙ্গীভূত হয়েছে যাদের মূলধন ন্যাশনালিজ্‌ম—কমিউনিজ্‌ম নয়। সাইমন কমিশনের উল্টো পিঠ হুইট্‌লে কমিশনে ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের এন. এম. যোশী আর চমনলাল গভর্মেণ্টি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে খুব হৈচৈ করলেন। 'ডাউন উইথ যোশী', 'ডাউন উইথ চমনলাল' পর্যন্ত হয়ে গেল। গভর্মেণ্টি এঁদের মত লোককেই চান, আমরা তাঁদের বিচারে বে-আইনী। গান্ধী-আরুইন প্যাক্টে মহাত্মাজীর বিচারেও আমরা অস্পৃশ্য। তিনি গোল-টেবিল-বৈঠকে যাবার আগে মুসলমানদের সঙ্গে আপস করতে গিয়ে জিন্নার ফোর্টিন পয়েন্ট্‌স শুনলেন, কিন্তু আমাদের একটা পয়েন্ট্‌ শোনা ও দরকার মনে হল না তাঁর। দেশের লোকের কাছেও হয় আমরা হেয় না হয় অজ্ঞাত। যাদের জন্যে আমরা এত দুঃখবরণ করেছি, সেই সব দরিদ্র কিষাণ-মজুরেরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবে, মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে হয়। হয়তো তারাও কিছু ভাবে না, ভাববার অবসরই নেই তাদের। নানাবিধ বোঝার ভারে তাদের পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে রোজ, তারই যন্ত্রণায় তারা কাতর, আমরা কখন তাদের জন্যে কি একটুখানি করেছি, তা তাদের মনে থাকবার কথা নয়। তার জন্যে দুঃখ নেই, কারণ জনপ্রিয় হওয়া কোনকালেই আমাদের (অন্তত আমার) লক্ষ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য আমার আদর্শ। সেই আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে—এ খবর যখন পাই, তখনই কেবল বড় কষ্ট হয়। যেদিন খবর পেলাম মানবেন্দ্র রায় কমিউনিস্ট্‌ ইনটার্‌ন্যাশনাল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, সেদিন রাত্রে ঘুম হয়নি আমার। সেই মানবেন্দ্র রায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে নানা কেলেঙ্কারির পর বেরিয়ে গিয়ে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস করলেন। গিরি আর শিবরাও গোল-টেবিল-বৈঠকে গেলেন। এই গিরিই আবার ফিরে এসে মাদ্রাজে গবেষণামূলক বক্তৃতাও করলেন, ভবিষ্যৎ ইণ্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশনে লেবারের স্থান কি হবে! দেশ জুড়ে কেবল গবেষণা, খোশামোদ এবং বক্তৃতা। কমিউনিস্ট্‌ নেতারাও কাজ করবেন না। অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি মিস্টার জে. এন. মিত্র এক উদাহরণও দিয়েছেন, রেলের কর্মীরা স্ট্রাইক করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু যমুনাদাস মেটা, গিরি আর যোশীর জন্যে তা নাকি হয়নি। কাশ্মীরে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাটা হয়ে গেল, যেটাকে ব্রিটিশভক্ত মুসলমানেরা কমিউনাল আখ্যা দিলেন, সেটার আসল কারণ যে অর্থ-

নৈতিক, এ কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলবার মত কমিউনিস্ট্ নেতা পাওয়া গেল না। অন্তত খবরের কাগজে কোন আভাস পেলাম না তার। জওহরলালের 'হুইদার ইণ্ডিয়া' পড়ে এবং নরিম্যানের মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা শুনে কিছু তৃপ্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে হল, এরকম মুখের বাণী তো ক্রমাগত শুনে আসছি সুরেন বাড়ুজ্জের আমল থেকে। সত্যি সত্যি কিছু কাজ হচ্ছে কি?। কাগজে অবশ্য খবরের অভাব নেই। আনসারি আর বিধান রায়—এই দুই ডাক্তারে মিলে মৃতপ্রায় কংগ্রেসকে আবার চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করলেন। প্রেস্ক্রিপ্শন—কংগ্রেসকে আবার কাউন্সিলে ঢুকতে হবে। স্বয়ং মহাত্মাজী সে প্রস্তাব করলেন পাটনায়—মহাত্মাজী, যিনি সি. আর. দাশের স্বরাজ্য-পার্টির বিবোধিতা করেছিলেন! মহাত্মাজীর এবার নতুন শত্রু জুটেছে—কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট্ পার্টি। কমিউনিজ্মের লেবেল কপালে লাগিয়ে এঁরাও ভোট ক্যান্ভাস করে বেড়ালেন এবং কাউন্সিলের অর্ধেক আসন দখল করে বসলেন। কিছুদিন পরেই এল হোয়াইট পেপার এবং সভায় সভায কাগজে কাগজে তার বাচনিক প্রতিবাদ।...কানপুরে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্ট্রাইক ঘোষণা করলেন— একটু আশান্বিত হলাম। কিন্তু যে স্ট্রাইক দেশব্যাপী হবে ভেবেছিলাম, তা শুরু হতে না হতেই থেমে গেল গভর্মেণ্টের লাঠির চোটে। লাঠি আরও অনেককালে থাকবে, কিন্তু নূতন কর্মী তো কই দেখা যাচ্ছে না আর। যে আদর্শকে লক্ষ্য করে আমরা একদিন অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, যার জন্যে কমিউনিস্ট্ নেতারা কোন বিপদকেই বিপদ বলে গণ্য করেননি, নবনীর চিঠি পেয়ে মনে হল, সে আদর্শ দেশের ছেলেদের মধ্যে আর নেই। তারা সিনিক হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস টেরিরিজ্ম কমিউনিজ্ম কোন কিছুরই ওপর আর আস্থা নেই তাদের। মুখে স্বীকার না করলেও, এখনও সকলেরই আস্থা ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের ওপরেই। তু করে যদি ডাকে, লক্ষ লক্ষ ছেলে ছুটে যাবে চাকরি করবার জন্যে, তা সে যে চাকরিই হোক। নবনী আই. সি. এস. হতে চায়। আই. সি. এস. হয়ে মায়ের দুঃখ ঘোচাবে—এই তার জীবনের আকাঙ্খা। তার চিঠি পেয়ে হতাশ হয়ে গেছি আমি। তার ওপর আমার অনেক আশা ছিল। তোমাকে আজ জেল থেকে বসে এই চিঠি লিখছি অনেক আশা নিয়ে। যে সাম্যেব বাণী আমাদের দেশে বুদ্ধ চৈতন্য প্রচার করে গেছেন, যে সাম্যের প্রেরণা আমাদের ভারতীয় সভ্যতার মর্মমূলে, যে সাম্য-দৃষ্টিতে আমরা প্রতি জীবে শিব প্রত্যক্ষ করি, সেই সাম্যবাদই একদিন মানুষের মুক্তি আনবে—এই বিশ্বাস নিয়ে অতিশয় অন্ধকার দুর্গম পথে আদর্শের মশাল জ্বেলে একদিন যাত্রা করেছিলাম। এসে পৌঁছেছি জেলে। ছাড়া পাবার আশা নেই। হয়তো জেলেই মরতে হবে. কিন্তু মরেও যে শান্তি পাব না মেজদা, যদি মরবার আগে শুনে না যাই যে, আমাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার ভার নিয়েছে কেউ। মেকী কমিউনিস্টে দেশ ছেয়ে গেছে। অন্তত একজন খাঁটি লোকও জেলের বাইরে কাজ করছে—এ খবরটুকু পেলেও আমার কারাবাস সার্থক হবে। এর জন্যে জন্মজন্মান্তর কারাবাস করতেও রাজী আছি।....কয়েকদিন পরেই দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন হবার কথা। সে উৎসবে আমি থাকতে পারব না বলে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমার সব দুঃখের অবসান হবে, তুমি যদি রাজী হও। কথাটা একটু ভেবে দেখো। তুমি শক্তিমান লোক, ইচ্ছে করলে সবই করতে পার। ভেবে দেখো, বুঝলে?

প্রণত

হীরক

পরিশিষ্ট

অন্নপ্রাশন-উৎসবে কনক আসেনি। ইন্দু-শুভ্রা আসত, কিন্তু সে-ও আসতে পারেনি। সে এসে উঠেছিল তার পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। ভেবেছিল, কর্তব্যটুকু চট্ করে সেরে ঠিক সময়ে এসে উৎসবে যোগ দিতে পারবে। প্রলুব্ধ পুলিস-ইন্সপেক্টরটিও ঠিক সেই সময়ে এসেছিলেন, ইন্দু-শুভ্রার গুলিও ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছিল, কিন্তু ঠিক সঙ্গে সঙ্গে পালাতে পারেনি। ইচ্ছে করেই পালায়নি। দৃশ্যটা উপভোগ করছিল সে। দেশদ্রোহী কামুক লোকটার রক্তাক্ত দেহটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে। পুলিস-ইন্স্‌পেক্টরের দেহ-রক্ষীরা আশে পাশেই ছিল। ইন্দু ধরা পড়ল রিভল্‌বার হাতেই।

....খানিকক্ষণ পরেই পুলিস এসে ঘিরে ফেলল শশাঙ্ক-শুভ্রের বাড়িটাও। হংস-শুভ্র থেকে আরম্ভ করে নবজাত খোকনকে পর্যন্ত উঠতে হলে পুলিস ভ্যানে। অদ্ভুত দেখাচ্ছিল খোকনকে। গায়ে টকটকে লাল আগুন-রঙের জামা, কপালে চন্দনবিন্দুর সমারোহ। পুলিস-ভ্যানে উঠে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে, খানিকক্ষণ। তারপর মোটরটা চলতে শুরু করতেই মায়ে মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে ফিক করে।



মধ্যবিত্ত

বনফুল

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম—[redacted]

প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৩৫

প্রিণ্টার—শ্রীসত্যচরণ দাস
আলেক্‌জান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
৯-এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা

স্বনামধন্য কথা-শিল্পী

শ্রীযুক্ত বিভুতিভুষণ মুখোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

পরিচয়

ফকির বন্দ্যোপাধ্যায়	বাড়ি-ওলা, দ্বিতলে থাকেন, বয়স ৬০, অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী
সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়	ফকিরের ভাই, বয়স ৪০, বেকার
নকুল মুখোপাধ্যায়	ভাড়াটে, একতলায় থাকেন, বয়স ৪২, অনবসর কেরাণী
সহদেব মুখোপাধ্যায়	নকুলের ভাই, বয়স ২২, রেডিওর দালালি করেন
পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ	সঙ্গীতজ্ঞ বেকার যুবক, বয়স ৩০, যমুনার বাল্যবন্ধু
শিবাজী	ফকিরের মাথা-খারাপ আশ্রিত আত্মীয়, বয়স ৪০
পিসামহাশয়	নকুলের দূর-সম্পর্কের পিসা, নকুলের আশ্রিত, বয়স ৫০
বিনয়	নকুলের আপিসের সহকর্ম্মী, বয়স ৪০
যমুনা	ফকিরের দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান পত্নী, বয়স ৩০
ললিতা	ফকিরের প্রথম পক্ষের কন্যা, বয়স ২২, অনূঢ়া

মৃণ্ময়ী	নকুলের স্ত্রী (অন্তরালবর্ত্তিনী)
কুঙ্কুম বন্দ্যোপাধ্যায়	দুর্গামণির কন্যা, বয়স ২০, অনূঢ়া
দুর্গামণি	নকুলের বিধবা দিদি, বয়স ৫০
টুনু	নকুলের প্রথমা কন্যা, বয়স ৯
ঝুণু	নকুলের দ্বিতীয়া কন্যা, বয়স ৭

ছোকরা, কুলি, জ্যোতিষী

মধ্যবিত্ত

প্রথম অঙ্ক

একটি প্রশস্ত সেকেলে দালানের অভ্যন্তর। প্রশস্ত কিন্তু জীর্ণ। আয়তন দেখিলে মনে হয় ইহার নির্ম্মাতা দরাজ মেজাজের লোক ছিলেন, বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে সন্দেহ হয় ইহার বর্ত্তমান অধিকারী তাঁহার দরাজ মেজাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মলিন রং-ওঠা দেওয়াল, স্থানে স্থানে চটাও উঠিয়া গিয়াছে, জানলা কপাটে বহুকাল রং দেওয়া হয় নাই। দেওয়ালের একদাসুদৃশ্য কুলুঙ্গিগুলি নানাজাতীয় কুদৃশ্য জিনিষে পরিপূর্ণ। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার হইতে সংগৃহীত গণেশ, মেমসাহেব, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির ছবি, তা-ও সবগুলি সোজা

করিয়া টাঙানো নাই। একধারে একটা আনলায় নানা আকারের এবং রঙের ময়লা আধময়লা কাপড় অবিন্যস্তভাবে ঝুলিতেছে। দালানের একপ্রান্তে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির খানিকটা অংশ দেখা যাইতেছে। সিঁড়ির পাশে একটা অন্ধকার গলির মতো রহিয়াছে, দালান হইতে রান্নাঘর অঞ্চলে যাইবার পথ। ইহা ব্যতীত দালানে চারটি দরজা দেখা যাইতেছে, তিনটি শয়নকক্ষের এবং একটি বাহির হইতে ভিতরে আসিবার। দালানের একপাশে একটি তক্তাপোশ রহিয়াছে। তক্তাপোশে বসিয়া নকুল একমনে টাইপ করিতেছেন। দালানের মাঝামাঝি একটি ভাঙা মোড়ায় বসিয়া ফতুয়াপরা পিসামহাশয় খেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছেন, একটু দূরে বামে কুঙ্কুম এস্রাজ বাজাইতেছে, একটা ঘরের ভিতর হইতে টুনু রুণুর পড়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছে, আর একটা ঘরের ভিতর হইতে মৃন্ময়ীর ব্যথাকাতর করুণ স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। পিসা-

মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া দুর্গামণি তরকারী কুটিতেছেন, একটু দূরে ডাহিনে সতীশ ও সহদেব একটি টেবিলে একটি কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া মুখোমুখি বসিয়া আছে। সময়, সকাল ন'টা।

পিসামহাশয়। জ্যোতিষের সঙ্গে তা হ'লে গোত্রটোত্র সব মিল ছিল?

দুর্গামণি। তা ছিল, সে আকারে ইঙ্গিতে আভাসও দিয়েছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিলাম না।

পিসামহাশয়। কেন?

দুর্গামণি। ওর আছে কি, থাকবার মধ্যে আছে একখানা পুরোনো বাড়ি, তাও নাকি আবার বাঁধা আছে শুনলাম।

পিসামহাশয়। তা থাকলেই বা, ছেলেটি তো ভাল, বি, এ, পাশ করেছে, দেখতেও বেশ।

দুর্গামণি। ওসব নিয়ে কি হবে আমার? একটা চাকরি-বাকরি থাকতো যদি তা হ'লে না হয়—

পিসামহাশয় নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন

সহদেব। (সতীশকে) মাথা নাড়ছেন যে ?

সতীশ। ড্রন হবে না, প্রন হবে।

সহদেব। প্রন ?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উভয়েই চুপ করিল

পিসামহাশয়। সে কথা যদি বল, চাকরিও খুব একটা নির্ভর-যোগ্য জিনিস নয়। আমার ঠাকুরদা বলতেন, ও হল তালপাতার ছাউনি, আজ আছে কাল নেই, বিষয়-আশয় থাকলে তবেই—

দুর্গামণি। বড় মেয়েটার বিষয়-আশয় দেখেই দিয়েছিলাম পিসেমশাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করতে হ'ল তাকে। বিষয়-আশয়ের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, চাকরির তুল্য জিনিস নেই।

পিসামহাশয়। তা হ'লে তোমার পরিতোষই বা কি এমন ভাল, ওরও তো চাকরি-বাকরি কিছু নেই, বেকার বসে আছে।

দুর্গামণি। কিসে আর কিসে! পরিতোর হ'ল এম, এ, পাশ, বনেদী বংশের ছেলে, ওর চাকরি জুটবেই একটা, আর জ্যোতিষ হ'ল গিয়ে একটা বখাটে—

নকুল। (সহসা) কেন বাজে বকবক্ করচিস দিদি, জ্যোতিষ যদি কুসুমকে বিয়ে করত বেঁচে যেতিস তুই, মনে মনে হয় তো সিন্নি মেনেছিলি এই জন্যে।

সজোরে টাইপ করিতে লাগিলেন

দুর্গামণি। কি বললি ?

নকুল। জ্যোতিষ যদি কুসুমকে বিয়ে করত বেঁচে যেতিস তুই, আমিও বাঁচতাম।

দুর্গামণি। তুই তো বাঁচতিসই, আমরা মা-বেটিতে যদি কলেরা হয়ে মরে যাই তা হ'লে আরও বাঁচিস তুই। কপাল পুড়েছে বলেই পেট-ভাতায় তোর বাড়ি রাঁধুনিগিরি করতে এসেছি, তাই কট কট ক'রে কথা শোনাস তুই রোজ।

নকুল কোন উত্তর দিলেন না

তোরও মেয়ে আছে দুটো, ভগবান যদি বাঁচিয়ে রাখেন বুঝবি একদিন।

নকুল। ওসব ভণ্ডামি সহ্য হয় না আমার।

দুর্গামণি। ফের্ যদি অমন কটকটিয়ে কথা শোনাবি থাক্‌ব না তোর এখানে, অর্জ্জুনের কাছে চলে যাব।

যেখানে গতর খাটাব সেখানেই খেতে পাব দুটি।

নকুল কোন উত্তর দিলেন না।
দুর্গামণি ঘস্ করিয়া একটা লাউ কাটিয়া ফেলিলেন। কুঙ্কুমের গৎ ছাড়া কিছুক্ষণ আর কোন শব্দ নাই। পিসামহাশয় হুঁকাটা কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া কুঙ্কুমের কাছে গেলেন

পিসামহাশয়। একেবারে সুরের সুরধুনী বইয়ে দিলি যে দিদি, আহা, চমৎকার !

ঘেঁসিয়া বসিলেন

কুঙ্কুম। এখন বিরক্ত কোরো না দাদু, গৎটা ঠিক ক'রে না রাখলে পরিতোষদা বকবেন।

দুর্গামণি। কি নিঃস্বার্থপর ছেলে ওই পরিতোষ, নিজে দুবেলা এসে এস্রাজটি শিখিয়ে যাচ্ছে, কে ক'রে অমন।

সতীশ। খুব নিঃস্বার্থপর নয় দিদি। আপনি মফঃস্বল থেকে এসেছেন কলকাতার ছেলেদের চেনেন না। বৌদি আস্কারা না দিলে বাড়িতেই ঢুকতে দিতাম না ওসব ছোকরাকে।

নকুল। দিদিও কম আস্কারা দিচ্ছেন না।

দুর্গামণি কোন জবাব দিলেন না।

সতীশ। এস্রাজের আমিও কিছু কিছু জানি, আমিই তো শিখিয়ে দিতে পারি দু-চারখানা গৎ ওকে।

নকুল। তোমাকে দিয়ে চলবে না, তুমি যে স্বগোত্র!

পিসামহাশয়ের মুখ একটা অদ্ভুত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দুর্গামণি ইহারও কোন জবাব দিলেন না।

পিসামহাশয়। ভয় কি, আমি শেখাব তোকে, আমিও নেহাৎ আনাড়ি নই, বদ্‌রুদ্দীন মিঞার চেলা আমি, বদরুদ্দীনের চেয়ে বড় সেতারী সেকালে আর ছিল না। (আপন মনে) একদিন ওই বদরুদ্দীন আমাদের বাড়ীতেই থাকত, আহা, কি দিনই গেছে!

সতীশ। (সহদেবকে) ষ্টুপ করছ কেন, স্কুপ হতেই বা ক্ষতি কি!

সহদেব। স্কুপ?

সহদেব অভিধান উলটাইতে লাগিল। মৃন্ময়ীর ব্যথাকাতর শব্দটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল

সতীশ। (কুঙ্কুমকে) 'নি' কোমলটা ঠিক হচ্ছে না কুঙ্কুম, দাও আমাকে।

এস্রাজটা লইয়া 'নি' কোমল দেখাইয়া দিল

সহদেব। উঃ।

সতীশ। কি হ'ল?

সহদেব। পা দুটো টনটন করছে।

সতীশ। (ঝুঁকিয়া দেখিল) ফুলেছে, একটু লালও হয়েছে দেখছি। অটল কি বলে?

সহদেব। অটলের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল, হোমিওপ্যাথিতে কিছু হবে না।

পিসামহাশয়। রোদে রোদে টোটো ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে এইটি করেছ তুমি।

সহদেব। না ঘুরলে চলবে কেন, ঘরে বসে বসে ক্যানভাসিং করা যায় না কি?

পিসামহাশয়। এত অল্পবয়সে কলেজ ছাড়ার কি দরকার ছিল তোমার বাপু, ঠাকুরদা বলতেন বিদ্যাই হল শ্রেষ্ঠ ধন—

সহদেব। পড়ার খরচ দেবে কে?

নকুলের দিকে একবার তাকাইল।
নকুল একমনে টাইপ করিতেছিলেন, কথাটা শুনিতে পাইলেন কি-না বোঝা গেল না।

সতীশ। পড়েই বা হবে কি, আমি তো বি. এ, পাশ করে ঠায় বেকার বসে আছি। ওই যে আমাদের শিবাজী, বি, এ-তে হিষ্ট্রিতে অনার্স পেয়েছিল, বেকার বসে থেকে থেকে পাগল হয়ে গেল শেষটা।

পিসামহাশয়। সত্যিই কি ও পাগল? এদিকে তো বেশ খায় দায় ঘুমোয়।

সতীশ। একজন ডাক্তার দেখে বলেছিলেন ও এক রকম পাগলই, ব্যায়ারামটার নাম হচ্ছে প্যারানইয়া।

পিসামহাশয়। প্যারানইয়া? সে আবার কি?

সতীশ। কি জানি।

সকলেই চুপ করিল। কুঙ্কুমের এস্রাজ বাজিতে লাগিল। মৃন্ময়ীর গোঙানিটা আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল

সতীশ। ললিতার হাত দেখাবার জন্যে দাদা একজন জ্যোতিষীকে ডেকেছেন আজ শুনলাম। আমার হাতটাও দেখাতে হবে তাকে।

দুর্গামণি। কুঙ্কুমের হাতটাও দেখাব।

নকুল। আমি কিন্তু পয়সা টয়সা দিতে পারব না, তা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।

দুর্গামণি। হবে না, হবে না—দিতে হবেনা তোমাকে, ভয় নেই। তুমি নিজের বো'য়ের ব্যবস্থা কর আগে। বউটা কাল থেকে ব্যথা খাচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত একটা ভাল ডাক্তার ডাকতে পারলে না, যা করেন ওই বিনা পয়সার অটলবাবু! কিপ্‌টে কোথাকার!

নকুল। ষাট টাকা মাইনে পাই, ভাল ডাক্তার ডাকব কোথা থেকে! ডেকেই বা কি হবে, পাশের বাড়ির ভদ্রলোক ষোল টাকা ফী-ওলা ডাক্তার ডেকে ডেকে তো জেরবার হয়ে গেলেন, ছেলেটা বাঁচল? তা ছাড়া, পাব কোথা আমি নগদ টাকা?

ঘরের ভিতর গোঙানিটা কমিয়া গেল।

দুর্গামণি। বেশ, যা খুশি কর তোমার।

তরকারীর থালা ও বঁটি লইয়া উঠিলেন এবং নকুলের দিকে একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সিঁড়ির পাশের গলি-পথ দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন

সতীশ। (সহদেবকে) পকেট নয়, রকেট কর ওটা।

সহদেব। এটা তা হ'লে রাউণ্ড হবে বলছেন ?

সতীশ। পাউণ্ডের চেয়ে রাউণ্ডই তো বেশী লাগ-সই বলে মনে হচ্ছে, অবশ্য সাউণ্ড সকেট—তাও হতে পারে।

জ্রকুঞ্চিত করিল

সহদেব। দাঁড়ান, ডিক্‌শ্‌নারিটা দেখি।

অভিধান উলটাইতে লাগিল। দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়িতে শিবাজীর আবির্ভাব হইল

শিবাজী। (সিঁড়ি হইতে) একটি কপর্দ্দক তাঞ্জোরে পাঠাব না।

নকুল ব্যতীত আর সকলে সেদিকে ফিরিয়া চাহিল

সতীশ। কি বলছ শিবাজী ?

শিবাজী নামিয়া আসিল

শিবাজী। একটি কপর্দ্দক তাঞ্জোরে পাঠাব না, সৈন্যদল গড়ে' তুলতে হবে।

সতীশ। কি করবে সৈন্যদল নিয়ে ?

শিবাজী। টোর্না দুর্গ জয়। টোর্না চাই, যেমন ক'রে হোক।

সতীশ। তার চেয়ে এক কাজ কর না—

শিবাজী। কি?

সতীশ। ওই থলিটা নিয়ে বাজারটা ঘুরে এস না চট করে' এই নাও ফর্দ্দ।

পকেট হইতে ফর্দ্দ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল

আলু এক সের, বেগুন এক সের, ছাঁচি-কুমড়ো একটা, সিম দু'পয়সার।

শিবাজী। সিম দু'পয়সার! আমি চাই টোর্না, তুমি বলছ সিম আনতে! ধিক, ধিক তোমাকে—

সতীশ। আমি বলি নি, বৌদি বলেছেন।

শিবাজী। বৌদি! বৌদি আবার কে! উনি জিজীবাঈ! জিজীবাঈ বলেছেন? ওঁর আদেশ শিরোধার্য্য দাও—

থলি ও ফর্দ্দ লইয়া প্রস্থান

সহদেব। আজকাল শিবাজীর যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে।

সতীশ। চিরকালই ওই রকম।

আবার দুজনে ক্রসওয়ার্ডে মন দিল।

পিসামহাশয়। (কুঙ্কুমকে) কিসের গৎ ওটা ?

কুঙ্কুম। ভৈরবীর।

পিসামহাশয়। 'নি' কোমল, নয় ?

কুঙ্কুম। রে গা ধা নি চারটেই কোমল।

বাজাইতে লাগিল

সতীশ। (হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া) ঠিক আওয়াজ বেরুচ্ছে না কুঙ্কুম। ছড়টায় ভাল ক'রে রজন দিয়ে নাও। দাও আমি দিয়ে দিচ্ছি।

ছড়ে রজন দিতে লাগিল

পিসামহাশয়। এস্রাজ বাজালেই হয় না দিদি, কানটি ঠিক থাকা চাই।

সতীশ। আপনি সত্যিই এককালে গান বাজনার চর্চ্চা করেছিলেন ?

পিসামহাশয়। খুব। এখন কিন্তু ভুলে গেছি। এই দেখ না ভৈরবীতে চারটে কোমল লাগে আমার একটি মনে আছে শুধু। একটু একটু এখনও মনে আছে বই কি।

গলায় ভৈরবী ভাঁজিবার চেষ্টা করিলেন। কিছুই হইল না।

এস্রাজটা দাও তো দেখি—

সতীশের হাত হইতে এস্রাজ লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, অত্যন্ত বেসুরা একটা আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল।

কুঙ্কুম। খারাপ হয়ে যাবে, দাও। ললিতাদির এস্রাজ, গৎটা প্র্যাকটিস ক'রে এখুনি দিয়ে আসতে হবে আবার।

সহদেব। আচ্ছা, এটা কি হবে বল তো সতীশদা, ক্রু হচ্ছে a pleasure vessel—আছে এ সি টি।

সতীশ। কই দেখি ?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেখিতে লাগিল

ইয়ট্।

হাতঘড়ি দেখিল

সহদেব। ইয়ট্। বানান কি ?

সতীশ। চুলোয় যাক বানান, চল ওঠা যাক।

পিসামহাশয় নাক মুখ কুঁচকাইয়া এস্রাজ বাজাইতে লাগিলেন বেসুরা আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছুই বাহির হইল না।

কুঙ্কুম। দাও আমাকে দাও।

পিসামহাশয় এস্রাজ দিলেন। কুঙ্কুম আবার ভৈরবীর গৎ ধরিল

পিসামহাশয়। না, ভুলেই গেছি দেখছি সত্যি সত্যি।

সতীশ। (সহদেবকে) ওঠ, চল বেরুন যাক।

সহদেব। কোথা যাবেন এখন ?

সতীশ। মিত্তিরদের বারান্দায় বসে' রেড়িওটা শোনো যাক চল। আজ ভাল শানাই কনসার্ট আছে একটা।

সহদেব। ওহো ভাল কথা মনে পড়ল, আমাকে এখুনি একবার চাটুজ্যেদের ওখানে যেতে হবে।

সতীশ। শানাই কনসার্টটা শুনে তারপর যেও।

সহদেব। শানাই কনসার্ট শুনে কি হবে ?

সতীশ। ক্রসওয়ার্ড ক'রে যা হচ্ছে তাই হবে, সময় কাটবে খানিকক্ষণ।

সহদেব। ক্রসওয়ার্ড যদি ঠিক লেগে যায়—বারো হাজার টাকা নগদ।

সতীশ। এন্‌ট্রি ফী পাচ্ছ কোথা ?

সহদেব। আপনি দেবেন বললেন যে।

সতীশ। পাগল না কি, আমি পাব কোথা ?

সহদেব। তবে তখন বললেন যে—

সতীশ। ঠাট্টা করছিলুম। আমাকে ঠেঙিয়ে খুন ক'রে ফেললেও একটি আধলা বার করতে পারবে না।

পিসামহাশয়। উঃ, আমি একবার ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়েছিলাম! আমার পালকি আটকেছিল ব্যাটারা।

সতীশ। (সবিস্ময়ে) কবে ?

পিসামহাশয়। ১২৮২ সালে।

সতীশ। তাই না কি ?

পিসামহাশয়। নগদ পাঁচ শো' টাকা দিয়ে তবে নিস্তার পাই, করকরে পাঁচশোটি টাকা।

নকুল এতক্ষণ আপন মনে টাইপ করিতেছিলেন, এই কথায় থামিয়া ঘাড় ফিরাইলেন

নকুল। অনর্গল মিছে কথা বলতে প্রবৃত্তিও হয় আপনার পিসেমশাই ! পাঁচ শো' টাকা একসঙ্গে দেখেছেন কখনও জীবনে ?

সহদেব নীরবে দন্তবিকশিত করিয়া হাসিল

পিসামহাশয়। দেখি নি ! বলিস কি তুই ? আমাদের পাঁচ শো বিঘে লাখরাজ জমিই ছিল যে, পদ্মায় হু হু

ক'রে ভেঙ্গে গেল তাই, তা না হলে—ছি ছি ক্রমাগত কেরাণীগিরি ক'রে করে' তোর দফা নিকেশ হয়ে গেছে দেখছি।

নকুল পুনরায় টাইপ করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ীর আর্ত্তস্বরটা হঠাৎ বেশী তীব্র হইয়া উঠিল। নকুল একবার সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কুঙ্কুম এস্রাজ রাখিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। পিসামহাশয় উঠিয়া হুঁকাটা তুলিয়া পুনরায় টানিতে লাগিলেন

সহদেব। (সতীশকে) আপনাকে ঠেঙালে এক আধলা বেরুবে না মানে? এই সেদিন তো ক্রসওয়ার্ড থেকেই আট টাকা পাঁচ আনা পেলেন, সেটা কি হ'ল?

সতীশ। সেটা রেখে দিয়েছি, খরচ করব না।

সহদেব। কেন?

সতীশ। দাদা-বৌদির কাছে সিগারেট-সিনেমার খরচ আর কাঁহাতক চাওয়া যায়! নিজের কাছে কিছু থাকা ভাল।

পিসামহাশয় পুনরায় হুঁকা রাখিয়া দিলেন এবং এস্রাজটা তুলিয়া

ভৈরবী বাজাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ীর গোঙানিটা বাড়িতে লাগিল

নকুল। সহদেব, অটলবাবুকে আর একবার দেখ্ না।

সহদেব। অটলবাবু দশটার আগে আসতে পারবেন না বলেছেন।

সতীশ। অটল টলবার লোক নয়।

হঠাৎ শিবাজীর প্রবেশ

শিবাজী। ভেবে দেখলাম ভুল করেছি। জিজীবাঈ আমাকে আদেশ করেন নি, করেছেন তোমাকে, সে আদেশ পালন করবার আমার কোন অধিকার নেই—এই নাও।

থলি ও ফর্দ্দ টেবিলে রাখিল

সতীশ। তুমি শিবাজী না ঘোড়ার ডিম! বাজার করতে পার না, টোর্না দুর্গ জয় করবে!

শিবাজী। টাকা দাও এক্ষুণি জয় করে' দিচ্ছি।

সতীশ। টাকা? টাকা নিয়ে কি হবে?

শিবাজী। সৈন্যদল গঠন করতে হবে, বিনা পয়সায় সৈন্যদল গঠন করা যায় না। (সহসা) তাঞ্জোরে এক কপর্দ্দক পাঠানো চলবে না। টোর্না, টোর্না, টোর্না—

সিঁড়ি দিয়া সবেগে উপরে উঠিয়া গেল

পিসামহাশয়। মাথা খারাপ লোক—ওকে বেশী ক্ষেপিও না, কি করতে কি ক'রে বসবে।

সতীশ। সহদেব, চল শানাইটা শুনে ওইদিক থেকে বাজারটা সেরে আসা যাবে !

নকুল। সহদেব, এখন বেরিও না, আমার আপিসের সময় হ'ল, অটলবাবু আসবেন, বাড়িতে একজন থাকা দরকার।

সহদেব। আমাকে কিন্তু একবার বেরুতেই হবে।

নকুল। কেন ?

সহদেব। জীবন চাটুজ্যেরা একটা রেডিও কিনবে বলেছে, সেটার ট্রায়াল নেবে তারা এক্ষুণি।

নকুল। তবে যাও।

সতীশ। জীবন চাটুজ্যেরা নিচ্ছে না কি রেডিও ?

সহদেব। হ্যাঁ, ব্যাটারি সেট নেবে বলেছে একটা।

সতীশ। কাঁচা পয়সা দুহাতে পিটছে, নেবে না কেন বল বাবা ! ব্যাটারি সেট কেন, ওদের বাড়িতে তো ইলেকট্রিসিটি আছে।

সহদেব। ব্যাটারি সেটে বাজে আওয়াজ কম হয়।

সতীশ। চল তা হ'লে।

নকুল। বেশী দেরি কোরো না।

সতীশ। আমরা এক্ষুণি ঘুরে আসছি।

সতীশ ও সহদেব চলিয়া গেল। পিসামহাশয় এস্রাজটায় কিছুতেই ঠিক সুর বাহির করিতে না পারিয়া অবশেষে সেটা রাখিয়া দিলেন। নকুল টাইপ রাইটারে নূতন কাগজ ও কার্ব্বন পেপার পরাইতে লাগিলেন

পিসামহাশয়। ধাঁ ক'রে তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলে ফেললে হে! তুমি! তুমি কি জাননা আমার প্রপিতামহর ঠাকুর্দা আলিবর্দ্দি খাঁর—

নকুল। দোহাই আপনার, চুপ করুন।

কুঙ্কুম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

কুঙ্কুম। মামীমার কোমরটা বড্ড কনকন করছে, একটু গরম তেল দিয়ে মালিশ ক'রে দেব?

নকুল। দে।

পিসামহাশয়। যাই কর, ও ঘিনঘিনে ব্যথা ভোগাবে এখন, আমার জানা আছে; (কিছুক্ষণ পরে) আমার বড় শালীর হয়েছিল একবার, স্বয়ং কেদার দাস এসে কিছু করতে পারে নি, শেষটা কি একটা গাছের শিকড় মাথার চুলে বেঁধে দিতে ভালয়

ভালয় হয়ে গেল। আহা, কি যেন গাছটা, ভাল, ভুলে যাচ্ছি, আপাং বোধ হয়।

নকুলের প্রতি আড়চোখে চাহিলেন নকুল কোন উত্তর না দিয়া টাইপ করিতে লাগিলেন। পিসামহাশয় এস্রাজটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় বাজাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ীর আর্ত্ত রবটা হঠাৎ তীব্রতর হইয়া উঠিল

নকুল। (ঘরের দিকে চাহিয়া ধমকেব সুরে) চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে লাভ কি, ওতে কি ব্যথা কমবে?

মৃন্ময়ী চুপ করিল। নকুল টাইপ-রাইটারে মন দিলেন

নকুল। (সহসা পিসামহাশয়কে) আপনি একবার অটল ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন?

পিসামহাশয়। বল—যাচ্ছি।

নকুল। যান একবার।

পিসামহাশয়। বেশ, (অর্দ্ধ স্বগত) চাকরেরও বেহদ্দ ক'রে তুলেছে।

নকুল। কি বললেন?

পিসামহাশয়। কিছু না।

বাহির হইয়া গেলেন। নকুল দ্বারের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় টাইপ করিতে লাগিলেন। টুনু আসিয়া প্রবেশ করিল। হাতে একখানা বই

টুনু। বাবা।

নকুল ফিরিয়া চাহিল

টুনু। ফ্রাইটফুল মানে কি।

নকুল। ভয়ঙ্কর।

টুনু। হোয়েন্স, মানে—

নকুল। যেখান হইতে।

টুনু। ডাউন রাইট ?

নকুল। এখন বিরক্ত কোরো না টুনু, ব্যস্ত আছি দেখছ না।

টুনু। তুমি আমাকে একটা ইংরিজি থেকে বাংলা ডিক্‌শ্‌নারি কিনে দাও বাবা, আমাদের ক্লাসের মণিকা কিনেছে।

নকুল। ডিক্‌শ্‌নারি দেখতে জান তুমি ?

টুনু। (সগর্ব্বে) হ্যাঁ।

নকুল টাইপ করিতে লাগিলেন

টুনু। আজ আপিস থেকে ফেরবার সময় একটা কিনে এনো, কেমন ?

নকুল। আচ্ছা।

টুনু। এবার পূজোর কাপড় চোপড় এখনও কিনলে না বাবা ?

নকুল। আজ কিনব।

টুনু। আমাকে কিন্তু চাঁপা রঙের সিল্কের শাড়ি কিনে দেবে বলেছিলে মনে আছে তো ?

নকুল। আছে।

টুনু। রুণুর জন্যে বরং ফুল দেওয়া একটা ফ্রক এনো, কেমন ?

নকুল। আচ্ছা।

ঘরের ভিতর হইতে আবার একটু একটু গোঙানির শব্দ আসিতে লাগিল

টুনু। মায়ের কি হয়েছে বাবা ?

নকুল। মায়ের পেট ব্যথা করছে, যাও মায়ের কাছে একটু বস গিয়ে।

টুনু। বাবা, পিসিমা কি বলছিল জান; বলছিল আমাদের ভাই হবে, সত্যি বাবা ?

নকুল। বিরক্ত কোরো না টুনু, যাও।

টুম্মু চলিয়া গেল। রুম্মু দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিল এবং তাহার পর আসিয়া প্রবেশ করিল

রুণু। বাবা!

নকুল। তোমার কি আবার?

রুণু। দিদির জন্যে যদি ডিক্‌শ্‌নারি আন, তা হ'লে আমার জন্যে একটা দ্বিতীয় ভাগ কিনো এনো বাবা।

নকুল। তোমার তো দ্বিতীয় ভাগ আছে।

রুণু! ওটা তো দিদির পুরোনোটা, কিচ্ছু পড়া যায় না, পাতাগুলো মুড়ে মুড়ে ছিঁড়ে গেছে।

নকুল। আচ্ছা আনব।

রুণু। আর আমার জন্যেও শাড়ি এনো, আমার ফুলফুল ফ্রক চাই না।

নকুল। আচ্ছা।

রুণু। (চুপি চুপি) মায়ের কি হয়েছে বাবা?

নকুল। অসুখ করেছে।

রুণু। কি অসুখ বাবা?

নকুল। আমি এখন কাজ করছি রুণু, গোলমাল কোরো না, যাও।

রুণু। মায়ের কাছে যাব?

নকুল। যাও।

টুনু বাহির হইয়া আসিল

টুনু। কুঙ্কুমদি ওঘরে থাকতে মানা করছে। মায়ের কি হয়েছে বাবা, মা কাঁদছে।

নকুল। (ধমকাইয়া) যাও এখান থেকে।

টুনু ও রুনু সভয়ে ঘরে ঢুকিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া ফকির নামিয়া আসিলেন। পাকা গোঁফ, ছিমছাম পোষাকপরা, হাতে সৌখিন ছড়ি

ফকির। টাইপ রাইটার কোত্থেকে পেলে হে?

নকুল। যতীনবাবুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।

ফকির। কেন, হঠাৎ?

নকুল। আর বলবেন না, মহা মুশকিলে পড়েছি।

ফকির। কি হল?

নকুল। আমাদের আপিসে না কি রিট্রেঞ্চমেণ্ট হবে; এক ব্যাটা নতুন সায়েব এসেছে, সে প্রত্যেকের খুঁত ধরে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে এক লম্বা explanation তলব করেছে, তারই জবাব দিচ্ছি।

ফকির। কেন, অপরাধ?

নকুল। অপরাধ একটু আছে, তাড়াতাড়িতে একদিন আপিসের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারি নি, কাজও কিছু কিছু এরিয়ার পড়েছে, লেট হয়েছি কদিন—

ফকির। ফ্যাঁসাদে পড়েছ তা হ'লে বল! আমি আজ তোমার কাছে ভাড়াটা চাইব মনে করছিলাম, এ এক আচ্ছা খবর শোনালে তুমি। ভাড়া তোমার ছ মাসের জমে গেছে, খেয়াল রেখো সেটা কিন্তু।

নকুল। সে আমার খুব খেয়াল আছে, এইবার আস্তে আস্তে দিয়ে দেব। আপনি বেরুচ্ছেন?

ফকির। মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটে একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, দেখি যদি গাঁথতে পারি। ছেলেটি এবার ডাক্তারি পাশ করেছে, বংশও ভাল। চেষ্টা তো করছি অনেক দিন থেকে, কিন্তু ফুল না ফুটলে তো হবার জো-টি নেই, আজ একজন জ্যোতিষীকে আসতে বলেছি, দেখি সে কি বলে।

ঘরের ভিতর হইতে মৃন্ময়ীর ক্রন্দন শোনা গেল।

ফকির। ও কি?

নকুল। ব্যথা ধরেছে।

ফকির। তাই না কি, কখন থেকে?

নকুল। কাল রাত থেকেই একটু খুঁটরেছে, সকাল থেকে একটু বেশী বেশী মনে হচ্ছে।

ফকির। বাঃ, তুমি আমাদের তো ঘুণাক্ষরে কিছু জানাও নি। দাই টাই সব ঠিক আছে তো?

নকুল। সব ঠিক আছে, খবর পাঠিয়েছি; অটলবাবুকেও খবর দিয়েছি।

ফকির। দাঁড়াও ওঁকে ডেকে দি, উনি এসব বিষয়ে একজন এক্‌স্‌পার্ট।

নকুল। থাক বৌদিকে আর এখন থেকে ব্যস্ত করবেন না, দরকার হলে তো ডাকতেই হবে।

ফকির। না, না, সে কি কথা, এসব ব্যাপারে নো ফর্মালিটি (সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে) ওগো শুনচ!

উঠিয়া গেলেন। ক্রন্দনটা বাড়িয়া উঠিল। নকুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিলেন। বাহিরের দ্বার দিয়া গুন গুন করিয়া গান গাহিতে

গাহিতে পরিতোষ আসিয়া প্রবেশ করিল। সুদর্শন সুবেশ যুবক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গলি দিয়া দুর্গামণিও প্রবেশ করিলেন।

দুর্গামণি। (সহাস্যে) পরিতোষ এসেছ, বস বাবা বস, কুঙ্কুম কোথা গেলি, একটু চা ক'রে এনে দি বাবা ?

পরিতোষ। চা ? এখুনি তো এক পেয়ালা খেয়ে এলাম চন্দনাদের বাড়ি ; বেশ, দিন আর এক পেয়ালা।

দুর্গামণি। হ্যাঁ এই যে দি। কুঙ্কুম কোথা গেলি ?

নকুল। (ঘরের ভিতর হইতে) কুঙ্কুম, তুই যা !

দুর্গামণি। চা-টা আনি তা হ'লে—

শশব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। সিঁড়ি দিয়া যমুনা নামিয়া আসিলেন

যমুনা। এই যে পরিতোষ এসে গেছ, তোমার কথাই ভাবছিলাম এখুনি।

পরিতোষ। কেন ?

যমুনা। ললিতা তোমার গানের কি দুর্দ্দশা করেছে, দেখ গে যাও ওপরে।

পরিতোষ। কোন্ গান্টা, ওকে তো দুটো শিখিয়েছি।

যমুনা। পরশু যেটা শিখিয়ে গেলে—আজিকে সাকী, প্রাণের পাখী—(মুচকি হাসিলেন)

পরিতোষ। কেন, কি হল ?

যমুনা। (হাসিয়া) অন্তরাটা কিছুতেই হচ্ছে না, গাইতে গেলেই গলাটা কেঁপে যাচ্ছে (ফিক করিয়া হাসিলেন) যাও, তুমি ওপরে যাও।

পরিতোষ। কুঙ্কুম কোথা ?

নকুল। (ঘরের ভিতর হইতে ধমকের সুরে) কুঙ্কুম, তুই যা না।

কুঙ্কুম বাহির হইয়া আসিল

যমুনা। কুঙ্কুমের আজ বোধ হয় এস্রাজ শেখবার ফুরসত হবে না। ওর মামীর আবার এ দিকে—

হাসিলেন

পরিতোষ। তাই না কি, তা হলে তো—

যমুনা। যাও, তুমি ওপরে যাও।

পরিতোষ উপরে চলিয়া গেল

যমুনা। আয় কুঙ্কুম, আমরা দেখি এ দিকের খবর কতদূর।

কুঙ্কুমকে লইয়া মৃন্ময়ীর ঘরে ঢুকিলেন। নকুল বাহির হইয়া আসিয়া পুনরায় টাইপ করিতে লাগিলেন।

একটু পরে যমুনা নাক মুখ কুঁচকাইয়া একটা ময়লা কাঁথা ও তেল চিট্‌চিটে বালিশ লইয়া বাহির হইলেন

যমুনা। এগুলো কোথা রাখি বলুন ঠাকুর পো ?

নকুল। যেখানে ছিল থাক না, বার করছেন কেন ?

যমুনা। এ সব ময়লা জিনিস ও ঘরে থাকলে কেস সেপ্‌টিক্ হয়ে যাবে যে ! আঁতুড় ঘরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জিনিস দিতে হয়।

নকুল কিছু না বলিয়া টাইপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। যমুনা বালিশ ও কাঁথা লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিলেন। মৃন্ময়ীর গোঙানিটা হঠাৎ খুব বাড়িয়া উঠিল, নকুল তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন। সিঁড়ি দিয়া ফকিরবাবু নামিলেন, পাশের ঘর হইতে যমুনাও বাহির হইয়া আসিলেন

যমুনা। তুমি যাচ্ছ না কি ?

ফকির। হ্যাঁ, ঘুরে আসি।

যমুনা। বৃথা যাচ্ছ, ওখানে হবে না. তার চেয়ে পরিতোষকেই পাকড়াও ভাল করে'।

ফকির। ওকে বলেছি একদিন, ও হাঁ না কিছুই বলে না।

যমুনা। দিন কতক ললিতার সঙ্গে মিশুক।

হাসিলেন

ফকির। তোমার পরামর্শ মতো আমি মিশতে দিয়েছি বটে, কিন্তু সত্যি বলছি আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। আমরা বড় বংশের ছেলে, মানে—তাছাড়া পরিতোষই বা পাত্র হিসাবে কি এমন—

যমুনা। শুধু ভাল পাত্র খুঁজলেই তো হবে না (ক্ষণকাল চুপ করিয়া) সম্বলের মধ্যে তো এই বাড়িটি (নিম্নকণ্ঠে) তা-ও যা ভাড়াটে জুটেছে—

ফকির। চুপ চুপ, শুনতে পাবে।

যমুনা। পরিতোষ যদি রাজি হয়, পণ লাগবে না একটি পয়সা। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু, সে জোর আমার আছে।

ফকির। তবু ও পাত্রটির জন্যে চেষ্টা করি একটু। পাত্রটি বড় ভাল, মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছে, ইয়া বুকের ছাতি, টক্‌টক্‌ করছে রং—

যমুনা। যাও তা হ'লে, বেশী বেলা কোরো না যেন;

পিত্তি পড়িয়ে খেলে তোমার আবার আমবাত বেরোয়।

ফকির। না, বেলা করব না।

চলিয়া গেলেন

যমুনা। ওই তো রূপের ধুচুনি মেয়ে, তার জন্যে রাজপুত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন! সতীনের কাঁটা গলা থেকে নাব্‌লে বাঁচি।

ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। ললিতা নামিয়া আসিয়া এস্রাজটা লইয়া গেল। একটু পরে পরিতোষ ও ললিতার যুগ্মকণ্ঠে গান শোনা গেল

আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা
আপনহারা সুরের ধারা
মানে না বাধা মানে না মানা।

চায়ের পেয়ালা লইয়া দুর্গামণি প্রবেশ করিলেন

দুর্গামণি। পরিতোষ কোথা গেল?

উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিলেন

দুর্গামণি। (কঠিন কণ্ঠে) কুঙ্কুম!

কুঙ্কুম বাহির হইয়া আসিল

কুঙ্কুম। কি মা?

দুর্গামণি। কি করচিস?

কুঙ্কুম। মামীমার কোমরে তেল মালিশ করে দিচ্ছি।

দুর্গামণি। (চাপা তর্জ্জন করিয়া) মামীমার কোমরে তেল মালিশ করলেই তুই উদ্ধার হবি, না? যা পরিতোষকে চা দিয়ে আয় ওপরে। কি হাঁদা মেয়ে বাবা!

কুঙ্কুম চা লইয়া উপরে চলিয়া গেল

এত লোকের মরণ হয় আমার মরণ হয় না। উঃ কি কপাল নিয়েই জন্মেছিলাম।

গলি-পথে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। গোঙানিটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। তর্ক করিতে করিতে সতীশ ও সহদেব প্রবেশ করিল। সতীশের হাতে তরকারীপূর্ণ বাজারের থলি

সহদেব। আপনি কি বলতে চান—ফুঁয়ের জোর যার যতো সেই ততো বড় বাজিয়ে?

সতীশ। আরে কি মুশকিল, ফুঁয়ের জোর না থাকলে শানাই বাজানই যায় না যে, কাগজ কলম না থাকলে যেমন লেখা যায় না।

সহদেব। যাই বলুন আপনার নাজির খাঁর চেয়ে আমাদের ন্যাপলা ঢের ভাল বাজায়, চমৎকার শ্রুতিমধুর—

সতীশ। ভাল গান বাজনা বুঝতে গেলে শ্রুতিকে শিক্ষিত করতে হয় তবে মধুর লাগে। বীথোফেন শুনেছ কখনও? হঠাৎ শুনলে মনে হবে কতকগুলো যন্ত্র বেসুরো চীৎকার করছে।

পরিতোষ ও ললিতা পুনরায় গান ধরিল

সুদূর দূরে অসীম দূরে
চলেছি ভেসে প্রাণের সুরে
অলখ পথে অচিন পুরে
অজানা হল পরম জানা
আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা।

সতীশ। আবার সেই রাসকেলটা এসেছে।

সহদেব। পরিতোষবাবু, নয়? ওঁকে জিগ্যেস করলে হয় সকেট হবে, না রকেট হবে, হাজার হোক লোকটা এম, এ. পাশ।

সতীশ। ইচ্ছে হয় জিগ্যেস কর গে যাও, আমি চললাম, আমার ভাল লাগে না এসব।

বাহির হইয়া গেল

সহদেব। কি মুশকিল! (একটু ইতস্ততের পর) আমি যাই জিগ্যেস করেই আসি।

উপরে উঠিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে শিবাজী নামিয়া আসিল

শিবাজী। টোর্না দুর্গ এখনও বিজাপুররাজের করতলগত আর এঁরা গান গাইছেন! একটি কপর্দ্দক তাঞ্জোরে পাঠাব না আমি—

ঘরের ভিতর হইতে মৃন্ময়ীর ক্রন্দন শোনা গেল। শিবাজী কান পাতিয়া শুনিল

শিবাজী। কে কাঁদছে? ভারতমাতা? সৈন্যদল গঠন করতে হবে, সৈন্য দল, সৈন্য দল, টোর্না চাই, টোর্না—

সবেগে বাহির হইয়া গেল। পরিশ্রান্ত কলেবর পিসামহাশয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন

পিসামহাশয়। শুধু শুধু এতটা পথ হাঁটিয়ে মারলে আমাকে। (ঘাম মুছিলেন) আহ্নিকটা পর্য্যন্ত করা হয় নি এখনও আজ। আরে বাপু, পয়সা না দিলে কখনও ডাক্তার আসে?

নকুল বাহির হইয়া আসিলেন

নকুল। অটলবাবু কি বললেন ?

পিসামহাশয়। তিনি এখন আসতে পারবেন না, ঘণ্টা দুই পরে আসবেন। এক ডোজ ওষুধ দিলেন, বললেন ওতেই কাজ হবে।

নকুল। ওষুধ ? কি ওষুধ ?

পিসামহাশয়। অটল ডাক্তার আবার কি ওষুধ দেবে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। বললে, আপনাদের হোমিওপ্যাথিতে যদি বিশ্বাস থাকে তাড়াহুড়ো করলে চলবে না, ধীরে ধীরে ওষুধের কাজ হবে !

নকুল। কই, দিন।

পিসামহাশয়। হোমিওপ্যাথিতে তা হ'লে বিশ্বাস আছে তোমার ?

নকুল। কোন প্যাথিতেই বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস আছে দুটি জিনিসে, একটি অজানা তার নাম অদৃষ্ট, আর একটি জানা তার নাম দারিদ্র্য। কই, দিন কি এনেছেন।

উপরে গানটা সহসা থামিয়া গেল ; কলকণ্ঠের হাসি শোনা গেল। পিসামহাশয় ঔষধের পুরিয়া দিলেন। পুরিয়া লইয়া নকুল ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তিলক-কণ্ঠী-নামাবলীধারী জ্যোতিষী আসিয়া প্রবেশ করিল

জ্যোতিষী। এইটেই কি ফকিরবাবুর বাড়ি ?

পিসামহাশয়। হ্যাঁ, কি চান আপনি ?

জ্যোতিষী। আমি জ্যোতিষী, ফকিরবাবু আমাকে আসতে বলেছিলেন আজ।

পিসামহাশয়। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার আসবার কথা শুনেছিলাম বটে। আসুন, চলুন ওপরে চলুন।

উভয়ে উপরে চলিয়া গেলেন। স্টেজে কেহ রহিল না; কেবল মৃন্ময়ীর আর্ত্ত ক্রন্দনটা ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। সময় সেই দিনই সন্ধ্যার পর। কুঙ্কুম একা বসিয়া লণ্ঠনের আলোয় নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছে। দালানে আর কেহ নাই। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। পরিতোষ সন্তর্পণে আসিয়া প্রবেশ করিল

কুঙ্কুম। আসুন।

উঠিয়া দাঁড়াইল

পরিতোষ। তুমি একাই রয়েছ দেখছি।

কুঙ্কুম। মা রান্নাঘরে আছেন, বসুন ডেকে দি।

পরিতোষ। মাকে ডাকবার দরকার নেই। বস তুমি।

উভয়েই বসিল

পরিতোষ। হাসপাতাল থেকে কোন খবর এসেছে?

কুঙ্কুম। না, কেউ তো এখনও ফেরেন নি।

পরিতোষ। অবস্থা খুব খারাপ নাকি?

কুঙ্কুম। ডাক্তারবাবু তাই তো বললেন।

পরিতোষ। অটলবাবু এসেছিলেন?

কুঙ্কুম। অটলবাবু আসেন নি, সতীশদা অন্য একজন বড় ডাক্তার এনেছিলেন।

পরিতোষ। কখন?

কুঙ্কুম। বড় মামা আপিস চলে যাওয়ার পর।

পরিতোষ। নকুলবাবু তা হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দেখে যান নি?

কুঙ্কুম। না।

পরিতোষ। সতীশবাবু কোন্ ডাক্তার এনেছিলেন?

কুঙ্কুম। নাম জানি না।

পরিতোষ। (হাসিয়া) বড় ডাক্তার জানলে কি করে?

কুঙ্কুম। আট টাকা ফী যখন, তখন নিশ্চয়ই বড় ডাক্তার।

পরিতোষ। ফী-টা দিলে কে, নকুলবাবুর কাছে তো টাকা ছিল না, তিনি আমার কাছে ধার চাইছিলেন।

কুঙ্কুম। ফী সতীশদাই দিলেন।

পরিতোষ। ধার?

কুঙ্কুম। জানি না।

উঠিয়া দাঁড়াইল

পরিতোষ। উঠছ কেন?

কুঙ্কুম। যাই মাকে ডেকে আনি।

পরিতোষ। তার চেয়ে এস্রাজটা আন, ভৈরবীটা শোনা যাক,

ওবেলা তো গোলমালে শোনাই হল না, এখন একটু ফাঁক আছে।

কুস্কুম। আমি আর এস্রাজ শিখব না।

পরিতোষ। (সবিস্ময়ে) কেন ?

কুস্কুম। যা শিখেছি তাতেই চলবে।

পরিতোষ। চলবে মানে ?

কুস্কুম। আমাকে যখন দেখতে আসবে তখন যা শিখেছি তাতেই মুগ্ধ করতে পারব বরপক্ষের লোকেদের।

পরিতোষ। বরপক্ষের লোকদের মুগ্ধ করবার জন্যেই বাজনা শিখছ নাকি ?

কুস্কুম। তাছাড়া আর কি, আমাদের জীবনে গান বাজনার আর কি মানে আছে ? মামীমাও বিয়ের আগে অনেক রকম বাজনা শিখেছিলেন শুনেছি, কিন্তু বিয়ের পর একদিনও বাজাতে শুনি নি।

পরিতোষ। আহা, সবাই যে তোমার মামীমার মতো হবে তার কি মানে আছে ? তুমি ইচ্ছে করলে—

কুস্কুম। আমার অবস্থা আরও খারাপ, আমি মামাদের আশ্রিত। মামীমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার লোক জুটেছে, আমি অসুখে পড়লে হয়তো তা-ও জুটবে না।

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

পরিতোষ। শোন শোন, কুঙ্কুম তোমার অমন চমৎকার মিষ্টি হাত, আমি বলছি, তুমি যদি ভাল করে শেখ—

কুঙ্কুম ঘুরিয়া দাঁড়াইল

কুঙ্কুম। একটা কথা জিগ্যেস করব, যদি কিছু মনে না করেন—

পরিতোষ। কর।

কুঙ্কুম। আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছেন?

পরিতোষ। বিয়ে!

কুঙ্কুম। হ্যাঁ বিয়ে।

পরিতোষ। হঠাৎ এ কথা বলবার মানে?

কুঙ্কুম। মানে, তা হলেই আমি আপনার কাছে এস্রাজ শিখতে পারি, ভৈরবী কানাড়া বেহাগ মালকোষ যা শেখাবেন তাই শিখব, আর তা যদি না থাকেন তা হলে এসব শেখাশিখির কোন অর্থ হয় না।

পরিতোষ। (হাসিয়া) আমাকে পছন্দ হয় তোমার?

কুঙ্কুম। আমার আবার পছন্দ অপছন্দ কি?

পরিতোষ। পছন্দ অপছন্দ নেই?

কুঙ্কুম। থাকলেও কোন মূল্য নেই, সুতরাং বলা বৃথা।

পরিতোষ। তবু বল না শুনি?

কুস্কুম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল

কুস্কুম। আপনাকে আমার একটুও পছন্দ হয় না, কিন্তু তবু আপনাকে বিয়ে করতে আমার এতটুকু আপত্তি নেই।

পরিতোষ। কেন ?

কুস্কুম। মায়ের আর মামার দুর্ভাবনা ঘোচাবার জন্যে। রাজি আছেন ?

সোৎসুকে চাহিয়া রহিল। পরিতোষ নীরব

কুস্কুম। বলুন, রাজি আছেন ?

পরিতোষ। বিয়ে করবার ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য নেই যে।

কুস্কুম। শুনলাম কোন্ কলেজে প্রফেসারি পাবেন নাকি ?

পরিতোষ। এখন তার কোথায় কি, দরখাস্ত করেছি মাত্র ; (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) সত্যি আমার সামর্থ্য নেই।

কুস্কুম। সামর্থ্য নেই যদি, তা হলে আপনার সরে থাকাই উচিত আমাদের মতো মেয়ের কাছ থেকে ; আমাদের সঙ্গে মিশে শুধু শুধু আমাদের উৎসুক ক'রে তোলেন কেন মিছিমিছি ?

পরিতোষ। উৎসুক ক'রে তুলি মানে ? আমি তো—

সিঁড়িতে ললিতাকে দেখা গেল

ললিতা। পরিতোষবাবু কতক্ষণ এসেছেন ? কুঙ্কুমকে এস্রাজ শেখাচ্ছেন নাকি ?

কুঙ্কুম। আমি যাই।

গলি দিয়া রান্নাঘর অভিমুখে চলিয়া গেল। ললিতা নামিয়া আসিল

ললিতা। কুঙ্কুম চ'লে গেল কেন ? আমি আসাতে বাধা পড়ল ?

মুচকি হাসিল

পরিতোষ। ও রান্নাঘরে গেল।

ললিতা। চা আনতে ?

পরিতোষ। না, চা আনতে তো বলি নি। তোমার গানটা এবার ঠিক হয়েছে ?

ললিতা। (হাসিয়া যেন ঢলিয়া পড়িল) না, এখনও হয় নি।

পরিতোষ। এখনও হয় নি ? তোমাকে নিয়ে বিপদে পড়লাম তো ! মা কোথা ?

ললিতা। মা ঘুমুচ্ছেন।

পরিতোষ। এমন অসময়ে ঘুম ?

ললিতা। মায়ের যে ফিট্ হয়ে গিয়েছিল। মাথায় বরফ জলটল দিয়ে এই সবে সুস্থ হয়েছেন একটু।

পরিতোষ। ফিট ? কেন ?

ললিতা। টুনুর মায়ের ব্যাপার দেখে ! উঃ সে কি রক্ত।

পরিতোষ। তাই নাকি?

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল

পরিতোষ। টুনু রুনু কোথা, তারাও হাসপাতালে গেছে নাকি ?

ললিতা। কাকা তাদের নিয়ে গেছে।

পরিতোষ। কোথায় ?

ললিতা। গোয়াবাগানে তাদের দূর-সম্পর্কের এক মাসী আছে সেইখানে।

পরিতোষ। ভারী মুশকিলে পড়েছেন তো নকুলবাবু।

ললিতা। সত্যি।

পরিতোষ। ফকিরবাবু কোথা ?

ললিতা। বাবাই তো হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। নকুলবাবু আপিসে, সহদেববাবু দুপুরে সেই যে বেরিয়েছেন এখনও ফেরেন নি, বাবাকেই যেতে হল শেষ পর্য্যন্ত। পিসে মশাইও গেছেন অবশ্য। (মুচকি হাসিল)

পরিতোষ। পিসেমশাই লোকটি বেশ, তোমাদের শিবাজীটিও বেশ, কোথায় সে ?

ললিতা। কি জানি কোথায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, সে তো বাড়িতে প্রায়ই থাকে না। (সহসা) ওমা আপনার গালের ব্রণটা বেশ লাল হয়ে উঠেছে

যে! টিপেছিলেন বুঝি? সকালে মানা করলাম অত ক'রে, দাঁড়ান একটু জাম্বাক নিয়ে আসি।

উপরে উঠিয়া গেল। বাহিরের দ্বারদেশে একটি কুলি সমভিব্যাহারে একটি ছোকরা প্রবেশ করিল

ছোকরা। এখানে নকুলবাবু থাকেন?

পরিতোষ। হ্যাঁ, কি চান?

ছোকরা। তিনি আপিস যাবার সময় সর্ব্বমঙ্গলা ষ্টোরস থেকে এই জিনিসগুলো পছন্দ ক'রে কিনে রেখে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন এই ঠিকানায় পৌঁছে দিতে।

পরিতোষ। বেশ, রেখে যান।

কুলি ভিতরে আসিয়া প্যাকেটগুলি নামাইয়া রাখিল

ছোকরা। বিলটা?

পরিতোষ। নকুলবাবু আপিস থেকে ফেরেন নি এখনও। বিলটা রেখে যান, কিম্বা কাল সকালে নিয়ে আসবেন। তাঁকে চেনেন তো?

ছোকরা। খুব চিনি, উনি হলেন আমাদের দোকানের পুরোনো খদ্দের। আগেকার বিলও বাকি আছে

কিছু। বেশ কাল সকালেই আসব। কুলির চারটে পয়সা দিয়ে দেবেন ?

পরিতোষ। আমি এ বাড়ির কেউ নই। নকুলবাবুর স্ত্রী খুব অসুস্থ, তাঁকে নিয়ে সবাই হাসপাতালে গেছেন। চারটে পয়সা ? আচ্ছা দেখি—

ব্যাগ বাহির করিয়া হাত ঢুকাইয়া শেষে উপুড় করিয়া দেখিলেন

না, নেই।

ছোকরা। আচ্ছা, আমরা দোকান থেকেই দিয়ে দেব এখন। নমস্কার।

কুলি ও ছোকরা চলিয়া গেল। জাম্বাক লইয়া ললিতা নামিয়া আসিল ও অনুরাগভরে তাহা পরিতোষের গালে লাগাইয়া দিল

ললিতা। সত্যি, বড্ড কেয়ারলেস তুমি (জিব কাটিয়া, মুচকি হাসিয়া) মানে, আপনি, ভুলে বলে' ফেলেছি, মাপ করবেন।

পরিতোষ কিছু বলিল না। প্যাকেট-গুলির প্রতি ললিতার নজর পড়িল

ললিতা। এসব কি আবার ?

পরিতোষ। নকুলবাবুর পূজোর বাজার বোধ হয়। প্যাকেটের

বছর দেখে মনে হচ্ছে, অনেক কিছু কিনেছেন ভদ্রলোক।

ললিতা। লজ্জাও করে না! ছ' মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, পাড়ার মুদির দোকানে ধার—

পরিতোষ। কি করবেন বল, পূজার সময়ে কিনতেই হবে।

ললিতা। দেখি কি কি কিনলেন ভদ্রলোক।

বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল

এই চাঁপা রঙের শাড়িটা বোধ হয় টুনুর, আর এই লালটা রুণুর, এটা বোধ হয় স্ত্রীর জন্যে কিনেছেন, বাঃ, বেশ টেষ্ট আছে ভদ্রলোকের; এই থানখানা বোধহয় দিদির জন্যে, এই সব ছোট ছোট পাঞ্জাবির কাপড় কার জন্যে?

পরিতোষ। ভাইপোদের জন্যে বোধ হয়, ওঁর এক দাদা আছেন শুনেছি।

ললিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। সেখান থেকেও আজ চিঠি এসেছে বাড়িসুদ্ধ সবায়ের অসুখ না কি।

পরিতোষ। ভদ্রলোক নিজের জন্যে কিছু কেনেন নি দেখছি।

ললিতা। এটা কি?

কাগজের মোড়ক খুলিল

বাঃ চমৎকার শাড়িটা তো, কুঙ্কুমের জন্যে বোধ

হয়, এই হেলিওট্রোপ রঙে যা মানাবে ওই মেয়েকে—

ঠোঁট উলটাইয়া হাসিল। চায়ের পেয়ালা হস্তে গলি-পথ দিয়া কুঙ্কুম প্রবেশ করিল এবং পরিতোষের সম্মুখে চায়ের পেয়ালা রাখিল

পরিতোষ। (বিস্মিত) চা কেন ! চা আনতে তো বলি নি।

কুঙ্কুম। মা পাঠিয়ে দিলেন, চা-টা খান ততক্ষণ, হালুয়া আনছি।

পরিতোষ। হালুয়া ? আবার হালুয়া কেন ?

কুঙ্কুম কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইতেছিল

ললিতা। নকুলবাবু তোমাদের কি সুন্দর পূজোর বাজার করেছেন দেখ।

কুঙ্কুম। মেজমামা এসেছেন না কি।

পরিতোষ। না, পাঠিয়ে দিয়েছেন দোকান থেকে।

কুঙ্কুম। হাসপাতাল থেকে কেউ আসে নি ?

পরিতোষ। না

ললিতা। তোমার শাড়িটা কি সুন্দর দেখ।

কুঙ্কুম। থাক, পরে দেখব।

প্যাকেটগুলি গুছাইয়া ঘরে রাখিল ও তাহার পর গলি-পথে রান্নাঘরে চলিয়া গেল

পরিতোষ। তোমাদের পূজোর বাজার হয়নি এখনও ?

ললিতা। আমাদের ? (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, হয় নি এখনও, বাবা কুরসতই পাচ্ছেন না।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। গানের কোন্ জায়গাটায় আটকাচ্ছে তোমার ?

ললিতা। সুদূর দূরে অসীম দূরে—ওই জায়গাটায়।

পরিতোষ। কেন, ওখানটা শক্ত কি এমন—

আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিল

সুদূর দূরে অসীম দূরে
চলেছি ভেসে প্রাণের সুরে
অলখ পথে অচিন পুরে
অজানা হল পরম জানা
আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা

ললিতা। গানটা আপনার তৈরি ?

পরিতোষ। হ্যাঁ আমারই তৈরি, রবি ঠাকুরের নকল আর কি, আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও দেখি।

আস্তে আস্তে দুজনে গানটি গাহিতে লাগিল। কুঙ্কুম এক প্লেট হালুয়া লইয়া প্রবেশ করিল, পিছনে পিছনে দুর্গামণি

দুর্গামণি। হালুয়াটুকু খেয়ে নাও বাবা। (ললিতার দিকে

বিষদৃষ্টি হানিয়া) ললিতা, তোমার মা কেমন আছেন ?

ললিতা। মা ঘুমুচ্ছেন।

দুর্গামণি। মাকে একলা ফেলে রেখে নেমে এলে কেন মা, আমিও এমন একটু অবসর পাচ্ছি না যে কাছে গিয়ে বসি। (পরিতোষের দিকে চাহিয়া) উঃ. দুপুরে সে কি কাণ্ড, এদিকে বউ যায় যায়, ওদিকে ওর মায়ের ফিট ! পরিতোষ, তুমি বাবা কুঙ্কুমের বাজনাটা শোন একবার, কুঙ্কুম গৎটা শোনা পরিতোষকে, আমি যাই দুধটা চড়িয়ে এসেছি।

চলিয়া গেল

পরিতোষ। কুঙ্কুম এস্রাজটা আন তা' হলে।

কুঙ্কুম ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল ও পরক্ষণেই বাহির হইয়া আসিল

পরিতোষ। কি হ'ল, এস্রাজ আনলে না ?

কুঙ্কুম। এস্রাজটা ওপরে আছে, নিয়ে আসি।

চলিয়া গেল

ললিতা। (মুচকি হাসিয়া) আমি তা হ'লে যাই, মায়ের সেবা করিগে, আপনি কুঙ্কুমকে বাজনা শেখান।

পরিতোষ। মা তো ঘুমুচ্ছেন, বস না।

পুনরায় গুন গুন করিয়া গান ধরিল

আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা
আপন হারা সুরের ধারা
মানে না বাধা মানে না মানা

ললিতা। মা এখনও ঘুমুচ্ছে ?

কুসুম। উঠেছেন

ললিতা। আমি যাই তা হ'লে।

পরিতোষ। বস না।

কুসুম। আমার কিন্তু এখন বাজাতে ইচ্ছে করছে না পরিতোষবাবু।

পরিতোষ। তা হলে দাও আমি বাজাই, এই গানখানাই বাজানো যাক, দাও দেখি, ললিতা, তাল দাও তো—তোমার তালটা ঠিক হয়েছে কি না দেখা যাক।

পরিতোষ এস্রাজ লইয়া গানখানা বাজাইতে লাগিল,—ললিতা তাল দিতে লাগিল, কুসুম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল

খানিকক্ষণ বাজনা চলিবার পর বাহিরের দ্বার দিয়া সতীশ আসিয়া প্রবেশ করিল

সতীশ। এই যে কনসার্ট বেশ জমে উঠেছে দেখছি!

বাজনা থামিয়া গেল

সতীশ। পরিতোষবাবু, একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই আপনাকে, যদি কিছু মনে না করেন—

পরিতোষ। কি বলুন?

সতীশ। আপনি এখানে আসেন কেন?

পরিতোষ। আসি কেন মানে?

সতীশ। কি উদ্দেশ্যে আসেন?

পরিতোষ। এমনি বেড়াতে আসি।

সতীশ। বেড়াতে আসেন! আমাদের বাড়িটা কি পার্ক যে যখন খুসি বেড়াতে আসবেন? পার্কে বেড়াবারও একটা সময় অসময় আছে।

সকলের অলক্ষ্যে সিঁড়ির উপর যমুনা আসিয়া দাঁড়াইল

পরিতোষ। আমি আপনার কথাবার্ত্তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সতীশ। স্পষ্ট করে' বলব? কার হুকুমে আপনি এদের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করছেন? কে আপনাকে যখন তখন এসে এদের গান শেখাবার জন্যে অনুরোধ করেছে?

যমুনা। (সিঁড়ির উপর হইতে) আমি।

সকলে সেদিকে ফিরিয়া চাহিল, যমুনা নামিয়া আসিল

যমুনা। পরিতোষ আমার বাল্যবন্ধু, আমি ওকে রোজ আসতে বলেছি ললিতাকে গান শেখাবার জন্যে; আর কুঙ্কুমের মায়ের অনুরোধে ও দয়া করে কুঙ্কুমকে বাজনা শেখাচ্ছে। তোমার এতে আপত্তি আছে?

সতীশ। আছে, যে কোন লোফারের সঙ্গে আমি আমার ভাইঝিকে মিশতে দিতে পারি না।

যমুনা। যারা নিজেরাই লোফার, তাদের সঙ্গে লোফার ছাড়া আর কে মিশবে বল।

সতীশ। আমরা লোফার?

যমুনা। তা ছাড়া আর কি, ভাগ্যে পূর্ব্বপুরুষদের এই বাড়িটা ছিল তাই নিচের তলাটা ভাড়া দিয়ে কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলছে। তোমার দাদা যে পেনসন পান তাতে সংসার চলে না।

সতীশ। তার সঙ্গে পরিতোষবাবুকে বাড়িতে ঢোকানোর কি সম্পর্ক?

যমুনা। এতদিন পরে আজ হঠাৎ ভাইঝির জন্যে এত

দরদ যে! (মুচকি হাসিয়া ও কুঙ্কুমের দিকে চাহিয়া) দরদটা যে কোথায় তা আমি জানি। চল পরিতোষ, আমরা ওপরে যাই, ললিতা আয়।

যমুনা, পরিতোষ, ললিতা উপরে চলিয়া গেল। কুঙ্কুম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল

সতীশ। লোকটাকে দেখলেই আমার রাগ হয়।

কুঙ্কুম। কেন, উনি তো কখনও কোন অভদ্র ব্যবহার করেন নি। বরং—

সতীশ। কেন? তুমিও বলছ কেন!

বাহিরের দ্বার দিয়া সহদেবের প্রবেশ। পিছনে কুলির মাথায় একটা রেডিও

সতীশ। একি!

সহদেব। চাটুয্যে নিলে না রেডিওটা, আপিসে ফিরিয়ে দেবারও আর সময় নেই আজ। (কুলিকে) ওই টেবিলটার ওপর রাখ, আনা দুই পয়সা হবে সতীশদা, কাল দিয়ে দেব।

সতীশ পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা দিল, কুলি পয়সা লইয়া চলিয়া গেল

সতীশ। আর তিন আনা বাকি রইল, এক প্যাকেট কাঁইচি হবে।

সহদেব। কুঙ্কুম এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস্, হেঁটে হেঁটে থকে' গেছি।

একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, কুঙ্কুম চলিয়া গেল

সহদেব। বৌদির সাড়া পাচ্ছি না যে, ছেলে হয়ে গেছে না কি?

সতীশ। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে :

সহদেব। তাই না কি, কখন?

সতীশ। দুপুরে।

সহদেব। খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল?

সতীশ। খুব।

সহদেব। দাদা তো ছিল না—কে নিয়ে গেল?

সতীশ। আমাব দাদা আর তোমার পিসেমশাই।

সহদেব। টুনু রুণু কোথা?

সতীশ। তোমার বৌদিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই আমি তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে গোয়াল-বাগানে রেখে এসেছি।

সহদেব। কেন?

সতীশ। তা না হলে হাসপাতালে যেতে চাইত। এইবার গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। রুণুটার আবার জরও হয়েছে একটু।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

সতীশ। রেডিওটা নিলে না ?

সহদেব। না। নিলে গোটা কয়েক টাকা পাওয়া যেত।

সতীশ। নিলে না কেন ?

সহদেব। পছন্দ হ'ল না। সকালে তোমার সঙ্গে শানাই শুনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল, ইতিমধ্যে আর একজন ক্যানভাসার এসে জুটেছে শুনলাম। আমাকে বললে—পছন্দ হল না, অথচ পছন্দ না হবার কি আছে এতে, কি চমৎকার ক্লিয়ার রিসেপ্‌শন, এই দেখুন না—

উঠিয়া গিয়া রেডিওটা লাগাইয়া দিতেই সেতারে বাগেশ্রীর আলাপ শোনা যাইতে লাগিল

সতীশ। দিল্লী ?

সহদেব। হাঁ, কি রকম ক্লিয়ার রিসেপ্‌শন দেখছেন।

রেডিও বাজিতে লাগিল। ললিতা উপর হইতে নামিয়া আসিল

ললিতা। কাকা, তোমার নামে দুপুরে এই চিঠিটা এসেছিল।

সতীশ। কি চিঠি ?

ললিতা। জানি না, খুলে দেখি নি, খাম।

চিঠি দিয়া উপরে চলিয়া গেল

সতীশ। (চিঠি পড়িয়া) থাক—

সহদেব। কি ?

সতীশ। একটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, হ'ল না।

রেডিওতে বাগেশ্রীর আলাপ চলিতে লাগিল। উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে বাহিরের দ্বার দিয়া ফকিরবাবু প্রবেশ করিলেন

সহদেব। বৌদির খবর কি ?

ফকির আমি তো জানি না, আমি তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েই নিজের ধান্দায় বেরিয়েছিলাম। (সতীশকে) মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটে সেই পাত্রটির খোঁজে গিয়েছিলাম, সকালে দেখা পাইনি।

সতীশ। কি হল ?

ফকির। নগদ পাঁচ হাজার টাকা চায়, গয়না পত্তর ছাড়া।

সতীশ। তাই না কি ?

ফকির। তবে আর বলছি কি। ওই পরিতোষেরই খোসামোদ করতে হবে, উপায় কি তাছাড়া।

গট গট করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। রেডিওতে বাগেশ্রী বাজিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে সতীশ আস্তে আস্তে কথা কহিল

সতীশ। সহদেব !

সহদেব। কি ?

সতীশ। পালাই চল।

সহদেব। পালাব ? কোথায় ?

সতীশ। যে দিকে দু'চক্ষু যায়। জাহাজের খালাসি ফালাসি যা হোক হয়ে আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া যেখানে হোক পালাই চল, এ সমাজে বাস করার চেয়ে জঙ্গলে বাস করা ঢের ভাল।

সহদেব চুপ করিয়া রহিল। উত্তেজিত ভাবে কথা কহিতে কহিতে পরিতোষের পিছু পিছু ফকির সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন

ফকির। শোন শোন, চলে যাবে কেন তুমি, আমার কথাটা শোনই না।

পরিতোষ। না আমাকে মাপ করুন।

ফকির। (সতীশকে) তুমি একে অপমান করেছ ? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার ! ভদ্রতা বলে একটা জিনিস নেই ? আমরা আসতে বলেছি বলেই ও আসে,

তুমি ওকে অপমান করবার কে! বাড়ির কর্ত্তা তুমি? ক্ষমা চাও, ক্ষমা চাও এক্ষুণি।

পরিতোষ। আহা, কি করেন ফকিরবাবু আপনি। আমি যাই, আমাকে যেতে দিন, সতীশবাবু কিছু মনে করবেন না, আমি চললাম—

বাহির হইয়া গেলেন

ফকির। লজ্জা করে না তোমার? কুটোটি নেড়ে উপকার করতে পার না, একটি পয়সা রোজকার করবার সামর্থ্য নেই, চিরটা কাল জোঁকের মত ঘাড়ে লেগে আছ, ভদ্রতা-জ্ঞানটা পর্য্যন্ত নেই, অতিথিকে অপমান করবে তুমি—

সিঁড়ির উপর ললিতাকে দেখা গেল

ললিতা। বাবা, শিগ্‌গির এস, মায়ের আবার ফিট হয়েছে।

ফকির। উঃ কি বিপদ।

হন্ত দন্ত হইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।
সতীশ ও সহদেব নীরবে বসিয়া রহিল।
ক্ষণকাল পরে শিবাজী প্রবেশ করিল

শিবাজী। (আপন মনে) বাঘ-নখ, বাঘ-নখ চাই একটা, আফজল খাঁর নাড়ি ভুঁড়ি টেনে ছিঁড়ে বার

করব ! আমার সঙ্গে চালাকী, বাঘের বাচ্চা আমি—

কোনদিকে না চাহিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেল। সহদেব একটু মুচকি হাসিল। সতীশ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিল। পিশামহাশয় প্রবেশ করিলেন

পিশামহাশয়। (এদিক ওদিক চাহিয়া) নকুল আপিস থেকে ফিরেছে ?

সহদেব। না, বৌদির খবর কি ?

পিসামহাশয়। মেয়ে দুটো কোথা ?

সহদেব। গোয়াবাগানে, বৌদিদির খবর কি আগে বলুন না।

পিসামহাশয়। মারা গেছে।

সহদেব। মারা গেছেন ? সে কি !

পিসামহাশয়। হ্যাঁ। পেটে প্রকাণ্ড এক মরা মেয়ে ছিল, কুলটা ছিল সামনের দিকে। আমার ঠাকুর্দ্দা যখন পাতিয়ালা ষ্টেটে ছিলেন তখন আমার ঠাকুরমার ঠিক এই রকম হয়েছিল শুনেছি। পাতিয়ালা ষ্টেটের চীফ মেডিক্যাল অফিসার নিজে চিকিৎসা করেছিলেন, নিজে স্বয়ং, কিন্তু (মাথা নাড়িলেন) বাঁচল না। এতে বাঁচে না।

সহদেব। হাসপাতালে বউদির কাছে আছে কে ?

পিশামহাশয়। কেউ না, তোমাদের ডাকতেই তো এসেছি :

সহদেব উঠিয়া পড়িল

সহদেব। চলুন তা হলে, সতীশদা উঠুন, দিদিকে খবরটা দেব, না থাক পরে দিলেই হবে, সতীশদা উঠুন—

সতীশ কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মহাদেবের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। পিসামহাশয় দাঁড়াইয়া রহিলেন

পিসামহাশয়। আর পারি না আমি, সমস্তটা দিন এক নাগাড়ে চলেছে। যাই যেতেই যখন হবে।

চলিয়া গেলেন। মিনিটখানেক পরে নকুল আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং নির্জ্জন ঘরটায় চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। সিঁড়ি দিয়া ফকির তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন

ফকির। সহদেব, স্মেলিং সল্‌ট্‌ আছে ? সহদেব কোথা গেল। (নকুলকে দেখিতে পাইয়া) নকুল, কখন ফিরলে ? ওকি, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে ?

নকুল। তাড়িয়ে দিলে, কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিলে।

ফকির। কে তাড়িয়ে দিলে ?

নকুল। সায়েব। চাকরিটা গেল।

নির্ব্বাক হইয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে-চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রেডিওতে-বাগেশ্রীর আলাপ চলিতে লাগিল

তৃতীয় অঙ্ক

সাত দিন পরে। দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। দালানের তক্তাপোশটাতে অসুস্থ রুণু জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় শুইয়া আছে। টুনু মাথার শিয়রে বসিয়া জল-পটি দিয়া বাতাস করিতেছে। নকুল একটি টেবিলের ধারে দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পাশে টাইপরাইটার টাও রহিয়াছে

টুনু। বাবা, কাকা হাসপাতালে গেল কেন, মাকে আনতে?

নকুল। না, ওষুধ আনতে।

টুনু। রুণুর জন্যে?

নকুল। রুণুর জন্যেও আনবে নিজের জন্যেও আনবে।

টুনু। কাকার কি হয়েছে?

নকুল। পা ফুলেছে দেখ নি।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব

টুনু। মা কখন আসবে বাবা, সাতদিন হয়ে গেল মা

তো এখনও এল না ; রুণুর জ্বরের খবর দিয়েছ মাকে ?

নকুল। না।

টুনু। দাও নি কেন, দিলে মা ঠিক চলে আসবে।

আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিল

টুনু। কাল পিসিমা কি বলছিল জান বাবা ?

নকুল। কি ?

টুনু। বলছিল—মা স্বর্গে গেছে। স্বর্গ কোথায় বাবা, হাসপাতালের কাছে কোনও জায়গা ?

নকুল। বেশী কথা বোলো না টুনু, রুণুর ঘুম ভেঙে যাবে এখুনি। জলপটিটা শুকিয়ে যায় নি তো দেখি—

উঠিয়া জলপটি ঠিক করিয়া দিলেন

টুনু। মাকে নিয়ে এস তুমি আজই।

নকুল কোন উত্তর না দিয়া কন্যার হাত হইতে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন

টুনু। বাবা, তুমি আপিস যাচ্ছ না কেন আজকাল ?

নকুল কোন উত্তর দিলেন না

টুনু। মাকেও তো হাসপাতালে দেখতে যাচ্ছ না—

নকুল কোন উত্তর দিলেন না

বাহিরের দ্বার দিয়া পরিতোষ প্রবেশ করিল

নকুল। কে, ও পরিতোষ, এস বস।

পরিতোষ। আমি আপনার বিপদের কথা শুনেছি, কিন্তু, নানা কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে আসতেই পারি নি। ওর জ্বর নাকি?

নকুল। হ্যাঁ, খুব জ্বর।

পরিতোষ। সতীশবাবুর কোন খবর পাওয়া গেল?

নকুল। না।

পরিতোষ। আশ্চর্য্য কাণ্ড, ভদ্রলোক কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন হঠাৎ—

নকুল। কি জানি (রুণুর গায়ে হাত দিয়া) উঃ জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

টুনু। দাও বাবা, আমি জোরে জোরে হাওয়া করি।

নকুল। না, থাক, আমি করছি।

পরিতোষ। সতীশবাবুর কোন খবর পাওয়া যায়নি তা হলে? আমি ব্যক্তিগতভাবে এজন্য কুণ্ঠিত, ঠিক আগের দিনই সামান্য একটা কারণে ভদ্রলোকের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে গেল মিছিমিছি।

নকুল কোন উত্তর দিলেন না

দুর্গামণি প্রবেশ করিলেন

দুর্গামণি। টুনু, তুই খেয়ে নিগে যা; ললিতা তোর ভাত বাড়ছে, আমি কাপড়টা ছেড়ে ফেলি গে, ট্রেণের আর কত দেরি, পিসেমশাই কোথা গেলেন?

নকুল। গাড়ি ডাকতে গেছেন।

টুনু গলিপথ দিয়া রান্না ঘরে চলিয়া গেল

পরিতোষ। আপনারা কোথাও যাচ্ছেন না কি?

দুর্গামণি। সবাই নয়, আমি কুঙ্কুম আর পিসেমশাই চললাম অর্জ্জুনের কাছে; টেলিগেরাপ এসেছে আজ, সেখানে তাদের বাড়িসুদ্ধ সব অসুখে পড়েছে, মুখে জল দেবার লোক নেই। এখানে ললিতা আছে, দেখাশোনা করছে; ভারী নেটিপেটি মেয়েটি, বড় ভাল, পর বলে' মনেই হয় না।

পরিতোষ। কুঙ্কুমকে রেখে গেলেই পারতেন।

দুর্গামণি। ও আবার আমাকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারে না বাবা, বিয়ে হলে ও মেয়ে যে কি করবে তাই ভাবি। তুমি একবার এসো না অর্জ্জুনের ওখানে বেড়াতে, নৈহাটি, বেশী দূর তো নয়।

পরিতোষ। দেখি সুযোগ পাইতো যাব।

দুর্গামণি। হ্যাঁ, এসো।

নকুল। ট্রেণের বেশী সময় নেই দিদি, কাপড় চোপড় যা পরবে—পরে নাও।

দুর্গামণি। হ্যাঁ, এই যে নি, কুঙ্কুমের জিনিসগুলোও গুছিয়ে নিতে হবে।

ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। কুঙ্কুম আসিয়া প্রবেশ করিল

নকুল। খাওয়া হয়ে গেল ?

কুঙ্কুম। হ্যাঁ, ললিতা-দি তোমারও ভাত বাড়ছে।

নকুল। আমার ? আমার এখন খিদে নেই।

কুঙ্কুম। যা পার চারটি খেয়ে নাও গিয়ে, কতক্ষণ হেঁসেল নিয়ে বসে থাকবে বেচারি।

নকুল। আমি খেয়ে নিলেই ওর ছুটি হয়ে যায় বুঝি ; আচ্ছা, তা হ'লে যাই, তুই একে একটু হাওয়া কর, আমি চট্ করে' খেয়ে আসি।

চলিয়া গেলেন। কুঙ্কুম বিছানায় বসিল

পরিতোষ। আজ তোমরা তা হ'লে চললে ?

কুঙ্কুম। হ্যাঁ।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। যে গৎগুলো শিখিয়েছিলাম সেগুলোর চর্চ্চা রেখো।

কুঙ্কুম। আমার তো এস্রাজ নেই, ললিতাদির এস্রাজটা বাজাতাম আমি।

পরিতোষ। মানে, যদি কোন এস্রাজ পাও ওখানে, পেতেও তো পার।

কুঙ্কুম। সেজকাকার ওখানে যখন ছিলাম তখন যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয় তাঁর সখ ছিল ইংরেজি লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করার; তাঁর সখ মেটাবার আশায় দিনকতক বি এল এ ব্লে করে' চেঁচিয়েছিলুম। আপনার হুজুগে পড়ে দু-চারটে গৎও শিখলুম, এবার আর কারো পাল্লায় পড়ে হয় তো কার্পেট বোনা বা নাচ শিখতে হবে।

পরিতোষ। তুমি এসব জিনিস ঠিক ওই দৃষ্টিতে দেখ কেন কুঙ্কুম?

কুঙ্কুম। অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখতে শিখিনি।

একবাটি সাবু হাতে করিয়া ললিতা প্রবেশ করিল

ললিতা। কণু ঘুমুচ্ছে না কি, সাবু করে' আনলাম ওর জন্যে। পরিতোষবাবু কতক্ষণ এসেছেন?

সেদিন যে রকম রাগ করে' গেলেন, ভাবলাম আর বুঝি আসবেনই না।

মুচকি হাসিয়া সাবুর বাটিটা টেবিলে রাখিয়া বই চাপা দিল

পরিতোষ। এসেছি নেমন্তন্ন করতে. কুস্কুম তো চলেই যাচ্ছে দেখছি।

ললিতা। কিসের নেমন্তন্ন ?

পরিতোষ। আমার বিয়ের। চন্দনার সঙ্গে পরশু দিন আমার বিয়ে।

ললিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল

কুস্কুম। আপনার বিয়ের! তবে যে সেদিন বললেন আপনার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই।

পরিতোষ। আমার সামর্থ্য নেই, চন্দনার বাবাই সামর্থ্য-সঞ্চার করেছেন! (একটু হাসিয়া) মোটা পণ এবং একটা চাকরি—

দুর্গামণি। (ঘরের ভিতর হইতে) কুস্কুম এলি, তোর কোথায় কি আছে গুছিয়ে নে, আমি কিস্কু খুঁজে পাচ্ছিনা।

কুস্কুম। যাই। চললাম পরিতোষ বাবু।

চলিয়া গেল

ললিতা। চন্দনার সমস্ত ইতিহাস জেনেও তাকে বিয়ে করতে প্রবৃত্তি হ'ল আপনার! টাকাটাই বড় হ'ল?

পরিতোষ। না জেনে বিয়ে করার চেয়ে জেনে বিয়ে করাই ভাল, এটা বিজ্ঞানের যুগ।

ললিতা। চন্দনা যদি আমাদের মতো গরীব হত, করতেন?

পরিতোষ। আমার নিজের সামর্থ্য থাকলে কেবল ওই জন্যেই আপত্তি করতাম না।

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। ফকিরবাবু কোথা?

ললিতা। বাবা সকাল থেকেই বেরিয়েছেন, কাকাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়।

পরিতোষ। আশ্চর্য্য, ভদ্রলোক গেলেন কোথা! যমুনা ওপরে আছে?

ললিতা। তিনি প্রমথবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন।

পরিতোষ। প্রমথবাবুটি কে?

ললিতা। আমি ঠিক জানি না, দাদা বলছিলেন।

পরিতোষ। প্রমথ বলে' ওর কোন দাদা আছে বলে' তো মনে পড়ছে না, ওদের বাড়ীর সকলকেই তো চিনি।

ললিতা চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। প্রমথবাবুর সঙ্গে কোথায় গেছে ?

ললিতা। ঠিকানা জানি না। শুনলাম প্রমথবাবুর বাসায় আজ সমস্ত দিন থাকবেন, সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখে তারপর ফিরবেন।

পরিতোষ। তা হলে তার জন্যে অপেক্ষা করা বৃথা। কার্ড-খানা রেখে যাই তা হলে, দিয়ে দিও তোমার বাবাকে। আর তোমরা সবাই যেও, বুঝলে ?

ললিতা। চেষ্টা করব।

পরিতোষ। নকুলবাবুকেও এই কার্ডখানা দিয়ে দিও, আমার আর বসবার সময় নেই, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।

দুইখানি রঙীন নিমন্ত্রণপত্র বাহির করিয়া ললিতাকে দিল

আচ্ছা, চলি তাহলে এখন। নিশ্চয় যেও তোমরা।

চলিয়া গেল। ললিতা নির্ব্বাক হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর সহসা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। বাহিরের দ্বার দিয়া শিবাজী প্রবেশ করিল। পদশব্দ শুনিয়া ললিতা নিজেকে সামলাইয়া লইল

শিবাজী। (চুপি চুপি) ললিতা, একটা ঝুড়ি দিতে পারিস ? বেশ বড় মজবুত-গোছের একটা ঝুড়ি ?

ললিতা। কি হবে ?

শিবাজী। (চুপি চুপি) পালাতে হবে, ঝুড়ির ভেতর লুকিয়ে পালাতে হবে! ঔরঙ্গজেবের বন্দী হয়ে আজীবন বাস করব বলতে চাস ?

ললিতার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেল। নকুল ফিরিয়া আসিলেন। ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল

ললিতা। খাওয়া হয়ে গেল আপনার এর মধ্যে ; আমি যাচ্ছিলাম এখনি।

নকুল। না, আমার আর কিছু লাগত না। তুমি বরং টুনুকে একটু দুধ দিয়ে এস, আর দেখ (একটু ইতস্তত করিয়া) একটু মেখে-চেখে ওকে খাইয়ে দিতে পার যদি ভাল হয়, ওর মা ওকে খাইয়ে দিত।

ললিতা। আমিও খাইয়ে দিচ্ছি গিয়ে। পরিতোষবাবু এই চিঠিখানা দিয়ে গেলেন।

নিমন্ত্রণ পত্রখানা দিয়া চলিয়া গেল। নকুল পড়িয়া দেখিলেন এবং চুপ করিয়া

বসিয়া রহিলেন। বাহিরের দ্বারে সরু-মঙ্গলা ষ্টোরের সেই ছোকরা আসিয়া দাঁড়াইল

ছোকরা। বিলটা এনেছি, যাদববাবু বললেন—

নকুল। এখন আমার বড় বিপদ, কিছুদিন পরে এসো ভাই।

ছোকরা। বেশ, কোন্ তারিখে আসব বলুন?

নকুল। তারিখ? আচ্ছা আমি ওবেলা যাদববাবুর সঙ্গে দেখা করব।

ছোকরা। আচ্ছা।

চলিয়া গেল। পিসামহাশয় প্রবেশ করিলেন

পিসামহাশয়। তোমাদের এ কোলকাতা শহর রাজধানী না ঘোড়ার ডিম! একটা ভাল ঘোড়ার গাড়ী পাবার জো নেই। উঃ, এইটুকু রাস্তা মাত্র এসেছি, মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত কবজাগুলো ঢিলে হয়ে গেছে যেন। উফ্! আমার ঠাকুরদার ক্রহামখানায় চড়লে টেরই পাওয়া যেত না যে গাড়িতে চড়েছি। কই দুর্গা, তোদের হল, ট্রেণের আর বেশী দেরি নেই।

দুর্গামণি ও কুঙ্কুম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া আসিল

দুর্গামণি। আমাদের হয়ে গেছে। গাড়ি ডেকেছেন ?

পিসামহাশয়। ডেকেছি। গাড়ি এ গলিতে ঢুকল না।

দুর্গামণি। আমাদের জিনিসপত্তরগুলো কে নিয়ে যায় তা হলে ?

পিসামহাশয়। কে আর নিয়ে যাবে, (নকুলের দিকে চাহিলেন) পাঁস ফেলতে ভাঙাকুলো আমি তো আছিই ; কই কি জিনিস আছে দেখি।

দুর্গামণি, কুঙ্কুম ও পিসামহাশয় ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। নকুলও নীরবে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। একটু পরেই আবার সকলে বাহির হইয়া আসিলেন। পিসামহাশয়ের এক হাতে একটা রং-চটা সুটকেস, আর এক হাতে প্রকাণ্ড একটা পুঁটুলি। নকুলের হাতেও একটা সুটকেস, তাহার কলটা সম্ভবত খারাপ, সেটা দড়ি দিয়া আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। দুর্গামণি, কুঙ্কুম প্রত্যেকেরই হাতে পুঁটুলি। দুর্গামণি যাইবার পূর্ব্বে ঘুমন্ত রণুর চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন

দুর্গামণি। ভাল হয়ে যাবে মা ষষ্ঠীর কৃপায়, কোন ভয় করিস নি। ও ভাল হয়ে গেলে ওদের দুজনকে নিয়ে তুই বরং নৈহাটি যাস।

নকুল নীরব

টুনু খাচ্ছে বুঝি, থাক তাকে এখান থেকেই আশীর্ব্বাদ করছি, যেতে দেখলে এখুনি আবার ষ্টেশনে যাবার জন্যে কাঁদাকাটা করবে।

সকলে একে একে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। একটু পরেই ফকিরবাবু প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে একখানা খবরের কাগজ। ললিতাও রান্নাঘর হইতে আসিল

ফকির। ললিতা, তোমার মা ফিরেছেন?

ললিতা। মা তো সন্ধ্যের সময় সিনেমা দেখে তবে ফিরবেন।

ফকির। তাই বলে গেছেন নাকি?

ললিতা। হ্যাঁ।

ললিতা ঘরে ঢুকিয়া একটা টিনের কৌটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিল

ফকির। ওটা কি?

ললিতা। চিনির টিন, টুনুকে দুধভাতটা খাইয়ে আসি।

চলিয়া গেল। নকুল ফিরিয়া আসিলেন

ফকির। ওরা সব চলে গেল?

নকুল। হ্যাঁ।

ফকির। রুণু কেমন আছে?

নকুল। খুব জ্বর—

ফকির। ওষুধ পড়েছে কিছু?

নকুল। সহদেবকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি, এখনও ফেরেনি। সতীশের কোন খোঁজ পেলেন?

ফকির। কিছু না। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছি, দেখ তো ছবিটা থেকে ঠিক চেনা যাচ্ছে কি না—

নকুলকে কাগজটা দিলেন

নকুল। তা যাচ্ছে।

নকুল কাগজের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ফকির চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ফকির। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) আমি সমস্ত বুঝচি, তোমাকে বলা বৃথা তা-জানি, তবু বলতে হচ্ছে—

নকুল খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন,

হাতে টাকা আছে তোমার? ভাড়া কিছু দিতে পারবে? আমি এখন চাইতাম না, কিন্তু বাধ্য হয়ে চাইতে হচ্ছে; মানে (নিম্ন কণ্ঠে) এরা কেউ জানে না, এই বাড়িটা মর্টগেজ রেখে কিছু টাকা ধার নিয়েছি আমি, তারা সুদের জন্যে এখন ভয়ানক তাগাদা লাগিয়েছে, বলছে এখন সুদ না দিলে কম্পাউণ্ড ইন্‌টারেষ্ট দিতে হবে। তা ছাড়া এই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা দিতে হ'ল এদেরও লম্বা বিল হবে একটা, চেনাশোনা ছিল বলেই ধারে ছেপেছে।

নকুল। শ্রাদ্ধটা হয়ে যাক, মৃণ্ময়ীর গয়না যা দু-একটা আছে বিক্রি করে যার যা পাওনা আছে সব চুকিয়ে দেব।

ফকির লাল খামখানা সহসা দেখিতে পাইলেন

ফকির। 'শুভ বিবাহ'—এ আবার কি?

নকুল। পরিতোষের বিয়ে, নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল।

ফকির। পরিতোষের বিয়ে! সে কি! আমি যে তার ওপর ভরসা ক'রে—

চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন ও একদৃষ্টে নিমন্ত্রণ পত্রটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহদেব প্রবেশ করিল

সহদেব। উঃ, কি ভিড় হাসপাতালে!

নকুল। তোকে দেখে কি বললে?

সহদেব। বললে বেরিবেরি হয়েছে। তেল আর ভাত খেতে মানা, জাঁতায় পেষা আটার রুটি, ঘিয়ের রান্না তরকারি, টমাটো, মুগের ডাল ভিজোনো, কমলালেবু, মাখন, ইস্‌ট, এই সব খেতে হবে। আর প্রকাণ্ড একটা ইনজেকশনের ফর্দ দিয়েছে, ভিটামিন আর ক্যালসিয়ামের, দাম জেনে এলাম পনর টাকা! যত সব বোগাস!

নকুল। রুণুর ওষুধ এনেছিস?

সহদেব। অনেক মারামারি ক'রে তিনদাগ সিনকোনা পেয়েছি। কুইনিন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে নাকি। এই নাও।

টেবিলের ওপর শিশিটা রাখিল

আমার বড় ক্লান্ত লাগছে, শুইগে যাই।

ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। নকুল
ও ফকির নিঃশব্দে বসিয়া রহিল

নেপথ্যে বিনয়। নকুলদা, বাড়ি আছ ?

নকুল। আছি, ভেতরে এস।

বিনয় প্রবেশ করিল

বিনয়। একটা সু-খবর আছে, আমাদের আপিসের টাইপিষ্ট জগৎবাবুর বেরিবেরি হয়েছিল জান তো, সে হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেছে কাল রাত্তিরে। সায়েব নাকি বলেছে তুমি একজন ওলড্ হ্যাণ্ড, তুমি যদি অ্যাপ্লাই কর, তোমাকে নেওয়া হবে। বড়বাবু বললেন তুমি এক্ষুণি দরখাস্ত লিখে নিয়ে আপিসে সায়েবের কাছে চলে যাও।

নকুল। (পুলকিত) তাই নাকি ?

তাড়াতাড়ি টাইপরাইটারে কাগজ
পরাইতে লাগিলেন

বিনয়। তোমাকে এই খবরটা দেবার জন্যে বড়বাবু আপিস থেকে পাঠালেন আমাকে। আমি চলি, তুমি শিগগির এস।

নকুল। হাঁ যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি আমি।

দ্রুতবেগে টাইপ করিতে লাগিলেন। ফকির চুপ করিয়া লাল থামটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। টুনুকে কোলে করিয়া ললিতা প্রবেশ করিল

ললিতা। চল তোমাকে ওপরে ঘুম পাড়িয়ে দিই গে, এখানে অসুখের বিছানায় তোমাকে আর বসতে হবে না।

উপরে উঠিয়া গেল

ফকির। নকুল, তোমাকে একটি কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?

নকুল। কি বলুন?

ফকির। তোমাকে দু'দিন পরে বিয়ে করতেই হবে; তা না হলে, তোমার ওই কচি মেয়েদের দেখবে কে বল, তুমি আমার মেয়ে ললিতাকেই বিয়ে কর না—

নকুল একবার ঘাড় ফিরাইয়া ফকিরকে দেখিলেন, তাহার পর আবার টাইপ করিতে লাগিলেন। ফকির বলিয়া চলিলেন

নগদ টাকা আমার কিছু নেই, কিন্তু আমার

ওই একটি মাত্র মেয়ে, আর সন্তান হবার সম্ভাবনাও নেই আমার, এ বাড়ি-ঘর-দোর সব তোমরই থাকবে, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কর আমাকে তুমি ভাই।

তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেলেন, কিন্তু টাইপরাইটারে নকুলের দুটি হস্তই আবদ্ধ বলিয়া পারিলেন না। ঘুমন্ত কণ অস্ফুট কণ্ঠে 'মা' 'মা' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। ফকির সাগ্রহে নকুলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। নকুল কোন উত্তর দিলেন না, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দ্রুত খট খট শব্দে টাইপ করিয়া যাইতে লাগিলেন

যবনিকা



বনফুল

রচনাবলী ০৫